বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার

চৌধুরী মোঃ তাশরিক-ই-হাবিব

রেজিস্ট্রেশন নং : ১৭৪/২০১২-২০১৩

শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০১৭

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **চৌধুরী মোঃ তাশরিক-ই-হাবিব**, মাতা : হাবিবা-হা-নূর, পিতা : মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, গ্রাম : বিহারীনগর, ডাকঘর : ফার্শিপাড়া, থানা : ধামুইরহাট, জেলা : নওগাঁ, কর্তৃক উপস্থাপিত **'বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার'--** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত মৌলিক গবেষণাকর্ম। তার পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ **১৭৪/২০১২-২০১৩**। এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি অর্জনের অথবা কোনো পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : লোকজ উপাদানের স্বরূপ ৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের অন্বেষণ ৪২

লোকবিশ্বাস ৪৩/ লোকসংস্কার ৪৬/ লোকাচার ৫০/ লোকসাহিত্য ৫১/
(*ছড়া* ৫১/ *প্রবাদ* ৫৪/ *ধাঁধা* ৫৬/ *লোককথা* ৫৯/ *উপকথা* ৬০/ *ব্রতকথা* ৬১/
লোকপুরাণ ৬১/ *কিংবদন্তি* ৬২/ *লোকসঙ্গীত* ৬৫/ *মন্ত্র* / ৬৬/ *বাগধারা* ৬৮/
পুথিপাঠ ৭০)/ লোকপ্রথা ৭১/ লোকজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৭২/ লোকচিকিৎসা ৭৩/
লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন ৭৪/ লোকশিল্প ৭৫/ লোক-উৎসব ৭৬/
লোকক্রীড়া ৭৮/ লোকখাদ্য ৮১ / লোকযান ৮২/ লোকবৃত্তি ৮৩/ লোকভাষা ৮৩

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার ৯৪

জসীমউদ্‌দীন	*বোবাকাহিনী* / ৯৫
হুমায়ুন কবির	*নদী ও নারী* / ১১৩
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	*তিতাস একটি নদীর নাম* / ১৩০
শওকত ওসমান	*জননী* / ১৬০
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	*লালসালু* /১৭৭
আবু ইসহাক	*সূর্য-দীঘল বাড়ী* / ১৮৯ *পদ্মার পলিদ্বীপ* / ২১৩
শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম	*কাশবনের কন্যা* / ২২৫ *কাঞ্চনমালা* / ২৪০ *জায়জঙ্গল* / ২৫২ *সমুদ্র বাসর* / ২৫৮
শহীদুল্লা কায়সার	*সারেং বৌ* / ২৬৯ *সংশপ্তক* / ২৮১
জহির রায়হান	*হাজার বছর ধরে* / ৩০০
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	*খোয়াবনামা* / ৩১৯
আহমদ ছফা	*সূর্য তুমি সাথী* / ৩৩৮
হরিপদ দত্ত	*ঈশানে অগ্নিদাহ* / ৩৪৪ *অন্ধকূপে জন্মোৎসব* / ৩৫২
সেলিনা হোসেন	*নীল ময়ূরের যৌবন* / ৩৬৬
হুমায়ূন আহমেদ	*ফেরা* / ৩৭৪ *অপরাহ্ণ* / ৩৮২
নাসরীন জাহান	*উড়ে যায় নিশিপক্ষী* / ৩৮৯

উপসংহার ৪৭১

মুখবন্ধ

'বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার' আমার পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ। এ অভিসন্দর্ভে 'উপসংহার' ব্যতীত তিনটি পূর্ণ অধ্যায়ে বিভিন্ন শিরোনামে নির্ধারিত বিষয়বস্তু বিন্যস্ত হয়েছে। 'লোকজ উপাদানের স্বরূপ' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে 'লোক'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণের পাশাপাশি 'লোকজ উপাদান' বলতে লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানসমূহের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। এরপর উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ও শ্রেণিকরণের পাশাপাশি লোকজ উপাদানসনমূহের উপযোগিতাও বিবৃত হয়েছে। 'বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের অন্বেষণ' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচিত উপন্যাসসমূহে প্রাপ্ত লোকজ উপাদানসমূহের সার্বিক পরিচিতি। কেননা, বাঙালি লোকজীবনের স্বরূপ অনুসন্ধানের পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক অবয়বকে উপস্থাপনের তাগিদে এ গবেষণাকর্মে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের রচিত উপন্যাসসমূহকে বেছে নেয়া হয়েছে। ফলে অন্বিষ্ট উপাদানসমূহের পরিচিতি নির্দেশ ব্যতীত গবেষণার তাৎপর্য অনুধাবন দুরূহ বিবেচিত হবার ঝুঁকি রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম মূল গবেষণাভুক্ত–– 'বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার'। এ অধ্যায়ে নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের রচিত প্রাসঙ্গিক উপন্যাসসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণাভুক্ত বিষয়কে অন্বেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঔপন্যাসিকদের পরিচিতি, মানসপ্রবণতা, শিল্পস্বভাব এবং উপন্যাসসমূহ বিষয়ক প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে সমগ্র উপন্যাস বিশ্লেষণের পাশাপাশি এ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও গবেষক-সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য-অভিমতকে তথ্যনির্দেশ ও টীকায় সংযুক্ত করা হয়েছে। কখনো বা গবেষণার রীতি অনুযায়ী স্বীয় অভিমতের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য গবেষক ও সমালোচকের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে আমরা নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করেছি। লক্ষণীয়, আমরা এ গবেষণায় বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের রচিত সেসব উপন্যাসকেই নির্বাচন করেছি, যেগুলোতে লোকজীবনের সার্বিক চালচিত্র এবং লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ রূপে উপস্থিত। বিভিন্ন লোকজ উপাদানের বর্ণাঢ্য সমাহারের ঐতিহ্য বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে যে বৈচিত্র্যের ছাপ ফেলেছে, তা নির্বাচিত উপন্যাসসমূহে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং বিষয়গুলোকে ঔপন্যাসিকরা কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বীয় অভিজ্ঞতা, জীবনভাবনা ও শিল্পভাবনার সমাবেশ ঘটিয়ে, এ অধ্যায়ে তা-ই নির্দেশিত হয়েছে। 'উপসংহার'-অংশে সমগ্র অভিসন্দর্ভের মৌল প্রতিপাদ্য অর্থাৎ গবেষণাভুক্ত উপন্যাসসমূহের আলোকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় এবং সমকালীন আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে তাদের জীবনচর্যার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নির্দেশিত। এ গবেষণাকর্মে যেসব উপন্যাস বিশ্লেষিত হয়েছে, সেগুলোর মূলপাঠ বিষয়ক তথ্যাদি 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশে সংযুক্ত 'মূলগ্রন্থ' উপশিরোনামে উল্লেখিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভে উপন্যাসের বিভিন্ন উদ্ধৃত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা পাশে নির্দেশিত।

আমি ২০১৩ সালের ২৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি গবেষক হিসেবে 'বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার' শীর্ষক গবেষণাকর্ম শুরু করি। এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য evsjv‡'k GwkqwUK †mvmvBwU, XvKv আমাকে ২০১৬ সালের পিএইচ.ডি স্কলারশিপ প্রদান করে। গবেষণাকর্মে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ দেয়ায় আমি এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের

অধ্যাপক আমার শিক্ষক, ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে এ অভিসন্দর্ভ। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অভিমত, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা এ অভিসন্দর্ভ রচনায় অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন গ্রন্থ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সহায়ক দিকনির্দেশনা দেয়ায় আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তিনি আমাকে তুষার চট্টোপাধ্যায়ের †jvKms¯‹wZi ZË¡i¨c I ¯^i¨c wRÁvmv বইটি দিয়েছেন কাজের প্রয়োজনে। আমার কর্মসম্পাদনগত জটিলতা তাঁর পরামর্শে যথেষ্ট লঘু হয়েছে, কাজে গতি সঞ্চার করেছে। এ কাজের পরিকল্পনা ও বিষয়-মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আমার শিক্ষক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী ও ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের সুচিন্তিত পরামর্শ অভিসন্দর্ভ রচনাকে অনেকটাই সহজ করেছে। এর বিষয় নির্ধারণের কৃতিত্ব বিশ্বজিৎ ঘোষের। এজন্য তাঁর প্রতি আমার ঋণ আরো বেড়েছে নিঃসন্দেহে। এ গবেষণাকর্মের অগ্রগতিসাধনে বিভিন্নভাবে যাঁরা আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, বর্তমানে অনারারি অধ্যাপক জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রাক্তন অধ্যাপক জনাব আহমদ কবির, সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. সিদ্দিকা মাহমুদা, বিভাগের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার, অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী, ড. হোসনে আরা প্রমুখ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি দুর্লভ অভিসন্দর্ভের স্ক্যানকপি নিজের সংগ্রহে রাখার সুযোগ পেয়েছি এর প্রশাসক এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সফিকুন্নবী সামাদীর সৌজন্যে। একারণে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগ থেকে প্রকাশিত †dvK‡jvi Rvbvj এর পুরো সেটটি দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন অধ্যাপক ড. মোবাররা সিদ্দিকা। তাঁর সহকর্মী এবং আমার সুহৃদ একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মোঃ রওশন জাহিদও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বই-পত্রিকা পাঠিয়ে গবেষণাকর্ম এগিয়ে নিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন। আরো কিছু বই দিয়ে সহায়তা করেছেন সরকারী আদর্শ মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গার বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইয়াহ্ইয়া মান্নান এবং মাইলস্টোন কলেজের বাংলার সহকারী অধ্যাপক জনাব অরুণকুমার মজুমদার। এ গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ব্যক্তিগত সংগ্রহের পাশাপাশি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা অনস্বীকার্য।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমার পরিবারের সদস্যদের সাধুবাদ জানাই। তাদের উৎসাহ আর সহায়তা ছাড়া কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন হতো না। আম্মা যদি বারবার তাগাদা না দিতেন, পারিবারিক ও সাংসারিক নানা কাজের চাপে এ কাজটি শেষ করতে কর্মস্থল থেকে হয়ত ছুটি নেবার প্রয়োজন হতো। তাঁর এবং আব্বার অনুপ্রেরণা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে নির্ধারিত সময়পরিধিতে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে। ফারহানা আমার সহধর্মিনীই শুধু নয়, সহকর্মীও। তাই তার কাছে আমার প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আলাদাভাবে উল্লেখ অর্থহীন। সংসারের যাবতীয় কাজের ভার তার ওপর চাপালেও সে আমাকে কখনো বিমুখ করেনি। আমার প্রাণপ্রিয় দুই সন্তান আসহাব আর অদ্বিতীয়ার জন্ম এ গবেষণাকর্ম শুরু হবার পর। তাদের যথেষ্ট সময় দিতে না পারায় আমি বারবার মর্মাহত হয়েছি। দীর্ঘ সময় ধরে এ ধরনের পরিশ্রমসাধ্য কাজে মনোনিবেশে যে ক্লান্তি ও একঘেয়েমি ভর করে, তা

অনেকটাই কেটেছে আমার প্রিয় কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ, অনুকূল সাহচর্য লাভ ও মনের সতেজতা আস্বাদনে। পরিশেষে, যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবারে ও কর্মস্থলে যারা আমাকে নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা করে চলেছেন এবং অন্তরের আশীর্বাণীতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : লোকজ উপাদানের স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : লোকজ উপাদানের স্বরূপ

১. ‘লোক’-এর সংজ্ঞার্থ

‘লোকজ’ শব্দবন্ধ অন্তর্গত ‘লোক’ শব্দটি ব্যাপক অর্থদ্যোতকতার ধারক ও বাহক। সেকারণে আভিধানিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির অর্থগত পরিধি নির্ধারণ করা জরুরি। ‘লোকজ’ অভিধার ব্যুৎপত্তি ‘লোক’ শব্দের সঙ্গে ‘জ’ প্রত্যয় যোগে, যার অর্থ হলো ‘লোক–সম্পর্কিত’ বা ‘লোক–বিষয়ক’। ‘লোক’ বলতে সমষ্টিবদ্ধ যে মানুষদের বোঝায়, তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচয়, বংশপরম্পরাগত পেশা অবলম্বনের প্রবণতা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, স্বকীয় জীবনবোধ ও ধর্ম-দর্শনভাবনা। ‘লোক’ এর সংজ্ঞা নির্ধারণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। কেননা, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে লোকসংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব ও মতবাদের নিবিড় সংযোগ। এ অভিধাটি উপর্যুক্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক বলয়ে (ডিসকোর্স) সময়ের বিবর্তনে ক্রমশ বদলেছে। পাশাপাশি নতুন ধারণা ও চিন্তা এতে যুক্ত হয়েছে। ‘লোক’-এর অর্থগত পরিধিও অজস্র বাঁক-বদলের পরিণতিতে নতুন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে।

‘লোক’ শব্দটি বাংলা ব্যাকরণে মূলত প্রাতিপদিক (বিভক্তিহীন নাম শব্দ) হিসেবে ব্যবহৃত। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় জনসমাজে এ শব্দের অর্থসীমা অত্যন্ত ব্যাপক। ‘লোক’ অর্থে পৃথিবী বা জগৎ বোঝানো হয়। পাশাপাশি ইহলোক, পরলোক, ভূলোক, দ্যুলোক, প্রভৃতি সমার্থক শব্দের প্রয়োগও ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচীন যুগ থেকে লক্ষণীয়।[১] বৃহত্তর মানব সমাজ হিসাবেও ‘লোক’ শব্দের উপসর্গসূচক প্রয়োগ বহুল। F‡M‘-এ শব্দটি অন্তরীক্ষ/জগৎ অর্থে প্রযুক্ত। Agi‡Kvl-এর টীকায় ভুবন এবং সামান্য অর্থে; gbmswnZv ও MxZv-য় : ভুবন অর্থে, ivgvqY-এ ও gnvfviZ-এ : পৃথিবী অর্থে, iNesk-এ সমূহ বা গণ অর্থে; দর্শন শাস্ত্রে লোকায়ত দর্শনের উদগাতা অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। †e‘-এ শব্দটির মূল অর্থ ইন্দ্রলোক।[২] ভারতীয় শাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বলতে এক কথায় ত্রিলোককে বোঝায়। পুরাণে সাত ঊর্ধ্বলোক ও সাত অধঃলোক মিলিয়ে চতুর্দশ লোকের কথা উল্লেখিত। এ শব্দের অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে জন অধ্যুষিত বিশ্ব (ভুবন)। ivgvqY, gnvfviZ এবং তদনুসারে Agi‡Kvl-এর টীকায় একই অর্থে ‘লোক’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতি তথা প্রজা থেকে জন, মনুষ্য অর্থ গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে তা এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য গৌণ অর্থ যেমন ভৃত্য, কর্মী, মজুর, সাথী, অনুচর, আদিবাসী, সেনা ইত্যাদি অর্থের সমার্থক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষায় ‘লোক’-এর প্রয়োগ সাধারণ মানুষ অর্থে বহুল প্রচলিত। অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, “লোকনিন্দা–সর্বসাধারণের কথাই বলে, তবে এই সর্বসাধারণ একটি জনগোষ্ঠী, যার মধ্যে আদান-প্রদান চলে ; যা কখনোই সমাজ পরিধিকে অতিক্রম করে না। লোক পরম্পরা–সর্বসাধারণ, তবে তার বিকাশ ভৌগোলিক নয়। এক্ষেত্রে স্থানের পরিবর্তে বহুকাল ধরে প্রচলিত ঐতিহ্য হিসেবে ‘লোক’ বোঝানো হয়। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, ‘পণ্ডিত লোক’, ‘ধোবা লোক’, ‘তাঁতী লোক’ প্রভৃতি প্রয়োগ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচুর।”[৩] msm‘ ev½vjv Awfavb[৪]-এ ‘লোক’ বিশেষ্য পদ হিসেবে নির্দেশিত। মনুষ্য বা ব্যক্তি অর্থে এর বহুবচনে ‘সমূহ’, ‘গণ’ প্রভৃতি যুক্ত হয়। জনসাধারণ অর্থেও এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। ev½vjv kã‡Kvl[৫] -এ বিশেষ্য পদ হিসেবে উল্লিখিত ‘লোক’-এর অর্থগত প্রয়োগ জগৎ, ভুবন অর্থে ত্রিলোক (স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল), ইহলোক প্রভৃতি দৃষ্টান্তযোগে বিবৃত। তবে মানুষ অর্থে জন, জাতি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এতে নির্দেশিত। e¨enwiK kã‡Kvl[৬]-এ ‘লোক’ শব্দের ব্যবহার স্থান হিসেবে ভুবন, জগৎ, ত্রিলোক, প্রভৃতি অর্থে এবং ব্যক্তি হিসেবে মনুষ্য, সমাজ, জনসাধারণ, প্রজা, ভৃত্য, মজুর প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত। evsjv GKv‡Wwg e¨enwiK evsjv Awfavb-এ[৭] ‘লোক’ বিশেষ্য পদ হিসেবে নির্দেশিত। এতে তিনটি পরিচয়ে শব্দটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমত মনুষ্য, জন, ব্যক্তি হিসেবে। দ্বিতীয়ত

জনসাধারণ অর্থে। তৃতীয়ত একই ঐতিহ্যের ধারক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বিবেচনায়। লক্ষণীয়, এসব শব্দ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিবাচক অর্থাৎ একাধিক মানুষকে বোঝায়, যারা একই অবস্থান ও পরিচয়ে সনাক্তযোগ্য।

ইংরেজি শব্দ 'ফোক' (Folk) থেকে বাংলায় প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে 'লোক' শব্দটি, যা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে মূল শব্দের অনুবাদ-ঋণ হিসাবে। বাংলা 'লোক' এবং ইংরেজি 'ফোক' উভয় শব্দের মধ্যে ধ্বনিসাদৃশ্য বিদ্যমান। শব্দটি অবিমিশ্র নয়, সংযুক্ত স্যাকসন শব্দ।[৮] ইংরেজিতে 'ফোকলোর' শব্দটি উদ্ভাবন করেন উইলিয়াস থম্পস।[৯] তিনি G¨v‡_wbqvg (Athenaeum) নামক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক এমব্রস মর্টনকে লিখিত একটি চিঠিতে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। চিঠিটি উল্লেখিত পত্রিকার ২২ আগস্ট, ১৮৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। "প্রথমে শব্দটিকে দুটো শব্দের যোগফলে সমাসবদ্ধ করা হয়, ফোক ও লোর, মাঝখানে থাকে একটি হাইফেন। এই পত্র প্রকাশের এক বছর পরেএ্যাথেনিয়াম পত্রিকায় সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৪৭ সংখ্যায় থম্পস্ একটি প্রবন্ধ লেখেন। এর শিরোনাম ছিল 'The Folk-Lore of Shakespeare'। এ প্রবন্ধে শেকসপিয়রের নাটকে যেসব লৌকিক আচার এবং লোকসাহিত্যের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে, তার একটি হিসাব-নিকাশের চেষ্টা করেন উইলিয়াম থম্পস্। ... ঐতিহ্যবাহী সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণত স্রষ্টার নাম ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ... সেকারণেই শব্দটি উদ্ভাবনের পঁচিশ বছর পরে তিনি ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে *Notes and Queries* নামে যে পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন তার ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যায় ফোকলোর শব্দটির উদ্ভাবক হিসেবে তার নামটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার একটি প্রস্তাব সুধী পাঠকের সামনে তুলে ধরেন।"[১০] আশরাফ সিদ্দিকীর[১১] মতে, ইংরেজিতে 'Folklore' শব্দটি উদ্ভাবনের পূর্বে প্রাচীন প্রথা (Old Custom and Usage) এবং লোকসংস্কার (Superstition) প্রভৃতিকে ইংল্যান্ডে 'Popolar Antiquities' বলা হত। ইংরেজি ভাষায় 'Popular Antiquities' বলতে বংশানুক্রমে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথাকে বোঝাত। জার্মানিতে এ ধরনের প্রাচীন প্রথাকে বলা হত 'Volkskunde'। তবে জার্মানি 'Volkskunde' শব্দটি প্রাচীন প্রথা ছাড়া লোকশিল্পকেও বোঝাত। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে থম্পস-এর প্রবর্তিত 'Folklore' শব্দটি দ্বারা লোকমুখে প্রচারিত লোককাহিনী, ধাঁধা, গীতিকা, প্রবাদ প্রভৃতি Formalised Folklore বা লোকসাহিত্য ছাড়াও বংশপরম্পরায় প্রচলিত লোকশিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদি Material Folklore -কেও অন্তর্গত করা হয়।[১২]

বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানী, লোকতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানী 'লোক'-সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশের সূত্রে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক অভিমত উপস্থাপন করেছেন। বলাবাহুল্য, লোকসংস্কৃতির পরিসর যেমন সম্প্রসারিত, তেমনি 'লোক' সম্পর্কিত ধারণাও বহুকাল ধরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। সেকারণে কোনো একক সংজ্ঞায় 'লোক'-ভুক্ত মানুষদের সনাক্তকরণের কাজটি দুরূহ। আমরা এ পর্যায়ে বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানী, লোকতাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানীর উপস্থাপিত অভিমত সম্পর্কে জানব এবং এসব সংজ্ঞা পর্যালোচনাপূর্বক স্বীয় সংজ্ঞা নির্ধারণ করব। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো মারিয়া লিচ সম্পাদিত দুই খণ্ডের [১৩] *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*. এতে সংকলিত একুশ জন লোকবিজ্ঞানী-লোকতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক-লোকধর্মবিদ ও পুরাণবিশারদ প্রদত্ত বক্তব্য 'লোক' এবং লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত ধারণা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে তাঁদের বক্তব্যকেই চূড়ান্ত না মেনে বরং পরিবর্তিত সময়ের পটভূমিতে নতুন চিন্তা, সূত্র ও তত্ত্বের আলোকে স্বীয় অভিমত প্রকাশের আগ্রহ আমেরিকা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের লোকবিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

জোনাস বেলিস (Jonas Balys) ফোকলোর-সম্পর্কিত অভিমত জানাতে গিয়ে এর বিভিন্ন উপাদানের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি 'ফোক' হিসেবে 'primitive' মানুষদের বুঝিয়েছেন।[১৪] মরিয়াস বারিউ (Marius Bareau)

ফোকলোরের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি 'ফোক' বলতে গ্রামীণ বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়কে (farmer, carpenter, carver, shoemaker, cooper, blacksmith, wooden ship builder) বুঝিয়েছেন।[১৫] বি. এ. বটকিন (B.A.Botkin) জানিয়েছেন, আধুনিক সমাজে ঐতিহ্যবাহী মৌখিক সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে ফোকলোরের মূল্য স্বীকৃত--

> In a purely oral culture everything is folklore. In modern society what distinguishes folklore from the rest of culture is the preponderance of the handed-down over the learned element and the prepotency that the popular imagination derives from and gives to custom and tradition. ... In this process of creative remembrance, which is tantamount to the genius of a people, the great collections of folk literature are the product of the collaboration of countless folk singers, folksayers, collectors, scholars, religious teachers, and professional artists and interpreters of the arts with the anarticulate folk-Sandburg's "Laboring many : of the "scholars's learning about the folk" with the folk's own learning.[১৬]

অন্যদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন অভিমত জানিয়েছেন অরেলিও এম. এস্পিনোজা (Aurelio M. Espinosa)। তিনি ফোকলোরের উপাদান সৃষ্টিকারী হিসেবে যাদের কথা বলেছেন, তারা দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বাহক--

> The materials of folklore are for the most part the materials of social anthropology that have been collected from the barbarous and "uncivilized" regions of the world, as well as from the rural and illiterate peoples of the "civilized" countries. These materials have been obtained from the anthropological data of history or have been collected by anthropologists and folklorists in modern times. Specially, folklore consists of the beliefs, customs, superstitions, proverbs, riddles, songs, myths, legends, tales, ritualistic ceremonies, magic, witchcraft, and all other manifestations and practices of primitive and illiterate peoples and of the "common" people of civilized society. …Folklore may be said to be a true and direct expression of the mind of "primitive" man.[১৭]

জর্জ এম. ফস্টার (George M. foster) জানিয়েছেন, ফোকলোর হলো 'people's culture.'। তাঁর মতে, ফোকলোর "is essentially of the people, by the people, and for the people".[১৮] এম. হারমোন (M. Harmon) ফোকলোর সম্পর্কিত আলোচনায় 'ফোক' সম্পর্কে সরাসরি না জানিয়ে বরং ইঙ্গিত দিয়েছেন--

> Nor can we think of groups simply in the traditional racial or geographic terms; they may be based on occupation, age, sex, economics, education, interest etc., and in a complicated society new groupings are constantly presenting themselves.[১৯]

মেলভিল জে, হারসকোভিচ (Melville J. Herskovits) 'ফোক'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন--

> A folk group, usually a rural group whose mode of life is rather different from that of its urban counterpart.[২০]

জর্জ হার্জগ (George Herzog) স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে গ্রামীণ সমাজের বাইরে, বিশেষত শহরেও 'লোক'-ভুক্ত মানুষ অবস্থান করতে পারে। তিনি 'ফোক'-সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

> Folklore in the specific sense, which is the usual one in the United States, embraces those literary and intellectual phases of culture which are perpetuated primarily by oral tradition : …Folklore thus exists in the city as well in the countryside, and within groups that cut across such a division, but by preference it has been that of the countryside. … a “folk” group, usually a rural group whose mood of life is rather diffrrent from that of its urban counterpart. Such a wide expansion of meaning, stemming from a special æFolk” concept, has not been applied in the study of “primitive” or preliterate societies where the anthropologist’s background in social science and linguistics appears indispensable for the study of native culture as a whole, and also for a fruitful evaluation of the function and history of oral folklore.[২১]

আর. ডি. জেমসন (R. d. Jameson) ফোকলোরের উপাদান সম্পর্কে জানানোর পাশাপাশি ‘ফোক’ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন--

> Folklore is a branch of cultural ethnology. The data of folklore are the myths, legends, traditions, narratives, superstitions, religions, rituals, customs, dances, and explanations of nature and man, acceptable to individual ethnic groups in each part of the world at any historical moment.[২২]

গার্ট্রুড পি. কুরাত (Gertrude p. kurath) ফোকলোর সম্পর্কিত আলোচনায় ‘illiterates and rustics’-দের উল্লেখ করেছেন, যারা বিভিন্ন ধরনের মৌখিক লোকসাহিত্য চর্চায় সচেষ্ট।[২৩]

ম্যাকওয়ার্ড লিচ (MacEdward Leach) জানিয়েছেন--

> Folklore, … in short the accumulated knowledge of a homogeneous unsophisticated people, tied together not only by common physical bonds, but also by emotional ones which color their every expression, giving it unity and individual distinction.[২৪]

ক্যাথরিন লুমালা (Catherine Luomala) ‘primitive people’-কে ‘ফোক’ হিসেবে অভিহিত করে জানান--

> *folklore* … is referring to all the unwritten narratives of primitive people and thereby drawing a line between the literature of primitive and civilized peoples … A connotation which adds to the confusion is a hang-over from the earlier European use of the word *folklore* to cover peasant customs, beliefs, and narratives-the anthropology of peasants.[২৫]

জন এল. মিস (John L. Mish) সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় ‘ফোক’ বলতে ‘ancient popular … less educated elements’ সামগ্রীর স্রষ্টাদের বুঝিয়েছেন।[২৬]

চার্লস ফ্রান্সিস পোর্টার (Charles Francis Pooter) ফোকলোর সম্পর্কে যে অভিমত জানিয়েছেন, তাতে ‘লোক’-সম্পর্কিত ধারণাদি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত--

> Folklore is a lively fossil which refuses to die. It is a precipate of the scientific and cultural lag of centuries and millennia of human experience. … folklore develops as the traditional, and usually oral, explanation of the origins and early history of man, as distinct from history, which is the factual record in writing. ... Folklore is the survival within a people’s later stage of culture of the beliefs , stories, customs, rites and other

> techniques of adjustment to the world and the supernatural, which were used in previous stages.[২৭]

'ফোক'-বিষয়ক একটি সন্তোষজনক, গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ যে অত্যন্ত জটিল কাজ, মেরিয়ন ডব্লিউ. স্মিথ (Marian W. Smith) ও স্টিথ থম্পসন (Stith Thompson) এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন--

> It suffers from the difficulty which arises whenever any attempt is made to define "the folk".It is doubtful that the uneducated or illiterate can be considered apart from other persons, and the hypothesis which establishes the existence of such a folk identity would be almost impossible to validate. …a definition resting upon this contrast between the oral and the written fails utterly to meet conditions found among American Indian and other societies formerly without the art of writing.[২৮]

স্টিথ থম্পসনও (Stith Thompson) ফোকলোর-কেন্দ্রিক আলোচনায় এ বিষয়টির অবতারণা করেছেন। তিনি ফোকলোরের উপাদান নির্দেশ করতে গিয়ে জানিয়েছেন--

> Although the word folklore is more than a century old, no exact agreement has ever been reached as to its meaning.[২৯]

এমিনি ডব্লিউ. ভোগিলিন (Ermenie W. Voegelin) এর মতে--

> the term folklore customarily has been used to refer to the various genres of orally transmitted prose and verse forms existent in primitive groups. ... this limitation of the term to designate one part only of any preliterate culture contrasts sharply with the students od Euro-American, European, and other folk and peasant cultures.[৩০]

উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, উক্ত লোকবিজ্ঞানী-লোকতাত্ত্বিক-নৃবিজ্ঞানীগণ 'লোক' বা ''ফোক' এর সংজ্ঞায়ন, লোকজ উপাদানসমূহ নির্ধারণ, এর স্রষ্টাদের পেশাগত তথ্যাদি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্দেশে ভিন্ন মত প্রকাশে দ্বিধাহীন।[৩১] অন্যদিকে আমেরিকান লোকবিজ্ঞানী অ্যালান ডান্ডিস 'লোক'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন পরিবর্তিত সময় ও সামাজিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি বলেন--

> The term 'folk' can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor … it could be a common occupation, language or religion--but what is important is that a group formed for whatever reason will have some traditions which it calls its own … with this flexible definition of folk, a group could be as large as a nation or as small as a family…[৩২]

নৃতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক জাতিতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি অভিধানে 'ফোক' বা 'লোক' এর সংজ্ঞা--

> Folk, a group of associated people; a primitive kind of post-tribal social organization; the lower classes or common people of an area.[৩৩]

> Folk in ethnology the common people who share a basic store of old tradition.[৩৪]

> A less ethnocentric and broader definition of folk would be any group of people who share at least one common factor (for example, common occupation, religion, or ethnicity).[৩৫]

'লোক'-সম্পর্কিত ধারণা গঠনে আমেরিকান লোকবিজ্ঞানী, লোকতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত বিশ শতকের প্রায় আশির দশক পর্যন্ত প্রাধান্য পেলেও বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গের লোকবিজ্ঞানী ও লোকতাত্ত্বিকগণ সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমিতে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এ প্রসঙ্গে ভেবেছেন এবং স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে অজস্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত এতদঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বিভিন্ন বহিরাগত জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের পরিণতিতে যে শঙ্কর নৃগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, এর বাইরেও বিচরণ করেছে এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ। জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং আর্থ-সামাজিক পরিসরে কয়েক হাজার বছর ধরে এতদঞ্চলে বসবাসরত অধিবাসীদের মধ্য থেকে 'লোক' পরিচয়ভুক্ত মানুষকে সনাক্তকরণের কাজটি প্রকৃতঅর্থেই দুরূহ। বাঙালি লোকবিজ্ঞানী ও লোকতাত্ত্বিকদের 'লোক'-বিষয়ক ভাবনা প্রসঙ্গে এবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য 'লোক' সম্পর্কে জানিয়েছেন--

> লোক যেমন বৃহৎ বা সমগ্র মানবজাতি নয়, তেমনি আবার তার অংশও নয়। আসলে যে জনঅংশ ভাবনায় চিন্তায় কর্মে ও কর্মবিকাশে পারস্পরিক লেনদেনের ও নির্ভরশীলতার মধ্যে সংহত হয়ে ওঠে ও এভাবে একটা যাপিত জীবনের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করে এবং তা অক্ষুণ্ন রাখে তারই সাধারণ পরিচয় 'লোক'। এই লোক সমাজ-অন্ধও নয়, আবার বাইরের পরিবর্তন-বিমুখও নয় বা বাইরের উপাদান গ্রহণ দ্বারা স্বতোপরিবর্তনশীলও নয়, কেবল তার স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতার কতকগুলো চিহ্নকে সে এসব যোগবিয়োগের মাঝেই প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে তার সংহতির বীজ গড়ে উঠলেও কালে তা আপন গণ্ডিকেও অতিক্রম করে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে।[৩৬]

মযহারুল ইসলাম বলেন--

> লোক কথাটি বুঝতে হবে লোকের চারিত্র্যে, তার কার্যকলাপে– তার সামাজিক অবস্থান অথবা বাসস্থানের ভিত্তিতে নয়। ... ফোক তারাই যারা সুদূর অতীত অর্থাৎ আদিম কাল থেকে ফোকলোর সৃষ্টি করে এসেছে এবং এখনো সৃষ্টি করে চলেছে ... লোক কোনো নির্দিষ্ট স্তরের মানুষ নয়–সমাজের যে কোনো স্তরে লোক বাস করতে পারে ... শহরে, নগরে বা গ্রামে সে থাকতে পারে ... ফোক যেমন একটি গণগোষ্ঠী হতে পারে, একটি বিশেষ সমাজবদ্ধ শ্রেণী হতে পারে, একটি বিশেষ ভাষার ও সংস্কৃতির বলয়ে আবদ্ধ সমাজ হতে পারে, তেমনি হতে পারে একটি দল বা গ্রুপ। একের সঙ্গে অপরের ভাবের আদান-প্রদান চলে এমন একটি দল বা গ্রুপকেও লোক বলে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। এমনকি ভাবের আদান-প্রদানকারী একটি পরিবারও ফোক-তারাও ফোকলোরের সৃষ্টি করতে পারে, লালন করতে পারে এবং ... হস্তান্তর করতে পারে।[৩৭]

তুষার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত--

> ক. সাধারণভাবে 'ফোক' বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী, যারা ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, জনতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও জীবিকাগত সমন্বয়সূত্রে সংগ্রথিত।
>
> খ. সাধারণভাবে 'ফোকলোর' শব্দের সূত্রে 'ফোক' বলতে এমন সামাজিক জনসমষ্টিকে বোঝায়, যা নিজস্ব ঐতিহ্যে কমবেশী সমৃদ্ধ ও যৌথ আবেগ বা চেতনায় সংহত; প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত জীবনাশ্রয়ী সুদূর প্রসারিত ও বহুধা বিস্তৃত কর্ম ও চেতনার প্রবাহে লোকসংস্কৃতির জগৎ ব্যাপ্ত।[৩৮]

পবিত্র সরকার বলেন--

> লোকসংস্কৃতির পরিচয় নিহিত আছে 'লোক' কথাটির মধ্যে। এখানে 'লোক' একটি পারিভাষিক শব্দ, এর অর্থ হল, মূলত গ্রামীণ, অধিকাংশত নিরক্ষর (কিন্তু 'নিরক্ষর' মানে 'অশিক্ষিত' নয়), কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত বা কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকানির্ভর সংহত জনগোষ্ঠী, যারা ভৌগোলিক সান্নিধ্যে, কিংবা জীবিকার বন্ধনে পরস্পরের দৈনন্দিন আদান প্রদানের অংশীদার। এই লোকেরা ... আদিবাসীও নয়, নাগরিকও নয়–বরং গ্রামীণ ধারাবাহিক গোষ্ঠী।[৩৯]

দুলাল চৌধুরী 'লোক' এর সংজ্ঞা সরাসরি প্রণয়ন না করে বরং লোকসমাজ-সম্পর্কিত আলোচনায় এ প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে বিষয়টির অবতারণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন,[৪০] 'একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে (গ্রামে, গঞ্জে, মহকুমায়, জেলায় বা রাজ্যে, রাষ্ট্রে) বসবাসকারী সমভাষাভাষী সরল ঐতিহ্যবাহী জনসমাজকে বলা হয় লোকসমাজ। ... লোকসমাজে কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী একাত্মক হয়ে সংস্কৃতি চর্চা প্রসারণ, সংবেদন ও উচ্চারণ করে। ফলে বর্ণ, শ্রেণী, গোষ্ঠীকে সংস্কৃতি অতিক্রম করে এক অনন্যারূপা সমাজ চেতনা সৃষ্টি করে। লোকসমাজের এটাই বিশ্বজনীনতা।' অর্থাৎ তাঁর অভিমত অনুযায়ী বলা চলে, একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে (গ্রাম-গঞ্জ, মহকুমা, জেলা, রাজ্য বা রাষ্ট্রে) বসবাসকারী সমভাষাভাষী সরল ঐতিহ্যবাহী সমষ্টিবদ্ধ মানুষেরাই 'লোক'।

অচিন্ত্য বিশ্বাসের অভিমত--

> বিশেষণ বর্জিত যে মানুষ, সংস্কৃতি বিকাশের এমন এক স্তরের কথা যার ব্যবহারে স্পষ্ট হয়– যে স্তরটির আদিম ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রশ্নাতীত, যাকে প্রধানত শ্রমসাধ্য কর্ম-কুশলতায় জীবনপাত করতে হয়–তাকেই 'লোক' নামে অভিহিত করা যায়। লোক-বিশেষণ বর্জিত, ভদ্র বা গ্রামীণ, নাগরিক বা সজ্জন, ছোট বা বড়ো নয়– নিতান্তই 'লোক', মানুষ। ইংরেজীতে Folk. অভিধানে যার অর্থ 'people in general' 'of the people' 'of popular origin' 'traditional'. সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষ সম্বন্ধীয়, জনপ্রিয় উৎস বা চিরন্তন ঐতিহ্য অনুসারী।[৪১]

সৌমেন সেন 'লোক'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন--

> 'লোক' একটি গোষ্ঠীতো বটেই, যার স্বতন্ত্র পরিচয় থাকবে, জাতিগত, পেশাগত, ধর্মগত ইত্যাদি, আর থাকবে একটি নির্দিষ্ট পরম্পরা, কিন্তু এই গোষ্ঠী অনেকসময়ই যেমন থাকে একটি শ্রেণির অন্তর্গত, তেমনি হয় নানা শ্রেণির সমন্বয়। লোকসংস্কৃতি বিচারে কিন্তু এই শ্রেণি-অন্তর্গত গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী-অন্তর্গত শ্রেণির হিসেবটা নিতে হয়।[৪২]

উপর্যুক্ত আলোচনা-সূত্রে আমরা 'লোক' সম্পর্কিত যে ধারণা পাই, তাতে প্রতীয়মান যে লোকসংস্কৃতির বহুসম্প্রসারিত পরিমণ্ডলে এ অভিধা সময়ের বিবর্তনে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সমষ্টিবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক পরিশীলন, যার সঙ্গে তাদের বংশানুক্রমিক পেশা, রুচি, অভ্যাস এবং জীবনপ্রণালী নিবিড়ভাবে জড়িত, যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, বিশেষভাবেই প্রকৃতিনির্ভর এবং ভৌগোলিক ধারণা-বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা ও লোকজ্ঞানে দীক্ষিত, গ্রাম ও শহর-নগরের খেটে খাওয়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এমন সমষ্টিবদ্ধ মানুষেরাই 'লোক'। আমাদের বিবেচনায় লোক বলতে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে যে কোনো ভৌগোলিক স্থানে অবস্থানরত এবং মূল সমাজকাঠামোর পরিসরে অপেক্ষাকৃত দূরে বিচরণরত, মানসিকতায় কিছুটা রক্ষণশীল, প্রচলিত শিক্ষাবঞ্চিত কিন্তু পারিপার্শ্বিক জীবন ও ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ধারণাসম্পন্ন, বংশপরম্পরাগত পেশানির্ভর (এমনকি পরিস্থিতিগত কারণে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হলেও), ও স্বীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী গোষ্ঠীবদ্ধ সেসব মানুষকে (আদিবাসী ব্যতীত) বোঝায়, যারা আর্থিক মানদণ্ডে স্বল্প উপার্জনক্ষম, হতদরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে।

১.১ লোক-এর বৈশিষ্ট্য

'লোক'-ভুক্ত মানুষের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা কোনো ভৌগোলিক অঞ্চল, জনপদ, শহর বা রাষ্ট্রভুক্ত বাসিন্দাদের অন্তর্গত হয়েও নিজস্ব পরিচয়ে বরাবর পরিচিত হয়। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্ততাই এক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দেয় তাদের স্বকীয় অবস্থানকে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহ ও কর্মগত অভিজ্ঞতা, বংশপরম্পরায় অনুসৃত পেশা ও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য, সর্বোপরি গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুপস্থিতি বিশেষ মাত্রা পায় সৃষ্টিশীল বিভিন্ন মাধ্যমে, লোকায়ত ভাবনা ও দর্শনে। সভ্যতার আদিম পর্যায় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ক্রমিক বিবর্তনের পরিণতিতে লোকসমাজের গড়ন বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। অরণ্যচারী জীবনে বিবিধ বৈরী প্রতিবেশের মুখোমুখি হয়ে বুদ্ধি, পেশীবল ও কৌশলকে হাতিয়ার করে তারা অস্তিতরক্ষায় বরাবর সচেষ্ট থেকেছে।

পাশাপাশি জৈবিক প্রয়োজনে বংশরক্ষার তাগিদ এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপনের ভাবনা থেকে তারা ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সংঘ, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও অনুশাসন। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের অন্তর্গত হওয়ায় তাদের ধারণকৃত বিশ্বাস, ভাবনা, আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, উৎপাদনপ্রণালী ও জীবিকানির্বাহরীতি প্রভৃতিতে প্রতিফলিত হয় নিজস্বতার ছাপ। 'লোক'-ভুক্ত মানুষের সামগ্রিক পরিচয়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট, যা তাদের স্বতন্ত্র জীবনধারা, আচরণও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে চিহ্নিত করে--

ক. লোক বলতে যে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষদের বোঝায়, তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অসচেতন থাকে। আদিম কৌমচারী জীবনের ধারাবাহিকতা লোকসমাজে পরিলক্ষিত হয়। একাকী জীবনযাপনের অসম্ভাব্যতা উপলব্ধির ফলে যূথচারী জীবনের প্রতি যে আগ্রহ আদিম মানুষের চেতনালোকে গড়ে উঠেছিল, তা-ই তাদের প্রভাবিত করেছিল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে। সময়ের প্রবহমানতায় সে রীতি ধীরে ধীরে বিবর্তিত হলেও লোকসমাজে বহুজনের সঙ্গে মিলে মিশে বসবাসের ধারণা থেকেই গেছে। সমষ্টির অংশ হিসেবেই সেখানে ব্যক্তির কাজ, সৃষ্টি ও ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়। তবে স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দানে সমর্থ ব্যক্তির প্রতি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমীহা, মনোযোগ ও শ্রদ্ধা একপর্যায়ে স্বীকৃতি পায়। এক্ষেত্রে লোকশিল্পী, বয়াতি, কবিয়াল, ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত -অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধক, গুরুর পাশাপাশি লোকচিকিৎসক, বৈদ্য, কবিরাজ, গুণীন, হাতুড়ে চিকিৎসক, জ্যোতিষী, সাপুড়েদের দৃষ্টান্ত স্মর্তব্য। অর্থাৎ ব্যক্তি হিসেবে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের নিকট মূল্যায়িত হবার শর্ত হিসেবে কখনো তার পেশাগত দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও অনুকরণীয় গুণাবলির প্রভাব নেপথ্যে কার্যকর থাকে।

খ. সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে লোকভুক্ত মানুষের অনুসৃত সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা রয়েছে। কেননা, বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসের সূত্রে তারা যে পেশা বা বৃত্তিকে জীবনধারণের তাগিদে অবলম্বন করে, তাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে তাদের গোষ্ঠীগত পরিচয়। এভাবেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরাও একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন করে, যা বংশপরম্পরায় সম্প্রসারিত হয়। গ্রামের কৃষকসমাজ, জেলে, দুর্গম অরণ্যের বাসিন্দা মৌয়াল সম্প্রদায়, বেদে সম্প্রদায় এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

গ. লোক হিসেবে পরিচিত গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের পেশাগত ও সাংস্কৃতিক স্বকীয় পরিচয় থাকলেও কখনো কখনো ভিন্ন ধর্ম- পেশা-সংস্কৃতিবদ্ধ গোষ্ঠীর, শ্রেণির বা সম্প্রদায়ের আচরিত বিশ্বাস-মূল্যবোধ, ধারণা তাদের প্রভাবিত করে। যদিও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা স্বীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্যকে অনুসরণে যথাসম্ভব রক্ষণশীল, তবু জীবিকা নির্বাহ বা প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে, এমনকি নিছক একই ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থানের সূত্রেও ভাষিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠায় একটি গোষ্ঠীর বাসিন্দা অন্য গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে ভিন্ন অভ্যাস, রুচি, নৈতিক শিক্ষা তাদের মনস্তত্ত্বেও প্রভাব বিস্তার করে। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের আচরণে, ভাষা প্রয়োগে, বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজে ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে।

ঘ. লোকসমাজের বাসিন্দারা প্রচলিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও স্বীয় সামাজিক পরিসর ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ, পারিপার্শিক জগৎ-জীবন ও জীবিকাসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষভাবেই অবহিত থাকে। ফলে লোকসংস্কৃতি, আঞ্চলিক পরিমণ্ডল, পরিবার ও সমাজ, ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিকতা সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা গ্রহণ ও অনুসরণে তারা সমর্থ। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি-সংকট থেকে উত্তরণের তাগিদে এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনযাপনের প্রয়োজনে তারা অধীত শিক্ষাকে ব্যবহার করে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এ শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। ফলে সেই লোকগোষ্ঠীর উদ্ভব, বিবর্তনের রূপরেখা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এতে প্রতিফলিত হয়।[৪৩]

ঙ. লোক হিসেবে অভিহিত মানুষদের চেনার অন্যতম মানদণ্ড হলো, তারা সমাজের কায়িক শ্রমজীবী, যাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হতে হয়। অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মপ্রবাহের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক

রয়েছে। তারা কোনোভাবেই পরনির্ভরশীল নয়। গ্রাম-শহর-নগর-বন্দর -- যে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলেই লোকগোষ্ঠী বসবাস করুক, তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের সামাজিক উপযোগিতা কোনো না কোনো উপায়ে অবশ্যই থাকতে হবে।

চ. একধরনের অকৃত্রিম অথচ আপাত সারল্য, অকপট মনোভঙ্গি, প্রযত্নের অভাব লোকভুক্ত মানুষের আচরণ-ব্যবহার ও চালচলনে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, লোকসাহিত্যে, লোকভাষায় ও বিভিন্ন সৃষ্টিশীল মাধ্যমেও এর ছাপ পড়ে। ভদ্র, নাগরিক সমাজের পরিমার্জিত রুচিবোধ ও শিক্ষিত মানসিকতায় তা অশোভন ও দৃষ্টিকটু হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত, প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, সহজাত মানবিক আচরণের প্রতি অনুরাগী লোকসমাজের সৃষ্টিশীলতা, চারুত্ব ও মননের অজস্র নিদর্শন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে বিধৃত।

ছ. রক্ষণশীলতা লোকসমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা হলেও তা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সংহতির বহিঃপ্রকাশও বটে। লোকসমাজ যেহেতু সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ, তাই সেখানে সকলের জন্যই বিধি-বিধান-অনুশাসন মেনে চলার কড়াকড়ি বজায় থাকে। গোষ্ঠীপতি ও তার অনুসারীদের নির্দেশ পালনের তাগিদ থাকায় ব্যক্তি যথেচ্ছ আচরণ করার সুযোগ বা স্বাধীনতা পায় না। গোষ্ঠীপ্রধানের নির্দেশ মেনে চলা ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য পুরস্কার ও সম্মান লাভের পাশাপাশি নিয়মভঙ্গের দায়ে শাস্তিভোগের বিধানও লোকসমাজের প্রচলিত রীতি। এভাবেই গোষ্ঠীর বাসিন্দাদের আচরণে রক্ষণশীলতা প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে রক্ষার তাগিদই শুধু নয়, স্বীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগও তাদেরকে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণশীল মনোভঙ্গি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে।

জ. ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-পেশা ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা, চালচলন, সামাজিক বিনিময়, আচার-অনুষ্ঠান উদযাপন ও যোগাযোগসূত্রে রক্ষণশীলতা-সহনশীলতা, সংঘাত-সমঝোতার বিচিত্র মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে লোকভুক্ত মানুষের গোষ্ঠীজীবন বহুলাংশে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি সম্প্রদায়গত ধর্মভাবনার গণ্ডি পেরিয়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি পোষণের উদারতা এবং আন্তরিকতাও লোকসমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। একটি লোকগোষ্ঠীর বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-প্রথা, উৎসব-পালা-পার্বণ, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রক্ষণশীলতা ও সহনশীলতার মিথস্ক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতি সময়ের বিবর্তনে ক্রমশ বিচিত্র মাত্রা পায়।

১.২ লোকজ উপাদানের সংজ্ঞার্থ

লোকজ উপাদান বলতে লোকসংস্কৃতির[৪৪] অন্তর্গত উপাদানসমূহকে বোঝায়। সংস্কৃতি বলতে মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সকল প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। অর্থাৎ সামাজিক মানুষের অভ্যাস, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার-মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, পেশা, শখ, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সামগ্রিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে মানুষ তার চিন্তা, বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে জীবনধারণের উপযোগী করে তোলে। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত হয় তার উদ্ভাবনী শক্তি, চিন্তার সামর্থ্য ও মেধার সুষ্ঠু সমন্বয়। এভাবেই প্রকৃতিপ্রদত্ত উপাদানকে কাজে লাগিয়ে সে একদিকে যেমন নিজের সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছে, অন্যদিকে তার কল্পনা ও সংবেদনশীলতাকেও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। লোকসংস্কৃতিতে বিধৃত হয় আদিম অরণ্যচারী কৌমজীবী মানুষের সামাজিক ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার ইতিবৃত্ত। কারণ 'সমাজ একটি জৈব সংগঠন। অতএব সমাজ প্রাণশক্তির প্রয়োজনে অনেক সামাজিক উপাদান যেমন বর্জন করে, তেমনি আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে অনেক উপাদানকে সংরক্ষণও করে। যে কোনো মানবসমাজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির উৎস হলো তার সংস্কৃতি। ... লোকসমাজ আনন্দে, বেদনায়, বিদ্রোহে, উচ্ছলতায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকেই বিজয়ের বৈজয়ন্তী কিংবা সংগ্রামের ও জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে

ব্যবহার করেছে। এই উৎসভূমির নাম লোকসমাজরূপী গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে ভাষা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতিগত সংহতি, ঐতিহ্য, আত্মীয়সূত্র [রক্তসম্পর্ক] পারস্পরিক বিশ্বাস, সমাজদলপতির প্রতি আনুগত্য কিংবা পঞ্চায়েতের ব্যবস্থায় আপন অস্তিত্বের সনাক্তকরণ এবং সংঘবদ্ধ জীবনচর্যা, সাহিত্য, শিল্প, মেলা ইত্যাদিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ইত্যাদির অন্তর ও বাহ্যিক বেগ-প্রতিবেগে সমাজ চলে নিরন্তর সামনের দিকে।'[৪৫] লোকসংস্কৃতি হলো একটি জাতির সামষ্টিক জ্ঞান ও অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ। মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগপরম্পরায় তা প্রবাহিত হয় এবং লোকসমাজের স্মৃতি, শ্রুতি ও অভিজ্ঞতায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সংরক্ষিত থাকে। কালিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় লোকজ উপাদানসমূহের কোনোটি উপযোগিতা হারিয়ে যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনিভাবে লোকসমাজের প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী নতুন উপাদানও সংযুক্ত হয়। যুগ যুগ ধরে এসব উপাদানের অবিরাম গ্রহণ-বর্জনের পালা চলে, যার মধ্য দিয়ে লোকসমাজের নিজস্ব অবয়ব ফুটে ওঠে। মূলত ব্যক্তির একক সৃষ্টি হলেও লোকসমাজের অনুমোদন ও স্বতঃস্ফূর্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে লোকজ উপাদানগুলো সমষ্টির সম্পত্তি হিসেবে গৃহীত হয়।[৪৬] কাজেই যেসব প্রাকৃতিক উপকরণকে লোকসমাজের বাসিন্দা বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ প্রয়োজনে এবং যাতে তার অন্তর্গত সৃষ্টিশীলতা, সম্ভাবনা ও সাংস্কৃতিক বোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নিজস্ব ভঙ্গিতে; সেগুলোকেই লোকজ উপাদান বলে।

১.৩ লোকজ উপাদানের বৈশিষ্ট্য

লোকজ উপাদানসমূহ [৪৭] প্রকৃতপক্ষে লোকসমাজের বাসিন্দাদের দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক বস্তুরাজির সাংস্কৃতিক রূপান্তর, যা তাদের জীবনাভিজ্ঞতা, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা ও সৃষ্টিশীল ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে লোকসমাজের বাসিন্দাদের ঐতিহ্যপ্রীতি, আদিম অরণ্যচারী জীবনের স্মৃতি, পূর্বপুরুষের অভ্যাস-আচার-অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও অনুরাগ, সজ্ঘবদ্ধ ভাবনার স্বাক্ষর, প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনের উদাত্ত আহ্বান, গোষ্ঠীর সুরক্ষা, স্থায়িত্ব ও কল্যাণকামনা প্রভৃতি।[৪৮] লোকজ উপাদানসমূহ লোকসমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে[৪৯] ধারণ করে, যাতে প্রকাশিত হয় কোনো জাতির পরিচর্যিত লোকসংস্কৃতির নিজস্ব পরিচয়।

১. লোকজ উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো পরিবর্তনশীল।[৫০] এসব উপাদান গড়নের দিক থেকে স্বকীয় কাঠামোবদ্ধ হলেও পরিবেশ, সমাজ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, অনুশাসন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক প্রভাবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যায়। পরিবর্তিত কালিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমির সঙ্গে অভিযোজনের অন্তর্গত শক্তি এসব উপাদানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও বটে। লোকজ উপাদান পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো, এগুলো বিশেষভাবেই মৌখিক সৃষ্টি, যা বংশপরম্পরায় ধরে রাখার প্রচেষ্টা লোকসমাজের বাসিন্দাদের ভাবনায় সক্রিয়। কিন্তু এটিও বিবেচনার বিষয় যে, ভাষার পরিবর্তনের পাশাপাশি লোকশিল্পী, কথক, গায়ক, চিত্রকর বা লোকসমাজের বাসিন্দারা, যারা বিভিন্নভাবে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের চিন্তা-মানসিকতা ও সৃষ্টিশীলতা একই স্তরের নয়। অন্তর্গত গুণাবলি, সৃজনশীলতা, চিন্তার সামর্থ্য ও কল্পনার প্রকাশে ভিন্নতা থাকায় এর প্রভাব লোকজ উপাদানের রূপ, গড়ন, ভঙ্গি ও অবয়বে প্রভাব ফেলে। এর পরিণতিতে লোকজ উপাদানেও পরিবর্তন সূচিত হয়। কোনো অঞ্চলের লোকসমাজভুক্ত বাসিন্দাদের সৃষ্ট বা পরিচর্যিত লোকজ উপাদানের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে এ পরিবর্তনের রূপরেখা অনুধাবন করা যায়। যেহেতু ভাষাশ্রিত মৌখিক ঐতিহ্যে এসব উপাদান লোকসমাজের বাসিন্দাদের শ্রুতিযোগে পরিবেশিত এবং স্মৃতিলোকে সংরক্ষিত হয়, তাই উত্তর প্রজন্মের বান্দিাদের দ্বারা পরিবেশনের ক্ষেত্রে এতে লোকজ উপাদান রচয়িতার ব্যক্তিত্ব, অন্তর্গত গুণাবলি প্রভৃতির পাশাপাশি সমকালের পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনার প্রভাবগত পরিবর্তনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এভাবে লোকজ উপাদানসমূহে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া পরিবর্তনশীল বিশ্বে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও শিক্ষাবিস্তারের সমন্বিত অভিঘাতে লোকসংস্কৃতির

পরিমণ্ডলেও বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বংশগত পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ ও গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা, শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থাকা, নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি কারণেও লোকসমাজের বাসিন্দাদের অবলম্বিত লোকসংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকজ উপাদানের উপযোগিতাসংশ্লিষ্ট। যেসব উপাদান লোকসমাজের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন বা ভাবনায় অপ্রয়োজনীয়, অব্যবহৃত এবং বাহুল্য বিবেচিত সেগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। তেমনিভাবে প্রয়োজনের তাগিদে এবং নতুনের প্রতি আগ্রহবশত লোকসমাজের বাসিন্দাদের ভাবনায় নতুন উপাদানের রূপায়ণও সাধিত হয়। এভাবেই লোকজ উপাদানের পরিবর্তনের ধারা বিলুপ্তি ও নতুন সৃষ্টির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে টিকে থাকে।

২. লোকজ উপাদানসমূহ ঐতিহ্যের[৫১] ধারক ও বাহক। লোকসমাজ গড়নের দিক থেকে সংহত সমাজ যেখানে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য বরাবর গুরুত্ব পায়। টিকে থাকার তাগিদ লোকসমাজকে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তুলেছে। পাশাপাশি প্রাত্যহিক প্রয়োজনে প্রাকৃতিক বস্তুসামগ্রীকে সাংস্কৃতিক রূপান্তরের মাধ্যমে কর্মোপযোগী করার রীতি আয়ত্ত করতেও লোকসমাজের বাসিন্দারা ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ ঐতিহ্যপ্রীতি একদিকে তাদের জন্য কার্যোদ্ধারের কৌশল, অন্যদিকে এটিই তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে। বিভিন্ন লোকজ উপাদানে সন্নিহিত থাকে পূর্বপুরুষের স্মৃতিময় অনুষঙ্গ, ধারণা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, যা পরবর্তী প্রজন্ম অনুসরণ করে নিজের সৃজনশীলতা, কল্পনা ও কর্মকুশলতার সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন উপাদান গড়ে তোলার প্রচেষ্টায়। লোকসমাজে বংশপরম্পরায় বাহিত ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ধারণা ও মূল্যবোধ, গোষ্ঠীজীবনের সংহতি ও স্বাজাত্যবোধ। পূর্বপুরুষের জীবনধারায় অর্জিত অভিজ্ঞতার নির্যাস, পারিপার্শ্বিক জগৎ-জীবন থেকে আহরিত শিক্ষা, কর্ম সম্পাদনের আনুষঙ্গিক কৌশল এবং তাদের অনুসৃত বিশ্বাস-সংস্কার-মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় উপলব্ধি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে লোকজ উপাদানের বিভিন্ন মাধ্যমে; যা দেখে, শুনে ও আয়ত্ত করে উত্তরপ্রজন্ম লোকসংস্কৃতির চর্চাকে তাদের মানসিকতা ও ভাবনা অনুযায়ী অব্যাহত রাখে।[৫২] লোকসমাজের বাসিন্দারা স্বভাবতই ঐতিহ্য-অনুসন্ধানে সচেষ্ট, যা প্রকৃতপক্ষে স্বীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতি তাদের অকৃত্রিম অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ।

৩. বিভিন্ন লোকজ উপাদানের সমাহার ঘটালে কোনো লোকসমাজের চালচিত্র, সমষ্টিমানুষের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ব্যক্তির একান্ত উপলব্ধিও প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিমানুষের উচ্চারণ, আবেগ ও চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে। এর কারণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা লোকসমাজে অনুপস্থিত। ব্যক্তি সেখানে বরাবর সমষ্টির অংশ বিধায় সামাজিক পরিচয়ে পরিচিত। শ্বাপদসংকুল অরণ্যচারী আদিম কৌমবাসী মানুষের যূথবদ্ধভাবে বসবাসের অভিজ্ঞতা তাদেরকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাসে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই কোনো লোকজ উপাদানের স্রষ্টা ব্যক্তি হলেও সেগুলো তার নিজস্ব অর্জন বলে বিবেচিত হয় না। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত এর উপযোগিতা অনুধাবন করে সমাজ কর্তৃক গৃহীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা অস্বীকৃতই থেকে যায়। অর্থাৎ ব্যক্তির সৃষ্টি যখন সমাজে অনুমোদিত হয় তখন তা হয়ে ওঠে সমগ্র সমাজেরই সৃষ্টি। এরপর সেই সৃষ্টি ধীরে ধীরে নতুন ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করে। তবে কোনো কোনো লোকজ উপাদান একাধিক ব্যক্তির সাহায্যে প্রাথমিক পর্যায়েই সৃষ্টি হয়। দলীয় সৃষ্টিশীলতার দৃষ্টান্তও লোকসমাজে রয়েছে। এসব উপাদানও সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর কালে কালে প্রজন্মান্তরের অনুশীলনের পরিণতিতে কোনো লোকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সম্পদে উন্নীত হয়।[৫৩]

৪. লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো লোকসমাজের বাসিন্দাদের সৃষ্টিশীল রূপান্তরের সামর্থ্য ও সম্ভাবনার সাক্ষর। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বস্তুরাশিকে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের তাগিদ থেকে তারা যে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দেয় তাতেই তাদের ঐতিহ্যপ্রীতি, গোষ্ঠীজীবনের স্বরূপ ও লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিশিষ্টতা পরিস্ফুট। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন প্রাকৃতিক বস্তুরাশিকে নিজের প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগাবার কৌশল আবিষ্কার করেছে, পাশাপাশি কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সৃষ্টিশীল বিভিন্ন মাধ্যমে

রূপায়ণে স্বীয় সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে তার সাংস্কৃতিক জীবন। মানুষ প্রকৃতির সন্তান হলেও তাকে অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে মানুষের সংগ্রামশীলতার বিভিন্ন পর্যায় রূপায়িত। জীবনধারণের তাগিদে মৌলিক চাহিদা পূরণের বাধ্যবাধকতায় মানুষ এভাবেই উদ্ভাবনী শক্তি ও কৌশলকে হাতিয়ার করে নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। জীবিকা নির্বাহের তাড়না, নিজের-পরিবারের সুষ্ঠু দিনযাপনের তাগিদ, গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনও তার সাংস্কৃতিক রূপান্তরের চালিকাশক্তি হিসেবে নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছে। লোকসংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানগুলোর উপযোগিতা মূলত তার ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনসঞ্জাত। অন্যদিকে অরণ্যচারী জীবনে অভ্যস্ত মানুষ ধীরে ধীরে মনের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে যখন ভাষা আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে, তখন থেকেই তার সাংস্কৃতিক পরিচয় বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গি ও অনুসরণ, দেখে দেখে কোনো বিষয় আয়ত্ত করা এসব কর্মকাণ্ডও লোকসমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে অবস্থানরত মানুষের প্রাকৃতিক উপাদানকে নিজের প্রয়োজনে উদ্ভাবন ও কৌশলগত প্রয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যাতে লোকগোষ্ঠীর অনুসৃত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির প্রতিফলন উপস্থিত।[৫৪] লোকজ উপাদানগুলো কোন প্রক্রিয়ায় লোকসমাজে সৃষ্টি হয় এবং উপযোগিতাবশত কালের প্রবহমানতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বংশপরম্পরায় কীভাবে রক্ষিত থাকে, সে প্রসঙ্গটিও লোকজ উপাদানের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে বিবেচনা করা জরুরি।[৫৫]

৫. বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে লোকবিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করেন, লোকসংস্কৃতি মানেই শুধু লোকসাহিত্য নয়, যা বিশেষভাবেই মৌখিকভাবে সৃষ্ট।[৫৬] এ ধরনের ধারণা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলোকে মৌখিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হত। এর কারণ, লোকসাহিত্যের উপাদানগুলো পুরুষানুক্রমে গড়ে ওঠে এবং লোকসমাজে শ্রুত হয়, আবার প্রজন্মান্তরে পরিবেশিতও হয় স্মৃতির আশ্রয়ে। অবশ্য লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকপ্রথা, ধর্মীয় ভাবনা ও সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি মুখে মুখেই লোকসমাজে প্রচলিত এবং আচরণে, বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে অনুসৃত। ফলে লোকজ উপাদানমাত্রই মৌখিকভাবে রচিত এবং শ্রুতি-স্মৃতিনির্ভর, এরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জানা যায় যে অনুকরণের মাধ্যমে, অঙ্গভঙ্গিযোগে, এমনকি দেখে দেখেও লোকসমাজের বাসিন্দারা বিভিন্ন লোকউপাদানকে আয়ত্ত করতে সমর্থ এবং এভাবেও লোকসংস্কৃতির পরিধি সম্প্রসারিত হয়।

৬. লোকজ উপাদানের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো সৃষ্টির নেপথ্যে লোকসমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভাবনা বা ধারণা সক্রিয় থাকে।[৫৭] কেননা, সমাজ কখনোই স্থিতিশীল নয়। বরং পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া, অর্থনৈতিক কাঠামো, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রমের বন্টন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভাবধারার প্রভাবে সমাজের অভ্যন্তরভাগে রূপান্তরের ধারা অবিরাম অব্যাহত থাকে; যার প্রভাব সেই সমাজভুক্ত বাসিন্দাদের জীবনব্যবস্থা ও চিন্তাধারা, সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। আদিম অরণ্যচারী কৌমসমাজ, কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজ ও শিল্প-প্রকৌশলনির্ভর নাগরিক সমাজের অন্তর্গত একাধিক লোকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতিতুলনা করলে বিভিন্ন লোকজ উপাদানের রূপ ও বৈষয়িক সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা সম্ভব। লোকসমাজের বাসিন্দাদের অনুসৃত মূল্যবোধও রীতি-নীতি, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, গোষ্ঠীর নিজস্ব অনুশাসন, চিন্তার বিবর্তন, ভাষা, জীবিকাপদ্ধতি, সঙ্ঘবদ্ধতা, নর-নারী সম্পর্ক ও সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয়-দার্শনিক পরিমণ্ডল, জ্ঞাতিসম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বন্টন প্রভৃতি প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে লোকজ উপাদানের গড়নও বিস্তারে প্রভাব ফেলে।

৭. স্বভাবগত দিক থেকে লোকজ উপাদানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোতে লোকসমাজের রক্ষণশীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কারণ, প্রায়শই আদিম অরণ্যচারী মানুষকে দলবদ্ধভাবে বেঁচে থাকার লড়াই

চালাতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈরী প্রকৃতি ও অরণ্যের জীবজন্তুর পাশাপাশি অন্যান্য দল-গোষ্ঠীর সঙ্গেও তাদের বিবাদ ঘটত শিকার, বাসস্থান তথা জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাতে। ধীরে ধীরে কৃষিজীবী সমাজে প্রবেশের পরও গ্রামীণ মানুষের মধ্যে কৌমচারী যূথবদ্ধতার ছাপ রয়ে গেছে। আক্রমণকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের লড়াই শুধুই বৈষয়িক ছিল না; বরং ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে দলের সকলকেই গোষ্ঠীপতি প্রবর্তিত নীতি, নিয়ম, অনুশাসন মেনে চলতে হত। দলের সদস্যদের আনুগত্য মেনে চলা ও কর্ম সম্পাদনের বিনিময়ে সম্মান অর্জন ও পুরস্কার লাভের বিপরীতে আদেশ অমান্য করার পরিণতিতে শাস্তিভোগের বন্দোবস্তও ছিল। গোষ্ঠীর সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এভাবেই বিধি-বিধানের কঠোরতা গোষ্ঠীর বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক আচরণ, চালচলন, সামাজিক জীবনপ্রণালী ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে প্রভাব ফেলত। লোকসাহিত্য, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের রক্ষণশীল মানসিকতার ছাপ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে বিধৃত। গ্রামীণ মানুষ ঐতিহ্যগতভাবেই পূর্বপুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাস-মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন বিষয় ও ভাবনার তাৎপর্য অনুধাবনে সমর্থ না হওয়ায় তাদের মানসিকতা অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ ও রক্ষণশীল। কিন্তু এতেই লোকসমাজের বাসিন্দাদের অন্তর্গত সামগ্রিক প্রবণতার পরিচয় মেলে না। কারণ, লোকজ উপাদানসমূহে বিধৃত অসাম্প্রদায়িকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে অনুধাবণ করা চলে যে বিভিন্ন কারণে একাধিক গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সেই সূত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিনিময়ও প্রচলিত ছিল।[৫৮] ফলে রক্ষণশীলতার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতা তাদের মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে।

৯. লোকজ উপাদানগুলোতে আদিম অরণ্যময় মানুষের যূথবদ্ধতা ও গ্রামীণ জীবনের আমেজ জড়িয়ে আছে। প্রাচীনকালের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের সংস্পর্শ থাকায় একধরনের আপাত সারল্য, নিরাভরণ রূপ ও পারিপাট্যের অভাব এগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের একক বা সমবেত সৃষ্টি হলেও যথেষ্ট যত্ন ও প্রসাধনের ছাপ এগুলোতে অনেক সময় পাওয়া যায় না। তবে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ এবং সৃষ্টিশীল, পাশাপাশি লোকসমাজের বিবিধ অনুষঙ্গকে বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিতে ধারণ করে বিধায় এসব উপাদানের মৌলিক গুণাবলি স্বীকৃত। কখনো কখনো গ্রাম্যতা ও স্থূল রুচিবোধ, বিষয়গত পুনরাবৃত্তি এসব উপাদানে পাওয়া যায়। তবু কোনো জাতির সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে এসব উপাদানের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

১০. লোকসমাজের সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত অবস্তুগত লোকজ উপাদানগুলো শৈল্পিক আবেদন ও নান্দনিক পরিচয়ে যে অসামান্যতার দাবিদার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একথা স্বীকার্য, বস্তুগত লোকজ উপাদানগুলো প্রাত্যহিক জীবনের কর্মসহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহারিক মূল্যকে ধারণ করে। কিন্তু অবস্তুগত উপাদানগুলোর উপযোগিতা নিছক লোকগোষ্ঠীর বাসিন্দাদের বিশেষ চাহিদা পূরণ, কর্মসম্পাদনের কৌশল বা সহায়ক মাধ্যম হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এসব উপাদানে প্রতিফলিত হয় লোকসমাজের স্বাজাত্যবোধ, এর উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস, সংঘাত-সমন্বয়ের রূপরেখা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যবোধ। বিশ্বের যে কোনো দেশের অন্তর্গত লোকসমাজের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের আনুষঙ্গিক পাঠগ্রহণের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এসব উপাদানের গুরুত্ব ইতোমধ্যে স্বীকৃত।

১.৪ লোকজ উপাদানের শ্রেণিকরণ

লোকসংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক চর্চায় বিভিন্ন লোকজ উপাদানের শ্রেণিকরণ প্রাসঙ্গিকই শুধু নয়, আবশ্যিকও বটে। এক্ষেত্রে লোকজীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনার প্রয়োজনে লোকজ উপাদানসমূহের তথ্য-প্রমাণভিত্তিক শ্রেণিকরণের বিকল্প নেই। লোকসংস্কৃতি বিচিত্র উপাদানে বরাবর সমৃদ্ধ। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এতে যেমন নতুন উপাদানসমূহ সংযুক্ত হয়, তেমনিভাবে লোকসমাজে উপযোগিতাহীন উপাদানসমূহের বিলুপ্তিও ঘটে। এর ফলে একদিকে যেমন লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গতিময়তা বজায় থাকে, তেমনিভাবে কালিক বিবর্তনের রূপরেখাও এতে বিধৃত হয়।[৫৯] পাশ্চাত্যের লোকবিজ্ঞানীরা লোকজ উপাদানসমূহকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা–– বস্তুগত উপাদান (Material Folklore) এবং অবস্তুগত বা ভাবগত উপাদান (Formalised Folklore)।[৬০]

বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানী নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী লোকজ উপাদানসমূহের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানসমূহকে পাঁচটি ধারায় বিন্যস্ত করেছেন––

ক. দৈহিক ক্রিয়াধর্মী– ক্রীড়া, অভিনয়, ইঙ্গিত, নৃত্য-অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

খ. শিল্পধর্মী– কারুকর্ম-চারুশিল্প, গৃহস্থাপত্য, আসবাবপত্র, পোশাক-যানবাহন, ব্যবহারিক উপকরণ, রান্নাবান্না ইত্যাদি।

গ. বাক্‌ধর্মী– ভাষা, লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, গীত, গাথা ইত্যাদি।

ঘ. প্রয়োগধর্মী– মন্ত্রগুপ্তি, ঝাড়ফুঁক, চিকিৎসা, ঔষধপত্র, তাবিজ, কবচ ইত্যাদি।

ঙ. বিশ্বাস-অনুষ্ঠানধর্মী– জাদু-ক্রিয়াচার, ধর্ম-লোকাচার, পালা-পার্বণ, সংস্কার, পূজানুষ্ঠান, উৎসব, মেলা ইত্যাদি।[৬১]

মযহারুল ইসলাম যেভাবে বিভিন্ন লোকজ উপাদানের শ্রেণিকরণ করেছেন––

১. লোকসাহিত্য– লোককাহিনী, যার অংশ পৌরাণিক লোককাহিনী বা পুরাকাহিনী, কিংবদন্তি, পরীকাহিনী, নীতিবাচক কাহিনী, পশুকাহিনী, পাখিকাহিনী, বোকাদের কাহিনী, কৌতুক বা ব্যঙ্গময় কাহিনী, প্রেতাত্মা বা ভৌতিক কাহিনী, ডাইনি কাহিনী, সত্য-ঘটনাশ্রয়ী ক্ষুদ্র কাহিনী, লোক-ছোট-গল্প, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকসঙ্গীত, লোকগীতিকা, ঘুমপড়ানী গান, ছড়া, লোকব্যুৎপত্তি বা লোকনিরুক্তি, লোকনাটক, লোকাশীর্বাদ, লোকাভিশাপ, লোকোপমা, লোকখেতাব বা উপাধি, মন্ত্র, লোকশিক্ষা, শিকলি চিঠি, লোকনাম, লোকযন্ত্র-সঙ্গীত, লোকশপথ, লোকঠাট্টা ইত্যাদি।

২. লোকাচার, বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান ইত্যাদি কেন্দ্রিক ফোকলোর–

ক. দৈনন্দিন আচারানুষ্ঠান (কিছু কিছু বিশেষ সময়ের) : লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকানুষ্ঠান, সংস্কার, শাস্ত্রীয় রীতিনীতি, লোকোৎসব, ঐতিহ্যিক ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি।

খ. (বিশেষ সময়ের) : লোকখেলা, পশুপাখির যুদ্ধ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

গ. লোক-শিল্প বা শিল্পগত ফোকলোর:

১. উপস্থাপনীয়– লেকনৃত্য, লোকনাটক, ছড়া আবৃত্তিসহ দড়িলাফ, ক্যারিকেচার বা হাস্যোদ্রেকের উদ্দেশ্যে অতিরঞ্জিত অনুকরণ, লোক অঙ্গভঙ্গি, ইশারা বা শারীরিক সংকেত।

২. অনুপস্থানীয়– লোকচিত্র-শিল্প বা অঙ্কন শিল্প, লোকভাস্কর্য, লোকস্থাপত্য, কুটির শিল্প, কাঁথা, লোকপুতুল, লোকপ্রতিমা, আলপনা, পিঠা-আলপনার নকশা, উল্কি, লোক-অলঙ্কার, লোক-পোশাক, ঐতিহ্যিক স্বস্তিকা, ধনুকে অঙ্কিত শিল্প, লোক প্রতীক প্রভৃতি।

ঘ. লোকবিজ্ঞান ও কারিগরি–

১. লোকবিজ্ঞান : লোকচিকিৎসা, লোক-ঔষধ, লোক-অংক, বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনরীতি, কাপড়ে রঙ দেবার প্রক্রিয়া, রঙ তৈরির প্রক্রিয়া, জমিতে সার দেবার লোকপদ্ধতি, বৃক্ষ ও ফসল রক্ষার লোকপদ্ধতি ইত্যাদি।

২. লোক-কারিগরিঃ গৃহনির্মাণের পদ্ধতি বা স্থাপত্যবিদ্যা, হস্তদ্বারা নিত্য ব্যবহার্য লোক সাধনী বা ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, শিকার ধরার সামগ্রী, লোকযানবাহন, লোকঅস্ত্র, লোকগৃহসামগ্রী, লোকরন্ধনশিল্প, লোকবয়নশিল্প ইত্যাদি।[৬২]

পবিত্র সরকারকৃত লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহের শ্রেণিবিভাজন––

১. জীবনধারণের বস্তুগত উপাদান– আবাস ও গৃহোপকরণ, গৃহবিন্যাস, খাদ্য প্রস্তুতের যাবতীয় কর্মপ্রক্রিয়া, পরিবেশনগত পদ্ধতি, পোশাক, চিকিৎসা ও ঔষধপত্র, যানবাহন প্রভৃতি
২. যৌথ সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও আদানপ্রদান– বিবাহ, সই পাতানো, বন্ধুত্ব পাতানো, অন্নপ্রাশন-জাতকের জন্ম ও শুভসূচক যত উৎসব, মেলা চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, মজলিস, গ্রামীণ প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি।
৩. শিল্প ও বিনোদন–ভাষাশ্রিত (ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, পাঁচালি, রূপকথা, লোককথা, কথকতা, কিংবদন্তি, খনার বচন প্রভৃতি) রূপাশ্রিত (বিভিন্ন চারুশিল্প যেমন বাড়ির দেয়ালে ও মেঝেতে বিচিত্র আলপনা ও অলংকরণ, মাটি ও কাঠের পুতুল, নৌকায় বিভিন্ন রঙের নকশা, পটচিত্র, লক্ষ্মীর সরা, শোলার কাজ প্রভৃতি। কারুশিল্পের মধ্যে হাঁড়ি কলসি, কুড়াল কোদাল, নৌকা, ঘর-বাড়ি, জানালা-দরজা, মাদুর-চাটাই-শীতলপাটি, বাঁশ ও কাঠের ঝুড়ি, বাক্স, শাঁখা-চুড়ি-অলংকার, রান্না ও খাবার পরিবেশনের উপকরণ ও বাসনপত্র, শাড়ি, চাদর, পাগড়ি প্রভৃতি।) ক্রিয়ামূলক (বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়া, লোকনাটক, পরিবেশনমূলক শিল্প যেমন পটের গান, নাটগীতি, রামায়ণ ও মঙ্গলগান পরিবেশন প্রভৃতি।

৪. বিশ্বাস ও তৎপ্রসূত নানা ক্রিয়াপ্রক্রিয়া– বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, আঞ্চলিক বা জনশ্রেণীগত ব্রত, লোকাচার, প্রাকৃতিক জাদুজনিত নানা অনুষ্ঠান– যেমন বৃষ্টি নামানোর উপচার, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র, বাণমারা, ঘটিচালা, সংস্কার প্রভৃতি।[৬৩]

ওয়াকিল আহমদ লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানরাশিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা––

ক. মানসগত বা বাগাশ্রিত লোকসংস্কৃতি– লোকসাহিত্য

খ. পরিবেশনামূলক লোকসংস্কৃতি– লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকক্রীড়া

গ. বস্তুগত লোকসংস্কৃতি– কারু ও চারু লোকশিল্প, লোকযান, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যদ্রব্য, লোকজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ঘ. বিবিধ বা মিশ্র বিষয়ক লোকসংস্কৃতি– লৌকিক দেবদেবী ও পীর-পীরানি, লোকাচার ও লোক-প্রথা, লোকমেলা ও উৎসব, লোক-চিকিৎসা।[৬৪]

মুহম্মদ আবদুল খালেক লোকজ উপাদানসমূহকে যেভাবে শ্রেণিবিভক্ত করেছেন--

১. বাককেন্দ্রিক ফোকলোর– লোকসাহিত্যের যাবতীয় উপকরণসমূহ। যেমন– লোককথা, লোকগীতিকা, ছড়া, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ প্রবচন, হেঁয়ালী, লোকবিশ্বাস, লোক-সংস্কার, লোক শব্দালংকার, লোকগাথা প্রভৃতি।
২. অঙ্গভঙ্গী কেন্দ্রিক ফোকলোর– লোকনৃত্য, লোকভঙ্গী, লোক সার্কাস প্রভৃতি।
৩. আচারমূলক ফোকলোর– লোকাচার, লোকসংস্কার, লোক উৎসব, লোক মেলা, লোক চিকিৎসা, লোক পার্বণ, লোক পূজা প্রভৃতি।
৪. খেলাধূলাকেন্দ্রিক ফোকলোর– বিভিন্ন লোকক্রীড়া যেমন– হা-ডু-ডু, নোস্তা, ছিবুড়ী, ডাংগুলি, কানামাছি, নৌকা বাইচ, ষাড়ের লড়াই, লাঠির খেলা প্রভৃতি।
৫. বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর– বিভিন্ন গৃহস্থালী সামগ্রী, কুটিরশিল্প প্রভৃতি।
৬. লিখনকেন্দ্রিক ফোকলোর– রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী, K_vmwirmvMi, cÂZš, †eZvjcÂweskwZ, ïK mšÍwZ, RvZK প্রভৃতি মৌখিক রূপ, যা পরবর্তীকালে লিখিতভাবে প্রচারিত হয়েছে।[৬৫]

দুলাল চৌধুরী যেভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহকে শ্রেণিবিভক্ত করেছেন--

ক. সাহিত্য ও ভাষা

খ. লোকশিল্পকলা : কারু ও চারুশিল্প

গ. লোকধর্ম ও লোকাচার, লোকসংস্কার ইত্যাদি

ঘ. লোকবিজ্ঞান : চিকিৎসাবিধি ও লোকশিল্প উৎপাদন পদ্ধতি[৬৬]

১.৫ লোকজ উপাদানের উপযোগিতা

লোকসংস্কৃতি লৌকিক মানুষের জীবনাভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের যথাযথ ক্ষেত্র। কেননা এতে প্রতিফলিত হয় তাদের গোষ্ঠীজীবনের চালচিত্র, জীবিকা নির্বাহের প্রক্রিয়া, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি, লোকায়ত ধর্মভাবনা ও দর্শন, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অজস্র অনুষঙ্গ। যুগের প্রবাহে লোকসমাজের ভাঙা-গড়া ও বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হবার অন্তরালে সক্রিয় অতীতের অবস্থাও প্রতিবিম্বিত হয় লোকসংস্কৃতির বৃহৎ পটভূমিতে। লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিবিধ লোকজ উপাদানসমূহের উপযোগিতা নিচে বিবৃত হলো--

১. জন্মলগ্ন থেকেই লোকসংস্কৃতিচর্চা অতীতচর্চার অঙ্গ। লোকসংস্কৃতি কোনো জাতির ঐতিহ্যমূলক অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে এবং তা অতীতের অনুবর্তন হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলে লোকসংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে কোনো জাতির ঐতিহাসিক পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। লোকসংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ পাঠ গ্রহণ করলে কোনো বিশেষ দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাস-সংস্কার, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মূল্যবান তথ্য প্রভৃতি বহুবিধ অজ্ঞাত অতীতের তথ্য

জানা যায়। ইতিহাস-পর্যালোচনায় লোকসংস্কৃতি পুরাতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে হারানো অতীতের প্রাগৈতিহাসিক উপকরণ লাভ করা সম্ভব। এসব উপকরণের মাধ্যমে যেমন সমাজ ও জীবনের প্রাগৈতিহাসিক পরিচয় উদ্ধার করা যায়, তেমনিভাবে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির মধ্য থেকে প্রাপ্ত আপাত ভগ্ন বা বিচ্ছিন্ন উপকরণসমূহের সাহায্যে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা করা চলে। লোকসমাজে প্রচলিত বৃক্ষ পূজা, পাথর পূজা, পশু পূজা, বিবিধ বিধিনিষেধ ও সংস্কারের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।[৬৭]

২. লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নৃতত্ত্বের রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক পুরাতত্ত্বের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে জাতি-উপজাতিসমূহের মানসিক গঠন ও আচার-আচরণ এবং জাগতিক দৃষ্টি, বাসনা-কামনা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। জনজাতির জীবনধারার বিশ্লেষণে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের প্রয়োজনে নৃতাত্ত্বিকগণ ব্যাপকভাবে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের সহায়তা গ্রহণ করেন। মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাস-সংস্কারের নানারূপ নিদর্শন এবং জনজাতির জীবনযাত্রার বহুবিধ বাস্তব পরিচয় লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় উপস্থিত থাকে। লোকঐতিহ্য প্রবহমান মানবজীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে লালিত আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস, বংশ পরিচয়, আত্মীয়তা, বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কারের তাৎপর্য বিশেষভাবে মানবগোষ্ঠীর নৃ-জাতিতত্ত্বগত পরিচয়কে বহন করে। আধুনিককালে এই তথ্য ও তত্ত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল। বিষয়বস্তুগত উপকরণ এবং অনুশীলনগত পদ্ধতি–– উভয়দিক থেকেই লোকসংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বের সংযোগ লক্ষণীয়।[৬৮]

৩. লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় নানাবিধ ভাষাতাত্ত্বিক উপকরণ পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতির বিপুল অংশ মৌখিক ভাষার মাধ্যমে বিবর্তিত হয়। এর সঙ্গে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের মধ্যে বিশেষত লোকসমাজে ব্যবহৃত নানাবিধ কাহিনী, কিংবদন্তি, লোকসঙ্গীত, ধাঁধা, ছড়া, মন্ত্র, ছড়া ও স্থান-নামের মধ্যে ভাষাতত্ত্বগত নানারূপ উপাদান লক্ষ্য করা যায়। তুষার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন–– 'বিশিষ্ট অঞ্চলের ভাষা, বিশিষ্ট নৃ-জনজাতির ভাষা, বিশিষ্ট পেশাগত বা বৃত্তিগত জনগোষ্ঠীর ভাষা প্রভৃতির মধ্যে লোকভাষাতত্ত্বের রূপ ও উপাদান লক্ষণীয়। ভাষা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে লোকভাষাকে গ্রামীণ ও লোকজ রূপ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। লোকভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় বিশেষজ্ঞগণ তিনটি ধারার উল্লেখ করেন– মান্য ভাষা, সাধারণ ভাষা ও লোকভাষা। উপরে উল্লেখিত ত্রিধারার সূত্রে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের আলোকে লোকভাষার বিশেষ অবস্থান সুচিহ্নিত হয়। ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনায় এবং শব্দ-তত্ত্বগত উৎস অনুসন্ধানে লোকভাষা মূল্যবান অবলম্বন হিসেবে ভূমিকা পালন করে।'[৬৯]

৪. লোকসংস্কৃতিভুক্ত উপাদানসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিবিধ উপযোগিতার মধ্যে প্রমোদ বা বিনোদনগত মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। পবিত্র সরকারের মতে 'বিনোদনেরও যে একটা 'প্রয়োজনের দিক' ... (আছে) ... লোকজীবনের বিনোদনের মধ্যে তা আরও খানিকটা স্পষ্ট। আদিম মানুষ যে পশুশিকারের নৃত্য তৈরি করেছিল, তৈরি হয়েছিল পশুশিকারের আদিম নাটক বা ছবি ... তা নিছক বিনোদন-মূলক ও নান্দনিক ছিল না। তা ছিল একই সঙ্গে শিক্ষামূলক, অর্থাৎ প্রয়োজনসাধক। এখনও গ্রামীণ লোকসমাজের গান, গল্পগাথা ইত্যাদি হয় তাকে কোনো শিক্ষা দেয়, না-হয় তার অবসরকে উজ্জীবিত করে, না হয় তার কাজের ও পরিশ্রমের মধ্যেই একটা মানসিক অবসর ও আনন্দময় বিরাম তৈরি করে।'[৭০] লোকসমাজের ধর্ম-উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম সবকিছুর সঙ্গেই কম-বেশি জড়িত থাকে নৃত্য-গীত-কথা-ধাঁধা শিল্প-অভিনয় ইত্যাদি নানাপ্রকার সৃজনশীল মৌলিক কার্যকলাপ। এসকল উপাদান শুধু লোকসমাজের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের অন্য ক্ষেত্রেও তা

লোকমনোরঞ্জনকারী উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। এই সূত্রে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম ও উচ্চসংস্কৃতির নানাবিধ মঞ্চে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োগ ঘটে, যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৭১]

৫. লোকসংস্কৃতির শিক্ষাবিষয়ক উপকরণগত মূল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় নানাপ্রকার শিক্ষা উপকরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রন্থিত হয়। লোককথা, লোকগাথা, লোকসঙ্গীত, লোকাভিনয়, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে নীতিশিক্ষা, পৌরাণিক জ্ঞান, ঐতিহাসিক তথ্য ও সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। তাছাড়া লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে সামাজিক আচার-আচরণ, প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন, সমাজ-জীবনের উন্নয়নমূলক বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। আবহমানকাল ধরে লোকসংস্কৃতি অক্ষরজ্ঞানহীন লোকসমাজকে প্রথাগত নিয়ম ব্যতিরেকে স্বকীয় ধারায় শিক্ষিত করে এসেছে।[৭২]

৬. লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে নানাভাবে নন্দনতত্ত্বগত আবেদন প্রকাশিত হয়। লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারা লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য মৌখিক ধারায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হলেও, তার মধ্যে নানাভাবে কাব্য-সাহিত্যগত রসধারা বিকশিত হয়। প্রায়শই অক্ষরজ্ঞানহীন লোকসমাজে সৃষ্টি হলেও ছড়া, গীতিকার মধ্যে কাব্যগুণ, লোককথার মধ্যে কথাসাহিত্যেও বৈশিষ্ট্য ও শিল্পগুণ, লোকনাট্যের মধ্যে নাটকের রসময়তা আস্বাদন করা যায়। লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ লোকসঙ্গীত। এর সাঙ্গীতিক মূল্য অসামান্য। লোকনৃত্যের নৃত্যকলাগত মূল্য অতুলনীয়। লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনে শৈল্পিক ভাবমূর্তি উপস্থিত।[৭৩]

৭. লোকসংস্কৃতিচর্চার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই, বিশেষত বিবর্তনবাদের সূত্রে বিশেষজ্ঞগণ লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহের মধ্যে আদিম সমাজ ও লোকসমাজের বাসিন্দাদের নানাপ্রকার প্রবণতা বা মানসিক ক্রিয়াকলাপের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, বিশেষত পুরাণ ও রূপকথায় আদিম মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উদ্‌ঘাটন করেছেন। লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ লোকধর্ম ও উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যেও নানাপ্রকার মানসিক সংবেদনা, আবেগ ও প্রবৃত্তির উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। লোককথার টাইপ এবং মোটিফ সূচিতেও ব্যক্তি ও সমষ্টিমানুষের মনোলোকের বিভিন্ন প্রবণতা আবিষ্কার করা হয়। লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদির ভিত্তিও প্রধানত সমাজমনস্তত্ত্ব। বলা যায়, লোকসংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে মাসবসমাজের নানাপ্রকার মানসিক প্রবণতার আধার। তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহকে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্যবান উপকরণ হিসেবে গণ্য করেন।[৭৪]

৮. লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজবিজ্ঞানীরা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমাজতত্ত্বের বহুবিক্ষিপ্ত উপকরণ সংগ্রহ করেন। জন্মসূত্রে লোকসংস্কৃতি একান্তভাবে লোকসমাজনির্ভর। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে লোকসমাজের সমষ্টিমানসের বৈশিষ্ট্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কার্যকলাপ বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয়। লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকসাহিত্য, লোকধর্ম, লোক-উৎসব, লৌকিক প্রথা, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদিতে লোকসমাজের বিশিষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়। তাই আধুনিককালে লোকসংস্কৃতিকে সমাজবিজ্ঞান আলোচনার বিশিষ্ট উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায়।[৭৫]

৯. লোকজ উপাদানসমূহের উদ্ভবের অন্তরালে এর ব্যবহারিক মূল্যের তাগিদই সর্বাধিক উপস্থিত। প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ বা উপাদানের সাংস্কৃতিক রূপান্তরে লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টাই সক্রিয় থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তার মেধা, কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতার স্পর্শ, যাতে শৈল্পিক মাত্রাও ধীরে ধীরে পল্লবিত হতে থাকে। অর্থাৎ ব্যবহারিকমূল্য ও নন্দনভাবনার সম্মিলনেই প্রাকৃতিক বস্তুসামগ্রী হয়ে ওঠে লোকজ উপাদান। পবিত্র সরকার লোকজ উপাদানের ব্যবহারিক উপযোগিতাকে লোকসমাজের 'জীবনব্যবহারগত মূল্য' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন--

মূল্যের ধারণাটিই আমাদের মতে ব্যবহারিক, অর্থাৎ এই মূল্যগুলি কোনো-না-কোনোভাবে সংস্কৃতির কোনো-কোনো কাজে লাগে। ... কিন্তু জীবনব্যবহারগত মূল্য বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি সমাজের বহুবিধ পার্থিব ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে যা জরুরি বলে ব্যবহৃত হয় তার কথা। ধর্ম ও জাদু এবং শিক্ষার প্রণালি মূলত ... ভাবগত সৃষ্টি, সেসব আমাদের মনোজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু লোকসংস্কৃতি এমন অনেক বস্তু সৃষ্টি করে যার সঙ্গে আমাদের ভাবজগতের যোগ সামান্য, বরং ব্যবহারিক জগতের যোগ অনেক বেশি। ... সেদিক থেকে দেখি, মাটিতে বা পিঁড়ির উপর বিছিয়ে বসবার আসন, বিছানায় পাতবার চাদর বা পাটি, কাঁথা, মাদুর, দরজার চৌকাঠ, পরবার শাড়ি, শোবার খাট-পালঙ্ক, বাড়ির বেড়া বা সদরদরজা, পিতল-কাঁসার প্রদীপ, জাতি ও বাসনপত্র, নৌকার খোল ও গলুই, ঘরের চালা, বাচ্চাদের দোলনা, কুমোরের তৈরি খুরি হাঁড়ি গ্লাস কলসি, মৃতের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত পোড়ামাটির মঠ ও কবর–ইত্যাদি যা কিছু তৈরি হয় সবই তাদের ব্যবহারিকতার কারণে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অধিকাংশ সংস্কৃতিবস্তুই নির্মিত হয় তাদের ব্যবহারিক মূল্যের জন্য। সৃষ্টি নয়, মানুষের ব্যবহারই যে-কোনো বস্তুকে সংস্কৃতিবস্তু করে তোলে, সৃষ্টি তো পরের কথা। পথে পড়ে থাকা পাথর সংস্কৃতিবস্তু নয়, মানুষ যখন প্রথম পাখিশিকারের জন্য তা ব্যবহার করল তখনই তা হয়ে উঠল সংস্কৃতিবস্তু। ... কিন্তু এও আমরা লক্ষ করি যে, শুধু ব্যবহারিক মূল্যের জন্য সৃষ্টি করেই মানুষের মন তৃপ্ত হয় না। তার সঙ্গে লাগে অলংকরণ, একটু সৌন্দর্যের ছোঁয়া। সাধারণ কাঁথা হয়ে ওঠে নকশি কাঁথা, আসনে বোনা হয় বিচিত্র রঙিন ফুললতাপাতার নকশা, পিতলের প্রদীপ পায় পাখির আকৃতি, কাজললতা পায় নানা অলংকরণ। ওই অলংকরণ না হলেও বস্তুটির ব্যবহার্যতা অক্ষুণ্ন থাকত। ... আর এই ব্যবহার্যতার ওপর যখন অলংকরণ ছোঁওয়ানো হয় তখন ব্যবহার্যতা আর নন্দনতত্ত্বের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। ... ওই ব্যবহার্যতাই ওই সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রাথমিক ভিত্তি আশ্রয়। ব্যবহারবর্জিত সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টা ও চেতনা লোকসংস্কৃতিতে নেই বললেই চলে।'[৭৬]

১০. লোক বলতে যে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে বোঝায়, তাদের বিশেষ পরিচয় হলো, তারা অবশ্যই সমাজের কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণি। সেকারণেই গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সমাজের তলদেশে তারা প্রান্তবাসী হিসেবে অবস্থান করলেও সামাজিক উৎপাদন কাঠামো ও শ্রমের গতিশীলতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ বিষয়টির সঙ্গে সন্নিহিত রয়েছে লোকজ উপাদানের 'শ্রম-সহায়ক মূল্য'। পবিত্র সরকার এ অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, লোকসমাজের বিভিন্ন পেশাভুক্ত মানুষের কাজের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির নিবিড় সংযোগ ঘটে। পরিশ্রমসাপেক্ষ কোনো কাজ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন হাঁকডাক, বুলি, গান, ছড়া পরিবেশন করে। এতে প্রতিফলিত হয় তাদের অবলম্বিত সাংস্কৃতিক পরিচয়টি। একইসঙ্গে তা তাদের মানসিক প্রশান্তি, বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং করণীয় কাজটির ভার লাঘব হয়।[৭৭]

এ অধ্যায়ে 'লোকজ উপাদানের স্বরূপ' অন্বেষণের তাগিদে আমরা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে 'লোক' অভিধাভুক্ত মানুষদের চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি। 'লোক'-কে অনুসন্ধানের প্রয়োজনে তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাতও আমাদের গবেষণাভুক্ত। কেননা, কোনো লোকগোষ্ঠীর অবলম্বিত সংস্কৃতির স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে উক্ত পটভূমি বিবেচনায় রাখা জরুরি। লোকসমাজবদ্ধ বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার-অভ্যাস, রুচি-মূল্যবোধ, ধর্মীয় ভাবনা ও অনুশাসন, জীবিকাপ্রণালী, উৎসব-আয়োজন, জ্ঞাতিসম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির সামষ্টিক রূপরেখাকেই লোকসংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই 'লোক'-ভুক্ত মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তাদের সামাজিক পরিচয় ও অবস্থানের প্রতি আমাদের সতর্ক অভিনিবেশ অব্যাহত রাখতে হয়েছে। যেকোনো রাষ্ট্রে বিদ্যমান সংস্কৃতিতে তিনটি প্রধান ধারার সন্ধান মেলে। যথা -- জাতীয় সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতি। এসব ধারার একের সঙ্গে অন্যের সম্পৃক্ততা থাকলেও নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারসূত্রে 'লোক'-এর পরিচয় ঐতিহ্যগতভাবেই স্বতন্ত্র। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা তাদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। কালিক বিবর্তনের সঙ্গে লোকসমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সম্পর্ককে নেপথ্যে রেখে লোকজ উপাদানসমূহের উপযোগিতা অন্বেষণে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। ফলে এসব প্রসঙ্গের অবতারণাসূত্রে লোকগোষ্ঠীভুক্ত বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পরিচয় সংক্ষেপে উপস্থাপনের পাশাপাশি তাদের মানসিক গড়ন ও প্রবণতাসমূহকেও চিহ্নিত করতে হয়েছে। লোকজ উপাদানের

উপযোগিতা যাচাই করতে হলে লোকসমাজের বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক কর্মপ্রবাহের ধরন, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে প্রাত্যহিক জীবনে অবলম্বনের যৌক্তিকতা ও চিন্তা-সৃষ্টিশীলতার রূপরেখা অনুধাবন জরুরি। নতুবা সেসব উপাদানের সাংস্কৃতিক রূপান্তরগত তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় না।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, †jvKms¯«wZwe'¨v, অঞ্জলী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৩-১৪

২. জীবেশ নায়ক, †jvKms¯«wZwe'¨v I †jvKmvwnZ¨, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৬৬-৬৭

৩. †jvKms¯«wZwe'¨v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪

৪. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য (সংকলিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৬২৮

৫. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (সংকলিত), ভূর্জপত্র, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৪৭

৬. কাজী আবদুল ওদুদ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ (সংকলিত), প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃ. ৯৩২

৭. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একডেমি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৬১

৮. তুষার চট্টোপাধ্যায়, †jvKms¯«wZi ZËi/c I ¯i/c mÜvb, এ মুখার্জী অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৫

৯. 'ফোকলোর (Folklore) শব্দের জন্মতত্ত্ব এবং উইলিয়াম থম্পস', †dvK‡jvi : †jvKms¯«wZi K_KZv, আনোয়ারুল করীম (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১০৮

১০. †dvK‡jvi : †jvKms¯«wZi K_KZv, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১১. আশরাফ সিদ্দিকী, †jvK-mvwnZ¨ (c_g LÐ), গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৩

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

১৩. Funk and Wagnalls Company, America, 1949

১৪. *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, Maria leach (edited), Funk and Wagnalls Company, America, 1949, volume 1, page. 398

১৫. Ibid, page. 398

১৬. Ibid, page. 399

১৭. Ibid, page. 399

১৮. Ibid, page. 399

১৯. Ibid, page. 400

২০. Ibid, page. 400

২১. Ibid, page. 400

২২. Ibid, page. 401

২৩. Ibid, page. 401

২৪. Ibid, page. 401

২৫. Ibid, page. 401

২৬. Ibid, page. 401

২৭. Ibid, page. 401

২৮. Ibid, page. 402

২৯. Ibid, page. 403

৩০. Ibid, page. 403

৩১. শেখ মকবুল ইসলাম এসব সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, মারিয়া লিচের সম্পাদিত এ অভিধানে প্রদত্ত ২১টি সংজ্ঞার ভিত্তিতে, সামগ্রিকভাবে, ফোকলোরের যে বিষয়গুলি প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলি হলো মৌখিক ঐতিহ্য, পরিবেশনাগত ঐতিহ্য, শিল্প ও কারুশিল্প, বস্তুগত সংস্কৃতি, মনস্তাত্ত্বিক ধারা, প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, উৎসব ও অনুষ্ঠান, লোকখাদ্য, লোকজীবন, সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। তিনি জানিয়েছেন––

> মারিয়া লিচের যে ২১টি সংজ্ঞা রয়েছে, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, সংজ্ঞাদাতারা বিভিন্ন দৃষ্টিতে ফোকলোরকে দেখেছেন। ... ফোকলোর অভিধাটির বিষয় পরিসর যেভাবে সুচিহ্নিত হয়েছে, সেই অর্থে ফোক খুব সুচিহ্নিত হয় নি। এই কারণে এক এক দেশ, তাদের মত করে, এক এক রকম ভাবে ফোককে চিহ্নিত করে, ফোকলোর চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে। ... এরই কারণে, পৃথিবীর সব দেশের ফোক, বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করলেও ফোক-এর সমাজগত চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক রূপায়ণের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ধরা পড়ে। ফোক এর আঞ্চলিক চরিত্র, জাতীয় চরিত্র এবং বৈশ্বিক চরিত্র–এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ অনুন্নত অঞ্চলের Rural Life-এর বাস্তবতার সাপেক্ষে, উন্নত শহরের Urban Folk এর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। তবুও, সর্বত্রই ফোক আছে। (†jvKms¯'ZeÁvb : ZË, c×wZ I c‡qvM , বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮২-৮৫)

'লোক' বা 'ফোক' সম্পর্কিত পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন––

> ১৮৪৬ সালে ফোকলোর শব্দটি আবিস্কৃত হওয়ার পর্ব থেকে এই ২০১০ সাল পর্যন্ত নানা শাখার নানা গবেষক, ফোককে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। এদের মধ্যে উইলিয়ম জন থমসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তাঁর মতে Folk-এর ইন্টারপ্রিটেশন হল-People। ... এই People ঠিক কারা তাদের সমাজতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাজন কেমন, সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত তার লেখায় ছিল না। অথবা শব্দটির দ্বারা সমাজ বিকাশের স্তরভেদের কোন নির্দিষ্ট পর্যায়কেও তিনি চিহ্নিত করেননি। ... মারিয়া লিচের গ্রন্থে যে ২১টি ধারণা আছে, সেখানে Jonas Balys,

> Folklore-এর সাপেক্ষে folk-কে চিহ্নিত করলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানক দিয়ে। তাঁর মতে Folk হল Traditional। তা সেই ট্র্যাডিশন যা Primitive এবং Civilized উভয় সমাজেই বিদ্যমান। George Horzog এর সংজ্ঞাতেও প্রায় অনুরূপ ভাবনার সমর্থন মেলে। এখানে ট্র্যাডিশনকে সমাজ বিকাশের দুই মেরুর (Primitive এবং Civilized) সংযোগকারী উপাদান হিসেবেই দেখা হর। এই সঙ্গে আরও লক্ষণীয় হল-তিনি Folk -কে, সমাজ বিকাশের কোন একটি স্তরে আবদ্ধ করে না দেখে, দুই স্তরেই ফোক-এর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে স্বীকার করলেন- folklore thus exists in the city as well as in the country side। Marious Berbeau-এর সংজ্ঞাতেও এই ট্র্যাডিশনের সমর্থন মেলে। Aurelio M.Espenosa, Folk বলতে 'rural people' এবং 'common people of civilized countries'-কেই বুঝিয়েছেন। তবে উন্নতির শিখরে পৌঁছানো মানুষের মধ্যেও ফোকলোরের অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি Folklore -কে Primitive man এর প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলতেও দ্বিধা করেননি। তত্ত্বগতভাবে Espenosa-র ভাবনা Jonas Balys-এর ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Theodor g.Gaster এর দৃষ্টিতে Folk হল 'Group'। কিন্তু তাঁর উল্লেখিত 'গ্রুপ'-এর ক্যাটিগরি সম্পর্কিত কোন উল্লেখ নেই। ... তবু এখানে Individual অপেক্ষা Group-এর প্রাধান্য। অন্যদিকে M Harmon আবার Individual কেই প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, 'Individual has in commonwith his fellows'। Gertrude p. Kurath তাঁর সংজ্ঞার দ্বারা Folk বলতে Communityকেই নির্দেশ করেছেন। Mac Edward Leach এর মতে ফোক হল 'a homogenous unshopisticated people tied together not only by physical bonds but by emotional one …'। অন্যদিকে Katharine Luamala ফোক ধারণার সঙ্গেই Primitive people -কে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। John L Mish সভ্য সমাজকেও ফোক এর অন্তর্গত করে দেখেছেন। Charles Frascis Poter -এর মতে ফোক হল সেই সব মানুষ যারা Later Stage of Culture-এর পর্যায়ে রয়েছে। Later stage বলতে সম্ভবত Post Primitive -কেই নির্দেশ করা হয়ে থাকবে।Armine W.Voegelin তাঁর সংজ্ঞায় ফোককে Primitive -এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখেছেন। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৮)

৩২. উদ্ধৃত, সৌমেন সেন, 'লোক-এর বিভাজন', †jvKms¯'…Zi AvZ¥-Aci I Ab¨vb¨, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮৯

অ্যালান ডান্ডিস জানিয়েছেন, কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনাবশত তিনি এ সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছেন−−

> If modern jolklorists accepted the nineteenth-century definition of the folk as illiterate, rural, backeard peasants, then the study of the lore of such folk might well be strictly a salvage operation and ther discipline of folklorists might in time follow the folk itself into oblivion. Certainly it is conceivable that eventually all the peasants of the world will become urbanized or, at least, so much influenced by the urban centres as to lose their peasant qualities. The impact of the mass media ... has tended to encourage standardization of food, dress, language etc. But if we look at the question who are the folk? In a new light, we shall see that the folk are not dying out; that there are folk cultures alive and well in the United States, Canada and Europr; and that new folk cultures are bound to arise. (পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯)

৩৩. উদ্ধৃত, †jvKms¯'…Zi ZËi¡c I ¯'i¡c mÜvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৩৪. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৩৫. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৩৬. উদ্ধৃত, মনিরুজ্জামান, †jvKmwn‡Z¨i wfZi I ewni, গতিধারা, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৬

৩৭. মযহারুল ইসলাম, †dvK‡jvi cwiwPwZ I cVb-cvVb, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮-১১

তিনি জানিয়েছেন, ‘ফোক’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে পাশ্চাত্যে, বিশেষত ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ব্যবহৃত হয়। তাঁর অভিমত–

১. জাতি অর্থে ইংরেজি Folk শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে শব্দটির অর্থ সংকোচ হয়ে বর্তমানে জনসাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

২. প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে যে সমাজ এখনো দাঁড়িয়ে আছে–যাদের ঠিক Primitive বলা যায় না অথচ যাদের সামাজিক রীতিনীতিতে ও চালচলনে প্রাচীনতার ধারা এবং ঐতিহ্য বহমান। এই সমাজকে জনসাধারণ বা লোক-এর (Folk) সমাজ বলা চলে। অধিকাংশ পণ্ডিত (লোকবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী) এই অর্থ সমর্থন করেন।

৩. আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী-নৃবিজ্ঞানীগণ মৌলিক সংস্কৃতির অধিকারী মানবগোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য এই শব্দ অনেক সময় ব্যবহার করে থাকেন।

এই সমস্ত অর্থের গূঢ় উদ্দেশ্য আসলে প্রায় একই–সাধারণ মানবসমাজ, যাদের মধ্যে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে ঐতিহ্যমুখী জীবনব্যবস্থা, চালচলন, রীতিনীতি, চিন্তাধারা এগুলোকে সম্পূর্ণ বদলিয়ে দেয় নি অথবা সভ্যতার আলোক প্রবেশ করলেও সেই সমাজের কাঠামো মূলত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় বিদ্যমান। সুতরাং এই অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে আমরা নিঃসংকোচে Folk অর্থে ‘লোক’ শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। ... Folk অর্থে ‘লোক’ যেমন উচ্চারণের দিক থেকে তেমনি অর্থেও দিক থেকেও বিশেষ উপযোগী। ... বাংলাদেশে যেমন, পশ্চিম বাংলায়ও তেমনি Folk অর্থে ‘লোক’ কথাটি নিঃসংকোচে সবাই মেনে নিয়েছেন। উত্তর ভারতের কয়েকটি ভাষাতেও Folk অর্থে ‘লোক’ শব্দটি মোটামুটিভাবে স্বীকৃত।” (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭-৮)

৩৮. †jvKms¯‹…Zi ZËi/c I ¯i/c mÜvb, এ মুখার্জী অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৫, উদ্ধৃতি ক. পৃ. নং ৪১, উদ্ধৃতি খ. পৃ. নং ৪৯-৫০

তিনি এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত পরিসরে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, “মূলত ঐতিহ্যনির্ভর সাধারণ জনসমষ্টি বোঝাতে যে-অর্থে ‘ফোক’ শব্দটি ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয়, প্রায় অনুরূপ অর্থে ‘লোক’ শব্দটির সাধারণ স্বীকৃতি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ‘ফোক’-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ‘জন’ বা ‘গণ’ শব্দদ্বয়ের সার্থকতা কম। এই শব্দদ্বয় প্রকৃতপক্ষে যথাক্রমে ‘Mass’ বা ‘People’ শব্দের প্রতিশব্দরূপেই অধিকতর প্রযোজ্য, যার সঙ্গে ‘ফোক’-এর অর্থসঙ্গতি কম। তা ছাড়া, ‘গ্রাম’ শব্দটি কোনোরূপেই ‘ফোক-এর পরিপূরক নয়। এদিক থেকে জর্মান Volks শব্দটির সঙ্গে Folk শব্দটির উচ্চারণগত ও অর্থগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তেমন ‘ফোক’ অর্থে ‘লোক’ শব্দটির ব্যবহার, উচ্চারণ ও অর্থের দিক থেকে সবিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। মোটের উপর, অর্থসঙ্গতি ও ব্যবহারিক সিদ্ধির পথে ‘ফোক’-এর প্রতিশব্দরূপে ‘লোক’ শব্দের সাধারণস্বীকৃতি সর্বজনগ্রাহ্য।” (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫) তিনি লোক’ শব্দের উদ্ভব এবং কালানুক্রমিক অর্থগত বিবর্তনের রূপরেখা নির্দেশ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–– “জন্মলগ্ন থেকে নানাভাবে ফোক অভিধার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে Volkslied, Volksglanbe প্রভৃতি শব্দের ধারায় নৃতত্ত্বে লোক শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি Folk শব্দটি অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের

দশকের শেষার্ধে 'ফোকলোর' অনুষঙ্গে আবির্ভূত হয়। ফোক শব্দটি যখন স্বাধীনভাবে নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতিশাস্ত্রে ব্যবহৃত হতো, তখন সাধারণভাবে শব্দটির দ্বারা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী (Small Group)-অনগ্রসর সমাজ (Backward People)-সমস্বার্থ-বন্ধনে আবদ্ধ গোষ্ঠী (A group bound together by common Interests)-সাধারণ মানুষ (Common people) ... কৃষিসমাজ (Peasant society)-প্রভৃতি নির্দেশিত হতো। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে টম্‌স ফোকলোর শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা সুনির্দিষ্টরূপে ফোক বলতে পুরাতন আচার-ব্যবহার প্রথাদির সংরক্ষক জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করেন, যারা মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী গ্রামীণ ও কৃষি জনগোষ্ঠী। এই সূত্রেই Andrew Lane প্রভৃতি ফোকলোরকে 'Study of survivles' বলে চিহ্নিত করেন। সম্ভবত এই অর্থেই Summer, Redfield এবং অন্যান্যদের চিন্তায় 'ফোক' শব্দটি মূলত প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল জনগোষ্ঠীর প্রতিরূপ হিসাবে বিবেচিত হয়। সুইডিশ লোকসংস্কৃতিবিদ M Erikson

লোকসংস্কৃতিকে ভাবানুষঙ্গে আদিম-মৌলিক-গ্রাম্য বা জাতীয় রূপে অন্বিত করার বিরোধিতা করেন এবং ফোকের অধিকতর স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দাবী করেন। তদবধি ফোক নানাভাবে ও রুপে ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে। ফোক-এর বিভিন্ন অর্থের সূচক হিসাবে লোক ও লোকসমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ সূত্রাকারে নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করা যায়––

প্রাচীন জনগোষ্ঠী

নিম্নস্তরের জনগোষ্ঠী

কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জনগোষ্ঠী

আধুনিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীনপন্থী জনগোষ্ঠী

প্রাচীন ঐতিহ্যবহনকারী জনগোষ্ঠী

শিল্পবিপ্লব-পূর্ব ঐতিহাসিক স্তরের জনগোষ্ঠী

গ্রাম্য-কৃষি জনগোষ্ঠী

বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী

সাহিত্য-শিল্পগত ঐতিহ্য-বিরল জনগোষ্ঠী

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীহীন জনগোষ্ঠী

অনগ্রসর জনগোষ্ঠী

নিরক্ষর জনগোষ্ঠী

মৌলিক সংস্কৃতি পরিবহনকারী জনগোষ্ঠী

বৈদগ্ধহীন অনালোকিত জনগোষ্ঠী

সাধারণত দৈহিক বৈশিষ্ট্যগত বা সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকারের সমসূত্রে আবদ্ধ জনগোষ্ঠী 'লোক' নামে চিহ্নিত হয়, যা কৃষক বা পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণকে বোঝায় এবং যারা মুখ্যত প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলে। ... কৃষিসমাজ, পল্লীজীবন ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনসমষ্টি লোকরূপে বিবেচিত করার ধারণার মধ্যে আভিজাত্যবোধের তারতম্যে বা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ-

অপকর্ষের বৈপরীত্যের দ্বৈতসত্তায় সংস্থাপনার মানসিকতা লক্ষ করা যায়, যার স্বরূপ নিম্নলিখিত রেখাচিত্রে সুস্পষ্টভাবে সন্দর্শন করা সম্ভব--

----

গ্রাম	শহর
কৃষি	শিল্প
প্রাচীন	নবীন
পশ্চাৎপদ	অগ্রসর
অশিক্ষিত	শিক্ষিত
অনাধুনিক	আধুনিক
নিরক্ষর	সাক্ষর
নীচ	উচ্চ
নিকৃষ্ট	শিষ্ট
অমার্জিত	মার্জিত

উপরে নির্দেশিত রেখাচিত্রের মাধ্যমে বোঝা যায়, সাধারণভাবে বৈপরীত্যের দুই মেরুতে স্থাপন করে 'লোক'-কে অসংস্কৃত, অশিক্ষিত ও প্রাচীন প্রথার দাস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে দীর্ঘকাল। এইভাবে 'লোক' ও 'শিষ্টজনে'র মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টির চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে জার্মানীতে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। ... ইউরোপে প্রকৃতপক্ষে লোকস্তরকে কৃষিসমাজের সমগোত্রীয় বলে বিবেচনা করা হতো। এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ফোক শব্দটি গ্রাম্য জনগোষ্ঠী অর্থে ব্যবহৃত হতো। ... নৃতত্ত্ববিদগণ ক্রমশ সমাজের স্তরবৈশিষ্ট্য-পর্যালোচনায় লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেন। রেডফিল্ডই মুখ্যত লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। ... তাঁর বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে লোকসমাজ–ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন, স্বনির্ভর, সমজাতীয়তা ও প্রথাবদ্ধ, পরস্পর সংলগ্ন, যন্ত্রকৌশলগত সরলতা ও শ্রম বিভাগের স্বল্পতা, প্রথাগত জীবনাচারে অভ্যস্ত, শ্লথপরিবর্তন, অন্তর্নিহিত একাত্মতা, প্রবল গোষ্ঠীচেতনা, স্থিতিশীলতায় মন্থর, সমঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, সংহত জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী প্রথাবদ্ধ যূথচারিতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্নরূপে বিকাশ করে, যা লোকসমাজের সংস্কৃতিরূপে চিহ্নিত হয় ও প্রথাগত স্বীকৃতির পথে বিবর্তিত হয়। ... রেডফিল্ড-বর্ণিত লোকসমাজের বৈশিষ্ট্যকে সম্প্রসারিত করেন ফস্টার। ... তাঁর ভাষায় লোকসমাজ প্রচলিত অর্থে 'আদিম ও সভ্য' সমাজের মধ্যবর্তী সমাজরূপে প্রতিভাত হয়। ... আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীগণ আদর্শ লোকসমাজ বলতে এমন এক মধ্যবর্তী স্তরকে নির্দেশ করেন, যা একদিকে আদিম বা আদিমকল্প আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক এবং অন্যদিকে আধুনিক অগ্রবর্তী সমাজ থেকেও স্বতন্ত্র।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৫)

৩৯. ব½xq †jvKms¯'ÆZ‡Kvl, বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা. ২০১২, পৃ. ৫২৭-৫২৮

৪০. †jvKms¯'ÆZi wek‡Kvl, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৪-৫

৪১. †jvKms¯‹…Zwe`¨v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪

৪২. সৌমেন সেন, 'লোক-এর বিভাজন', ‡jvKms¯‹…Zi AvZ¥-Aci I Ab¨vb¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো জানিয়েছেন−−

> ইংরেজিতে যাকে বলা যায় স্টিরিওটাইপ বাংলায় তা হতে পারে 'মাপেকাটা' বা 'ছাঁচে ঢালা'। সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সাধারণ ছাঁচে ঢালা, গোষ্ঠীচরিত্র, চৈতন্য, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা ও ব্যবহারবিধির মাপে। এবং এই সবের সমন্বয়েই গোষ্ঠী-সংস্কৃতি যার অন্য নাম একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়, যার ভিত্তি একটি বহমান পরম্পরা বা ট্র্যাডিশন। গোষ্ঠীসভ্যদের আচরণ, সংস্কার, বিশ্বাস, ভাবনা সাধারণত এই ট্র্যাডিশনের ছাঁচে ঢালা। যদিও, ট্র্যাডিশনের গ্রহণ-বর্জন, নির্মাণ-পুনর্নির্মাণও ঘটছে প্রতিনিয়ত। ... একটি গোষ্ঠীর গড়ে ওঠা, সামাজিক, ভাষিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, ধার্মিক ইত্যাদি চাপে, যেমন একটা ছাঁচের জন্ম দেয়, তেমনি তাদের ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কেও একটি ধারণার ছাঁচ তৈরি হয়। এই ছাঁচ বা ছাঁচগুলি আমরা তৈরি করি বিশ্লেষণের স্বার্থে। এবং ক্রমশ আমরা এই ছাঁচে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে তার প্রয়োগ ঘটে নির্বিচারে, সময় ও সমাজের পরিবর্তনগুলি লক্ষ না করেই। সমাজ ও সংস্কৃতির যে বর্গীকরণে আমরা অভ্যস্ত তা-ও এমনই একটি ছাঁচ। ... এই ছাঁচেই আমরা লোক বা ফোক, লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোরকে চিনে আসছি। লোক বলতে আমরা বুঝেছি গ্রামীণ ও প্রধানত কৃষিনির্ভর জনসমষ্টি, যাঁদের সাংস্কৃতিক নাম লোকসংস্কৃতি। ... লোকসংস্কৃতি মূলত গ্রামীণ, ঐতিহ্যমণ্ডিত, কিঞ্চিত অশিষ্ট (তথাকথিত গ্রাম্য) কারণ তেমন পরিশীলিত নয়, তার নির্মাণ ও উপভোগ মূলত যৌথ এবং তার বহমানতা পরম্পরাগত ও বিশেষ পরিবর্তনশীল নয়। ... যদি বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের মুখোমুখি হওয়া যায় তা হলে দেখা যায় ... লোক ও লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধারণা তাই বদলে গেছে। ... লোক বলতে এখন বুঝি কোনো একটি গোষ্ঠী, যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে নানা শ্রেণিতে, নানা পেশায়, ধর্মীয় ও জনজাতি বলয়ে। এই গোষ্ঠী গ্রামীণও হতে পারেন, নাগরিকও। তাঁদের বন্ধনসূত্র একটিই−নিজস্ব পরম্পরা, যা আছে তাঁদের গ্রহণে এবং প্রতিমুহূর্তের নির্মাণে। এবং এই যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি, যাকে এখন লোকসংস্কৃতি বলা হচ্ছে, তার নির্মাণ সর্বদাই যে যৌথ হবে, তা না-ও হতে পারে; কোনও ব্যক্তির সৃষ্টি ক্রমে গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যৌথ হয়ে ওঠে, যেমন কোনও লিখিত, মুদ্রিত উৎসও থাকতে পারে এই সংস্কৃতির−তা যে সর্বদা মৌখিক হতে হবে, সে ছাঁচ আর মানা হচ্ছে না। যেমন মানা যাচ্ছে না ঐতিহ্যের অতীত নির্ভরতা, তা একটি পরিবর্তনশীল প্রবাহ। ... যদি আমরা মেনে নিই আর স্বীকার করি যে লোকসংস্কৃতি পরিবর্তনশীল, তা হলে দেখা যাবে 'লোক'-এর অভ্যস্ত স্টিরিওটাইপ আর মানা যাচ্ছে না আর 'লোক' ছড়িয়ে আছে অনেক শ্রেণিতেই, বিশেষত মাও-এর মডেলের মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া, আধাপ্রোলেতারিয়েত ও প্রোলেতারিয়েতদের মধ্যে। ... আমি লোকসংস্কৃতির সেই সংজ্ঞাই স্বীকার করতে চাই যে সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করে যে লোকসংস্কৃতি মাত্র সাহিত্যশিল্প নয়, তা একটি পরিকল্পিত শিল্পিত প্রসার প্রক্রিয়া এবং সমাজনির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ। ... আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতিচর্চায় এখন মোটামুটি মান্যতা পেয়ে গেছে যে 'লোক' ও 'লোকসংস্কৃতি'কে আর স্টিরিওটাইপে চেনা যাচ্ছে না। ('মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-১০২)

৪৩. দুলাল চৌধুরীর অভিমত−−

> অনেকেই লোকসমাজকে নিরক্ষর বা অশিক্ষিত বলে থাকেন। যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী, তারা বলেন, কৃষক, শ্রমিক বা জনসাধারণ বিশেষ কোনো অ্যাকাডেমিক শিক্ষা যারা পাননি তারা বস্তুত নিরক্ষর বা অশিক্ষিত। আমাদের লোকসমাজে তাদের বেশি প্রাধান্য। অতএব লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির স্রষ্টা হলেন এই তথাকথিত নিরক্ষর বা অশিক্ষিত মানুষ। তাই লোকসংস্কৃতিকে নিরক্ষরের সংস্কৃতিও বলা চলে। কিন্তু এই মতবাদে আমাদের প্রবল আপত্তি আছে। কারণ মানুষ শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে পড়লেই সব সময় সংস্কৃতিবান হন না। প্রকৃতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য,

মানবজীবনের সচল প্রবাহ, সংঘবদ্ধ সমাজজীবন, নানাবিধ কর্মপ্রণালী থেকেও সাধারণ মানুষ জ্ঞান আহরণ করেন। সুতরাং জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান বা দর্শন যার প্রগাঢ়, সেই লোকসমাজান্তর্গত মানুষকে কীভাবে বলব অশিক্ষিত? হয়ত লোকসমাজের কোনো কোনো সদস্য নিরক্ষর অথচ তার জাগতিক অভিজ্ঞতা (কর্ম ও জীবনগত) একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে কোন দিক থেকে কম নয়। তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি যে কৃষক বা শ্রমিক তেমন অ্যাকাডেমিক শিক্ষা লাভ করতে পারেননি, তৎসত্ত্বেও তার সংস্কৃতিবান বা সংস্কৃতির স্রষ্টা হতে কোন বাধা নেই। [†jvKms¯'…Zi ‡ek‡Kvl, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৪]

৪৪. তুষার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন--

লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি; যা মূলত তথাকথিত আদিম সমাজের অমার্জিত সাংস্কৃতিক প্রয়াস ও অগ্রবর্তী সমাজের সুমার্জিত বিদগ্ধ সংস্কৃতি অপেক্ষা কমবেশী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, শিক্ষাগত অতিপ্রযত্ন নিরপেক্ষ প্রধানত ঐতিহ্যাশ্রয়ী–বাকভাআ-অঙ্গভাষা, কারুকলা-চারুকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, রান্না-বান্না, সুর-ছন্দ, ক্রীড়া-অভিনয়, ঔষধ-তুকতাক, প্রথা-উৎসব, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম-অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বণ ইত্যাদিতে অভিব্যক্ত; এবং ক্ষেত্রানুসন্ধানে সৃষ্টিশীল সক্রিয়তায় মূর্ত বা বিস্মৃতিতে অবলুপ্ত হলেও, সামগ্রিকভাবে সামাজিক সম্বন্ধপাতের সচলতায় আদিম সমাজের হারানো অতীতে মূল প্রোথিত করে বিবর্তনের ধারায় চলমানকালের সত্যে উদভাসিত হয়ে আগামী দিনের বাতাবরণে সম্প্রসারিত। (†jvKms¯'…Zi ZËi¡c I ¯^i¡c mÜvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২)

৪৫. দুলাল চৌধুরী, †jvKms¯'…Zi ‡ek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৪৬. বিমল গুহ জানিয়েছেন--

লোকজীবনের সামগ্রিক রূপ যে সকল অনুষঙ্গের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে–তাকেই সামগ্রিকভাবে লোকজ উপাদান বলে চিহ্নিত করা যায়। মানুষের সরল বিশ্বাস বা সামগ্রিক আচার-আচরণের মধ্যে তা গণ্ডিবদ্ধ নয়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন-আচরলের সবক্ষেত্রে এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কার, নৃত্য, ভাষা ও ভাষার ব্যবহৃত শব্দ, স্থাপত্য, জীবনযাপন পদ্ধতি–অর্থাৎ চলমান বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের তাগিদে নিত্যদিন যা কিছু ঘটে, তাতেই লোকজ উপাদানের সৃষ্টি হয়। (AvaywbK evsjv KweZvq †jvK Dcv'vb : RmxgD''xb-Rxebvb›' 'vk-w‡eò †', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭)

৪৭. ওয়াকিল আহমদ জানিয়েছেন--

মানুষের চিন্তা, কল্পনা, ধ্যান, ধারণা, ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি হিসেবে শিল্পকলা সংস্কৃতির অঙ্গ, কিন্তু সংস্কৃতির বাহনরূপে যে জগৎ ও জীবনের পরিচয় ফুটে ওঠে, সংস্কৃতির উপাদান সেখানেও বিদ্যমান। ... সংস্কৃতি মানবজীবনাচার বটে, আবার জীবন ধারণের উদ্ভাবিত উপকরণও বটে। মানুষ ব্যবহারিক জীবনযাপনের পথে যা কিছু সৃষ্টি করেছে ও করছে, সেসব বস্তু স্বরূপে সংস্কৃতির স্বরূপ। আবার মনোজগতে আর এক সৃষ্টির লীলা নিয়ত চলেছে ও চলছে, তার চিন্তাধারা, জ্ঞানবুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, কল্পনা-অনুভূতির প্রকাশ নানাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে শিল্পলোকে, সৃষ্টিকলায়। প্রথমটি ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থার সহায়ক বস্তু-উপকরণ, দ্বিতীয়টি অন্তর্লোকের উৎকর্ষবিধায়ক মানস-উপকরণ। (evsjvi †jvK-ms¯'…Z, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৬)

৪৮. পবিত্র সরকারের অভিমত--

লোকজীবনের নানা বস্তুগত, ভাষাগত, প্রদর্শনমূলক বা অভিকরণযোগ্য (পরিবেশনোপযোগী) সংস্কৃতিবস্তু কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য রচিত হয় না, তার আরও নানা কাজ থাকে। এই কাজগুলি সেই সংস্কৃতিবস্তুর দ্বারা সম্পন্ন হয় বলেই লোকসংস্কৃতির নানা সৃষ্টিকর্মের একটা মূল্য বা value তৈরি হয়ে যায়। লোকজীবনে এই মূল্যবস্তুর মধ্যে কেবল একটিই হলো সৌন্দর্য। ... লোককথা, লোকসংগীত, পুতুল ও খেলনা, বাড়ির দেয়ালে অলংকরণ ও আলপনার নানা ডিজাইন, দরজা-জানলার চৌকাঠে কাঠের উপর কারুকাজ, টিনের চালার চুড়োয় টিনের ময়ূরজোড়া–এ সবই মূলত নন্দনতত্ত্বের অধীন। ... তবু ... লোকসংস্কৃতির সমস্ত নির্মাণ ও রচনা কেবল সৌন্দর্যমুখী নয়। যখন কুমোর হাঁড়ি, সরা বা কলসির গায়ে অলংকরণ করে, ... তখন দেখি সৌন্দর্যের একটা ব্যবহারিক আধার আছে। অর্থাৎ ওই ব্যবহারিক আধারকে ভিত্তি করেই তার সৌন্দর্যসৃষ্টির কারুকলা বিকশিত হয়েছে। ওই আধারটি না থাকলে তা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ত। অর্থাৎ কেজো, ব্যবহারযোগ্য জিনিসটি ছিল বলেই কারিগরের সৌন্দর্যকল্পনা একটা আশ্রয় পেল, তার বাইরে তার নিদর্শন তত পাওয়া যাচ্ছে না। বস্তুগুলির ওই ব্যবহারিক মূল্য না থাকলে সৌন্দর্যের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষাটির যেন জন্মই হত না। († j√Kms¯‹…Zi b›'bZË, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃ, ৫৩-৫৪)

৪৯. এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম জানিয়েছেন--

লোকতত্ত্বের প্রামাণ্য সংজ্ঞা গণ, বা জন, বা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর যে কোনো ছকে ফেলে লোকজীবনকে বিচার করা হোক না কেন, লোক উপাদানের অন্তর্নিহিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সর্বত্র ধরা পড়বে – ১. প্রাকৃতজনের সরল জীবনাচরণের গভীর কেন্দ্র থেকে উৎসারিত বলে তাতে সারল্য আছে। ২. সহজ একটি কাঠামো এবং বিন্যাস আছে কিন্তু নিতান্ত আটপৌরে বলে তাতে মার্জনার অভাবও আছে। ৩. তাতে বিশ্বাসের চরিত্রটি প্রবল; প্রায়শ দৈব নির্ভরতার মাধ্যমে ঐ বিশ্বাসের একটি রূপ প্রস্ফুটিত। ৪ যেহেতু বিবর্তনশীল ইতিহাসের দীর্ঘ পদযাত্রার নির্ঘণ্ট লোকজীবনের দোলাচলেই বিশ্বস্তভাবে বিন্যস্ত, সেজন্য এক ধরনের রক্ষণশীলতা দেখা যায় তাতে। ৫. দীর্ঘদিন ধরে যে লোকাচার বা লোক বিশ্বাস গড়ে ওঠে, তার ভিত্তি থাকে সুদৃঢ়, কালের বিবর্তনে সামান্যই পরিবর্তন আসে তাতে। যদিও নিস্পৃহ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলে এদের পেছনে ক্রিয়াশীল দ্বান্দ্বিকতার রূপটি উপলব্ধি করা যাবে না। লোকজীবনের সামূহিক পরিচয়টি মূর্ত হয় এর যে সকল অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে, তাদেরই সমষ্টিগতভাবে লোক উপাদান বলে চিহ্নিত করা যায়। ['সমকালীন সাহিত্যে লোক উপাদানের ব্যবহার', GK‡ki ceÜ : †dvK‡jvi, শাহীদা খাতুন (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৭]

৫০. দুজন গবেষকের প্রাসঙ্গিক অভিমত--

ক. শ্রুতিনির্ভর বলেই লোকসংস্কৃতির কোনও অবিকৃত বিশুদ্ধ চিরকালীন রূপ নেই। সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মানুষের সমাজে কালে কালে উৎপাদন সম্পর্ক পালটে যায়, কৃষির যন্ত্রপাতির বিবর্তন ঘটে, গোষ্ঠীসমাজের চিন্তার উত্তরণ ঘটে, অভিজ্ঞতা ব্যাপ্ত হয়, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ক বিস্তৃততর হয়, এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হতে থাকে। নতুন নতুন কথক-গায়ক-শিল্পী-নৃত্যশিল্পী সৃষ্টিশীল মনের মাধুরী মিশিয়ে পুরোনো চলে আসা বিষয়ের পরিবর্তন আনেন। সব সময় সচেতন হয়ে নয়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-মনন-অভিব্যক্তির অন্যবিধ প্রকাশ ঘটে যায়। ... লোকসংস্কৃতি ... কোনও কালেই এক জায়গায় একই রূপে অবস্থান করেনি। কালে কালে বিবর্তিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। গোষ্ঠীসমাজের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বদলায়, জীবন-জীবিকার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে, চিন্তার বিবর্তন ঘটে। ... বিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশে সংস্কৃতি নতুনতর রূপ নেয়, নতুন ভাবে নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। সমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক ধারায় সঙ্গত কারণেই লোকসংস্কৃতির কিছু অংশ হারিয়ে যায়, লোকসমাজে সেগুলো ক্রিয়াশীল থাকে না। কিন্তু মূল লৌকিক সংস্কৃতির ধারা বা পরম্পরা কখনওই

একেবারে বিলুপ্ত হতে পারে না। আর স্বাভাবিক এই গ্রহণ-বর্জনের রীতি ও ধারা বয়ে চলেছে বলেই পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন অবান্তর। লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক ও বিষয় পরিবর্তিত পরিবেশে সব সময় বিবর্তিত হচ্ছে। লোকসমাজ নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হচ্ছে, গোষ্ঠীমানুষ গ্রামসমাজে মিলিত আলোচনায় আলোকিত হচ্ছেন–সমকাল তো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। খুব ধীরগতি হলেও পরিবর্তন ঘটেই চলে, অগোচরেই ঘটে। সে ভাবেই লোকসংস্কৃতির মধ্যেও নতুন নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটে, কালের প্রভাবেই ঘটে। (দিব্যজ্যোতি মজুমদার, †jvKms¯‹wZi fwel¨r I †jvKvqZ gb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১, ১৭)

খ. ফোকলোর জনগণের ঐতিহ্যের ধারাকে আশ্রয় করেই জীবিত থাকে। যুগের পরিবর্তনের সাথে নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে ফোকলোরের চরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে। পুরোনো ফোকলোর সময়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতিক্রম করে সমাজের দশজনের মুখে মুখে পূর্ববর্তী পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের অনেক স্তর পেরিয়ে বর্তমান সমাজে চলে এসেছে–এগুলোর পরিবর্তন সচরাচর হতে দেখা যায় না। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে নতুন পরিবর্তিত ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ফোকলোর সৃষ্টি হয়। যেমন একটি সমাজ কৃষিনির্ভর চরিত্র পেরিয়ে যখন শিল্পনির্ভর সমাজে রূপান্তরিত হয়, তখন সেই সমাজে যে ফোকলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে, চরিত্রের বা মেজাজের দিক থেকে তা ঠিক কৃষিনির্ভর সমাজের ফোকলোরের মত হয় না, হতে পারে না। কৃষিনির্ভর সমাজের ফোকলোরের স্রষ্টা কৃষক, অথবা জমিতে কর্মরত মজুর এবং এদের চারপাশের অন্যান্য মেহনতি মানুষ। অপরপক্ষে শিল্পায়িত সমাজের ফোকলোরের স্রষ্টা কলকারখানায় কর্মরত মেহনতী মজুর–মজুরের চারপাশের অর্থ আহরণে সুপটু বণিক এবং ধনিক শ্রেণী। (মযহারুল ইসলাম, †dvK‡jvi cwiwPwZ I cVb-cvVb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫)

৫১. সৌমেন সেন জানিয়েছেন––

ট্র্যাডিশনের তিনটি রূপ চিহ্নিত হয় : প্রথম, উত্তরাধিকার, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিস্তৃত, দ্বিতীয়, একটি উপাদান যা থেকে জন্ম নেয় লোকসংস্কৃতি বা মৌখিক সংস্কৃতি আর তৃতীয়, ট্র্যাডিশন একটি গোষ্ঠীর পরিচয়। এবং এই বিশ্লে-ষণের সূত্রেই বলা হয় যে কিছু 'ঐতিহ্য' মৃত, কিছু জীবিত, কিন্তু অসাড়, আর কিছু জীবিত ও সচল। ... আমরা আজ জানি যে লোকসংস্কৃতির লোক নানা শ্রেণিতে, নানা বর্গে, নানা বলয়ে বিচরণ করেন। এই 'লোক' একটি জাতিগোষ্ঠী হতে পারেন, হতে পারেন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, বিশেষ পেশাজীবী ইত্যাদি। এইসব গোষ্ঠীর যোগসূত্র একটিই–নিজস্ব পরম্পরা বা ট্র্যাডিশন। ... 'লোক' এর সংস্কৃতি আছে, আর, সেই সংস্কৃতি ... একটি পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত। ... 'লোক; একটি গোষ্ঠী, সংখ্যার পরিমাণে নয়, আত্ম-পরিচয়ে, যে পরিচয় স্বতন্ত্র, জাতিগত, ধর্মগত, পেশাগত, ইত্যাদি কারণে এবং যে গোষ্ঠী যেমন শ্রেণি অন্তর্গত হতে পারে তেমনি থাকতে পারে শ্রেণি অবস্থানে আর এই গোষ্ঠী বহন করবে ও নির্মাণ করবে প্রতিনিয়ত একটি আত্মস্থ পরম্পরা। ... পরম্পরার ভূমিকা এখানে বহতায় ও নির্মাণে। ... ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতিকে যদি বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সভ্যদের পারস্পরিক সংলাপ, যা চিত্রিত হয়, শিল্পিত হয়, প্রাত্যহিকতার আশ্রয়ে ব্যবহারিক প্রকাশ মাধ্যমে, যে মাধ্যম সুনিশ্চিত করে একটি আত্মপরিচয় ও তৈরি করে, প্রতিনিয়ত, একটি যোগসূত্র, যার নাম পরম্পরা, যার বহমানতা সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে, তাহলে এই সংস্কৃতিই মানুষকে যথার্থ সংস্কৃতিবান করে, তাকে চেনা যায়। ... এই সংস্কৃতিই পরম্পরা গড়ে তোলে, ... বহমান, নিত্য-নির্মিত পরম্পরা সাংস্কৃতিক স্মৃতির আশ্রয়ে। (†jvKms¯‹wZi AvZ¥-Aci I Ab¨vb¨, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩৭-৩৮)

৫২. পরিবর্তনশীল পরিবেশেও লোকসংস্কৃতি নতুন রূপে কীভাবে গড়ে ওঠে এবং টিকে থাকে, এর সম্যক দৃষ্টান্ত নিচে উপস্থাপিত হলো––

দেশান্তরী মানুষের লোকসংস্কৃতি কী ভাবে বেঁচে থাকে কিংবা পরিবর্তিত হয় অথবা বিলুপ্ত হয়ে যায় এই ভাবনা লন্ডনের ফোকলোর সোসাইটিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই সোসাইটির পক্ষ থেকে খ্যাতিমান লোকসংস্কৃতি-গবেষক ওয়ালটার জেকিলকে জ্যামাইকায় এ বিষয়ে সমীক্ষা করতে পাঠানো হল। তিনি দীর্ঘ দিন ব্যাপক এলাকায় সমীক্ষা করে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তথ্যসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ লেখেন–জ্যামাইকান সং অ্যান্ড স্টোরি। লন্ডনের ফোকলোর সোসাইটি সেটি প্রকাশ করে। জ্যামাইকায় আসা আফ্রিকান মানুষজনের মধ্যে থেকে সংগৃহীত লোকসংগীত ও লোককথা বিশ্লেষণ করে ফোকলোর সোসাইটির লোকসংস্কৃতি-গবেষকবৃন্দ দেখলেন, পরিবর্তিত ভৌগোলিক পরিবেশে লোকসংস্কৃতি নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে। তাদের সৃষ্টিশীল মানসিক তাগিদেই এই লোকসংস্কৃতির উৎসার ঘটল। এই সব উদ্বাস্তু ছিন্নমূল ক্রীতদাস দীন-দরিদ্র, অর্ধভুক্ত, অমানবিক পরিশ্রমে বাধ্য, কর্মক্ষেত্রে বাক্যহারা আফ্রিকার মানুষের লোকসংগীত-লোককথার ভাষা ভিন্ন হয়ে গিয়েছে, তবু এই নতুন ভাষার মধ্যেও বহু শব্দ-চিত্রকল্প-পরিবেশ বর্ণনা-আত্মীয় সম্পর্ক আচার-বিশ্বাস প্রভৃতির বিবরণে ফুটে উঠেছে ফেলে আসা স্বদেশভূমির জীবনের কাহিনী। একই সঙ্গে বর্তমান জীবনের নির্যাতিত-উৎপীড়িত-অবমানিত-বুভুক্ষু অবস্থার বেদনা-কান্না-হতাশা-অভিমান-অমর্যাদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নতুন সুন্দর স্বাধীন জীবনের কথাও প্রকাশ পেয়েছে। যে জীবনের কথা আফ্রিকায় থাকতে তারা কল্পনাও করতে পারেনি, যে দুঃসহ জীবন আজ বয়ে চলতে হচ্ছে, জীবনের সংস্কৃতি কিন্তু দুটি ভিন্ন পরিবেশকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করেনি। নতুন ভাবে সংস্কৃতি বেঁচে রইল। এ ভাবেই ঐতিহ্যের ধারা বয়ে চলে। অনেক কিছু মরে যায়, শুকিয়ে যায়– আবার অনেক কিছু নতুন ভাবে জন্মায়। এই প্রক্রিয়াই লোকসংস্কৃতির পরম্পরা। (†jvKms¯'…Zi fvel¨r I †jvKvqZ gb, গাঙচিল, কলকাতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২৩)

৫৩. তিনজন গবেষকের প্রাসঙ্গিক অভিমত--

ক. এই (লোক) সংস্কৃতি সংহত গোষ্ঠীসমাজের সৃষ্টি। স্রষ্টা একজন ব্যক্তি হলেও তা সমগ্র লোকসমাজের সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। গোষ্ঠীমানুষ সেই সৃষ্টিকে মান্যতা দিলেই তা গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। লৌকিক ঐতিহ্যের এ এক বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক বৈভব। (দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ‡jvKms¯'…Zi fvel¨r I †jvKvqZ gb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১)

খ. লোকসংস্কৃতিও ঐক্যবদ্ধ সমাজ ব্যক্তিত্বের যৌথ সৃষ্টি। হয়ত একজন প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী কয়েকটি কথা, কয়েকটি রেখা, কয়েকটি মৃৎপ্রদীপ সৃষ্টি করে, কালক্রমে লোকসমাজের সমন্বয়ী প্রতিভা এই কণাগুলিকে এক বিশাল ঐতিহ্যে পরিণত করে এবং সমাজে এই বস্তুসম্পদ স্থায়ী যৌথ শিল্পকলায় পরিণত হয়। (দুলাল চৌধুরী, †jvKms¯'…Zi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩)

গ. ফোকলোর একটি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি, যারা একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে, যাদের জীবনব্যবস্থা ভাষা, জীবিকা ও ঐতিহ্যের অবলম্বন একই সূত্রে গ্রথিত। ফোকলোর ... সব ক্ষেত্রেই ... ব্যক্তির সৃষ্টি, তবে মাঝে মাঝে দলগতভাবে ও সৃষ্টি হতে পারে যেমন কোন কোন সঙ্গীত বা গীতিকা, হেঁয়ালী, ক্ষুদ্র কাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদি। তবে ব্যক্তির বা ব্যষ্টির সৃষ্টি হলেও কালের প্রবাহে যখন সেই সৃষ্টি একটি ব্যাপক জনসমাজের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখনই তা ফোকলোর হয়। (মুহম্মদ আবদুল খালেক, ga¨h‡Mi evsjv Kv‡e¨ †jvK-Dcv'vb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯)

৫৪. দুজন গবেষক এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন--

ক. 'সংস্কৃতি'কে অর্জনের জন্য মানুষকে কয়েক লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে করে অগ্রসর হতে হয়েছে। নিজেকে বাঁচার তাগিদেই সে শ্রমপ্রক্রিয়াকে নিজের বিবর্তনশীল বুদ্ধিবৃত্তির জোরে জটিল এবং সূক্ষ্মতর করতে সক্ষম হয়েছে। ... শারীরিক গঠনের পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে তার মেধা, স্মৃতিক্ষমতা ও বিচারশক্তি। এই সবের সুসংহত পরিণামে যুক্তিসিদ্ধভাবে সে ভাবতে শিখেছে, প্রকৃতির ওপরে তার আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে

এবং গড়ে তুলেছে শৃংখলাবদ্ধ সমাজ, ক্রমবিবর্তমান সভ্যতা, আর তারই অনুষঙ্গে–সংস্কৃতি। (পল্লব সেনগুপ্ত, †jvKms¯‹…Zi mxgvbv I ¯^i~c, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭)

খ. মানুষ প্রকৃতির সন্তান। ... যখন প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে শিখেছে মানুষ, ঠিক তখন থেকেই শুরু হয়েছে মানবচেতনার অগ্রগামিতা। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে, বাঁচার কৌশল আয়ত্ত করেছে মানুষ এবং প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে আসছে ক্রমাগত। সেই প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করতে গিয়ে, সেই উপকরণ দিয়ে মানুষ যা-কিছু তৈরি করেছে, তা-ই তার নিজস্ব সৃষ্টি আর সম্পদ হয়ে উঠেছে। এই সৃষ্টিই তার সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক উপকরণ ও উপাদান। ... সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের তৈরি পরিবেশ। পৃথিবীর জীবনপ্রতিবেশে মানুষের সৃষ্ট যা কিছু সে সবই ‘সংস্কৃতি’, বাকিটা হল প্রকৃতি। ... প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে জীবনধারণ ও বাঁচবার কৌশল ও হাতিয়ার নির্মাণ করে মানুষ নিজেকে ‘প্রাকৃতিক সন্তান’ থেকে ‘মানবিক’ ও ‘সাংস্কৃতিক সন্তানে’ রূপান্তরিত করেছে। মানুষের হাতে পড়ে ‘প্রাকৃতিক উপকরণ’ আর প্রাকৃতিক থাকেনি, তা হয়ে উঠেছে ‘সাংস্কৃতিক উপকরণ’। এই রূপান্তর মানুষের ‘ক্রিয়েশন’ বা সৃষ্টি। আর তা-ই তার সংস্কৃতির অন্তর্গত। ... বস্তুগত উপকরণ এবং আবিষ্কারের সঙ্গে অবস্তুগত কিন্তু যোগাযোগের জন্য তথা মনের ভাব প্রকাশের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ‘ভাষা’ আবিষ্কার করেছে। ... বস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদান এবং অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদান ছাড়াও বস্তু-অবস্তুগত উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র নির্মাণকারী সাংস্কৃতিক উপাদান হচ্ছে ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, চিন্তা-চেতনা, ভাব-ভঙ্গিমা, ইঙ্গিত-ইশারা আচার-আচরণ ইত্যাদি। এ-সব কিছুই তার সাংস্কৃতিক বোধের সৃষ্টি-ফসল। “মানুষের ভাবধারা, বিশ্বাস, নীতিবোধ, আইন ও ভাষা এবং তার ব্যবহৃত সকল হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি, এমনকি বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে মানুষ যা কিছু পন্থা অবলম্বন করে সে-সব কিছু নিয়ে মানুষের সংস্কৃতি গঠিত। (মাহবুব হাসান, evsjv‡`‡ki KweZvq †jvKR Dcv`vb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১-৪)

৫৫. এ প্রসঙ্গে দুজন গবেষক জানিয়েছেন––

ক. এক সময় লোকসংস্কৃতি শুধুমাত্র মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত, এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। তাই ‘ওরাল ট্র্যাডিশন’, ‘ওরাল লিটারেচার’ প্রভৃতি অভিধা লোকসংস্কৃতিকেই বোঝাত। কিন্তু গত শতকের পাঁচের দশক থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্প কাল পর থেকেই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতি-গবেষক অনেক প্রাজ্ঞজন বললেন, লিখিত রূপে আবদ্ধ হলেই সেটি লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা থেকে বঞ্চিত হবে এ ধারণাও অভ্রান্ত। আসলে এক কালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের গ্রামীণ মানুষজন নিরক্ষর ছিলেন। তাই লিখিত আকার দেয়ার সুযোগ ছিল না। এমন জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা লিখিত রূপেও লোকসংস্কৃতির উপাদান নথিভুক্ত করেছেন। ... সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত হল এই ভাবনা, লিখিত আকারেও লোকসাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। বাংলার বাউল-ফকিরি-ঝুমুর গান সে কারণেই লোকসংগীত। (দিব্যজ্যোতি মজুমদার, †jvKms¯‹…Zi fwel¨r I †jvKvqZ gb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩)

খ. যুগে যুগে ফোকলোর মৌখিক ঐতিহ্য থেকে লিখিত ঐতিহ্য এবং লিখিত থেকে মৌখিক ঐতিহ্যে স্থান-বদল করেছে। ... ফোকলোরের সেইসব অংশ সম্পর্কে, যেগুলো অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় প্রচারিত হয় এবং সেগুলো কখনোই মৌখিক ঐতিহ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না, যেমন– লোকনৃত্য, লোকখেলা, লোকচিত্রকলা এবং লোকভঙ্গি, এগুলো দেখে দেখে শিখতে হয়, মুখে শুনে নয়। অনুরূপভাবে লোকশিল্প, লোকচিত্রকলা, আলপনা, লোকভাস্কর্য প্রভৃতি সৃষ্টি-পদ্ধতি দেখেই শিখতে হয়। এগুলোকে ওর‍্যাল ট্রাডিশনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, আবার এগুলোকে কেবল ... দৃষ্টিলব্ধ ঐতিহ্যও বলা সমীচীন নয়। ... তা হলে বলতে হয় যে, ফোকলোর পূর্ব-পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মুখে মুখে প্রচলিত হয় অথবা কার্যের দ্বারা বিস্তারলাভ করে কিংবা দেখে অনুসরণের মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করা হয়। লোকশিল্পের বেলায় প্রকৃত শিল্পীর সাথে পরিচয় না থাকলেও তার সৃজিত শিল্প দেখেই যে কোনো শিল্পী তা আয়ত্ত করতে পারে। ... ফোকলোর বিশেষ বিশেষ দলীয় মানুষের ঐতিহ্য থেকে

সৃষ্টি লাভ করে–তারা শহরেই বাস করুক অথবা গ্রামেই থাকুক। এই দলীয় মানুষের আচার-ব্যবহার, চালচলন, ভাষা, জীবনব্যবস্থা, জীবিকা এবং ঐতিহ্য যদি একই হয় তবে তাদের সৃজিত ফোকলোর একই ধাঁচের হবে। ভাষা, জীবনব্যবস্থা, জীবিকা এবং ঐতিহ্য ইত্যাদি সংস্কৃতিতে যেমন প্রতিফলিত হয়, সংস্কৃতির বিশিষ্টতম অঙ্গ ফোকলোরেও তেমনি এদের প্রতিবিম্বন ঘটে। ... ফোকলোর সাধারণ মানুষের সৃষ্টি, অশিক্ষিত মানুষ মুখে মুখে এগুলোর সৃষ্টি করে–তা যেমন দলগতভাবে সমবেত প্রয়াসে তেমনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসেও সৃজিত হয়–মুখে মুখেই তা প্রচারিত ও হস্তান্তরিত হয়–পূর্ববর্তী পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে–এক দেশ বা মহাদেশ থেকে অন্য দেশ বা মহাদেশে। ফোকলোরের কোনো উপাদান লিখিতভাবেই সৃজিত হয়, মৌখিকভাবে সৃজিত হয়ে লিখিত ঐতিহ্যে প্রবেশ করে, আবার লিখিতভাবেও সৃজিত হয়ে মৌখিক ঐতিহ্যে প্রবেশ করে। পুঁথিগত বিদ্যার স্পর্শ ছাড়াই একজন প্রতিভাদীপ্ত মানুষ কোনো একটি বস্তু উদ্ভাবন করতে পারে, শিল্প সৃষ্টি করতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, পুতুল বা মূর্তি গড়তে পারে–এগুলো দেখে পূর্বপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষ, কিংবা একজন থেকে অন্যজন, এক সংস্কৃতি ও দেশ থেকে অন্য সংস্কৃতির বা দেশের মানুষ তা নির্মাণ করতে, আঁকতে বা পড়তে পারে। এ ছাড়া অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও ফোকলোরের কোনো কোনো উপাদান জন্মলাভ করে এবং তারই অনুকৃতি, অনুকৃতির স্বাভাবিক সংযোজন ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে। ... লোকনৃত্য, লোকশিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, আলপনা, লোকোৎসব, লোকচিকিৎসা–পদ্ধতি ও ঔষধ, লোকযান বা বাহন, লোকরন্ধনশিল্প বা খাদ্য ইত্যাদি মুখে মুখে প্রচলিত নয়, তবু এরাও ফোকলোরের বিশিষ্ট উপাদান। তা ছাড়া এমন অনেক উপাদান আছে যেগুলো মুখে মুখে প্রচলিত হয়েছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিল্প বা আর্ট নয়, তারাও তো ফোকলোর, যেমন মন্ত্রতন্ত্র, লোক খেতাব, লোকসংস্কার ও বিশ্বাস, লোকব্যুৎপত্তি বা লোকনিরুক্তি ইত্যাদি। অন্য পক্ষে লোকনৃত্য, আলপনা, লোক-অংকন শিল্প, বা চিত্রকলা, লোক-ভাস্কর্য, কুটির শিল্পের বস্তুসমূহ যদিও শিল্প কিন্তু তারা মুখে মুখে প্রচলিত নয়, দৃষ্টিলব্ধ অভিজ্ঞতা ও অনুকরণই এগুলো সৃষ্টির মূল বাহন। (মযহারুল ইসলাম, †dvK‡jvi cwiwPwZ I cVb-cvVb, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪-৫)

৫৬. লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যত ও লোকায়ত মন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৫৭. দুলাল চৌধুরীর অভিমত––

লোকসংস্কৃতির উপকরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা সমাজমনস্তত্ত্বের অন্তঃশীল রহস্যলোকের সন্ধান পাব। ... সমাজের নীচুতলা থেকে সমাজের উপরিসৌধকে আবিষ্কারের সূত্র লোকসংস্কৃতিই আমাদের দিতে পারে। ... লোকসংস্কৃতি এক ঐতিহ্যসম্পন্ন ব্যক্তি বা লোকসমাজের অলিখিত মানব ও বস্তুসম্পদ। ... আদিম বর্বর স্তরের মানবসমাজ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রতিঘাতে বহুযুগ ধরে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। যাযাবর জীবন থেকে ফল চয়ন, আহরণ ও ফসল উৎপাদনের স্তরে যে কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তারই ঐতিহাসিক ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকাচার এবং লোকউৎসব, লোকদেবতা ইত্যাদি। কালক্রমে, প্রস্তর ফলকের কিংবা গুহাগাত্রের চিত্রাঙ্কন ও চিত্রলেখা মানবসভ্যতার এক নবযুগের সূচনা করেছিল। এরই সূত্র ধরে লিপিমালার আবিষ্কার মানুষকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছিল। (†jvKms¯'wZi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২)

৫৮. পল্লব সেনগুপ্তের অভিমত––

একটি গোষ্ঠী এবং সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে অন্যান্য গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপকরণগুলিও এসে হামেশাই মিশে যায়। এটা সম্ভব হয় এইজন্যেই যে, বিবিধ প্রকারের আর্থ-সামাজিক উপলক্ষে গোষ্ঠীগুলি একে অপরের সান্নিধ্যে আসে। মৈত্রী কিংবা বিবাদ, সহযোগিতা অথবা শত্রুতা, অর্থনৈতিক লেনদেন নয়ত কারিগরি প্রযুক্তির বিনিময় ইত্যাদির সূত্রে একের সঙ্গে অপরের যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে–তারই কারণে সাংস্কৃতিক উপাদানেরও বিনিময় ঘটে। (†jvKms¯'wZi mxgvbv I ¯^i~c, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭-১৮)

৫৯. †jvKms¯«wZi fwel¨r I †jvKvqZ gb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৬০. তুষার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন--

> লোকসংস্কৃতির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। ... সমাজ ও সভ্যতার বস্তুগত পটভূমিকায় এবং জীবনপ্রবাহের বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতির বিষয়পরিধি জীবনপ্রবাহের সামগ্রিকতাকে অঙ্গীকার করে নেয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমন কি, জন্ম পূর্ববর্তী সংস্কার থেকে মৃত্যু পরবর্তী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও মরণোত্তর বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়েই বিশিষ্ট লোকসমাজ বা জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতিগত পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। ... লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস পরিক্রমায় এই সত্য উদ্ভাসিত হয় যে, জন্মলগ্ন থেকেই লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তু, পরিধির প্রশ্নে নানাবিধ বিতর্কের উপস্থিতি বর্তমান। বিদ্যা হিসেবে লোকসংস্কৃতি আধুনিককালে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও লোকসংস্কৃতির বিষয়পরিধির প্রশ্নে (লোকবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে) নানারূপ মতান্তর দেখা দেয়। ... প্রাথমিক পর্যায়ে লোকসংস্কৃতি বলতে লোককথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গাথা, গীত, গীতিকা, ইত্যাদি গ্রহণ করা হত। সুদীর্ঘকাল লোকসংস্কৃতি কেবলমাত্র লোকসাহিত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। ... নৃবিজ্ঞানীগণ 'ফোকলোর' বলতে মুখ্যত লোকসাহিত্যকেই নির্দেশ করতেন। ... মৌখিক ভাষাশ্রয়ী অলিখিত-নিরক্ষর জনসমাজের মৌখিক সাহিত্যকেই নৃবিজ্ঞানীগণ 'ফোকলোর' হিসেবে চিহ্নিত করতেন। ... আর্চার টেলর প্রথমাবধি সর্বপ্রকার পরম্পরাগত ঐতিহ্যকেই লোকসংস্কৃতি বলে গণ্য করেছেন। ... ক্রমশ লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীগণ লোকসংস্কৃতিকে মৌখিক ভাষার পরিধির বাইরে প্রসারিত বিষয় হিসেবে গণ্য করেন। ... এই ব্যাপারটি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, লোকসাহিত্য মৌখিক ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকশিল্প, লোকধর্ম, লোকউৎসব, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি মৌখিক ভাষানির্ভর নয়। সেগুলি অঙ্গভাষা (ভঙ্গি), চিত্রভাষা ও নানারূপ মানসিক ক্রিয়া মুখীন। ... মৌখিক ভাষাশ্রয়ী লোকসাহিত্যের প্রাধান্য থাকলেও লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তু যে কেবলমাত্র বাক্‌ভাষার সীমায় আবদ্ধ নয় তা উপলব্ধি করা যায় এবং বস্তু, ভাব ও ক্রিয়াধর্মী যাবতীয় বিষয়ের মধ্যেই যে লোকসংস্কৃতির পরিধি পরিব্যাপ্ত তা সহজেই অনুমান করা যায়। (†jvKms¯«wZ cv‡Vi fwgKv, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৫৩-৫৪)

৬১. †jvKms¯«wZi ZËi/c I ¯i/c mÜvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

৬২. †dvK‡jvi cwiwPwZ I cVb-cvVb, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২-১৪

৬৩. e½xq †jvKms¯«wZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৮-৫৩১

৬৪. †jvKms¯«wZ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. 'ভূমিকা'- xii

৬৫. ga¨h‡Mi evsjv Kv‡e¨ †jvK-Dcv'vb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-১০৩

৬৬. †jvKms¯«wZi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

৬৮. দুলাল চৌধুরী এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন--

> জনজীবনের বিভিন্ন ধারায় লোকসংস্কৃতি কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রত্যক্ষ প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী নৃবিজ্ঞানীদের আলোচনায় সেগুলি প্রসার লাভ করে। লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচন, কোন এক জাতির প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার কাজ করে থাকে। জাতির নীতি ও আদর্শের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয় এসব ছড়া

প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে। সেইজন্য বিশেষ লোককথা, প্রবচন অথবা ছড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক লেনদেন ও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের কথা প্রতিফলিত হয়। বহু যুগ পূর্বের কোন জনগোষ্ঠীর বিস্মৃত ইতিহাসের পুনর্গঠনের সময় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দিক থেকে কোন প্রত্যক্ষ সাহায্যের অভাব ঘটলে লোকসংস্কৃতির আলোচনাই একমাত্র সহায়কের কাজ করতে পারে। লোকসংস্কৃতিকে সেজন্যই বলা হয় A living fossil which refuses to die. অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি এক জীবন্ত ও অবিনশ্বর জীবাশ্ম। ভারতীয় সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিভিন্ন লৌকিক আচার-ব্যবহারও বিধিনিষেধের প্রস্তাবে প্রভাবিত। ... মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সংস্কারের জটাজালে আবদ্ধ। কোন জাতিগোষ্ঠীর জীবনে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার দেশের বৃহত্তম জীবনকে প্রভাবিত করে। এই সকল লোকবিশ্বাসের প্রতিটি উপাদান সংশ্লিষ্ট জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পশ্চাৎপটে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। ... ভারতের সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণায় জাতি-প্রজাতির জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে আলোক সম্পাতের সময় লোকসংস্কৃতির উপাদানের বিশ্লেষণ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক অখণ্ডতা, সদৃশীকরণ এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার এক সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কনে দৃষ্টিপাত অতীব প্রয়োজন। ভাষাতাত্ত্বিক নৃ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচনের ভূমিকা আছে। বিভিন্ন অঞ্চল ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মানুষের মানসিকতার গতি-প্রকৃতির প্রতিফলনের স্বরূপ তার ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। এই লোকসাহিত্য ভারতের জনজীবনকে আশ্রয় করে সজীব আছে। এগুলির সুষ্ঠু সংগ্রহ কিছু কিছু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক ধ্যান-ধারণার পটভূমিকায় এদের বিচার এখন অসম্পূর্ণ। সামাজিক নৃবিজ্ঞানী লোকসাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদকে মানুষের সমাজ, ধর্ম, শিল্প ও নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনাকালে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন। কোন বিশেষ পরিবেশে এসব লোকসাহিত্যের সৃষ্টি এবং অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর প্রভেদ অনুযায়ী কিভাবে এগুলি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে সেগুলি অনুসন্ধানযোগ্য। এদের মধ্যে দেশ, কাল ও জনমানসের মনস্তত্ত্বের এক মূর্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। নৃবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বিভিন্ন রকমের প্রয়োগ কৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে সমাজ সংস্কৃতির গতি প্রকৃতির উপর আলোকপাতের একটি সুযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে অবলীলাক্রমেই ব্যবহার করা যেতে পারে। (†jvKms¯'«Zi «ek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭)

৬৯. †jvKms¯'«Z cv‡Vi f«gKv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৭০. পূর্বোক্ত, ২৮-২৯

৭১. পবিত্র সরকারের অভিমত––

লোকসংস্কৃতির নানা প্রণালি বা সিস্টেম গড়ে ওঠে, প্রত্যেকেই পরম্পরাসূত্রে অংশত স্বতন্ত্র। ... শহরে দৈনিক যাতায়াতের ফলে নাগরিক ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রার আদল ইত্যাদির সঙ্গে শুধু পরিচয় ঘটে না, সে-সব আস্তে আস্তে গ্রহণের দিকে লোকসমাজ এগিয়ে চলে। তার রচনার পদ্ধতি ও প্রতিবেশ বদলায়, তার অভিকরণের (পরিবেশনার) চরিত্র বদলে যায়, তার গ্রাহকগোষ্ঠীও পরিবর্তিত হয়। ... লোকসংস্কৃতির সৃষ্টিগুলির বাজারও বদলায়, যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ... এইভাবেই ঝাঁপান গান, গম্ভীরা, বাউল, ছউ নৃত্য, নানান ধরনের পুতুল নাচ ইত্যাদি কেবল নিছক পারফর্মেন্স বা 'অভিকরণ' হয়ে ওঠে। তার দর্শক ও শ্রোতা, এবং অবশ্যই বাজার বদলায়, তা রেডিয়োতে, টেলিভিশনে, ভিডিয়োতে, চলচ্চিত্রে কিংবা শহরের আসরে ও মঞ্চে পরিবেশিত হয়। তখন নতুন ক্রেতার কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠার জন্য এবং অভিকরণ হিসেবে নিজেকে উন্নত করার জন্য লোকসংস্কৃতি বস্তুর চরিত্রও বদলাতে থাকে। এই হস্তক্ষেপ বা ইনটারভেশন কিছুটা বা আরোপিত, কিছুটা নিজের তাগিদেই নিজের দিকে টেনে নেওয়া। আরোপিত হস্তক্ষেপের চেহারা দেখি শহুরে শিল্পী ও কারিগরের ডিজাইন গ্রামের লোকশিল্পীর হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে সেই ধরনের বস্তুনির্মাণে উৎসাহিত করা। ফরাসি বিপ্লব বা বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথের উপর পট আঁকার অনুরোধ বাংলার

পটশিল্পকে তার ঐতিহ্যগত বিষয়ের বাইরে টেনে এনেছে, এবং নতুন গ্রাহক সম্প্রদায়ের জন্য নতুন বিষয়, নতুন ভঙ্গি–সবই স্বীকার করতে হয়েছে। যাঁরা অভিকার বা 'পারফরমার', তাঁদের অভিকরনের নতুন টেকনোলজিকেও গ্রহণ করতে হয়। গ্রামের বৃত্তাকার ভুমিসীমার বদলে আয়তক্ষেত্রাকার মঞ্চের বাঁধা গণ্ডি, আলোর সুনির্দিষ্ট এলাকায় চলাফেরা, কণ্ঠস্বরকে মাইক্রোফেনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া–ইত্যাদি সজ্ঞান বিবেচনার মধ্যে তাঁদের রাখতে হয়। (†jvKms¯'…Zi b›'bZË, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৪)

৭২. পবিত্র সরকার জানিয়েছেন--

লোকসাহিত্যরূপগুলির একটি প্রধান লক্ষ্য থাকে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়া। গোষ্ঠীর বহুদিনের সম্মিলিত জ্ঞানের শিক্ষা, যাতে নতুন প্রজন্ম তার সাহায্যে গোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও আচরণকে ভালো করে বুঝতে শেখে, গোষ্ঠীর দিক থেকে কী করা উচিত বা উচিত নয় তা জেনে নেয়, কোন সময়ে কী পদ্ধতিতে কী করা দরকার তারও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে। শিক্ষাদানের চেষ্টা যেমন পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষকে হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়ার মধ্যে লক্ষ করি, তেমনই তার সঙ্গে ভাষার মধ্য দিয়ে মৌখিক নির্দেশনাও তাতে একটা বড় ভূমিকা নেয়। মা মেয়েকে রান্নাবাড়া, ব্রতপার্বণ, ঘরের নানা কাজকর্মে দীক্ষা দেয়, বাবা বা ঠাকুরদাদা সন্ততিকে বংশের বৃত্তি ও জীবিকায় দীক্ষিত করে তোলে, তাকে শিক্ষানবিশ হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু গল্পে-ছড়ায়-প্রবচনে এসব শিক্ষা নিহিত করে দেওয়ার একটা সুবিধা হল, এসব মৌখিক রচনা দূরে ছড়িয়ে পড়ে, ছাত্র-শিক্ষককে মুখোমুখি বসতে হয় না। শুভংকরের আর্যায়, সংস্কৃত লাতিনে পদ্যে ব্যাকরণ ও ছন্দ গণিত ইত্যাদি শেখানোর চেষ্টাতে লোকপ্রকরণের প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। ... এই ভাষাগত সৃষ্টিগুলি এক ধরনের আদিম দূরশিক্ষণ ... এর উপায়। এ দূরত্ব স্থানিক হতে পারে, কালিকও হতে পারে। শিক্ষক এক অঞ্চলের–তাঁর তৈরি, গল্প বা ছড়া লোকের মুখে ফিরতে ফিরতে অন্য এক অঞ্চলের ছাত্রকে শিক্ষা দিচ্ছে; আবার শিক্ষক হয়তো পাঁচশ বছর আগে রচনা করেছেন ওই ছড়া বা প্রবচন–এখনকার ছাত্র তাঁর ওই রচনা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। খনার বচন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ... নারীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে উত্তর বঙ্গের পাঁচালিতে নির্দেশরা আছে। ... এক এক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গল্প কিংবদন্তি উপকথা ইত্যাদির মধ্যে যে পুরুষানুক্রমিক মিথ তৈরি হয়ে যায়, তাতেও নানা শিক্ষামূলক উপকরণ থাকে। যেমন আসাম অঞ্চলের মিসিং-দের প্রচুর লোককথা আছে, যাতে বাঁদরদের উৎপত্তি, ভূত-প্রেতের জন্ম, আকাশ আগে নিচু ছিল–পরে কী করে উঁচু হল, ইত্যাদির বৃত্তান্ত বলা হয়েছে। ... তাদের প্রবাদে বলা হয়েছে 'মা-মরা মুরগির বাচ্চা পালন করবে না আর অনাথ/গরিব মেয়েকেও পালন করবে না। পরে দুইই কষ্ট দেবে।' ... এ সমস্ত শিক্ষাই ব্যবহারিক, গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন-চর্যাকে সুসহ করার জন্য রচিত। ... বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলের ব্রতকথার মধ্যেও অনেকক্ষেত্রে সন্তানদের এবং গৃহপালিত পশুপাখির সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্য চর্চিত হতে দেখা যায়। ভাইফোঁটাতে ভাইয়ের 'যমদুয়ারে কাঁটা' পড়বার প্রার্থনা একই লক্ষ্যে উচ্চারিত, ষষ্ঠীর ব্রত মূলত সন্তানদের কল্যাণের জন্য। ... নানা জায়গায় শীতলা ব্রত মূলত বসন্তরোগের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য উদ্‌যাপিত হয়। ... (লোকজ উপাদানে) নীতিশিক্ষার মূল্য বলে একটি আলাদা মূল্য/উপযোগিতা রয়েছে। তাকে আলাদা করার কারণ, সবসময় জীবনে ব্যবহারিক শিক্ষা আর নীতিশিক্ষা একপথে চলে না। নানা পশুকথায় যখন মাকড়সা, খরগোশ বা শেয়ালের বুদ্ধি বা চালাকির জোরে অনেক বেশি প্রবল কোনো পশুকে হারিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ আসে, তখন বোঝা যায় যে, জীবন ও সমাজে টিকে থাকার শিক্ষা সবসময় ভালোমানুষির শিক্ষা নয়। ... ঈসপ প্রমুখের 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' গোছের নীতি যেমন একদিকে কার্যকর করবার চেষ্টা হয় তেমনই অন্যদিকে, কোনো কোনো সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে, এও শেখানো হয় যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিছক সৌজন্য ও সততায় তেমন কাজ চলে না। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৬৩)

৭৩. দুজন সমালোচক এ প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন--

ক. লোকশিল্পকলার অনন্য নিদর্শন, লোককথার উন্নত সাহিত্যগুণ ও সামাজিক ইতিহাসবোধ, লোকসংগীতের নির্মল মরমি বিষাদময় অথচ প্রাণময় আবেদন, মিথকথা ও কিংবদন্তির রহস্যঘেরা জগৎ, ধাঁধা-প্রবাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ, ছড়ার ছন্দময় অভিব্যক্তি–– এ সবই শিক্ষিত নাগরিক মানুষের কাছে এক পরম বিস্ময়। (দিব্যজ্যোতি মজুমদার, †jvKms¯‹…Zi fvel¨r I †jvKvqZ gb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬)

খ. অধিকাংশ লোককারুজাত শিল্পবস্তু একই সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায়, এবং সেই সঙ্গে লোকজীবনের নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী সুন্দর হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। ... শিশুর খেলনা আর অলংকার ছাড়া লোককারুকলাতে নিছক বিনোদনমূলক সৃষ্টি দুর্লভ। শিশুর খেলনাও আবার শিশুর জন্যই বিনোদন, কিন্তু তার অভিভাবকের জন্য তা এক প্রয়োজনীয় উপকরণ–তার কিছুটা স্বস্তি ও অবসর জোগানোর বস্তু। শিশুর জন্য ... শোলার টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া ... নানান ধরনের ঝুমঝুমি, খেলার পুতুল ইত্যাদি লোকজীবনের নিজস্ব প্রয়োজন ও নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তিত হয়। ... গ্রামীণ হস্তশিল্প একই সঙ্গে বিনোদন ও প্রয়োজনসাধনের উপকরণ। নকশি কাঁথা, নানা ধরনের কারুকার্যময় শিকে, মাদুর, পিঠে ও নারখোল বা মুগডালের তক্তি' জাতযি মিষ্টি তৈরির নানা সুন্দর কাঠের ছাঁচ, বসার আসন, চেয়ার বা টেবিলের ঢাকনা, শিশুর দোলনা, নৌকার পালের নানা রং, নৌকার গলুইয়ের ময়ূর বা হাঁসের প্রতিরূপ,– ইত্যাদিতে প্রয়োজন ও বিনোদন, ব্যবহার ও সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। (পবিত্র সরকার, †jvKms¯‹…Zi b›'bZË¡, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-৩০)

৭৪. †jvKms¯‹…Z cv‡Vi fwgKv, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৭৬. †jvKms¯‹…Zi b›'bZË¡, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৭৭. পবিত্র সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন––

শ্রমসাধ্য কাজকে, খানিকটা সুসহ করে তোলার জন্য লোকসংস্কৃতির নানা বস্তু, বুলি, হাঁকডাক, ছড়া, গান ইত্যাদির ব্যবহার সমস্ত সংস্কৃতিতেই ব্যবহার হয়ে এসেছে। কোনো শ্রমসাধ্য কাজের সঙ্গে "মারো জোয়ান হেইয়ো, আউর থোড়া, হেঁইয়ো" বুলি ... উদাহরণ। এই কর্মসহায়ক লোকসৃষ্টিই আবার প্রায় গানে রূপ পায়। তার একটি আধা নাগরিক রূপ দেখি সলিল চৌধুরীর "হেঁইয়ো হো হো হেঁইয়ো–হো মাঝি ভাই-ও, বাইয়ো ও নাও বাইয়ো, খর নদীর ওপারে স্বপনের দেশে যাইয়ো" গানটিতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পালকিবাহকদের বিষয়ক দুটি কবিতায় তাদের চলার ছন্দটি যেন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ... ভারতে ছাদপিটুনি কামিনরা যখন ছাদ পেটাতে পেটাতে গান গায়, তখন তাদের গানের ছন্দের সঙ্গে তাদের কাজের তাল মিলে যায়। সেই তালে তালে তাদের হাতের চ্যাপটা মুগুর ছাদের উপর পড়তে থাকে। বাংলা পল্লীগীতি "চিড়া কুটি চিড়া কুটি আমগাছের তলেতে, ও দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে"-তে উদখুলে চিঁড়ে কোটার ছন্দটি চমৎকার ধরা পড়েছে। ... কর্মসঙ্গীত যে সবসময় শুধু ভারী কাজের ছন্দের সঙ্গে গাঁথা হয়ে একই ধরনের হাঁকডাক বুলিতে তৈরি হবে তা নয়, ... পূর্ববাংলার মাঝি নৌকোর হাল ধরে বিষণ্ন বিকেলে গায় বিরহের ভাটিয়ালি–আমি হাড় কালা করলাম রে/ আমার দেহ কালার লাইগ্যা রে,/আমি অন্তর কালা করলাম রে/ দুরন্ত পরবাসী।" শুধু যে কাজের ছন্দের গানে প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য গানে পরোক্ষভাবে শ্রমলাঘবের একধরনের মানসিক প্রয়াস ফুটে ওঠে তা নয়। কোথাও কোথাও গল্পকেও ব্যবহার করা হয় এ কাজে। ... নদিয়াতে চাষিরা ধান বা পাটের খেত নিড়োবার সময় পাশাপাশি ছ-সাতজন বসে কাজ করে। প্রখর রোদে এই যান্ত্রিক ও ক্লান্তিকর কাজের মধ্যে তারা অনেক সময় এক ধরনের মানসিক বিরাম খুঁজে নেয় ধারাবাহিক গল্প বলার মধ্য দিয়ে। প্রথম চাষিটি একটি গল্প শুরু করে কিছুক্ষণ পরে তার সুতো দ্বিতীয় চাষিটির হাতে

ছেড়ে দেয়। তখন দ্বিতীয় চাষিটিই গল্পের বিস্তার করতে শুরু করে। ... এইভাবে প্রত্যেক চাষিই পালা করে গল্প বলে এবং গল্প বলতে বলতে দিনের কাজ শেষ হয়। ... অবশ্যই কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার সংস্কৃতিবস্তুটি কী হবে–হাঁক, না সংগীত, না নাচ, না গল্প; ... অসংখ্য সংস্কৃতিবস্তুর এই শ্রমসহায়ক ভূমিকা বা মূল্য অগ্রাহ্য করার মতো নয়। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭৪)

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের অন্বেষণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের অন্বেষণ

অজস্র লোকজ উপাদানের সমাহারে বাংলার লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আবহমানকাল থেকে কৃষিপ্রধান বাংলার ভূমিনির্ভর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ আয়োজনে লোকসংস্কৃতির নিবিড় উপস্থিতি লক্ষণীয়। গ্রামীণ লোকসমাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত যে, একে বাদ দিয়ে তাদের জীবনধারার রূপরেখা অনুধাবন অসম্ভব। ভূমিকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার নির্দিষ্ট ধরন এশিয়া মহাদেশে বিদ্যমান সামন্ততন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য, যা ভারতবর্ষে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহুকাল ধরে নির্দিষ্ট রাষ্ট্র, রাজ্য বা ভূ-খণ্ডের প্রধান শাসক এবং তার অনুগত জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ফসল ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। বংশপরম্পরাগত বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বৃত্তিনির্ভরতাও লোকসমাজের বাসিন্দাদের অনিবার্য জীবনবাস্তবতা। পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকসমাজের জীবিকা নির্বাহে প্রকৃতিনির্ভরতার প্রভাব অনস্বীকার্য। বিশ্বের বৃহত্তম গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের অংশ হিসেবে পলিমাটি দ্বারা গঠিত সমতল অববাহিকার বাসিন্দারা জীবনধারণের তাগিদে ভূমির পাশাপাশি নদী, সাগর এবং জলাশয়ের ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। সেকারণে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ঐতিহ্যবাহী পেশানির্ভর প্রান্তিক মানুষের বিবিধ কর্মকাণ্ডের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তাদের চিন্তাচেতনা, মনোভঙ্গি এবং জীবনধারায় লোকসংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। শখ মেটানোর তাগিদ, চিত্তবিনোদনের মাধ্যম বা জীবিকা ধারণের অনুষঙ্গ হিসেবেই শুধু নয়, বরং ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ এবং অন্তর্গত সৃষ্টিশীলতা তাদেরকে লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী করে তোলে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ লোকজীবনের আলেখ্য রূপায়ণের সচেতন প্রবণতা ঔপন্যাসিকদের লেখনীর অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে।[১] গ্রামীণ পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠার পাশাপাশি এখানকার মানুষ ও ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে আন্তরিক সংযোগ এবং সংস্কৃতির প্রতি বিমুগ্ধতা তাঁদের শিল্পদৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ অভিনিবেশ পেয়েছে।[২] সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি এবং গড়নগত প্রবণতা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিষয়গৌরবে গুণান্বিত এবং শিল্পসফল অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ সমাজ এবং এসবের প্রতিপাদ্য লোকজীবনের রূপরেখা প্রণয়ন।[৩] ষাটের দশকে ঢাকাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে নগরব্যবস্থা বিকশিত হতে থাকলেও ঔপন্যাসিকরা চল্লিশের দশকের শেষভাগ থেকেই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের ভূমিনির্ভর জীবনপ্রবাহকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সমকালীন বাস্তবতার সমন্বয়ে উজ্জীবিত হয়ে উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন।[৪] এ অভিসন্দর্ভভুক্ত উপন্যাসসমূহের আলোকে বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজের পরিচয়[৫] তুলে ধরতে গিয়ে তাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত যেসব উপাদানকে তাৎপর্যপূর্ণরূপ চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপনে আমরা এ পর্যায়ে অগ্রসর হব।

১. লোকবিশ্বাস-- লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন উপাদান লোকবিশ্বাস, যার সঙ্গে আদিম কৌমজীবী মানুষের সম্পৃক্ততার সূত্রপাত ঘটেছে সভ্যতার উন্মেষলগ্নে। যতই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ, সামাজিক বাস্তবতা, ভৌগোলিক পরিসর ও লোকসমাজের গড়ন, ভাবনা-মানসিকতা অনুযায়ী বিশ্বাসের ধারায় রূপান্তর ঘটেছে। বিশ্বাস যে কোনো বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি বা প্রসঙ্গকেন্দ্রিক হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস যখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের নিকট কোনো কারণে স্বীকৃতি পায় এবং যুগ যুগ ধরে তাদের আচার-আচরণ, আলাপ, এমনকি মনোলোকেও প্রভাব বিস্তার করে, শুধু তখনই তা লোকবিশ্বাস হিসেবে গণ্য হয়। শিক্ষা ও যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক ঠিক বিপরীত। বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, 'সংহত সমাজের মানুষের মনে স্থান না করে নিতে পারলে বিশ্বাস কখনো লোকবিশ্বাসে পরিণত হতে পারে না। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে লোকবিশ্বাসের মূল পার্থক্য এখানেই। তাছাড়া লোক-বিশ্বাস যে নিরক্ষর ব্যক্তি মনেই অবস্থান করে, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন তথাকথিত শিক্ষিতজনের মনে অবস্থান করে না এমন কথাও যুক্তিসঙ্গত নয়।'[৬] বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানী এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন--

Dhaka University Institutional Repository

ক. একই ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক পরিবেশে একই রূপ আচার আচরণ ও জীবনচর্চায় অভ্যস্ত সংহত জনসমষ্টির মধ্যে যা বিশ্বাস বলে গৃহীত হয়, তাই হ'ল লোকবিশ্বাস।[৭]

খ. বিশ্বাস মনোজ। বস্তু বা বিষয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। বস্তু-বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতীতি যখন সত্য ও বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তখন তা বিশ্বাসের অঙ্গ হয়েও জ্ঞান নামে অভিহিত, কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব, বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে ... তখন বিশ্বাসের জন্ম হয়।[৮]

গ. বিশ্বাস প্রাথমিকভাবে একটি মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র। কোনও কিছুর অস্তিত্ব বা অবহিতিকে স্বীকার করাকেও বিশ্বাস বলে অভিহিত করা যায়। ... লোকবিশ্বাস মূলত লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে একটি স্তর মাত্র। কারণ লোকবিশ্বাসে কোনও বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা মানসিকতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৯]

মযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে লোকবিশ্বাসের উদ্ভব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে--

> বিশ্বাস কখনো বস্তুভিত্তিক হতে পারে, কখনো হতে পারে সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যখনই কোনো অনধিগম্য, আশ্চর্য ও বিশাল কিছু মানুষ দেখেছে, যেমন পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, বন, সূর্য, চন্দ্র কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, বজ্র, প্লাবন, ভূমিকম্প, দাবানল অথবা মহামারী, যার মধ্যে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাভাবনা দিয়ে তার সামগ্রিকতা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই এসব সম্পর্কে সে তার একটি ধারণা বা বিশ্বাস গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে এবং কালে কালে পরবর্তী সমাজে চলে এসেছে। এভাবেই বিশ্বাসগুলো সমাজে স্থিত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ যতই বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনাকে আয়ত্ত করতে শিখেছে, ততই এই বিশ্বাসগুলো শিথিল হয়ে এসেছে–এভাবে অনেক বিশ্বাস সভ্য সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দেশে দেশে যুগে যুগে এই লোকবিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন ধর্ম। মৃত্যু এবং মৃত্যুভয় লোকবিশ্বাসের জন্মে ও লালনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়েই জন্মকেও শাসন করেছে। শিশু যখন মায়ের পেটে তখন থেকেই নানাবিধ বিশ্বাস তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য, তার নিরাপত্তা এবং তার নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ জন্ম। জন্মের পরও তাকে নিয়ে বা প্রসূতিকে নিয়ে বিশ্বাসের অন্ত নেই।[১০]

এর সঙ্গে জীবেশ নায়ক প্রদত্ত বক্তব্যকে মিলিয়ে নিলে লোকবিশ্বাসের উদ্ভব এবং লোকসমাজে এর প্রবল দাপটের স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব --

> লোকসমাজের পটভূমিতে বিচার করতে গেলে বিশ্বাসকে সংস্কারের প্রাথমিক অবস্থা রূপেই গণ্য করতে হয়। ... বিশ্বাসগুলির উদ্ভবের কারণ হল যে কোন ক্রিয়ার হেতু অনুসন্ধান বা কার্যকারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা। প্রাচীন যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহের ও আত্মরক্ষার তাগিদে সদা সতর্ক থাকতে বাধ্য হত। নাহলে অসতর্কতার মূল্য দিতে হত প্রাণ দিয়ে। ... আদিমানব বিশ্বাসে ভর করেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। অন্য ভাষায় বলা যায়, মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টার অংশ রূপে বিশ্বাসগুলিকে পেতে ও সযত্নে লালন করতে শুরু করেছিল। তাই একথা স্বীকার করতে হবে যে বিশ্বাস মানবজীবনের প্রয়োজনে মানব-প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়ে, এদের উভয়কে একযোগে নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত করার মৌল ভিত্তিরূপে কাজ করেছিল। ... বিশ্বাসের ধর্ম এই যে তা অমান্য করলে আত্মগ্লানির সম্ভাবনা ছাড়া অন্য শাস্তির বিধান নেই।[১১]

বৈশিষ্ট্য--

বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকবিশ্বাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–

১. লোকবিশ্বাস খুব সাম্প্রতিক কালেরও হতে পারে এবং হয়।

২. লোকবিশ্বাস ... একান্তভাবে একটা ধ্যান-ধারণা মানসিক ক্রিয়া মাত্র, এর সঙ্গে আচার-আচরণের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

৩. লোকবিশ্বাস অনুসৃত না হলেও তেমন কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় না।

৪. লোকবিশ্বাসে যুক্তির প্রভাব কার্যকর হয় না।

৫. লোকবিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক খুবই কম, নেই বললেই চলে।[১২]

এ প্রসঙ্গে জীবেশ নায়কের অভিমত--

১. বিশ্বাসের ভিত্তি যেমন দুর্বল তেমন অস্থির।

২. বিশ্বাসসমূহের বিবর্তন আছে। বিবর্তনের ধারায় কিছু বিশ্বাস অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে ধীরে-ধীরে সমাজ-মন থেকে মুছে যায়। কিন্তু সেই শূন্যতা পূরণের জন্য নবতর বিশ্বাসের উদয় হয়।

৩. বিশ্বাসগুলির মধ্যে কতক সমাজ-মনের স্থায়ী আসন পেয়ে গেলে সংস্কারে পরিণত।

৪. বিশ্বাসগুলি ব্রতাচারের ভিত্তি হলেও ঐতিহ্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত নয় বলে তুলনায় দুর্বল।

৫. লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাসগুলি কখনোই ক্রিয়া-নিরপেক্ষ হয় না। ... বরং কিছু বিশ্বাস মানব সমাজের সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। এইরকম বিশ্বাস ঐতিহ্যবাহী। এগুলির সর্বজনীন আবেদন দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে টিকে থাকার বিবিধ শর্ত পূরণ করে তবেই অন্যের সঙ্গে সমতা প্রকাশ করে।

৬. বিশ্বাসসমূহের অধিকাংশই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। সামাজিক রীতি, প্রথা, আচার-বিচার, জীবন ও পেশার দাবি মেনে নিয়েই বিশ্বাসের অস্তিত্ব। যারা এসব বিশ্বাস মেনে নেয়, তারা যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে উঠেই এসব মেনে চলে।

৭. বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু যৌক্তিক এবং অন্যগুলিকে অযৌক্তিক বলে গণ্য করাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অমঙ্গল রোধকারী বিশ্বাস জন্ম নেয় মানবমনে মঙ্গলের কামনা বলবর্তী থাকলে। তাই স্থান, কাল ও পাত্রভেদে, আধুনিক যুগে, বিশ্বাসের রূপান্তর ঘটতে পারে। সেগুলির তাৎপর্যও বদলে যেতে পারে। লোকসমাজের কামনা-বাসনার অনুরূপ বলে বিশ্বাসগুলির অভিপ্রায় সর্বদাই সদর্থক।[১৩]

লোকবিশ্বাসের উৎস ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে গোষ্ঠীভুক্ত বাসিন্দাদের জীবনবাস্তবতা, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড ও বসবাসের বিশিষ্ট ধরন, তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও মানসলোকের স্বরূপ অনেকটাই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। লোকসমাজে বিশ্বাসের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভে জাদুক্রিয়া ও বিভিন্ন ধর্মীয়-গুপ্ত আচার পালনও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন বিশ্বাস থেকে যেসব সংস্কার ধীরে ধীরে লোকসমাজে সম্প্রসারিত হয়েছে, তার প্রভাব গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জীবনপ্রবাহকে দুর্দান্ত দাপটের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা, এসব বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পারলৌকিক কল্যাণ, ব্যক্তি-পরিবার-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের নিরাপদ, নিশ্চিন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা, সকল অশুভ, বৈরী, অনিষ্টকর শক্তি ও পরিস্থিতির কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। নির্দিষ্ট একটি লোকসমাজে লোকমনের স্বরূপ ও তার গতি-প্রকৃতি সম্যক উপলব্ধি করার জন্য বিশ্বাসের জগতটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া জরুরি। ধর্মের পরিসর বাদ দিলে লোকবিশ্বাস লোকসমাজের বাসিন্দাদের সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলেও অবাধ প্রবেশাধিকার রাখে। কারণ নিয়তিতাড়িত, অসহায়, পরকালবিশ্বাসী নিরক্ষর মানুষ নিজের ভীত-সন্ত্রস্ত মনকে বলশালী করতে, নিজের ওপর আস্থা পোষণের জন্য সচেতনভাবে, এমনকি নিজের অজান্তেই প্রচলিত বিশ্বাসকে মান্য করে।

বিশ্বাসগুলি ব্যবহারিক জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। দৈবশক্তির প্রতি আস্থা বিশ্বাসের জোর বাড়ায়। তাই মানুষের মনে নিশ্চেষ্টতার বৃদ্ধি ঘটে। বিশ্বাসের সংস্কারে পরিণতি, লোকসমাজে পরম্পরা সৃষ্টি করে এবং প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে। লোকসংস্কৃতিতে বিশ্বাস ও সংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আধুনিক শিক্ষিত প্রজন্মের কাছে লোকবিশ্বাসের মূল্য যত নগণ্যই হোক না কেন, তাদের অবচেতনমনেও লোকবিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে যা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

২. লোকসংস্কার-- বিশ্বাসেরই সম্প্রসারিত রূপ লোকসংস্কার,[১৪] যা লোকসমাজে প্রবল দাপট দেখিয়ে সেই আদিমকাল থেকেই মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঠিক কবে থেকে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের উৎপত্তি সঠিকভাবে সে সম্বন্ধে কিছু বলা না গেলেও অনুমান করা যায়, সংস্কার এবং বিশ্বাস অতি প্রাচীন। অনেকের মনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সংস্কার প্রধানত নিরক্ষর লোকসমাজে ও অল্পাধিক পরিমাণে সভ্য-শিক্ষিত সমাজেই প্রচলিত। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়।[১৫] সংস্কারের আভিধানিক অর্থ ও ভারতীয় সমাজের পটভূমিতে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষিত হয়েছে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বক্তব্যে। জীবেশ নায়ক জানিয়েছেন--

> বাংলা ভাষার অভিধানে 'সংস্কার শব্দের একটি অর্থ দেওয়া আছে 'স্বভাবসিদ্ধ স্থায়ীভাব'। একই সঙ্গে কিছু সামাজিক কৃত্যকে (দশটি) সংস্কার শব্দে নির্দেশ করেছেন। এই দ্বিতীয় অর্থটি দীর্ঘকাল ধরে বহুলভাবে প্রচলিত। ... স্বাভাবিক বিবেচনায় যা অবস্থার বিকাশ বা সদর্থক উন্নতি বা উৎকর্ষ বোঝায়। তা কেবল মনেই থাকে না–সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অংশ রূপে আচরিত হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক তথা পারিবারিক অনুষ্ঠানেই মূর্ত হয় না, লঙ্ঘিত হলে ব্যক্তি ও সমাজ মনকে আহত করা হয়। ভারতীয় ধারণায় এগুলি সংস্কার নামেই স্বীকৃত। সংস্কারের আক্ষরিক অর্থ হল পূর্ব-কর্ম-বাসনা বা অনুভব। শাস্ত্রবিহিত দশ সংস্কার সমাজে জন্মচক্র সূত্রে অবশ্য পালনীয় কৃত্য বা অনুষ্ঠান। ... সামাজিক সংস্কারগুলির মূলে কোন-না-কোন বিশ্বাসের অবস্থান। কতগুলি বিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে ঘনীভূত হয়ে সামাজিক অলঙ্ঘনীয় আচারে পরিণতি পায়। ফলে নির্দ্বিধায় এসত্য স্বীকার করতে হয় যে বিশ্বাসের দৃঢ় সামাজিক ভিত্তি স্থাপিত হলে তা সংস্কাররূপে স্থায়ী হয়। বিশ্বাস লোকসমাজে যে স্তরে উন্নীত হলে সমাজের সাধারণ স্বীকৃতি পায়। সংস্কারের সমবেত সামাজিক ক্রিয়াশীলতা লক্ষণীয়। ... কি ধরনের বিবাহ বিধেয় বা পিতামাতার পারলৌকিক কৃত্য কিভাবে সম্পন্ন করবে, তার সমাজ বিহিত রীতি মানাই সংস্কার। লোকসমাজে সেজন্যই সংস্কারের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।[১৬]

ওয়াকিল আহমদ লোকসমাজে সংস্কারের উদ্ভবের কারণ এবং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানিয়েছেন--

> সকল সংস্কারের মূলে আছে অমঙ্গল চিন্তা। অর্থহানি, স্বাস্থ্য হানি, শাস্তিভোগ, বিচ্ছেদ-বিড়ম্বনা ও বিপদ-আশঙ্কা থেকে অমঙ্গল চিন্তার উদ্ভব। অকল্যাণের মূলে আছে অপদেবতার কোপ, শয়তানের দুষ্ক্রিয়া, ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি। এদের প্রভাব থেকে মুক্তি প্রয়োজন। লৌকিক উপায়ে মুক্তির দুটি পথ–মন্ত্র ও ক্রিয়া। কিছু ক্ষেত্রে শ্লোক, ছড়া, গান ও ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা হয়, কতক ক্ষেত্রে লৌকিক আচরণ ও বাহ্যবস্তুর প্রয়োগ দ্বারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়। এসবই লোকসংস্কার। ... মানব মনের বিচিত্র রহস্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে শুভাশুভ বাছ-বিচার মূল্যবান উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে। ... আমেরিকার লোকসংস্কারে ডানদিকে হাঁচি পড়া সৌভাগ্যজনক, বামদিকে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। খাবার সময় হাঁচি পড়লে গৃহে অতিথি আসে। অতএব তা মঙ্গলজনক। সকালে শয্যা ত্যাগের আগে বিছানায় হাঁচি পড়া অমঙ্গলজনক। ... সংখ্যা ও প্রতীক চিহ্ন সম্পর্কেও শুভাশুভের ধারণা আছে। শূন্যসংখ্যা বা গোলচিহ্ন অশুভজনক। এক, তিন, পাঁচ, সাত নয় প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যা শুভজনক। বিবাহ-অনুষ্ঠান, বরণ-উৎসব ও ধর্মকর্মে বিজোড় সংখ্যার ব্যবহার বেশি। মুসলমানের বিবাহে তিনবার কবুল করতে হয়। হিন্দু বিবাহ-বাসরে বর-বধূকে সপ্তপদ গমন করতে হয়। খ্রিস্টান সমাজে 'তের' সংখ্যাকে অশুভজনক বলা হয়; কারণ ঐদিন যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হন। হিন্দুসমাজে স্বস্তিকা শুভচিহ্ন, ক্রুশচিহ্ন খ্রিস্টান সমাজে পবিত্রতার লক্ষণ। পদ্ম বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র।[১৭]

বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানী লোকসংস্কারের সংজ্ঞা দিয়েছেন--

ক. লোকসংস্কার হ'ল সেসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে।[১৮]

খ. কতক লোকবিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলি মনের গভীরে স্থান পায়। আচরণসিদ্ধ, প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসের এ স্তরকে আমরা 'সংস্কার' নাম দিতে পারি।[১৯]

গ. লোকসংস্কার প্রধানতঃ নিরক্ষর লোকসমাজে ... ও অল্পাধিক পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত সমস্ত বাহ্যিক কর্মকাণ্ড, যথা– অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণাদি ও অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াদি, যথা– ধারণা, বিশ্বাস, প্রবণতা ও সহজাত প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে এমন সব উপাদানের নাম, যার মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা অযুক্তির প্রাধান্যই বেশী।[২০]

বরুণকুমার চক্রবর্তী বিস্তৃত পরিসরে লোকসংস্কারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করেছেন--

১. লোকসংস্কারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিচারশক্তি শূন্যতা।

২. লোকসংস্কারে ঐক্য এবং বৈষম্য দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন লোকসংস্কারের মধ্যে গভীর ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

৩. লোকসংস্কারের সঙ্গে ঐতিহ্য এবং ঐহিক কল্যাণ লিপ্সাও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কারণ লোক-সংস্কারের মূল থাকে গোষ্ঠীচেতনার গভীরে। পুরুষানুক্রমে যা লোকসমাজে বিশ্বস্তভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে।

৪. লোকসংস্কার সুপ্রাচীন, অতীতকাল থেকেই তা চলে আসছে, বর্তমানে তা প্রচলিত থাকলেও লোকসমাজের বাসিন্দারা সেগুলি না বুঝেই মেনে চলে।

৫. লোকসংস্কারের মূলে কাজ করে ঐহিক শুভাশুভ বোধ।

৬. সংস্কার প্রাচীন কালে উদ্ভূত হলেও আধুনিক কালের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থাতেও নতুন রূপে এর প্রচলন ও সম্প্রসারণ ঘটে।

৭. সংস্কারের মূল বর্তমানে অজ্ঞাত বা বিস্মৃত হলেও তা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত না হয়ে বরং পরিবর্তিতরূপে বর্তমানে প্রচলিত থাকে।

৮. লোকসংস্কারে যুক্তির বন্ধনকে অস্বীকার করা হয়।

৯ লোকসংস্কারের অংশীদার সংহত সমাজ। ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাস বা সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তবে লোক-সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী। ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা সংস্কার ব্যক্তির নিজস্ব আবিষ্কার, কিন্তু লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার সংহত সমাজের আবিষ্কার।

১০. লোকসংস্কারের সঙ্গে কিছু আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। লোকসংস্কারের উৎপত্তির মূলে অনেকক্ষেত্রেই ধর্মবোধ বা শাস্ত্রনির্দেশও কাজ করে।

১১. আপাতভাবে সংস্কারগুলি অর্থহীন বলে মনে হলেও এমন অনেক সংস্কার আছে যেগুলির যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। তবে যুক্তিগ্রাহ্য সংস্কারগুলির বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃত কারণ গোপন রেখে অন্যবিধ কারণের উল্লেখ। মূলত এসব ক্ষেত্রে অমঙ্গল অথবা অন্য কোন ক্ষতির সম্ভাবনার বিষয়ই উল্লিখিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হল প্রকৃত কারণ এসব ক্ষেত্রে গোপন রাখার কারণ কি? ... প্রকৃত কারণ বা উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি সাধারণ মানুষের দ্বারা অনুসৃত বা পালিত হত না। যা অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট তার প্রতি মানুষের এক প্রকার স্বাভাবিক ভয়মিশ্রিত অনুচিকীর্ষার মনোভাব বিদ্যমান থাকে। সব সংস্কার যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও অনেক সংস্কারই যুক্তিগ্রাহ্য, বিশেষত নিষেধাজ্ঞা সূচক সংস্কারগুলি। যেমন-- শাঁখ খালি মেঝেয় রাখতে নেই। এর কারণটি হল খালি মেঝেয় শাঁখ রাখলে তা মেঝেয় ঘষে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা। সেইজন্যই কোন কিছুর ওপর শাঁখ রাখতে হয়। স্বর্ণালঙ্কার হারানো খুবই অমঙ্গলজনক বলে প্রচলিত। আমরা জানি সোনা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। তাই স্বর্ণনির্মিত মূল্যবান অলংকার ব্যবহারকারী বা অলংকারের অধিকারী যাতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন সেইজন্যেই সংস্কারটির উদ্ভব।

১২. একই বিষয় নিয়ে কিংবা একই উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট সংস্কারের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সংস্কারের তুলনামূলক আলোচনায় সেই সত্য উপলব্ধি করতে প্রয়াস পাব। পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংস্কার সূত্রেও যে আমরা ঐক্যবদ্ধ, সেই পরিচয়টুকুও লাভ করব। ... খেতে বসে গান গাওয়া ঠিক নয় কারণ তাতে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হন। আমাদের দেশের প্রচলিত এই সংস্কারের সঙ্গে অন্যান্য দেশে অবশ্যই খেতে বসা অবস্থায় গান গাওয়া সম্পর্কিত সংস্কারের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন ইংল্যান্ডে খাবার টেবিলে গান গাইলে কর্মক্ষেত্রে তার মৃত্যু ঘটে বলে বিশ্বাস, অন্য এক সংস্কারে বলা হয়েছে অবিবাহিতা মেয়ে যদি খাবার টেবিলে বসে গান গায়, তাহলে তার কপালে জোটে মাতাল স্বামী। ফরাসিরা বিশ্বাস করে খাবার টেবিলে গান গাইলে দারিদ্র্য দেখা দেয়, আবার আমেরিকানদের সংস্কারে একই কারণে কার্যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। মোটের ওপর খেতে বসে গান গাওয়া ব্যাপারটা যে মোটেই ভাল নয় এবং এর পরিণাম যে কখনই ভাল হয় না, সেই মূল বক্তব্যটিই এই সব সংস্কারগুলিতে প্রতিফলিত।

১৩. সংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল স্ববিরোধিতা। অর্থাৎ যে উপাদানের ব্যবহার বা অনুষ্ঠানের আয়োজন কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সুখকর, সেই একই উপাদানের ব্যবহার বা অনুষ্ঠানের আয়োজন অন্য ক্ষেত্রে অশুভ বলে বলা হয়েছে। এর কারণ হলো সংস্কার মূলত বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, বিশ্বাসের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু এগুলি সচেতনভাবে সৃষ্ট নয় এবং সর্বাংশে বিজ্ঞানভিত্তিক নয় কিংবা বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দ্বারা পরীক্ষিত নয়, তাই একই উপাদানের ব্যবহারগত প্রতিক্রিয়া কিংবা একই আচরণ অথবা অনুষ্ঠানের পরিণাম ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পেরেছে। ... 'তিন' সংখ্যাটি অশুভ বলে সংস্কার। দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস দিতে নেই, দিলে শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি তিন সত্যি করে কিছু বলে, তবে তা সত্য বলেই গৃহীত হয়। তিনজনের বিশেষতঃ তিন ব্রাহ্মণের একসঙ্গে যাত্রা নিষেধ। আবার ভগবানের আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রার্থনা শেষে তাঁর উদ্দেশে তিনবার প্রণতি জানান হয়। অশুভ শক্তিকে তাড়াতে বা তার হাত থেকে মুক্তি পেতে অশুভ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর বিশেষ কোন দ্রব্য তিনবার নাড়ানোর রীতি। ... কোনো মৃতদেহ আবার তিনজন ব্যক্তি বহন করতে পারে না। তিনটি জিনিস কখনই এক সময়ে করা উচিত নয়। কোন কৃষক তার ফসল তিন জায়গায় সঞ্চয় করে রাখে না। শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য সময়ে তিন ব্রাহ্মণে একসঙ্গে আহারে বসে না।[২১]

বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রতিতুলনার মাধ্যমে এসব লোকজ উপাদানের প্রতি লোকসমাজের অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন--

> লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার উভয় ক্ষেত্রে মূল কথা হলো বিশেষ কার্য বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত একটি সুনির্দিষ্ট কারণের অনুসন্ধান। সেদিক দিয়ে বলা চলে, মানুষের বিজ্ঞান চেতনার প্রথম স্ফুরণ ঘটে লোক-বিশ্বাস, বিশেষত লোকসংস্কারে। কারণ বিজ্ঞান আমাদের প্রথম যে পাঠ দেয় তা হল– জাগতিক ব্যাপারে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই। প্রতিটি কার্যই সুনির্দিষ্ট কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ... সেই কার্য-কারণ সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত নয়। সংহত সমাজের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ বুদ্ধি তথা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণে ব্রতী হয়েছে। ... মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্বাস এবং সংস্কারের মূল্য অনেকখানি। যেমন সংহত সমাজে যা নাকি শুভ বলে চিহ্নিত, যা দেখে গৃহে যাত্রা করলে যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস, সেই বস্তু বা প্রাণীর দর্শনে মানুষ অনেকখানি বল পায়, যে বল তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে বহুলাংশে সহায়তা করে। আবার বিপরীতক্রমে যা অশুভ বলে স্বীকৃত সেই বস্তু বা প্রাণীর অদর্শনে মানুষের মনে এমন এক বিপরীত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার ফলে তার আত্মবিশ্বাস অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়। সাফল্য লাভের পথে তা গুরুতর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। [২২]

সংস্কার মান্য করে মানুষ সৌভাগ্য বা সুফল নিশ্চিত করে এবং দুর্ভাগ্য প্রতিহত করার সান্ত্বনা পায়। সংস্কার যেখানে যেভাবে রয়েছে, সেভাবেই তাকে রক্ষা পেতে দিলে সামাজিক জীবন সুস্থির থাকতে পারে। মনে করা হয়, সৌভাগ্যই সঙ্গে থাকবে, দুর্ভাগ্য দূরে সরে যাবে। এক কথায় সংস্কারগুলি সৌভাগ্যের রক্ষাকবচ। বাস্তবে ক্ষয়, ক্ষতি, কলহ, অস্বস্তি এড়িয়ে চলার জন্য স্থান-কাল-পাত্র সীমার মধ্যে নানা পালনীয় বিধি সংস্কাররূপে প্রচলিত থাকে। এগুলি ঠিক বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে না, বরং সদাচার বা স্বেচ্ছানুশাসন বলা যায়। শোওয়া-বসা, উঠা-পড়া, খাওয়া-পড়া, চলা-ফেরা, বাঁচা-মরা ইত্যাদি প্রাত্যহিকতায় এদের মূল্য ও মান্যতা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক নিয়মেই এরা টিকে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কার-বিধি পর্যালোচনা করলে বহু পূর্ণ ও আংশিক সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের জীবনচক্রে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে প্রধান ঘটনা। ফলে এসব পর্যায়কে কেন্দ্র করে সংস্কারের প্রচলনও সবচেয়ে বেশি। এদের সঙ্গে যুক্ত থাকে আরো অজস্র গৌণ বা সম্পূরক সংস্কার।

> সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-বিচার, প্রকৃতি ও ভৌম সংস্থান, জীবিকা ইত্যাদির পার্থক্য থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য ঘটে। ... লোকসমাজের জীবনবৃত্তকে বেষ্টন করে রয়েছে বিশ্বাস ও সংস্কারের নিপুণ জাল। এই জাল বয়নে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ, জীবনের শুভাশুভ নিয়ন্ত্রণের শক্তিতে বিশ্বাস। সেই শক্তির আচার-আচরণ ও চলাচল সম্পর্কে অনুমান থেকে বিবিধ সৃষ্টিকথা ও পুরাণের উদ্ভব। এ সব মিলে গিয়ে বিশ্বাসের ভিত্তি পেয়েছে ঐতিহ্যবাহী সমাজে। তা ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তা পেয়ে সংস্কারে পরিণত হয়েছে। ... লোকমানসে সংস্কার যতই দৃঢ়মূল হোক, সমাজ বাস্তবতার পরিবর্তনে তার কিয়দংশ লোপ পায়, কিছু পরিবর্তন স্বীকার করে নেয়। আর কবাকি কিছু সামঞ্জস্যবিধানের জন্য নতুন যুক্তির সন্ধান করে। ... বিশ্বাস ও সংস্কার সামাজিকের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। পারস্পরিক অভ্যাসের পথে সংস্কার মজ্জাগত হয়ে যায়; তার বেশি কোনো যুক্তি খোঁজা চলে না। সংস্কারেরর প্রয়োগ ও তার সামাজিক গুরুত্ব সাধারণ যুক্তিতে ব্যাখ্যা হয় না। সামাজিক রীতি, প্রথা, আচার-বিচার ও ধর্মের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। সেখানেই তার জোর এবং সেজন্যই তারা সুস্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপেক্ষা করেও স্বচ্ছন্দে প্রচলিত থাকে।[২৩]

পৃথিবীর পৌত্তলিক ধর্মসমূহ তো বটেই, একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোও কোনো না কোনোভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লোকসংস্কারের উপাদানকে আত্মসাৎ করেছে। সভ্য-অসভ্য সকল মানুষের চেতনা ও মননের মধ্যে যেসমস্ত বিশেষ ধারণা, ঝোঁক, প্রবণতা বা বিশ্বাস দেখা যায়, তা এত বিচিত্র যে সহজে তার পরিমাপ করা যায় না। বিশ্বের সমস্ত দেশ, মানব-গোষ্ঠী, উপজাতিসমূহ প্রভৃতির লোকবিশ্বাস, লোক-প্রথা, লোক-উৎসব, লোকাচার শিষ্টাচার বিনিময়, মানব-সম্পর্ক যাদুবিদ্যাগত কর্মসূচী ও লোকচিকিৎসা বিধি লোকসংস্কার থেকে উদ্ভূত হয়েছে।[২৪] লোকসংস্কারের বহু বিষয় আদিমকাল থেকে একালে এসে পৌঁছেছে, আবার প্রাচীনকালের অনেক লোকসংস্কার হারিয়েও গেছে।

এছাড়া লোকসংস্কার অন্যান্য বহু বিষয়ের মত দেশ-কাল পাত্রের ধার ধারে এবং সঙ্গত কারণেই আদিমকাল ও মধ্যযুগে লোকসংস্কার যেভাবে বেঁচে ছিল, একালে আর তা নেই।

> বিশেষ কালে বিশেষ ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অওতায় এক এক ধরনের লোকসংস্কার গড়ে ওঠে, আবার বিনষ্টও হয়। ... কিন্তু এস্থলেও মনে রাখা দরকার, লোকজীবনে পরিবর্তন আসে সবার শেষে আর সেকারণেই বহু আদিম সংস্কারও আকস্মিকভাবে লোকসমাজে খুঁজে পাওয়া যায়। ... কোন বিশেষ কাজমাত্রই লোকসংস্কার নয়। লোকসমাজের সামাজিক বিচার ও শাস্তিদানের ঘটনার মধ্যে লোকসংস্কার বিদ্যমান, কিন্তু বিচার বা শাস্তিটাই লোকসংস্কার হতে পারে না। তেমনি বাংলার হিন্দু-মুসলিম সমাজে বিবাহ একটি ধর্মীয় ব্যাপার, কিন্তু বিবাহের বহু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই লোকসংস্কার বর্তমান, তবে বিবাহ ব্যবস্থাটি লোকসংস্কার নয়। ... সব লোকসংস্কারই অযৌক্তিক নয়, যেমন– সকাল বেলায় গৃহাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করে গৃহস্থ বা বাড়ীর গৃহিণী কোথাও যাত্রা করেন না বা খাদ্যাদি গ্রহণ করেন না। এই সংস্কারটির মধ্যে পরিচ্ছন্নতার প্রতি লোকসমাজের যে-মনোভাব বিদ্যমান, তারই পরিচয় পাওয়া যায়। ... নিরক্ষর লোকসমাজ যে-সমস্ত লোকসংস্কারে বিশ্বাস করেন, তা শিক্ষিত ভদ্রসমাজেও চালু থাকতে পারে। গ্রহশান্তির জন্য আংটি, কবচ বা তাবিজ ধারণের ঘটনা উভয় সমাজে প্রচলিত। আবার এই ঘটনা বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেও থাকতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মুসলমান এবং নিরক্ষর হিন্দু বা নিরক্ষর মুসলমান একই লোকসংস্কারে বিশ্বাস করতে পারেন। ... বাংলাদেশের যে সব স্থানে সাঁওতাল উপজাতির লোকেরা বাস করে, সেখানে পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম জনগণও বাস করে। এবং এ-কারণেই সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত বহু লোকসংস্কার হিন্দু ও মুসলিম জনগণের লোকসংস্কারেও পাওয়া যায়।[২৫]

৩. লোকাচার-- লৌকিক আচার লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। মানব জীবনের বস্তুগত দিকের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ তার কর্ম-জীবনে এ দুটিকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। বস্তুগত বিষয়ে আপন অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেও তার অদৃষ্টবাদী মন তাতেই স্বস্তি পায় না। তার বিশ্বাস, কর্মের সঙ্গে যে দৈব শক্তির নিবিড় সম্পর্ক আছে, তাকে তুষ্ট বা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি দক্ষ কৃষক, সে জমি চাষ থেকে শুরু করে সার্বিক পরিচর্যায় বিরত থেকেও নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দৈব-দুর্বিপাকের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই আচারের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ। প্রকৃতি এবং দৈব শক্তিকে তুষ্ট রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তার বস্তুগত কর্মকাণ্ড ফলপ্রসূ হবে, এই তার বিশ্বাস। এই থেকেই (এভাবেই) লোকায়ত সমাজে আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রবর্তন। মোমেন চৌধুরী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন–'লৌকিক আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠান বলতে তাই তাকেই বুঝায়, লোকায়ত সমাজের নিরক্ষও এবং অর্ধ-শিক্ষিত এমন কি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় পুরুষানুক্রমে কখনো ব্যক্তিগতভাবে আবার কখনো দলবদ্ধভাবে কোন পার্থিব কামনার লক্ষ্যে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেবদেবী, অপদেবতা অথবা পীর-ফকিরকে তুষ্ট করতে কিংবা যাদুবিদ্যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট অপ্রাকৃত অথবা প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া পালন করে থাকে।'[২৬] ওয়াকিল আহমেদ বিস্তৃত পরিসরে লোকাচার গড়ে ওঠার সহায়ক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে--

> বিচিত্র ধরনের বহুসংখ্যক অনুষ্ঠানের দেশ বাংলাদেশ। প্রকৃতপক্ষে তিথি, মাস বা ঋতু ভিত্তিক লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। এই ভূখণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের জাতিগোষ্ঠীর লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে নানা প্রথা-পার্বণ, আচার-উৎসব গড়ে উঠেছে। আচারগুলি উপলক্ষ, আয়োজন, উপাদান, কৃত্যানুষ্ঠানে এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে আদিবাসীর সংস্কার বিশ্বাসের সাথে মিল আছে। বস্তুত লোকাচারগুলি হলো এ দেশবাসীর আজন্মলব্ধ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অঙ্গ। মানবজীবন নানা আশঙ্কা ও ভীতি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তাইত্যাদি অভিব্যক্তির মধ্যে আবর্তিত হয়। এর সঙ্গে রয়েছে দৈবশক্তির অবস্থান। দৈবিক, ভৌতিক, অলৌকিক, নৈসর্গিক শক্তিসমূহকে সমীহ ও তুষ্ট করতে না পারলে যেমন মনে শান্তি পাওয়া যায় না, তেমনি তাদের ক্রোধ থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। ... জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অদৃশ্য শত্রুকে দমন ও অজানা আশঙ্কাকে অতিক্রম করার জন্য এদেশের নরনারী আবহমান কাল থেকে বিবিধ আচার পালন করে চলেছে। লক্ষ্য একটাই– দৈবশক্তিকে তুষ্ট করে সানন্দে বাঁচার ও স্বচ্ছন্দে চলার পথকে নিষ্কণ্টক ও বিপদমুক্ত রাখা। সুতরাং মানুষের দৈবিক বিশ্বাস ও বৈষয়িক মঙ্গলচিন্তা থেকেই লোকায়ত সমাজে নানাবিধ আচার ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। ...লোকাচারে কেবল পার্থিব কামনা-বাসনাই প্রতিফলিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের নানা রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র্য, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ,

> কৃষি, পশু, বৃষ্টি, অশুভ আত্মা, দৈবশক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে, সেসবের প্রতিরোধ-প্রতিবিধানের অভিপ্রায় থেকে লোকাচারের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ লোকাচার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর অংশগ্রহণই অধিক। কোন কোন আচার ও ক্রিয়ানুষ্ঠানে পুরুষের অংশগ্রহণ দূরের কথা, উপস্থিতি পর্যন্ত নিষিদ্ধ। ... যেহেতু লোকাচার লোকসমাজের যুগ-সঞ্চিত চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার ফল, সেহেতু এসবে সমগ্র জাতির অতীত ইতিহাসসহ বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৭]

লৌকিক আচারে প্রকাশ পায় কেবলমাত্র ইহলৌকিক কামনা। হিন্দু মেয়েরা যে ব্রতাচার পালন করে, তাতে পারলৌকিক মোক্ষলাভের কামনা নেই, আছে পার্থিব সুখ-শান্তি প্রাপ্তির ঐকান্তিক ইচ্ছা। অথবা, জন্ম ও বিবাহে যে সকল স্ত্রী-আচার পালিত হয়, পার্থিব সুখ-শান্তিই তার লক্ষ্য। লৌকিক আচারের দুইটি দিক : ক্রিয়া এবং অনুষ্ঠান। আচারের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস এবং বিশ্বাস কোন অতীন্দ্রিয় শক্তিতে–যে শক্তি সমাজ ও মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। লোকবিশ্বাস তাই লৌকিক আচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং বিশ্বাসকে কার্যকর করার নামই ক্রিয়া। এবং এক বা একাধিক ক্রিয়া সহযোগে হয় অনুষ্ঠান। লৌকিক আচার প্রতীকধর্মী। কাম্যবস্তু এবং অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রতীক ব্যতীত ক্রিয়ানুষ্ঠানের আয়োজন অসম্পূর্ণ থাকে। যেমন আলপনায় চিত্রিত বিষয়াবলী কাম্যবস্তুর প্রতীক। জেলেদের দেবতা মাকাল ঠাকুরের প্রতীক মাটির স্তূপ; ভৈরবের প্রতীক পোড়ামাটির বাঘ, হাতী বা ঘোড়া। কোন কোন প্রতীক বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখেই ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলি বিশেষ অর্থ বহন করে। যেমন, কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধান-দূর্বার ব্যবহার। ধান ঐশ্বর্যের প্রতীক, দূর্বা যৌবন ও দীর্ঘ জীবনের প্রতীক। বিবাহে ধান-দূর্বা ব্যতীত কড়ি, আংটি, মাছ, কলা ইত্যাদি উর্বরতাসূচক প্রতীক ব্যবহার করা হয়।[২৮]

৪. লোকসাহিত্য-- নিজের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই অপ্রতিরুদ্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় লিখিত হোক, মৌখিক হোক মানুষ আপন ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। সাহিত্য সৃজনশীল মানুষের অর্থবহ এই প্রকাশ-বেদনার ফল। মানুষ আগে ভাষা আয়ত্ত করেছে, পরে বর্ণমালা ও লিপি আবিষ্কার করেছে। এর সূত্র ধরে বলা যায়, মৌখিক ধারার লোকসাহিত্য আগে রচিত রয়েছে, লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছে অনেক পরে। ওয়াকিল আহমদ জানিয়েছেন, 'লোকসাহিত্য একটি সংহত সমাজের সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত মানস-ফসল। তারা স্বল্প শিক্ষিত অথবা একেবারেই শিক্ষা ও বর্ণজ্ঞানহীন। কিন্তু তাদের আবেগ, কল্পনা ও চিন্তাশক্তি আছে, প্রকাশের তাড়না ও সৃষ্টির আনন্দ আছে। তারা তাদের আবেগ-অনুভূতির কথা মুখে মুখে ব্যক্ত করে মানুষকে শুনিয়েছে। গান-গাথা গেয়ে, কথা-কাহিনী বলে, ছড়া-বোল আবৃত্তি করে, ধাঁধা প্রশ্ন করে নানা প্রক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে। তারা যুগ যুগ ধরে লোকসাহিত্য রচনা করেছে এবং স্মৃতি ও শ্রুতির মধ্যে ধারণ ও লালন করে একে বাঁচিয়ে রেখেছে। লোকসাহিত্য বৃহত্তর অর্থে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। প্রকাশ মাধ্যম ভাষা হওয়ায় শিল্পসমৃদ্ধ এ শাখাটি অনেক বেশি লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে।'[২৯]এ প্রসঙ্গে দুলাল চৌধুরী জানিয়েছেন, 'প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ প্রয়োজনে এবং পরোক্ষভাবে সৃষ্টির আনন্দে গোষ্ঠীসমাজ প্রাথমিক অবস্থায় যে মৌখিক সাহিত্যের জন্ম দেয়, তাই ব্যাপক অর্থে লোকসাহিত্য বলে প্রচারিত হয়েছে। একক মানুষ এর স্রষ্টা হলেও সমগ্র সমাজ যখন একে মেনে নেয় তখনই বংশ পরম্পরায় লোকসাহিত্য বয়ে চলে। তাই লোকসাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় রচয়িতার নাম থাকে না। আবার কিছু কিছু বিভাগে রচনাকারের নামও পাওয়া যায়'।[৩০] লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখাগুলো হলো ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোককথা, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, লোকপুরাণ, কিংবদন্তি, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র, বাগধারা, পুথিপাঠ প্রভৃতি।

ছড়া -- সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বহমান ধারা হিসেবে ছড়া স্বীকৃত। 'বাংলা ছড়াসাহিত্যে বাঙালীর জীবনধারার প্রতিচ্ছবিই প্রধান, অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তার পূর্বপুরুষের ছবি। ক্রমবিকাশমান ছড়ার বিভিন্ন স্তরে যেহেতু মিশ্রিত হয়ে আছে অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের বাস্তবতা আর ভবিষ্যতের কামনা–তাই সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্র ছড়ায় পাওয়া যায়। ... লোকছড়ায় সমাজচিত্র প্রতিফলনের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অধিকতর। কেননা, নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির পরিবর্তে যৌথভাবে জনসাধারণ এর রচয়িতা, ফলে সমাজের প্রতিনিধিত্ব এতে স্বভাবতই

স্পষ্টতর। অন্যদিকে শত বছরেও লোকছড়ায় এত সামান্য পরিবর্তন ঘটে-যে তাতে অতীত স্মৃতির চিত্র প্রত্যক্ষভাবেই পাওয়া যায়'।[৩১] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে 'ছড়া' শব্দটি দেশজ। অনেকে আভিধানিক 'ছড়া'র অর্থ করেছেন গ্রাম্য কবির কবিতা, ছন্দোবদ্ধ গ্রাম্য উক্তি, শ্লোক পরম্পরা প্রভৃতি। শব্দটির অর্থগত বিবর্তন ঘটেছে আধুনিক কালে।[৩২]'ছড়া' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বরুণকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন--

> ছড়া শব্দটির ব্যুৎপত্তি ... প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করব সুকুমার সেনের বক্তব্য। তিনি কবিতা, কবিতাছত্র কিংবা ছত্রাংশ অর্থে ছড়া শব্দটির ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাননি বলে জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে এও জানিয়েছেন যে ছড়া শব্দের ব্যবহার না থাকলেও এর ব্যবহার এবং চল ছিল সমাজে। সাধারণ শ্রোতাকে আকর্ষণ করত মঙ্গল গান, পাঁচালী যাত্রায় বিধৃত গান আর কবিতা ছত্র। কবিতা ছত্র বা ছত্রের অংশকে ছড়া বলে প্রয়াত আচার্য মনে করেছিলেন। অবশ্য তিনি দ্বিবিধ অর্থে ছড়া শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। ক. প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত বা ছড়ানো অর্থে। খ. গ্রথিত বা গাঁথা এই অর্থে।' ... কেউ মনে করেছেন ছটা থেকে ছড়া শব্দটির উৎপত্তি। ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে কেউ দেখিয়েছেন ছটা>ছডা>ছড়া। কারও মতে ছন্দ শব্দের অপভ্রংশেই ছড়া শব্দটি এসেছে। আমরা 'ছটা' থেকেই 'ছড়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তি বলে নির্দেশ করতে পারি। ছড়া শব্দটি কারও মতে দেশজ। ... ছড়া শব্দের অর্থে কেউ বলেছেন গ্রাম্য কবিতা, কেউ বলেছেন শ্লোক পরম্পরা, বিস্তৃত পদ্য বিশেষ, অথবা কোনো বিষয়কে নিয়ে রচিত গ্রাম্য কবিতা।[৩৩]

বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানী ছড়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন--

> ব্যাষ্টি রচিত হয়েও স্বল্পায়তন বিশিষ্ট ছন্দবদ্ধ পদসমূহ যা নাকি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত হয়ে সমষ্টির সম্পদরূপে পরিচিতি অর্জন করে, যেখানে ছন্দ নির্মিতি কৌশল এবং অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশই মুখ্য, মূলত শিশু ভোলানাথদের মনোরঞ্জনের জন্য যা মুখে মুখে রচিত এবং মূলত নারী কর্তৃক ব্যবহৃত, তাকেই আমরা ছড়া বলে অভিহিত করতে পারি।[৩৪]

> ছড়া হল বঙ্গীয় লোকসাধারণের সর্বপ্রকার প্রকাশভঙ্গির একটি সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গি। লোকমানস কয়েকটি প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীককে খুব গুরুত্ব দেয়। ছড়ার মধ্যেও সেই প্রতীক প্রবণতা ধরা পড়ে।[৩৫]

> ছড়া হলো লঘু ভাষায় ও প্রাকৃত ছন্দে বদ্ধ আনুপূর্বিক ভাব ও কাহিনী-বিহীন ধ্বনি, রস বা চিত্র প্রধান সুরাশ্রয়ী সংক্ষিপ্ত সমিল পদ্য।[৩৬]

বৈশিষ্ট্য--

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত জানিয়েছেন। তিনি ছড়াকে কখনো 'ছেলেভুলানো ছড়া', আবার কখনো 'মেয়েলি ছড়া' বলে অভিহিত করেছেন। সেই আলোকে আমরা ছড়ার যেসব বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে পারি--

১. ছড়া নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের অধীন নয়;
২. ছড়ার ভাব পরস্পর সম্বন্ধহীন ও যুক্তিসঙ্গতিবিহীন;
৩. ছড়ার চিত্র অসংলগ্ন
৪. অর্থবোধের চেয়ে সুরময় ধ্বনিই ছড়ার প্রাণস্বরূপ;
৫. ছড়া কলাবিচার-শাস্ত্র কিংবা শাস্ত্রীয় রসে বিচার্য নয়;
৬. ছড়ায় যতির ভূমিকা শুধু বিরতির জন্য নয়; এবং
৭. ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ছন্দ এবং শব্দও প্রাকৃত।[৩৭]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহিতলাল মজুমদার, সুকুমার সেন, মুহম্মদ আবদুল হাই, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান ও নীলরতন সেন প্রমুখ ছড়া সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত জানিয়েছেন। এসব মতামত পর্যালোচনাপূর্বক বাংলা ছড়ার বৈশিষ্ট্যসমূহকে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ উপস্থাপন করেছেন--

১. ছড়ায় যুক্তিসঙ্গত বা বিশিষ্ট ভাব কিংবা ভাবের পারম্পর্য নেই।
২. ছড়ায় রচনার ধারাবাহিকতা বা আনুপূর্বিক কাহিনী থাকে না।
৩. ছড়া ধ্বনি প্রধান, সুরাশ্রয়ী।
৪. ছড়ায় রস ও চিত্র আছে, তত্ত্ব ও উপদেশ নেই।
৫. ছড়ার ছন্দ শ্বাসাঘাত প্রধান প্রাকৃত বাংলা ছন্দ।
৬. ছড়া বাহুল্যবর্জিত, দৃঢ়বদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত।
৭. ছড়ার ভাষা লঘু ও চপল।
৮. ছড়ার রস তীব্র ও গাঢ় নয়, স্নিগ্ধ ও সরস।[৩৮]

ওয়াকিল আহমদ ছড়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানিয়েছেন--

১. ছড়া মূলত আবেগ অনুভূতিজাত, বুদ্ধিপ্রসূত নয়।

২. ছড়া চর্চায় সব বয়সের নরনারী অংশগ্রহণ করে।

৩. ছড়ায় বিষয়-বৈচিত্র্য আছে–লঘুগুরু সব ধরনের বিষয় এবং হাস্য-ব্যঙ্গ-করুণ-শান্ত নানা ধরনের রস নিয়ে ছড়া হয়।

৪. ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে যা 'ছড়ার ছন্দ' বা 'স্বরবৃত্ত ছন্দ' নামে পরিচিত।

৫. ছড়া আবৃত্তি-সুখকর।

৬. ছড়ার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সহজ সরল প্রত্যক্ষ; ক্বচিৎ হেঁয়ালির ভাষা ব্যবহৃত হয়।

৭. ছড়া চিত্রবহুল ও ধ্বনি-স্পন্দিত বলে স্মৃতিতে ধরে রাখা সহজ হয়।

৮. ছড়া চিত্তবিনোদনের নির্মল মাধ্যম; কোন কোন ছড়ায় গ্রাম্যতা থাকলেও অশ্লীলতা নেই।

৯. ছড়ার মধ্যে 'চিরত্ব' আছে। পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজে ছড়া আছে; এই সর্বজনীনতার ও সর্বকালীনতার গুণে ছড়া পুরাতন হয়েও চির নতুন।[৩৯]

বরুণকুমার চক্রবর্তী ছড়ার পাঠান্তর প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। কেননা, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সব থেকে বেশি পাঠান্তর মেলে লৌকিক ছড়ায়। তিনি জানিয়েছেন--

> বিষয়টি বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ছড়ায় যেহেতু সুসংগত ভাব প্রকাশের বাধ্য বাধকতা থাকে না তাই অনেকেই বিশেষত ব্যবহারকারিণী নারীরা নানা সময়ে প্রচলিত ছড়ায় রূপান্তর ঘটিয়ে থাকেন। ... কখনও বা কিছু পদ সমষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ে, কখনও বা বিশেষ পংক্তির পরিবর্তন করে ব্যবহারকারিণী নারী নিজের ইচ্ছামতো মনোমতো পদ, বাক্যাংশ বা পংক্তি বিশেষের সংযোজন ঘটিয়ে থাকেন। ... ছড়ায় ভাব বা অর্থের ধারাবাহিকতা রক্ষার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সেই সুযোগই ব্যবহারকারী বা কারিণীরা নিয়ে থাকেন। ... এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে তাহলে কি ছড়ার পাঠান্তরের মূলে রয়েছে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন সাধন? এমন কথা কিন্তু বলা যাবে না। সব পাঠান্তর বা রূপান্তরের মূলেই একটি কারণ দায়ী

নয়। পূর্বে যখন গৌরীদান প্রথা সমাজে চালু ছিল, তখন অল্প বয়সে বালিকা বিবাহসূত্রে শ্বশুরালয়ে গমন করত। তখন পিত্রালয়ে শ্রুত ছড়াও নিয়ে যেত স্মৃতিতে করে। স্থান এবং কালভেদে এই বালিকা বধূ পরবর্তীকালে যখন জননীর ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজের সন্তানকে ছড়া শোনাত, তখন বিস্মৃতির কারণে বাধ্য হয়ে পাদ পূরণ করতে হত পূর্ব পরিচিত ছড়ার। ... আমরা জানি বাংলাদেশের সব অঞ্চলের ভাষা সমান নয়, আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জেলার ভাষায় বিদ্যমান। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ভাষার উচ্চারণগত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। তাই এক অঞ্চলের ছড়া যখন স্মৃতি পথে অন্যত্র বাহিত হয়ে যায় তখন সেই অঞ্চলের মানুষই ঐ ছড়ার উচ্চারণে নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন একপ্রকার নিজের অজান্তে। ... লৌকিক ছড়া মূলত যা শিশুদের উপভোগের জন্য রচিত, সেই শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচয়িতা অথবা আবৃত্তিকারী নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। আমরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো। কোনো গৃহের শিশুকে পরিবারের সব সদস্যই এক নামে অভিহিত করে না। দেখা যায় শিশু নানা নামে নানা জনের দ্বারা অভিহিত হয়। ছড়াতেও শিশুকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে আর এই রূপে ছড়ার রচয়িতা বা আবৃত্তিকারী শিশুর কাছে তার পুঞ্জীভূত অপত্য স্নেহকে উৎসাহিত করে দিয়েছে। ... শিশুর মনোরঞ্জন ব্যতীত শিশুকে ভোলাবার জন্য, তার পছন্দের কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার তাগিদে, শিশুকে অন্যমনস্ক করতে তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য, নানা অবাস্তব অতি লৌকিক প্রাণীরও উল্লেখ করা হয়। এভাবেই ছড়াগুলির ক্ষেত্রে আমরা পাঠান্তর লক্ষ করি।'[৪০]

প্রবাদ-- লোকসাহিত্যের শাখাগুলির মধ্যে প্রবাদ সমকালকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে আছে। আধুনিক যুগের সব ধরনের রচনায় প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, সংবাদপত্র, বক্তৃতা, বিজ্ঞাপন, দৈনন্দিন কথাবার্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। লোকসাহিত্যধারায় প্রবাদ ক্ষুদ্রতম রচনা। 'প্রবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : বিশেষ উক্তি বা কথন; 'প্র' পূর্বক 'বাদ' (বদ+অ) প্রবাদ। বদ্ ধাতুর অর্থ বলা। যেসব প্রাজ্ঞ উক্তি লোক পরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে, তা-ই প্রবাদ। প্রবাদ পাথরের নুড়ির মতো সমাজ-মানসে জন্ম নিয়ে জীবন-স্রোতে অনেক পথ-পরিক্রমা করে একটি নিটোল অবয়ব লাভ করে। এরপর তা আর ভাঙে না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।'[৪১] বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ প্রবাদকে বিভিন্নভাবে দেখেছেন এবং প্রবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞাও তাঁরা আমাদের উপহার দিয়েছেন। "প্রতিটি সংজ্ঞাই প্রবাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে উপস্থিত করেছে। একটি স্পেনীয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে -- 'দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে যখন মানুষ স্বল্পতম বাক্যে প্রকাশ করে তখন তাই হয়ে ওঠে প্রবাদ'। ... আরেকটি জার্মান সংজ্ঞায় বলা হযেছে, 'Proverbs are the wisdom of ages.' একটি হিব্রু প্রবাদের সংজ্ঞা- 'A man's life is built on Proverb.' -প্রবাদের উপর ভিত্তি করেই মানবজীবন গড়ে ওঠে : বক্তব্যটির অর্থ হলো-মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা নাকি প্রবাদের বিষয় হয়ে ওঠেনি।" [৪২] প্রবাদের নানা সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও অর্থবহ সংজ্ঞা হলো : প্রবাদ হলো দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। স্পেনের লোকবিদ সার্ভেন্তেস এই সংজ্ঞা জানিয়েছেন। ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, সমাজ, জগৎ, সংসার, পরিবেশ, কাল, কৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা সংহত আকারে একটি বাক্যে বিশেষ রীতিতে প্রকাশ করলে প্রবাদ হয়। ... প্রবাদ হলো মানুষের অভিজ্ঞতার স্ফটিককৃত বাক-রূপায়ণ। এ্যারিস্টটল জাতির জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তার ওপর জোর দেন। তাঁর মতে প্রবাদ হলো সমাজের প্রবীণ মানুষের বুদ্ধির সার-সংক্ষেপ হলো প্রবাদ।'[৪৩]

বৈশিষ্ট্য--

বরুণকুমার চক্রবর্তী প্রবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানিয়েছেন--

১. প্রবাদের মূল আকর্ষণ-এতে প্রকাশিত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। পাঠক বা শ্রোতা তার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার সাযুজ্যে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং যে অভিজ্ঞতার কথা সে ঠিকমত প্রকাশ করে উঠতে পারছিল না, প্রবাদে তাকেই বাঙ্ময় হতে দেখে সে প্রবাদকেই তার বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। প্রবাদ হয়ে ওঠে তার মুখপাত্র স্বরূপ। এই সর্বজনগ্রাহ্যতা প্রবাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

২.সর্বজনগ্রাহ্যতা গুণটির অধিকারী হতে প্রবাদে এমন কোন অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করা চলে না, যা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে। দ্বিতীয়ত, সর্বজনগ্রাহ্যতার আর একটি কারণ প্রবাদের গভীর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, যা প্রকৃতিতে রূপকাশ্রয়ী।

৩. প্রবাদের বাচনিক অর্থই সব নয়, তার ব্যঙ্গার্থই প্রধান।

৪. প্রবাদের সরল অনাড়ম্বর, প্রকাশভঙ্গীর জন্যই এর এত কদর। সহজবোধ্যতা এবং সারল্য সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে প্রবাদকে তার প্রাত্যহিক জীবনে গ্রহণে।

৫.এক ভাষার রচিত প্রবাদের মধ্য দিয়ে সেই ভাষাভাষী মানুষের সামগ্রিক পরিচয় প্রকটিত হয় সহজেই।[৪৪]

৬. প্রবাদে বক্তব্য পরিষ্কার এবং যেটুকু না বললে নয় সেইটুকুই মাত্র বলা হয়। অহেতুক বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করার পথ প্রবাদকারেরা নেননি।

৭. মৌখিক ঐতিহ্যের সূত্রেই প্রবাদ বাক্যগুলি প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে। এগুলির নির্দিষ্ট রচয়িতার সন্ধান মেলে না। ব্যব্হারকারীর সেই পরিচিতি লাভের প্রয়োজনও হয় না। অবশ্যই প্রবাদ ব্যষ্টি কর্তৃক রচিত হয় কিন্তু সংহত সমাজের মানুষের দ্বারা গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত তা একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

৮.বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতেও প্রবাদ হল এক সার্থক হাতিয়ার। প্রতিটি দেশের ভাষার সম্পদ বলেই বিবেচনা করা হয় সেই ভাষার প্রবাদগুলিকে।

৯.প্রবাদ বাক্যগুলির মূল লক্ষ্য মানবচরিত্র। আরও একটু বিস্তারিতভাবে বললে বলা যায় মানবচরিত্রের সমালোচনা। এই সমালোচনার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ–বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মানুষের অসঙ্গতিগুলিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করা। একদিকে এই শ্রেণীর মানুষেরা যেমন সমালোচনার ফলে সাবধান হতে পারে, নিজেদের ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করে, অন্যদিকে যারা এরূপ চরিত্রের অধিকারী নয় তারা দূষণীয় চরিত্রের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরামর্শ লাভ করে এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও যেন এইরূপ ত্রুটির অধিকারী না হয় সেজন্য সচেষ্ট হওয়ার শিক্ষা পায়।

১০. প্রবাদবাক্যে দুটি অর্থ সমান্তরালভাবে প্রকাশ পায়। একটি সাহিত্যের ভাষায় বাচ্যার্থ, অপরটি ব্যঙ্গার্থ। বলাবাহুল্য ব্যঙ্গার্থই প্রবাদের প্রকৃত অর্থ বা এই ব্যঙ্গার্থ প্রকাশের জন্যই প্রবাদের প্রকৃত গুরুত্ব। ... যেমন– 'সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না' অর্থাৎ পাত্র থেকে ঘি সংগ্রহের জন্য আঙুল সোজা না রেখে কিছুটা বক্র করতে হয়। কিন্তু এই বাচ্যার্থের মধ্যেই যদি প্রবাদটি নিঃশেষিত হত তাহলে প্রবাদ হিসাবে এর কার্যকারিতা হ্রাস পেত। এর ব্যাঙ্গার্থ হলো এই যে সহজে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, দুষ্ট বুদ্ধি যার, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা ঘায়েল করতে প্রয়োজন কূট বুদ্ধির। আঙুলের বক্রতা প্রবাদে অনুল্লেখিত থাকলেও স্পষ্ট বোঝা যায় কূট কৌশলকেই প্রতীক করা হয়েছে প্রবাদে।

১১.বেশ কিছু প্রবাদ বিশেষ কোনো ঘটনা, চরিত্র বা গল্প অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছে। এই উৎপত্তিসূচক গল্পগুলি অধিকাংশই বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু রয়ে গেছে প্রবাদগুলি। উৎপত্তিসূচক ঘটনা বা গল্পগুলি যদি সংগৃহীত হয়, আমরা যদি সেগুলি ঠিকমতো জানতে পারি তাহলে ঐসব গল্পগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রবাদগুলির মর্মার্থ অনুধাবন সহজ হবে।

১২.প্রবাদ বক্তব্য প্রকাশে এবং আকৃতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ। যেমন যখন বলা হয় 'কারোর পৌষমাস, কারোর সর্বনাশ', তখন সম্পূর্ণ ভাবটি এখানে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে যদিও ক্রিয়াপদ উল্লিখিত হয়নি তবু বক্তব্যটি স্বয়ং সম্পূর্ণ।[৪৫]

ওয়াকিল আহমদ প্রবাদের গঠনগত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, 'গদ্যে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে ছন্দোবদ্ধ দুই চরণ পর্যন্ত প্রবাদের অবয়বগত ব্যাপ্তি। 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে'। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' এক বাক্যের দুটি প্রবাদ : একটি সরল বাক্য, অপরটি যৌগিক বাক্য। 'কড়ি থাকলে ভেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।' ছন্দোবদ্ধ দুই চরণের প্রবাদ। ... প্রবাদ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা পূর্ণ ভাবদ্যোতক ও অর্থবহ হয়ে থাকে। প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং মূলত বুদ্ধিপ্রধান রচনা। আবেগ নয়, মস্তিষ্ক থেকে প্রবাদের জন্ম হয়। দানা বাঁধা স্ফটিকের সঙ্গে প্রবাদের উপমা দেওয়া যায়। স্ফটিক একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ফল; প্রবাদ সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল। 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।', 'লাগে টাকা, দিবে গৌরীসেন।', 'যে রাঁধে, সে চুল বাঁধে।' ইত্যাদি প্রবাদের আঁটসাট বাঁধন; এগুলিতে বাড়তি মেদ একটুও নেই। কথা স্বল্প হলেও অর্থের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আছে। 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক।' চার শব্দের এই সরল বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো : মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সীমিত থাকে; নিজ সীমানা অতিক্রম করে যায় না। 'যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকে ল্যাঠা বাজে।' জোর চরণের এই প্রবাদেরও গূঢ়ার্থ আছে। পেশাদার ব্যক্তি যেভাবে একটি কাজ সম্পন্ন করবে অপেশাদার ব্যক্তি দ্বারা তা সম্ভব নয়। স্বল্প কথায় অধিক অর্থ ধারণক্ষমতা প্রবাদ ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য কোন শাখায় নেই'।[৪৬] প্রবাদের উপযোগিতা সম্পর্কে লোকবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অভিমত জানিয়েছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রবাদের ভাষা প্রধানত অন্তঃপুরের ভাষা বা মেয়েলী ভাষা'। কৃষিকাজের মত প্রবাদও মেয়েলী সৃষ্টি। নারীর মুখের ভাষায় রচিত প্রবাদে নারীজীবনই মুখ্য প্রতিফলিত। অথচ এই নারীজীবন সমাজবন্ধনের মৌলিক ভিত্তি। বিবাহ এবং তৎসম্পর্কিত বিশ্বাসও আচারের স্রোতে জীবনের সর্ব কর্ম, চিন্তা, আনন্দ এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে। ফলে প্রবাদে সমাজ জীবনই প্রতিবিম্বিত হয়। তবে প্রবাদেও ভাষা রক্ষণশীল ভাষা। ... দার্শনিক সত্য ও জীবনের তথ্র প্রবাদে অনবদ্য বাণীরূপ লাভ করে সার্বজনীন সাহিত্যে পরিণত হয়। ... প্রবাদের ভাষায় প্রাচীনত্ব যেমন থাকে প্রত্ন-সমাজকণাও অটুট থাকে।[৪৭]

> প্রবাদ মানুষের প্রাজ্ঞমনস্কতার ফসল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় একদিন সামাজিক মানুষ আয়ত্ত করলো তারই ফলশ্রুতি প্রবাদ। ... কালপ্রবাহে ও লোকসমাজের স্মৃতি বাহিত হয়ে, জন-জনান্তওে শ্রুতির মদ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রবাদ একটি নিটোল অবয়ব লাভ করেছে। সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বা উত্থান-পতনে প্রবাদ আরো জীবনদর্শনঋদ্ধ হয়ে উঠেছে্ গ্রাম্য মানুষের মুখ নিঃসৃত বাণী বলেই প্রবাদেও ভাষাও হয়েছে গ্রাম্য ভাষার অনুবর্তী। সেজন্য প্রবাদ লোকভাষার যথার্থ নিদর্শন। আঞ্চলিক সমাজ জীবনের বহু অমূর্য্য উপকরণ বিধৃত হয়ছে প্রবাদে। প্রবাদকে মানব সমাজের প্রত্ন-সাহিত্যও বলা চলে। সমাজ-ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রবাদেও ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাদে এমন অনেক সামাজিক জীবন-রেণু পাওয়া যায়, যাকে অনুসরণ কওে বাঙালির হারানো ইতিহাস পুনর্নির্মাণ সম্ভব। ... প্রবাদ আদিতে ছিল কাহিনীমূলক। জীবন সম্পৃক্ত গল্প বা কাহিনী কালক্রমে হারিয়ে গিয়ে, শুধু সেই গল্পের বা জীবন বৃত্তান্তের নির্যাসটুকু আমাদের লোকসাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে।[৪৮]

ধাঁধা– ধাঁধা লোকসাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ, লোকসাহিত্যের ধর্মানুযায়ী মৌখিক ঐতিহ্যানুসারী। বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, 'ধাঁধা হলো সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মৌখিক রচনা যা প্রজন্ম পরম্পরায় ঐতিহ্যকে নির্ভও কওে টিকে থাকে, যাতে আপাতভাবে যে বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে শ্রোতা মনে করে, প্রকৃতপক্ষে অনুরূপ কিন্তু ভিন্নতর বিষয়কে কৌশলে উপস্থাপিত করা হয় প্রশ্নকারে, যার উদ্দেশ্য শ্রোতার বুদ্ধির পরীক্ষা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের স্বীকৃত সমাধানটি তার ইতিপূর্বে জানা কিনা্ তার পরীক্ষা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতার যৌথভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে যার ফলশ্রুতি কৌতুক রসাস্বাদন, তাকেই বলা হবে ধাঁধা।'[৪৯]

> 'ধন্ধ' থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি; অর্থ ধোঁকা, সংশয়, দুরুহ সমস্যা, কৌতুহলজনক ও বুদ্ধিবিভ্রমকারী প্রশ্ন।' ... এতে বর্ণনার কৌশলে রহস্যময় বাতাবরণ রচনা করা হয়। প্রশ্ন আছে বলে এর একটি উত্তরও আছে। রূপক-সংকেত-উপমাদিও ভেদ ভেঙে উত্তরটি বের করতে হয়। প্রশ্ন ও উত্তর মিলে ধাঁধা পূর্ণাঙ্গ হয়। ধাঁধার চর্চায় কমপক্ষে দুজনের উপডস্থিতি আবশ্যক হয়; অর্থাৎ দুটি পক্ষ থাকতে হয়। ... ধাঁধার প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে বুদ্ধি ও চিন্তার সমন্বয় লক্ষণীয়। ... ধাঁধা মূলত রূপক, আর এই রূপক হলো ভাবানুষঙ্গ, তুলনা ও সমতা-অসমতার ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক মানসিক প্রক্রিয়ার ফল। অভীষ্ট বিষয়কে আড়াল করে সমতুল্ল অন্য বিষয়ের অবতারণা করলে রূপক হয়। ... ধাঁধা রচনায় ভাষার উপর দখল, চিন্তার দক্ষতা, প্রবল ছন্দ-চেতনা থাকা দরকার। ... ধাঁধা একটি অজানা বিষয়ের পরোক্ষ বিবরণ; এটি এমনভাবে বিবৃত করা হয় যাতে শ্রোতা-পাঠক অনুশীলন দ্বারা বের করতে পারে। প্রশ্নকর্তার কাছে বিষয়টি অজানা থাকে না, শ্রোতা-পাঠকের কাছ অজানা থাকে; উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে ধাঁধার শব্দচিত্র, বর্ণবিন্যাস, রূপকল্প বা ধ্বনিব্যঞ্জনা থেকে উত্তরটি বের করতে হয়। ... শ্রোতা বা পাঠককে উত্তরটি বের করার জন্য চিন্তার সুযোগ দেওয়া হয়। এজন্য ধাঁধা বর্ণনায় কিছু না কিছু চিত্র-সংকেত বা ধ্বনিব্যঞ্জনা তাকতে হয়। এরূপ সংকেত-ব্যঞ্জনাটি নানাভাবে আসতে পারে–বর্ণ, চিহ্ন, সংখ্যা, আকার, আচরণ, গুণধর্ম ইত্যাদিও দিক দিয়ে সাদৃস্র বা তুলনা আরোপ করে। ধাঁধার রচনায় বুদ্ধিও সঙ্গে কল্পনার মিস্রণ দরকার হয়। তবে এতে আবেগের স্থান নেই। এজন্য ধাঁধার অবয়ব দীর্ঘ হয় না। গদ্যে ও পদ্যে ধাঁধা রচিত হয়; সাধারণত গদ্যাশ্রিত ধাঁধা একটি বাক্যে এবং পদ্যাশ্রিত ধআধা ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিল যুক্ত দুই থেকে চার চরণে সমাপ্ত হয়। বুদ্ধি ও কল্পনার মিশ্রণ থাকায় ধাঁধা শুষ্ক প্রশ্নোত্তরে পরিণত হয় না, বরং রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্পের গুণে তা যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক ও রসধর্মী রচনার রূপ ধারণ করে। ... বুদ্ধি, কল্পনা, কৌতূহল, আনন্দ এবং রসবোধ মিলে ধাঁধায় একটি শিক্ষিত মনের ছাপ বিরাজ করে।[৫০]

বাংলাদেশে ধাঁধার বিভিন্ন প্রতিশব্দ বা সমনাম প্রচলিত। যথা--ধন্দ, হিঁয়ালি, হেঁয়ালি, প্রহেলি, প্রহেলিকা, ঢক, ঢোঁক, ভাঙ্গানি, কখানি, কিচ্ছা, কিস্তা, চুটকি, ফাকরি, ফাকলি, ছিলকা, কথা, শ্লোক, শিল্লক, শুলুক, শিল্লুক বা দরবারী শিলুক, দিস্তান, ভাইঙ্গা, পরস্তাপ, ভিঠান, ছিলকা, মান, ধনুহাসি বা পিলিকা, দস্তান, পঁই, রাতকথা, দাঁতকথা, পুনি, ফুমলকমানি, ফড়ুই, ডাক, ঠার, পুনি, প্রভৃতি। ... দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গেও বিভিন্ন অঞ্চলে ঢক, ঢোঁক, কথা, ভাঙ্গানি, বাখানি, চুটকি, নাতকথা, দাঁতকথা, কহানি, শ্লোক, শোলোক প্রভৃতি প্রচলিত।[৫১] প্রাচীন লোকসমাজে ধাঁধার উদ্ভবের কারণগুলো বরুণকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন--

ক. ঐন্দ্রজালিকতার সুবাদে ধাঁধার উদ্ভব। ধাঁধাকে অনেকেই ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন মনে করেন।

খ. কোনো কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো বিষয়ের বর্ণনা নিষিদ্ধ ছিল, ফলে সেই বিষয়টি ধাঁধায় পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করা হত।

গ. বুদ্ধিবৃত্তি যাচাইয়ের সূত্রে ধাঁধার উদ্ভব হওয়া সম্ভব।

ঘ. নির্মল পরিহাস প্রিয়তাই ধাঁধা উদ্ভবের মূল।

ঙ. বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকর কাজ করার সময় একঘেয়েমি দূর করতে ধাঁধার উদ্ভব। অর্থাৎ অবসর সময় অতিবাহিত করার প্রয়োজনেই ধাঁধার প্রচলন ঘটেছে।

চ. ধাঁধা আসলে নিজের অভিজ্ঞতাকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ আঙ্গিক।

ছ. অন্যকে অক্ষম প্রতিপন্ন করতে, অপরপক্ষে নিজের ক্ষমতা জাহির করার সুবাদেই ধাঁধার আত্মপ্রকাশ।[৫২]

তিনি ধাঁধার বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন--

১. একটি ধাঁধায় কমপক্ষে একটি বিষয় ও সেই সম্পর্কিত একটি মন্তব্যকে উপস্থাপিত করা হয়। বর্ণনাত্মক উপাদান ধাঁধায় একাধিক থাকতে পারে। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে আপাতভাবে ধাঁধার বিরোধিতা থাকে না। কিন্তু বর্ণনাত্মক উপাদান যেখানে একাধিক সেখানে উপাদানগুলি সুসংহত যেমন হতে পারে, অপরদিকে সেগুলিতে বিরোধিতাও উপস্থাপিত হতে পারে।

২. লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অন্যগুলোতে যেখানে অনুভূতিরই তাড়না কিংবা সুনির্দিষ্ট প্রয়াস লক্ষিত হয়, সেখানে একমাত্র ধাঁধার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলনের ওপর।

৩. ধাঁধায় একটি সমস্যাকে উপস্থাপন করা হয় এবং শ্রোতার কাছে চাওয়া হয় তার উপযুক্ত সমাধান। সমস্যাটি এমন কিছু দুরূহ নয়। কিন্তু উপস্থাপনের কারণে প্রকাশ বৈমিষ্ট্যে শ্রোতা কিঞ্চিত বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে স্মৃতি থেকে হাতড়াতে থাকে যথাযথ উত্তরটি। মনে মনে সে নিশ্চিত তাকে, যে প্রশ্নটি তাকে করা হয়েছে তার উত্তর তার জানা। অন্তত তার াভিজ্ঞতার নাগালের মধ্যেই তা আছে। কিন্তু ঠিক সময়ে উত্তরটি দেওয়ার যে নৈপুণ্য তা সবসময় দেখানো হয়ে ওঠে না। ধাঁধার উত্তর যদি সঠিক হয় তবে উত্তরদাতা এক ধরনের আত্মগরিমা বোধ করেন এই ভেবে যে, প্রশ্নকর্তা তাকে অপ্রস্তুতে ফেলতে পারেননি। উল্টে সঠিক উত্তর দিয়ে তিনিই প্রশ্নকর্তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছেন। আবার বিপরীতক্রমে উত্তরদাতা যদি উত্তরদানে অপারগ হন, সেক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন, সঠিক উত্তরটি তিনি বলে দেন এবং তিনি এইভাবে এক ধরনের গৌরবত্বের অধিকারী হওয়ার আনন্দ পান। মনে রাখতে হবে ধাঁধায় যুক্তির কোনো স্থান নেই। উত্তর নিয়ে বিতণ্ডার কোনো অবকাশ নেই। ঐতিহ্যগতভাবে যে ধাঁধার যে উত্তর সেটি না বলতে পারলে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বিকল্প উত্তর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শ্রোতা যদি করেন, তবে কখনোই তা গ্রাহ্য হয় না।

৪. ধাঁধার উদ্দেশ্য শ্রোতার রসবোধ কিংবা বুদ্ধির পরীক্ষা যত না, তদপেক্ষা স্মৃতিশক্তির পরীক্ষাই প্রধান।

৫. ধাঁধার প্রশ্নকর্তা এর বাচনিক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশী। ইতিবাচত অথবা নেতিবাচক যে- কোনো একটি প্রতিক্রিয়া শ্রোতাকে ব্যক্ত করতেই হয়। ... ধাঁধার শ্রোতা কখনোই নীরব থাকতে পারবেন না। তার ভূমিকা কখনো নিষ্ক্রিয় হয় না। বলা যেতে পারে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতার সম্মিলিত রূমিকা গ্রহণে ধাঁধার পূর্ণতা।

৬. ধাঁধার ক্ষেত্রে মূলত বুদ্ধি তথা স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা নেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। ধাঁধায় সর্বোপরি একটা মজা আছে। উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হোন আর না হোন, উভয় ক্ষেত্রে সেই মজাটার আঁচ পাওয়া যায়।

৭. অনেক ক্ষেত্রে ধাঁধার অবয়ব ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ করা হয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বা বক্তব্যকে যুক্ত করা হয় শ্রোতাকে বিমূঢ় করার জন্য।

৮. ধাঁধার প্রকৃতি কখনোই সমালোচনাত্মক নয়। মানুষের অবয়ব নিয়ে ধাঁধা রচিত হয়, কিন্তু মানব প্রকৃতি কিছুতেই ধাঁধার বিষয় হয় না। যদিও ধাঁধার উত্তরদানে বুদ্ধিও প্রয়োজন হয় কিন্তু ধাঁধার উপাদানগুলি মূলত দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ থেকেই আহৃত।

৯. ধাঁধা পদ্যবন্ধ অবস্থায় যেমন মেলে তেমনি গদ্য ধাঁধাও দুর্লভ নয়। মূলত ধাঁধা রচয়িতার ঝোঁক দুই বা চার পংক্তির মধ্যে বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখা।

১০. ধাঁধায় যে চিত্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যায় তা প্রকৃতিতে শিল্পগুণসম্পন্ন। ... ধাঁধা প্রথমাবধি অলিখিতরূপে আত্মপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত, স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর। ... এর রচয়িতার সন্ধান অলভ্য এবং সংহত সমাজের সম্পদ বলেই বিবেচিত।[৫৩]

লোককথা-- লোকসাহিত্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় শাখা হিসেবে লোককথার আবেদন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সার্বজসীন। মানুষের গল্প বলারও গল্প শোনার চিরন্তন আকুতি লোককথায় বিচিত্রভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়েছে। আদিম মানুষের অরণ্যজীবন ও শিকারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লোককথার উদ্ভবের সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "গল্পকেই সাধারণভাবে বলা হয় 'কথা'। যে সব মৌলিক গল্প সাধারণভাবে দেশের নিরক্ষর কিংবা স্বল্প শিক্ষিত সমাজে উদ্ভূত হইয়া বৃহত্তর জনমানসে প্রচলিত হয় তাহাকেই বলে 'লোককথা'। পুরুষানুক্রমিকভাবে মৌখিক পরম্পরায় তাহা আমরা প্রাপ্ত হই। নির্মল বেরা লোককথার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, "অতি প্রাচীনকাল থেকে লোকসমাজে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত অথবা নতুন কওে উদ্ভূত রূপকাশ্রীয় কল্পলোকের আয়াসবিহারী নানা কাহিনী মৌখিক মাদ্রমে প্রচারিত হয়ে যখন জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের রূপলেখ্য হিসাবে জাতির জীবনেই সজীবভাবে বিরাজিত থাকে তখন তাকেই বলে লোককথা।"[৫৪] লোককথা লোককাহিনী হিসেবেও লোকসমাজে প্রচলিত। এর ভাষা মূলত গদ্য, তবে কোনো কোনো গল্প গান সহযোগে পরিবেশন করা হয়। বিশেষ করে, দীর্ঘ কলেবরের কাহিনীগুলি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে গান জুড়ে দিয়ে শ্রোতার কাছে অধিক আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। এতে গল্প বলার ও শোনার একঘেয়েমি দূর হয়। শ্রোতারা একাধারে গল্পরস ও সঙ্গীতরস লাভ করে তৃপ্তি ও আনন্দ পায়। যে কেউ এসব গল্প বলতে ও শুনতে পারে। লোককথার জগৎ যেমন বিশাল, তেমনি বহুমুখী তার বিষয়বৈচিত্র্য। মানবজীবনে ঘটে চলা যাবতীয় ঘটনার পাশাপাশি তার অজস্র কল্পনা, স্বপ্ন, প্রত্যাশা, কামনা, অলৌকিক ভাবনা, সৌন্দর্যের প্রতি আকুতি, প্রেম-ভালোবাসা, প্রতিহিংসা, রাজ্য জয় ও রাজকন্যাকে উদ্ধার, পাশবিক ও দানবীয় শক্তিকে পরাভূত করা সবকিছুই লোককথার প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। লোককথার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. লোককথার কাহিনী সাধারণত একমুখী হয়। এতে শাখা কাহিনী বা জটিল গ্রন্থিমোচন থাকে না।

২. লোককথার প্রচার মাধ্যম হয় মৌখিক। পুরুষানুক্রমে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে লোকসমাজে। এতে গল্পকথকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার গল্প বলার ভঙ্গি ও সামর্থ্যের ওপর শ্রোতার মনোলোকে গল্পের ভুবন মুদ্রিত হবার ব্যাপারটি নির্ভরশীল।

৩. মূলত গদ্যই লোককথার বাহন।

৪. চরিত্রগুলো টাইপ চরিত্র। পরিপূর্ণ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বোকা সিংহ, ধূর্ত শিয়াল, চটপটে বুদ্ধিমান খরগোশ, অকৃতজ্ঞ সাপ, উপকারী পাখি এর নিদর্শন।

৫. লোককথার জগতে সম্ভব-অসম্ভবের কোনো ব্যাপার কার্যকর নয়। বাস্তবে যা অলীক কল্পনা, লোককথায় তা সহজেই রূপায়িত হতে পারে। তাই রাজপুত্র চোখের পলকে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে যেতে পারে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে।

৬. প্রায় প্রতিটি লোককথাই কোনো অভাববোধ দিয়ে শুরু হয়। পরিণতিতে সেই অভাববোধের অবসান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. পশুপাখি, গাছপালা, বিভিন্ন বস্তুকে মানবীয় দোষ-গুণের অধিকারী হিসেবে দেখানো হয়। শুধু তাই নয়, তারাও বিভিন্ন অলৌকিক, অতিলৌকিক গুণ ও শক্তি ধারণে সমর্থ।

৮.লোককথায় বরাবর মানবীয় শক্তির বিজয় রূপায়িত হয়। রাক্ষস, দৈত্য-দানো, অসুর, ডাইনি, মায়াবিনীরা মানুষের বাহুবলের কাছে পরাজিত হয়। শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত সদর্থক শক্তি সাফল্য অর্জন করে।

৯. বিশেষ কোনো লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষা প্রদানের চেষ্টা লোককথায় বিদ্যমান।

১০. লোককথা বলার বিশেষ ভঙ্গি রয়েছে 'এক যে ছিল রাজা। তার ছিল তিন রানী'। এভাবে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া ধারাবাহিতভাবে না বসে কর্তা থাকে বাক্যের শেষভাগে।

লোককথার আবেদন বিশ্বজনীন। একই লোককথা হুবহু অবিকলভাবে অথবা সামান্য পরিবর্তিত রূপে একাধিক দেশে অথবা একই সাংস্কৃতিক বলয়ে প্রচলিত থাকতে পারে। গবেষকরা জানিয়েছেন, সংস্কৃতির পরিভ্রমণ ও সংমিশ্রণ ঘটার ফলে এমনটি হতে পারে। এক্ষেত্রে লোককথার টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতি অবলম্বন করে আনুষঙ্গিক তথ্যাদি আবিষ্কার করা যায়। লোককথায় বিধৃত হয় কোনো জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের চালচিত্র, তার ঐতিহ্যিক পরিচয়, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের মূল্যবান নির্দেশনা। তাই লোকসাহিত্যের বিশেষ ধারা হিসেবে যে কোনো বয়সের মানুষের কাছেই লোককথার স্বতন্ত্র আবেদন স্বীকৃত।

লোককথার উল্লেখযোগ্য শাখার মধ্যে রয়েছে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, রূপকথার জগত শিশুর কল্পনার জগৎ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রূপকথা হলো বাস্তব জীবনতাড়িত মানুষের কাল্পনিক সৃষ্টি। যে ইচ্ছা বাস্তব জীবনে চরিতার্থ করা সম্ভব নয়, তাকে কল্পনার জগতে পূরণ করতে রূপকথার আশ্রয় নেয়া হয়।[৫৫] রূপক কথা অর্থেও রূপকথাকে চিহ্নিত করা হয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'ফেইরি টেল'। রূপকথা[৫৬] মৌলিক সৃষ্টি নয়, বরং ঐতিহ্যবাহী রচনা। আপাতভাবে একে অবাস্তব, অর্থহীন মনে হলেও এর অন্তরালে এমন এক সার্বজনীণ আবেদন থাকে, যা সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। একদিকে সামাজিক শ্রেণিসম্পর্ক, অন্যদিকে অবচেতন মনের বিচিত্র প্রত্যাশা ও তাদের অপূর্ণতাবোধের দ্বন্দ্ব মিলেমিশে রূপকথার আখ্যান গড়ে তোলে। রাজা-রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্যা-রাক্ষস-দৈত্য-ডাইনি-জাদুকর-সাধু প্রভৃতি চরিত্রের অন্তরালে বাস্তবের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা-অপূর্ণতা, আশা-নিরাশা রূপায়িত হয়। লোককথার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এতে প্রতিফলিত হয়। রূপকথায় চরিত্রের বিবর্তন অনুপস্থিত। যে নিষ্ঠুর, খল, তাকে সাধু ও মহৎ হিসেবে উন্নীত হতে দেখা যায় না। এত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। ভাগ্য বিপয়য়, নিয়তি, অলৌকিক শক্তি, জাদু-মায়া প্রভৃতি চরিত্রের পরিণতি নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপকথা–– একে পশুকথাও বলা হয়। লোকপুরাণ ব্যতীত লোককথার অন্যান্য শাখার মধ্যে প্রাচীনতম হলো উপকথা। পশু-পাখির চরিত্র অবলম্বন করে এসব কাহিনী রচিত হয়। এতে দুটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রথমত: কৌতুকরস সৃষ্টি ও দ্বিতীয়ত : নীতিশিক্ষা প্রচার। কাহিনীতে মানুষের চরিত্রগুলি পশু-পাখির ছদ্মবেশে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। অরণ্যাচারী কিংবা পর্বত গুহায় বসবাসকারী মানুষ কেবলমাত্র বৃত্তি তাড়িত হয়ে জীবন ধারণ করত। এসব কাহিনীতে আদিম সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি সমবেদনা। সে দৈহিক শক্তির অভাব পূর্ণ করতে চায় বুদ্ধির মাধ্যমে। তাই উপকথায় দৈহিক শক্তি সম্পন্ন জীবকে নিতান্ত নির্বোধ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একারণেই উপকথায় পশুর মধ্যে শিয়াল, পাখির মধ্যে টুনটুনি, চড়ুই এর কাছে হাতি, বাঘ, কুমির পরাজিত হয়।

ব্রতকথা–– মৌখিক কাহিনীগুলির মধ্যে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ব্রতকথার স্বকীয় আবেদন রয়েছে। বাংলার গ্রামীণ জীবনযাত্রায় নারীরা বিবিধ আচার ও পূজা পালনের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্রতকথা শোনে, বাস্তবজীবনে অনুসরণ করে। লৌকিক দেবদেবীর পূজার অনুষ্ঠানে ব্রত পালনের সময় ব্রতকথাগুলি পরিবেশন করা হয় বলেই এসব কথাকে ব্রত কথা বলে। ব্রত অনুষ্ঠানের দেবীরা শাস্ত্রীয় নয়, বরং লৌকিক দেবদেবী। ব্রত কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এসব কাহিনীতে গ্রামীণ নারীরা সহজ ভাষায় অকপট ভঙ্গিতে মনের কথা পরিবেশন করে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, ভবিষ্যত জীবনের সম্ভাবনা ও স্বপ্ন-প্রত্যাশা, সুখ-দুখ-হাসি-কান্না এসব কাহিনীকে ঘিরে পল্লবিত হয়। কাহিনীর দেবদেবীর চরিত্রগুলি মানুষের মতোই দোষ-গুণ, ভালো-মন্দে গড়ে ওঠা রক্তমায়সের মানব-মানবীর প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। ব্রতকথায় ইহজাগতিকতারই জয়জয়কার। বিভিন্ন ব্রতকথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যমপুকুর, অরণ্যষষ্ঠী, ভাদ্রলক্ষ্মী, ক্ষেত্রলক্ষ্মী, কুলই মঙ্গলচণ্ডী, শিবরাত্রি, ইতু, প্রভৃতি।

লোকপুরাণ–– বিশ্বচরাচরের অজস্র বিষয়ের উদ্ভব, সৃষ্টি, আন্তঃসম্পর্ককে উপলক্ষ করে আদিমকাল থেকেই মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অলৌকিক, অবিশ্বাস্য কাহিনী। সেগুলোই লোকপুরাণ হিসেবে পরিচিত। তাই লোকপুরাণ হলো মানুষের প্রাচীনতম কাহিনী। লোককথার এ বিভাগটিতে মানবমনের রহস্যঘন রূপটির সন্ধান সবচেয়ে মৌলিক ও নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়। যে জনগোষ্ঠী যত প্রাচীন ও পুরাতন মূল্যবোধের অধিকারী, তাদের সংস্কৃতিতে লোকপুরাণও তত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। লোকপুরাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্যার জি. এল গোম বলেন, লোকপরাণ হলো, 'দি সায়েন্স অব এ প্রিসায়েন্টিফিক এজ'।[৫৭] আকাশ-বাতা, গাছপালা, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, নদী, পাহাড়, গাছপালা, পশুপাখি অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধানের মৌল ভাবনা থেকেই আদিম সমাজে এ ধরনের কাহিনী গড়ে উঠেছে বলে ধারণা করা হয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো––

ক. লোকপুরাণ হলো সৃষ্টিকাহিনিমূলক লৌকিক আখ্যান, যাতে সুদূর অতীতে মানুষ সৃষ্টির রহস্যভেদ করার কৌতূহল প্রবাশ করেছে।

খ. পুরাণকথার রচনাকাল এবং রচয়িতা সম্পর্কে জানা যায় না। এসব কাহিনীতে লোকসমাজের সমষ্টিমনের পরিচয় ও সৃষ্টিসামর্থ্য রূপায়িত।

গ. এসব কাহিনীতে বিভিন্ন বস্তু, মানুষ, পশু-পাখি-প্রাণীকূলের জন্মের কথা বিবৃত। এতে বাস্তবের যুক্তি-নিষ্ঠার পরিচয় না মিললেও আদিম মানুষের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী জগৎ-জীবন সম্পর্কে ভাববার ও ব্যাখ্যা করা প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

ঘ. এসব কাহিনী বহুলাংশেই দেব-দেবীনির্ভর অলৌকিক কাহিনী, যেখানে রূপকের প্রাধান্য রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষই যে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়, তা অনুধাবন করা চলে।

ঙ. সাধারণ মানুষ এসব কাহিনীতে অনুপস্থিত। প্রাত্যহিক জীবনের পরিচয় এসব কাহিনীর উপজীব্য হয় না।

চ. এসব কাহিনী সম্প্রসারণশীল, পরিবর্জন-পরিমার্জনযুক্ত এবং ভ্রাম্যমান।[৫৮]

বাাংলার লোকসংস্কৃতিতে রামায়ণ, মহাভাররের কাহিনীগুলোর লৌকিক রূপ কয়েক হাজার বছর ধরে লোকসমাজে প্রচলিত। তাছাড়া ধর্মঠাকুর, সূর্যদেবতা, মনসা, গোরক্ষনাথ, শীতলা, কল্যাণেশ্বরী, প্রমুখ দেবদেবীকে নিয়েও বিভিন্ন লোকপুরাণ রচিত।[৫৯] ধর্মীয় শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সামজিক-সাংস্কৃতিক মূর‌্যবোধ, আদর্শ, অনুশাসন ও মানববৃত্তির পরিচয় এসব কাহিনীতে অনবদ্যরূপে ফুটে উঠেছে।

কিংবদন্তি-- শীলা বসাকের মতে--

সত্য, মিথ্যা, সম্ভাবনা-এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মিলিত সমষ্টি কিংবদন্তি। কিংবদন্তির রচয়িতার সন্ধান মেলে না। এটা লোকের মুখে মুখে বিভিন্ন কথা বা বিশ্বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কিংবদন্তি ইতিহাস না হলেও অনেকক্ষেত্রে তা ইতিহাসের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ কোনো ঘটনা যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন তা কিছুটা কল্পনার পাখায় ভর করে কিংবদন্তির রূপ নেয়। 'কিংবদন্তি'- কিছু বলে। ... অতীতে কত ঘটনাই ঘটে তার আর পুনরাবৃত্তি হয় না; সেই ঘটনার ক্ষীণ সূত্র ধরে কিংবদন্তির যাত্রা শুরু। তাই বলা যায় যে ইতিহাস যেখানে নীরব, কিংবদন্তি সেখানে মনোরম কাহিনি নিয়ে সরব হয়ে উঠেছে। কিংবদন্তি বাস্তবের সীমানা ছাড়িয়ে কল্পনার ডানা মেলে দিয়ে অবাধে বিচরণ করছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নভোমণ্ডলে। ফলে বাস্তব নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বা চিহ্ন নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কল্পিত কাহিনি। বাংলায় অজস্র কিংবদন্তির উদ্ভব ঘটেছে এইভাবে। বিশাল প্রাসাদ, পোড়ো ভিটে, পুরোনো বটগাছ, দীর্ঘ নদী, প্রকাণ্ড মাঠ, বিরাট পুকুর বা দিঘি, ভাঙা মন্দির বা মসজিদ, মঠ, গির্জা, শ্মশান, সমাধিস্থল প্রভৃতির সঙ্গে ইতিহাসের চরিত্র যুক্ত হয়ে পড়ে। কিংবদন্তি সেখানে এত প্রবল যে মূল ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিহাস যখন কথা বলে না, কিংবদন্তি তখন যেন বিচারকের মতো রায় দান করে। তাই বলা যায় যে কিংবদন্তি কোনও প্রামাণ্য দলিল বা ইতিবৃত্ত নয়, কোনও নীতিকথা বা যুক্তিসিদ্ধ কাহিনিও নয়, অলৌকিক ঘটনাবলীই এর উপজীব্য। ঘটনা অতীত হয়ে যায় কিন্তু ইতিগানের সেইসব ঘটনার এক একটি রূপকে কিংবদন্তিই জীবন্ত করে রাখে। পূর্বকালে সংগীত বা উপাখ্যান হিসেবে যে কাহিনিগুলি পরিচিত ছিল, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে কিছু সংস্কার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও স্থানের সঙ্গে জড়িত য়ে যে মুখরোচক গালগল্পের সৃষ্টি কওে তাকেই বলা হয় কিংবদন্তি। তাই বলা যায় যে ইতিহাস যেখানে নীরব, কিংবদন্তি সেখানে মনোরম কাহিনি নিয়ে সরব হয়ে ওঠে। অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনার ক্ষীণসূত্র ধরে কিংবদন্তির যাত্রা শুরু হয়। রূপকথাকে লোকমানসজাত গল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কিংবদন্তির কাহিনীকে লোকসমাজের বাসিন্দারা সত্য ভেবে বিশ্বাস করে।[৬০]

লোকবিজ্ঞানীরা এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন--

বিশেষ অঞ্চলে সংঘটিত কোনো ঘটনা অথবা কোনো চরিত্রকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র আখ্যান যখন সেই অঞ্চলের মানুষ প্রজন্ম পরম্পরায় মনে রাখে এবং বিশ্বাস করে, পরবর্তী প্রজন্মেও কাছে তার উত্তরাধিকারিত্ব রেখে যায়, লোককথার লক্ষণাক্রান্ত ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট মূলত আচারাদির সঙ্গে অসম্পৃক্ত এবং ঐতিহাসিক মর্যাদালাভে বঞ্চিত বিষয়কেই আমরা কিংবদন্তী বলে অভিহিত করতে পারি।[৬১]

বিশেষ অঞ্চলে সংঘটিত কোনও ঘটনা বা চরিত্রকেন্দ্রিক কাহিনি যা সে অঞ্চলের মানুষ প্রজন্ম-পরম্পরায় মনে রাখে এবং বিশ্বাস করে পরবর্তী প্রজন্মেও কাছে তার উত্তরাধিকার রেখে যায় সেইসব বিষয়কে কিংবদন্তি বলা হয়।[৬২]

অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনা, বিষয় বা চরিত্রকে অবলম্বন করে কোনো বিশেষ অঞ্চলে যে ক্ষুদ্র আখ্যান গড়ে ওঠে, লোক-পরম্পরায় বাহিত হয়ে যে কাহিনি স্মৃতি ও শ্রুতিকে আশ্রয় করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচলিত থাকে, লোককথায় লক্ষণাক্রান্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অবয়ব বিশিষ্ট লোকসমাজে সত্য ঘটনা বা ইতিহাস বলে প্রচলিত কাহিনিই হল কিংবদন্তী।[৬৩]

বৈশিষ্ট্য--

শীলা বসাকের মতে, কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

ক. নির্দিষ্ট কোনো স্থান, নির্দিষ্ট কোনো সময় বা কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তির উদ্ভব।

খ. বীরগণ কিংবদন্তির নায়ক। এরা লৌকিক বা অতিলৌকিক চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

গ. অতীত এবং বর্তমান কিংবদন্তির মূল উপজীব্য যা প্রজন্ম-পরম্পরায় বিশ্বাস করে।

ঘ. কিংবদন্তিতে আছে সত্যেও ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিচিত্র জনশ্রুতি, সমাজজীবনের প্রতিবিম্ব, মানসিকতার বাস্তব ছায়া এবং লোককল্পনা প্রভৃতি।

ঙ. লোকসমাজের সামাজিক প্রয়োজনে, ধর্মীয় তাগিদে, এমনকি অনাবিল আনন্দলাভের কামনায় কিংবদন্তিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ. কিংবদন্তির মূল উদ্দেশ্য লোককথার মাধ্যমে গল্পরস বিতরণ।

ছ. মৌখিক ঐতিহ্য কিংবদন্তির মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা এর গতিশীলতাকে নিরূপণ করে।

জ. কিংবদন্তির বহিরঙ্গে বহু পরিবর্তন ঘটে এবং কালে কালে তার অবয়বে কল্পনার রং লাগে।

ঝ. কিংবদন্তি যাকে ঘিরে সৃষ্টি হয় সেই ঘটনাস্থল, ব্যক্তি বা বস্তু স্বচক্ষে দেখা। (এর পটভূমি বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত

ঞ. কিংবদন্তিতে অলৌকিকতা এবং অতিরঞ্জনের প্রআব ক্রিয়াশীল।

ঞ. কিংবদন্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক হয়।

ট. কিংবদন্তির কাহিনি বা ঘটনা সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন এগুলিকে লোকে বিশ্বাস করে।[৬৪]

শ্যামসুন্দর প্রধান এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন--

১. কিংবদন্তী বাস্তব ও কল্পিত ঘটনার সংমিশ্রণে গঠিত।

২. সাধারণত ক্ষুদ্র আকৃতির।
৩. অতীতের কোনো বিশেষ যুগের সৃষ্টি নয়। বরং তা এক চলমান প্রক্রিয়া। সুদূর অতীত থেকে যা সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানেও যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে, এবং ভবিষ্যতেও তা চলমান থাকবে বলে ধারণা করা চলে।
৪. জনজীবনের (লোকসমাজের) বহু ঘটনা, যা লিখিত বা প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে স্থান পায় না তা বিধৃত থাকে কিংবদন্তিতে। যেখানে লিখিত ইতিহাস চুপ করে থাকে, সেখানে কিংবদন্তী মুখর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কিংবদন্তী লোকায়ত জীবনের যথার্থ ইতিহাস বা ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। লিখিত ইতিহাসের সীমানা পেরিয়ে যার বিস্তার।
৫. কিংবদন্তির পরিণতি কিছু ক্ষেত্রে মিলনান্তক হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিয়োগান্তক হয়। এখানেই কিংবদন্তি অন্যান্য লোককথার থেকে পৃথক।
৬. এতে চরিত্রের বিকাশ সীমিত। এক বা দুটি চরিত্রকে অবলম্বন করে কিংবদন্তির কাহিনী রচিত হয়।
৭. কিংবদন্তির রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না।
৮. এতে আয়তনের সংক্ষিপ্ততার কারণে গল্পরস যৎসামান্য থাকে এবং ঘটনার ঘনঘটাও অপেক্ষাকৃত কম থাকে।
৯. কিংবদন্তি আন্তর্জাতিক নয়। বরং তা এতটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। সাধারণত কোনো অঞ্চলের কোনও ব্যক্তি, স্থান বা বস্তুকে অবলম্বন করে প্রচলিত কিংবদন্তি ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ

থাকে। অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে না। অর্থাৎ অন্যান্য লোককাহিনির তুলনায় কিংবদন্তি অনেক বেশি আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত।[৬৫]

বরুণকুমার চক্রবর্তী কিংবদন্তির সঙ্গে লোককথার প্রতিতুলনার মাধ্যমে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ণয় করেছেন--

> এমন অনেক কিংবদন্তির সাক্ষাৎ মেলে যার পিছনে পুরোপুরি বাস্তবের সমর্থন রয়েছে। আবার এমন অনেক কিংবদন্তি আছে যেগুলির সঙ্গে হয়ত বাস্তবের সম্পর্কই নেই। ... চরিত্রে কিংবদন্তি লোককথাধর্মী। অবম্য লোককথা এবং কিংবদন্তী কিছুটা সমলক্ষণাক্রান্ত হলেও দুই অভিন্ন এমন কথা বলা যাবে না। পার্থক্যটা কী রকম দেখা যাক– লোককথা আকৃতিতে মোটামুটি ছোটগল্পের তুল্য। খুব বড় নয় বা খুব ছোট নয়। কিন্তু কিংবদন্তী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রাকৃতির। লোককথা পরিপূর্ণ রূপে গল্পের লক্ষণাক্রান্ত হলেও কিংবদন্তিতে গল্পরস পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর। লোককথায় যেমন কাহিনী কাঠামো থাকে; একটি বিশেষ উপস্থাপন ভঙ্গি অনুসৃত হয়, সেক্ষেত্রে কিংবদন্তীতে দেখি একটি ঘটনা বা অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত হতে। সেখানে কাহিনী কাঠামো তেমনভাবে লক্ষিত হয় না। কিংবদন্তিতে শ্রোতার কৌতূহল জাগে, কিন্তু লোককথার মতো আকর্ষণ, লোকখতার গতিশীলতা, ধারাবাহিকতা কিংবদন্তীতে অনুপস্থিত। লোককথায় মানুষ অথবা মনুষ্যেতর প্রাণীর একাধিক চরিত্র বিদ্যমান। লোককথায় একটা পরিণতিও লক্ষিত হয়। কিন্তু কিংবদন্তিতে অনেক সময় চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না। অথবা মিললেও এক বা সীমিত সংখ্যক মেলে। কিংবদন্তির ক্ষেত্রে পরিণতির কোনো প্রশ্নই নেই। তবে লোককথা যেমন গদ্যে রচিত, কিংবদন্তীও তাই। লোককতা যেমন স্মৃতি-শ্রুতিনির্ভর, কিংবদন্তিও তাই। লোককথা ও কিংবদন্তি উভয়ের রচয়িতারই সন্ধান মেলা কঠিন। ... কিংবদন্তি টিকে থাকে লোকবিশ্বাসের উপর কিন্তু তাই বলে লোকবিস্বাস এবং কিংবদন্তি কখনোই এক নয়। ... কিংবদন্তি কোনো ঘটনা, কোনো স্থান নাম, বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর উৎপত্তি অথবা তাদের আক্রোশ বা করুণা বিতরণ, নদনদী বৃক্ষেরও উদ্ভব বা তাদের নামকরণ সম্পর্কিত কাহিনী। অশরীরী বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত বিষয় মূলত কিংবদন্তির উপজীব্য। ... কিংবদন্তির সঙ্গে লোকসমাজের ঐহিক ভালোমন্দের প্রায়শই সম্পর্ক থাকে না। ... কিংবদন্তিতে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান লভ্য হলেও এতে ... অনেক অতিরঞ্জন থাকে। লোকমুখে কথা ও বিশ্বাস ছড়াতে ছড়াতে অনেক সময় তা এমন একটা রূপ নেয় যার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এমনকি অবিমিশ্র কল্পনার সন্ধানও মেলে কিংবদন্তিতে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে বিশেষভাবে স্থানীয় ইতিহাস রচনায় কিংবদন্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।[৬৬]

বৈশিষ্ট্য–

ক. সচরাচর কোনো এক বিশেষ স্থানে কোনো এক বিশেষ সময়ে কোনো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় কিংবদন্তী।

খ. কিংবদন্তীর সঙ্গে যুক্ত চরিত্র বা স্থানের নিজস্ব এবং প্রত্যক্ষ একটি পরিচয় ছিল বলেই সাধারণ মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কওে তাকে। সবসময় যে বাস্তব চরিত্র বা বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে কিংবদন্তী উদ্ভূত হয় তা নয়, অনেক সময় অলৌকিক চরিত্র বা ঘটনা অবলম্বনেও কিংবদন্তী সৃষ্ট হয়।

গ. কিংবদন্তির উপজীব্য সর্বদাই অলৌকিক নয়। বরং বিভিন্ন লৌকিক প্রসঙ্গও এর অন্তর্গত।

ঘ. কিংবদন্তী যে কেবল অতীতের ব্যাপার তাও নয়। বর্তমানের সঙ্গেও তার যোগ, দ্বিবিধভাবে। একদিকে অততির কিংবদন্তী বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বাস কওে আসছে সে দিক দিয়েও বটে। তা ছাড়া যে-কোনো ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষের আচরণে মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, যে ঘটনা মানুষ যুক্তি দিয়ে সব সময় ব্যাখ্যাা করে উঠতে পারে না, সেগুলি শেষপর্যন্ত কিংবদন্তীর রূপ নেয়।[৬৭]

লোকবিজ্ঞানীদের মতে, কোনো আঞ্চলিক স্থান, পাহাড়-পর্বত, বিল-ঝিল, নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, লৌকিক দেব-দেবী, আঞ্চলিক স্তরে ইতিহাসখ্যাত কোনো নরনারী বা বিশেষ কিছু ঘটনা, যা অঞ্চলবিশেষের মানুষজনের মনে দীর্ঘকাল ধরে সজীব হয়ে আছে, যেগুলি স্থানয়ি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মাত্রা যোগ করে থাকে–এসবই লোককথা

এবং কিংবদন্তিও অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। কিংবদন্তি বস্তু সমষ্টিগত মনের সৃষ্টি। সাধারণ মানুষেরই ভাবনা ও আগ্রহের রূপ বিকশিত করেছে কিংবদন্তি। কিংবদন্তির বহিরঙ্গগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তাই কালে কালে তার অবয়বে নুতন কল্পনার রং চমক লাগায়। কোনো দেখা বস্তু নিয়ে মানুষের ভাবনা, আবেগ, কল্পনা ও শ্রুতির সংমিশ্রণে যে কাহিনির সৃষ্টি হয়, তাই কিংবদন্তি। কিংবদন্তি-জগতের আয়তন বিশাল ও বহুমুখী। লোকের মুখে পুরুষানুক্রমে এর চলমান স্থিতি। অবিরাম চলেছে এর সৃষ্টিলীলা। রূপকথাকে শ্রোতারা লোকমানসজাত গল্প হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু কিংবদন্তিকে তারা বিশ্বাস করে–এটাই কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্য।[৬৮]

কিংবদন্তিতে যে সব চরিত্র রয়েছে সেগুলি পুরাকাহিনীর চরিত্রগুলির মতো নির্বিশেষ নয়, বরং এদের বিশেষ পরিচয় থাকে। ... কিংবদন্তিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন লোকগীতি, গীতিকা, গাথাগান রচিত হয়। দিব্যজ্যোতি মজুমদার জানিয়েছেন--

> গীতিকার মধ্যে যে কাহিনীগুলি রয়েছে তা কখনো কখনো কিংবদন্তি থেকে গৃহীত। বাংলার বিখ্যাত মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, গোরক্ষনাথ-মীননাথ, গোপীচাঁদ-ময়নামতী-মানিকচাঁদ প্রভৃতি গীতিকার আদি উৎস বাংলার পল্লীতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন কিংবদন্তি। এইসব গীতিকা লিখিতরূপে সম্পাদিত হয়ে প্রচার লাভ করেছে। ... প্রতিটি লোকসমাজে ... কিংবদন্তি থাকবেই। ... কিংবদন্তিকে বিশ্লেষণ করলে লোকসমাজের মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে। সেই সমাজের আগ্রহ ও কল্পনা লুকিয়ে থাকে কিংবদন্তির দেহে। ... একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, পুরাকাহিনীর অনেক পরবর্তীকালে এর জন্ম। মানুষ তখন আদিম জীবন থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে এসেছে। পুরাকাহিনীর কল্পকথার অতিলৌকিক স্তরের পরে যখন বাস্তব কিছু ইতিহাসবোধ সমাজের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখনই এসব কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে। অবশ্য আজ তাদের যে রূপে আমরা দেখছি সেরূপ পরিবর্তিত হয়েছে বার বার, বহু সময় ধরে। লোককথার অন্তর্বিহীন অলৌকিকতার উপকরণগুলির সরণি ধরেই কালক্রমে কিংবদন্তির অভ্যুদয়।[৬৯]

লোকসঙ্গীত-- লোকসঙ্গীত অর্থে, এক কথায় লোকজীবনের গানকে বোঝায়। এর উৎস গ্রামের জল, মাটি, হাওয়া। তাই এর মধ্যে থাকে পরম্পরাগত শব্দ ও সুরের ঐতিহ্য, যাকে ভিত্তি করে গ্রামীণ সংস্কৃতি ধারাবাহিকতার পথ প্রশস্ত করে। অনেক বিবর্তন পরিবর্তনের পথ অতিক্রম করে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। প্রয়োজন বোধে এর উদ্ভব; এবং নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে সমাজের গভীরে শিকড় বিস্তার করে। জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ বেদনা এবং প্রত্যাশা পূরণেই এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট। নিজস্ব আঞ্চলিক পরিবেশে বিকাশ লাভ করে লোকসঙ্গীত তার অতুল বৈভব আর সংবেদনশীল গুণরাজি নিয়ে মানচিত্রের সীমানা লঙ্ঘন করে; দেশ, কাল, পাত্রের গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি। একক সত্তার অনুভূতি সম্পৃক্ত লোকসঙ্গীতের উচ্চারিত ভাষা ও সুর সর্বজনীন স্তরে উন্নীত হয়। এর কারণ লোকসঙ্গীতের সহজ সরল অকৃত্রিম আবেদন, যা সমাজের হৃদস্পন্দন থেকে উৎসারিত। বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা না হয়ে হৃদয়ের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ধর্মে, কর্মে, পার্বণে এবং গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমি নিয়ে এর বিস্তার ঘটে একক অথবা সম্মেলক কণ্ঠে। কবে লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করেছে সহজাতবৃত্তির ফলে। আদিমকালে মানুষের জীবন চর্যায় সুরই ছিল একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। ভাষার ব্যবহার এসেছে অনেক পরে। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৪) লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায়, 'লোকসঙ্গীত হল লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি ও সুর সহযোগে গীত; সাধারণত কর্ম, প্রেম ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত একজাতয়ি গান যা স্মৃতির মাদ্যমে বাহিত বলিষ্ঠ জীবনচেতনা ও সুরের ও গায়নরীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে জীবনমুখী।'[৭০]

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ শাখা লোকসঙ্গীত। ... বাংলাদেশের হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন নামে বর্তমানে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে অন্তত সত্তর প্রকার লোকসঙ্গীত প্রচলিত। এগুলো হলো – অষ্টক গান, আলকাপ গান, ওন্নি গান, কড়চা গান, কবিগান. কীর্তন গান, খেমটা গান, ক্ষেত নিড়ানির গান, গম্ভীরা গান, গাজনের গান, গাজীর গান, গোরক্ষনাথের মাগনের গান, গোসা

গান, ঘাটু গান, চটকা গান, ছাদ পিটানোর গান, জাগ গান, জারি গান, ঝাপান গান, ঝুমুর গান, তর্জা গান, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, ধামালি গান, ধুয়া গান, নাটুয়া গান, নৈলা গান, বৃষ্টির গান, নৌকা বাইচের গান, টুসু গান, পটুয়া সংগীত, বর্গ গান, বাইলান্তি গান, বাউল গান, বাঘাই শিরনির গান, বারমাসী গীত, বিচার গান, বিচ্ছেদের গান, বেদের গান, বৈঠকি গান, বোলান গান, ব্রতের গীত, ভাওয়াইয়া গান, ভাটিয়ালি গান, ভাঁজো গান, ভাদু গান, ভাসান গান, মর্সিয়া গীত, মাইজভান্ডারি গান, মাদার পীরের গান, মানিক পীরের গান, মারফতি গান, মালসী গীত, মাহুত বন্ধুর গান, মৈষাল বন্ধুর গান, মুর্শিদি গান, মেয়েলি গীত, যাত্রাগান, রয়ানি গান, লেটোগান, শিরালির গান, সখি বা সহেলি গীত, সারি গান, হাতি খেদার গান, হাপুর গীত, হাবু গান, হোলির গান, হুদমার গান, হুলই গীত ইত্যাদি। এসব গান লোকের মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে।[৭১]

বাংলার লোকসংগীত বাণী-প্রধান হলেও সুরের মাধ্যমে তা প্রাণবন্ত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। অনেকের ধারণা, শিক্ষা ও অনুশীলন ছাড়াই লোকসংগীত গাওয়া যায়। কিন্তু তা সঠিক নয়। এক এক ধারার লোকসংগীতের এক এক ধরণের সুর আছে, যা পূর্বপুরুষের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ কওে আয়ত্ত করতে হয়। গানের সুর শুনেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে দিতে পারেন, গানটি বাউল না কীর্তন, ভাওয়াইয়া না ভাটিয়ালি, জারি না সারি, মারফতি না মুর্শিদি গান। গানগুলির প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন স্বর, লয়, ছন্দ ও গায়কি ঢং আছে। আধুনিক বাংলা গানের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ চারটি পর্বের যে সাঙ্গীতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে, লোকসংগীতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া তার বাঁধা-ধরা রীতি অনুসৃত হয় না। সাধারণত দুই বা চার চরণের পর্বসমষ্টি বা পর্ব, সঙ্গে এক বা দুই চরণের ধুয়া দ্বারা লোকসংগীতের কায়া গঠিত হয়। কতক শব্দ বা পদগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি লোকসংগীতের অপর বৈশিষ্ট্য।[৭২]

মন্ত্র-- সংস্কৃত 'মন্ত্র' শব্দের বিবিধ অর্থ থাকলেও বাংলায় প্রচলিত অর্থে 'মন্ত্র' বা 'মন্তর' শব্দটি লোকসংস্কৃতি বিষয়ানুশীলনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। নিঃশব্দ অথবা সশব্দে উচ্চারিত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন শব্দ সমষ্টি 'মন্ত্র' বা 'মন্তর' নামে পরিচিত।[৭৩] বরুণকুমার চক্রবর্তী মন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ' ছন্দের নিগড়ে আবদ্ধ, মূলত আবৃত্তি যোগ্য, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধিও জন্য ব্যবহৃত অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন শব্দ নিচয়কেই বলা হবে মন্ত্র।'[৭৪] লোকসাহিত্যের প্রাচীন নানা শাখার মধ্যে মন্ত্র অন্যতম। 'মন্ত্রের চর্চা একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মন্ত্রগুণী অন্যের কাছে মন্ত্র সহজে প্রকাশ করতে চায় না। প্রকাশ করলে মন্ত্রেও কার্যকাইরতা গুণ হারিয়ে ফেলে বলে সে বিশ্বাস করে।[৭৫] মন্ত্র হলো জাদুবিদ্যার একটি অঙ্গ যা লোকভাষায় প্রকাশ করা হয়। জাদুবিদ্যা অতি প্রাচীন বিশ্বজনীন বিদ্যা। মন্ত্র, আচার ও নানাবিধ দ্রব্য জাদুবিদ্যার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মন্ত্র পদ্যের আঙ্গিকে ছন্দোবদ্ধ চরণাশ্রিত শব্দসমষ্টি, যার মধ্যে জাদুশক্তি আছে। এরূপ মন্ত্র উচ্চারণ বা আবৃত্তি করে এবং তদসংশ্লিষ্ট কিছু আচার বা ক্রিয়া পালন করে ঐ জাদুশক্তির প্রকাশ ঘটাতে হয়। 'তাবিজ, কবচ, মাদুলি, আংটি, জড়ি, শিকড় ইত্যাদি বস্তুকে মন্ত্রপূত করেও জাদুগুণসম্পন্ন করা হয়। জাদু-মন্ত্র শিক্ষার ও চর্চার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর লোক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে মন্ত্র শিক্ষা করে থাকে। এ-শিক্ষা সময়-সাপেক্ষ; বিশেষ নিয়ম ও কঠোর কৃচ্ছ্রতা পালন করতে হয়।'[৭৬] মানব সমাজে মন্ত্রের উদ্ভব এবং ব্যবহার অতি প্রাচীনকালে। আদিম মানুষের সর্বপ্রাণবাদ ও সর্বাত্মার ধারণা এবং যাদুবিশ্বাস মন্ত্রের উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। অতিপ্রাকৃত শক্তিকে স্তব-স্তুতির মাধ্যমে বশীভূত করা, কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঐন্দ্রজালিক প্রয়াসের মাধ্যমরূপে মন্ত্রের ব্যবহার ক্রমে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে মঙ্গলের পাশাপাশি অমঙ্গল সাধনের অস্ত্ররূপেও মন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। লোকবিশ্বাস, এই মন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রার্থনা পূরণ ও নানা প্রকার সমস্যার প্রতিকার যেমন সম্ভব, তেমনি এর প্রত্যাঘাতমূলক ও প্রতিরোধাত্মক ক্ষমতাও বর্তমান।[৭৭]

বৈশিষ্ট্য– বরুণকুমার চক্রবর্তী মন্ত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানিয়েছেন–

১. মৌখিক ভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষায় রচিত।

২. কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। মৌখিক বিদ্যমান।

৩. অমার্জিত, সুষমাহীন কাব্যিকতা বিমুক্ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ হীন অথবা পূর্ণ অর্থে প্রযুক্ত।

৪. তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন।

৫. সুনির্দিষ্ট নয়, পরিবর্তনশীল।

৬. পাঠান্তর সুলভ।

৭. ব্যাপকতর আঞ্চলিকতার পরিচয় বাহী।

৮. মাঙ্গলিক এবং একই সঙ্গে তা ক্ষতিকারকও।

৯. আনুপূর্বিকতা রক্ষিত নয়।

১০. কেবলমাত্র উপলক্ষে ব্যবহৃত।

১১. লোকসমাজই স্রষ্টা।

১২. আধ্যাত্মিকতা বিমুক্ত।

১৩. মূলত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেই এর বিশ্বাস যোগ্যতা সীমিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একের হয়ে অন্যে আবৃত্তি করে অথবা প্রয়োগ করে।[৭৮]

তিনি লৌকিক মন্ত্রগুলির গঠন তথা আঙ্গিকগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানিয়েছেন––

ক. বেশ কিছু লৌকিক মন্ত্রে কথোপকথন রয়েছে। স্বভাবতঃই এইসব লৌকিক মন্ত্রে এক ধরনের নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো লৌকিক মন্ত্রে দিব্যি একটি গল্প উপস্থাপিত হয়।

খ. মন্ত্রে বিশেষ সংখ্যার গুরুত্ব রয়েছে। যেমন–তিন যাদুকরী সংখ্যা। মন্ত্রে সর্বত্রই তিনের বাড় বাড়ন্ত।

গ. বেশ কিছু লৌকিক মন্ত্রের পংক্তিতে আজ্ঞাকারীর নাম উল্লিখিত, যে আজ্ঞাকারীর আজ্ঞায় বিশেষ কোনো সমস্যার সমাধান উপস্থাপিত। যেমন–কার আজ্ঞা? বিষ হরির আজ্ঞা ... আসলে মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এমনতর সংযোজন।

ঘ. সংস্কৃত মন্ত্রের অনুসরণে কোনো কোনো লৌকিক মন্ত্রে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখি, অবশ্যই মন্ত্রের গাম্ভীর্য ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে।

ঙ. যেখানে ফলপ্রাপ্তির আশা সেখানে সাম্প্রদায়িকতা টেকেনি। মন্ত্র রচয়িতারা অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমান–এই উভয় সম্প্রদায়ের দেব দেবী, পীর পয়গম্বরদের প্রসঙ্গ এনেছেন আনুকূল্য লাভের আশায়।

চ. কিছু লৌকিক মন্ত্রে ... আচরণীয় আচার সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শুধু মন্ত্রোচ্চারণই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে কিছু আচার পালনও আবশ্যক।

ছ. বৈজ্ঞানিকভাবে মন্ত্রের কার্যকারিতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। তবে যেসব মন্ত্র আচার সমন্বিত, যে আচারে এমন কিছু দ্রব্যের ব্যবহার স্বীকৃত তা সে বাহ্যিক ভাবেই ব্যবহৃত হোক অথবা ভক্ষণ করা হোক, ভেষজ গুণ সম্পন্ন যদি হয় তবে তা কার্যকরী হয়, অনেকটা লোক ঔষধের মত। কিন্তু তুলনামূলকভাবে মন্ত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রোচ্চারণে দুর্বলচেতা মানুষও অনেকখানি মানসিক শক্তি লাভ করে, চরম নিরাশা থেকে আশাবাদী হয়ে ওঠে। মনের প্রভাব স্বভাবতই দেহে পড়ে। তার সুফলও মেলে।

জ. মন্ত্রে প্রায় অনিবার্যভাবে যুক্ত হয় দেব দেবী সাধু সন্ন্যাসী কিংবা পীর-পয়গম্বরদের নাম ... যাতে মন্ত্রটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, মন্ত্রটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লৌকিক মন্ত্রে বিষহরী, কামেশ্বরী, হরি, চৈতন্য, কালী, বিসমিল্লাহ, নূরী জোহরী, আল্লা, মোহাম্মদ, শ্রীগৌরাঙ্গ, পার্বতী, দুর্গা, রাধা, কৃষ্ণ, ষষ্ঠী মা প্রভৃতি নাম উল্লেখ্য।

ঝ. লৌকিক মন্ত্রে বিভিন্ন বস্তু, জীব-জন্তু এমনকি অশরীরী প্রাণীও উল্লিখিত হয়েছে।

ঞ. মন্ত্রে অলংকারের ব্যবহার কম হলেও কিছু কিছু মন্ত্রে ছড়ার আদল লক্ষণীয়।[৭৯]

উপযোগিতা– মন্ত্রের রয়েছে বিশেষ উপযোগিতা, যা লোকসমাজে স্বীকৃত। ওয়াকিল আহমেদ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন। তাঁর মতে, মন্ত্রে মন্ত্রচারীর বিশেষ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়। মন্ত্র অব্যর্থ ফল প্রত্যাশা করে, এজন্য এতে প্রথমে আবেদন-নিবেদনের সুর থাকে, তাতে ফল না পাওয়া গেলে দাবীর সুর তোলা হয়। যে সমস্ত দৈব, অতীন্দ্রিয়, ভৌতিক, নৈসর্গিক, পার্থিব, পাশব শক্তিকে বাহুবলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অথচ তাদের কাছ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়-সেসব শক্তিকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে বা বশে আনতে চায়। মন্ত্র বা ইন্দ্রজাল মানুষের ইচ্ছা পূরণের এরূপ একটি হাতিয়ার। এর উৎস মস্তিষ্ক; বুদ্ধি ও আচরণ দ্বারা একে কার্যকর করতে হয়। ... মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক শক্তির উদ্দেশ্যে।[৮০] সঞ্জীব নাথ মন্ত্রের ভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতা নির্দেশ করেছেন এবং এর ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে জানিয়েছেন––

> মন্ত্রের রচনারীতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রাচীনকালে মন্ত্র ছন্দবদ্ধ ভাষাতেই রচিত হত। পরবর্তীকালে কিছু কিছু মন্ত্র গদ্যেও রচিত হতে থাকে। ... অধিকাংশ মন্ত্রেরই প্রকাশভঙ্গী জোরালো এবং ভাষা আক্রমণাত্মক। মন্ত্রের মধ্যে উপমা অলঙ্কারের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। মন্ত্রপাঠে ত্রুটি হলে অভীষ্ট ফল লাভ সম্ভব হয় না, উপরন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে–লোকসমাজে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকায় স্থানিক কিংবা কালিক ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাষার দ্রুত পরিবর্তন ঘটলেও মন্ত্রের ক্ষেত্রে সেরূপ ঘটে না। একারণে মন্ত্রের মধ্যে অনেক অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই সব শব্দের অর্থ সম্যকরূপে অবহিত না থাকায় মন্ত্রের ভাষা সাধারণের নিকট রহস্যমণ্ডিত মনে হয়। ভাষাবিজ্ঞান গবেষণায় প্রাচীন শব্দ প্রাপ্তির সম্ভাব্য ক্ষেত্র রূপে মন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মন্ত্রের মধ্যে কোনো কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ মন্ত্রের সঙ্গেই কোনো না কোনো প্রকারের ক্রিয়ামূলক আচরণ বা বিশেষ বস্তু ব্যবহারের রীতি প্রচলিত। মন্ত্র একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মটিফ রূপে চিহ্নিত। লোককথা, গীতিকা, পালাগান ইত্যাদিতে অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই মটিফটির উজ্জ্বল উপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। মন্ত্রের সঙ্গে ছড়ার সম্পর্ক বিষয়ে বলা যায়, ... অনেক মন্ত্রের ব্যবহারিক গুরুত্ব হারিয়ে গেলেও ছড়া রূপে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়।[৮১]

বাগধারা –– বাগধারার নামকরণ সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইংরেজিতে একে 'ইডিয়ম' (idiom) হিসেবে অভিহিত করা হলেও বাংলায় বরুণকুমার চক্রবর্তী একে বলেছেন 'বাক্‌পদ্ধতি', [৮২] সুভাষ ভট্টাচার্য এর নামকরণ করেছেন 'বাগভঙ্গি'[৮৩] এবং সুধীরচন্দ্র সরকার একে বলেছেন 'বিশিষ্টার্থক শব্দাবলী' [৮৪] বরুণকুমার চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'বাগ্‌ধারা বা ইডিয়ম হল বাক্‌পদ্ধতি 'mode of expression

peculiar to a tongue'। প্রবাদ কিন্তু একটি সম্পূর্ণ বাক্য 'A proverb is a short sentence'; বাংলায় ইডিয়মকে বলা হয় শব্দগুচ্ছ, যা নাকি প্রবাদের অংশ মাত্র। ইডিয়মকে আমরা বিভিন্ন বাক্যের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করি বিশেষ ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে। বাগ্ধারা প্রত্যেক ভাষাতেই আছে। বলাবাহুল্য বাগধারা আক্ষরিক অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে না। বাচ্যার্থ অতিক্রম করে বিশেষ এক অর্থকে তা প্রকাশ করে থাকে। ... যেমন আদায় কাচকলায়। এখানে আদা অথবা কাঁচকলা কোনটির অর্থই প্রধান হয়ে ওঠেনি। শত্রুতার সম্পর্ক বোঝাতেই এই বাগধারাটি প্রযুক্ত হয়। যেমন রাম আর শ্যামের মধ্যে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক'। সুভাষ ভট্টাচার্য [৮৫]বাগধারার কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন--

১. সমাজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই বাগধারায় প্রবাশিত হয়। এদিক থেকে প্রবাদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে।
২. বাগধারা সম্পূর্ণ বাক্য নয়, বরং বাক্যাংশ।
৩. বাগধারার ব্যবহারে বাক্য তীক্ষ্ম ও রসসিক্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রে বাক্য গভীরতাও লাভ করে।
৪. বাগধারা সাধারণভাবে শব্দার্থে গৃহীত হয় না। বিশেষ অর্থের জন্যই সেগুলি বাগধারা হিসাবে পরিগণিত। তবে বাগধারা মাত্রেই যে ... আলংকারিক অর্থে প্রযোজ্য তাও নয় [৮৬] সুধীরচন্দ্র সরকার বাগধারার উদ্ভব সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে–এই বিশিষ্টার্থক শব্দের উদ্ভব কোথা হইতে এবং কি প্রকারে হইল? প্রথমত, এই সকল বাক্যাংশের কিছু কিছু বাংলা প্রবাদ হইতে লওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ একটি প্রবাদ হইতে দুই-একটি শব্দ বিচ্ছিন্ন করিয়া বহু বিশিষ্টার্থক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতদীয়ত, প্রাত্যহিক বাক্যালাপের অর্থাৎ প্রতিদিনের কথাবার্তার মধ্য হইতে সময় সময় এই সকল বিশিষ্টার্থক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয়ত, বাংলার লোকসাহিত্য উক্ত ধরনের বহু শব্দের জন্ম দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কবিগান, তর্জা, কথকতা ও নানা গ্রাম্য ছড়া, গীত, উপাখ্যান এই শ্রেণীর বাক্যাংশের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। ... বাক্যাংশ ভাষাকে জোরালো, তীক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত করে। নূতন নূতন ভাবপ্রকাশের একমাত্র পথ হইতেছে এই বাক্যাংশ।[৮৭] সুভাষ ভট্টাচার্য বাগধারার প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করেছেন--

ক. দুটি বিশেষ্য শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে–ডাকাবুড়ো, কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড।

খ. একটি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ সমাসবদ্ধ হতে পারে– বকধার্মিক, কুপোকাত।

গ. এক বা একাধিক বিশেষ্যবাচক বা বিশেষণবাচক শব্দের সঙ্গে ক্রিয়াবাচক শব্দ যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ বাগধারাটি ক্রিয়াপদ হিসাবে গণ্য হতে পারে– লালবাতি জ্বালা, এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

ঘ. একটি ধাতুর দ্বিত্ব করে প্রথম অংশে–আ এবং দ্বিতীয় অংশে-ই যোগ করে বিশিষ্টার্থক শব্দ তৈরি হয়। পুরো শব্দটি বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়–ধরাধরি, নাচানাচি।

ঙ. ধাতুর সঙ্গে -আনো প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ক্রিয়াপদ গঠিত হতে পারে–সাঁটানো, গ্যাঁজানো।

চ. ধাতুর সঙ্গে -আনি প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্যবাচক শব্দ তৈরি হয়–লাগানি, ভাঙানি।

ছ. শব্দের দ্বিত্ব করে বিশিষ্টার্থক শব্দ গঠিত হয় এবং শব্দটি বা শব্দগুচ্ছটি বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়–কাতারে-কাতারে, গলায়-গলায়।

জ. অজস্র অনুকারমূলক শব্দ বাগধারা বা বিমিষ্টার্থক শব্দের পর্যায়ে পড়ে। একটি শব্দের সঙ্গে অনুগামী শব্দ জুড়েও তা তৈরি হতে পারে– বাঁধাছাঁদা, ঠাটঠমক।[৮৮]

উপযোগিতা–– লোকভাষায় বাগধারার প্রয়োগ সহজাত, গতিময় ও মানানসই। প্রচলিত ঢঙে চেনা-পরিচিত কথাকে ভিন্নভাবে বলার প্রয়োজনে বাগধারার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। আবার বক্তব্যকে ঘুরিয়ে বলার আগ্রহেও এর প্রয়োজন মেনে নিতে হয়। বাগধারার উদ্ভব অনেকটাই আকস্মিকভাবে ঘটে, প্রচলিত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগুলো বক্তার কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, আবার কখনো কখনো আকস্মিকভাবেই অনেক বাগধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুভাষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,

> একথা মনে করার কারণ নেই যে বাগধারা কেবল কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ, মনে করার কারণ নেই যে কথ্যভাষার এলাকার বাইরেতার প্রয়োগ নেই কিংবা অনুচিত। প্রকৃতপক্ষে বাগধারার নানান স্তর। বহু বাগধারা গ্রামীণ পরিবেশের বাইরে অশ্রুত, যেমন শতেকখাগি, ভুরোচোর, মড়ুঞ্চে পোয়াতি। বহু বাগধারা গ্রামীণ না হলেও আঞ্চলিকতা-চিহ্নিত, অর্থাৎ শিষ্ট বা মান্য কথ্যভাষায় তেমন ব্যবহৃত নয়। যেমন ফুঁকো দেওয়া, বটেক না করা, বাউলি দেওয়া, মালা ঘোরানো, শিথলে দেওয়া। আবার বহু বাগধারার প্রয়োগ শুধু কথ্যভাষাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সাহিত্যের তাদের নির্দ্বিধ পদসঞ্চার। এমন-কী, কবিতায়ও বাগধারার প্রয়োগ বিলল নয়। অতএব বাগধারাকে কেবল কথ্যভাষার সম্পদ ধরে নিলে ভুল হবে। ... এমন বাগধারা আছে যেগুলির ব্যবহার কেবল কথোপকথনেই সীমাবদ্ধ, যেগুলি সাধারণত শিষ্ট বা মান্য লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এগুলি কথ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ... মনে রাখতে হবে, এগুলি কথ্য হলেও অশোভন বা অশিষ্ট নয়। হ্যাটা করা, জাপানো, জক দেওয়া, খচে বোম হওয়া, চুকলি কাটা, চুক্কি দেওয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। আবার এমন বহু বাগধারা আছে যেগুলি অশোভন পর্যায়ভুক্ত। ঢপ মারা, হালুয়া টাইট করা, গ্যারেজে পাঠানো প্রভৃতি শুদু কত্য নয়, অশোভনও। ... ভাষা অন্তর্গত সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে যেমন, বাগধারা বা বিশিষ্টার্থক শব্দের ক্ষেত্রেও তেমনি উল্লেখযোগ্য যে, কোনো-কোনো বাগধারা নতুন করে প্রচলিত হয়। এই প্রচলন বা অপ্রচলনের কারণ প্রায়ই সুস্পষ্টভাবে বা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।' [৮৯]

পুথিসাহিত্য–– আহমদ শরীফ জানিয়েছেন, 'আঠারো-উনিশ-বিশ শতকে বাংলা-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত ভাষায় রচিত দোভাষী (দ্বিভাষী) কাব্যগুলোকেই বিশেষ অর্থে 'পুথি' নামে অভিহিত করা হয়।'[৯০] পুথিপাঠ বাংলার লোকসমাজে আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যথেষ্ট সমাদৃত ছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন––

> বাংলার পুঁথি সাহিত্য বলতে আমরা ঝুঝি এক শ্রেণীর বাংলা কাব্য, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানের ধর্মীয় বা জাতীয় ঐতিহ্য। এই জন্য এতে আমরা পাই আম্বিয়া আলায়হেস্ সাল্লামদেও জীবন-কাহিনী, হযরত রসুলুল্লাহের (রঃ) জীবনী, কারবালার যুদ্ধ-বৃত্তান্ত, আমীর হামযার যুদ্ধ-কাহিনী, হয়রত আলীর পুত্র হানিফার যুদ্ধেও বর্ণনা, সোনাভান-জৈগুন প্রভৃতি বীর রমণদিেও লাভের জন্য হানিফার জঙ্গ, দাতা হাতেম তাই-এর কেচ্ছা, আরবের প্রেমিক যুগল লায়লী-মজনুর অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান, ইরানের প্রেমিক-প্রেমিকা শিরী-ফরহাদের করুণ প্রণয় কাহিনী, কুরআন শরীফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৃত্তান্ত অবলম্বনে রোমান্টিক কাব্য ইউসুফ-জোলায়খা প্রবৃতি। এগুলি পাক-ভারতের বাহির থেকে আমদানি। পাক-ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা পাই কালুগাজী-চম্পাবতীর কাহিনী, ইসমাইল গাজী, খোরাচাঁদ পীর, মোবারকগাজী, শাহজালাল, বনবিবি, বড়খাঁ গাজী প্রভৃতি পীরগণের ঐতিহ্যমূলক কাব্য। ... পুঁথি সাহিত্য নারীগণকেও অবহেলা করে নি; যেমন দেওয়ানা মদিনা, ভেলুয়া সুন্দরী, মহুয়া, কাজলরেখা, নূরুন্নেহার প্রভৃতি। বাংলার কতকগুলি প্রাচীন ঐতিহ্য, মূলে হিন্দু বা বৌদ্ধ সমাজে উৎপন্ন হলেও, পুঁথি-লেখকেরা সেগুলি ত্যাগ করেন নি। এই জন্য আমরা পুঁথি সাহিত্যেও মদ্যে সত্যপীরের কাহিনী, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি বিষয়ের কাব্য দেখতে পাই। মোটকথা, এই পুঁথি সাহিত্যকে বাঙলার মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বলা যেতে পারে।[৯১]

ওয়াকিল আহমদ জানিয়েছেন পুথিসাহিত্য রচিত হবার সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও তদানীন্তন লোকমানসে এর প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গ––

> আঠার শতকে ... রচিত হয় নতুন কাব্যধারা–দোভাষী পুথি ... শাহ গরিবুল্লাহ লেখেন আমীর হামজা (প্রথম অংশ/১৭৬৬), সোনাভান (১৭২০) ও সত্যপীরের পুথি (১৭২০)। সৈয়দ হামজা লেখেন আমীর হামজা (২য় অংশ/১৭৯৪)

ও জৈগুনের পুথি (১৭৯৭)। ... দোভাষী পুথিতে ... শুধু আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের মিশ্রণ নয়, পদবিন্যাস ও বাক্যগঠনেও ঐসব ভাষারীতির প্রভাব পড়েছে। হুগলী-হওড়ার মুসলিম পরিবারে দোভাষী কাব্যের উদ্ভব হয়, পরে সারা বাংলাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ-বিশ শতক পর্যন্ত বহু সংখ্যক পুথি রচিত ও মুদ্রিত হয়। পুথি পাঠেরও স্বতন্ত্র রীতি আছে; আসরে বসে সুর করে পাঠ করা একটি সাধারণ রীতি। এভাবে পুথি পাঠের ও শ্রবণের মধ্যে মাদকতা আছে। নিম্নবিত্তের স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মুসলমানের কাছে দোভাষী পুথি স্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলে ক্রমশ এ-ধারার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। বর্তমানে তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। ... গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার (গুরু-শিষ্য) একত্রে সমাপ্ত আমীর হামজা বৃহৎ কাব্য। ইরানের শাহ নওশেরওয়ানের সাথে খুলিফা ওসমানের যুদ্ধ এতে বর্ণিত হয়েছে। এর সঙ্গে অজস্র উপকাহিনী আছে, অলৌকিক ও কাল্পনিক ঘটনা আছে। এটি মূলত বীররসের কাব্য। কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত জঙ্গনামা করুণ রসের কাব্য। এই উভয় ধারার রচনা মুসলিম সমাজে আদৃত হয়েছিল। ... গরীবুল্লাহর সোনাভানের পুথি (১৭২০) এবং সৈয়দ হামজার জৈগুনের পুথি (১৭৯৭) যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম। যুদ্ধ করে রাজ্যজয়ের সাথে সম্পদ ও রমণী লাভের সরলরৈখিক কাহিনী দ্বারা দোভাষী পুথির বিরাট ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। দোভাষী পুথির ধনাত্মক দিকটি এই যে, বাংলা সাহিত্য দরবার ও শিক্ষিত শ্রেণীর সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে জনসাধারণের উন্মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করে।' ৯১আহমদ শরীফ পুথিসাহিত্য সম্পর্কে অভিমত জানিয়েছেন, 'আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্র আমাদের নগরবন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের তথা জীবনচর্যার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ। এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ... অনক্ষর অশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্য চেতনা। ... মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন ভাবিনার নিয়ামক। এই দিক দিয়ে এ সাহিত্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিমেয়।[৯২]

৫. লোকপ্রথা-- লোকপ্রথা বা লোকরীতি হলো সেসব ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুশাসন, যা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা কোনো লোকসমাজের অন্তর্গত সদস্যদের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের আশ্বাস দেয়, জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত লোক তথা সমষ্টিমানুষের জীবিকানির্বাহ, প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা এবং জীবনধারণের সঙ্গে প্রথা বা রীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। স্মর্তব্য, মানবসভ্যতার প্রারম্ভলগ্ন থেকেই যূথবদ্ধ আদিম অরণ্যাচারী মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করত। একাকী জীবনযাপন যে অসম্ভব, তা অনুধাবন করে তারা পারস্পরিকভাবে বেঁচে থাকতে সচেষ্ঠ ছিল। এর ফলে বন্যপ্রাণী ও বিরূপ প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক প্রতিবেশে তাদের পক্ষে আত্মরক্ষা যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনভাবে ধীরে ধীরে সভ্যতা গড়ে তুলতেও তারা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। সময়ের বিবর্তনে দলনেতা বা গোত্রপতির আবির্ভাব ঘটায় একেকটি দলে বিভিন্ন ধরনের আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান গড়ে উঠেছে। খ্যাতনামা সমাজতাত্ত্বিক ডিমলে ডেভিসের মতে, মানুষ তার সামাজিক প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক প্রণালীর মাধ্যমে মেটাতে উদ্যোগী হয়। এই ব্যাবহারিক প্রণালী হঠাৎ গড়ে ওঠে না। নিরবচ্ছিন্নভাবে, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় মানুষের মধ্যে সামাজিক ব্যবহার স্বীকৃতি পায় এবং সকলে তা মেনে চলে। সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও যোগাযোগের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি সামাজিক রীতি নীতি এবং ব্যবহারিক প্রণালী ধরে রাখে। ... সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ... মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই নির্ধারণ করে সমাজে কি হওয়া উচিত আর কি হওয়া উচিত নয়। এইভাবে সামাজিক অনুশাসন ও রীতিনীতি আরোপ করা হয়। এর ফলে কেউ বিচ্যুত হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট সকলেই সচেষ্ট হয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ভর এই সকল রীতিনীতি, ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়।[৯৩] খাদ্য উৎপাদন, পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্পত্তির ধারণা লোকসমাজে স্বকীয় প্রথা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। এর ধারাবাহিকতায় সমাজে যখন ধর্ম, বিবাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পেয়েছে, তখন একেক ধরনের অনুশাসন একেক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চায়েত বা সমগ্র গোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে একপর্যায়ে লোকসমাজে মোড়ল বা গোষ্ঠীপ্রধাননির্ভর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও কায়েম হয়েছে। সুতরাং লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা বা রীতি একদিকে যেমন গোষ্ঠীর সংহতি ও ঐক্যবদ্ধতা রক্ষার জন্য জরুরি, তেমনিভাবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শ ধরে রাখতেও এর উপযোগিতা

স্বীকার্য। টোটেম, ট্যাবু, ধর্মীয় বিধি, মন্ত্র, জাদু প্রভৃতির সঙ্গে লোকপ্রথার ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য লক্ষণীয়। রক্ষণশীলতা এবং বিধিনিষেধের কড়াকড়ি লোকসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর অংশ হিসেবে কখনো কখনো পুরস্কার ও শাস্তির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মূলত একটি গোষ্ঠীর সমষ্টিচেতনায় যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবপরিমণ্ডল, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাদি সক্রিয়, তা-ই বহুলাংশে নির্ধারণ করে সে সমাজভুক্ত মানুষের অনুকরণীয় লোকপ্রথা ও আদর্শিক মূল্যবোধের রূপটিকে। সমাজভুক্ত মানুষের বয়সের পরিক্রমায় ধাপে ধাপে সামাজিক রীতি-নীতি, অনুশাসন শেখার প্রক্রিয়াকে সামাজিকীকরণ বলা হয়। ব্যক্তির কাছে সমাজের প্রত্যাশা ও দায়িত্ব পালনসম্পর্কিত ভূমিকা যাচাইয়ে লোকপ্রথার ভূমিকা অনস্বীকার্য। লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে উপযোগিতা ধরে রাখতে না পেরে হারিয়ে যায়, এর প্রয়োজন অস্বীকৃত হয়। আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন রীরত-নীতির প্রবর্তন ঘটে, তা অনুসরণ করা হয়।

৬. লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি-- মানুষ জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবসভ্যতার বিকাশ সাধন করেছে। এর মূলে আছে মানবজীবনকে প্রতিনিয়ত সুখকর, সমৃদ্ধ, উন্নত ও নিরাপদ করে গড়ে তোলার প্রয়াস। সুখ-শান্তি ও উন্নত জীবনের সন্ধানে মানুষের সে অগ্রযাত্রা আজও অব্যাহত আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কোনো আবেগের বিষয় নয়, জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জমি চাষের জন্য লাঙলের আবিষ্কার বিজ্ঞানের কাজ, আর মুঠা, ঈষা, ফলা ইত্যাদি যন্ত্রাংশ দিয়ে লাঙল নির্মাণ প্রযুক্তির কাজ। লাঙলের নির্মাতা ছুতার লাঙলের জ্ঞানকে প্রযুক্তির মাধ্যমে সে রূপ দিয়েছে্ প্রযুক্তিতে হাতিয়ার আবশ্যক; হাতিয়ার ছাড়া প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বস্তুর নির্মাণ সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক যুগ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিকে কেন্দ্র করেই এ দেশের মানুষের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবেগ-অনুভূতি, চেতনা-সংস্কার, ধর্মবোধ, সমাজব্যবস্থা, এক কথায় জীবনযাত্রার সামগ্রিক রীতি-নীতি, গতি-প্রকৃতি ও নিয়ম-কানুন গড়ে উঠেছে। অভাব থেকে সৃষ্টি হয় চাহিদা, আর চাহিদা থেকে আবিষ্কার। মানুষ এ অভাব ও চাহিদা পূরণের লক্ষে যুগ যুগ ধরে তাদের লৌকিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাপনের উপযোগী নানা বস্তু, যন্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি করে আসছে। লোকমানুষের বহুযুগসঞ্চিত লোকজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কয়েকটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায় : ক. আবাসগৃহ ও সাজসরঞ্জাম ২. কৃষিকর্ম ও যন্ত্রপাতি ৩. রন্ধনশিল্প ও খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ৪. বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য বয়ন প্রণালী ৫. মৎস্য ও পশুপাখি শিকার ৬. যানবাহন নির্মাণ কৌশল প্রভৃতি। ফরাসি লোকবিদ লেভি ক্লদ স্ট্রাউস বলেন, প্রকৃতিকে বদলে নিয়ে সংস্কৃতির উদ্ভব; আর প্রকৃতির এরূপ বদল বা রূপান্তরের প্রধান উপায় হলো প্রযুক্তি। জীবনে চলার পথে প্রথমে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য মেধা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করেছে, এটা তার জ্ঞান। এই জ্ঞানকে কিছু হাতিয়ার বা যন্ত্রের সাহায্যে বাস্তব রূপ দিয়ে অভাব পূরণ করেছে।[৯৪] 'লোকপ্রযুক্তি' কথাটি গ্রামীণ জীবন-কর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'প্রযুক্তি' অর্থে ব্যবহারিক ক্রিয়া-পদ্ধতিকে ধরা যেতে পারে। বিজ্ঞানের কল্যাণে শহুরে জীবনযাপনে যতটা স্বাভাবিকতা এসেছে, এখনও গ্রামে সে পরিমাণে উন্নতি সম্ভব হয়নি বলা চলে। আর সে কারণে তাদের কর্মের ক্ষেত্রে এখনও লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে যে গ্রামীণ জীবন-যাপনে বহুলাংশে শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষকে কেন্দ্র করে। আর সে কারণে তাদেও কর্মেও পদ্ধতিগুলি স্বাভাবিক সরল ও অনায়াসলব্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক।[৯৫] মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানবগোষ্ঠী কাজ করে চলেছে। তাদের অবিরাম শ্রমে ও সংগ্রামে মানব-সংস্কৃতি কালে-কালান্তরে প্রবাহিত। মানুষের খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব সভ্যতা বিকাশের চাবিকাঠি। এটা একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। লোকসমাজের রূপান্তরকরণের এটাই হলো সন্ধিক্ষণ। সভ্যতার উন্মেষ ঘটে শস্য উৎপাদনের সাফল্যে। মানুষ প্রযুক্তির সাহায্যে তার পরিবেশকে রূপান্তরিত করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ফসল। এই প্রযুক্তি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান করে। মানুষ যে সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করে তার পরিবেশকে পরিবর্তিত করেছে তার যোগফল হলো প্রযুক্তিবিদ্যা। মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগই প্রযুক্তিবিদ্যা।[৯৬]

৭. লোকচিকিৎসা-- মানব-সমাজ উদ্ভবের সময় থেকেই মানুষ নিজের দেহ বিকার জনিত নানাবিধ রোগ নিরাময়ের জন্য আপন জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে রচনা করেছিল চিকিৎসা বিধি। মূলত প্রাক শাস্ত্রীয়, নৈসর্গিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রভাব জনিত প্রতিক্রিয়াই এই চিকিৎসা বিধির উৎস। প্রাকবিজ্ঞান স্তরে মানুষের দৈবী ও প্রাণবাদী, অতীন্দ্রিয়, জাদু বিশ্বাস মূলক ক্রিয়া এবং ঔষধি ব্যবহার ও মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ লোকচিকিৎসা বিধির প্রধান চরিত্র লক্ষণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চিকিৎসাবিধি লোকসমাজের মোড়ল ... ওঝা নির্ভর এবং এঁদের মৌখিক বিধান ও লোকপরম্পরাগত ঐতিহ্যই এই চিকিৎসার ভিত্তি। অলিখিত ঐতিহ্য নির্ভর চিকিৎসাবিধি বলেই এর নাম লোকচিকিৎসা। আধিভৌতিক, অতিপ্রাকৃত শক্তি, অপদেবতার হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই সৃষ্টি করেছে মানুষ অসংখ্য চিকিৎসাবিধি। শুধু চিকিৎসাবিধিই নয় অনেক সংস্কার, লোকাচার এবং জাদুক্রিয়া লোকচিকিৎসা সূত্রেই মানুষ তৈরি করেছে রোগাক্রান্ত ব্রক্তিকে জাদ্বান থেকে শুরু কওে, তাকে ঘিওে নাচ, মন্ত্রোচ্চারণ, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, নানা রকম জাদু ঔষধের ব্যবহার লোকচিকিৎসার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে পরিচিত।[৯৭] পল্লব সেনগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে--

> মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাক, মারণ-উচাটন-বশীকরণ ইত্যাদিরই সূত্র ধরে লৌকিক চিকিৎসাপদ্ধতির ধারাটা প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে উঠলেও, আদ্যিকাল থেকেই গাছগাছড়া, জড়িবুটি, শাক-পাতা-লতা-বাকল-শিকড় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাপ্য কিছু কিছু সহজলভ্য রাসয়নিক উপকরণের নিরাময়ী গুণের কথাও মানুষ জেনে চলেছে এবং সেগুলিও ব্যবহার করছে। ... লোকচিকিৎসার ক্ষেত্রে 'দ্রব্যগুণ'ই হল প্রধান, জাদু-অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ-মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি ... কিছুই নয়। এটা তথাকথিত ওঝা-গুনিনরাও মনে-মনে জানের, মুখে অবশ্য মানেন না। কারণ তাঁদের অসাধারণ 'শক্তি' সম্পর্কে তাহলে অন্যরা আর শ্রদ্ধাভরে বিমূঢ়, বিহ্বল হবে না। ... আদিমকালে 'শামান' ওরফে জাদুকর-পুরোহিতরাই ছিলেন নিজেদের গোষ্ঠীর চিকিৎসক। চিকিৎসাবিধির ওপর জাদু-অলৌকিকতার একটা আস্তরণ বিছিয়ে তাঁরা নিজেদের 'ক্ষমতা' সম্পর্কে গোষ্ঠীর মানুষদের সচকিত এবং সন্ত্রস্ত রাখতে চাইতেন। এই ব্যাপারটারই উত্তরাধিকার বর্তেছে ... একালের 'গুনিন'-দের মধ্যে। ... লোকচিকিৎসা মূলত গ্রামাঞ্চলেই প্রচলিত। শহরের অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যেও অল্পবিস্তর এর অভিঘাত দেখা যায়। ... শারীরিক ব্যাধি, উৎসর্গ ইত্যাদির কারণ হিশেবে বহুক্ষেত্রেই 'নজর লাগা', 'বাতাস লাগা', নষ্ট-দুষ্ট-ডাইন-গুনিনের বাণ মারা' জাতীয় তথাকথিত অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারকে গণ্য করা হয়ে থাকে। 'ভুতে-ধরা', অপদেবতার 'ছায়া-লাগা' গোছের মনগড়া-কারণকে মানসিক ব্যাধির (যথা হিস্টিরিয়া, ডিপ্রেসন, সাইকিক অবসেসন ইত্যাদি) উপলক্ষ বলেও সাব্যস্ত করেন বহুসংখ্যক মানুষ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে 'সর্ষে-মারা', 'ঝাঁটা- পেটানো', 'আগুনের মালসা' মাথায় দিয়ে দাঁড় করানো, দাঁতে করে জলভর্তি বালতি বা ঘড়া তোলানো ইত্যাদি অমানবিক এবং পীড়নকারী ব্যাপারকেও 'চিকিৎসা'র নামে চালানো হয়। ... সঙ্গে মন্ত্র ইত্যাদি তো থাকেই। ... সাপে-কাটা, কুকুরে-কামড়ানো, গাছ থেকে পড়ে-যাওয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনার প্রতিকার হিশেবেও নানাবিধ লোকচিকিৎসার পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আসলে যে-কোনও ধরনের আধিব্যাধি, অপঘাত, দুর্ঘটনা, অসুস্থতার হেতু হিশেবে কোন এক বা একাধিক অপদেবতার হাত থাকার আদিম কল্পনার অনুবর্তন করেই এ-অবধি প্রচলিত লৌকিক চিকিৎসার ধারাটি টিকে রয়েছে। ... শারীরিক আধ্ব্যিাধির নিরাময়ের জন্য সর্বদাই অবশ্য মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, গুণ-তুক ইত্যাদির প্রয়োগ করা হয় না। বহুক্ষেত্রেই শুধু ওষুধপত্রের সাহায্যেই গ্রামে-গঞ্জেও চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। তবে গুণিন বা ওঝারা চিকিৎসার ভার নিলে ... কোনওটা হয়ত সত্যি-সত্যিই রোগমুক্তি ঘটায়; কোনওটা মানসিকভাবে একটু স্বস্তি দেয়-যেটা আসলে পুরুষানুক্রমে অর্জিত বহুবিধ সংস্কারের লব্ধফল! রোগ আসলে না সারলেও, 'সারছে-সারছে' বলে মনে হওয়া, এই আর কি! ... ঠিক এখানেই লোকচিকিৎসার মূল রহস্যটি নিহিত আছে। শুধু ভেষজ বা অন্য ধরনের সহজলভ্য বস্তুর মাধ্যমে রোগ সারছে বলে মনে হওয়া এবং গুণিন/ওঝার মন্ত্র-ঝাঁড়ফুক প্রভৃতির সাহায্যে আরোগ্য হয়েছে ভাবা, আসলে একই সংস্কারভিত্তিক প্রত্যয়ের দুটি মাত্রা- যারা আবার বহুক্ষেত্রেই একে অন্যের পরিপূরণও করে।[৯৮]

ওয়াকিল আহমদ মনে করেন, 'লোক-চিকিৎসা মূলত তন্ত্র-মন্ত্র, জাদু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ, গাছ-গাছালি নির্ভর। এর অধিকাংশ দৈব ও অলৌকিক বিশ্বাসজাত; তবে গাছ-গাছালি সেবনে বস্তুগুণের প্রভাব আছে। অনেক গাছের ফুল, ফল, পাতা, ডাল, ছাল, শিকড় ইত্যাদির ঔষধি গুণাগুণ আছে, যার ফলে ভেষজ চিকিৎসা শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। জ্যোতিষী শাস্ত্রে কোন কোন পাথরের রোগ প্রতিরোধক গুণ আছে; পাথর-খচিত আংটি-মাদুলি ধারণ করলে গ্রহদোষ দূরীভূত হয়।'[৯৯]

৮. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন-- মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বিশেষ পরিচয় সন্নিহিত রয়েছে তার ভাবনা, বোধ ও সতর্ক অনুভবে। বিশেষত, আরণ্যক জীবনের নির্মম বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আর নিজের সম্পর্কিত ধারণা লজ্জা নিবারণে তাকে ধীরে ধীরে উজ্জীবিত করেছিল। এভাবেই মানবসমাজে পোশাকের উদ্ভব ঘটে। তবে এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান তথা গাছের পাতা, বাকল ও পশুর চামড়াকে সরিয়ে একপর্যায়ে সে সুতা তৈরি করে কাপড় বুনতে শেখে। এভাবেই প্রাকৃতিক উপাদানের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের মাধ্যমে তার উদ্ভাবনীশক্তি স্বকীয় মাত্রায় উন্নীত হয়। 'লোকপরিচ্ছদ' বলতে গ্রামীণ লোকসমাজের বাসিন্দাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে পরিহিত পোশাককে বোঝায় । এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য, পরিবেশে টিকে থাকার অনুকূল অবস্থা, এর উপযোগিতা ও স্থায়িত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ। লোকসমাজের পুরুষ বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন পরিচ্ছদ হলো ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, চাদর, পাঞ্জাবি, টুপি, ফতুয়া, পিরান প্রভৃতি। নারীরা শাড়ি, জামা, ওড়না প্রভৃতিতেই স্বচ্ছন্দ্য। পায়ে চপ্পল, জুতা, খড়ম, চটি প্রভৃতির ব্যবহার লোকসমাজে লক্ষণীয়।

শুধু সৌন্দর্যের বাহন হিসেবেই নয়, ব্যক্তির প্রাচুর্য, সামাজিক অবস্থান ও সমৃদ্ধিও প্রতীক হিসেবেও অলংকারের পরিচিতি বিশ্বময় বিস্তৃত। প্রাচীনকাল থেকেই এর প্রতি মানুষের আগ্রহ লক্ষণীয়। লোকসমাজের বাসিন্দারা সোনার প্রতি অনুরাগী হলেও বাজারমূল্যের কারণে অন্য ধাতব অলংকারের মাধ্যমে তারা সাজসজ্জার শখ মেটায়। গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অলংকারের মধ্যে রয়েছে টিকলি, নোলক, নথ, নাকছাবি, নাকমাছি, বেশর, বুলাক, ঝুমকা কুন্তল, কানফুল, কানাত, বালি, মাকড়ি, মালা, হার, হাঁসুলি, বাজু, বাজুবন্ধ, অনন্ত, তার বাউটি, কেয়ুরচুড়ি, খাড়ু, পৈছা, বালা, শাঁখা, আংটি, চন্দ্রহার, বিছা, ঝুমঝুমি, নূপুর, ঘুঙ্গুর. এল, বাঁকখাড়ু, মকরখাড়ু প্রভৃতি। ওয়াকিল আহমদ জানিয়েছেন, 'লোকসংস্কার হলো, গ্রামের স্বর্ণবকাররা সোনাকে লক্ষ্মী মনে করে। এ কারণে তারা পায়ে পরার উপযোগী কোনো সোনার গয়না তৈরি করে না। তাদের মতে, পায়ের সোনার গয়না তৈরি করার অর্থ হলো লক্ষ্মীকে অসম্মান করা। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে নরনারীর অলংকার প্রীতি ও অলংবার ব্যবহারের কথা জানা যায়। শুধু দেহের শোভাবর্ধনই অলংকার পরিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এর পিছনে আছে দীর্ঘদিনের সংস্কার ও লোকবিশ্বাস। অপদেবতা ও অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা, যুগ-যুগান্তরের সংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতির কারণে এ দেশের মেয়েরা আবহমান কাল থেকে দেহে অলংকার ধারণ করে এসেছে। বিবাহিত নারীর হাতে অলংকার না থাকলে স্বামীর অমঙ্গল হয়, নারীর অলংকারবিহীন নাকের নিঃশ্বাস স্বামীর শরীরে লাগলে স্বামীর আয়ু কমে যায়, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর নাকে অলংকার পরিধান নিষিদ্ধ'।[১০০]

সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবণতা। নিজেকে পরিপাটি করে সাজানোর শখ আদিম অরণ্যচারী মানুষের মধ্যেও যে ক্রিয়াশীল ছিল, তার দৃষ্টান্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতির অন্তর্গত মানুষের শিল্পকর্মে, আলোকচিত্রে বিদ্যমান। অন্যের মনোযোগ পাবার পাশাপাশি তাদের সামনে নিজেকে শোভনীয় করে তুলতে আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা অবলম্বনের রীতি প্রায় সব সংস্কৃতিভুক্ত মানুষের আচরণেই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। বিয়ে-পার্বণ, বিভিন্ন উৎসব ও সামাজিক আয়োজনে নারী-পুরুষের সাজসজ্জায় প্রসাধনের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার লক্ষণীয়। নারীর ক্ষেত্রে প্রসাধন তার ব্যক্তিত্ব, ভাবমূর্তি এবং সামাজিক অবস্থানের নির্দেশক। বেদেগিরি, পতিতাবৃত্তি, বাজির খেলা (সার্কাস), জাদু প্রদর্শন, যাত্রাদলে এবং অন্যান্য পরিবেশনাাশিল্পের সঙ্গে জড়িত নারীপুরুষদের প্রসাধন তাদের পেশাদারিত্বের পরিচয়বহ। প্রাচীনকাল থেকেই নারীর সাজসজ্জার বিভিন্ন উপকরণ হিসেবে ফুল, কুমকুম, অগুরু, চন্দন, রাঙতা কাগজ, আলতা, টিপ, ফিতা, চুড়ি, কাজল, ধূপ, আতর, সুরমা, মেহেদি, তেল, পাখির পালক, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে নারীর সাজসজ্জা ও প্রসাধন লোকসমাজে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। বাঙালি হিন্দু লোকসমাজে পুরুষদের মধ্যে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে অগুরু ও চন্দনের ফোঁটা বা তিলক, হাতে লাল সুতো বাঁধার রীতি প্রচলিত। তেমনিভাবে মুসলমান সমাজে পুরুষেরা চোখে সুরমা টানে, আতর মাখে এবং কখনো কখনো দাড়িতে মেহেদি লাগায়। পরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন-এ তিনের সমাবেশেই নারীপুরুষের সাজসজ্জা পূর্ণতা পায়। প্রাচীনযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত লোকসমাজের বাসিন্দাদের

সাজসজ্জার বিবর্তন অনুধাবনে বিভিন্ন শিল্পকর্ম, আলোকচিত্রের পাশাপাশি লোকসাহিত্যও প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। নারীর প্রসাধনের অংশ হিসেবে কেশবিন্যাসের উল্লেখ জরুরি। কেননা, 'মেয়েলি লোকশিল্প তথা লোক-ঐতিহ্যের এক বৈশিষ্ট্যময় নিদর্শন কেশবিন্যাস। গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে পড়ন্ত বিকালে আজও কেশসজ্জার এক মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। একান্নবর্তী পরিবারের বধূ-কন্যারা সমবেত হন বাড়ির বারান্দা বা উঠোনে। বয়স্কা কাকিমা জেঠিমা বা ঠাকুমা যিনি কেশচর্চায় বিশেষ পারদর্শিনী, মূলত তাঁর উপরেই ভার পড়ে সকলের কবরী বন্ধনের। ... মূল উপকরণ হিসাবে চাই ভালো একটি চিরুনি, চুলবাঁধার সরু ফিতে, রঙ-বেরঙয়ের এবং জড়ির চওড়া ফিতা, একগুচ্ছ ছোট-বড় কাঁটা। ... নানাবিধ ফুলে কবরী ও বেনীকে সাজানো হয়'।[১০১]

৯. লোকশিল্প-- যে শিল্প কোন বিকাশশীল সমাজে প্রত্যক্ষ অথচ ভৌগোলিক অথবা সংস্কৃতিগত কারণে তথাকথিত বিলাসী সম্প্রদায় থেকে পৃথক, তাকে লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[১০২] লোকশিল্প লোকসমাজের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ তার সমষ্টিগত চিন্তা-আয়াসের বিশেষ ফর্ম বা শৈলী। এখানে শিল্পীর নাম চিহ্নিত হয় না। লোকসমাজের সামগ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে লোকশিল্প চিহ্নিত। তা কারিগর বা শিল্পীর নিজস্ব শিল্প-ভাবনার ফলশ্রুতি নয়, সমাজ ও গোষ্ঠীর শিল্প-ভাবনা তথা মননেরই প্রকাশ তার নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে বিধৃত। মোটকথা, আদিম শিল্প থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন কর্মাদিতে মানুষ তার প্রয়োজনীয় ঘর বাড়ী, তার আসবাবপত্র, গ্রহস্থালী দ্রব্য, তার আচার-অনুষ্ঠান, তার ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক পরিবেশের অনুকূল ধ্যান-ধারণায় তৈরী ব্যবহারিক রূপের অতিরেকে আন্দনিক চেতনায় যে সব দ্রব্য আত্মপ্রকাশ করে তাই 'লোকশিল্প'। খগেশকিরণ তালুকদার একে 'লোকায়ত শিল্পকলা' হিসেবে সম্বোধনপূর্বক জানিয়েছেন--

> লোকায়ত শিল্পকলা মানে জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত শিল্পকলা তো বটেই, আবার শুধু বস্তুগত শিল্পকলাই নয়, বস্তুবাদী শিল্পকলাও বটে। ... লোকায়ত শিল্পের আলোচনায় শব্দটির অর্থগত তাৎপর্যকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কারণ স্পষ্টত বিভেদাত্মক 'লোক' অভিধাটির মধ্যেই তথাকথিত শিষ্ট বা অভিজাত শিল্প থেকে লোকায়ত শিল্পকে পৃথক করার প্রবণতা পরিলক্ষিত। .. লোকায়ত শিল্পকলার উৎস সন্ধানে নিরত হলে আমাদের অতি অবশ্যই পৌঁছুতে হবে সমাজ বিকাশের এমন এক প্রাকৃত স্তরে যেখানে জীবন ধারণ তথা জীবিকা নির্বাহের মৌল প্রয়োজনেই মানুষ সরাসরি এবং সংঘবদ্ধভাবে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম-রত। সেই জীবন-সংগ্রামে মানুষ যতটুকু পরিমাণে বিজয়ী, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারে যতটুকু পরিমাণে সমর্থ, ততটুকু দ্বারাই তার জীবন প্রবাহ সজ্জিত। জীবন সংগ্রামে নিরত মানুষের হস্ত এবং মস্তিষ্কের, শ্রম এবং কৌশলের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিই বস্তুগত শিল্প অথবা ব্যবহারিক শিল্প।[১০৩]

বৈশিষ্ট্য–

প্রদ্যোত ঘোষ লোকশিল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন--

ক. প্রাতিষ্ঠানিক বা কেতাবী শিক্ষাহীনতা।

খ. ক্ষেত্রগত পরিসর বিশেষভাবেই স্থানিক।

গ. স্বল্প পূঁজিতেই এর সূত্রপাত সম্ভব।

ঘ. কারিগরি পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সরল, অনাড়ম্বর।

ঙ. অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক ব্যক্তির সৃষ্টি। তবে পারিবারিকভাবে একাধিক সদস্যের অংশগ্রহণ বিরল নয়।

চ. রক্ষণশীলতার প্রভাব রয়েছে, বিশেষত শৈলী, মোটিফ, প্রতীক ও অলংকরণে।

ছ. ভাবনা ও রূপের সুপ্রাচীনকাল-বাহিত পুনরাবৃত্তি।

জ. বিদেশী প্রভাবের দুর্লক্ষতা।

ঝ. ধর্মীয় ভাবনা, প্রভাব ও মনস্তত্ত্ব শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করে শিল্প সৃষ্টিতে।[১০৪]

উপযোগিতা-- লোকশিল্পের বিশিষ্ট চারিত্রিক রূপ ও গড়নের জন্যই তা স্থানিক হয়েও নান্দনিক মূল্যে সর্বজনীনতার দাবিদার। এতে ব্যবহৃত রঙ, মুদ্রিত নকশা ও বুননে, সামগ্রিক কারুকাজে শিল্পীর পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি ও ধর্মীয়-নৈতিক ভাবধারা তার কল্পনায় নিজস্ব মেজাজ, মনন ও ভঙ্গিতে ধরা দেয়। ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতা যখন সমষ্টিমানুষের নিকট গৃহীত হয়, তখন উপযোগিতা ও নান্দনিকতার সমাহারে তা সমগ্র গোষ্ঠীর গর্ব ও কৃতিত্বের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। লোকশিল্পের আদিরূপ কখনোই স্থিও নয়। বরং পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে তা যুগোপযোগী রূপে এর ভোক্তাশ্রেণির নিকট টিকে থাকে। ফলে লোকশিল্পের সৃষ্টিশীলতা, উপযোগিতার সঙ্গে বাণিজ্যিকমূল্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রদ্যোত ঘোষের মতে--

> লোকশিল্প লোকায়ত সংহত সমাজের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়, শাস্ত্র ও সামাজিক অনুশাসন অপেক্ষা ঐতিহ্যানুসারী, ধারাবাহিকতাপ্রসূত, মৌলিক বা গোষ্ঠিক পরম্পরাগত, স্বতঃস্ফূর্ত ভাব-ভাবনার ক্রিয়াশীলতায় সমাজের যৌথ আবেগ-অনুভূতি, প্রয়োজন-প্রতীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাম-সংস্কার, বাস্তব-চেতনা, রসচেতনা, ব্যবহারিক প্রয়োজন, সৌন্দর্যস্পৃহা বিবিধ ও বিচিত্র মাধ্যমে রূপাবয়ব লাভ করে। ... নগরকেন্দ্রিক অলংকার বহুল বা ধ্রুপদী নান্দনিক চেতনা ঋদ্ধ, ব্যক্তিক চিন্তা-কল্পনা বা বিশিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ শিল্প ঘরাণা মুক্ত অথচ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত, বাহুল্যবর্জিত, সরল, সংক্ষিপ্ত, কোথাও বা সহজ প্রতীকীযুক্ত, লোকসমাজের সামগ্রিক চারিত্রধর্মের রূপোড়াসই লোকশিল্পের মূল কথা।[১০৫]

ওয়াকিল আহমদ লোকশিল্পের ব্যবহারিক ও আর্থিক উপযোগিতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন--

> লোকশিল্পী চারু ও কারু শিল্পকর্ম দ্বারা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধন করেও নান্দনিক আবেদন সৃষ্টির বিষয়টি উপেক্ষা করে না। সৃজনশীলতার ও নান্দনিকতার গুণে উভয় শিল্পধারা একত্রে বাঁধা। লোকশিল্পের বহুবিধ প্রকারভেদ আছে। চিত্রাঙ্কন (painting), নকশা (sketch), বয়ন (weaving), সূচিকরণ (embroidery), আদর্শায়ন (modelling), ভাস্করণ (engraving), বিখচন (inlaying) ইত্যাদি শিল্পের সকল প্রকার মাধ্যম লোকশিল্পে ব্যবহৃত হয়। কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে পেশাজীবী কারিগর শ্রেণি আছে, যারা পুরুষানুক্রমে শিল্পকর্ম নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে, যেমন কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, সোনারু, কাঁসারি, শাঁখারি, ঘরামি, মালাকার, শোলাকার, ময়রা, গোয়ালা, দর্জি, নাপিত, ডোম ইত্যাদি। এরা নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি করে থাকে। পেশাজীবী ছাড়াও অপেশাজীবী শৌখিন লোকশিল্পীও অনেক আছে। তারা সংসারের প্রয়োজনে অথবা শৌখিন দ্রব্য হিসেবে অনেক কিছু গড়ে তোলে, যা় অনেক সময় শিল্পসৌন্দর্যে রমণীয় ও মোহনীয় হয়ে ওঠে। ... লোকশিল্পের আলোচনায় মটিফের বিচার আবশ্যক। মটিফ লোকশিল্পের কতক ... ডিজাইন, যেগুলি ঐতিহ্যাশ্রিত হয়ে নানা আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন পদ্ম, কল্কা, সূর্যম সজীব গাছ, পুষ্পিত লতা, গাছে-বসা পাখি ইত্যাদি মটিফ রূপে চিত্রাঙ্কনে, সূচিকর্মে, বুননে, ভাস্করণে পরিলক্ষিত হয়। এসবের মধ্যে জাতির ঐতিহ্য, সংস্কার, প্রতীকচিন্তা ও সৌন্দর্যচেতনা জড়িত আছে। মাছ, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, মকর, স্বস্তিকা, বৃত্ত, বর্ফি, ধানছড়া, তরঙ্গ, মন্দির, মসজিদ, রথ, তাজিয়া ইত্যাদিও মটিফ রূপে বিভিন্ন চারু ও কারু শিল্পে অঙ্কিত হয়ে থাকে। মাছ প্রজননের, ধানছড়া সমৃদ্ধির, পদ্ম পবিত্রতার, স্বস্তিকা সৌভাগ্যের, কল্কা সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে গণ্য হয়ে থাকে।[১০৬]

১০. লোক-উৎসব-- উৎসব জাতির প্রাণ। উৎসব জাতির সৃষ্টির চৈতন্য। মানুষের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দিন থেকে সমষ্টি জীবনের উত্তরণের পথে উৎসবের সৃষ্টি হয়। যে উৎসব লোকে বিস্তৃত, সাধারণ মানুষের আনন্দে মূর্ত, তাকে বলা চলে : লোক-উৎসব। উৎসব মানে মিলনানন্দ। একের সঙ্গে এক, একের সঙ্গে বহুর মিরনে গড়ে উঠে উৎসব। ম,ানুষ তার জন্ম তেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান ও আচার পালন করে, এই অনুষ্ঠান ও আচারের বৃহত্তর, সামগ্রিক ও সমষ্টিগত রূপ হলো উৎসব। পার্বণ হলো উৎসবের আদিরূপ। পর্বে পর্বে বাঁধন হলে পার্বণ। আদিম

শিকারী মানুষের দিনান্তিক 'সমষ্টি ভোজ' উৎসবের আদিম রূপ। সমাজের ক্রম বিবর্তনে ও অগ্রসরণে উৎসব ব্যাপক, সর্বাত্মক ও বহুমুখী হয়ে ওঠে। ঋতু, ঋতু-পরিবর্তন, অয়ন, সংক্রান্তি, পৃথিবী, সূর্য, শস্য, বৃক্ষ, প্রকৃতি, সর্প ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ উৎসবের প্রাণকোষ। বাঁধনা, নবান্ন, পৌষ পার্বণ, গাজন, ঝাপান, গম্ভীরা, টুসু, ভাদু, চড়ক, মহরম, ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি সমগ্র বাঙালি জাতির ভাব-কর্ম চেতনার মূর্ত প্রকাশক উৎসব। উৎসবকে অনুসরণ করে আসে মেলা। এরা তাই একাত্ম।

> মেলার অপর নাম মিলন। ... মানুষের ভক্তি, ভয়, বিশ্বাস ও সংস্কারকে কেন্দ্র করেই আনন্দোৎসব সৃষ্টি। দেব-দেবীর প্রতিমা বৃক্ষ, প্রস্তর বন ইত্যাদি পূজার পরিবর্তিত রূপ। কাল-কালান্তরে, যুগ-যুগান্তরে উৎসব মেলা লোকসমাজে প্রাণধারা অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। 'কল্যাণী ইচ্ছা', সর্বজনীন আনন্দ, প্রকৃতপক্ষে উৎসবের প্রাণ। মানুষের প্রাত্যহিক কর্ম, আচার চিন্তার বিকশিত শতরূপ হলো উৎসব। ... লোকউৎসব হলো 'লোককেন্দ্রিক জীবনধারার বা লোকজীবনের অনুগত সমবেত ... অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম। সাধারণভাবে লোকউৎসব বলতে বোঝায় গ্রামীণ জনগণের উৎসব। ... বঙ্গদেশে আর্য আগমনের পূর্বে যে অনার্য অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকের বাস ছিল বর্তমানে অন্ত্যজ কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, লোধা, ভুমিজ, মাহাতো, শবর, প্রভৃতি উপজাতি ও উপজাতি সম্পৃক্ত গোষ্ঠী তাদেরই উত্তরসূরী। এছাড়া বাগদি, বাউরি, হাড়ি, ডোম, মাঝি, কোড়া প্রভৃতি তথাকথিত নিচবর্ণের হিন্দু জাতি বাংলার প্রাচীন লোকসমষ্টির অবশিষ্ট নিদর্শন। এদের জীবনাচরণে আর্যসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ খুব সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারমুক্ত এই সম্প্রদায়গুলির জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ, তাদের ক্রিয়াকর্ম, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ, আচার-অনুষ্ঠান, সাজসজ্জা, অলংকরণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাদের উৎসব মূলত লোকউৎসব। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এসব লোকউৎসব ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার সঙ্গে মেলামেশায় কিছুটা সেই সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলেও এগুলিতে লোকজ ঐতিহ্য ও প্রাচীনতার ইঙ্গিত এখনো রয়ে গেছে। এসব লোকউৎসবের বৈশিষ্ট্য হলো : বাস্তবধর্মিতা, স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক আবেদন; সঙ্গীতময়তা, কালব্যাপকতা এবং সর্বজনীন। মূল আদিম ভাবটি থেকে যাওিয়ার ফলে উৎসবগুলি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। আবেদনে স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটেছে। মনের প্রবহমান ভাবধারা অতি সহজেই অন্যকে আকৃষ্ট করতে পারে বলে লোকউৎসবের গানগুলি সাধারণের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাধারণত লোকউৎসবগুলি দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয় যাতে সমাজের সর্বস্তরের ও বয়সের লোকজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করতে পারে। লোকউৎসবগুলির অনুষ্ঠানের মধ্যে ... উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অধিকাংশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গ্রামীণ বা আদিম সমাজের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচার, পশুশিকার, ফসল উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়কে ভিত্তি করে। বেশির ভাগ উৎসবেই মেলার আয়োজন থাকে, যার সঙ্গে লোকসমাজের আর্থিক বন্দোবস্ত এবং উপার্জনের দিকটিও চিত্তবিনোদনের আধারে উপস্থিত থাকে।[১০৭]

মেলা বাংলাদেশের সার্বজনীন ও ঐতিহ্যবাহী লোকজ উৎসব। বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে লোকসমাজে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়। অগণিত শ্রমজীবী মানুষ কর্মক্লান্ত প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্যে খানিকতা চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের সুযোগ পায় মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। পারস্পরিক সাক্ষাৎ, আলাপ ও মেলামেশার মাধ্যমে একে গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতা ও চেনাজানার মতো সামাজিকতাও সৃষ্টি হয় মেলা উপলক্ষে। এ দেশে কবে থেকে কি ভাবে মেলার উৎপত্তি হয়েছে, তা সঠিক জানা যায় না। পণ্ডিতদের ধারণা, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান ও উৎসবের সূত্র ধরে এদেশে মেলার উৎপত্তি হয়েছে। প্রথমে মঠ-মন্দির, সাধু-সন্তদের আস্তানায় ভক্তরা পূজা, পুণ্য ও দর্শনার্থে জড় হয়েছে, সেখানে সাময়িকভাবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ও বেচাকেনার আয়োজন হয়েছে। এভাবে মেলার মূল ধর্মীয় উপলক্ষের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার আবেদন সৃষ্টি হয়, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত নির্বিশেষে সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলার অধিকাংশ মেলা সম্প্রদায়ভিত্তিক হয়েও সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েচে। সময়ের ব্যবধানে ও উপলক্ষ ভেদে মেলার প্রসারতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়।[১০৮] 'মেলা' শব্দের অর্থ হলো মিলন, বন্ধন। প্রাচীনকাল থেকেই মেলা যে বাঙালি সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ পেয়েছে, তার নিদর্শন রয়েছে gnvfviZ-এর বিরাট পর্বে বিধৃত 'শঙ্কর মেলা'র উল্লেখে। মধ্যযুগে বাংলায় লড়াই, তরজা, বোলান, মুর্শিদা, পীর-ফকির, আউল-বাউল, ভাসান, যাত্রা, কথকতা, পালাগানকে ঘিরে মেলা বসত, যে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন সাধক-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, দেব-দেবীন থান-মন্দিরকে ঘিরে একালেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদযাপনের নেপত্যে লোকসমাজে যেসব ভাবনা

পরিলক্ষিত হয় : শারীরিক কলা-কৌশল প্রদর্শন, আঞ্চলিক কৃষি পণ্যের সমাবেশ ও বিপণস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের উন্নতি বিধান, সামাজিক মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, সর্বোপরি মানুষে মানুষে ঐক্যসাধন বা সংহতি বিধান।[১০৯]

সাধারণত লোকালয় থেকে দূরে উন্মুক্ত স্থানে বিশেষ কোনো উপলক্ষে ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানসহ ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতিতে বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময় বহুলোকের সমাগম বা সম্মিলনকে মেলা বলা হয়। মেলাগুলি সাধারণত ভাদ্র থেকে কার্তিক এবং ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। দেশের প্রধান ফসল ধান রোয়া এবং কাটার পর কৃষিজীবী মানুষের অবসর যাপনের অবকাশ ঘটে। ফসল তোলার পর এসময় কৃষকদের হাতে অর্থও আসে। নিত্য দারিদ্র্যসঙ্গী কৃষি পরিবারে এ সময় স্বচ্ছলতার হাওয়া বইতে শুরু করে। অবসর বিনোদন ও সপরিবাওে আনন্দ উপভোগ, লোক-লৌকিকতা, কুটুম্বিতা করার এই তো সময়। প্রধানত লোকালয় থেকে মন্দির বা অন্য কোন ধর্মীয় স্থানে, নদীতীর, সমুদ্রতট অথবা কোন পাহাড়ের পাদদেশে মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। মেলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সামাজিক তাৎপর্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মেলায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু, শৌখিন মনিহারী দ্রব্যাদি ও খেলনা পুতুলের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামজীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, শিল্পদ্রব্য, কৃষি-যন্ত্রপাতি, স্থানীয় বিশিষ্ট কুটির শিল্প প্রভৃতি কেনাবেচা হয়। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ লোকসঙ্গীতশিল্পী, কবি, কথক, পাঁচলিকারদের সুযোগ সৃষ্টি হয় উপার্জনে। মেলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক মিলিত হন। এর ফলে মানুষে মানুষে পরিচয়, সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে মানসিক আদান-প্রদান ঘটে, ভাববিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। মেলাগুলি জনসংযোগের অন্যতম মাধ্যম। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে লোকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণের সুযোগও মেলায় থাকে। আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান। মেলায় সার্কাস, জাদু, পুতুল নাচ, কবিগান, তরজা, কথকতা, নাচগান প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এর ফলে জাতীয় সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।[১১০]

১১. লোকক্রীড়া-- ক্রীড়া বা খেলাধূলা একটি অতি প্রাচীন সামাজিক ক্রিয়া। বস্তুতপক্ষে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে ক্রীড়া অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আদিম মানুষ তার বাঁচার তাগিদে দৌড়, ঝাঁপ, গাছে চড়া, পাথর ছোঁড়া, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি কাজে অভ্যস্ত ছিল। উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়াসে সে প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নানাবিধ শারীরিক ক্রিয়াকলাপ একদিন যা ছিল তার বেঁচে থাকার হাতিয়ার, উন্নত অবস্থায় এই ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন কমে যায় কিন্তু বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী এই কাজগুলি করার এক স্বাভাবিক অভীপ্সা থেকে যায়। চাষবাস শেখার পর আদিম মানুষ যখন শস্য সংগ্রহ করতে শিখল তখন তার হাতে কিছু অবসর এল। অবসর আনন্দদায়ক কাজের মদ্য দিয়ে অতিবাহিত করার বাসনা থেকেই ক্রীড়া বা লেখার উৎপত্তি। লোকক্রীড়ার বৈচিত্র্য, সংগঠন ও পরিকল্পনাগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এটি একটি সামাজিক প্রথা-প্রকরণ, মানুষের সংগ্রাম ও সংস্কৃতির অনুকৃতি। যেহেতু যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবনচর্চার মধ্রে খেলাগুলি থেকে গেছে এবং সঞ্চারিত হয়েছে তাই এগুলি লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত।[১১১]

লোকক্রীড়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুজন লোকবিজ্ঞানী জানিয়েছেন–

> ক. আঞ্চলিকতার পরিচয় বিশিষ্ট, সহজলভ্য উপকরণ নির্ভর অথবা উপকরণবিহীন, ছড়া সম্পৃক্ত অথবা ছড়াবিহীন, ঐতিহ্যানুসারী যে ক্রীড়া নমনীয় নিয়মানুসারী গৃহাভ্যন্তরে অথবা প্রকৃতির উষ্ণ সান্নিধ্যে অনুষ্ঠিতব্য, সাধারণভাবে যে ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণকারীদের নিবিড় অনুশীলন অথবা শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন হয় না, যাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছেলে, মেয়ে কিংবা উভয় লিঙ্গের খেলোয়াড়ের দৈহিক পুষ্টি অথবা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হয়, যা আপাত ভাবে গুরুত্বহীন অথচ সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় যে খেলায় জীবনের

অনুকৃতি কিংবা ফেলে আসা অতীত জীবনচর্চার পুনরভিনয় লক্ষিত হয়, যাতে আমাদের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের প্রত্নাবশেষের সন্ধান লভ্য, তাই হলো লোকক্রীড়া।[১১২]

খ. প্রাচীন খেলাধূলা যা মানুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক অনমনীয় নিয়মকানুনের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রসারিত হয় না, মানুষের জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে এক যুগ থেকে অন্য যুগে সঞ্চারিত হয়ে যায়, যা জীবনের অনুকৃতির প্রতীকিরূপ, এবং যার মধ্যে ফ্যান্টাসী ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি সেই ক্রীড়াগুলিই লোকক্রীড়া।[১১৩]

বৈশিষ্ট্য--

অলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত অনুযায়ী লোকক্রীড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো--

১. লোকক্রীড়ার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল ছড়া। অনেক লোকক্রীড়ার মধ্যে ছড়াটিই খেলার এক বড় আকর্ষণ এবং ছড়ার মধ্যে প্রাচীন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির প্রকাশ স্পষ্ট।

২.লোকক্রীড়ার নিয়মকানুন অতীব সরল এবং খুব সহজেই বোধগম্য হয়। বিশেষ শারীরিক দক্ষতা বা ক্রীড়া শৈলী ছাড়াই খেলায় অংশগ্রহণ করা যায়।

৩.খেলাগুলি প্রায়শই কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়, অর্থাৎ প্রয়োজন মত কম বা বেশী সময় ধরে খেলা যায়। যতটুকু অবসর পাওয়া যায় সেই সময় ধরে খেলা হয়।

৪. কিছু খেলা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিব সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ থাকলেও বেশীর ভাগ লোকক্রীড়ার কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখার প্রয়োজন হয় না।

৫. লোকক্রীড়ার উপকরণ নগণ্য এবং খুবই সহজলভ্য। উপকরণের জন্য অর্থ ব্যয় প্রায় নেই বললেই হয়। অনেক খেলায় কোন উপকরণ লাগে না।

৬. অবাধে, সহজে সব বয়সের মানুষ খেলার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। খেলাগুলি বৈচিত্র্যে ভরপুর। কিছু খেলা বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়েছে এবং খেলার আকর্ষণ ও আনন্দের দিকটি বিচার করে পরিমার্জিত রূপটি প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে। যেমন কাবাডি খেলা।[১১৪]

সুব্রত মুখোপাধ্যায় লোকক্রীড়র বিভিন্ন দিক পর্যালোচনাসাক্ষে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন--

১. গৃহাভ্যন্তরের এবং গৃহাভ্যন্তরের বাইরের খেলা হিসেবে লোকক্রীড়া মোটাদাগে বিভক্ত।
২. কিছু খেলায় শুধু ছেলেরা এবং কিছু খেলায় শুথু মেয়েরা অংশ নেয়। কিছু খেলায় উভয়ের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।
৩. এ খেলা বৈচিত্র্যময়, বিধায় খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়েই উপভোগের মাধ্যমে চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয়।
৪. উপকরণের বাহুল্য নেই, এমনকি অনেক ক্রীড়া উপকরণহীন, যেটুকু লাগে তাও সুলভ।
৫. অধিকাংশ ক্রীড়াই আঞ্চলিকতার সীমায় সীমাবদ্ধ।
৬. কোনো লিখিত নিয়ম বা আইন নেই।
৭. খেলাগুলি প্রকৃতিতে সহজ-সরল।
৮. খেলাগুলির সময়সীমা নির্দিষ্ট নয়। লোকক্রীড়ায় জীবনের অনুকৃতি, নৃতাত্ত্বিক ও যাদুকরী প্রেক্ষিত থাকে।

৯. অতীত জীবনের ছায়াপাতে সমৃদ্ধ
১০. কোনো পরিচালক লাগে না।
১১. খেলোয়াড় বন্টনে, বিবাদের মীমাংসায় এবং আঘাতের উপশমে বিভিন্ন খেলায় ছড়ার ব্যবহার হয়।
১২. প্রকৃতিতে অভিনয়ধর্মী, লোকনাট্যের অন্যতম উৎসও লোকক্রীড়া।
১৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। কল্পনাশক্তির সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষণীয়।
১৪. লোকক্রীড়ার চরিত্র তথা কাঠামো পরিকল্পনায় পরিবেশের প্রভাব সক্রিয়।
১৫. প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের বহুল ব্যবহার। (সুব্রত মুখোপাধ্যায়, mxgvš Í evsjvi †jvKµxov, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২)[১১৫]

উপযোগিতা -- লোকক্রীড়া মানুষের জীবনচর্চা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক লোকক্রীড়ায় প্রাচীন মানুষের জীবনধারণ প্রণালীর প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়। গাচ্ছুয়া-গাচ্ছুয়া' খেলার মধ্যে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে মানুষের আত্মরক্ষার ছবিটি স্পষ্ট হয়। তেমনিভাবে 'কুমীর যাঙ্গা' খেলায় জলের ধারে বাস করা মানুষের সংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে। 'লুকোচুরি' খেলায় আদিম মানুষের শিকার করার চর্চাটি প্রতীকী রূপ পায়। প্রাচীন কৃষি পদ্ধতির পরিমার্জিত সংস্করণ 'ডাংগুলি খেলা', 'গুটি খেলা', 'কড়ি খেলা', 'পুতুল খেলা'য় বিবাহরীতি ও যৌন জীবনের ছবিটি খুব অস্পষ্ট নয়। নারী অপহরণ করে বিবাহরীতি প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল এবং লোকক্রীড়া, 'বৌ-বসান্তি' বা 'বুড়ি-বসান্তি' খেলায় ঐ রীতির অনুকৃতি স্পষ্ট। আদিম মানব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে জমির দখল নিয়ে যে সংগ্রাম ও যুদ্ধ চলেছিল সেই জীবনচর্চার অনুকৃতি কাবাডি খেলায় পরিস্ফুট। 'জেলে-মাছ' খেলায় প্রাচীন সমাজের 'দাস' সংগ্রহের মোটিটটি লুকিয়ে আছে। অতীতকালের লবণ ব্যবসায় 'মহাজন-শ্রমিক' সংঘাতের চিত্র 'গাঙ্গি' খেলায় প্রতিফলিত। জমির অধিকার প্রসঙ্গটি 'এক্কা দোক্কা খেলায় বিধৃত।

অলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলিকে যেভাবে শ্রেণিবিভক্ত করেছেন–

ক. এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা একা একা খেলা-- তীরন্দাজী, সাঁতার, দড়ির খেলা, মালখাম্বা, ঘুড়ি ওড়ানো, ডিগবাজী, গুলতি, নৌকা চালানো প্রভৃতি।

খ. দ্বৈত বা দুই জনের খেলা-- লাঠি খেলা, অসি খেলা, কুস্তি বা মল্লক্রীড়া, গুলি বা মার্বেল, দাবা, পাশা প্রভৃতি।

গ. দলবদ্ধ খেলা (গণ্ডিবদ্ধ)-- হা-ডু-ডু, গাঙ্গি, চু-কিত্-কিত্, এক্কা-দোক্কা, রুমাল চোর, বাঘবন্দি, গোল্লাছুট, বুড়ি-বসান্তি, গাছছুয়া প্রভৃতি।

ঘ. দলবদ্ধ খেলা (গণ্ডিবিহীন)-- লুকোচুরি, ডাংগুলি, সাতঘুটি বা সাতচাড়া, জলকুমীর, জেলে ও মাছ প্রভৃতি।

ঙ. স্থির হয়ে বসে খেলা-- আগডুম-বাগডুম, ইকিড়-মিকিড়, গোলকধাম, পাশা, দাবা, কড়ি, বাঘবন্দি প্রভৃতি।

চ. বালিকাদের খেলা-- পুতুল খেলা, বৌ-বৌ, রান্না-বান্না, এলাটিং-বেলাটিং, উপেনটি বায়স্কোপ প্রভৃতি।

ছ. বিবিধ-- কানামাছি, চোর-পুলিশ, বাঘ-ছাগল, গণ্ডার-গণ্ডার, পশু-পাখি নিয়ে খেরা, বল সহযোগে খেলা প্রভৃতি।[১১৬]

১২. লোকখাদ্য-- লোকখাদ্য বলতে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রাত্যহিক উদরপূর্তির জন্য প্রস্তুত খাবারকে বোঝায়। তবে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক ভাবনা, কর্মকাণ্ড ও আচার, সাংস্কৃতিক আয়োজন ও উৎসবের সঙ্গে জড়িত বিচিত্র স্বাদযুক্ত খাদ্যরাশিও। এসবের অধিকাংশই পরিবারে তৈরি করা হলেও বিভিন্ন আয়োজনে পেশাদার পাচকেরাও মুখরোচক বিভিন্ন খাদ্য তৈরি করে। রঙ, স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণে এগুলোর জুড়ি মেলা ভার। তবে প্রাত্যহিক আয়োজনে বাঙালি লোকসমাজে ভাত, ডাল, মাছ, শবজির উল্লেখ সচরাচর লক্ষণীয়। বাঙালির ভোজনপ্রীতির পরিচয়[১১৭] পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে। প্রাচীনকাল থেকেই বৈচিত্র্যময় খাবার রান্নার গুণে লোকসংস্কৃতিতে এর বিশিষ্ট অবস্থান স্বীকৃত। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারায় এসব ঐতিহ্যবাহী খাবারের উল্লেখ রয়েছে। লোকখাদ্য শুধু প্রাত্যহিক জীবনের উদরপূর্তির প্রয়োজনই মেটায় না। এর সঙ্গে লোকসমাজের ঐতিহ্য, স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতাও প্রকাশিত হয়। সেকারণেই বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, পূজা পার্বণে লোকখাদ্যের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মিষ্টান্ন এবং পিঠা তৈরিতে বাঙালির খ্যাতি ও কুশলতা বহুকাল ধরে প্রচারিত। আবার আঞ্চলিকতাভেদে ও প্রাকৃতিক উপকরণ সরবরাহের কারণে একেক স্থানে একেক ধরনের খাবারের প্রতি লোকসমাজের ঝোঁক ও আগ্রহ লক্ষণয়ি। সামুদ্রিক অঞ্চলের খাবার হিবেবে বিভিন্ন মাছ এবং শুটকির কদর রয়েছে। নদীপ্রধান অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই মাছের চাহিদা বেশি। মসলার জন্য এদেশ প্রাচীনকাল থেকেই খ্যাত। লোকখাদ্যে বিভিন্ন মসলার উপস্থিতি থেকে ধারণা করা চলে, এসব খুব জনপ্রিয় খাবার বিভিন্ন ব্যঞ্জন ও আচারে মসলা ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ভর্তা, ভাজি, ডাল, শাকসবজি লোকখাদ্য হিসেবে প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত। ‘মাছে ভাতে বাঙালি’ এ প্রবাদে সন্নিহিত রয়েছে বাঙালির খাদ্যপ্রীতির ইঙ্গিত। বাঙালি ‘ভোজনরসিক’, আবার ‘ভোজনবিলাসী’ও বটে। এক বেলার রান্না করা বাড়তি ভাত পানি দিয়ে রাখা হয়। পরদিন সকালে লবণ, মরিচ ও পেয়াজ দিয়ে সেটি খাওয়া হয়। একে পানতা বলে। বলাবাহুল্য, দরিদ্র, অর্থবঞ্চিত প্রান্তিক লোকসমাজের বাসিন্দাদের উদরপূর্তির অন্যতম অবলম্বন পানতা। লোকখাদ্যে মাছের উপস্থিতি থাকলেও মাংসের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। কেননা, দরিদ্র, অভাবী মানুষের কাছে মাংস খাওয়া বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। গ্রামীণ লোকসমাজে আমিষ তথা মাংস কেনার সামর্থ্য কম থাকায় দেশজ শাক, সবজি, ফল, মূল আশ্রিত নিরামিষ জাতীয় খাবারের প্রচলন বেশি। রান্নার প্রয়োজনে বিভিন্ন মসলা যথা পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, গোলমরিচ, জায়ফল, জিরা, কালোজিরা, ধনে, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, মেথি, জাফরান, তেজপাতা, মৌরি, হিং, রাধুনি, পুদিনা, প্রভৃতি। এসবের বেশির ভাগই বাংলা ভূভাগের বাইরের, যুগে যুগে বাইরে থেকে এসে বাঙালির রান্নায় স্থান লাভ করেছে। একটি জাতি কি খায় এবং কিভাবে খায় অর্থাৎ তার খাদ্যসামগ্রী এবং খাদ্যাভ্যাস দ্বারা রস-রুচির পরিচয় যেমন, তেমনি সংস্কৃতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। জীবন ধারণের জন্য দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা আর বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে পরিবেশিত খাদ্য তালিকা ভিন্ন হয়ে থাকে। লোকখাদ্যকে ঘিরে বাঙালি সমাজে বিভিন্ন সংস্কার ও বচন চালু রয়েছে।[১১৮]

মাছ-মাংস এক সাথে খেতে নেই। অনুরূপভাবে মাংসের সঙ্গে শাক খাওয়া নিষেধ। রাতে দই কেথে নেই এবং দই ও ফল খেয়ে পানি পানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। খনার বচন : ‘ফল খেয়ে জল খায়/ যম বলে আয় আয়’। গর্ভবতী নারী জোড়া কলা খেলে নাকি তার জমজ সন্তান হয়। সে আঁশযুক্ত মাছ খেলে তার গর্ভস্থ সন্তানের শরীর খসখসে হয়। সে গজার মাছ খেলে তার সন্তানের নাকি কুষ্ঠ হয়। গর্ভবতী নারীকে সাত মাসের মাথায় ‘কাঁচা সাধ’ ও নয় মাসের মাথায় ‘পাকা সাধ ’ খাওয়ানোর রীতি রয়েছে। হিন্দু সমাজে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে বাচ্চার মুখে প্রথম অন্ন বা ভাত তুলে দেয়ার অনুষ্ঠান প্রচলিত। বিয়ের ‘আইবুড়ো ভাত’ অনুষ্ঠানে পায়েস, পিঠা ও অন্যান্য মিষ্টান্ন পরিবেশিত হয়। নবান্ন উৎসবে নতুন আমন ধানের চাল দিয়ে নানা লোকখাদ্য তৈরি করা হয়। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনার উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন প্রবাদে, ডাক ও খনার বচনে। যেমন ‘আগে তিতা, পাছে মিঠা’। ‘ঊনা ভাতে দুনা বল/ ভরা ভাতে রসাতল’। বাগধারার মধ্যে ‘পাকা ধানে মই দেয়া’, বাড়া ভাতে ছাই পড়া’ কারো আকস্মিক বিপদ বা সর্বনাশের ইঙ্গিতবহ হলেও এর মূলেও লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে। ভাত সংক্রান্ত প্রবাদের মধ্যে ‘পুরানো চালে ভাত বাড়ে’, ‘ভাত দেবার মুরোদ নাই, কিল মারার গোঁসাই’ বহুল

প্রচলিত। বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের মধ্যে রয়েছে পানতা ভাত, নিরামিষ, ঝোল, ভাজা, ভুনা, বিভিন্ন শাক-সবজি-মূল- কন্দ-ফুল-ফল-বীজ, দোলমা, লাবড়া, ডালের বড়া, দুধলাউ, ছক্কা, ডালনা, চচ্চড়ি, ছেঁচকি, শুক্ত, ডাল, মাছ ভাজা-ভুনা-ঝোল, শুটকি, বিভিন্ন ভর্তা, ভাজি, মিষ্টান্ন, যেমন ছানা, ক্ষীর, পায়েস, শিরনি, সেমাই, পিঠা, ঘি, মাখন, দুধ, দই, পনির, দুধের সর, খেজুরের গুড় ও অখের গুড়ের পাটালি, খেজুরের রস, চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, খই, নাড়ু, তিলের গজা, মণ্ডা, মালাই, খিচুড়ি, চাপড়ি, জাউ, পাচৈ, রুটি, কলাইয়ের রুটি ছাতু, আচার, মোরব্বা, কাসুন্দি, আমসত্ত্ব, খাট্টা, প্রভৃতি লোকখাদ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য।[১১৯]

১৩. লোকযান-- লোকযানবাহন বলতে লোকসমাজে প্রচলিত ও লোকসমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যানবাহনকে বোঝায়। মানবসভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ খাদ্যান্বেষণ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধানে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করত পায়ে হেঁটে। পরবর্তীকালে যখন সে পশুপালন মিখল, বন্যজন্তুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগাতে শিখল তখন বাহন হিসাবে বিভিন্ন জীবজন্তুকে ব্যবহার করতে লাগল। চাকার আবিষ্কারের ফলে তৈরি হলো বিভিন্ন প্রকার যান; এগুলি টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে অবশ্য সেই পশুবাহনের উপরেই নির্ভর করতে হত। এ থেকেই সম্ভবতঃ যানবাহন কথাটির সৃষ্টি। পৃথিবীর সকল দেশের সমাজেই সংস্কৃতির এই ধারা পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুল্য ভূপ্রাকৃতিক কারণে যেখানে যে জন্তু সহজলভ্য মানুষের বাহন হিসাবে সেখানে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাহনরূপে লোকসমাজ কখনো কাজে লাগিয়েছে কুকুরকে, কখনো উটকে, কখনো ঘোড়া, হাতি, মহিষ, গাধা, এমনকি বল্গাহরিণের মতো প্রাণীকেও। নগরকেন্দ্রিক জনসমাজে বিজ্ঞানের আবিষ্কার হিসেবে বিভিন্ন আধুনিক যানবাহনকে লোকমানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করছে। তবু নদীমাতৃক গ্রামবাংলায় এখনো জলপথের প্রধান বাহন নৌকা এবং স্থলপথে গরুর গাড়ির একক আধিপত্য রয়েছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামকেন্দ্রিক লোকায়ত বাংলার লোক যানবাহনের শ্রেণিবিভাজন–

ক. মনুষ্য পদচালিত স্থলযান-- মানুষের কায়িক পরিশ্রম ও পদযুগল চালনার মাধ্যমে বহু লোকযান একালেও লোকসমাজে জনপ্রিয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পালকি বা চতুর্দোলা, তাঞ্জাম, ডুলি, মাফা, সোয়ারি, ডান্ডি প্রভৃতি; তেমনি আছে আধুনিক সাইকেল, রিক্সা, ট্রলি বা ভ্যান ইত্যাদি।

খ. পশুচালিত চাকাসম্বলিত স্থলযান-- এ ধরনের যান একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে ওঠানোর উপযোগী এবং গ্রামবাংলার অমসৃণ মেঠোরাস্তায় চালনার উপযোগী। এজন্য একজন দক্ষ চালক প্রয়োজন হয়। গরুর গাড়ি, বিভিন্ন ধরনের ঘোড়ার গাড়ি যথা এক্কা, চৌঘুড়ি, টাঙ্গা, টমটম, ফিটন, ছ্যাকরাগাড়ি প্রভৃতি গ্রামবাংলার কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । তবে এখনো সুদূর প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলগুলিতে গরুর গাড়ির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

গ. জলযান-- প্রাচীনকাল থেকেই নদীমাতৃক বাংলায় যাতায়াতের প্রধান সহায়ক বিভিন্ন ধরনের নৌকা। পণ্য পরিবহন, যাতায়াতও মাছধরাসহ জীবিকার প্রয়োজনে, এমনকি যুদ্ধবিদ্যায়, ডাকাতিতে, প্রমোদ ক্রীড়াতে নৌকার বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। এজন্য লোকসমাজে বিভিন্ন ধরনের নৌকার উদ্ভব ঘটেছে। মালবহনের জন্য বাংলাদেশে প্রচলিত নৌকার মধ্যে রয়েছে উখরি, বালাম, ভড়, ছান্দি, কিস্তি প্রভৃতি। এগুলি সাধারণত আকারে বড় এবং ধীরগতিসম্পন্ন। যাত্রী পরিবহনের জন্য কুন্দা বা কোঁদা বা গদুনা, কোশ বা কোশা, টাপরিয়া বা টাবুও, সরঙ্গা বা সলঙ্গা, শালতি, গশতি, ডিঙ্গি উল্লেখযোগ্য। জেলেদের মাছ ধরার প্রয়োজনে ডোঙ্গা, ডিঙ্গি, ভোল, উতারনাও প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধবিদ্যা, ডাকাতি ও নৌকাবাইচের জন্য দ্রুতগামী লম্বাকৃতির ছিপনৌকা ও বাচারি নৌকার ব্যবহার লক্ষণীয়। কিছুকাল পূর্বে অভিজাত পরিবারের বিলাসভ্রমণের জন্য ময়ূরপঙ্খী নৌকা, পানসিতরী, বজরা, ডিঙ্গা, বোট, ভাউলিয়া, লখাই বা লাখাই ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের নৌকা প্রচলিত ছিল। কিছু নৌকা কাঠের পরিবর্তে গাছের গুঁড়ি

কুঁদে তৈরি হত, যথা– সলঙ্গা, শালতি, ডিঙ্গি, কুন্দা ইত্যাদি। এছাড়া দাঁড়ের সংখ্যানুসারে পাঁচদেড়ে নৌকা এবং মাঝির সংখ্যানুসারে একমাল্লাই নৌকা কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত।[১২০]

১৪. লোকবৃত্তি -- লোকবৃত্তি বা লোকপেশা বলতে লোকসমাজের বাসিন্দাদের অবলম্বিত সেসব কর্মকাণ্ডকে বোঝায়, যা তাদের উদরপূর্তির বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে। লোক বলতে সমষ্টিবদ্ধ সেসব মানুষকে বোঝায়, যারা কায়িক শ্রমজীবী এবং ঐতিহ্যবাহী পেশা অবলম্বন করে। তাদের পেশা বিশেষভাবেই বংশপরম্পরাসূত্রে অব্যাহত থাকে। পেশা পরিবর্তনের অবাধ সুযোগ লোকসমাজে নেই। বরং পারিবারিকভাবে, পুরুষানুক্রমে একই পেশায় স্থিত হবার প্রবণতা লোকসমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। লোকসমাজের বাসিন্দারা প্রায়শই যেহেতু অরণ্য ও গ্রামীণ পরিবেশসংলগ্ন স্থানে অবস্থান করে, তাই প্রকৃতির ওপর তাদের নির্ভরতা লক্ষণীয়। তাদের জীবন ও জীবিকা বহুলাংশেই প্রকৃতিনির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। একথা অনস্বীকার্য যে, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক বস্তুরাজির সমাহার লোকসমাজের গড়ন, অস্তিত্বসংগ্রাম ও জীবিকানির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে লোকসমাজের বাসিন্দাদের জীবনধারাতেও পরিবর্তন আসে, কখনো বা পেশা পরিবর্তনেও তাদের বাধ্য হতে হয়। তবে ভারতীয় লোকসমাজের পেশা গ্রহণ ও অবলম্বনের ব্যাপারটি নিতান্তই তাদের ইচ্ছাধীন ছিল না। বরং বর্ণভেদ প্রথা ও জন্মান্তরের ধারণা সহযোগে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে একই পেশায় পুরুষানুক্রমে জীবনধারণের বিধান কয়েক হাজার বছর ধরে চালু রেখেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী। সনাতন সমাজে বিভিন্ন মিশ্র বর্ণের অন্তর্গত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অধম সংকর পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ধাপে বিশটি পেশাজীবী গোষ্ঠীকে অন্তর্গত করা হয়। এরা হলো – ১. করণ (লেখক, পুস্তক কর্মদক্ষ), ২. অম্বষ্ঠ (চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চর্চাকারী), ৩. উগ্র (ক্ষত্রিয়, যুদ্ধবিদ্যায় সম্পৃক্ত), মগধ (সংবাদবাহক), ৫. তাঁতি, ৬. গন্ধবণিক ৭. নাপিত, ৮. গোপ (লেখক), ৯. কামার, ১০. তৈলিক (গুবাক-ব্যবসায়ী), ১১. কুমার, ১২. কাঁসারী, ১৩. শাখারী, ১৪. চাষী, ১৫. বারজীবী (পানচাষী), ১৬. ময়রা, ১৭. মালাকার, ১৮. চারণ গায়ক, ১৯. রাজপুত. ২০. তাম্বলী (পান বিক্রেতা)। দ্বিতীয় ধাপে বারোটি পেশাজীবী শ্রেণি অন্তর্গত হয়। যথা -- ২১. খোদাইকার, ২২. রজক, ২৩. স্বর্ণকার, (স্বর্ণ প্রস্তুতকারক), ২৪. সুবর্ণ বণিক (সোনা ব্যবসায়ী) ২৫. আহীর (গোরক্ষক/রাখাল), ২৬. তেলী, ২৭. ধীবর বা মৎস্য ব্যবসায়ী, ২৮. শুঁড়ি, ২৯. নট (যারা নাচে, বাজি ও খেলা দেখায়), ৩০. শাবাক (?), ৩১, শেখক (?), ৩২. জালিক বা জেলে। তৃতীয় ধাপে নয়টি পেশাজীবী শ্রেণিকে অন্তর্গত করা হয়। যথা– ৩৩. মলেগ্রহী, ৩৪. কুড়র (?), ৩৫. চণ্ডাল, ৩৬. উরুড় (বাউড়ী?), ৩৭. তক্ষণদার, ৩৮. চামার, ৩৯. ঘট্টজীবী (খেয়াঘাটের মাঝি), ৪০. ডেলোবাহী (ডুলিবাহক), ৪১. মল্ল (বর্তমানে মালো) [১২১]

১৫. লোকভাষা-- লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে লোকভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর লোকভাষা অত্যন্ত বিচিত্র, যার নেপথ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সমন্বিত অভিঘাত। ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মৌলিক বাহন। তবে এর ভূমিকা এতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সভ্যতার আদিম পর্যায় থেকে বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে মানুষ যে সভ্যতার বর্তমান অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে, এক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকাই প্রধান। পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের জৈবিক স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ সূচিত হয়েছে ভাষা আবিষ্কার ও এর প্রাসঙ্গিক ব্যবহারের মাধ্যমে। লোকসমাজের ভাষাভঙ্গি নিছক বাচিক নয়। বরং অভিনয়, ইশারা, অঙ্গভঙ্গি, প্রতীক-রূপক অনুষঙ্গ, প্রবাদ-বাগধারা, বিভিন্ন ধরনের শব্দের মিশ্রণে ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও জটিল রূপ পায়। ফলে সাম্প্রতিককালে লোকবিজ্ঞানীদের মধ্যেও লোকভাষা সনাক্ত করা, এর সংজ্ঞায়ন এবং উপভাষার সঙ্গে এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অনুধাবনে মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে নির্মল দাশ জানিয়েছেন--

> বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে কিছু দিন হল 'লোকভাষা' নামে একটি শব্দ চালু হয়েছে। কিন্তু সমালোচকরা কোনো একক বা সুনির্দিষ্ট অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছেন না। কেউ-বা উপভাষা বা আঞ্চলিক কথ্য ভাষার সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেছেন,

> কারো কাছে 'লোকভাষা' হচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে থাকা আমজনতার ভাষা, কেউ কেউ আবার লোকসাহিত্যের ভাষাকেই 'লোকভাষা' বলে চিহ্নিত করেছেন। বলা বাহুল্য এইসব অর্থদ্যোতনায় অনির্দিষ্টতা থাকায় 'লোকভাষা'কে নির্দিষ্ট পারিভাষিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যেও 'লোকভাষা' শব্দটির পারিভাষিক সীমানা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কোনো অভিন্ন মতৈক্যে পৌছাতে পারেন নি। ফলে শব্দটির অর্থের এলাকা ও তাৎপর্য নিয়ে অস্পষ্টতার সমস্যা এখনো অমীমাংসিত। ... 'লোকভাষা' শব্দটির অর্থব্যঞ্জনা নিয়ে যত অস্পষ্টতাই থাক, একটা বিষয় পরিষ্কার যে 'লোকভাষা' বলতে সকলেই ভাষার একটা বিশেষ রূপভেদকে বুঝিয়েছেন। ভাষার রূপভেদকে সাধারণভাবে বলা হয় উপভাষা। ... উপভাষার দুটি প্রাথমিক রূপের মধ্যে কথ্য উপভাষার বৈচিত্র্য ও সজীবতা অনেক বেশি। কারণ লেখ্য উপভাষার মধ্যে আছে একটি মাত্র অঞ্চল নিরপেক্ষ আদর্শ বা ছাঁচ, কিন্তু কথ্য উপভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম সামাজিক ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ... কথ্য উপভাষার প্রধান অংশটা সমাজের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাতে সমসাময়িকতার প্রসঙ্গই প্রধান। কিন্তু কথ্য উপভাষার আর একটি অংশ আছে যেখানে দৈনন্দিন সমসাময়িকতার বদলে অতীতের ঐতিহ্যবোধই বাগব্যবহারের মধ্যে স্থান পায়। এই অতীতচারিতা ব্যক্তিগত স্মৃতিরোমন্থন নয়, এর মধ্যে থাকে ফেলে-আসা সামন্ত জীবনের গোষ্ঠীভাবুক পিছুটান। তাতে দৈনন্দিন ও সমসাময়িক শব্দভাণ্ডার ও বাক্যবন্ধের বদলে কিছু বাঁধাধরা শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বিন্যাসক্রম প্রাধান্য পায়। কথ্য উপভাষার এই অংশের অতীতচারী ঐতিহ্যানুসারিতার মধ্যে কাজ করে নানা ধরনের লোকায়ত প্রবণতা। তাই কথ্য উপভাষার এই অংশের নাম দেওয়া যেতে পারে লোকভাষা, আর কথ্য উপভাষার যে-অংশের মধ্যে দৈনন্দিনতা ও সমসাময়িকতার যোগ বেশি সেই অংশই জনগণের দৈনন্দিন ভাববিনিময়ের ভাষা-মাধ্যম।[১২২]

পবিত্র সরকার লোকভাষা বিষয়ক বিতর্কের আন্তর্জাতিক পটভূমি সম্পর্কে জানিয়েছেন--

> ১৯৬৪-তে লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের সেমিনারে হেনরি হেনিগ্সোয়ল্ড যখন প্রথম ... একটি প্রবন্ধ পড়েন, তখন থেকেই পরিভাষাবিষয়ক একটি সমস্যা তৈরি হয়ে যায়। ... লোকভাষা (folk language) কোনো বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। নাগরিক ভাষার সঙ্গে–বাংলার ক্ষেত্রে মান্য মার্জিত কলকাতার বা শহরের 'শিষ্ট' ভাষার সঙ্গে বিরোধে যে ভাষা গ্রাম্য বলে চিহ্নিত হতে পাওে তা-ই লোকভাষা। ... সম্প্রতি ... মনে হল এ বিষয়ে একটি বিভ্রান্তি জমে উঠেছে; অনেকে মনে করেছেন গ্রামীণ অঞ্চলবিশেষের উপভাষাই লোকভাষা। তা হওয়া উচিত নয়; ভাষায় সাধারণভাবে গ্রামীণতার যে-লক্ষণগুলিকে শহরের লোক আলাদা করে চিহ্নিত করে সেগুলিই লোকভাষা বা গ্রামভাষার নির্ণায়ক। এই কারণে আমরা folk language-এর বাংলা হিসেবে 'গ্রামভাষা' কথাটি সুপারিশ করি, 'লোকভাষা' নয়। অবশ্য এই 'গ্রাম্য' কথাটির মধ্যে কোনো নিন্দা বা অবজ্ঞার প্রশ্ন নেই, এটি নেহাতই একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক ধারণা; যা নাগরিক বা শহুরে নয়, তা-ই গ্রাম্য।[১২৩]

ডবভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী লোকভাষার সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছেন, যা থেকে স্পষ্ট হয় এ প্রসঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য--

> লোকভাষা থেকে আদর্শভাষা মার্জিত অভিজাত হতে হতে কৃত্রিম বা মৃত ভাষা হয়ে যায়। লোকভাষা তখন জীবন্ত ভাষা রূপে লোকমুখে মুখে বয়ে চলে।[১২৪]

> লোকভাষা হলো সামাজিক উপভাষা, যদিও লোকভাষায় আঞ্চলিক রূপভেদ থাকেই। ... লোকভাষাই হলো জীবন্ত ভাষার মূলভিত্তি, ভাষার প্রাণশক্তির মূল উৎস। লোকভাষায় একটা অপেক্ষাকৃত অমার্জিত গ্রাম্যতা থাকে, আর থাকে আঞ্চলিক রূপভেদ। এটি উত্তীর্ণ হয়ে আদর্শ মান্য ভাষার রূপটি গড়ে ওঠে। এই লোকভাষা থেকে আদর্শ ভাষা মার্জিত অভিজাত হতে-হতে যত দূরে সরে যেতে থাকে, তত তার প্রাণ শক্তি শুকিয়ে যায়, শেষে তা কৃত্রিম ভাষা ও মৃতভাষা হয়ে দাঁড়ায়।[১২৫]

> লোকভাষা কোনো বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। নাগরিক ভাষার সঙ্গে– বাংলার ক্ষেত্রে মান্য মার্জিত কলকাতার বা শহরের 'শিষ্ট' ভাষার সঙ্গে বিরোধে যে-ভাষা গ্রাম্য বলে চিহ্নিত হতে পারে তা-ই লোকভাষা। ... অনেকে মনে করেছেন গ্রামীণ অঞ্চলবিশেষের উপভাষাই লোকভাষা। তা হওয়া উচিত নয়; ভাষায় সাধারণভাবে গ্রামীণতার যে লক্ষণগুলিকে শহরের লোক আলাদা করে চিহ্নিত করে সেগুলিই লোকভাষা বা গ্রামভাষার নির্ণায়ক। ... ' 'লোকভাষা'-কে একটা

> পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করে তাকে নির্দিষ্ট অর্থ দিতে হবে। কিন্তু বহু মানুষ একে শিথিলভাবে উপভাষা অর্থে প্রয়োগ করেই চলেছেন। ফলে আমি এখন এর বদলে 'গ্রামভাষা' কথাটি ব্যবহার করার সুপারিশ করছি।[১২৬]

> লোকভাষা হলো বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন কিন্তু সংহত গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা কৌমজনের ভাষা–যা নানা কারণেই ক্রম ক্ষয়িষ্ণু।[১২৭]

পল্লব সেনগুপ্ত 'লোকভাষা'র কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ না করলেও এর সম্প্রসারিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় প্রান্তীয় উপভাষা, গ্রামীণ ভাষা, মেয়েলি ভাষা, লোকসাহিত্যেও ভাষা, ডাকনাম-ছদ্মনাম, শহুরে 'ককনি ও রক্‌নি', ছাত্রমহলের ভাষা, গালাগালির ভাষা, অপরাধ জগতের ভাষা সবকিছুই লোকভাষার অন্তর্গত।[১২৮] তিনি জানিয়েছেন--

> সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা-অনুযায়ী লোকভাষার প্রতিশব্দ হল (আঞ্চলিক) উপভাষা; নিদেনপক্ষে গ্রামীণভাষা। ভাষাবিজ্ঞানীরা অবশ্য লোকভাষার একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ চরিত্রই নির্দেশ করেন এবং নিছক ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় তাকে ধরে রাখতে চান না। গ্রামীণ বা আঞ্চলিক শব্দ এবং প্রয়োগশৈলী লোকভাষার মধ্যে মেলে ঠিকই, কিন্তু সেটাই সবটুকু নয়। সামাজিক অবস্থান, পেশা, লিঙ্গপার্থক্য, ভিন্ন সংস্কৃতিবলয়ের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদি অনেক কিছু পরিপ্রেক্ষিতই লোকভাষা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ... সুতরাং লোকভাষার স্বরূপ কী, তা নির্ধারণ করতে হলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন মাত্রার কতকগুলি জটিল বুননকে বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে সর্বাগ্রে।

e½xq †jvKms¯'ÖZ‡Kvl-[১২৯]এ 'লোকভাষা' ভুক্তিতে বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানীর অভিমত উপস্থাপিত হলেও স্বীকৃত সংজ্ঞা নির্দেশত হয়নি। লোকভাষা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা এতে থাকলেও শেষে সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে 'কোন সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে কোন একটা অলক্ষণ দিয়ে তাই লোকভাসাকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। তাছাড়া সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লোকভাষার কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন তথাকথিত অ-লোক ভাষাতেও পড়তে পারে। ... তবে সমাজভাষাতত্ত্বের প্রেক্ষিতে লোক ভাষার গুরুত্ব তখনই বোঝা যাবে যখন বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা ও সম্পর্কেও মূল্যায়ন এই ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে করা যাবে।'[১৩০]

লোকভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন--

১. ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে লোকভাষার কোন আঞ্চলিক গণ্ডিবদ্ধতা নেই ... বরং আছে সামাজিক প্রসার–যদিও তা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-নির্দিষ্ট গোষ্ঠীচেতনা পুষ্ট, সামাজিক শাসন ও অনুশাসনে সীমাবদ্ধ।
২. লোকভাষার কোনো ব্যক্তিক রূপ নেই।
৩. ভাষার ক্রমস্তরীয় বিন্যাসে লোকভাষার অবস্থান উপভাষার চেয়ে এক ধাপে নিচে। ... উচ্চবর্গের ভাষার নিরন্তর চাপে নিচবর্গের লোকভাষার আন্তর-উপাদানগুলি ক্রমশই হটে যেতে থাকে। এইজন্যই শিষ্টভাষাভাষী স্ত্রী-সমাজে এয়ো' বা 'নোয়া' জাতীয় শব্দাবলী এখনও টিকে আছে।
৪. লোকভাষাকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা হিসেবে অভিহিত করা চলে না। কেননা লোকসমাজের অনেক অবচেতন স্মৃতিই লোকভাষায় ধরা পড়ে না বলে এর ভাষিক কাঠামোও অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন।
৫. লোকভাষার গণ্ডি বহুলাংশেই অঞ্চলের পরিসরে সীমাবদ্ধ এবং বিশেষ জনসমাজের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত।
৬. লোকভাষা একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিতভাবে ব্যবহৃত হলেও এতে একটি সার্বজনীন মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠে, যা তাকে বিশ্বজনীন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। যেমন– বাংলায় 'বার' শব্দটি দিনের নাম হিসেবে যে-কোনো প্রসঙ্গে যে-কোনো সামাজিক স্তরে প্রসঙ্গ-মুক্ত রূপে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন, সোমবার, মঙ্গলবার ইত্যাদি। কিন্তু 'বারবেলা' শব্দটি একটি বিশেষ দিনের সূচক। এর প্রসঙ্গবদ্ধ প্রয়োগে লোকমনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়। এটি লোকমানসে একটি অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে।

৭. লোকভাষার উপাদানগুলি অনেকাংশে শিষ্ট বা মান্যভাষায় তেমনভাবে স্বীকৃত হয় না, প্রয়োগের দিক থেকে এগুলি সময় সময় 'অপভাষা' হিসেবে মান্য বা শিষ্ট ভাষায় চিহ্নিত হয়। বাংলা লোকসাহিত্তে ভাষায় ব্যবহৃত 'মাগী-মিনসে' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন 'সাত মাগী দাসী দেব ... সাত মিনসে কাহার দিব' ।[১৩১]

রামেশ্বর শ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন--

ক. লোকভাষায় অমার্জিত গ্রাম্যতা ও আঞ্চলিক রূপভেদ লক্ষণীয়।

খ. এ ভাষা নানা কারণে ক্ষয়িষ্ণু।

গ. লোকভাষা কোনো একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই অঞ্চলের মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংহতভাবে বাস করে।

ঘ. লোকভাষা লোক মুখে মুখে প্রবাহিত ও ক্রমবিবর্তিত হয়ে তাদের জীবনীশক্তি বজায় রাখে।

ঙ. লোকভাষায় নৈর্ব্যক্তিক আবেদনের পরিবর্তে ব্যক্তিধারণার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

চ. লোকভাষায় জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-বৃত্তি ইত্যাদি জনিত সামাজিক পার্থক্যও সুচিহ্নিত।[১৩২]

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন লোকজ উপাদানের সমাহারে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহুকাল ধরে বিভিন্ন ভাষা-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের এ অঞ্চলে আবির্ভাব, বসবাস, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমঝোতা-সমন্বয়ের পরিণতিতে এদেশের জাতিগত পরিচয়ে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ প্রবল। নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাও কালের বিবর্তনে বাঙালির জাতীয় চেতনায় ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের কৌমচারী জীবনপ্রবাহের স্মৃতিময় সাক্ষর এতদঞ্চলের নিসর্গচারী-প্রকৃতিনির্ভর মানুষের পেশা, অভ্যাস-আচরণ, ভাবনা, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি-অনুশাসন, সামাজিক প্রথা-আয়োজন-উৎসব, ধর্মীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান-সংগঠন অর্থাৎ তাদের সার্বিক জীবনধারাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। পাশাপাশি, বিশেষ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত বিধায় বংশানুক্রমিক পেশা অবলম্বনের বাধ্যবাধকতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও প্রজন্মান্তরে সম্প্রসারিত হবার শাশ্বত জৈবিক প্রণোদনা-- উভয়ের পরিণতিতে এদেশের লোকসমাজে পরিলক্ষিত হয় অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় সমন্বয়বাদ। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা উপন্যাস রচনায় লোকমানসে প্রতিফলিত এসব ভাবনাকে নিগূঢ়ভাবে অনুধাবন করেছেন। ব্যক্তিজীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর্লোকে লালিত শিল্পানুভব, মানবিক মূল্যবোধ ও শাশ্বত হৃদয়বৃত্তির আবেদন তাঁদের উপলব্ধিতে বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি যে বিমুগ্ধতা সৃষ্টি করেছে, তা বিভিন্ন উপন্যাসে বাঙ্ময় রূপে উন্নীত হয়েছে। নিজের দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙালির আজন্মলালিত নাড়ীর টান, তার ঐতিহ্যবোধ ও প্রজন্মান্তরের পথচলার যে আকুতি, গ্রামীণ কৃষি লোকজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই তা বিকশিত হয়েছে।

১.সমালোচকের অভিমত--

বাংলাদেশের সাহিত্যেতিহাসের গোড়ার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে আমাদের প্রধান ঔপন্যাসিকদের প্রায় সকলের মুখ্য অবলম্বন ভূমিনির্ভর মানবজীবন। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের পটভূমির আশ্রয়েই গড়ে উঠে তাঁদের উপন্যাসের কাহিনী। তাঁদের চরিত্ররা ভূমিকেন্দ্রিক, উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব ও ঘটনার উত্থানপতনেও ভূমিজ বাস্তবতার প্রভাব। যেখানে ভূমি মূল নয় সেখানেও অবতীর্ণ অনুঘটকের ভূমিকায়। ভূমিবাস্তবতার এ প্রাধান্যের মূল নিহিত হয়ত বা সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে। বাংলাদেশের সাহিত্যের সূচনাকালে অর্থাৎ দেশবিভাগকালীন বাংলাদেশ সে-অর্থে শিল্পনির্ভর অর্থনীতির জগতে প্রবেশ করেনি। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী তখনো কৃষিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতির অধীন। রাজধানীর তৎপরতা বা শিল্পকেন্দ্রিক জীবনযাপনের ঘনঘটা দানা বাঁধতে লেগে যায় আরও কিছুকাল। তার আগ পর্যন্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ এমনকি ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের উপন্যাস মূলত গ্রামীণ জীবনকাহিনীর প্রতিফলন এবং সে গ্রামীণতায় ভূমির তাৎপর্য সবকিছুকে ছাপিয়ে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, শহীদুল্লা কায়সার, আবু ইসহাক, ... শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসসমূহ প্রসঙ্গত স্মরণীয়। (মহীবুল আজিজ, ‘ভাটি অঞ্চলের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও সমুদ্রবাসর’, DjLvMov, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৫, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ঢাকা, পৃ. ২৬২)

২.সমালোচক জানিয়েছেন--

নদী এবং নদী-তীরবর্তী মানুষকে কেন্দ্র করে উপন্যাস-রচনার সূত্রপাত ভারত-বিভাগের পূর্ব পর্যায়ে। বিভাগোত্তর পর্বে নদীবাহিত বিভিন্ন অঞ্চলের সংগ্রামশীল মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতিকে শিল্প-অন্তর্গত করে যাঁরা উপন্যাস-রচনায় প্রাগ্রসর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের মূলত প্রেরণার উৎস ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) মতো জীবনাগ্রহী মানবতাবাদী শিল্পী-ঔপন্যাসিক। কাজী আবদুল ওদুদের b‘xe‡ÿ (১৯১৯) কিংবা হুমায়ুন কবিরের b‘x I bvix ... স্বাধীনতা-উত্তর শিল্পী-মানসকে প্রভাবিত করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের cÙvb‘xi gwS আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক উপন্যাস। পদ্মা-তীরবর্তী কেতুপুরের অভাবগ্রস্ত সংগ্রামশীল অস্পৃশ্য ধীবর সম্প্রদায়কে শিল্প-অন্তর্গত করে এ উপন্যাস রচিত। বিভাগপূর্ব পর্যায়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নদী-তীরবর্তী অঞ্চল নিয়ে রচনা করেছেন Kwj›‘x (১৯৪০) ও nvmjx ev‡Ki DcK_v (১৯৪৭)। কালিন্দী নদী-তীরবর্তী বিপুল মানুষের ভাঙ্গা-গড়া উত্থান-পতন, সংগ্রাম সংক্ষোভের বিশ্বস্ত বর্ণনায় Kwj›‘x হয়ে উঠেছে বীরভূমের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবনকথা। nvmjx ev‡Ki DcK_vয় শব্দরূপ পেয়েছে হাঁসুলী বাঁকের লোকায়ত মানুষের বহুবর্ণিল জীবনচিত্র। ... বিভাগোত্তর কালপ্রবাহে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ নদী-তীরবর্তী অঞ্চল নিয়ে রচনা করেন সীমিতসংখ্যক উপন্যাস। বলা বাহুল্য, সময়ের সুস্পষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও এ পর্যায়ের ঔপন্যাসিকগণ তিরিশোত্তর শিল্পবোধকে স্পর্শ করতে সক্ষম হননি। জীবন এবং জীবন-পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবন ও বিশ্লেষণে এরা যতটুকু ছিলেন উচ্ছ্বাস-আক্রান্ত, ঠিক ততোধিক ছিলেন অভিজ্ঞতাবর্জিত। (গিয়াস শামীম, evsjv‡‘‡ki AvÂwjK Dcb¨vm, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১০)

৩. আরেকজন সমালোচক বলেছেন–

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা উপন্যাস রচনার একটি নতুন ক্ষেত্র গড়ে ওঠে ঢাকাকে কেন্দ্র করে। ... উপকরণের দিক দিয়ে তাঁরা (লেখকরা) বেছে নিয়েছিলেন প্রধানত মুসলমান সমাজকে : প্রথমত অবিভক্ত বাংলার পটভূমিতে, পরে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশে। ... উপন্যাসে প্রতিফলিত সমাজ-জীবনের বিক্ষিপ্ত উপকরণ সংগ্রহ করে তা সাজিয়ে দেখা ... সমাজের কি ছবি এতে ফুটে উঠল, সমাজভুক্ত মানুষের মানসিকতার কোন দিকগুলোর প্রতি ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, তা অবলোকন ... গ্রামে বিভিন্ন পেশায় ও বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষের ক্রিয়াকলাপ, জমিদার, মহাজন ও পীরদের ভূমিকা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার, ধর্মশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে গ্রামবাসীর মনোভাব, নারীসমাজে পর্দা ও অবরোধ প্রথার অস্তিত্ব, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণ ও যৌতুক প্রথার মতো যেসব বিষয় মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করে তোলে, আমাদের উপন্যাসে বিধৃত সেসব বিষয়ের পরিচয় লাভ ... পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে ঔপন্যাসিকেরা গ্রামীণ নারী ও পুরুষ উভয়ের পেশার উলেখ করেছেন। ... পূর্ব বাংলার উপন্যাসে সমাজ-জীবনের পরিচয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই সকল পেশার উলেখ করা যায়– জমিদার-নায়েব, মহাজন, ব্যাপারী-ফড়িয়া, ছোট ব্যবসায়ী, পীর, বিভিন্ন ধরনের কৃষক, জেলে, মাঝি. বাঁশ ও বেতের ব্যবসায়ী, তাঁতি, জোলা, বয়াতি-গায়ক, শিক্ষক, ডাক্তার, অধ্যাপক, উকিল, বেদে, ধাত্রী, নাচের দলের মালিক, মিস্ত্রী, শিকারী, হাঁড়ি, মুচি, চাড়াল, বাগ্দী ইত্যাদি। (ভূঁইয়া ইকবাল, evsjv‡‘‡ki Dcb¨v‡m mgvRwPÎ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, ‘অবতরণিকা’ অংশের এগারো থেকে পনেরো পৃষ্ঠা এবং পৃ. ১২)

৪. সমালোচক শাহীদা আখতার যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ নয়। এ ব্যাপারে অন্য গবেষক, সমালোচকরা বিপরীত অভিমত জানিয়েছেন, যা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত। আমরাও এ প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদানের জন্য নির্বাচিত উপন্যাসগুলোকে যথাসম্ভব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছি, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে নির্দেশিত। তিনি বলেছেন–

> পূর্ব বাংলার উপন্যাস প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক। ১৯৪৭-এর পর থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত গ্রামজীবন নিয়ে উপন্যাস রচনার ধারাটিই অব্যাহত ছিল। এর কারণ নির্ণয় করতে হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে। ... পূর্ববাংলার লেখকশিল্পীরা শিক্ষা ও কর্মসূত্রে কলকাতায় প্রবাসজীবন যাপন করতেন। কিন্তু সেই নগরের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির বন্ধন ছিল না। শহরে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের পারিবারিক জীবন থেকে গ্রামসুলভ আচার-আচরণ ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ অপসারিত হতে দীর্ঘদিন কেটে যায়। নিজের জীবনের ও চারপাশের সমাজের পরিচিত পরিমণ্ডল নিয়েই তৈরী হয় ঔপন্যাসিকের জগৎ। মূলত এ কারণেই পূর্ব বাংলার লেখকদের দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়েছে চিরপরিচিত গ্রামজীবন, গ্রামীণ সমাজ ও মানুষ। ... ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ঢাকা একটি জেলা শহর থেকে উন্নীত হয় রাজধানীতে। ... আধুনিক নাগরিক চরিত্র অর্জন করতে (এর) সময় লেগেছিল প্রায় দশ বছর। ... তখনো পর্যন্ত এখানকার সমাজ ছিল মুখ্যত গ্রামভিত্তিক। জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামের বাসিন্দা-কৃষিঅর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। তাই বিভাগোত্তর প্রথম দশকে পূর্ব বাংলার ঔপন্যাসিকচেতনা গ্রামীণ পটভূমিতে সংস্থিত ছিল। সমাজবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এই পর্বেও উপন্যাস হয়ে উঠেছে স্থবির, বৈচিত্র্যহীন গ্রামজীবনের আলেখ্য। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই গ্রামজীবন লেখকদের অভিজ্ঞতার আলোকে উৎসারিত না হয়ে ভক্তিসর্বস্ব ভাবালুতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ সন্ধান করলে দেখা যাবে, গ্রামজীবন সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা গভীর নয়। সাতচল্লিশের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রায় সকলেই জীবিকার সূত্রে শহরবাসী হয়েছেন। তাই তাঁরা যখন গ্রাম নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন, তার মধ্যে বাস্তবতার ছবি অপেক্ষা স্মৃতিময় আলোছায়ার বিস্তারই প্রাধান্য পায়। (ce I cwðg evsjvi Dcb¨vm, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৭৫-৭৬)

৫. মহীবুল আজিজ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন––

> ১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে নগর-জীবনভিত্তিক উপন্যাসের চেয়ে গ্রামীণ জীবন-নির্ভর উপন্যাস রচিত হয়েছে অধিক। ... গ্রাম বিষয়ক জীবন-কাহিনী আকৃষ্ট করেছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রচুর লেখককে। ... বাংলাদেশের সাহিত্যের সূচনালগ্নে এত অধিক সংখ্যক ঔপন্যাসিকের গ্রামমুখিতা নিঃসন্দেহে পূর্ববঙ্গের গ্রাম-প্রধান সমাজকাঠামা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের অনিবার্য উপস্থিতিকেই দিয়েছে শৈল্পিক স্বীকৃতি। এ-কালপর্বে পূর্ববঙ্গের প্রধান ঔপন্যাসিকদের রচিত প্রধান উপন্যাসসমূহ গ্রামীণ জীবন নির্ভর। তাঁদের যেসব উপন্যাস শিল্প-সাফল্যে ভাস্বর, সেগুলোর মূল উপজীব্য বিষয় গ্রাম এবং গ্রামের নিম্নবর্গ মানুষ। ... শওকত ওসমানের উপন্যাসে বাংলার গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত কৃষিজীবী পরিবার; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'য় বাংলার গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠি, ... শহীদুল্লা কায়সারে কৃষিভিত্তিক গ্রামবাংলার ব্যাপক সমাজচিত্র এবং গ্রামত্যাগী অভাবগ্রস্ত-জীবিকান্বেষী মানুষ; শামসুদ্দীন আবুল কালামে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও নতুন সমাজ-বিনির্মাণের স্বপ্ন এবং আবু ইসহাকে নিঃস্ব গ্রামীণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম প্রভৃতি বাংলাদেশের উপন্যাসের সূচনাকালে একটি সমাজ-সচেতন ধারা-নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল্যবান উপাদান। এঁদের উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো, সদ্য স্বাধীন দেশে নতুন রাজধানী শহর গড়ে উঠার পটভূমিতে ... গ্রামে বসবাসরত মানুষের জীবন-বাস্তবতার সাহিত্যিক প্রতিফলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। (evsjv‡`‡ki Dcb¨v‡m MÖvgxY wb¤œeM©, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫২-৫৩)

৬. †jvK-wekvm I †jvK-ms¯‹…wi, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৬
7. বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvK-wekvm I †jvK-ms¯‹…wi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৮. ওয়াকিল আহমদ, evsjvi †jvK-ms¯‹…wZ, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৪৪
৯. আবদুল হাফিজ, †jŠwKK ms¯‹…wi I gvbe mgvR, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬১
১০. মযহারুল ইসলাম, †dvK‡jvi cwiwPwZ I cVb-cvVb, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৪-৬৫
১১. †jvKms¯‹…wZwe`¨v I †jvK mvwnZ¨, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩
১২. †jvK-wekvm I †jvK-ms¯‹…wi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬-৭
13. †jvKms¯‹…wZwe`¨v I †jvK mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
১৪. আবদুল হাফিজ জানিয়েছেন––

বাংলা ভাষায় সংস্কার শব্দটি সংস্কৃত থেকে গৃহীত হয়েছে। ... শব্দটির যেসমস্ত আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়, তাকে তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা সম্ভব :

ক. প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্রে, যেমন– শোধন, উৎকর্ষসাধন, সংশোধন ও মেরামত।

খ. ধর্মবিহিত অনুষ্ঠানাদি, যেমন– হিন্দু ধর্মের দশকর্ম প্রভৃতি।

গ. মানসিক ক্রিয়াসমূহ, যেমন– ধারণা, বিশ্বাস, ছাপ, সহজাত প্রবৃত্তি, ঝোঁক, গড়ন, স্থিতিস্থাপক গুণ ও পূর্বজন্মবাসনা। († jŠvKK ms¯‹vi I gvbe mgvR, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১)

১৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvK-wekvm I †jvK-ms¯‹vi, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
16. †jvKms¯‹...Zwe'¨v I †jvK mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪
১৭. ওয়াকিল আহমদ, evsjvi †jvK-ms¯‹...Z, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৪৪, ২৫০-২৫২
১৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvK-wekvm I †jvK-ms¯‹vi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
১৯. ওয়াকিল আহমদ, evsjvi †jvK-ms¯‹...Z, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৪৪
২০. আবদুল হাফিজ, †jŠvKK ms¯‹vi I gvbe mgvR, পূর্বোক্ত, পৃ ১
২১. বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvK-wekvm I †jvK-ms¯‹vi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৯, ১৭-১৮, ২৮, ৩৫-৩৬
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
23. †jvKms¯‹...Zwe'¨v I †jvK mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪২

জীবেশ নায়ক বিস্তৃত পরিসরে লোকসংস্কারের উদ্ভবের পটভূমি সম্পর্কে জানিয়েছেন–

আদিম যুগের মানুষের এটা জানা ছিল যে, কোনো কিছুই অকারণে ঘটেনা। সব কিছুর পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট যুক্তি কাজ করে। তবে আধুনিক যুগে যাকে আমরা কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে অভিহিত করি, আদিম যুগের মানুষ কাকতালীয় ঘটনার মধ্যেই সেই কার্য-কারণ সম্পর্ককে প্রত্যক্ষ করেছিল। আদিম মানুষকে প্রধানত দুটি ব্যাপারে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হত–ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শিকারের সন্ধান আর শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা। বলাবাহুল্য একটুকু অসতর্কতার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, নতুবা সম্ভাবনা ছিল মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার। এই জন্যে আদিম মানুষের সদাজাগ্রত দৃষ্টিকে এড়াতে পারত না অন্যের পদচিহ্ন, গাছের ভাঙ্গা ডালপালা, খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ, অথবা বসতির কোন চিহ্ন, পশুর বিষ্ঠা বা পাখির পালক। শুধু শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া নয়, সেই সঙ্গে আদিম মানুষের অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিও সজাগ থাকত অন্যান্য নানা ব্যাপারে। যেমন কলরব বা সুগন্ধ-দুর্গন্ধ তার শ্রবনেন্দ্রিয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সহজেই আকৃষ্ট করত। এইভাবে সুদূর প্রাচীন কালের আদিম মানুষ তার পরিচিত সীমাবদ্ধ জগতের সর্বত্র সদা জাগ্রত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নানাবিধ সঙ্কেত বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছির। হঠাৎ কোন পাখির স্তব্ধ হওয়া, আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথার ওপর কোন শকুনকে প্রত্যক্ষ করা, যাত্রা পথের ওপর দিয়ে খরগোসের চলে যাওয়া, প্রবহমান বাতাসের দিক পরিবর্তন, –এই রকম শত-সহস্র সঙ্কেতের সঙ্গে মানুষ ক্রমে ক্রমে তার ব্যক্তিগত শুভাশুভকে যুক্ত করে ফেলে। ক্রমে ক্রমে আদিম মানুষ তার প্রত্যক্ষ করা সঙ্কেত গুলিকে সম্ভবত; দুটি ভাগে বিভক্ত করে দেখতে শেখে। যেমন শিকারের পদযাত্রা, সোয়ালো পাখীর প্রত্যাবর্তন, ভেকের কর্কশ শব্দ ইত্যাদি–এই সব সঙ্কেতের অনিবার্য পরিণাম হিসাবে আদিম মানুষ লক্ষ্য করত হয় খাদ্য প্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে, নতুবা বসন্ত ঋতুর পুনরাবির্ভাবকে। বারবার একইরূপ অভিজ্ঞতা হওয়ার ফলে আদিম মানুষ এইসব সঙ্কেতগুলিকে কয়েকটি বিশেষ পরিণতির কারণ হিসাবে গণ্য করতে শেখে। অপর পক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্কেতগুলির মধ্যে ছিল–আকাশে বিদ্যুতের চমকানি, নক্ষত্রের স্খলন, ভূমিকম্প ইত্যাদি। এইসব সঙ্কেত প্রত্যক্ষ করার পর হয়ত আদিম মানুষ শিকারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা অর্জন করে, কিংবা তার গোষ্ঠীভুক্ত কারো মৃত্যু ঘটে। যদিও এসব ক্ষেত্রে উল্লিখিত সঙ্কেত এবং পরিণামে আদিম মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না, তথাপি আদিম যুগের মানুষ উভয়ের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ককে কল্পনা করে নেয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সঙ্কেতগুলিই সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ... ধর্মীয় নির্দেশ এবং আচার-আচরণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংস্কার সৃষ্টির উৎস। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হল বেদ, আবার বেদের প্রাচীনতম অংশ হল ঋকবেদ। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত রচিত ঋকবেদে আমরা কিছু সংখ্যক সংস্কার বা সংস্কারের মূলের সন্ধান পাই। আজও আমাদের সংহত সমাজে এইসব সংস্কারের এবং বিশ্বাসের অনেকগুলিই বেশ বহাল তবিয়তেই বিরাজমান, অথচ এগুলির উৎসের কথা আমাদের অনেকেরই অজানা। পেঁচার ডাককে অমঙ্গল সূচক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। বেদে এহেন পেচকের ডাকজনিত অমঙ্গল নাশের জন্য মন্ত্রও রয়েছে। ... পক্ষীদের অমঙ্গল ধ্বনি শুনলে যে নিজের অথবা পরিবারের অমঙ্গল হয়, এ বিশ্বাস বহুকাল ধরেই চলে আসছে। ... লোক বিশ্বাস হল পুত্র না থাকলে

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ স্বর্গচ্যুত হয়। এর মূলটি হল ঋকবেদের মন্ত্রের সায়ণভাষ্য। ... কাউকে ডাকতে গেলে সামনে থেকে ডাকা উচিৎ, পেছনে থেকে ডাকা অশুভ বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে কৃষ্ণযজুঃ সংহিতা। ভারতবর্ষে বহু সংস্কার এবং বিশ্বাস ধর্মীয় নির্দেশ অথবা আচার থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ... পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেসব দেশের আচরণীয় ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীও (লোকসাহিত্য) অসংখ্য সংস্কার সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। যেমন, মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে ভিক্ষা দিতে নেই। আমরা জানি জনক দুহিতা ও রামচন্দ্র-পত্নী সীতা ঘরের বাইরে গিয়ে লঙ্কাধিপতিকে ভিক্ষা দিতে গিয়েই রাবণ কর্তৃক অপহৃত হয়। অথবা কোন মেয়ের নাম সীতা বা জানকী রাখতে নেই। কারণ রামায়ণে বর্ণিত সীতাকে সারাটি জীবন দুঃখে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। ... সংস্কার হল, এলোচুলে ভিক্ষে দিতে নেই, দিলে সীতার দশা হয়। (†jvKms¯'…Zwe'¨v I †jvK mvwnZ¨, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১৫) আবদুল হাফিজ, †jŠwKK ms¯'vi I gvbe mgvR, পূর্বোক্ত, পৃ ১-৪

২৪. evsjv‡'‡ki †jŠwKK AvPvi-Abôvb : Rb¨ I weevn, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১
২৫. evsjv‡'‡ki †jŠwKK AvPvi-Abôvb : Rb¨ I weevn, পূর্বোক্ত, পৃ. ২, ৫
২৬. †jvKms¯'…Z, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩১৭
২৭. evsjv‡'‡ki †jŠwKK AvPvi-Abôvb : Rb¨ I weevn, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
২৮. †jvKms¯'…Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ১
২৯. †jvKms¯'…Zi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৩০. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, Qovq evOvjx mgvR I ms¯'…Z, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, 'অবতরণিকা', পৃ. ১৭
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৩২. †jvKms¯'…Zi mjK mÜv‡b, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০২
৩৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvKms¯'…Zi mjK mÜv‡b, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
৩৪. নির্মলেন্দু ভৌমিক, e½xq †jvKms¯'…Z‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩
৩৫. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, Qovq evOvjx mgvR I ms¯'…Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৩৬. উদ্ধৃত, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, Qovq evOvjx mgvR I ms¯'…Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৩৭. Qovq evOvjx mgvR I ms¯'…Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৩৮. evsjv †jvKmvwnZ¨ : Qov, পূর্বোক্ত, পৃ. ২
৩৯. †jvKms¯'…Zi mjK mÜv‡b, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৩
৪০. ওয়াকিল আহমদ, cev' I cePb, আনন্দধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩-১৪
৪১. বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvKms¯'…Zi mjK mÜv‡b, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১১
৪২. ওয়াকিল আহমদ, cev' I cePb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
৪৩. ১-৫ নং বৈশিষ্ট্যের জন্য দ্রষ্টব্য : বরুণকুমার চক্রবর্তী, e½xq †jvKms¯'…Z‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০
৪৪. ৬-১২ নং বৈশিষ্ট্যের জন্য দ্রষ্টব্য : †jvKms¯'…Zi mjK mÜv‡b, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১৪

৪৫. ওয়াকিল আহমদ, cev' I cePb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩)

৪৬. ‡jvKms¯'…Zi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫
৪৭. দুলাল চৌধুরী, ‡jvKms¯'…Zi wek‡Kvl, পৃ. ১০৬-১০৭
৪৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), avav : ¯^iƒc mÜvb, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৫
৪৯. ওয়াকিল আহমদ, evsjv †jvKmvwnZ¨ : avav, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১-১৪
৫০. মিলনেন্দু জানা, 'wÿY-cwðg e‡½i avav : GKwU mgxÿv, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৩-২৫
৫১. avav : ¯^iƒc mÜvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
৫২. †jvKms¯'…Zi mjK mÜv‡b, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬
৫৩. ['লোককথা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, †jvKK_vi eYgvjv, সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১৫-১৬]
৫৪. মিলনকান্তি বিশ্বাস, 'লোককথা : শ্রেণিবিভাগ', †jvKK_vi eYgvjv, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপকথা সম্পর্কে বলেছেন–

ঠাকুরমা'র ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? ... কিন্তু কোথায় গেল–রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী, কোথায়–সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক! ... পাল পার্বণ যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মতো শুকাইয়া আসাতে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ... এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী-বালকের চিত্তক্ষেত্রের ওপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃ‌েহের মধ্যে। যে ‌েহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম ‌েহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত। ... অতএব বাঙ্গালার ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে– সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন ‌েহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়। ['ভূমিকা', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, VvKigvi Sywj (kZewlK ms¯‹iY), বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা, ২০০৭]

৫৬. পল্লব সেনগুপ্ত, উদ্ধৃত, †jvKms¯‹…wZi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৫৭. 'লোককথা : শ্রেণিবিভাগ', †jvKK_vi eYgvjv, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৫-২৬

৫৮. পল্লব সেনগুপ্ত, †jvKms¯‹…wZi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৫৯. evsjvi wKse`wš—, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬
৬০. বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvKms¯‹…wZi mjK mÜv‡b, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
৬১. শীলা বসাক, evsjvi wKse`wš—, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৫-১৬
৬২. wKse`š—x : Drm wbYq I we‡køl Y, শ্যামসুন্দর প্রধান, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৪৬
৬৩. বাংলার কিংবদন্তি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮
৬৪. wKse`š—x : Drm wbYq I we‡køl Y, শ্যামসুন্দর প্রধান, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১
৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪
৬৬. †jvKms¯‹…wZi mjK mÜv‡b, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
৬৭. evsjvi wKse`wš—, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-২০
৬৮. †jvKms¯‹…wZi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮
৭০. †jvKms¯‹…wZ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
৭১. পূর্বোক্ত, ৩১-৩২
৭২. e½xq †jvKms¯‹…wZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩
৭৩. †jŠwKK gš¿, বরুণকুমার চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১১
৭৪. ওয়াকিল আহমদ, evsjv †jvKwPwKrmv : gš¿, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, মুখবন্ধ
৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৭৬. সঞ্জীব নাথ, e½xq †jvKms¯‹…wZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩
৭৭. †jŠwKK gš¿, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১৩
৭৮. †jŠwKK gš¿, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩৭
৭৯. evsjv †jvKwPwKrmv : gš¿, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১৩
৮০. e½xq †jvKms¯‹…wZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩-৪২৪
৮১. e½xq †jvKms¯‹…wZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
৮২. wewea_ Awfavb, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, 'গ্রন্থবিষয়ক আভাষ', পৃ. নং গ-ঘ
৮৩. e½xq †jvKms¯‹…wZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩)
৮৪. msm` evsjv Awfavb, পূর্বোক্ত, পৃ. আট
৮৫. wewea_ Awfavb, পূর্বোক্ত, পৃ. গ–ঘ

৮৬. msm` evsjv Awfavb, পূর্বোক্ত, পৃ. আট-নয়

৮৭. msm‘ evsjv Awfavb, পূর্বোক্ত, পৃ, আট-নয়
৮৮. evOvjx I evOjv mwnZ¨ (২), নিউ এজ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪৭৪)
৮৯. [‘পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি’, evsjv‡`‡ki †jvKHwZn¨ (দ্বিতীয় খণ্ড), শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩]
৯০. পৃ. ২৭৭, ২৮১-২৮২, ২৯০-২৯১

৯১. evOvjx I evOjv mwnZ¨ (২), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৯

৯২. দুলাল চৌধুরী, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), †jvKms¯«Zi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
৯৩. ওয়াকিল আহমদ, †jvKÁvb I chw³, ‘ভূমিকা’, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০ পৃ. অনুল্লেখিত
৯৪. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, পূর্বোক্ত, ৫০৮
৯৫. †jvKms¯«Zi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৪
৯৬. দুলাল চৌধুরী, †jvKms¯«Zi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫

৯৭. ‘লোকচিকিৎসা : বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞানের যুগলবন্দী’, †jvKms¯«Zi mxgvbv I ¯i|c, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩০১-৩০৪

৯৮. †jvKms¯«Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০
৯৯. †jvKms¯«Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

১০০. কাকলী ধাড়া, e½xq †jvKms¯«Z‡Kvl, বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১০১. প্রদ্যোত ঘোষ, evsjvi †jvKwkí, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪

১০২. evsjv‡`‡ki †jvKvqZ wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৯

১০৩. evsjvi †jvKwkí, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১০৫. †jvKms¯«Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭

১০৬. দুলাল চৌধুরী, †jvKms¯«Zi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫-২৮৬

১০৭. ওয়াকিল আহমদ, †jvKms¯«Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

১০৮. দুলাল চৌধুরী, †jvKms¯«Zi wek‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ, ২৮৮-২৮৯

১১০. e½xq †jvKms¯«Z‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

১১১. বরুণকুমার চক্রবর্তী, উদ্ধৃত, অনুপম হীরা মণ্ডল, †jvKµxovi AšÍcwV, অবসর, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২০
১১২. অলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্ধৃত, বরুণকুমার চক্রবর্তী, evsjvi †jvKµxov, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪
১১৩. e½xq †jvKms¯«Z‡Kvl, পূর্বোক্ত, ৪৯৬-৪৯৭
১১৪. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, mxgvšÍ evsjvi †jvKµxov, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২
১১৫. e½xq †jvKms¯«Z‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯
১১৬. †jvKms¯«Z, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

১১৭. †jvKms¯'wZ, পৃ. ২২৪
১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫

১১৯. e½xq †jvKms¯'wZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪-৫১৬

১২০. জাহিদুর রহমান, evsjv‡`‡ki †ckvRxex, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩-৪
১২১. [‘লোকভাষা’, ev0jv †jvKfvlv weÁvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৭০
১২২. ‘লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্ব’, †jvKfvlv †jvKms¯'wZ, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৩৭

১২৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, উদ্ধৃত, মিলনকান্তি বিশ্বাস, cm½ : †jvKms¯'wZ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১১৫
১২৫. রামেশ্বর শ, ‘লোকভাষা : স্বরূপ ও বিশ্লেষণ’, ev0jv †jvKfvlv weÁvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
১২৬. পবিত্র সরকার, ‘লোকভাষা ও গ্রামভাষা’, †jvKfvlv †jvKms¯'wZ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯
১২৭. পরেশচন্দ্র মজুমদার, উদ্ধৃত, মিলনকান্তি বিশ্বাস, cm½ : †jvKms¯'wZ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১১৫
১২৮. †jvKms¯'wZi mxgvbv I ¯^i/c, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩২০
১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮
১৩০. e½xq †jvKms¯'wZ‡Kvl, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪
১৩১. ‘লোকভাষার স্বরূপ সন্ধানে’, ev0jv †jvKfvlv wеÁvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-২৩
১৩২. উদ্ধৃত, মিলনকান্তি বিশ্বাস, cm½ : †jvKms¯'wZ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

জসীমউদ্‌দীন

‘পল্লীকবি’ শিরোনামে নন্দিত জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) আজীবনের সাহিত্যসাধনার মূল অবলম্বন কবিতা।[১] তবে গদ্য রচনাতেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি স্মৃতিচারণমূলক রচনা ও ভ্রমণকাহিনী, লোকজীবনভিত্তিক নাটক ও উপন্যাস, প্রবন্ধ ও লোককাহিনী প্রভৃতিতে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের মনোলোকে যে ধারণা গড়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যকর্মের আলোকে, তাতে বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহমান ঐতিহ্য, প্রকৃতিপ্রীতি ও অতীতচারিতা, রোমান্টিক আবেশ ও স্মৃতিকাতরতার জোরালো উপস্থিতি, লোকসংস্কৃতির বর্ণাঢ্য রূপ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। তিনি জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত গ্রামে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতা একান্তই স্বভাবজাত। সেকারণেই তাঁর ভাবনা, মনন ও সৃজনে গ্রামবাংলার মানুষ এবং তাদের পরিচর্যিত লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বিভিন্ন লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ফরিদপুরের লোকজীবন ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে †evevKwwnbx (১৯৬৪) নামে উপন্যাস লিখেছেন। কবিতার প্রতি তাঁর আজীবনের আগ্রহের সঙ্গে মেলালে, ব্যাপারটিকে কিছুটা নাটকীয় মনে হতে পারে।[২] কিন্তু এ উপন্যাস রচনার পূর্বপ্রস্তুতি তাঁর ছিল। তিনি যে বাংলা ভাষার পাশাপাশি বিদেশী উপন্যাস সম্পর্কেও খোঁজখবর রাখতেন, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় ‘গণ-সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে[৩]। উপন্যাস লেখা তাঁর কাছে যে নিছক খেয়াল বা শখের তাড়না ছিল না, তাঁর প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকার পাঠে ব্যাপারটি বোধগম্য হয়[৪]। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-- “লোকজীবনভিত্তিক উপন্যাস লিখে জসীমউদ্‌দীন গদ্য সাহিত্য রচনায় তাঁর ক্রমবর্ধমান মনোযোগেরই পরিচয় দিয়েছেন। ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ‘সকিনা’ ও ‘মা যে জননী কান্দে’ এ চারটি কাহিনীকাব্যে ইতপূর্বেই জসীমউদ্‌দীন আপন ঔপন্যাসিক মনোভঙ্গির যে পরিচয় উপস্থিত করেছিলেন, গদ্যে লিখিত ... ‘বোবা কাহিনী’ তে তাই যেন প্রথম স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজেছে। পয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসটিতে জসীমউদ্‌দীন বাংলার চাষী মুসলমানেরই জীবনগাথা রচনা করেছেন।”[৫]

†evev Kwwnbx

পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন ও লোকজ সংস্কৃতির প্রতি জসীমউদ্‌দীনের প্রগাঢ় মমত্ববোধের অনন্য দৃষ্টান্ত তাঁর উপন্যাস †evev Kwwnbx । গ্রামের খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের প্রাত্যহিক চালচিত্র বয়ানে তাঁর লেখনীর সামর্থ্য এ উপন্যাসের[৬] আদ্যন্ত প্রকাশিত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহুকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে চলা মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের হাহাকারকে নিগূঢ় উপলব্ধি দিয়ে তিনি যেভাবে বিবৃত করেন, তা পাঠকের হৃদয়কে বারবার আলোড়িত করে। যে জীবনকে তিনি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, অনুভব করেছেন এর অন্তরঙ্গ সারসত্য, সেই মর্মবাণীই তাঁর উপন্যাসে[৭] ভাষ্যরূপ পেয়েছে গ্রামীণ পরিমণ্ডলের বাসিন্দাদের অবয়বে। আজাহেরের পারিবারিক বৃত্তান্তের সূত্রে তার ছেলে বছিরের বিলাতে গিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলনের অভিপ্রায় উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় ভাবসত্য হলেও এতে সবিশেষ অভিনিবেশ পেয়েছে গ্রামীণ লোকমানুষের জীবনাচার, বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসন, ঐতিহ্যবাহী[৮] নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের নিপুণ বৃত্তান্ত। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার নির্যাস, গ্রামীণ আবহ ও লোকসমাজের বিশিষ্ট রূপটিকে কথাশিল্পীর সংবেদনশীল অবস্থান থেকে অনুধাবন এবং লোকমানুষের প্রতি একাত্মতাবোধ প্রভৃতির সমাহারে এ উপন্যাসটি পূর্ববাংলার লোকজ পটভূমিতে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। এ উপন্যাসটি পূর্ব-বাংলার লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের [৯] অন্তর্গত বিবিধ উপাদানে সমৃদ্ধ।

১. লোকবিশ্বাস-- গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে লক্ষণীয়, যার অধিকাংশ ইসলাম ধর্মসম্পৃক্ত। সামাজিক জীবনে প্রচলিত তিনটি লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত--

ক. আজাহের মাতবরকে সালাম জানাইয়া কহিল, "আমরা মিনাজদ্দী মাতবরের দ্যাশ অইতে আইছি।" ... মোড়ল খুশী হইয়া বলিল, "আরে কুটুমের দ্যাশ অইতে আইছ! তা বইস বাই! বইস। ... আজ সকাল বেলা থাইকাই কুটুম-পক্ষি ডাকত্যাছে, তখনই মনে করছিলাম, আইজ কুটুম আইব।" (পৃ. ৮৯)

খ. মোড়ল বলিল, "বলি, আজাহের-বাই, তুমি নাকি তোমার ছাওয়ালডারে ইস্কুলি দিব্যার চাও? জান লেখাপড়া শিখলি হগলের মানায় না।" ... "আপনার কতা বুজবার পারলাম না মোড়ল সাব", আজাহের বলে। ... "হোন তবে", মোড়ল উত্তর করিল, "মুরালদার সৈজদ্দী তার পুলাডারে ইস্কুলি দিছিল। দুই মাস না যাইতে ছাওয়ালডা মইরা গেল। সগলের উয়া সয় না।" ... আজাহের বলিল, "আমি আইজ ইন্দু পাড়ায় যাইয়া দেইখ্যা আইছি। কতজনের পুলা-পাইন লেখাপড়া করত্যাছে; কিন্তুক তারা ত মরে না।" "আরে মিঞা! এইডা বুজবার পারলা না? ওরা ওইল ইন্দু। ওগো মদ্দি লেহাপড়ার চইল আছে। হেই জন্যি ওগো কুনু ক্ষেতি হয় না।" (পৃ. ১২৮)

গ. বছির বিস্ময়ে বলে,"এহানে এমুন সোনালতা ঐছে তাতো এতদিন দেহি নাই?" ... ফুলী বলে, "বড়ুরে ছাইড়া হেই লতার গয়না বানায়া পরবার আমার মনে লইল না। তাই লতাডারে মেইলা দিলাম এই বোরই গাছটার উপরে। রোজ উয়ার উপরে পানি ডাইলা ডাইলা ইয়ারে বাঁচায়া তুলছি। দেখছাও না কেমন জাটরায়া উট্ছে?" ... ফুলী জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা বছির বাই! হুনছি শববরাতের রাইতে সগল মুর্দারা কবরে ফির্যা আসে। আগামী শববরাতের রাইতে বড়ু যদি এহানে আসে তবে হে এই বোরই গাছটার উপর সোনালতাগুলান দেকতি পাবি ন্যা?" ... বছির অন্যমনস্ক হইয়া বলে, "হয়ত দেখতে পাবি।" ... "আর আমি যে তার দেওয়া সোনালতাডা এই বোরই গাছে বাঁচায়া রাখছি তাও সে জানতে পারবি, না বছির বাই?" (পৃ. ১৯০)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি সমাজে কুটুম বা আত্মীয়তা সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। সুদখোর মহাজন শরৎ সাহার দ্বারা হৃতসর্বস্ব আজাহের মিনাজদ্দী মাতবরের পরামর্শে নিজ গ্রাম ছেড়ে পরিবার নিয়ে তাম্বুলখানা গ্রামে আসে। সে মিনাজদ্দীর আত্মীয় গরীবুল্লা মাতবরের বাড়িতে হাজির হয় আশ্রয়লাভের জন্য। অতিথি এলে কুটুম পাখি সে খবর পূর্বেই জানতে পারে এবং 'কুটুম' বলে ডাকতে থাকে। যে এ ডাক শোনে, সে ভাবে, হয়ত তার বাড়িতে সেদিন অতিথি আসবে। অনুরূপ ঘটনা গরীবুল্লার ক্ষেত্রে ঘটেছে বলেই সে এরূপ বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গ্রামীণ মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে গরীবুল্লা মাতবরের সংলাপে। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন গুজব ও রটনা স্বার্থান্ধ মৌলবিগোষ্ঠীর দ্বারা প্রচারিত হয়, যা লোকসমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিধর্মীর শিক্ষা গ্রহণ করলে মুসলমানরা অকালে মৃত্যুবরণ করবে, নানা বিপদে আক্রান্ত হবে, এরূপ ধারণার বিস্তার ঘটে ভণ্ড ও শঠ ধর্মব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। একারণেই সৈজদ্দীর ছেলের মৃত্যুর ঘটনাকে গরীবুল্লা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ফল হিসেবে বিবেচনা করেছিল, যদিও আজাহের এ অভিমত মেনে নেয়নি। তাছাড়া হিন্দুর সন্তানেরা স্কুলে গিয়ে শিক্ষিত হলেও তাদের কোনো ক্ষতি হয় না, এ ভাবনায় মাতবরের ধারণার বিপরীতে আজাহেরের অবস্থান নির্দেশিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজে খ্রিস্টান শাসকগোষ্ঠী প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে রক্ষণশীল মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। এর নেপথ্যে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনব্যবস্থায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব আরোপের একপর্যায়ে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর দ্বারা তাদের পরাজিত হবার ঘটনা। হিন্দুরা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ করে চাকরি ও ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধন করলেও সমকালে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডুকতা প্রবলভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত সত্তরের দশক থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের প্রতি তাদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ উদ্ধৃতির অন্তরালে লেখক বাঙালি মুসলমান সমাজের বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন উক্ত ঘটনার অন্তরালে।

গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্ম সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয় ফুলীর সংলাপে। আরব্য ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী শবেবরাত মুসলমানদের জন্য বিশেষ পবিত্র রাত। এ রাতে মানুষের ভাগ্য লিখিত হয়, এরূপ ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত। শুধু তাই নয়, যেসব মৃত ব্যক্তির আত্মা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, তারা এ রাতে নিজ

নিজ কবরের কাছে ফিরে আসে, এ ধরনের বিশ্বাসও লোকমানসে সক্রিয়। খেলার সঙ্গী বড়ুকে হারিয়ে ফুলীর একাকিত্ব প্রকাশিত হয়েছে উপর্যুক্ত সংলাপে। সেকারণেই সে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে রোপিত স্বর্ণলতা গাছটির পরিচর্যায় নিজের মমত্ব ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে উক্ত লোকবিশ্বাসের অনুষঙ্গে। বাঙালি মুসলমান সমাজে আরবীয় ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত যে, মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির আত্মা বা রুহ কবরে অবস্থান করে। কিয়ামত বা রোজহাশরের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সেই আত্মা কবরেই থাকে। ইহলোকে সংঘটিত কাজের পরিণাম হিসেবে ভালো ও খারাপ কাজের জন্য তাদের জন্য সেখানেই পুরস্কার ও শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে মুসলমানদের জন্য পুণ্যময় রাত হিসেবে বিবেচিত শবে বরাতের রাতে মৃত ব্যক্তির আত্মার তার কবরের কাছে ঘোরাফেরার কোনো উল্লেখ বা প্রসঙ্গ শাস্ত্রীয় ইসলামে নেই। উদ্ধৃতিতে বিধৃত প্রসঙ্গটি সম্ভবত লৌকিক ইসলামের প্রভাবজাত, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সনাতন ধর্মের পরজন্মবাদ প্রসঙ্গ।

২. লোকসংস্কার-- †eve¨ Kvwnbx উপন্যাসে বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিবিধ লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। এসব সংস্কারে লোকমানুষের বিশ্বাস, অভ্যাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ভীতিবোধ, অনিষ্ট ও অমঙ্গল সংক্রান্ত নানা ভাবনার রূপায়ণ ঘটেছে।

২.১ দিব্যি দেয়া

> ক. কামলারা ধান কাটিতেই ছিল। আজাহের এবার তাহাদের সামনে আসিয়াই দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই দিছি কোম্পানী বাহাদুরের, দোহাই মহারাণী মার। মিঞারা তোমরা আগগাওরে, আমার জমির ধান কাইটা নিয়া গ্যাল। ও মাতবরের পো! ও বরান খাঁ! ... আজাহের এবার আরো জোরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই দিছি কোম্পানীওয়ালার, দোহাই দিছি ইংরাজ বাহাদুরের, মিঞারা তোমরা দেইখা যাও, আমার জমির ধান কাইটা নিয়া গ্যাল।" (পৃ. ৫০-৫১)

> খ. আজাহের সেই আদালতের পিয়নের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "দোহাই দিচ্ছি কোম্পানী বাহাদুরের দোহাই মা মহারাণীর, আমার হালের গরু দুইডা নিবেন না।" (পৃ. ৭২)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আজাহেরের সংলাপে সুদখোর মহাজন শরৎ সাহার অপতৎপরতায় নিজের কষ্টার্জিত ফসল হারানোর প্রসঙ্গটি দিব্যি দেয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। দোহাই দেয়া সংক্রান্ত সংস্কারের মূলে রয়েছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি মানুষের আনুগত্য স্বীকার বা সমীহ করার প্রবণতা, পাশাপাশি অন্যকে ভয় দেখিয়ে নিয়ণ্ত্রণের চেষ্টা। স্রষ্টার প্রতি সমীহ প্রকাশার্থে বাঙালি মুসলমান সমাজে, 'আল্লাহর দোহাই', 'আল্লাহর কিরা' এবং হিন্দু সমাজে 'ভগবানের দিব্যি' প্রচলিত। ক্রমশ এ সংস্কার লোকসমাজে পরিবর্তিত রূপে যে প্রকাশিত হয়েছে, উদ্ধৃতিতে তা লক্ষণীয়। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির এদেশের শাসনব্যবস্থা দখল করায় ভূমির প্রকৃত অধিকারী কৃষকরা তাদের অধিকার থেকে বহুকাল ধরেই বঞ্চিত হয়েছে। এ অবস্থা আজাহেরের ক্ষেত্রে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে শরৎ সাহার নিকট হতে কষ্টার্জিত অর্থে জমি কিনে তাতে ফসল ফলিয়েও নিজের গোলায় তুলতে না পারার অপারগতায়। তারই সামনে সেই সুদখোর মহাজন কামলাদের দিয়ে বলপূর্বক ধান কাটিয়ে নিতে গেলে সে মরীয়া হয়ে গ্রামের মাতবর মিনাজদ্দী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বরান খাঁর শরণাপন্ন হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও এর কর্তাব্যক্তিদের দোহাই দিয়েও আজাহের শরৎ সাহাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কেননা, ক্ষমতা যার করায়ত্ত, সে বরাবরই দুর্বলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, যা উক্ত উদ্ধৃতিতে প্রতীয়মান। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি পূর্বের উদ্ধৃতিরই সম্প্রসারণ। বিয়ের জন্য শরৎ সাহার নিকট থেকে পনের টাকা ঋণ নিলেও আজাহের যথাসময়ে তা পরিশোধ করে। কিন্তু শঠ সুদখোর মহাজন শরৎ সাহা বারবার তা অস্বীকার করে। বকেয়া অর্থ সুদসহ চক্রাকার বৃদ্ধিতে কয়েক বছরের ব্যবধানে বিপুল অর্থে পরিণত হয়েছে, যা পরিশোধে আজাহের অসমর্থ- এ অভিযোগে শরৎ সাহা আদালতে মামলা দায়ের করে প্রভাব খাটিয়ে। অবশেষে আদালতের সমন জারি করিয়ে সে আজাহেরের সমুদয় বিষয়াষয় দখল করে। আজাহের আদালতের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত পিয়নের নিকট কোম্পানি বাহাদুর ও

মহারাণীর দোহাই দিয়ে শত আকুতি জানালেও তা কার্যকর হয়নি। অশিক্ষিত অসহায় দুর্বল আজাহেরের হৃতসর্বস্ব হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না, ধূর্ত প্রতারক শরৎ সাহার চক্রান্তের জেরে।

২.২ মন্ত্র

ক. গণ্শা বলে, "দেখ বছির। আমি সন্ন্যাসী হয়া জঙ্গলে যায়া তপস্যা করব। দেবতা যদি আমার তপে তুষ্ট হয়া বর দিতি আসে তবে কইমু, আমারে এমন বর দাও ওই মাষ্টারের লাঠিগাছারে আমি যা হুকুম করুম ও যেন তাই করে। মাষ্টার যহন আমারে লাঠি দিয়া মারতি আইব অমনি লাঠিরে কইমু, লাঠি ফিরা যায়া মাষ্টারের পিঠি পড়, খানিকটা লাঠির বাড়ি পিঠি পাইলি তহন বুঝবি মাষ্টার, লাঠির মাইরের কেমুন জ্বালা।" ... বছির বলে, "আচ্ছা গণেশ ভাই! এমন মন্তর সেহা যায় না? যহন মাষ্টার মশায় তোমারে মারতি আসপি তহন মন্তর পইড়া আমি ফুঁক দিব, অমনি মাষ্টারের আত অবশ হয়া যাবি।" (পৃ. ১৪৩)

খ. গণ্শা বছিরের আরও কাছে আসিয়া বলে," দেখ বছির। তুই ত শহরে চললি, দেহিস সেহানে কেউ এমন কোন মন্তর যদি জানে যা পড়লি মাষ্টারের ব্যাতের বাড়ি পিঠে লাগে না, আমারে খবর দিস। আমি যায়া শিখ্যা আসপ।" ... "য়্যা গণশা-বাই! তোমারে মাষ্টার মশায় আইজ আবার মারছে নাকি?" বলিয়া বছির সমবেদনায় গণশার পিঠে হাত রাখে। ... "নারে, সে জন্যি না। মাষ্টার মশার মাইর ত আমার গা-সওয়া হয়া গ্যাছে। উয়ার জন্য আমি ডরাই না। পাঠশালার আর সকল ছাত্রগো মাষ্টার মশায় মারে, ওগো কান্দন আমি সইবার পারি ন্যা। তেমুন একটা মন্তর জানতি পারলি আমি ওগো শিখাইয়া দিতাম, ওগো গায়ে মাষ্টারের ব্যাতের বাড়ি লাগত না। এমন মন্তর জানা লোক পাইলি তুই আমারে খবর দিস?" (পৃ. ১৯২)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গণ্শার সংলাপে পাঠশালার শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। কেননা, সেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়া বুঝিয়ে দেয় না, অথচ পড়া শিখে না এলে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। গণশার সরল মনে দেবতার প্রতি ভক্তি রয়েছে বলেই সে অন্য বর না চেয়ে তার কাছে এ সমস্যার সমাধানের জন্য লাঠির আঘাতে শিক্ষককেই কাবু করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। এ ভাবনা বছিরের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে মন্ত্রের শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায়। কল্পনাচারিতা তাদের আলাপের অবলম্বন হলেও এর অন্তরালে পাঠশালার শিক্ষকের প্রতি বিরূপতার বহিঃপ্রকাশই তাদের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি পূর্বের উদ্ধৃতিরই সম্প্রসারণ। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বছিরের শহরে যাবার সময় তার প্রতি গণ্শার সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে মন্ত্রের প্রতি আসক্তি। কেননা, পাঠশালার শিক্ষকের প্রহারে গণ্শা অভ্যস্ত হলেও সহপাঠীদের ওপর এ নির্যাতন মেনে নিতে সে অসম্মত। তাই সে এ সমস্যার প্রতিকারের জন্য মন্ত্রের ওপর আস্থাবশত বছিরকে উক্ত অনুরোধ জানায়।

২.৩ বিবিধ

ক. চিড়া কুটিয়া মা গামছায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মা বলে,"সঙ্গে নিয়া যা। সকালে সন্ধ্যায় নাস্তা করিস। আর এই দুই হ্যান পাঁটি সাঁপটা পিঠা নিবিরে? পথের মদ্দি খাইস।" ... বাপ বলে, "বাজা-পুড়া অযাত্রা, সঙ্গে দিও না।" (পৃ. ১৯১)

খ. মজিদ হোটেল-ওয়ালাকে বলিল, "হাফেজসাব! আজই এক ছিপারা কোরান শরীফ পইড়া আপনার মা-বাপের নামে বকশায়া দিবানি। আমাগো একটু মাছের ঝোল দেওনের হুকুম করেন।" ... হোটেল-ওয়ালা বলিল, "অত বকশানের কাম নাই। পয়সা আছে যে মাছের ঝোল দিব?" ... মজিদ বলিল, "আমরা তালেব-এলেম মানুষ। আমাগো দিলি আল্লা আপনাগো বরকত দিব। না দিলি আল্লা বেজার হবেন।" ... হোটেল-ওয়ালা মনে মনে ভাবিল, না যদি দেই তবে হয়ত ইহারা অভিসম্পাত দিবে। শত হইলেও তালেব-এলেম! ইহাদের কথা আল্লা শোনে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে দুই চামচ মাছের ঝোল তাহাদের পাতে ঢালিয়া দিল। (পৃ. ২৪২)

গ. নতুন শিশু পুত্রটিকে লইয়া আজাহের আর তার বউ বড়ই মুস্কিলে পড়িল। বাড়িতে বর্ষিয়সী কোন স্ত্রীলোক নাই। কেমন করিয়া শিশুকে দুধ খাওয়াইতে হইবে, কেমন করিয়া তাহাকে্লান করাইতে হইবে, কি ভাবে তাহাকে কোলে লইতে হইবে,

> কোন সময় কি ভাবে শিশুকে শোয়াইলে তাহাকে ডাইনীতে পায় না এসব খবর তাহারা কেহই জানে না। আনাড়ী মাতা শিশুকে দুধ খাওয়াইতে যাইয়া তাহার সমস্ত গায় দুধ জড়াইয়া দেয়, ...ান করাইতে শিশুর নাকে মুখে জল লাগে, সর্দ্দি হয়। বেশী দুধ খাওয়াইয়া শিশুর পেটে অসুখ করে। ... দৌড়াইয়া যায় আজাহের রামে-রাজের বাড়ি। তুক-তাবিজের অলঙ্কারে শিশুর সকল অঙ্গ ভরিয়া যায়। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিশুর ভালোর জন্য যে যেমন বিধান দেয় দুইজনে অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করে। এই ভাবে শিশু দিনে দিনে বাড়িতে থাকে। ... এখন তাহারা ঠেকিয়া ঠেকিয়া অনেক শিখিয়াছে। রাত্রে বাহির হইতে আসিয়া 'শিশুর ঘরে' প্রবেশ করিলে শিশুকে প্রেতে পায়। নিমা-সামের কালে শিশুকে বাহিরে আনিলে তাহার বাতাস লাগে। বাতাস লাগিয়া পেটে অসুখ করে। ডাইনী আসিয়া শিশুর সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিলে তাহার 'জ্বর চমকা' লাগে। এ জন্য সাবধানও তাহারা কম হয় নাই। ... ঘরের দরজার পাশে একটা মরা-গরুর মাথার হাড় লটকাইয়া রাখিয়াছে। ডাইনীরা তাহা দেখিয়া পালাইয়া যাইবে। কে কখন শিশুকে দেখিয়া নজর দেয়, বলা যায় না ত? সকলের চোখ ভাল না। তাহাতে শিশু রোগা হইয়া যাইতে পারে। উঠানের এক কোণে বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপরে রান্নাঘরের একটি ভাঙ্গা হাঁড়ী বসাইয়া রাখিয়াছে। ছেলের দিকে নজর লাগাইলেই সেই নজর আবার যদি সেই কালো হাঁড়ীর উপর পড়ে তবে আর তাহাতে ছেলের কোন ক্ষতি হইবে না। ছেলের যাহাতে সর্দ্দি না লাগে সেই জন্য তাহার গলায় একছড়া রসুনের মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (পৃ. ৬৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে খাদ্য সম্পর্কিত লোকসংস্কারের প্রভাব লক্ষণীয়। সম্ভবত সেকারণেই আজাহের তার স্ত্রীকে নিষেধ করেছিল বছিরের শহরে গমনকালে এসব খাবার না দিতে। খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লোকমানসে ধর্মের প্রতি সমীহবোধ লক্ষণীয় হোটেলমালিক হাফেজ মিঞার মনোভঙ্গিতে। কেননা, কোরান শরীফ মুখস্তকারী কিশোরদের প্রতি সে আস্থা স্থাপনে অনাগ্রহী। দিনের পর দিন ধারে তারা তার হোটেলে খাওয়ায় সে একপর্যায়ে তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়। অথচ মজিদের প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে গিয়েও সে দ্বিধায় পড়ে। কেননা, স্রষ্টার কালাম শিক্ষার্থীরা তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিশাপ দিলে তা ফলতে পারে ভেবে সে শঙ্কিত ছিল। অভিশাপ সংক্রান্ত লোকসংস্কার এভাবেই তার সিদ্ধান্তকে বদলে দেয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে নবজাতকের জন্ম সংক্রান্ত বিবিধ লোকসংস্কার মান্য করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রথম সন্তান বছিরের জন্মের পর তাকে প্রতিপালন করতে গিয়ে আজাহের ও তার স্ত্রী অনভিজ্ঞতাবশত বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। ছেলের জন্য সঠিক পরিচর্যাহেতু তারা অন্যদের পরামর্শ মেনে নেয়, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে নবজাতক সম্পর্কিত সতর্কতা। কেননা, শিশুর অনিষ্টসাধনের জন্য ভূতপ্রেত-ডাইনির অপতৎপরতা, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি, প্রতিবেশীদের নজর দেয়া বা খারাপ দৃষ্টি পড়া সংক্রান্ত নানা লোকসংস্কার এ দম্পতিকে বিচলিত করে। এর প্রতিকার হিসেবে তুকতাক, তাবিজে আস্থা স্থাপনে তারা উদ্বুদ্ধ হয়।

৩. লোকাচার–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত লোকাচারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো অতিথিকে আপ্যায়ন ও পরিচর্যা। আজাহের তার পরিবার নিয়ে যখন গরীবুল্লা মাতবরের বাড়িতে আসে, সে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। সে সালাম দিয়ে মিনাজদ্দী মাতবরের পরিচয় জানাতেই গরীবুল্লা তাদের ঘরে বসিয়ে স্ত্রীকে আহ্বান করে খাতির-যত্নের জন্য। আজাহেরের জন্য ওজুর পানি পাঠিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়। আজাহেরের হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বদনায় পানি ও খড়ম দেয় গরীবুল্লার মেয়ে ফুলু। গরীবুল্লা মেয়েকে ডেকে জানায়, 'তোর মাকে ক গিয়া বড় মোরগডা জবাই কইরা দিতি। আইজ বেয়াই-এর দ্যাশের কুটুমরে বাল কইরা খাওয়াইতি অবি' (পৃ. ৯০)। অচিরেই ফুলী আজাহেরের নাস্তার জন্য নানা খাবার নিয়ে আসে। আজাহের হাত মুখ ধুয়ে সেসব খেতে খেতে গরীবুল্লার সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হয়। এরপর চলে পান-সুপারি খাবারের আয়োজন। অন্যদিকে আজাহেরের ছেলেমেয়েরা গরীবুল্লার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে যায়। সেই সুযোগে রান্না চাপিয়ে গরীবুল্লার স্ত্রী আজাহেরের স্ত্রীর চুলে তেল দেয় এবং 'তুই' সম্ভাষণে ছোট বোনের মতো আন্তরিকভাবে কাছে টেনে নেয়। যে অশেষ কষ্ট হৃদয়ে নিয়ে আজাহের ও তার স্ত্রী গরীবুল্লার নিকট হাজির হয়েছিল, তা প্রকাশের জন্য তারা উন্মুখ ছিল। কিন্তু গরীবুল্লা ও তার স্ত্রী তাদের দুর্দশা অনুমান করেই সে বিষয়ে সেদিন আলাপে বিরত ছিল। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষে তাদের শোয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। পাঁচ-ছয়দিন

অতিক্রান্ত হলে গরীবুল্লা আজাহের ও তার পরিবারের সম্মানে গ্রামের মানুষকে নিমন্ত্রণ জানায় বিশাল ভোজের আয়োজনে। ইতোমধ্যে যখনই আজাহের এ গ্রামে তার আসবার বৃত্তান্ত জানাতে চেয়েছে, গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত হতে চেয়েছে, প্রতিবারই তাকে থামিয়ে দিয়ে গরীবুল্লা জানিয়েছে, 'কুটুমির দ্যাশের মানুষ। মিঞা! তুমি যদি আমার বাড়িতি কাম করবা, তয় আমার মান থাকপ? কুটুম বাড়িতে আইছ। বাল মত খাও দাও, এহানে ওহানে হাইট্যা বেড়াও, দুইডা খোশ গল্প কর' (পৃ. ৯৫)। অবশেষে ভোজপর্ব সমাপ্ত হলে আজাহের মরীয়া হয়ে এ গ্রামে পরিবারসহ তার আসবার বৃত্তান্ত গ্রামবাসীকে জানায়। এভাবেই আজাহের গরীবুল্লার পরিবার ও গ্রামের বাসিন্দাদের আন্তরিকতা, সমাদরের সঙ্গে পরিচিত হয়। মৃত সম্পর্কিত লোকাচারের দৃষ্টান্ত বিবৃত হয়েছে আজাহেরের মেয়ে বড়ুর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণের ঘটনায়। তাকে কবরস্থ করতে সে যেখানে সঙ্গীদের নিয়ে খেলত, বাড়ির কদম গাছটির নিচের সেই স্থানটি খোঁড়া হয়। তাম্বুলখানার হাট থেকে আতর ও লোবান আনা হয়। কাফনের কাপড়ের অভাবে রহিমদ্দী কারিগরের উপহৃত শাড়ি দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়া হয়। গরীবুল্লার স্ত্রী বড়ুর মৃতদেহের গোসল করিয়ে দিলে এরপর তাকে বাঁশের মাচায় শোয়ানো হয়। জানাজা শেষে বড়ুর মৃতদেহ কবর দেয়া হয়। তার কবরে প্রথমে মাটি দেয় তার পিতা আজাহের। এরপর ভাই বছির ও অন্যরা মাটি দিয়ে কবর ভরাট করে। কবরের ওপর সরষের বীজ বুনে দেয়া হয়, যেন রাতের অন্ধকারে শেয়াল এসে কবর থেকে মৃতদেহ খুবড়ে খেতে না পারে।

৪. লোকসাহিত্য-- ধাঁধা, লোককাহিনী ও লোকসঙ্গীতের সমাহারে এ উপন্যাসে ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের পরিচয় প্রকাশিত--

৪.১ ধাঁধা-- গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কিছু ধাঁধার উল্লেখ এ উপন্যাসে রয়েছে। আজাহের যখন বিয়ে করতে যায়, তখন তার হবু স্ত্রী এ শর্তে বিয়েতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল যে, তার ধাঁধার জবাব বরপক্ষকে দিতে হবে। কনের হয়ে তার পক্ষের কয়েকজন বরপক্ষকে প্রশ্ন করে, 'বচ্ছরকে দুইটা পাখি আসে। তার একটা সাদা আর একটা কালা। আপনারা কালাডা খাইবেন না ধলাডা খাইবেন। কোনডা আপনাগো জন্যি আনবো?' এর উত্তর দেয় মোড়ল মেনাজদ্দী 'বচ্ছরকে দুইডা পাখি আসে রোজার মাসে, কালা পাখি ঐল রাইত আর ধলা পাখি ঐল দিন। আমি কালা পাখিই খাইলাম। রোজার মাসে ত কালা রাত্তিরেই ভাত খাইতে হয়।' (পৃ. ১১-১২)। এরপর মেনাজদ্দী কনেপক্ষকে জানায়--

> "মাইটা হাতুন কাঠের গাই--
>
> বছর বছর দুয়ায়া খাই" (পৃ. ১২)

এর জবাব দেয় কনেপক্ষের মোড়ল বরান খাঁ, "মানে খেজুর গাছ। এক বছর পরে খাজুইর গাছ কাটা হয়। মাটির হাঁড়ী গাছের আগায় বাইন্দা রস ধরা হয়"। (পৃ. ১২)। এরপর সে আবার প্রশ্ন করে-

> "নয় মন গোদা, নয় মন গুদি,
>
> নয় মন তার ছাওয়াল দুটি।
>
> নদী পার অইব। কিন্তুক নৌকায় নয় মনের বেশী মাল ধরে না। কেমন কইরা পার অবি? " (পৃ. ১৩)

এর জবাবে বরপক্ষের মোড়ল মেনাজদ্দী বলে,

> "পেরতমে দুই ছাওয়াল পার হ'য়া ওপারে যাবি। এক ছাওয়াল ওপারে থাকপি, আর এক ছাওয়াল নাও বায়া এপারে আসপি। তারপর গোদা নৌকা বায়া ওপারে যাবি। গোদার যে ছাওয়াল ওপারে রইছে সে নৌকা বায়া এপারে আসপি। আইসা দুই ভাই আবার ওপারে যাবি। ওপার ত্যা এক ভাই নৌকা লয়া এপারে আসপি। এবার গোদার বউ নৌকা লয়া

> যাবি। ছাওয়ালডা এপারেই থাকপি। ওপার যে ছাওয়ালডা রইছে সে নৌকা নিয়া আইসা এপার ত্যা তার বাইডারে লয়া যাবি।" (পৃ. ১৩)

ধাঁধার পর্ব সম্পন্ন হলে বিয়ের অন্যান্য আয়োজন ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলে।

৪.২ রূপকথা-- লোককথা, রূপকথা, উপকথা, কেচ্ছাকাহিনীতে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গ্রামীণ লোকসমাজে এসবের প্রচলন ঘটেছে বহুদিন পূর্বে এবং বংশপরম্পরায় মুখে মুখে বাহিত হয়ে এগুলো এখনো টিকে রয়েছে। বিভিন্ন গাথা, আখ্যায়িকা, পল্লীগীতি ও পালাগানে উপজীব্য নানা কাহিনীও রূপকথার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। কখনো কখনো রূপকথার বিষয় ও ঘটনাকে ভিত্তি করেই পল্লীগায়কদের কল্পনাযোগে স্থানীয় ভাষায় এগুলো রচিত ও গীত হয়। এ উপন্যাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় আমির সাধু ও বেলোয়া সুন্দরীর আখ্যানে। লেখকের বর্ণনায়--

> পল্লী-বাংলার অনেকগুলি রূপকথা সাহা, সাধু-সওদাগরদের কাহিনীতে ভরপুর। আজও পল্লী গ্রামের গানের আসরগুলিতে গায়কেরা কত সাধু-সওদাগরেরে, শঙ্খ-বণিকের দূরের সফরের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শতশত শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। কবে কোন নীলা-সুন্দরীর মাথার কেশে-লেখা প্রেম-লিপি পড়িয়া কোন্ সাহা বণিকের ছেলে সুদূর লঙ্কার বাণিজ্যে বসিয়া বিরহের অশ্রুবিন্দু বিসর্জন করিয়াছিল, তাহার ঢেউ আজো গ্রাম্য-রাখালের বাঁশীতে রহিয়া রহিয়া বাজিয়া উঠে। (পৃ. ৩২)

রহিমদ্দী কারিগরের সঙ্গে আলাপকালে আজাহের গীত শুনতে চাইলে সে এ লোকগীত পরিবেশন করে। নদীর ঘাটে্ান করতে গেলে আমির সাধুর রূপবতী স্ত্রী বেলোয়া সুন্দরীকে দেখে মগ জলদস্যুরা তাকে অপহরণ করে। স্ত্রীকে হারিয়ে বিরহব্যথায় ব্যাকুল আমির সাধু মনের দুঃখে সারিন্দা বাজাতে বাজাতে নানা স্থানে খুঁজেও তাকে পায় না। এ কাহিনীকে ভিত্তি করেই গীতটি রচিত। তেমনিভাবে তার পরিবেশিত ওতলা সুন্দরীর কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত গীতের উদ্দেশ্য নারীর নৈতিক আদর্শ ও সতীত্বের মহিমায় অটল থাকার দৃঢ়তাকে মহিমা দান। এসব কাহিনীতে উপজীব্য হয় সমাজ ও পারিবারিক জীবনে অনুসৃত বিশেষ কোনো নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয়-সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ, যা সহজেই শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। ওতলা সুন্দরীর গীতের কাহিনী হলো--

ইরান তুরান মুল্লুকের এক খ্যাতিমান বাদশার অতুলনীয় সুন্দরী কন্যা ওতলা সুন্দরী। একসময় এক সওদাগর পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর তারা মহানন্দে প্রাসাদে বসে পাশা খেলে। বিলাস ব্যসনে সময় অতিবাহিত করায় লোকজন সওদাগরপুত্রের নিন্দা করে। এ খবর তার পিতার কানে গেলে সওদাগরপুত্র একপর্যায়ে স্ত্রীকে রেখে দূরদেশে বাণিজ্য করতে যায়। বিদায়কালে সে মা ও বোনকে অনুনয় জানায়, স্ত্রীকে দেখে রাখার জন্য। সওদাগর পুত্র ছয় মাস ধরে বিভিন্ন নগর-বন্দরে বাণিজ্য করতে করতে একপর্যায়ে সাত সমুদ্রের তীরে হাজির হয়। এখানে এক পাখির কাছে ছয় মাসের পথ অচিরেই অতিক্রম করার কৌশল জেনে নিয়ে সে গভীর রাতে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়। এ ঘটনা কেউ জানতে পারেনি। স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়লীলায় রাত যাপন করে ভোরেই সওদাগরপুত্র মন্ত্র পড়ে সমুদ্রতীরে চলে যায়। একপর্যায়ে ওতলা সুন্দরী গর্ভবতী হলে তার সতীত্ব ও সন্তানের জনকত্বের প্রশ্নে সকলের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়। ওতলা স্বামীর আগমনের কথা জানালেও কেউই তার কথা বিশ্বাস করে না। তখন দেহের মহামূল্য অলংকাররাজি ও দামী পরিচ্ছদ খুলে তাকে ছেঁড়া চটের বসন পরিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। পথে পথে অনাহারে ঘুরতে ঘুরতে ওতলা অবশেষে এক বৃদ্ধ চাষীর গৃহে ঠাঁই পায়। সেখানেই সে এক ছেলের জন্ম দেয়। একপর্যায়ে সেই চাষী মারা গেলে আশ্রয়হারা ওতলা ছেলে কোলে নিয়ে আবার পথে নামে, স্বামীর খোঁজে। কিন্তু কেউই সওদাগরপুত্রের সন্ধান তাকে জানাতে পারে না। বনের এক দুষ্ট লোক ওতলার রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বশীভূত করতে চায়। ওতলা তার প্রস্তাবে সম্মত না হলে সে ওতলার ছেলেকে কেড়ে নেয় এবং তাকে হত্যার হুমকি দেয়। তবু ওতলা সম্ভ্রম বিসর্জনে সম্মত না হলে একপর্যায়ে সেই পাষাণ ওতলার প্রাণপ্রিয় ছেলেকে হত্যা করে। ছেলের শোকে প্রায় উন্মাদিনী ওতলা অহর্নিশ বিলাপ করলেও তার দুঃখের পালা ফুরায় না। রহিমুদ্দীর পরিবেশিত এ গীতাখ্যান শুনে আসরের শ্রোতাদের চোখের জল উপচে ওঠে

ওতলার প্রতি সমবেদনায়। গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত এ কাহিনীর অন্যতম আকর্ষণ হলো, প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ মানবিক বৃত্তান্তের সঙ্গে শ্রোতারা নিজেদের জীবনবাস্তবতাকে একাত্ম করতে পারে। ফলে, ওতলা তাদের কল্পনায় ইরানের রাজকন্যা নয়, বরং পল্লীর সাধারণ গৃহবধূ হয়ে ওঠে। লেখকের অভিমত–

> কাহিনীর ভিতর দিয়া এই দেশের সব চাইতে যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ সেই একনিষ্ঠ প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া গেল। সেই প্রেমের মর্যাদা রাখিতে এ দেশের মেয়েরা কত দুঃখের সাগরস্নান করিয়াছে ... যুগে যুগে এই প্রেম, দুঃখের অনলে পুড়িয়া নিজের স্বর্ণজ্যোতি আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। অস্ত্র তাহাকে ছেদন করিতে পারে নাই, অগ্নি তাহাকে দাহন করিতে পারে নাই। রহিমদ্দীর মত বাঙলার গ্রামগুলিতে এইরূপ কত গায়ক, কত কবি, কত কথক রহিয়াছে। তাহারা বাঙলার অবহেলিত জনগণের মধ্যে আনন্দ-রসে ভরিয়া এই আদর্শবাদ আর নীতির মহিমা প্রচার করিতেছে। (পৃ. ১৬৪)

৪.৩ লোকসঙ্গীত–– এ উপন্যাসে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী মুর্শিদী-মারফতি, ভাটিয়ালি ও বাউল সঙ্গীতের পাশাপাশি বিয়ের মেয়েলি গীত, বালক-বালিকাদের খেলায় পরিবেশিত গান ও বিভিন্ন গ্রাম্য লোকগীতি কুশীলবদের বয়ানে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষত রহিমদ্দী কারিগরের বয়নে আমির সাধু ও ওতলা সুন্দরীর লোকগীত নৃত্যযোগে উপস্থাপিত হলেও আরজান ফকির ও তার স্ত্রীর মাধ্যমে সারিন্দাযোগে বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের পরিবেশনা লক্ষণীয়। লোকমানুষের চিত্তবিনোদন ও প্রাণের আকুতিকে যথোপযুক্ত শব্দ ও ভাবসমাবেশে, লোকবাদ্যসমূহের সুর ও তালের নিপুণ যোজনায় পরিবেশনের অসামান্যতাগুণে এগুলো যুগ যুগ ধরে বাঙালি লোকমানুষকে আলোড়িত করে। এ উপন্যাসে লোকগীতি, বিয়ের মেয়েলি গীত, বালকবালিকাদের পুতুল খেলায় পরিবেশিত গীত, মারফতি, ভাটিয়ালি ও বাউল গানের সমাহার ঘটেছে। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ, হাসি-ছাট্টা, প্রেম-ভালোবানসা, বিরহ-মিলনের অনুষঙ্গ, লোককাহিনীর চমকপ্রদ ঘটনাদির সঙ্গে যথোপযুক্ত সুর, তাল ও রসের সমাবেশে গীতময়তা ও মানবিক আবেদনের গুণে এসব গান যুগযুগ ধরে শ্রোতাদের বিমোহিত করে চলে। তাদের চিত্তবিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রহিমদ্দী কারিকরের কাছে আজাহের গান শুনতে চাইলে সে পরিবেশন করে আমির সাধু ও তার স্ত্রী বেলোয়া-সুন্দরীর গীত––

প্রথমে বাজিলরে সারিন্দা আমির সাধুর নামরে;

হারে তারিয়া নারে। ...

তারপর বাজিলরে সারিন্দা–দেশের রাজার নামরে;

হারে তারিয়া নারে। ...

তারপর বাজিলরে সারিন্দা– বেলোয়া সুন্দরীরে;

হারে তারিয়া নারে। ...

আজ কোথায় রইল আমার বেলোয়া সুন্দরীরে– (পৃ. ৪-৫)

বিয়ের মেয়েলি গীত

ওদিকে সইরা বইস হারে দামান

আমার বেলোয়া বসপি তোমার বামেনারে।

কেমনে বসপি আমার বেলোয়া হারে দামান

তাহার সিন্তা রইছে খালি নারে।

Dhaka University Institutional Repository

দুলার মামু দৌড়াইয়া তখন বাইনা বাড়ি যায় নারে।

কেমনে বসপি আমার বেলোয়া হারে দামান

ও তার গায়েতে জেওর নাইরে।

দুলার চাচা দৌড়ায়া তখন

সোনারু বাড়ি যায় নারে। (পৃ. ১৬)

গ্রাম্য লোকগীত

বাড়িতে নতুন বহু আসিয়া,

কথা কয় রাঙা মুখে হাসিয়া;

আমার বাঁশী বাজে তারিয়া নারিয়া নারিয়ারে।

পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায় বহু লাল শাড়ী পরিয়া,

লাল মোরগের রঙীন পাখা নাড়িয়া নাড়িয়া;

ও ভাইরে ঝলমল কি চলমল করিয়া ...

বউ ত নয় সে হলদে পাখি এসেছে উড়িয়া

সরষে খেত নাড়িয়া

হয়ত বা পথ ভুলিয়া;

আমার মন বলে রাখি তানে পিঞ্জিরায় ভরিয়া হৃদয়ে পুরিয়া

নইলে যাবে সে উড়িয়া

ও ভাইরে ফুরফুর কি তুরতুর করিয়া। (পৃ. ২৪-২৫)

পুতুল খেলায় বালক-বালিকাদের পরিবেশিত গান

দেশাল সিন্দুর চায় নারে ময়না,

আবেরি ময়না ঢাকাই সিন্দুর চায়,

ঢাকাই সিন্দুর পরিয়া ময়নার গরম লাগে গায়। ...

দেশাল শাড়ী চায় নারে ময়না,

আবেরি ময়না ঢাকাই শাড়ী চায়;

ঢাকাই শাড়ী পরিয়া ময়নার গরম লাগে গায়।

ডান হস্তে শ্যামলা গামছা,

বাম হস্তে আবের পাঙ্খা;

আরে দামান চুলায় বালির গায়। (পৃ. ১৪৮)

মারফতি গান

যে হালে যে হালে রাখছাওরে
দয়ালচান তুই আমারে
ও আমি তাইতে ভাল আছিরে।
কারে দিছাও দালান কোঠা
ও আল্লা আমার পাতার ঘররে।
কারে খাওয়াও চিনি সন্দেশ
ও আল্লা আমার খুদের জাওরে। (পৃ. ২১০-২১১)

ভাটিয়ালি গান

কে যাসরে রঙিলা নার মাঝি!
সামের আকাশরে দিয়া,
আমার বাজানরে কইও খবর,
নাইওরের লাগিয়ারে।
গলুইতে লিখিলাম লিখন সিন্তার সিন্দুর দিয়া
আমার বাপের দেশে দিয়া আইস গিয়া
– রে রঙিলা নার মাঝি!
আমার বুকের নিশ্বাস পালে নাও ভরিয়া,
ছয় মাসের পন্থ যাইবা ছয় দণ্ডে চলিয়া,
– রে রঙিলা নার মাঝি। (পৃ. ২৩২)

বাউল সঙ্গীত

ও দীন বন্ধুরে
আমি ভাবছিলাম আনন্দে যাবে দিন।
বাল্যকাল গ্যাল ধূলায় খেলায়
আমার যৈবুন গ্যাল হেলায় ফেলায়,
এই বৃদ্ধকালে ভাঙল দিনের খেলারে।
জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরি,

আমি আইলা ক্যাশ নাহি বান্দি হে;

আমি তোরো জন্যে হইলাম পাগলিনীরে।

শুনেছি তোর মহিমা বড়,

তুমি পাতকী তরাইতে পার হে;

আমার মতন পাতক কেবা আছে ভবেরে। (পৃ. ২৩৭)

লেখকের শিল্পীমানসে পরম মমতায়, সযত্ন অনুরাগে লালিত পল্লীজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন এসব লোকসঙ্গীত। এগুলোতে বাঙালি লোকসমাজের নিত্যদিনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ-মিলনের অকৃত্রিম অনুভবের পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। চিত্তবিনোদন এবং সৃষ্টিশীলতার অনবদ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে রূপায়িত গানগুলোর ভাবময়তা ও সাঙ্গীতিক অনুরণন পাঠকের অন্তর্লোককে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করে।

৫. লোকশিল্প-- ফরিদপুর অঞ্চলের লোকশিল্পের খ্যাতি অতুলনীয়। বিশেষত, বয়নশিল্পের জন্য এ অঞ্চল স্বনামধন্য। এ উপন্যাসেও এতদঞ্চলের তাঁতি ও হস্তশিল্পীদের সৃষ্টিশীলতার পরিচয় উল্লেখিত। সূচিশিল্পের মধ্যে নকশিকাঁথা, রুমালের নকশা, পাট দিয়ে বানানো দড়ি, বাঁশের কঞ্চির ঝুড়ি, তাঁতে বিভিন্ন রঙের শাড়ি বয়নে গ্রামবাসী পারদর্শী। ফুলী আজাহেরকে ভালোবেসে যে নকশিকাঁথা সেলাই করেছিল, তাতে সুঁই-সুতার আঁচড়ে মূর্ত হয়েছে গ্রামীণ তরুণীর হৃদয়ে জাগ্রত শিল্পভাবনা ও কল্পনাশক্তির সমন্বয়--

> "তোমার জন্যি আইজ ছয়মাস ধইরা একখানা কাঁথা সিলাই করত্যাছিলাম। আইজ সারা রাইত জাইগা এডারে শেষ করলাম। দেখ তো বছিরবাই কেমন ঐছে।" ... এই বলিয়া ফুলী তার আঁচলের তলা হইতে কাঁথাখানা মেলন করিয়া ধরিল। দেখিয়া বছির বড়ই মুগ্ধ হইল। কোন শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া এই গ্রাম্য-মেয়েটি অঙ্কন পদ্ধতির সীমা-পরিসীমার জ্ঞান লাভ করে নাই। নানা রঙ সামনে লইয়া এ-রঙের সঙ্গে ও-রঙ মিশাইয়া রঙের কোন নতুনত্বও সে দেখাইতে পারে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় হইতে লাল, নীল, হলুদ ও সাদা–মাত্র এই কয়টি রঙের সূতা উঠাইয়া সে এই নক্সাগুলি করিয়াছে। ... কাঁথার মধ্যে অনেক কিছু ফুলী আঁকে নাই। শুধু মাত্র একটি কিশোর-রাখাল বাঁশী বাজাইয়া পথে চলিয়াছে। আর একটি গ্রাম্য-মেয়ে কাঁখে কলসী লইয়া সেই বাঁশী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। পুকুরে কয়েকটি পদ্মফুল ভাসিতেছে। তাহাদের দলগুলির রঙে বংশীওয়ালার প্রতি সেই মেয়েটির অনুরাগই প্রকাশ পাইতেছে। ... তারই মনের আকুতি রূপ পাইয়াছে ওই চলন্ত মাছগুলির মধ্যে, ওই উড়ন্ত পাখিগুলির মধ্যে এই ক্ষুদ্র কাঁথার উপরে ফুলী এতগুলি নক্সা এবড়ো থেবড়ো ভাবে বুনোট করে নাই। যেখানে যে নক্সাটি মানায়– যে রঙটি যে নক্সায় শোভা করে সেই ভাবেই ফুলী কাঁথাখানি তৈরী করিয়াছে। আর সবগুলি নক্সাই বাঙালীর যুগ যুগান্তরের রস-সৃষ্টির সঙ্গে যোগ-সংযোগ করিয়া হাসিতেছে। (পৃ. ২৮৩)

রহিমদ্দীর বোনা জামদানি শাড়ির খ্যাতি স্বগ্রাম পেরিয়ে আশেপাশের অঞ্চলসমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। সেকারণে বড় বড় ব্যবসায়ীরাও তার কাছে আসত শাড়ি কিনতে। শুধু জামদানি শাড়িই নয়, সে মনখুশী, দিলখুশী, কলমীলতা, কাজল লতা, গোলাপ ফুল, রাসমণ্ডল, বালুচর প্রভৃতি শাড়ি বুনতেও ওস্তাদ ছিল। সেকারণেই আজাহের তার নববধূকে কোন রঙের শাড়িতে মানাবে, এরূপ কল্পনায় মত্ত হয় রহিমদ্দীর তাঁতে বোনা রঙবেরংয়ের শাড়ি দেখে--

> আজাহের কাপড়গুলির পানে চায়, আর মনে মনে চিন্তা করে, কোন্ কাপড়খানা তার বউকে মানাইবে ভাল। তার বউ যদি ফর্সা হয়, একেবারে সরষে ফুলের মতো ফর্সা, তবে ওই নীলের উপর হলুদের ডোরা-কাটা শাড়ীখানা সে তার জন্য কিনিয়া লইবে। কিন্তু বউ যদি তার কালো হয়, তা হোক, ওই যে কালোর ওপর লাল আর আবছা হলুদের ফুল-কাটা পাড়ের শাড়ীখানা, ওইখানা নিশ্চয় তার বউকে মানাইবে ভাল। আচ্ছা, বরান খাঁর মেয়ে আসমানীর মত পাতলা ছিপছিপে যদি তার গায়ের গড়ন হয়, তবে ওই যে পাড়ের উপর কলমীফুল আঁকা শাড়ীখানা, ওইখানা তার বউ-এর জন্য কিনিলে হয় না? (পৃ. ৬)

গ্রামীণ গৃহবধূদের হাতে বোনা শিকা ও আল্পনার উল্লেখ রয়েছে এ উপন্যাসে। আজাহের তাম্বুলখানা গ্রামে গরীবুল্লা মাতবরের বাড়িতে এলে একপর্যায়ে গ্রামবাসী তাকে সাহায্য চালাঘর নির্মাণে। প্রতিবেশী নারীরা আজাহেরের স্ত্রীকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে, বসতবাড়ি আল্পনায় সাজিয়ে বিমোহিত করেছিল। আজাহেরের বাড়ি দেখে স্বয়ং গরীবুল্লাও অবাক হয়েছিল--

> ঘরের মধ্যে যাইয়া মোড়ল আরো অবাক হইয়া গেল। ঘরের চালার আটনে একটা ফুলচাঙ পাতা। তাহার সঙ্গে কেলীকদম্ব সিকা, আসমান তারা সিকা, কত রঙ বেরঙের সিকা ঝুলিতেছে। সেই সব সিকায় মাটির বাসন। ছোট ছোট খুটি (হাঁড়ি) বাতাসে দুলিতেছে। ঘরের বেড়ায় কাদা লেপিয়া চুন-হলুদ আর আলো-চালের গুঁড়া দিয়া নতুন নক্সা আঁকা হইয়াছে। মোড়ল বুঝিতে পারিল তাহার গৃহিণী সমস্ত গাঁয়ের মেয়েদের লইয়া সারা দিনে এইসব কাণ্ড করিয়াছে। ... মোড়লের বউ তখন বলিতে লাগিল, "এই সিকাডা দিছে বরান খাঁর বউ, এইডা দিছে কলিমদ্দীর ম্যায়া, আর এই সিকাডা দিছে মোকিমির পরিবার।" (পৃ. ১০৪-১০৫)

৬. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে--

> ক. সামনের পালান হইতে বেতে-শাক তুলিয়া আনিয়া কুলার উপর রাখা হইয়াছে। তারই পাশে একরাশ ঘোমটা মাথায় দিয়া বউটি হলুদ বাঁটিতেছে। (পৃ. ২০)
>
> খ. খ্যাতের ধান পাকলি তুমি মনের মত কইরা পিঠা বানাইও, কেমন? (পৃ. ২০-২১)
>
> গ. শ্বশুর বাড়িতে দুপুর বেলায় শুকনো ডাঁটার ঝোল আর পচা আউস চাউলের ভাত খাইয়া জামাই চলিয়া গিয়াছে। ... আজ পাঁচ বচ্ছর মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছি, একখানা পান-বাতাসা হাতে করে মেয়েটাকে দেখে গেল না। (পৃ. ৩৪-৩৫)
>
> ঘ. ফুলু চীনের রেকাবীতে করিয়া মুড়ি, তীলের নাড়ু, নারকেলের তক্তি–আর একটি বাটিতে করিয়া ঘন আওটা দুধ আজাহেরের সামনে আনিয়া ধরিল। ... নাস্তা খাওয়া শেষ হইলেই মোড়ল নিজের বাঁশের চোঙ্গা হইতে পান বাহির করিল। পাশের দাখানা লইয়া একটা সুপারি অর্ধেক কাটিয়া আজাহেরের হাতে দিল। "মিঞা! পান সুপারি খাও।" তারপর খুব গর্বের সঙ্গে বলিতে লাগিল, "পান আমার নিজির বাড়ির, আর সুপারিও নিজির গাছের। চুনডা ক্যাবুল কিন্‌ছি।" বলিয়া চুনের পাত্রটি সামনে আগাইয়া দিল। আজাহের পান মুখে দিতে না দিতেই মোড়ল নিজির হাতে হুঁকোটি আনিয়া আজাহেরের হাতে দিল।" (পৃ. ৯০)
>
> ঙ. ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া আজাহের দেখিল যে সবগুলি পান্তা-ভাত বউ তাহাদের পাতে ঢালিয়া দিয়াছে। নিজের জন্য কিছুই রাখে নাই। ... সে নিজের মাটির সানকি হইতে অর্দ্ধেকটা পরিমাণ ভাত তুলিয়া হাঁড়িতে রাখিল। তারপর অবশিষ্ট ভাতগুলিতে সানকি পুরিয়া পানি লইয়া তাহাতে কাঁচা মরিচ, পেয়াজ ও লবণ মাখাইয়া শব্দ করিয়া গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। (পৃ. ১১১)
>
> চ. মেছো বাজার পার হইলেই রাস্তার দুই ধারে মেঠায়ের দোকান। ... মিষ্টির দোকানে সব চাইতে সস্তা দামে বিক্রি হয় জিলিপি। ... আজাহের মিষ্টির দোকানের কাঁচের আবরণীতে রক্ষিত সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া প্রভৃতি স্তরে স্তরে সাজানো নানারকমের মিষ্টিগুলির উপর চোখ বুলাইয়া লইতেছিল। (পৃ. ১২১)
>
> ছ. আজাহের অনেকগুলি বেতের আগা কাটিয়া লইল। শহরের লোকেরা বেতের আগা খাইতে পছন্দ করে। (পৃ. ১২৫)
>
> জ. বনের মধ্যে ঢুকিয়া সারাদিন বছির এখানে সেখানে ঘুরিল। গাছের পেয়ারা পাড়িয়া খাইল। জঙ্গলের কুল পাড়িয়া স্তূপাকার করিল–তারপর সন্ধ্যাবেলায় চুপিচুপি বাড়ি ফিরিয়া আসিল। (পৃ. ১২৮)
>
> ঝ. বউ রহিমদ্দীর সামনে মুড়ি আর গুড় আনিয়া দিয়া বলে, "চাচাজান খাউক।" (পৃ. ১৫২)
>
> ঞ. রহিমদ্দী ঢ্যাপের পোঁটলা আর তেলের শিশি তার বোঁচকার মধ্যে বাঁধিতে বাঁধিতে বলে ...(পৃ. ১৬৪)

ট. চিড়া কুটিয়া মা গামছায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মা বলে, "সঙ্গে নিয়া যা। সকাল সন্ধ্যায় নাস্তা করিস। আর এই দুই হ্যান পাঁটি সাঁপটা পিঠা, নিবিরে?" (পৃ. ১৯১)

ঠ. ফকিরের স্ত্রী সামান্য খুদ ভাজিয়া লইয়া আসিল। দুইটি শাঁখআলু আগেই আখায় পোড়ানো হইয়াছিল। একটি পরিষ্কার নারিকেলের আচিতে ভাজা খুদ আর মাটির সানকিতে সেই পোড়া শাঁখআলু দুইটি আনিয়া বছিরের সামনে ধরিল। (পৃ. ২১২-২১৩)

ড. ফকিরের বউ ... কিছু মুড়ি আর গুড় আনিয়া বলিল, "বাজান খাও।" ... সামান্য কিছু আতপ চাউল আর গুড় যদি থাকিত, তবে সে মনের মত করিয়া কত রকমের পিঠা তৈরী করিয়া এই কিশোর- দেবতাটির ভোগ দিত।

ঢ. ফকিরনী বছিরের হাতমুখ ধোওয়াইয়া তাহাকে সামান্যকটি ভিজানো ছোলা আনিয়া খাইতে দিল। (পৃ. ২৩৯)

ণ. মাঝে মাঝে আজাহের ... বাড়ি হইতে গামছায় বাঁধিয়া কোনদিন সামান্য চিড়া বা ঢ্যাপের খই লইয়া আসে। (পৃ. ২৫০)

ত. ভাত লইয়া ফকিরনী আর এক বাড়ি হইতে একটু শাক আর ডাল লইয়া আঁচল আড়াল করিয়া তার ছোট রান্নাঘরে ঢুকিল। (পৃ. ১২৮)

থ. সে ছেলের নাস্তা করিবার জন্য দশ সের চিড়া কুটিয়া দিবে। মিঞাজান দিবে এক হাঁড়ি খেজুরে-গুড়। (পৃ. ২৬৮)

হুকায় ও কলকেতে তামাক পান ফরিদপুরের বাঙালি লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত, যার সাক্ষ্য রয়েছে এ উপন্যাসে। গ্রামের পুরুষেরা এতে যে রীতিমত অভ্যস্ত, উপন্যাসটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিবৃত দৃশ্যসমূহে এর উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে। অতিথি, বন্ধু-বান্ধব, চেনা পরিচিত ব্যক্তিবিশেষকে সমাদর জানাতে এ অভ্যাস হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ফরিদপুরের গাছবাইড়ার চক ও তাম্বুলখানা গ্রামদ্বয়ের পুরুষসমাজে প্রচলিত। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই নিজের বিয়ের প্রসঙ্গে আলোড়িত নায়ক আজাহের নববধূর জন্য রহিমদ্দী কারিগরের বয়নকৃত তাঁতের রঙিন শাড়ি কেনা প্রসঙ্গে আলাপকালে তামাকযোগে পান করে। লেখকের বর্ণনায় দৃশ্যটি এভাবে বিবৃত--

> রহিমদ্দী কারিকর তার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আরে কি মনে কইরা, আজাহের? বইস, বইস। তামুক খাও।" ... ঘরের বেড়ার সঙ্গে লটকান হুঁকোটি লইয়া কলিকার উপরে ফুঁদিয়া প্রথমে আজাহের কলিকার ছাইগুলি উড়াইয়া দেয়। তারপর কলিকার গুলটুকু ভাল জায়গায় ঢালিয়া রাখিয়া কলিকার মধ্যে খানিকটা তামাক ভরিয়া অতি সন্তর্পণে সেই গুলটুকু নিপুণ হস্তে তাহার উপর সাজাইয়া দেয়, যেন এতটুকুও নষ্ট না হইতে পারে। তাহার উপরে সুন্দর করিয়া আগুন ধরাইয়া রহিমদ্দী কারিকরের দিকে হুঁকোটি বাড়াইয়া ধরে। ... কারিকর বলে-"আরে না, না-তুমি আগে টাইনা ধূমা বাইর কর।" ... কারিকর যে তাকে এতটা খাতির করিয়াছে, আগে তাকে তামাক টানিতে বলিয়াছে এ যে কত বড় সম্মান! আজাহেরের সমস্ত অন্তর গলিয়া যায়। সে রহিমদ্দীর দিকে হুঁকোটি আরও বাড়াইয়া বলে, "কারিকরের পো, তা কি অয়? মুরব্বি মানুষ। তুমি আগে টাইনা দাও।" ... খুশী হইয়া কারিকর হুঁকোটি হাতে লইয়া টানিতে আরম্ভ করে, তার তাঁত চলা বন্ধ হয়। (পৃ. ৪)

৭. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন-- এ উপন্যাসে বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত নারী-পুরুষের পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার বিভিন্ন উল্লেখ লক্ষণীয়--

ক. মেনাজদ্দী মাতব্বরের উৎসাহই এ বিষয়ে সকলের চাইতে বেশী। সে ফরিদপুরের খলিফাপট্টী হইতে তাহার জন্য লাল ফোঁটা দেওয়া একটি পিরান (জামা) কিনিয়া আনিল। নিজের যে চাদরখানা এতদিন তেলে ও ঘামে সিক্ত হইয়া নানা দরবারের সাক্ষ্য হইয়া তাহার কাঁধের উপর ঘুরিয়া বিরাজ করিত, তাহা সে আজ বেশ সুন্দর করিয়া পাকাইয়া পাগড়ীর মত করিয়া আজাহেরের মাথায় পরাইয়া দিল। একজোড়া বার্নিশ জুতাও মোড়ল আজাহেরের জন্য সংগ্রহ করিল। এ সব পরিয়া নতুন "নওশা" সাজিয়া আজাহের বিবাহ করিতে রওয়ানা হইল। ... ... সদ্য কেনা বার্নিশ জুতাজোড়া পায়ে লাগাইয়া চলিতে আজাহেরের পা দুলিয়া যাইতেছিল। তবু সে জুতাজোড়া খুলিল না। এমনি নওশার সাজে, এমনই জুতা-জামা পরিয়া সে তাহার কনের বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইবে। ... আজাহের তার রঙীন গামছাখানি অর্দ্ধেকটা বুকপকেটে পুরিয়া দিল, বাকি অর্দ্ধেক কাঁধের উপর ঝুলিতে লাগিল। (পৃ. ৭-৯)

খ. শাড়ীর ফাঁক দিয়া বউ-এর মেহেদী মাখান সুন্দর পা দুটি দেখা যাইতেছিল। (পৃ. ১৮)

গ. হাতের চুড়ীগুলি টুং টুং করিয়া বাজিতেছে। (পৃ. ১৯)

ঘ. আজাহের বলে, "সামনের ভাদ্দর মাসে পাট বেইচা তোমার জন্যি পাছা পাইড়া শাড়ী কিন্যা আনব।" (পৃ. ২১)

ঙ. (আজাহের) ঘরের বেড়া হইতে একখানা কাঠের ভাঙা চিরুণী আনিয়া মাথার অবাধ্য চুলগুলির সঙ্গে কসরৎ করিতে প্রবৃত্ত হইল। (পৃ. ২১)

চ. পথে সাহাদের সুন্দর ছেলে মেয়েগুলি খেলা করিতেছে। তাহাদের প্রায় সকলের গলায়ই মোটা মোটা সোনার হার। কাহারো বাহুতে সোনার তাবিজ বাঁধা। কপালে সিঁদুর পরিয়া কাঁখে পিতলের কলসী লইয়া দলে দলে সাহা গৃহিণীরা নদীতে জল আনিতে যাইতেছে। (পৃ. ৩১)

ছ. রাঙা টুকটুকে আলতা মাখান পা দু'টি। (পৃ. ৮৩)

জ. আজাহের সেই গোট-ছড়া মেয়ের কোমর হইতে খুলিতে যাইয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। পীর সাহেবের নিকট হইতে ছেলের ভাল-ভালাইর জন্য আজাহের তাহার হাতে একটি রূপার তাবিজ কিনিয়া দিয়াছিল। (পৃ. ৮৪)

ঝ. কে বাঁশঝাড়ের আগায় উঠিয়া তাহার নাকের নথ গড়িবার জন্য বাঁশের কচি পাতা পাড়িয়া দিবে। (পৃ. ১৩৭)

ঞ. বড়ু উঠিয়া কান্দিয়া বলিল, "ও মিঞা ভাই। আমার নাকের ফুল আরায়া ফেলাইছি।" গ্রাম্য সুনারুর নিকট হইতে তাহার মা রূপার একটি নাক-ফুল তাহার জন্য গড়াইয়া দিয়াছিল। (পৃ. ১৪৯)

ট. বছিরের হাতে একখানা লাল গামছা দিয়া রহিমদ্দী বলে, "তোমার দাদী এই গামছাখানা বুনাইছে। বলে, নাতীরে দেহি না কত বচ্ছর। তারে গামছাখানা দিয়া আইস গিয়া। (পৃ. ১৫০)

রহিমদ্দীর পরিবেশিত 'ওতলা সুন্দরীর লোকগীতি'-তে উল্লেখিত হয়েছে বাঙালি সমাজে প্রচলিত নারীর সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদের বিভিন্ন অনুষঙ্গ[১০]–

প্রথমে পরিল শাড়ী নামে গঙ্গাজল,

হাতের উপর থইলে শাড়ী করে টলমল। ...

তারপরে পড়িল শাড়ী তার নাম হীত,

হাজারও দুঃখিতে পরলে তারও আইএ গীত।

এ শাড়ীও রাজকন্যার পছন্দ হইল না। সহচরীরা গুয়াফুল-শাড়ী আনিল, আসমান-তারা শাড়ী আনিল, তারপর রাশমণ্ডল, কেলিকদম্ব, জলেভাসা, মনখুশী দিলখুশী, কলমীলতা, গোলাপফুল, কোন শাড়ীই রাজকন্যার পছন্দ হয় না। তখন সব সখীতে যুক্তি করিয়া রাজকন্যাকে একখানা শাড়ী পরাইল।

তারপরে পরাইল শাড়ী তার নাম হিয়া,

সেই শাড়ী পিন্দিয়া হইছিল চল্লিশ কন্যার বিয়া। (পৃ. ১৫৯)

সওদাগরপুত্রের সঙ্গে বিয়েতে ওতলা সুন্দরীর সাজসজ্জার বিবরণ–

আনিল বেশরের ঝাপি খুলিল ঢাকনি,

ডান হস্তে তুলিয়া লইল আবের কাঙ্কনখানি।

চিরলে চিরিয়া কেশবাসে বানল খোঁপা,

খোঁপার উপর তুইল্যা দিল গন্ধরাজ চাঁপা।

সাজিয়া পরিয়া এই দিন কন্যা হৈল ক্ষীণ,

কোমরে পরিল কন্যা সুবর্ণের জিন।

তার দিল তরু দিল কোমরে পাশুলী,

গলায় তুলিয়া দিল সুবর্ণের হাসলী। (পৃ. ১৬০)

৮. লোকপ্রযুক্তি-- গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কিছু লোকপ্রযুক্তির উল্লেখ এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজে গ্রামবাসী ঐতিহ্যবাহী এ ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটায়। '২১' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য বছির ও নেহাজদ্দীন শিক্ষকের পরামর্শে রান্নার হাঁড়ির তলদেশে লেপ্টে থাকা কালির সঙ্গে লাউপাতা ঘষে লেখার উপযোগী কালি তৈরি করে। কালি দোয়াতে ভরে এর মুখে দড়ি বেঁধে তারা পাঠশালায় হাজির হয়। কলম হিসেবে খাগড়া-বন থেকে লাল রঙের খাগড়া বেছে সেটি দিয়ে তারা লেখার কাজ চালায়। লেখার আধার হিসেবে কলাপাতা কেটে নেয়া হয়। এর ওপর শিক্ষক বিভিন্ন বর্ণ লোহার শলাকা দিয়ে লিখে দিলে তারা এর ওপর হাত ঘুরিয়ে বর্ণমালা শেখায় অভ্যস্ত হয়। অন্যদিকে, গ্রামের গৃহিণীরা নিত্যদিনের রান্নাবান্নার কাজেও যে লোকপ্রযুক্তির শরণাপন্ন হয়, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে এ উপন্যাসের '২৫' পরিচ্ছেদে। রহিমদ্দী কারিগর আজাহেরের বাড়িতে বেড়াতে এলে তার স্ত্রী চালের গুড়া দিয়ে পিঠা বানায়। পিঠা বাঙালি লোকসংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী খাবার। লেখক অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে পিঠা বানানোর প্রক্রিয়ায় সন্নিহিত লোকপ্রযুক্তিকে উপস্থাপন করেছেন। আজাহেরের স্ত্রী ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল কুটে নেয়। এরপর সেগুলো কুলায় বিছিয়ে ধীরে ধীরে হাত দিয়ে দোল দিলে ভাঙা চালের গুড়া কুলার একপাশে জড় হয়, অন্যদিকে পৃথক হয়ে যায় ভাঙা চালগুলো। আজাহেরের স্ত্রী সেগুলোকে আলাদা করে গুড়োগুলো সযত্নে ধামায় নামিয়ে রাখে। এরপর চুলার ওপর গরম পানি ফুটাতে দিয়ে ধামায় রাখা গুঁড়িগুলো থেকে অল্প পরিমাণে নিয়ে দুই হাতের মুঠোয় বড় বড় গোলা বানিয়ে ফুটন্ত পানির মধ্যে ফেলতে হয়। সেগুলো আঁচে কিছুটা সিদ্ধ হলে হাঁড়ির পানির কিছুটা নামিয়ে গামলায় ঢেলে রাখতে হয়। এ পানির সঙ্গে মিশ্রিত চালের ঢেলার সঙ্গে লবণ মিশিয়েও খাওয়া যায়। এরপর আজাহেরের স্ত্রী গুড়ির ঢেলাগুলো পানি থেকে নামিয়ে দুই হাতে আটা মাখতে থাকে। এরপর আটার দলাগুলো দুই হাতে চ্যাপ্টা করে ছোট রুটির মত আকারে বেলুনে বেলা হয়। ধীরে ধীরে দলাগুলো রুটিতে পরিণত হলে আজাহেরের স্ত্রী সেগুলো চুলার গনগনে আগুনে সেঁকে নেয়। এভাবেই সম্পূর্ণ লোকজ প্রযুক্তিকে ভিত্তি করে হাতে তৈরি হয় মজাদার মুখরোচক রুটি, যা মুরগির ঝোল মাংস দিয়ে রহিমদ্দী ও পরিবারের সদস্যদের খেতে দেয় আজাহেরের স্ত্রী।

৯. লোকক্রীড়া-- এ উপন্যাসে গ্রাম্য বালক-বালিকাদের লোকক্রীড়া হিসেবে বর-কনের বিয়ে করে সংসার পাতানো খেলার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। উপন্যাসের '২৪' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মাতবর গরীবুল্লার ছেলে নেহাজউদ্দীন ও মেয়ে ফুলীর সঙ্গে আজাহেরের ছেলে বছির ও মেয়ে বড়ু রবিবার পাঠশালা বন্ধ থাকায় বিয়ে ও সংসার পাতানো বিষয়ক খেলা খেলে। বলাবাহুল্য, গ্রামীণ লোকসমাজে বর-কনের বিয়ের রীতি-নীতি, দাম্পত্য সম্পর্ককে বিভিন্ন সংলাপ ও ছড়ায় যেভাবে উপজীব্য করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে, খেলার ছলে বালক-বালিকারাও এতদ্বিষয়ক শিক্ষা পেয়ে থাকে। অবশেষে বছিরের সঙ্গে ফুলীর ও নেহাজউদ্দীনের সঙ্গে বড়ুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর ফুলী বরের বাড়ি যায় ডোলায় চেপে। নববধূ ফুলীর ক্রন্দনের কারণ বর নেহাজদ্দী জানতে চাইলে ফুলী ছড়া কেটে জবাব দেয়–

"মিঞা ভাইর বাঙেলায় খেলছি হারে খেলা সোনার গোলা লয়া নারে।

আমার যে পরাণ কান্দে সেই না গোলার লাইগারে।" (পৃ. ১৪৬)

নেহাজদ্দী জানায়, তার সাত ভাইয়ের সাত ভাবী ফুলীকে হিরার গোলা বানিয়ে দেবে খেলার জন্য। তবু ফুলী কাঁদতে থাকে নতুন বায়না জানিয়ে--

আম গাছের বাকলরে সাধুর কুমার! চন্দন গাছে ওকি লাগেরে।

তোমার মায়ের মিঠা কথারে সাধুর কুমার, নিম্বু যেমুন তিতা নারে!

আমার মায়ের মুখের কথারে সাধুর কুমার! মধু যেমন মিষ্ট নারে!" (১৪৬)

এরপর নববধূ বড়ুর ঘোমটা খসিয়ে ননদ ফুলী তাকে বেগুন কুটে দিতে বলে রান্নার জন্য। বড়ু জানায়, বেগুনে পোকা রয়েছে। ফুলী ভাইয়ের নিকট নালিশ জানায়, ভাবী বেগুন কুটতে শেখেনি। স্ত্রীর ওপর রেগে নেহাজদ্দী তাকে লঠিপেটা করতে যায়। এরপর ফুলী ভাবী বড়ুকে বলে ঘর গুছিয়ে বিছানা সাজাতে। বড়ু জানায়, ঘরের ভেতর মশা, ভনভন করে। তাই সে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায় নদীর ঘাটে গোসলের দোহাই দিয়ে। সেখানে তার সাত ভাই নৌকা বেয়ে যাওয়ার কালে সে তাদের নিকট ছড়া কেটে অভিযোগ জানায়--

ও পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক টুক করে,

গুণবতী ভাই। আমার মন কেমন করে।

হাড় হল ভাজা ভাজা মাংস হৈল দড়ি,

আয়রে কারিন্দার পানি ডুব দিয়া মরি।" (পৃ. ১৪৭)

এরপর ফুলী এ খেলা শেষ করতে চাইলে বড়ু তা উপেক্ষা করে তাকে পরামর্শ দেয় স্বামীর কাছে বিভিন্ন জিনিস উপহার চাইতে। তখন নেহাজদ্দী স্ত্রীর আবদার রক্ষার্থে ঢাকাই সিঁদুর, ঢাকাই শাড়ি, শ্যামলা গামছা প্রভৃতি এনে দেয়। এভাবেই বালক-বালিকাদের এ লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবারব্যবস্থায় প্রচলিত আচার-রীতিনীতি ও অনুশাসন, সংসারে নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা সম্পর্কে তারা ধারণা পায়, তেমনিভাবে বাল্যজীবনের এ শিক্ষা তাদের মনোলোকেও প্রভাব ফেলে।

১০. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে লোকভাষার প্রয়োগে লেখকের সহজাত দক্ষতা ও ভাষিক সচেতনতার পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কুশীলবদের উচ্চারিত সংলাপ বিনিময়ে তিনি ফরিদপুরের উপভাষার সঙ্গে সাধু গদ্যরীতির দ্বারস্থ হলেও এতে সংযুক্ত হয়েছে গ্রামীণ সমাজে, বিশেষত ফরিদপুর অঞ্চলের প্রচলিত শব্দরাশি, বাগধারা, প্রবাদ, অলংকার প্রভৃতি। কুশীলবদের সংলাপ প্রক্ষেপণে তিনি সংযুক্ত করেছেন তাদের দেহভঙ্গি এবং বিশেষ ঢঙে সংলাপ উচ্চারণের প্রবণতা। ফলে সেই চরিত্রের আবেগ সংলাপের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়, ফুটিয়ে তোলে পরিস্থিতির সাপেক্ষে তার মনোভঙ্গিকে। পাশাপাশি কোনো বিশেষ দৃশ্য বা চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতাকে পাঠকের নিকট উপস্থাপনে লেখকের বয়ানের ভাষা সাধু গদ্যের অনুসারী হলেও তা আড়ষ্ট এবং গুরুগম্ভীর নয়। কেননা, সংক্ষিপ্ত বাক্যে সহজ শব্দের সমাহারে ভাষার প্রবহমানতার গুণে বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলার সামর্থ্য জসীম উদ্‌দীনের এ লেখনীর প্রাণশক্তি। এক্ষেত্রে লোকজ শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০.১ শব্দভাণ্ডার

দেশজ শব্দ– আক্কা, বেড়া, তেনা, মাজন, গুল, মাড়, ডাল, ডোবা, গোয়াল, পাটি, কালা, ধলা, পুটুলি, খোসা, আঁটি, ঝাঁট, চুলা, বাছুর, বুলি প্রভৃতি।

ক্রিয়া– জোগাইতে, ভাসিয়া, ঠকাইয়াছে, ঢুকাইয়া, ফুটিয়া, পাকায়, মেলিয়া, লটকান, উড়াইয়া, ঢালিয়া, বাঁকাইয়া, বাজাইয়া, বুনাইছাও, কুলাইয়া, পাঠাইয়া, বেচিয়া, ছাড়াইয়া, পারাইয়া, চড়িয়া, মেলিলে, দুলিতে, ভরাইয়া, ছুলিয়া, ছড়াইয়া, শুখাইয়া, কোচকাইয়া, লটকানো, পুরিয়া, খাটিয়া, বিছাইয়া, দমিল, বাইন্ধা, লুটাইয়া, গড়াইয়া, উথলিয়া, ফাড়িয়া, বেচিয়া, কুলাইয়া, দুলিয়া, ভাসিয়া, মুছিয়া, লেপিয়া প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– শ্যাওলা>শেহলা, ভরে>ভইরা, বুনেছ>বুনাইছাও, ছেলে> ছাওয়াল, কলকে>কোলকে, ভাদ্র>ভাদ প্রভৃতি।

১০.২ বাগধারা

সবাই যদি আসিত, আজ দেখিয়া যাইত, আজাহের একেবারে কেউকেটা নয়। তাকেও লোকে খাতির করে। (পৃ. ১১)

মার কাছে মাসী-বাড়ির গল্প কইতি আইছাও? (পৃ. ২৮)

মেয়েকে আনার নাম করলে ত চোখ চড়ক গাছ। (পৃ. ৩৫)

আমার হুকুমে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। (পৃ. ৩৬)

শরৎ সাহা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। (পৃ. ৪৮)

কলিকাল হ'লেও ধরাটাকে সরা জ্ঞান করা যায় না। (পৃ. ৪৯)

তোমরা কি চোখের মাথা খেয়েছ, দেখছ না ঘরের চালে ক'খানি টিন রয়েছে (পৃ. ৭৫)

আজই ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত হইয়া যাওয়া ভাল। (পৃ. ৯৮)

শুধু মুহির কতায় কি চিড়্যা ভেজে মিঞারা? (পৃ. ১০০)

কমিরদ্দির ভিটায় আইজ ঘু ঘু চরত্যাছে। (পৃ. ১০৩)

বাবারে মারে চীৎকার করিয়া গণ্শা আকাশ-পাতাল ফাটাইতেছিল। (পৃ. ১৩৩)

গণ্শাও চৌদ্দপোয়া অবস্থা হইতে রেহাই পাইল। (পৃ. ১৩৪)

পাঠশালার মাষ্টার মহাশয়ের সেই মান্ধাতার আমলের শিক্ষা-প্রণালীর যাঁতা-কলে পড়িয়া চার-পাঁচ বৎসরেও ছেলে লেখাপড়ায় এতটুকুও অগ্রসর হইতে পারে নাই। (পৃ. ১৩৮-১৩৯)

মেনাজদ্দী মাতবর ভেদবমি হইয়া মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পর তার যা কিছু জমি-জমা সাত ভূতে দখল করিয়া লইয়াছে। (পৃ. ২৫৩)

পূর্ববাংলার গ্রামীণ লোকসমাজের প্রতি লেখকের প্রগাঢ় মমত্ববোধ ও নাড়ির টান উপন্যাসটির আদ্যন্ত ফুটে উঠেছে। বাংলার লোকসংস্কৃতির আবহমানকালের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গ্রামীণ বাসিন্দারা কীভাবে অনুসরণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করে, তা প্রকাশিত হয় তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্রিয়াকর্মে, পারস্পরিক সম্পর্কের গড়নে, ওঠাবসা ও আদান প্রদানে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসার উদার মানসিকতায়। পূর্ববাংলার লোকজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় সম্ভার উপন্যাসটির

কুশীলবদের জীবনবাস্তবতা ও চেতনালোকে তাৎপর্যবাহী আবেদন রেখেছে। কেননা, এসবের সঙ্গে মিশে আছে তাদের বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্য, অতীতের প্রতি বিমুগ্ধতা ও বাল্যের স্মৃতিকাতরতা, স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ। তবে, গ্রামীণ লোকজীবন রূপায়ণে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসবশত বাস্তববিচ্যুত হয়নি। কেননা, গ্রামীণ আবহে প্রতিপালিত লোকমানুষের সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাদের অস্তিত্বসংগ্রামের প্রসঙ্গ, যেখানে বিশেষ ভূমিকা রাখে ক্ষমতাধর মাতবর, সুদখোর মহাজন, স্বার্থসর্বস্ব মৌলবি ও তার অনুসারীরা। এদের দাপটে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, যা বাঙালি লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। গ্রামকেন্দ্রিক যূথবদ্ধতা ও সমষ্টিমানুষের সংহতি, একের প্রতি অন্যের সহানুভূতি ও ঔদার্য তাদেরকে যে আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে, এর মানবিক আবেদনের ভাষ্যদানে লেখকের অনায়াস দক্ষতা পাঠকের নিকট অকপটে বিধৃত হয়। পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের অনুপুঙ্খ চালচিত্র বয়ানে জসীম উদ্‌দীনের আন্তরিক প্রচেষ্টার অনন্য শিল্পরূপ †evev Kwnbx।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুমায়ুন কবির

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) ছিলেন বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতি অর্জনের অসামান্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন আজীবন কর্মসাধনায় নিমগ্ন থেকে। শওকত ওসমান তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, 'হুমায়ুন কবির একাধারে ছিলেন অধ্যাপক, কবি, দার্শনিক, সমালোচক, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক– অনেকান্ত প্রতিভার অধিকারী।'[১১] এর সঙ্গে অবলীলায় যুক্ত হতে পারে সম্পাদক, অনুবাদক, নাট্যকার ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর অদম্য কর্মতৎপরতা,[১২] যা সমকালে শুধু নয়, বর্তমানেও সমগ্র সর্বভারতীয় পরিমণ্ডলে বিরল দৃষ্টান্ত। কবিতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যভুবনে যাত্রা শুরু হলেও প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসেবেই তাঁর মনস্বিতার দ্যুতি সবচেয়ে বেশি বিচ্ছুরিত হয়েছে। স্বনামে এবং ভিন্ননামে ত্রিশের দশকে কিছু ছোটগল্প লিখলেও, এমনকি পরবর্তীকালে বিদেশী গল্প অনুবাদ করলেও উপন্যাসের প্রতি তাঁর আগ্রহ যে অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, তা বোঝা যায় একটিমাত্র উপন্যাসই ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় রচনায়। শুধু তাই নয়, বিদেশী উপন্যাস অনুবাদের মধ্য দিয়েও এর প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশিত।[১৩] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের ব্যাপ্তিতে মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোজাম্মেল হক, শেখ মোহাম্মদ ইদরিশ আলী, কাজী ইমদাদুল হক, প্রমুখ বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিকরা স্বীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ-মঙ্গল প্রত্যাশায় যে ভাবধারা ও আদর্শকে নেপথ্যে রেখে উপন্যাস লিখে পাঠকসমাজে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি পেয়েছিলেন, হুমায়ুন কবির সেই ধারাতে নিঃসন্দেহে নতুনত্ব সংযোজন করেছেন।[১৪] এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র অন্যতম কর্মোদ্যক্তা কাজী আবদুল ওদুদ, যিনি নিজ সম্প্রদায়ের ভাবলোকের উন্নয়নসাধনের বিশেষ আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ভাবনাকে এড়িয়ে পূর্ব-বাংলার আটপৌরে দরিদ্র মুসলমান কৃষকজীবনকে ভিত্তি করে b'xe‡ÿ (১৯১৮) উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রগতিশীল চিন্তায় আলোকিত, রেনেসাঁসের ভাবনায় উদ্দীপিত, দেশীয়-আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বনামধন্য হুমায়ুন কবির স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদের দ্বারা সম্ভবত প্রভাবিত হয়েছিলেন। উভয় উপন্যাসের আধার ও আধেয় যাচাই করলে এমন ধারণা পোষণ যৌক্তিক বিবেচিত হতে পারে। তবে হুমায়ুন কবিরের b'x I bvix (১৯৫২) উপন্যাসে আধুনিককালের শিল্প-সাহিত্যভাবনার আলোকে গ্রামীণ লোকসমাজভুক্ত ব্যক্তিমানুষের দোষ-গুণ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনুতাপ, ঈর্ষা, ঔদার্য ও ভালোবাসাস্নাত মানবস্বভাবের সার্বিক পরিচয় সচেতনভাবে বাঙ্ময় রূপে উন্নীত।

b‘x I bvix

নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় হুমায়ুন কবিরের b‘x I bvix-i (১৯৫২)[১৫] বিশিষ্ট অবস্থান রয়েছে। পূর্বসূরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) cÙvb‘xi gvwS-র (১৯৩৬) কথা স্মরণে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা চলে, এ উপন্যাসে লেখক পূর্ব-পাকিস্তানের সহায়সম্বলহীন প্রান্তিক ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের জীবনধারা সময়ের প্রবহমানতায় কীভাবে বিবর্তিত হয়, এর শিল্পভাষ্য নির্মাণে পদ্মা নদীকে কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে অবলম্বন করেছেন। পদ্মাতীরবর্তী এ লোকগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও বহমান সংস্কৃতির চিত্রায়ণে লেখকের আন্তরিক আগ্রহ ও শিল্পানুধ্যান উপন্যাসটির আদ্যন্ত নিপুণ ভাষাবয়ব পেয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত এ মানুষগুলোর জীবনযাত্রা, জীবিকা ও সামাজিক পরিচয় তাদের প্রাত্যহিক বিশ্বাস-আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাদের জন্ম থেকে মৃত্যুর অনির্দেশ্য কালচক্রে প্রকৃতির ভূমিকা নিয়তির মতোই অদৃশ্য অথচ অলঙ্ঘনীয়। ক্ষুধা মেটাতে ভূমি ও নদীকেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহ, প্রাচীন ধরনের উৎপাদন কাঠামো তথা কৃষিকাজ ও শিকারকে অবলম্বন, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রতি পক্ষপাত এবং সামাজিক রীতিনীতির ভিত্তিতে একক অখণ্ড সত্তার মতোই গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এ উপন্যাসভুক্ত কুশীলবদের মনোভঙ্গিতে আদিম অরণ্যাচারী লোকসমাজের স্মৃতিকেই নেপথ্যে বহন করে চলে। প্রকৃতির ওপর তাদের নির্ভরতা এতটাই প্রত্যক্ষ যে, এর ভাঙা-গড়ার খেলায় আকস্মিকভাবে বদলে যায় পদ্মাপারের রহিমপুর ও বিয়ানচরের লোকগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ।[১৬] সহজ-সরল, অল্পেই তুষ্ট, শিক্ষাবঞ্চিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো সমুদয় প্রতিকূল পরিস্থিতিকে দৈব, নিয়তি বা বিধির বিধান হিসেবে অকপটে মেনে নিলেও দিনযাপনের ক্ষেত্রে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অনমনীয় তেজ তাদের বলিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক। অস্তিত্বরক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিয়জন, বসতবাড়ি, সহায়সম্বল হারিয়ে কপর্দকশূন্য হলেও তারা পুনরায় সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এগিয়ে চলে জীবনের অনিঃশেষ গন্তব্যের পানে। বহুকাল ধরে বহমান স্রোতস্বতী পদ্মার বাঁক পরিবর্তন, ঋতুর পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ এবং খামখেয়ালীপনা এ জনগোষ্ঠীর অলিখিত ইতিহাসে রেখে যায় ভাঙন ও সৃষ্টির নিজস্ব স্বাক্ষর। তাই তাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনের বিবিধ ক্রিয়াকর্মে, পারস্পরিক আলাপ, আড্ডা ও চালচলনে, আচার-উৎসবে, পালা-পার্বণে, মূল্যবোধ-অনুশাসনে অর্থাৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পদ্মার অমোঘ উপস্থিতি অনস্বীকার্য। আদিম অরণ্যময় প্রকৃতি ও মহাকালের ব্যাপ্তিতে মানবজীবনের ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা নির্দেশের অন্তর্তাগিদ পদ্মা-তীরবর্তী রহিমপুর ও এর সংলগ্ন বিয়ানচরের লোকজীবনের শৈল্পিক উপস্থাপনায়[১৭] লেখককে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ উপন্যাসের বিশেষ প্রবণতা হলো বিভিন্ন লোকজ উপাদানের ব্যবহার।

১. লোকসংস্কার–– এ উপন্যাসে বিধৃত পদ্মাতীরবর্তী রহিমপুর গ্রামের বাসিন্দাদের চেতনালোকে বিভিন্ন ধরনের লোকসংস্কার প্রচলিত, যা গ্রামবাসীর প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। প্রকৃতিনির্ভর জীবিকা নির্বাহের বাধ্যবাধকতা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের উদ্ধুদ্ধ করে এসব লোকসংস্কার মেনে চলতে। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে, সাংস্কৃতিক আয়োজনে, এমনকি জীবনসংগ্রামের যে কোনো সংকটকালে তারা পূর্বপুরুষদের অনুসৃত এসব সংস্কার-রীতিনীতির শরণাপন্ন হয়।

১.১. পীর-ফকির সংক্রান্ত লোকসংস্কার–– পীর-দরবেশ ও ফকিরের প্রতি নির্ভরতা লোকসমাজে লক্ষণীয়। তারা অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, ইচ্ছা করলেই যে কোনো সমস্যার সমাধানে সমর্থ; কারো অনিষ্ট চাইলে তাদের বরদোয়া বা অভিশাপে সবকিছু তছনচ হয়ে যেতে পারে, এমন ধারণা সংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসে গড়ে উঠেছে বহুকাল ধরে। এ উপন্যাসের ‘নজুমিয়া’ অংশের ‘তিন’ পরিচ্ছেদে আবির্ভাব ঘটে নামহীন এক ফকিরের। ধুলদির হাটে তার আসার খবর জানা যায় নজুমিয়ার অনুচর রমজানের মাধ্যমে। তার ধারণা, সেই ফকির ‘কামেল ফকির’। তবে নজুমিয়া ফকিরের কেরামতি বা শক্তিতে আস্থাহীন বলেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে অনাগ্রহী। রমজান

নজুমিয়াকে সতর্ক করে ফকিরের প্রতি তাচ্ছিল্যকর মনোভঙ্গির ব্যাপারে –'অলিআল্লা দরবেশ– আমাদের মনের কথা জানে। তার নাম নিয়ে হাসি ঠাট্টা কোরো না। ... ফকির দরবেশ কী না পারে? জানো সে তোমার কথা সব জানে[১৮] (পৃ. ৪১)। রমজান জানায়, ফকির নজুমিয়ার খোঁজ করছিল এবং তাকে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছে। তার ধারণা, ফকিরের দোয়া পেলে নজুমিয়ার সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ক্ষেতের ধান কাটার মজুর পেতে দেরি হবে না। অধিক মজুরির প্রলোভনে মজুরেরা নজুমিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানপূর্বক তার কাছে ফিরে এলে রমজান এ ঘটনাকেও ফকিরের কেরামতি হিসেবে বিবেচনা করে। নজুমিয়া তাকে স্পষ্টভাবেই জানায়, আসগরের স্বল্পদরের মজুরির কারণেই ক্ষেতমজুরেরা তার প্রস্তাব নাকচ করেছে, এখানে ফকিরের কেরামতি অচল। একথা শুনে রমজানের অভিমত 'কামেল দরবেশ যেমন ভালও করতে পারে ওনারা বেজার হলে তেমনি বেহদ লোকসানও করতে পারে। ... ওনাদের কথা বলা যায় না। কখনো হাজার গুনা মাফ করে দেন, আবার কখনো একটা কথার তর সয় না' (পৃ. ৪০)। রমজানের বিবরণে প্রকাশিত হয়েছে ধুলদির হাটে ফকিরের আগমনের চালচিত্র। হাটের পূর্বকোণের প্রাচীন বটগাছের নিচে ঝোপের পাশে সে আস্তানা গেড়ে বসে। তার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, 'মাথায় সবুজ পাগড়ি, হাতে তসবীহ, মুখে সাদা ধবধবে দাড়ি, চেহারায় শান্ত ভাব। দেখলেই ভক্তি আসে' (পৃ. ৪২)। ধ্যানস্থ অবস্থায় তাকে ডাকতে কৌতূহলী মানুষের সাহস না হলেও একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ মতির মা একপর্যায়ে তার সঙ্গে আলাপে উদ্যোগী হয়। ফকির তার সঙ্গে কথোপকথনের শুরুতেই চোখ মেলে মতির মায়ের কাছে জানতে চায়, সে তার হারানো ছেলের খোঁজ জানতে ব্যগ্র কি না। এ ঘটনায় 'ভিড়ের মধ্যে যেন একটা চমক খেলে গেল– ফকির বিদেশি, কেউ তাকে আগে কোনদিন দেখেনি। সে কী করে জানল যে ছেলে হারিয়ে মতির মা পাগলাটে হয়ে গেছে' (পৃ. ৪২)। মতির মা তার পা জড়িয়ে ছেলের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে ফকির পুনরায় ধ্যানে বসে। কিছুক্ষণ পর 'হঠাৎ বিকট শব্দে সোবহান আল্লা বলে ফকির চোখ মেলে চাইল। শূন্য দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মতির মা'র উপর চোখ পড়তেই বলল, তুমি তোমার ছেলের কথা জানতে চাইলে? সে ভাল আছে এবং শিগ্‌গিরই বউ নিয়ে দেশে ফিরবে' (পৃ. ৪৩)। মতির মা বারবার ছেলের হালহকিয়ত জানতে চাইলে তাকে নিবৃত্ত করতে সে কৌশল গ্রহণ করে– 'আল্লাতালার দয়া হলে মাঝে মাঝে পরদা খুলে যায়, আগামীকালের দু-একটা ছবি দেখতে পারি। বেশি যারা ভবিষ্যত নিয়ে টানা হেঁচড়া করে আল্লাতালা তাদের শাস্তি দেন।' এরপর সে এ গ্রামে আশ্রয় গড়ার আগ্রহে জানায়, পীরের হুকুমে তাকে ধুলদিতে থাকতে হবে। সমাগত মানুষের মধ্যে রোগা লিকলিকে ছোটখাট বৃদ্ধ হামদু মিয়া, যে তার ছয় ছেলে ও স্ত্রীকে হারিয়ে এখন নিঃস্ব, নিজের দুঃখের বৃত্তান্ত জানিয়ে এ অভিমত প্রকাশ করে, 'ফকির যদি তাকে দয়া করে, ভাল দাওয়াই দেয়, তবে আবার ছেলেপুলে হলে ঘরের জৌলুস ফিরবে' (পৃ. ৪৩)। ফকির তাকে জানায়, তার কাছে 'বুড়োকে জওয়ান করবার দাওয়াই অবশ্যই আছে ... কিন্তু তার জন্য অনেক খরচ লাগে' (পৃ. ৪৪)। হামদু মিয়া সেই শর্তে অবলীলায় রাজি হলে উৎসুক জনতার মধ্যে তাকে নিয়ে আগ্রহ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে তারা বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার চেয়ে তাকে ঘিরে ধরে। গ্রামের তরুণেরা ফকিরের প্রতি অনাগ্রহী হলেও নারীরা এবং বৃদ্ধরা বিভিন্ন প্রয়োজনে তার দ্বারস্থ হয়। 'কেউ চায় তাবিজ, সোয়ামির মন ফেরাবে। কেউ চায় ছেলে হোক, কেউ চায় ভূত পেত্নির দৃষ্টি না লাগে' (পৃ. ৪৪)। ফলে ফকিরও সুযোগ বুঝে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে সে বিশেষ কৌশলের আশ্রয় নেয়। যেহেতু গ্রামের আপাতসরল মানুষেরা ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী, তাই একেই হাতিয়ার করে সে অর্থোপার্জনের বন্দোবস্ত করে। স্রষ্টার প্রতি ইমান রেখে গ্রামবাসীর সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সে অজুহাত সৃষ্টি করে। ফকিরের নির্দেশ মানা সত্ত্বেও যদি কারো সমস্যার সমাধান না হয়, সেক্ষেত্রে এর দায় এড়াবার জন্যই সে এভাবে প্রতারণার শরণাপন্ন হয়। 'ফকির চালাক লোক, তাবিজ দিক আর দাওয়াই দিক, সবাইকে বলে, এ সব ইমানের কথা। ভক্তি থাকে তো ফল হবে আর ভক্তি না থাকলে ফল হবে না' (পৃ. ৪৪)। ইদ্রিস ফকিরের দৈবী শক্তিতে আস্থাশীল। তার ধারণা–– 'ফকির দরবেশের কাছে নানা রকমের দাওয়াই থাকে। তারা ঝাড়ফুঁক করেও অনেক অসুখ ছাড়িয়ে দেয়' (পৃ. ৪৫)। রমজান ও ইদ্রিসের কথায় প্রভাবিত হয়ে যুক্তিবাদী নজুমিয়াও শেষ পর্যন্ত তার মা আয়েষার বাতের ব্যথার ওষুধ নিতে ফকিরের দ্বারস্থ হবার কথা ভাবে। ফকিরের

প্রতি সন্দিহান নজুমিয়ার সংশয় কেটে যায়, সে তাকে দেখেই 'পঞ্চায়েত' সম্বোধন করায়। এ পর্যায়ে তার ধারণা জাগে 'যে নিজে খাঁটি, সে-ই সাচ্চা মানুষের কদর জানে। হাটভরা এত লোক, আসগর মিয়া ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কই তাদের কাউকে তো ডাকে নি ফকির– ডেকেছে নজুমিয়াকে' (পৃ. ৪৬)। সে তাকে 'বাবা' সম্বোধন করে দোয়া ও দয়া প্রার্থনা করে এবং জানায় 'দোওয়া কর বালবাচ্চা নিয়ে যেন সুখে থাকি, মানইজ্জত বাঁচিয়ে জীবন কাটে, মরবার সময় শান্তিতে যেন চোখ বুঁজি' (পৃ. ৪৬)। ফকির তাকে শান্ত হবার পরামর্শ দেয় এবং জানায়, সে যতদিন তার অস্থিরতার প্রতিকার করতে না পারবে, ততদিন তার শান্তিলাভ ঘটবে না। ফকিরের বিশেষ কৌশল হলো, লোকসমাজে ধর্ম ও স্রষ্টার প্রতি মানুষের আবেগ ও বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে ভক্তদের সমর্থন আদায় করা। তাই সে কখনো বলে 'মঙ্গল অমঙ্গল কাকে বল? সবই খোদার ইচ্ছা' (পৃ. ৪৬)। নজুমিয়া তার মায়ের বাতের ব্যথার প্রতিকারের জন্য তাবিজ চাইলে সে তাকে অপেক্ষায় রাখে নামাজ পড়ার দোহাই দিয়ে। সে ফকিরকে তোয়াক্কা না করেই আস্তানার ভেতর ঢুকে যায় এবং তার পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী ভক্তরা নজুমিয়াকে বিদায় নিতে বলে। ঠিক এ পরিস্থিতিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগর ফকিরের নিকট এলে নজুমিয়া ধারণা করে, সে হয়ত তুকতাকের জন্য এসেছে। তাই একপর্যায়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ফকিরকে অপমান করলে সে চোখ বন্ধ করে দুহাত তুলে উৎসুক জনতাকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে, একপর্যায়ে তা নজুমিয়ার জীবনে ফলে যায়। পদ্মা নদীতে ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণের ইঙ্গিত ফকিরের ভাবোন্মত্ত সংলাপে যেভাবে প্রকাশিত হয়, তাতে তার প্রতি জনতার কৌতূহল আরো বাড়ে। এভাবেই সে ধুলদির হাটের বাসিন্দাদের নিকট ফকির হিসেবে সমীহ আদায় করে। অচিরেই এ ঘটনা সম্পর্কে আয়েষা অবগত হয় এবং নজুমিয়ার সঙ্গে আলাপকালে জানায় 'ফকির মানুষ, তাদের বরদোওয়ায় লোকসান করে' (পৃ. ৫২)। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত আয়েষা নজুমিয়াকে আদেশ দেয় পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চর দখলের আগে ফকিরকে সন্তুষ্ট করার জন্য। অবশেষে নজুমিয়া সেবারের নৌযাত্রা থেকে ফিরে এসে ফকিরের সৌজন্যে গ্রামে মিলাদের আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেয়। সে নতুন চরের বন্দোবস্ত শেষ করে গ্রামে ফিরতেই আয়েষার অনুরোধে তাকে মিলাদ মাহফিলের আয়োজনে উদ্যোগী হতে হয়। দিনে দিনে ফকিরের অবস্থান যে ধুলদির হাটে দৃঢ় হচ্ছে, নজুমিয়া তা উপলব্ধি করে। সে হাটের পাশেই চালাঘর তুলে মাদ্রাসা স্থাপন করে, গ্রামের কিশোরদের কোরআন মুখস্ত করায়। নজুমিয়া ফকিরের কাছে নিজের রুঢ় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং রহিমপুর গ্রামে মিলাদ পড়ানোর অনুরোধ করে। ফকির যথেষ্ট কৌশলী বলেই এ প্রস্তাবে যেচে রাজি না হয়ে জানায় 'এখানকার বাসিন্দারা রাজি হলে হয়। দু-দশ ঘর মুরিদ আছে, সাকরেদ তালিবেইলেম আছে, তাদের ফেলে যাব কী করে? ... তুমি যদি জোর কর, তবে আমাকে যেতেই হবে' (পৃ. ৫৮-৫৯)। এরপর সে তার সুবিধা অনুযায়ী মিলাদের তারিখ নির্ধারণ করে। ফকির যে পোশাকে সজ্জিত হয়ে মিলাদে উপস্থিত হয়, তা থেকে বোঝা যায়, তার বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। বড় ঘাসি নৌকায় অনুচরদের নিয়ে সে ধুলদির হাট থেকে রহিমপুর গ্রামে আসে। আরবি-ফারসি ভাষায় সে যেভাবে ওয়াজ করে, গ্রামবাসী তা বুঝতে অসমর্থ বলেই তার প্রতি তাদের ভক্তি আরো বেড়ে যায়। মিলাদ পড়ানো শেষে তার কাছে বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত গ্রামবাসী এলে সে যথাসাধ্য প্রতিকারের পরামর্শ দেয়। মিষ্টি কথা ও ভদ্র আচরণের মাধ্যমে তাদের আয়ত্তে আনতে সে বেশ পটু। আয়েষা নাতি মালেককে নিয়ে তার নিকট হাজির হয়, ফকিরের দোয়া পাওয়ার আশায়। এরপর ইব্রাহিম তার মৃগীরোগে আক্রান্ত মেয়েকে চিকিৎসার জন্য ফকিরের সামনে আনলে সে একে 'জ্বিনে ধরা' হিসেবে ঘোষণা করে। এর প্রতিকার হিসেবে সে সেই তরুণীর ওপর যেভাবে শারীরিক নিপীড়ন চালায়, তাকে কোনোভাবেই চিকিৎসা বলা চলে না। তবু অজমূর্খ গ্রামবাসী এ ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফকির এ সমস্যার স্থায়ী প্রতিকার হিসেবে মেয়েটির বিয়ে দিতে তার বাপকে পরামর্শ দেয়। এর ফলে 'সকলে অবাক হয়ে ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইল, তাদের ভক্তি আরো বেড়ে গেল' (পৃ. ৬৩)। এভাবেই এ উপন্যাসে ফকিরের প্রতি গ্রামবাসীর অসীম বিশ্বাস, নির্ভরতা ও আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

১.২ মানত করা ও বদর পীরের নাম নেয়া-- নদী, সাগরে, জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়ে কুমির, হাঙর বা অন্য কোনো জলজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হলে, এমনকি জলপথে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাত্রাকালে বৈরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে লোকসমাজে, বিশেষত জেলেদের মধ্যে বিশেষ কিছু অনুশাসন প্রচলিত। যেমন– পাঁচ পীরের নাম স্মরণ করা, তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করার প্রতীকার্থে নৌকায় সিঁদূরের রেখা লেপন, বিপদ থেকে মুক্তি পেতে তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা, মিলাদ পড়ানো প্রভৃতি। তবে এসব সংস্কার মোটাদাগে অধিকাংশ গ্রামীণ লোকসমাজে অনুসৃত। এ উপন্যাসের বিভিন্ন দৃশ্যে অনুরূপ বিবরণ লক্ষণীয়--

ক. মালেক তার কথায় কান দিল না। আপন মনে বলে চলল, বাবা বলে যে জেলেরা সব জোয়ানমরদ। সাঁতরে পদ্মা পার হয়ে যেতে পারে, আর নৌকো ভাসাবার আগে কী যেন সব মানত করে নামে!' (পৃ. ২৪)

খ. ততক্ষণে নৌকোর সাজ তৈরি হয়ে গেছে। সে বছরই নজুমিয়া একখানি বড় ডিঙি তৈরি করেছিল ... খালি গলুইয়ের কাছে সিন্দূরের পাঁচটি রেখা, পাঁচ পীরের মানত। (পৃ. ২৭)

গ. গাঁয়ের সবচেয়ে পাকা মাঝি বসির ধরল হাল। বদর বদর করে নৌকো নদীতে নামাল, মাঝি মাল্লা সবাই চেঁচিয়ে উঠল বদর বদর। ডাঙ্গার লোকেরাও যোগ দিল, সকলের গলা ছাপিয়ে মালেকের সরু গলার আওয়াজ। (পৃ. ২৭-২৮)

ঘ. নদীর জলে প্রচণ্ড তুফান তুলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুমির ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তখন সকলে মিলে ধীরে ধীরে মরা কুমীরসুদ্ধ জাল টেনে তুলল।

মাঝিরা চেঁচিয়ে উঠল– বদর বদর। পাড় থেকে সবাই সাড়া দিল–বদর বদর। ...

আয়েষা এগিয়ে এল, বলল,– খোদার শোকর সবাই ভালয় ভালয় ফিরে এসেছ। সিরনি পাঠিয়ে দাও মসজিদে, আর একদিন মৌলুদ শরীফের বন্দোবস্ত কর। মনে থাকে যেন এ আমার দাদুর শিকার– দাদুর ধরা প্রথম কুমির। (পৃ. ২৯)

ঙ. মাঝ দরিয়ার তীব্র স্রোতে নৌকার মুখ ঘুরে গেল। জলের মৃদু কল্লোলের বদলে এখন স্রোতের হিংস্র তীক্ষ্ম ডাক। সবাই একসঙ্গে বদর বদর বলে চেঁচিয়ে উঠল। (পৃ. ৬৭)

চ. বিরাট নদী, অসীম আকাশ আর প্রচণ্ড বাতাস–তারই মধ্যে ছোট নৌকায় কয়েকটি প্রাণী। প্রাণপণে তারা ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লাগল কিন্তু তাদের মুখের 'বদর বদর' ডাক নদীর গর্জনে চাপা পড়ে গেল। (পৃ. ৬৯)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহে লক্ষণীয়, 'ক' থেকে 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'নজুমিয়া'-র অন্তর্গত 'এক' পরিচ্ছেদ থেকে। নজুমিয়ার বালকপুত্র মালেকের কুমির শিকারের দৃশ্য রূপায়ণে কুশীলবদের যে সামষ্টিক অংশগ্রহণ, এতে পূর্বোক্ত লোকসংস্কারসমূহের প্রতিফলন ঘটেছে। জলে নামার আগে জেলেদের পাঁচ পীরের নামে মানত করা, ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও তাদের স্মরণে সনাতনী পূজার উপকরণ বা সিঁদূরের রেখা দিয়ে নজুমিয়ার নৌকার গলুইয়ের কাছে রেখা আঁকা লোকসংস্কারের প্রভাবগত। বলাবাহুল্য, লোকসমাজে এ ধরনের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান নিতান্তই স্বাভাবিক। পাশাপাশি জলপথে কর্মসম্পাদনকালে বিপদে পড়লে 'বদর' পীরের নাম স্মরণ এবং মসজিদে শিরনি মানত করা প্রভৃতিও লোকসংস্কারের অন্তর্গত। 'ঙ' এবং 'চ' সংখ্যক উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডভুক্ত 'আট' পরিচ্ছেদ থেকে, যেখানে নজুমিয়া পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চর দখলের বন্দোবস্তের জন্য এক বর্ষণমুখর দুপুরে উত্তাল, বিক্ষুব্ধ নদীর বুকে সঙ্গীদের নিয়ে পাড়ি জমাতে বিপদের সম্মুখীন হয়। 'বদর' পীরের নাম স্মরণ করে আসন্ন সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য এ লোকসংস্কারকে অনুসরণ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মনোভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ।

১.৩ তুকতাক, জাদু-টোনা করা–– স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে বশীকরণের বিভিন্ন উপায় হিসেবে তুকতাক ও জাদু-টোনার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আয়ত্তে রাখার ধারণা বাঙালি লোকসমাজে দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত। b'x I bvix উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র আসগর ও নজুমিয়ার বাল্যকালীন বন্ধুত্ব একপর্যায়ে ঘোর শত্রুতায় উপনীত হয়, আমিনাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার প্রচেষ্টায়। আমিনা ও আসগর পরস্পরকে ভালোবাসলেও নজুমিয়া বৈষয়িক উন্নতির কারণে আমিনার মাকে কৌশলে বশীভূত করে। বিয়ের পর একপর্যায়ে অহেতুক সন্দেহবশত নজুমিয়া আমিনাকে তালাক দিলে আসগর তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র উপন্যাসে একাধিকবার আসগর ও নজুমিয়ার কথোপকথনে জাদু, তুকতাক প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন ধুলদির হাটে আগত জনৈক ফকিরের নিকট নজুমিয়া যখন তার মা আয়েষার বাতের ব্যথার প্রতিকারার্থে তাবিজ নিতে গিয়ে আলাপ করছিল, তখন সেখানে আকস্মিকভাবে আসগর উপস্থিত হয়। আসগরের ধারণা, নজুমিয়া হয়ত তার ক্ষতিসাধনের জন্য ফকিরকে দিয়ে তুকতাক করাতে সেখানে এসেছে। কারণ ইতঃপূর্বে সে তাকে কয়েকবার অপদস্থ করেছে। এরই পরিণতিতে তাদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপ নেয়। এরপর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়, যখন ফকির আসগরকে সমাদর করে এবং নজুমিয়া সেখান থেকে চলে না যাওয়ায় বিস্মিত হয়। এ পর্যায়ে নজুমিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে ধারণা করে, আসগর ফকিরকে দিয়ে তুকতাক করাতে চায় তার ক্ষতি সাধনের জন্য। তেমনিভাবে নজুমিয়া যখন অর্থ ও জমির প্রলোভন দেখিয়ে আমিনার মাকে প্রলুব্ধ করে, বিষয়টি জানতে পেরে আসগর ক্ষুব্ধ হয়। বারবার অনুনয় সত্ত্বেও নজুমিয়া আমিনাকে আয়ত্তের চেষ্টা করায় একপর্যায়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে জানায় 'তুমি তাকে জাদু করেছ, গুণ করেছ' (পৃ. ১৮৬)। সমগ্র ঘটনা যাচাই করলে বৈষয়িকভাবে সমৃদ্ধ নজুমিয়ার কাছেই মেয়েকে সমর্পণের জন্য আমিনার মায়ের আগ্রহ প্রকাশিত হয় তার ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা ভেবে। তবু, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত আসগরের মনোভঙ্গিতে গুণ, জাদু, তুকতাক সংক্রান্ত লোকসংস্কারই অধিক প্রভাব ফেলে। এরূপ সংস্কার গ্রামীণ নারীসমাজে বহুল প্রচলিত। বাল্যকাল থেকেই অনাথ মালেককে প্রতিপালনকারী দাসী কুলসুম অনিচ্ছাসত্ত্বেও নুরুর মা আমিনার তত্ত্বাবধানে আজিজকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এ পর্যায়ে সে এরূপ ধারণা পোষণ করে, কুলসুম যেন মালেককে দেখাশোনা করনার সুযোগ না পায়, সেজন্যই নুরুর মা তাকে নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে এ বিয়ের আয়োজন করেছে। মালেকের প্রতি কুলসুমের মমতা ও বাৎসল্য এতটাই প্রবল যে, সে তাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী। অথচ তার মতো একজন উঠতিবয়সী বিধবা নারীর পক্ষে যে আজীবন পরপুরুষের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ ধর্মীয়-সামাজিক বিধির পরিপন্থী, সে এ বিষয়টি মানতে অসম্মত। সেকারণেই নুরুর মায়ের প্রতি তার বিতৃষ্ণ মনোভঙ্গিতে রূপকথার খলনারীর (ডাইনি) আবহ উপস্থিত––

> এবার কুলসুম ফেটে পড়ল। তার মনের যত গোপন দুঃখ বেরিয়ে এল, জলভরা চোখে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব কথা আমার জানা আছে। বাচ্চাখেকো ডাইনি ও। মালেককে গুণ করেছে, তা না হলে যে মালেক একদণ্ড আমার কাছ ছাড়া থাকত না, সে-ই কিনা একবারটি আমার কাছে আসে না? আর আসতেও দেয় না ও! মালেক ঘরে এলেই আমাকে দূরে সরাবার জন্য যত ফাই-ফরমাস করবে তখুনি! যেন আমি আকাট বোকা, ওর চালাকি বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। নিশ্চয়ই ও মাগি ডাইনি, ওষুধ করেছে মালেককে। (পৃ. ১১৬)

১.৪ অভিশাপ দেয়া–– লোকসমাজে বহুল প্রচলিত লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এ উপন্যাসে অভিশাপ-সংক্রান্ত একাধিক দৃষ্টান্ত বিবৃত হয়েছে। সাধারণত, কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হলে বা বিপদ ঘটলে, এমনকি সে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বা সেরূপ আশঙ্কা থাকলে যে ব্যক্তির কারণে এমনটি ঘটে বা ঘটতে পারে, তার প্রতি অভিশাপ বা বরদোয়া উচ্চারিত হয়। এর পরিণতিতে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান না ঘটলেও সে একধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পায়, দুস্কৃতিকারীর দণ্ডবিধানের প্রচেষ্টায়। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসমূহ নিচে উল্লেখিত হলো––

> ক. হঠাৎ চোখ মেলে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ফকির, এখনো তোমরা এখানে? সরে যাও, সবাই সরে যাও–এখান থেকে সরে যাও। হায় বেওকুফ নজু, দোস্তকে দুশমন বানালি আর এখন জীবনের শেষ পাড়ি দেওয়ার সময়

আবার নতুন ঝগড়া ফ্যাসাদ! ঈশান কোণে ঝড়ের রেখা, নদীর জল দুলছে, তুফানে নৌকো মাতালের মতন টলছে, বাজপাখির মতন অন্ধকার মেঘের ছোঁ–সে বিপদের দিনে কে তোমাকে বাঁচাবে? যাও যাও, সব ঝুট, দু'দিনের দুনিয়া, দু'দিনের জিন্দেগি, আর তাই নিয়ে এত ঝগড়া ফ্যাসাদ। এত কাজিয়া। (পৃ. ৪৯)

খ. নজুমিয়া বলল ... কোথাকার এক ভণ্ড উজবগ এসে হাটে আড্ডা গেড়েছে, আর দেশসুদ্ধ লোক ফকির ফকির করে পাগল। (আয়েষা বলল)... আসল হোক আর মেকি হোক, ফকিরের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কেন? ... ফকির মানুষ, তাদের বরদোওয়ায় লোকসান ফলে। ..., খোদা জানে কার মধ্যে কি আছে, কিন্তু ফকির যখন তোমাকে নদীর ঝড়ের কথা বলেছে, তখন ফকিরকে খুশি না করা পর্যন্ত তোমার আর পদ্মা পাড়ি দিতে হবে না। এমনিতেই রাক্ষসী পদ্মা কত জনের সর্বনাশ করেছে, আর তাতে ফকিরের বরদোওয়া। (পৃ. ৫২-৫৩)

গ. ধুলদির হাটে ফকিরের সঙ্গে নজুমিয়ার ঝগড়া হয়েছিল। ফকির বরদোওয়া করেছিল। আজ হঠাৎ আয়েষার সেই শাপের কথা মনে পড়ে গেল। সারা মন দুঃখে বেদনায় ভরে উঠল। ... বুজরুকের সব স্তোকবাক্য মিথ্যা হয়ে গেল, কিন্তু তার বরদোওয়া ফলে গেল। (পৃ. ৭৪)

এ উপন্যাসে অভিশাপ বা বরদোওয়ার মাধ্যমে কারো অনিষ্টসাধন সংক্রান্ত লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় নজুমিয়ার মৃত্যুর ঘটনায়। বাল্যবন্ধু আসগরের সঙ্গে নজুমিয়ার সম্পর্ক শত্রুতায় রূপান্তরিত হয় আমিনাকে বিয়ে করায়। এক্ষেত্রে নজুমিয়ার প্রতারণা ও শঠকৌশলই মূল ভূমিকা পালন করে। তাই বহু বছর পর বৃদ্ধাবস্থায় একদিন ধুলদির হাটে আসগর জনৈক ফকিরের সঙ্গে যোগসাজশ ঘটিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে তুকতাক করছে, এরূপ অহেতুক সন্দেহবশত নজুমিয়া জনসম্মুখে তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে। এরই পরিণতিতে ফকির বরদোওয়ার ছলেই নজুমিয়ার জীবনের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে অশুভ ইঙ্গিত দেয়। 'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সেই বৃত্তান্ত নির্দেশিত। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি এ ঘটনারই সম্প্রসারিত রূপ। আয়েষার কাছে এ ঘটনা গোপনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে কৌশলে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়। তার ধারণা, ফকিরের সঙ্গে অহেতুক অন্যায় ও রূঢ় আচরণ করায় তার অভিশাপ নজুমিয়ার ক্ষেত্রে ফলে যাবে। তাই নজুমিয়াকে ভরা বর্ষায় প্লাবিত পদ্মা নদী পাড়ি দেয়ার অনুমতি প্রদানে সে কোনোভাবেই সম্মত নয়। অবশেষে ফকিরকে সন্তুষ্ট করিয়ে তবেই নজুমিয়া এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারবে বলে আয়েষা সিদ্ধান্ত নেয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আষাঢ়ের দুরন্ত পদ্মায় কালবৈশাখীর দাপটে নজুমিয়া ও তার সঙ্গীদের নৌকাডুবির ঘটনায় শোকাহত জননী আয়েষার মনোলোকে ফকিরের অভিশাপ বা বরদোওয়া সংক্রান্ত লোকসংস্কারের উপস্থিতি উল্লেখিত। নজুমিয়ার মৃত্যুর ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে ফকিরের বরদোওয়ার পরিণতি হিসেবে আয়েষার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনায় লোকমানসে নিয়তি সংক্রান্ত সংস্কারের প্রাবল্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।

২. লোকাচার–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৃষ্টি নামাতে বদনা বিয়ের আয়োজন, মিলাদের দাওয়াত প্রভৃতি। বদনা বিয়ের রীতি আদিম লোকাচারের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষিজীবী সমাজে প্রচলিত। এ উপন্যাসেও এর প্রাসঙ্গিক বিবরণ লক্ষণীয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে আষাঢ়েও বৃষ্টি না হওয়ায় রহিমপুরের কৃষকরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। কেননা, পূর্ববর্তী দুই বছর অনাবৃষ্টির ফলে তাদের ভোগান্তির সীমা ছিল না। এবছরও অনুরূপ অবস্থা হলে না খেয়ে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু ব্যতীত গত্যন্তর থাকবে না, এমন আশঙ্কাবশত গ্রামের মেয়েরা বদনাবিয়ের আয়োজন করে।

একদল মেয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে। সবার আগে নুরু। তারা ক্রমে কাছে আসে। দুয়েকটা কথা বোঝা যায়। বৃষ্টির ছড়া গাইছে তারা। মেঘকে ডাকছে, দোহাই দিচ্ছে। কত রকমের মেয়েলি ছড়া। ... আসগর মিয়ার মুখ থমথমে মেঘের মতন অন্ধকার। চাপা গলায় বলে, মন্ত্র তন্ত্র বা ছড়া গানে যদি বর্ষা নামত তবে তিন-তিনটে বছর এমন ভাবে কাটে? ... মেয়ের দল মাথায় বদনা রেখে গান করছে। আসগর মিয়া নুরুর কাছে এসে তার বদনা নিয়ে মাটিতে আছাড় দিলে। ডুকরে

কেঁদে উঠল মেয়ের দল। বর্ষা নামানো বদনা ভেঙ্গেছে আসগর মিয়া। না জানি কী সর্বনাশ হয়! ... তাদের কান্না শুনে আসগর মিয়ার রাগ যেন আরো বেড়ে গেল, নে আরো গান গা। ...

বাজান তুমি যে বদনা ভাঙ্গলে, এতে যে মন্দ হবে আমাদের!

মিছেই ভয় পাচ্ছিস তুই। এসব গানটানের কোন দাম নেই। যদি থাকত, গত দুবছরে কেন বৃষ্টি নামে নি? কেন আকাল হল? (পৃ. ১২৪)

ধুলদির হাটের ফকিরকে সন্তুষ্ট করতে নজুমিয়া বাড়িতে মিলাদের আয়োজন করে এবং তাকে ওয়াজ নসিয়তের আহ্বান জানায়। এ উপলক্ষে সে আয়েষার পরামর্শ অনুযায়ী গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু আসগরকেও তার বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত দেয়। গ্রামের চারশ-পাঁচশ লোকের জন্য কলাপাতা কেটে খাবারের থালার বন্দোবস্ত করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে ফকির নজুমিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হয়। 'মিলাদের মজলিসে ফকিরকে আদর করে বসানো হ'ল। টানা ফরাস, তার এক কোনায় ফকির সাহেবের জন্য তাকিয়া পাতা, দু'পাশে আতর দান, সামনে আগর বাতি আর ধূপলোবান' (পৃ. ৫৯)। কোরান তেলাওয়াত শেষ হলে সে ওয়াজ শুরু করে। দরুদ পাঠের পর মোনাজাতের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান শেষ হলে সবাই খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'দুপুর রাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা চলল, সমস্ত গ্রাম নজুমিয়ার তারিফ করতে লাগল। কারো জন্মকালের মধ্যে এত বড় জিয়াফত গ্রামে হয় নাই' (পৃ. ৬৩)।

৩. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে বিধৃত রহিমপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ও রূপকথার অনুষঙ্গ প্রচলিত ।

৩.১ ছড়া-- এ উপন্যাসের 'আসগর' খণ্ডের অন্তর্গত 'দুই' পরিচ্ছেদে গ্রাম্য বালকদের ছড়া আবৃত্তির ঘটনা রয়েছে। তারা নৌকা নিয়ে পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চরে বেড়াতে আগ্রহী হলেও মালেক তার বাবা নজুমিয়ার নিষেধ স্মরণ করে এ প্রস্তাবে সাড়া দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বন্ধু সাবু এ অভিযানে অংশ নিতে তাকে রাজি করাতে চাইলেও প্রতিবেশী এবং খেলার সঙ্গী নুরুর অনাগ্রহে সে শেষ পর্যন্ত এতে সম্মত হয়নি। তবে বালকদের অভিযান দেখতে সে নদীর তীরে হাজির হয়েছিল। সেখানে সমবেত বালকেরা পরস্পরকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পাশাপাশি জলে লাফালাফি এবং ছড়া আবৃত্তিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। মালেকের আপত্তি থাকায় একপর্যায়ে সাবু তাকে রেখেই খেলায় যোগ দেয়।

সাবু এমন ভাব দেখাল যেন সে নিজের মনে খেলা করছে–সাঁতরে এসে কোমর জলে দাঁড়াল, হাততালি দিয়ে বলে উঠল–

এতটুকু পানি

ঝপর পানি।

সবাই এসে যোগ দিল তার সঙ্গে, হাত ধরাধরি করে সবাই গাইতে লাগল–

এতটুকু পানি

ঝপর পানি।

একটি ছেলে ডুব দিয়ে সাবুর পা জড়িয়ে ধরল, সাবু চেঁচিয়ে উঠল,–

এ গাঙে কুমির নাই

ঝুপুর ঝাপুর নেয়ে যাই। (পৃ. ৮৭)

'আসগর' খণ্ডের অন্তর্গত 'আট' পরিচ্ছেদে বৃষ্টি নামানোর ছড়ার উল্লেখ রয়েছে। টানা তিন বছর আকালের পরিণতিতে গ্রামীণ জীবনে অভাব-অনটন ও সার্বিক বিপর্যয় ঘনিয়ে এলে প্রাচীন লোকাচারের অংশ হিসেবে নুরু ও তার সঙ্গী বালিকারা বদনা বিয়ের আয়োজন করে। বৃষ্টিকে আবাহনের ছড়া আবৃত্তি করতে করতে তারা গ্রামের পথে হেঁটে যায়। নুরুর বাবা আসগর অনাবৃষ্টির কবলে ভুগে একপর্যায়ে এ লোকাচারে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। তার দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে নুরু ও তার সঙ্গীদের ছড়া পরিবেশনের বৃত্তান্ত--

একদল মেয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে। সবার আগে নুরু। তারা ক্রমে কাছে আসে। দুয়েকটা কথা বোঝা যায়। বৃষ্টির ছড়া গাইছে তারা। মেঘকে ডাকছে, দোহাই দিচ্ছে। কত রকমের মেয়েলি ছড়া।

কচুর পাতা হলদি,

বৃষ্টি নাম জলদি।

কেউ বা বলে,

কচুর পাতায় করমচা

আয় বৃষ্টি নেমে যা'। (পৃ. ১২৪)

৩.২ প্রবাদ-- প্রবাদ গ্রামীণ লোকসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভাষিক উপাদান এবং একইসঙ্গে মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত। লোকসমাজে এর প্রয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিয়মিত। এতে যেমন কোনো গোষ্ঠীর অতীত বৃত্তান্তের ছাপ থাকে, তেমনিভাবে প্রজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় মেলে। তাছাড়া পারস্পরিক আলাপে এর উপস্থিতিতে গতিময়তা ও বাকবৈদগ্ধ্য ক্ষেত্রবিশেষে সঞ্চারিত হয়। যেহেতু সমষ্টিমানুষের আচরণ, কর্মকাণ্ড, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ছাপ এতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাই উপযুক্ত পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগও লোকমানসে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়। এ উপন্যাসে এর কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। উপন্যাসের 'নজুমিয়া' খণ্ডভুক্ত 'এক' পরিচ্ছেদে কুমির শিকার করতে গিয়ে লোকজনকে সতর্ক রাখতে নজুমিয়ার হুশিয়ারি 'সাবধানের মার নেই' উচ্চারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। 'এ খণ্ডের 'দুই' পরিচ্ছেদে বিধৃত 'ধুলদির হাট'-এর বৃত্তান্ত উপস্থাপনে লেখকের বিবরণেও 'দশ মুখে তিলকে তাল করতে কতক্ষণ' প্রবাদটি বাঙ্ময় রূপ পায়। বিশেষত, রহিমপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বাসিন্দাদের হাটবারে এ হাটে আগমন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপের অবতারণা সম্পর্কে এ প্রবাদের প্রয়োগ যথার্থ বিবেচিত হয়। কেননা, লোকমুখে প্রচারিত নানা প্রসঙ্গের ভিত্তি বা উৎস সম্পর্কে জানা না গেলেও যা জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়, সেটির আবেদন স্বীকার্য। 'তিন' পরিচ্ছেদে বাকপটু ইদ্রিসকে সংযত করতে নজুমিয়ার প্রবাদ (নিজের চরকায় তেল দেয়া) স্মরণ করানো, 'চার' পরিচ্ছেদে জনৈক ফকিরের কেরামতির প্রতি রমজানের মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি পোষণ সম্পর্ক নজুমিয়ার সন্দেহ উত্থাপনে (ঝড়ে বক ওড়ে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে) প্রবাদের প্রয়োগ সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হয়। তবে 'পাঁচ' পরিচ্ছেদে আয়েষার সংলাপে একাধিক প্রবাদের পাশাপাশি বাগধারার সমাবেশ (চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, পাকা ধানে মই দেয়া/ বুদ্ধির ঢেঁকি) লেখকের এতদ্বিষয়ক সচেতনতার দৃষ্টান্ত। ধুলদির হাটে ফকিরের সঙ্গে নজুমিয়ার বিবাদের বৃত্তান্ত এড়াতে রমজান সচেষ্ট হলেও ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বাকপটু বৃদ্ধা আয়েষার কাছে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় এ ঘটনা। প্রবাদ ও বাগধারার সন্নিবেশ ঘটিয়ে আয়েষা রমজানকে

যেভাবে তিরস্কার করে, তাতে বোঝা যায়, লোকসমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এসব প্রবাদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভাত হয়। এ ধরনের আরো কিছু দৃষ্টান্ত--

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন নজুমিয়ার মৃত্যুসংবাদে ধুলদিতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। (পৃ. ৭৩)

নিজের চরকায় গিয়ে তেল দে। (পৃ.৮১)

পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ,−তাতে তুই-ই ঠকবি। (পৃ. ৮৩)

ওই দেখ, বলে ঘরে কে, না আমি কলা খাইনি! (পৃ. ৯৩)

সাবধানের মার নেই, তাই সাবধানে চলাই ভালো। (পৃ. ১০২)

কথায়ই আছে, নিজে সাত পাঁচ না ভেবে কিছু করা উচিত নয়। (পৃ. ১০৯)

শাখেঁর করাত যেতেও কাটে আসতেও কাটে। (পৃ. ১১০)

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। (পৃ. ১২৩)

কথায় আছে একে মনসা, তাতে ধোঁয়ার গন্ধ। (পৃ. ২৪৫)

লোকের বাজে কথায় কান দিতে নাই । (পৃ. ১৪৫)

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। (পৃ. ১৫৬)

দশজনের মধ্যে থাকতে হলে দশজনের কথা শুনতে হয়। (পৃ. ১৫৯)

কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? (পৃ. ১৬২)

b'x I bvix উপন্যাসে লেখক এমন কিছু বাক্যকে ভাষ্যরূপ দিয়েছেন, যা অর্থগত পূর্ণতা এবং পারিপার্শ্বিক জগত-সমাজ-মানবজীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ধারণের গুণে উপন্যাসে বিবৃত ঘটনারাশি এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে প্রবাদপ্রতিম মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে--

মানুষ যত পায়, তত চায় আর তাতেই অশান্তি। (পৃ. ৪৬)

রাগ হিংসা আর ভয়− যতদিন এ তিনটি সাপকে না মারবে, ততদিনই অশান্তি। (পৃ. ৪৬)

কাফনের সঙ্গে সঙ্গে দুশমনী দোস্তি সব দাফন হয়ে যায়। (পৃ. ১১০)

পুরোনো পাতা যতক্ষণ না ঝরে, ততক্ষণ নতুন পাতা দেখা দেয় না। (পৃ. ১৯১)

৩.৩ রূপকথার অনুষঙ্গ-- গ্রামীণ লোকসমাজে যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথার অনুষঙ্গ এ উপন্যাসে রয়েছে। লক্ষণীয়, বয়স্কদের দ্বারা বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জনের জন্যই শুধু নয়, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডেও যথোপযুক্ত ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজনে এসবের উল্লেখ লোকভাষায় বিদ্যমান। এমনকি, উপন্যাসের ঘটনা,

পরিস্থিতি এবং কোনো বিশেষ অনুষঙ্গের সমান্তরালে এসবের উপস্থিতি স্বয়ং লেখকের লেখনীতেও বারবার স্থান পায় লৌকিক ভাবপরিমণ্ডল নির্মাণের তাগিদে। নিচে প্রাসঙ্গিক কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হলো--

> আয়েষা বলল যে সাত রাজার ধন কোন্ মানিক তুমি বঁড়শিতে গেঁথেছ, আমি জানব কেমন করে? (পৃ. ২৪)

> গোল বাঁধত রোজ সন্ধ্যাবেলা। দাদী ছাড়া অন্য কারো হাতে সে [মালেক] কখনো খায় নি। দাদী ছাড়া আর কেউ তাকে ঘুম পাড়াতে পারত না। কথা গল্প কেচ্ছা ছড়া ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাহিনী–রাক্ষস-খোক্কসের গল্প তাকে কে বলবে? (পৃ. ৭৮)

> [মালেক] কেচ্ছায় শুনেছে যে কুচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল। নুরুর মাকে দেখে মালেক ভাবল যে রূপকথার পরি বুঝি এমনি সুন্দর হয়। (পৃ. ১১২)

> নতুন ধানের শীষগুলো যেন সবুজ পরি, তাদের অঙ্গে এ কী জাদু! (পৃ. ১১৩)

> মায়ের কোলে বসে নুরু একমনে রূপকথার গল্প শোনে। এক-আধটা প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে,– মা হেসে তাকে নিরস্ত্র করে। (পৃ. ১১৫)

> তাদের আনন্দ যেন জীয়ন কাঠি, যাকে ছোঁয়, তারই মন আনন্দে ভরে উঠে। (পৃ. ১৭৭)

> তোর মায়ের বয়স তখন পনেরো ষোল হবে– দেখতে ছিল যেন বেহেস্তের হুরী। ... এ রকম রূপবতী তো আমার চোখে কোনদিন পড়ে নি– সে যেন রূপকথার রাজকন্যা, চাঁদের দেশ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছে। (পৃ. ১৮৫)

৪. লোকচিকিৎসা-- রহিমপুর, ধুলদির হাটের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা চিকিৎসার জন্য শরণাপন্ন হয় এ তল্লাটের একমাত্র হাকিম এবং ভিনদেশী জনৈক ফকিরের নিকট। হাকিমের সম্পর্কে নানা গালগল্প লোকসমাজে প্রচলিত। তার পারিবারিক বৃত্তান্ত ও হেকিমী শিক্ষা সম্পর্কে সন্দিহান হলেও গ্রামবাসী আরোগ্য লাভের জন্য নির্দ্বিধায় হেকিমের কাছেই ছুটে আসত। 'হাকিম সাহেবও কখনো দিত পানিপড়া, কখনো কাউকে দিত দুটো হজমিগুলি, কখনো বা চিড় বিড় করে কী সব আউড়ে ফুঁ দিয়ে দিত, বলত, যাও ভাল হয়ে যাবে। বলত সুরা ইয়াসিন পড়ে তিনবার ফুঁকে দিলাম, এবার আর ভয় নাই' (পৃ. ৩১)। প্রয়োজনীয় কবিরাজি বড়ি বানাতে তার প্রয়োজন হত কুমিরের কলিজা ও গুর্দা। ধূলিমাখা জোব্বা, ঢোলা পিরহান ও আঁটসাঁট পোশাকে সজ্জিত, উর্দু-আরবি-ফারসি মিশিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত পালোয়ানের মতো উন্নত দেহের অধিকারী হাকিমের প্রতি গ্রামবাসীর আস্থা ছিল অবিচল। তবে তার এ অবস্থান একপর্যায়ে করায়ত্ত হয় ধুলদির হাটে আগত জনৈক ফকিরের। গ্রামীণ লোকসমাজে জ্বিন-ভূতে ধরা, অশরীরীর উপদ্রব সংক্রান্ত ঘটনাদি হরহামেশাই প্রচারিত হয়। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী এ সংক্রান্ত নানা গল্প-গুজবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এসব প্রাচীন সংস্কার যুগ যুগ ধরে নিরক্ষর লোকমানসে প্রভাব বিস্তার করে। এর সুযোগ নেয় হাতুড়ে চিকিৎসক, পীর-ফকির, ওঝা-কবিরাজেরা। যেহেতু কোরআনে জ্বিনের এবং সনাতন ধর্মশাস্ত্রসমূহে ভূত, প্রেতাত্মা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে, তাই এসব ব্যাপারে অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে ভীতিবোধ প্রবল। বিজ্ঞানভাবনার অভাব এবং যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা পরিস্থিতি বিবেচনার অসামর্থ্য লোকমানুষকে বাধ্য করে তাদের দ্বারস্থ হতে। ফকির নজুমিয়ার বাড়িতে মিলাদের জন্য উপস্থিত হলে উক্ত গ্রামের বাসিন্দা ইব্রাহিম জানায়, তার পনের বছরের তরুণী মেয়েকে কী যেন ভর করেছে। ফলে তার স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্তপ্রায়। এর সংক্রমণ বাড়লে মেয়েটি 'ভীষণ চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, হাত পা ছুঁড়তে থাকে। শেষে যখন চিৎকার বন্ধ হয়, তখন মুখ ফেনায় ভরে যায়, দাঁতে দাঁতে লেগে যায়, সমস্ত শরীর শক্ত হ'য়ে যায়। কখনো কখনো সারা দিনরাত অজ্ঞান হয়ে থাকে' (পৃ. ৬১)। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের অভাবে সে দিন দিন রোগা হতে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষ্য অনুযায়ী মেয়েটি স্পষ্টতই মৃগীরোগে আক্রান্ত। পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বানুযায়ী সে যে মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে পারিপার্শ্বিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের অভিঘাতে, তা বলাই

বাহুল্য। জ্বিন সংক্রান্ত আর্কেটাইপ তার চেতনালোকে যেভাবে ভ্রান্ত শ্রবণ ও ভ্রান্ত দর্শনের সন্নিবেশ ঘটায়, তা সিজোফ্রেনিয়ার অন্যতম লক্ষণ। অথচ এ ব্যাপারে ফকির ঘোষণা করে, মেয়েটিকে জ্বিন ধরেছে। উপন্যাসে তার সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, সে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে--

> একদিন সন্ধেবেলা নদী থেকে কলস ভরে ফিরছিলাম, হঠাৎ অন্ধকারে বাঁশবনে দেখলাম কালো উলঙ্গ মূর্তি। চোখগুলো ভাটার মত জ্বলছে, যেন আমাকে আগুনে ঝলসে দেবে। কেমন করে যে বাড়ি পৌঁছোলাম, মনে নাই। কিন্তু মার কাছে শুনেছি যে উঠোনে পা দিয়েই চিৎকার করে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি। সেই থেকে অন্ধকার হলেই সে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। ... ওর লজ্জা সরম নাই– তোমরা এত লোক এখানে, তবু উলঙ্গ হয়ে নাচছে, এখুনি আমাকে গ্রাস করবে। ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। (পৃ. ৬২)

মেয়েটি আতঙ্কিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ফকির তার নাড়ি টিপে চোখের পাতা উল্টে দেখে। এরপর সে তার স্বজনদের বলে এক গামলা পানি এবং হলুদ আনতে। পানি ছিটিয়ে আগুনে পোড়ানো হলুদ নাকের কাছে ধরতেই মেয়েটি সেখান থেকে সরে যেতে চায়। তখন ফকির জোরপূর্বক তাকে ধরে রেখে ছোট একটি দড়ি দিয়ে প্রহার করলে মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিৎকার করে এবং নির্যাতন থেকে মুক্তি চায়। ফকির উৎসুক জনতাকে জানায় যে এখন মেয়েটির ওপর ভর করা জ্বিন তার মুখ দিয়ে কথা বলছে। তাই জ্বিন ছাড়াতে সে আরেকজনকে আদেশ দেয় পুনরায় একইভাবে মেয়েটিকে প্রহারের জন্য। সে এরপর গামলাভরা পানিতে বিশেষ মন্ত্র সাতবার পড়ে মেয়েটির মুখে ও মাথায় ছিটিয়ে দেয়। পরিশেষে সে মেয়েটির মাথায় হাত রেখে চিৎকার করে জ্বিনকে আদেশ দেয় তাকে চিরজীবনের মতো ছাড়বার প্রমাণ হিসেবে 'কলসভরা জল দাঁত দিয়ে তুলে নিয়ে সাত পা' (পৃ. ৬৩) এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মেয়েটি অস্বাভাবিক নাকীসুরে এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে তা পালন করামাত্রই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে কলসির পানিতে ভিজে সয়লাব হয়ে যায় । এরপর ফকির ইব্রাহিমকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জানায়, মেয়েকে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে দিয়ে দিতে। এ ঘটনায় গ্রামে ফকিরের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়।

৫. লোকশিল্প-- গ্রামীণ নারীসমাজে প্রচলিত সূচিশিল্পের উল্লেখ এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। নুরু কখনো কখনো গৃহকর্মের অবসরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পুরোনো শাড়িতে নানা রঙের সুতো দিয়ে নকশার বিচিত্র কারুকাজে কাঁথা বোনে।[১৯] প্রতিদিনের ঘটে চলা নানা ঘটনা, বাল্যজীবনের অজস্র স্মৃতির সঙ্গে মনের ভেতর লালিত কল্পনাকে মিশিয়ে সে নানা দৃশ্য ও ছবিকে রঙিন সুতার অবয়বে ফুটিয়ে তোলে। কখনো কখনো এর সঙ্গে যুক্ত হয় মালেককে ঘিরে তার প্রেমানুভব ও রোমান্টিক ভাবনা--

> একলা ঘরে বসে গুন গুন করে কী গান গাইছে নুরু? কথাগুলি স্পষ্ট শোনা যায় না। হয়তো সে নিজেই জানে না কোথায় কবে কার মুখে শুনেছিল, কিন্তু তার রেশ আজও তার মনে রয়ে গেছে। গুন গুন করে গাইতে গাইতে পুরানো শাড়ি জড় করে কাঁথা সেলাই করছে নুরু। সে কাঁথায় নকশা কত, ছবি কত। লাল কালো সুতোর তাগা, তাই দিয়ে কাঁথার জমিনে সে নানা ছবি তুলছে। তার ছেলেবেলার এক-একটা ঘটনা মনে পড়ে, আর কাঁথায় তার ছবি তুলতে চেষ্টা করে। মালেক, আসগর মিয়া আর তার মা-এই তিনজনাকে নিয়েই তার জীবন গড়ে উঠেছে, তাই যে ছবি সে আঁকতে চায়, তাতেই মালেকের কথা এসে পড়ে। অথচ মালেকের ছবি তুলতে তার হঠাৎ লজ্জা লাগে। কেউ কাছে না থাকলেও কাঁথা লুকিয়ে ফেলে। ... কাঁথাটি কী জন্য, কবে তার ব্যবহার হবে মনে পড়ে হঠাৎ সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে। এ যে তার বিয়ের কাঁথা–ফুলশয্যার রাতে নতুন বর বধূর বিছানায় ফুলকাটা রঙিন নকসি-কাঁথা বিছিয়ে দেয়, আর সেই কাঁথা বধূকে নিজের হাতে সেলাই করতে হয়। তাই বিয়ের বয়সী সব মেয়েরাই বিয়ের কথা না ভেবে পারে না। (পৃ. ১৩৫- ১৩৬)

বালকবালিকারা স্বভাবতই বিভিন্ন খেলনার প্রতি আগ্রহী। বালক মালেককে বসির কাঁচা বাঁশের ধনুক এবং পাটখড়ির তীর বানিয়ে দেয়। এসব খেলনা দিয়ে সে যখন শিকারের চেষ্টা চালায়, তার সমবয়সীরা ঈর্ষান্বিত হয়। এ খেলার সূত্রেই তার সঙ্গে সাবু ও নুরুর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তরুণ মালেক নিজেই ছোট ছুরি দিয়ে বাঁশ, কাঠ,

Dhaka University Institutional Repository

রঙিন ঘাসের খেলনা বানিয়ে তার প্রেমিকা নুরুকে উপহার দেয়। নুরু চায় না, সে ছাড়া অন্য কেউ মালেকের বানানো খেলনা উপহার পাক। যেদিন মালেক নুরুর জন্য খেলনা না নিয়েই বাড়ি ফেরে, সেদিন সে সরল বালিকাসুলভ অভিমান করে। এরপর সেগুলো মালেকের হাতে দেখামাত্রই দৌড়ে এসে কেড়ে নেয়। মালেক কখনো কখনো নতুন ধানের ছড়া দিয়ে সাতনরী হার বানিয়েও নুরুকে উপহার দেয়।

৬. লোকজ্ঞান-- জীবিকার তাগিদে, নিত্যদিনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতায় সময়ের পরম্পরায় সঞ্চিত লোকজ্ঞান বংশপরম্পরায় অনুসৃত হয়। কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক গড়ন, আবহাওয়া, জলবায়ু, কৃষিকর্ম ও প্রাকৃতিক অনুষঙ্গসংশ্লিষ্ট এ অভিজ্ঞতা তাদের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ উপন্যাসেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে--

> ক. ঘা-খাওয়া কুমির আর ঘা-খাওয়া বাঘ, তাকে নিয়ে তামাশা করা চলে না। (পৃ. ২৬)
>
> খ. ডাঙ্গায় জটলা, নৌকোর মধ্যেও সকলের সলাপরামর্শ। যদি কোনোক্রমে একেবারে কুমির ছুটে যায়, তবে সর্বনাশ হবে, কারণ জখমি কুমির মানুষ-খেকো হতে বাধ্য। মানুষের মতন সহজ শিকার তো আর দ্বিতীয় নাই! ... একে কুমির, তাতে জখমি, এ সময় পানিতে নামলে আর রক্ষা আছে? (পৃ. ২৬)
>
> গ. আসগর এবং তার দলের লোক পশ্চিমের চর দখল করেছিল। নজুমিয়াকে খবর পাঠাল যে একখানি বড় চর পেলেই তারা খুশি। নজুমিয়া পূবের চর দখল করল, একবার ভাবল যে পশ্চিমের চরে দাবি জানায়, কিন্তু তার মাঝি বসির বলল, পঞ্চায়েত, আমি বুড়ো মানুষ, প্রায় চার কুড়ি বয়স হতে চলল, রাক্ষুসি পদ্মার অনেক খেলা দেখেছি। পশ্চিমের চর টেকে না, বছর দু'বছরে নদীর ধারে কেটে যায়, আর পূবের চর বিশ বছরেও ভাঙ্গে না। (পৃ. ৫৫)
>
> ঘ. জানো তো সর্দার লোকে কী বলে? বৈশাখের পদ্মা রাক্ষসী! তাকে লোভ দেখিয়ে লাভ কী? ... নজুমিয়া ধমক দিয়ে উঠল, মেয়ে মানুষের মতো কথা বলো কেন? বৈশাখ মাসে পদ্মা রাক্ষসী, আষাঢ় মাসে পদ্মা দুরন্ত, ভাদ্রের পদ্মা বিশ্বাসঘাতক, এসব কেচ্ছা শুনলে কাজ চলে না। ... আকাশ এখন পরিষ্কার, বেলাও বেশি হয়নি। যদি ঝড় ওঠেও, তবু বৈশাখী ঝড় বিকালের দিকেই আসে। ... নজুমিয়া বলল, ঝড় তুফানের কথা কী বলছ আম্মা? আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই, বাতাসও একেবারে বন্ধ, ঝড় তুফানের তো আজ নামগন্ধও নেই।
>
> আয়েষা বলল, এসব চালাকি রাখো। বোশেখ মাসের পদ্মাকে বিশ্বাস নেই। সকালে চারদিক পরিষ্কার, কিন্তু দুপুর না হতে হতে তুফানে চারদিক তোলপাড় করে তোলে। ... পদ্মার মেজাজ আমিও জানি–ওর ছলাকলার অন্ত নাই। আজ মনে হচ্ছে যে রাক্ষুসী শিকার ধরবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে, তাই সে এত চুপ। (পৃ. ৬৫-৬৬)
>
> ঙ. নদীর রকম সকম আজ আমার ভাল লাগছে না–বড্ড বেশী শান্ত আর স্তব্ধ। ... হঠাৎ দমকা বাতাসে নৌকো ট'লে উঠল। ... বসিরের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, খোদা করেন বাতাস যেন না বাড়ে। বোশেখ মাসে একবার হাওয়া উঠলে কখন যে তুফান শুরু হয়ে যায়, তার ঠিকানা পাওয়া মুস্কিল। এ মাঝ দরিয়ায় তুফান উঠলে নৌকা সামলানো কঠিন হবে।' (পৃ.৬৭- ৬৮)
>
> চ. যে জেলের দল মালেককে ফিরিয়ে এনেছিল, তাদের সর্দার বলল, তোমরা ডাঙ্গার মানুষ, জলের খবর রাখ না, তা নইলে এ ভুল তোমার হত না মিয়া। আমরা মাছ ধরি হয় সাঁঝ বেলায়, না হয় ভোর রাতে। একবার রোদ তেতে উঠলে মাছ সব গভীর জলে ডুব দেয়, সাঁঝের আগে আর জাগে না। তাই আমরা অন্ধকার থাকতে খেপ ফেলি, সূর্যের তেজ বাড়লে বাড়ি রওয়ানা দিই। (পৃ. ১৬১)

'ক' ও 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কুমির শিকারের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রসঙ্গাদির উল্লেখ থেকে অনুধাবন করা যায়, পদ্মাতীরবর্তী বাসিন্দারা নদীপথে যাত্রাকালে বা মাছ ধরতে গিয়ে ইতঃপূর্বে কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং সেই বৃত্তান্ত অন্যদের জানিয়েছে। 'গ', 'ঘ', 'ঙ', সংখ্যক উদ্ধৃতিসমূহে পদ্মা তীরবর্তী মানুষের স্থানিক

অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঋতুর পরিবর্তনের সমান্তরালে এ নদীর খেয়ালী রূপ অনুধাবনের সামর্থ্য। ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পদ্মার ভাঙা-গড়ার খেলা এতদঞ্চলের লোকজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত সৃষ্টি করে। সেকারণেই তারা এর খামখেয়ালি মেজাজ সম্পর্কে বরাবর সচেতন থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে পদ্মা পাড়ি দিতে গিয়ে তারা যেভাবে লড়াই চালিয়ে যায়, তা থেকে অনুধাবন করা যায়, এসব অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে তাদের অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা কতটা নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। 'চ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে তাদের মাছ ধরার অভিজ্ঞতা সন্নিহিত।

৭. লোকপ্রযুক্তি-- লোকসমাজের বাসিন্দারা প্রযুক্তিগত বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ হলেও প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে নানা কৌশল অবলম্বনের সচেতন আগ্রহ তাদের আচরণে লক্ষণীয়। নিত্যদিনের প্রয়োজন মোকাবেলায় এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা রয়েছে--

> রমজান বলল, – বঁড়শি কাটা অত সহজ নয়, সর্দার। গুণের সুতো তিনবার পাকিয়ে তাতে লোহার তার জড়িয়ে দিয়েছি, আর যেখানে বঁড়শির মাথা, সেখানে তারও চৌগুনো। যদি কাটতে চেষ্টা করে শালার (কুমিরের) দাঁতই ভেঙ্গে যাবে। (পৃ. ২৫-২৬)

৮. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে। প্রাত্যহিক আহারের অংশ হিসেবেই শুধু নয়, বরং বিভিন্ন উৎসবে-আয়োজনেও এসব খাবারের প্রতি লোকমানুষের আগ্রহ লক্ষণীয়--

> ক. আমাকে (সাবুকে) কত ভালবাসত তোর বাবা! কত আদর করত। কতবার মিছরি খেতে দিয়েছে, নতুন গুড়ের পাটালি দিয়েছে, একবার হাট থেকে কদমা এনেছিল তাও দিয়েছে। (পৃ. ৮৪)

> খ. আসগর মিয়া রাতের খাবার অন্দর বাড়িতেই খায়। কিন্তু নিজে খেতে বসবার আগে কিষাণ মজুরদের খাবার তদারক করে, দেখে তারা ঠিকমত পেয়েছে কিনা। থালা ভরা মোটাচালের ভাত, গামলা ভরা ডাল, কুমড়ো বেগুনের তরকারি। ... কিষাণদের খাওয়া শেষ হ'লে আসগর মিয়া খেতে বসে। তার দুপাশে বসে মালেক আর নুরু। গরম গরম ভাত, বাঁটা লঙ্কা মাখানো বেগুন ভাজা। ঝালে চোখে জল বেরিয়ে আসে। মালেকের কিন্তু ঝাল না হ'লে খাওয়াও হয় না। কাঁচা পেয়াজ, রসুন ভাজা থাকলে তো কথাই নেই। মালেক আহ্লাদে আটখানা। শেষকালে একবাটি ক'রে দুধ, দু-চারটে পিঠে আর খেজুর গুড়। (পৃ. ১১৪)

> গ. মালেক ফিরেছে বলে আসগর মিয়া সারা গাঁয়ের লোকের জন্য জিয়াফতের ব্যবস্থা করল। মালেককে যারা নিয়ে এসেছিল, সেই মাঝিদের অনেক করে বলে কয়ে একদিন থেকে যেতে রাজি করল। ... খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা যা হল সে এক এলাহি কাণ্ড। পুরুষ্ট দেখে একটা বাছুর জবাই করে কালিয়া আর কাবাবের আয়োজন হল, সমুদ্রের রকম বেরকমের মাছ ভেজে তাতে শুকনো লঙ্কা কাঁচা মরিচের বাটনা বেটে নানা রকমের ঝালঝোল অম্বল তৈরি হল। নুরু যত্ন করে মালেকের জন্য নিজের হাতে নানা রকমের সালুন রাঁধল, মুরগির কোরমা, কই মাছের ব্যঞ্জন, ঘন দুধের ক্ষীর। ... মেহমানরা সবাই বসে গেলে আজিজ একটা বড় বাসন ভরে নুন নিয়ে এল–সকলের পাতে নুন পড়বার পর বড় বড় গামলা ভরা গরম ভাত এল। মোটা লাল চালের ভাত, কিন্তু খেতের ধানের চাল, তাতে তখনো ভাপ উঠছে। সে ভাতের গন্ধ আর স্বাদের তুলনা কোথায়? বাটি বাটি সালুন এল, গোস্ত দিয়ে রাঁধা ডাল, তারপরে মাছ ভাজা, রাঁধা মাছ, কত রকমের তরিতরকারি, শাকসবজি। সবার শেষে সেমাই, ঘনদুধ আর নতুন গুড়। গাঁয়ের লোক পেট ভরে খেল–আসগর মিয়া আয়োজনের ত্রুটি করে নি। এ রকম জিয়াফত সে তল্লাটে কখনো হয় নি। (পৃ. ১৫৮)

লোকসমাজে হুকায় ধূমপানের বিশেষ কদর রয়েছে। তামাক সেবনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি একটি। এ উপন্যাসে 'নজুমিয়া' অংশের 'দুই' পরিচ্ছেদে ধুলদির হাটের হাকিম নজুমিয়াকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে তার দোকানঘরে হুক্কা খাওয়ার অনুরোধ জানায়। সে অন্যসময় কৃষক নজুমিয়াকে পাত্তা না দিলেও স্বার্থোদ্ধারের তাগিদে যেচে তাকে এক ছিলিম তামাক খাওয়ার অনুরোধ করে। কারণ তার কবিরাজি চিকিৎসার জন্য কুমিরের কলিজা

এবং গুর্দা প্রয়োজন। নজুমিয়ার ছেলে মালেক একটি কুমির শিকার করেছিল। সে তাই নজুমিয়াকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে পিতলের ডিবেতে পান, সুপারি ও জর্দার বন্দোবস্ত করে। যেহেতু নজুমিয়া রহিমপুরের 'পঞ্চায়েত' বা গ্রামপ্রধানদের অন্যতম, তাই তাকে 'আপনি' সম্বোধনসহ ফরাসে বসিয়ে সমাদর করা হয়। সেকারণেই সরকারি ডাবা হুঁকার পরিবর্তে তার জন্য বিশেষ গড়গড়ার ব্যবস্থা থাকে। নজুমিয়া সঙ্গীদের নিয়ে পদ্মা নদীতে যাত্রাকালে তার জন্য নৌকায় হুকার বন্দোবস্ত থাকে। রমজান, বসির ও ইদ্রিস একটানা দাড় বেয়ে ক্লান্ত হলে খানিকটা সময় জিরিয়ে হুকা টেনে পুনরায় বৈঠা বাইতে থাকে। বন্যায় রহিমপুর প্লাবিত হলে গ্রামবাসীকে নিয়ে আসগর বিয়ানচরে নতুন বসতের বন্দোবস্ত করে। সেখানে ক্ষেতের কাজে নিযুক্ত ক্ষেতমজুরদের খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও তার বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। সে নিজেই তাদের তদারকির ব্যাপারে খেয়াল রাখে। 'সবাই খুশি মনে খায়। খেয়ে দেয়ে দাওয়ায় সবাই জটলা করে বসে। হুঁকো চলে এক হাত থেকে ও হাতে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে সহজ জীবনের সুখ দুঃখের কথা, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা' (পৃ. ১১৪)।

৯. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে রহিমপুর ও বিয়ানচরের লোকসমাজে ব্যবহৃত যে ভাষা রূপায়িত হয়েছে, এতে আঞ্চলিক বাচনভঙ্গির প্রয়োগ, বিশেষত, পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের স্থানিক উপভাষার ব্যবহার অনুপস্থিত। লেখক যেসব চরিত্রকে কুশীলব হিসেবে নির্মাণ করেছেন, তাদের মুখের সংলাপ শিষ্ট চলিত প্রমিত কথ্যরীতির অনুসারী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে অনুসৃত লোকভাষাকে বিবেচনায় রাখলে বলা যায়, স্থানীয় লোকসমাজের নিত্যদিনের চর্চিত ভাষাকে লেখক এ উপন্যাসে ব্যবহার করেননি। এর ফলে প্রায়শই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সংলাপ পাঠকের কাছে কৃত্রিম বিবেচিত হয়। অশিক্ষিত জনসমাজের প্রাত্যহিক কথোপকথনে এতদঞ্চলের মানুষের ভাষিক পরিমণ্ডলের বিশিষ্ট রূপটি আত্মস্থীকরণে লেখক সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। যদিও প্রবাদ ও বাগধারার ব্যবহার চরিত্রসমূহের মনোভঙ্গিকে অনেকটাই স্পষ্ট করে তোলে, তবু লোকভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ না ঘটায় এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য জীবনভাবনার সঙ্গে লোকসমাজের আন্তঃসম্পর্ক নিপুণভাবে গ্রন্থিত হয়নি। ফলে উপন্যাসের কার্যকারণগত দিকটির বিশ্বাসযোগ্যতা পাঠককে কিছুটা সংশয়গ্রস্ত করে তোলে। এর কারণ সম্ভবত, বাল্যকাল থেকেই পিতার বদলির চাকরির কারণে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বসবাস ও পড়ালেখা করতে হয়েছে। ফলে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিণতিতে সেখানকার পারিপার্শ্বিক জনজীবন ও স্থানিক পরিমণ্ডল সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তাঁর ছিল না।[২০] সমগ্র উপন্যাসে কিছু আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ সত্ত্বেও এতদঞ্চলের ভাষিক বিশিষ্টতা তাতে কোনোভাবেই প্রকাশিত হয়নি। এ উপন্যাসে লোকভাষাশ্রিত উপাদান হিসেবে প্রযুক্ত বিবিধ শব্দরাশি ও বাগধারাসমূহকে নিচের তালিকা দ্বারা সনাক্ত করা যায়।

৯.১ শব্দভাণ্ডার-- এ উপন্যাসে লেখক সচেতনভাবেই বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত শব্দরাশিকে ব্যবহার করেছেন–

> দেশজ শব্দরাশি– ডাঙ্গা, পাড়, ভিটে, বনবাদাড়, জলা, ফাল, কানাঘুষো, শণ, খাটুনি, মুঠি, খন্দ, বাইনকুয়ো, স্যাঙাত, খেদ, খড়কুটো, উঠোন, রোসো, খিড়কি, বকর বকর, খুঁটো, জটলা, টানাহেঁচড়া, ঘের, গলুই, পাটাতন, লগি, ভীমরতি, বাগে, হিজল, ডিঙি, গাব, মাঝি, মাল্লা, গলুই, দাঁড়, মাচা, ঘাপটি, শালা, তল্লাট, হাট, চাষি, বেসাত, প্যাটরা, বিড়ি, ঠেস, আউড়ে, ছিলুম, উজবুক, কেশে প্রভৃতি।
>
> ক্রিয়া– চাপড়ে, নিড়োয়, ঢাকাঢাকি, ঠেকেছে, লেপে, হাঁপাচ্ছিস, পিটিয়ে, ছিটকে, চালাচালি, নাইবার, তাগড়া, বকাঝকা, টিপলে, বেরোয়, ঝাঁপিয়ে, চরাবার, লুটছে, ভড়কে, লেপে, ধোওয়াপোছা, টানাহেচড়া, চাপড়িয়ে, উপুড়, খেঁকিয়ে, ঠেলাঠেলি, ফুসফাস, চোখাচুখি, গড়াগড়ি, ছুঁড়তে, লুটোপুটি প্রভৃতি।

বিশেষণ– ঝলসে, নুয়ে, উড়ু-উড়ু, উজালা, ঢিমে, সিধে, কড়া, হেলে, ছেড়া, লেপা, ফুলিয়ে, সোমত্ত, কালা, ঠাটা, তেতে, লুটোপুটি, চুরমার, ফাঁপড়া, জারিজুরি, তেলকুটে, গ্যাঁট, ধুঁকতে, জংলী, গোঁয়ার, কেউকেটা, মাখামাখি, খুড়খুড়ে, মুরোদ, মিছামিছি, তোয়াজ, চাষাড়ে, হেলে প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– তর্কাতর্কি> তক্কাতক্কি, মেয়ে>ছুঁড়ি, মূর্খ>মুখ্যু, গুর্দা>গুরদো, স্পর্ধা>আস্পর্দা, কবিরাজ>কোবরেজ, তালাশ>তল্লাস, বেচেইন>বৈচেন, পিছুটান>পেছুটান, প্রভৃতি।

৯.২ বাগধারা–– বাগধারার ব্যবহার এ উপন্যাসে অবলম্বিত লোকভাষার বিশিষ্টতার পরিচায়ক। লোকমানুষের প্রাত্যহিক ওঠাবসা, চালচলন, কাজকর্ম সম্পাদন ও ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজন মেটাতে তাদের উচ্চারিত ভাষায় এর জোরালো উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাগধারা শব্দরাজির নির্দিষ্ট অর্থদ্যোতক গণ্ডির মধ্যে সঞ্চার ঘটায় ব্যঞ্জনাময়, সম্প্রসারিত অর্থকে। পরোক্ষভাবে, এমনকি এর মাধ্যমে বিশেষ ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রচলিত বক্তব্যের সমান্তরালে নতুন বার্তার সংযোজন ঘটানোও সম্ভব, । ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, পরিহাস ও তিরস্কারের পাশাপাশি প্রশংসা, স্তুতিও বাগধারার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়ে অভীষ্ট বক্তব্যকে স্পষ্ট, জোরালো করে তোলে। শব্দের নির্দিষ্ট অর্থদ্যোতকতার বাইরে গিয়ে সম্প্রসারিত অর্থ আরোপে এর উপযোগিতা সন্দেহাতীত। নিচে এ উপন্যাসে প্রযুক্ত প্রাসঙ্গিক বাগধারাসমূহ উল্লেখিত হলো––

রেগে মেগে আয়েষা আরো জোরে চরকা চালায়, দাসীবাঁদিদের উপর ঝাল ঝাড়ে। (পৃ. ২২)

ঘাটের লোকে বলে, হাকিমের দাওয়াইয়ের কেরামতি আছে, তা নইলে এ তালপাতার সেপাই কবে ঝড়ে উড়ে যেত। (পৃ. ৩৩)

যেই বেপারীরা বলল যে তবে চল পঞ্চায়েত নজুমিয়ার কাছে, সালিশ বসবে, অমনি বাছাধনেরা জব্দ। একেবারে ভিজে বেড়াল, আর কথাটি নাই। (পৃ. ৩৪)

এখনো যার নাক টিপলে দুধ বেরোয় সে নাকি একলা বিশ হাত কুমির মেরেছে। (পৃ. ৩৫)

একেবারে ষোলো আনা মিছে কথা নয় (পৃ. ৩৫)

একে গোঁয়ার গোবিন্দ, তাতে আবার পঞ্চায়েত (পৃ. ৩৬)

সে এসে হাজির হওয়ামাত্র তার উপরে ঝাল ঝাড়তে শুরু করল। (পৃ. ৩৭)

ফকির এসেছে তো আমার মাথা কিনে নিয়েছে। (পৃ. ৪০)

হামদু মিয়া তারস্বরে বলে উঠল, তোমাকে কে ফোঁপর দালালি করতে বলেছে? (পৃ. ৪৩)

বলি বুদ্ধির ঢেঁকি, যদি হাটে কিছু না-ই হবে তবে এমন গোমড়া মুখ কেন? কে তোর পাকা দানে মই দিয়েছে রে? (পৃ. ৫১)

তার দেখবার লোক কে? কবরমুখো বাহাত্তুরে এক বুড়ো আর নাক টিপলে দুধ বেরোয় এমন এক ছুঁড়ি। (পৃ. ৭৯)

মালেকের টিটকারিকে থোড়াই কেয়ার করে কুলসুম। (পৃ. ৮২)

কুলসুম গলা চড়িয়ে বলল, এবার চাচার কাছে তো ননীর পুতুল, ফুঁ দিলে গলে যায়। (পৃ. ৮৯)

এক ছিলুম তামাক আর দু'গণ্ডা বিড়ি খরচ করতে পারলে বাঘের দুধেরও হদিস মিলে যাবে। (পৃ. ৩৮)

নায়েব মশায় উত্তর দিলেন, গরিবের আবার ঘোড়া রোগ কেন? (পৃ. ৯২)

মেয়েমানুষ অল্প বুদ্ধি আর বেটাছেলেরা বুঝি এক-একজন বুদ্ধির ঢেঁকি? (পৃ. ৯৩)

কুলসুমের ভীষণ রাগ হলো, ভাবল বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। (পৃ. ৯৮)

বসিরের একটা কিছু হ'লে মালেকের সম্পত্তি বারোভূতে লুটে খাবে। (পৃ. ১০২)

সে কথা কুলসুম বোঝে না, আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেতে চায়। (পৃ. ১১৭)

তুমি যে বিসমিল্লায় গলদ রেখেছ, তা কে জানে! (পৃ. ১১৯)

তোমাকে বাহাত্তুরে ধরেছে, তা নইলে দিনরাত কুলসুম কুলসুম করে মাথার পোকা খসিয়ে দিতে না। (পৃ. ১৫২)

লোকে আমাদের মানিকজোড় বলে ঠাট্টা করত (পৃ. ১৮৪)

মামী যেন আকাশ থেকে পড়ল (পৃ. ১৮৫)

দেখতে দেখতে রটে গেল যে আমি গোল্লায় গেছি। (পৃ. ১৮৮)

এ উপন্যাসে পদ্মাসংলগ্ন চরাঞ্চলের কৃষিজীবী প্রান্তিক মুসলমান সমাজের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ও লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিস্তৃত পরিসরে শিল্পরূপ পেয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রামীণ লোকসমাজভুক্ত মানুষেরা জন্মভূমি ও পরিবার ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমায় দুমুঠো খেয়েপড়ে বেঁচে থাকার তাগিদে। প্রকৃতির ওপর একান্ত নির্ভরশীলতাবশত তারা জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হলেও তা সর্বদাই বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতায় জর্জরিত। পদ্মার তীরে তারা বসতি গড়ে তোলে, ফসল ফলায়, নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তাদের জীবন ও জীবিকা প্রকৃতির দাপটে বারবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তবু জীবনসংগ্রামী মানুষেরা স্বীয় স্বপ্ন ও প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে নির্দ্বিধ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তারা অবিরাম লড়াই চালিয়ে যায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেখানে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব বিলীন হলেও তাদের সামষ্টিক জীবনপ্রবাহ নিরন্তর চলতে থাকে। এরই সঙ্গে যুক্ত থাকে ঐতিহ্যবাহী লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, যা তাদের সামূহিক বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ, নৈতিকতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এর উৎসে রয়েছে পূর্বসূরীদের অনুসৃত বিবিধ লৌকিক আচার-আচরণ, ঐতিহ্যগত পরম্পরা ও প্রকৃতিসম্পৃক্ত জীবিকা নির্বাহগত অভিজ্ঞতার নির্যাস। পদ্মাতীরবর্তী লোকগোষ্ঠীর জীবনচর্যা ও সাংস্কৃতিক চালচিত্র উপস্থাপনে এ উপন্যাস শিল্পনৈপুণ্যের দাবিদার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) বাংলা সাহিত্যের সেসব বিরলপ্রজ লেখকদের একজন, যাঁরা স্বল্পায়ুর জীবনে গুটিকয়েক লেখা দিয়েই নিজের নাম কালের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করতে সমর্থ হয়েছেন। নিজে মালো পরিবারের সন্তান বিধায় বর্ণহিন্দু সমাজের সম্যক অবস্থাকে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাযোগে তিনি গভীরভাবে অবলোকনই করেছেন। পাশাপাশি প্রতিবেশী মুসলমানদের সঙ্গে তাদের প্রাত্যহিক জীবনপ্রণালিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ এবং উপন্যাসের আদলে শিল্পসম্মতভাবে রূপায়ণে তাঁর একাগ্রচিত্ত সাধনার দৃষ্টান্ত বিরলই বটে। কবিতা দিয়ে লেখনী শুরু হলেও এরপর গল্প ও প্রবন্ধে অভিনিবেশ দান, বিদেশী লেখকের উপন্যাস অনুবাদ করা,[২১] সাংবাদিকতা প্রভৃতিতে সম্পৃক্ত থাকলেও [২২] তিনি যে একজন জাত ঔপন্যাসিক, তা বুঝতে বোদ্ধা পাঠকের পক্ষে wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসটি পাঠের অভিজ্ঞতাই[২৩] যথেষ্ট। উপন্যাসটি লেখকের মৃত্যুর পর পুঁথিঘর প্রকাশনী থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জীবদ্দশায় মোহাম্মদ আকরাম খাঁ-র 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ই এটি সেখানে কিস্তিতে কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল। এ সম্পর্কে অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন– " 'মোহাম্মদী-তে তিতাসের ভাগ ছিল এরকম : 'দুই নদী', 'রামধনু' ও 'মহাযুদ্ধের সূচনা'। 'দুই নদী' বেরিয়েছে ১৮শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা অর্থাৎ শ্রাবণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ৪২৬ পৃ. থেকে ৪৩৫ পৃ.। ভাদ্র সংখ্যা ৪৯৫ পৃ. থেকে 'রামধনু' অংশ এবং 'মহাযুদ্ধের সূচনা' শুরু হয় পৌষ, ১৩৫২ সংখ্যার ১৭৭ পৃ. থেকে। প্রত্যেক সংখ্যার শেষে 'ক্রমশ' লেখা। মাঘ ১৩৫২ সংখ্যার ২৬৪ পৃ.-র পরেও 'ক্রমশ' লেখা থাকায় মনে হয় পাণ্ডুলিপি অদ্বৈত মোহাম্মদী-তে জমা দিয়ে রেখেছিলেন।" [২৪] হরিশংকর জলদাস এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, শ্রাবণ ১৩৫২ থেকে মাঘ ১৩৫২ – সময়সীমার মধ্যে সাত সংখ্যায় উপন্যাসটি 'মোহাম্মদী'-তে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের জুলাই-আগস্ট থেকে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উপন্যাসটির আদিরূপ প্রকাশিত হয়। 'মোহাম্মদী'-তে সপ্তম কিস্তি প্রকাশের পরও লেখা ছিল – 'ক্রমশঃ'।[২৫] ১৯৩৪ সালে অদ্বৈত কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র যখন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র মতিউল ইসলামের একখানি কাব্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পান। কবি পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে মতামত জানতে চেয়েছেন অদ্বৈতের কাছে। ৩০.০৬.৩৪ তারিখে লেখা এক পত্রে অদ্বৈত কবি মতিউল ইসলামকে বলেন, ' ... নিরাশ হইবেন না, অনবরত লিখিতে থাকুন, ... সাধনা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে নাই। আর সাধনা যাহা করিবেন নীরবে নীরবেই করিবেন। আগুন কখনো ছাই-ঢাকা থাকে না।' এ অভিমত থেকে আমরা লেখক অদ্বৈতের শিল্পীমানসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি, যা তাঁর লেখনীতে বরাবর ছাপ ফেলেছে।[২৬]

wZZvm GKwU b‘xi bvg

অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) wZZvm GKwU b‘xi bvg (১৯৫৬) নদীভিত্তিক বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ অবস্থানে উত্তীর্ণ। তিতাসপারের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি অদ্বৈতের অকুণ্ঠ অনুরাগ[২৭], মালো সম্প্রদায়ের একজন হয়েই তাদের জীবনসংগ্রাম ও অস্তিত্বসংকটকে অনুধাবনের আন্তরিকতা,[২৮] সর্বোপরি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাদের জন্ম থেকে মৃত্যুর অনিঃশেষ চালচিত্রকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে শিল্পভাষ্যে রূপদানের সামর্থ্য উপর্যুক্ত দাবির সহায়ক সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, শিক্ষাহীনতা প্রভৃতির সমন্বিত অভিঘাতের পাশাপাশি প্রকৃতিনির্ভর জীবিকা অবলম্বনের বাধ্যবাধকতা মালো সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে আদ্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রেণিবিভক্ত বাঙালি সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে অবনমিত এ লোকগোষ্ঠীর প্রবঞ্চিত, বিড়ম্বিত জীবনধারার রূপায়ণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর সামগ্রিক, পক্ষপাতহীন। সেকারণেই শত অভাব-অনটন আর উদরপূর্তির লড়াইয়ের প্রতিবেদনেও তিনি অন্বেষণ করেন তাদের সামাজিক পরিচয় ও সংকটের অভিন্ন উৎসমূলে। সেটি নিঃসন্দেহে তাদের বহুবর্ণিল, বহুস্তরিক সাংস্কৃতিক জীবন। বহুকাল ধরে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে নিত্যদিনের যাপিত জীবনে অনুসরণ ও প্রতিপালনে তারা অত্যন্ত সচেতন, একনিষ্ঠ। এর সাক্ষ্য রয়েছে উপন্যাসভুক্ত কুশীলবদের আচার-আচরণে, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ও মেলামেশায় জীবিকানির্বাহপ্রণালিতে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারিবারিক অনুশাসনে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনে, ভাবনা ও অন্তর্বাস্তবতার সম্মিলনে গড়ে ওঠা লোকজসমষ্টিচেতনার বিস্তৃত পরিমণ্ডলে। তিতাসপারের লোকগোষ্ঠী হিসেবে শুধু মালো সম্প্রদায়ের চালচিত্র উপস্থাপনেই তিনি লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এর পাশাপাশি তাদের প্রতিবেশী এবং নিত্যদিনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের সঙ্গী ভূমিনির্ভর মুসলমান কৃষকসমাজের বৃত্তান্তও সমান্তরালভাবে এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত ক্যানভাসে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ, অখণ্ডিত বয়ানের এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলা উপন্যাসে নিঃসন্দেহে বিরল, অভূতপূর্ব। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের রূপায়ণ ঘটেছে। এসব উপাদানের সমাবেশে তিতাসপাড়ের লোকসমাজের পূর্ণাঙ্গ চালচিত্র অসামান্য ভাষ্যরূপ পেয়েছে এ উপন্যাসে। আমরা তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের লোকজীবন ও লোকমানসের স্বরূপ অনুধাবনে এসব উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারি।

১. লোকবিশ্বাস-- তিতাসপাড়ের মালো ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস প্রচলিত। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এসব বিশ্বাস বহুলাংশেই যুক্তিহীন, কাল্পনিক ধারণাপ্রসূত ও বাস্তবতাবিবর্জিত। কিন্তু অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিয়তিবাদী এবং প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য লোকসমাজের বাসিন্দাদের নিকট এসব বিশ্বাস মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। কেননা, ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যার অপেক্ষাকৃত সরল এবং নিজস্ব প্রয়াস সংহত সমাজের সাধারণ প্রবণতা। এতে তাদের নিজস্ব চিন্তা এবং কল্পনার সামর্থ্যও প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া এসব বিশ্বাস প্রায়শই পূর্বসূরীদের নিকট থেকে অর্জিত বলে তা মান্য করার ঝোঁকও তাদের মধ্যে প্রবল। এ উপন্যাসেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। যেমন 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ নৌকায় চড়ে মেঘনার বড় গাঙ সংলগ্ন শুকদেবপুর গ্রামের উজানিনগর খলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। একপর্যায়ে নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে বৈঠা বাইতে গিয়ে অল্পবয়সী সুবল কিছুটা ভীত হলে কিশোর তাকে সাহস জোগায়, 'না সুবলা, ডরাইস না। গাঙের ডর মাইঝ গাঙে না, গাঙের বিপদ পারের কাছে। বা'র গাঙে মা গঙ্গা থাকে, বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে'[২৯] (পৃ. ৪১৮)। বলাবাহুল্য, এ লোকবিশ্বাস কিশোরের ব্যক্তিগত ধারণাপ্রসূত নয়। পরিবার ও সমাজের বাসিন্দাদের কাছ থেকে শোনা বিশ্বাসকে সেও প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর সংকটকালীন মুহূর্তে অবলম্বন করতে চায় প্রতিকূলতা অতিক্রমের তাগিদে। কেননা, সেও ভীত হয়েছিল অকূলবিস্তারী মেঘনার প্রবল স্রোতে নৌকা চালাতে গিয়ে। সে জানে, নদীতে যাত্রাকালে অনেকেই ডুবে মারা যায়।

অর্থাৎ মা গঙ্গার কৃপায় সকলে বিপদের মুহূর্তে রক্ষা পায় না। তবু, ব্যক্তিগত সংকট মোকাবেলার জন্য এ ধরনের বিশ্বাসের ওপর ভরসা করা লোকসমাজের বাসিন্দাদের স্বভাবেরই অংশ। আবার বাঁশিরাম মোড়ল তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের একপর্যায়ে সে কিশোরদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিচয় জানতে চায়। কিশোর জানায়, তারা কৃষ্ণের অনুসারী। একথা শুনে বাঁশিরাম জানায়, স্বয়ং কৃষ্ণই তাদের মিলিয়ে দিয়েছে। কেননা, বাঁশিরামও একই সম্প্রদায়ভুক্ত। এভাবেই লোকবিশ্বাসের ভিত্তি জনমনে বিস্তৃত হয়। কাকতালীয়ভাবে মিলে যাওয়া ঘটনাকেও লোকবিশ্বাস হিসেবে বিবেচনা লোকমানুষের বিশেষ প্রবণতা। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মেয়েদের মধ্যে এমন ধারণা প্রচলিত যে, 'রামের হাতের ধেনু, লক্ষ্মণের হাতের ছিলা, যেইখানের ধেনু সেইখানে গিয়া মিলা' –ছড়াটি আবৃত্তি করলে রঙধনু আকাশে মিলিয়ে যায়। সেকারণেই ছোটবেলায় বনমালী উদয়তারাকে নতুন কাচের চুরি কিনে দিলে সে তা পরিধান করে এ ছড়াটি আবৃত্তি করত। বাসন্তীর কাছ থেকে অনন্ত মালো লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। মৃত মানুষের বিদেহী আত্মা যে প্রিয়জনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, এমনকি ছলে-বলে ক্ষতি করতে চায়, অনন্ত এ বিষয়ে তার কাছ থেকে ধারণা পায়।

> মা যদি মরিয়া যায়, তবে সে মা আর মা থাকে না, শত্তুর হইয়া যায়। মরিয়া যেখানে চলিয়া গিয়াছে, ছেলেকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য সবসময়েই তার লক্ষ্য থাকে। অন্তত শ্রাদ্ধশান্তি না হওয়া পর্যন্ত একমাস তো খুব ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হয়। তার আত্মা তখন ছেলের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কি না। একা পাইলে, কিংবা আঁধারে, কি বট বা হিজল গাছের তলায় পাইলে, কিংবা নদীর পারে পাইলে, কাছে কেউ না থাকিলে লইয়া যায়। নিয়া মারিয়া ফেলে। (পৃ. ৪৯২)

অনন্তের ধারণা, তার মৃত মা কাক হয়ে তাকে দেখতে আসে। অন্য কাকের সঙ্গে সেও আসে খাবার খেতে। কিন্তু যারা মারা যায়, তারা জীবিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। অনন্ত তার মাকে দেখলে কথা বলতে চাইবে বলেই তার মা উড়ে চলে যায়, এ ধরনের শিশুতোষ রূপকথাও তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে বাসন্তীর নিকট থেকে শোনা গালগল্পের কারণে। পাশাপাশি 'লোকে তেপথা পথে রোগীকে্লান করায়, ফুল দিয়া রাখে। যে পা দিবে সেই মরিবে' (পৃ. ৪৯৪)। লোকসমাজে এ ধরনের বিশ্বাসও যে প্রচলিত, তা লক্ষণীয় বাসন্তীর মার ক্ষুব্ধ মনোভঙ্গিতে। পরের ছেলে অনন্তকে লালন-পালন করতে বাসন্তীর যে আগ্রহ, তা তার পছন্দ নয়। নিজের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে একজন বাড়তি মানুষ থাকলে তার খরচ ও ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করতে বাসন্তীর বাপের পরিশ্রম বহুলাংশে বেড়ে যায়। সেকারণেই বাসন্তীর বৃদ্ধ বাবা-মা অনন্তকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে চায়। অনন্তের অমঙ্গল প্রত্যাশায় বাসন্তীর মা চায়, সে যেন একদিন ভুলবশত তেপথা পথে যায় এবং তার বাড়িতে আশ্রয় নিতে না পারে। লোকবিশ্বাসের অন্যতম মাধ্যম হলো স্বপ্ন। অবচেতনলোকে সঞ্চিত বিচিত্র বিশ্বাস ও ঘটনা স্বপ্নে রূপক-প্রতীকী তাৎপর্যে আভাসিত হয়। 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে তিতাস নদী শুকিয়ে যাবার পরিণতিতে এর তীরে বসবাসরত মালোদের অস্তিত্বসংকটের ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে রাধাচরণ মালোর জবানিতে– 'দেখলাম স্বপ্ন, তিতাস শুখাইয়া গেছে। এই স্বপ্ন কি মিছা হইতে পারে। দেখলাম গাঙে বিশ-হাতি বাঁশ ডুবাইয়া তলা ছোঁয়া যায় না, সেই গাঙের মাঝখান দিয়া ছোট একটা মানুষ হাঁইট্যা চলছে। যে যে জায়গা দিয়া সে গেছে, একটু পরেই দেখলাম সেই সগল জায়গায় আর জল নাই; শুকনা। ঠনঠন করতাছে। বুকটা ছাৎ কইরা উঠল। হাত পাও কাঁপতে লাগল। নাওয়ে আমি একলা। এমুন ডর করতে লাগল যে একবার চিৎকার দিয়া উঠলাম' (পৃ. ৫৫২)। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চর সম্পর্কে ধারণা লাভের পরিণতিতে জীবিকা বিঘ্নিত হবার বিপন্নতাবোধই তাকে তাড়িত করেছে, যা এ স্বপ্নদৃশ্যে রূপায়িত।

২. লোকসংস্কার–– এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের হিন্দু মালো ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। কিছু সংস্কারের সঙ্গে লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নিবিড় সংযোগ রয়েছে। যেমন – 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে ডাকাত আক্রমণের পর অনন্তের মা নদীতে লাফিয়ে আত্মরক্ষা করলেও আকস্মিকভাবে আরেক অচেনা নারীর মৃতদেহ নৌকার কাছে দেখে তিলক 'রাম' নাম সম্বোধন করে। তেমনিভাবে 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে রাধাচরণ মালো তিতাস নদী শুকিয়ে যাবার দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত অবস্থায় তিনবার 'রাম'

নাম উচ্চারণ করে ভয় কাটায়। গোকর্ণঘাট গ্রামে যাত্রাকালে অনন্তর মা গৌরাঙ্গের ভিটাসংলগ্ন তুলসী গাছকে প্রণাম করে। আবার নৌকায় উঠে সে নৌকাকেও প্রণাম করলে তার ছেলে অনন্তও মায়ের অনুসরণে একই আচরণ করে। গৌরাঙ্গ 'গঙ্গা'র নাম স্মরণ করে লগি ঠেলে নৌযাত্রা করে। কিশোর ও সুবলকে নিয়ে প্রবাসে যাত্রাকালে তিলকচাঁদ পাঁচপীর বদরের ধ্বনি দিয়ে নৌকার লগি চালায়। হিন্দু মালোদেরও মুসলমান পীরের নাম স্মরণের প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করায় একের বিশ্বাস-সংস্কার-অভ্যাস ও রীতিনীতি অন্যকেও প্রভাবিত করেছে, যার অন্তরালবর্তী উদ্দেশ্য হলো যে কোনোভাবেই হোক, কাজে সফল হওয়া এবং সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া। কোনো কাজ শুরু করার আগে নিজ ধর্মের বিশেষ ভাবমূর্তিসম্পন্ন কারো নাম স্মরণও লোকসংস্কারের অন্তর্গত। এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ জোবেদ আলীর তিন ছেলে নদীর ওপারের চরে আলু রোপণ করে। তারা নদীপথে গন্তব্যে পৌঁছতে 'আলী'র নাম স্মরণ করে নদীতে নৌকা ভাসায়। আবার তাদের বাড়ির দুই বাঁধা কামলা করমালী ও বন্দেআলী 'আল্লা আল্লা মোমিন মোমিন' উচ্চারণপূর্বক গৃহপালিত গরুগুলোকে সাঁতার কাটিয়ে নদী পার করিয়ে চরে আবাদের কাজে লাগায়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে বিবৃত গৌরাঙ্গসুন্দরের আচরণে। সে নদীতে নৌকা ভাসানোর সময় 'গঙ্গা মা'-র নাম স্মরণ করে। নদীপথে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষার তাড়নাবশত স্বীয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এ ধরনের লোকসংস্কারের প্রচলন ঘটে। হিন্দু বিবাহিত নারীর ধর্মীয় লোকসংস্কার মান্য করার বিধান হিসেবে হাতে শাখা, কপালে সিঁদুর পরিধানের অনুশাসন রয়েছে। বিধবা হলে এ বেশ ও রঙিন শাড়ি ছেড়ে তাকে আজীবন সাদা শাড়ি পরতে হয়। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, অনন্তের মা শ্বশুরবাড়ি আসার পথে ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হলে নদীতে লাফিয়ে আত্মরক্ষা করে। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ তাকে উদ্ধার করে নিজেদের পরিবারে আশ্রয় দেয়। কিন্তু সেই নারীর বৃত্তান্ত শুনে গৌরাঙ্গ তার পরনের বেশ ছাড়িয়ে বিধবা নারীর আভরণ পরায়। কারণ, ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন শাস্ত্রে মহাপাপ হিসেবে বিবেচিত। তাই গৌরাঙ্গ এ অভিযোগে অভিযুক্ত হতে অসম্মত। ধর্মীয় অনুশাসন লোকসমাজে কতটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ, এ ঘটনা এরই সাক্ষ্যবহ। আবার, 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সংসারের কাজ করতে গিয়ে অসতর্কতাবশত হাতে পরিহিত কয়েকটি চুড়ি ভেঙে যাওয়ায় রমুর মা খুশি উদ্বিগ্ন হয়। কারণ তার শ্বশুর কাদির মিয়া ব্যাপারটি জানলে নির্ঘাত তিরস্কার করবে । আর বাঙালি গ্রামীণ মুসলমান সমাজেও গৃহবধূর হাত খালি রাখা নিষিদ্ধ। সম্ভবত প্রতিবেশী হিন্দু নারীদের হাতে শাখা পরার বাধ্যতামূলক নির্দেশ এভাবেই মুসলমান সমাজে সম্প্রসারিত হয়েছে। গৃহবধূর হাত, নাক গলা ও কানে সাধ্যমত অলংকার পরিধানের সংস্কারও এভাবেই বোধহয় প্রচলিত হয়েছে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে পিঠা বানানোর আয়োজনে বাসন্তী খোলায় বানানো প্রথম পিঠাটি রাধামাধবকে পরিবেশনের জন্য রেখে দেয়। নজর লাগা বা অপদৃষ্টি, কুদৃষ্টি সংক্রান্ত লোকসংস্কারও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। কারো প্রলুব্ধকর দৃষ্টির জন্য ক্ষতি বা অমঙ্গলের আশঙ্কা থেকে এ ধরনের সংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে নববিবাহিত কিশোর তার স্ত্রীর প্রেমে বিমুগ্ধ বলেই বাড়ি ফেরার পথে নৌকায় তাকে বারবার দেখতে চায়। কিন্তু নদীপথে ডাকাতের আক্রমণের আশঙ্কাবশত তিলকচাঁদ কিশোরের স্ত্রীকে নৌকারা পাটাতনে লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করে। সে কিশোরকে সতর্ক করে, 'নাওয়ের ডরার ভিতরে নজর লাগাইও না কিন্তুক' (পৃ. ৪৩৬)। লোকসমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পরিবারের বয়স্ক ও মান্য ব্যক্তিদের নাম ধরে সম্বোধন না করা, কারো মৃত্যু ঘটলে সরাসরি না বলে ভিন্নভাবে বিষয়টির উপস্থাপন এসবই লোকসংস্কারের অন্তর্গত। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে অনন্তের মায়ের বাড়িতে আগত প্রতিবেশী বর্ষীয়সী নারীরা আলাপকালে একজন পান খেতে খেতে জানায়, সে খুব বেশি বটপাতা খায়। অনন্তের মা একথা শুনে অবাক হলে আরেকজন তখন জানায় 'তাইনের শ্বশুরের নাম পাণ্ডব। পান কইতে পারে না, পানেরে কয় বটপাতা' (পৃ. ৪৪৬)। শ্বশুরকে পরিবারের গৃহকর্তা তথা বটবৃক্ষ বিবেচনায় 'বটঠাকুর' নামও বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত। তাই তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত পানের পরিবর্তে 'বট' নামকরণ থেকে এ ধরনের লোকসংস্কারের অন্তরালে সক্রিয় বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, যার অন্তরালে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যসূচক মনোভাব জোরালোভাবে

বিদ্যমান। 'রামধনু' পরিচ্ছেদেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'উদয়তারার এক ননাসের নাম ছিল মনসা। তাই মনসাপূজা বলিতে পারে না। স্বামী যেমন মান্য, স্বামীর বড় বোনও তেমনি মান্য' (পৃ. ৫১২)। একারণে সে মনসা পূজাকে 'শাওনাই পূজা' হিসেবে সম্বোধন করে। কেননা, শ্রাবণ মাসে এ পূজা করা হয়। বিধবার বেশে অনন্তর মাকে দেখে বাসন্তী অনন্তের বাবার মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে সরাসরি 'মৃত্যু' শব্দটি ব্যবহার না করে বলে, 'ছাওয়ালের বাপ কবে স্বগগে গেল দিদি' (পৃ. ৪৪৮)। এভাবে অপেক্ষাকৃত সহনীয় পর্যায়ে ব্যাপারটিকে উপস্থাপনের শিক্ষাও লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কারবিশেষ। আবার স্বামীর নাম উচ্চারণও নারীদের জন্য নিষিদ্ধ বলে সন্তানের পিতার পরিচয়ে তাকে সম্বোধনের ব্যাপারটিও এ সংলাপে প্রকাশিত। পারিবারিক সংস্কার হিসেবে পর্দাপ্রথা মান্য করাও লোকসমাজের রীতি। যেমন বহুদিন পর বনমালীর বাড়িতে তার বিবাহিত তিন বোন এবং তাদের স্বামীরা উপস্থিত হয়। ছোট বোন আসমানতারার সঙ্গে তার স্বামী থাকায় বড় বোন নয়নতারা ও মেজ বোন উদয়তারা দ্রুত ঘোমটা টেনে কপাল ঢাকে। 'কেবল আসমানতারার ঘোমটা কপালের নিচে নামিল। বড় বোনদের দুর্দশা দেখিয়া সে মৃদু হাস্য করিতে লাগিল' (পৃ. ৫০৭)। সন্ধ্যালগ্নে ঘরে প্রদীপ জ্বালাতে হয়। এসময় ঘর অন্ধকার রাখা অমঙ্গলজনক, এমন সংস্কার অত্যন্ত প্রাচীন। সেকারণে অনন্তের মা ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর প্রয়োজন না থাকলেও সংস্কারবশত তা জ্বেলে সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দেয়। এরপর বাসন্তীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিঠা বানাতে কিশোর অর্থাৎ তার পাগল স্বামীর বাড়ি যায়। অভিশাপ দেয়া লোকসমাজের প্রাচীন সংস্কারের অন্তর্গত। এ উপন্যাসে এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। দয়ালচাঁদের সঙ্গে কালোবরণের ভাইয়ের বিবাদের মূলে ছিল পুরুষতন্ত্রের ধারক তথা ছেলে সন্তান সম্পর্কিত বিরোধ। দয়ালচাঁদের মতে, অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রী মুখে জল দেয়। আর 'পুত ত কুত্তার মুত' (পৃ. ৪৬২)। কিছুদিন আগেই পুত্রের জনক হওয়া কালোচাঁদের ভাই এ মন্তব্য শুনে অবিবাহিত দয়ালচাঁদকে 'আটকুঁড়ার রাজা' সম্বোধন করে। পিতৃত্বহীনকার অপবাদে অপমানিত দয়ালচাঁদ কালোবরণের ভাইকে অভিশাপ দেয়, 'অহন থাইক্যা তোরেও যেন ঐশ্বরে আটকুড়া বানাইয়া রাখে' (পৃ. ৪৬২)। অনন্তের মার মৃত্যুর পর বাসন্তী অনন্তকে নিজের পরিবারে রাখলেও তার বৃদ্ধ বাবা-মার এতে সম্মতি ছিল না। একপর্যায়ে সে এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কলহে, এমনকি হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। অসহায় এতিম বালক অনন্তের এক্ষেত্রে কিছুই করার ছিল না। তবু রাগের বশে মায়ের সঙ্গে অশোভন আচরণের পরিণতিতে গ্লানিবশত অনন্তের প্রতি বাসন্তীর ক্রোধ তীব্র হয়ে ওঠে। তাই সে তাকে অভিশাপ দেয় 'শত্তুর, তুই বাইর হ। এই ঘরে তুই ভাত খাস ত তোর সাত গুষ্ঠির মাথা খাস। তোর লাগি আমার মায়েরে মারলাম। তুই আমার কি, ঠ্যাঙ্গের তলা, পায়ের ধূলা। যা যা অখনই যা, যমের মুখে যা। ডাকিনী যোগিনীর মুখে যা, কালীর মুখে যা। ধর্মে যেন আর তোরে ফিরাইয়া না আনে। চোখের মাথা নাকের মাথা খাইয়া যেখানে যমে টানে, সেইখানে যা। আমার সামনে আর মুখ দেখাইস না। তোর মা গেছে যে-পথে, তুইও সেই পথে যা' (পৃ. ৪৯৭)। বাসন্তীর মা অনন্তকে পরের ছেলে ভেবে নিজ সংসারে ঠাঁই দিতে চায়নি। তার প্রতি বাসন্তীর মমত্বকে আদিখ্যেতা মনে হয় বলেই সেই বৃদ্ধা অকপটে উচ্চারণ করে 'শত্তুর শত্তুর। ইটা আমার শত্তুর। অখনই মরুক। সুবচনীর পূজা করুম' (পৃ. ৪৯২)। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লেনদেন সংক্রান্ত লোকসংস্কারের পরিচয় লক্ষণীয়। কাদির ক্ষেতের আলু বিক্রির জন্য ছেলে ছাদিরকে নিয়ে হাটে আসে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ধরনের সংস্কার প্রচলিত, নিজের পণ্য বিক্রি শুরু হওয়ার আগে কাউকে ধার দিতে বা দান করতে নেই। এতে নাকি ব্যবসা মার খায়। সেদিন হাটে আগত দরিদ্র বালকদের দেখে আলু বিক্রি হওয়ার আগেই কাদির মমতাবশত কিছু কাটা আলু তাদের দিলে ছাদির ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানায়, 'না করলাম বোয়ানি, না করলাম সাইত; তুমি বাপ অখনই এইভাবে দিতে লাগছ' (পৃ. ৪৮৭)। পূর্বপুরুষের ভিটায় আমৃত্যু বসবাসের ইচ্ছা লোকসংস্কারভুক্ত হলেও এর অন্তরালে নিজ পরিবারের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ প্রবল। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ অনন্তের মায়ের সঙ্গে গোকর্ণঘাট গ্রামে নতুন করে বসবাসের ব্যাপারে যে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, এটিই এর মূল কারণ। আজন্মলালিত নাড়ির টানকে তারা অস্বীকার করতে পারে না। 'তারাও যদি এ-নদীর পারে ঘর বাঁধিত! কিন্তু জন্মভিটার এমনি তাদের মায়া, বুড়া হইয়াছে, সব ছাড়িবে, তবু জন্মভিটা ছাড়িবে না' (পৃ. ৪৪৩)। নিজের শেকড়কে কখনো ছিন্ন করতে নেই, এ ধরনের লোকসংস্কারও সম্ভবত এ ঐতিহ্যকে অনুসরণসূত্রেই উদ্ভূত। দিব্যি দেয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে

সুবলের বাবা-মায়ের কলহের বৃত্তান্তে। সুবলের বাপ গগন মালোর আর্থিক অসঙ্গতি আর পরিশ্রমবিমুখতার কারণে আজীবন পরের ওপর নির্ভরশীল হবার বাধ্যবাধকতা তার স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত বিক্ষিপ্ত করত। কারণ, 'যৌবনে সুবলের মা ভর্ৎসনা করিত, এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা। এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেন?' গগনচন্দ্র নিজে এ কাজে সফল না হলেও ছেলে সুবলের ওপর ভরসা থাকায় প্রত্যুত্তরে সে স্ত্রীকে জানাত, 'আমার সুবল আছে। আমি ত করতাম পারলাম না, নাও-জাল আমার সুবলে করব। অত ভেন্ ভেন্ করিস না' (পৃ. ৪১৫)। বশীকরণ আদিম লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত, যা বিশেষভাবে বেদে, ফকির, কবিরাজ, সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত। অর্থের বিনিময়ে সংকটাপন্ন ব্যক্তির দুর্দশা মোচনের লক্ষে জাদু, তন্ত্র-মন্ত্র-চালান, জড়িবুটি, শিকড় প্রভৃতিকে অবলম্বন গুপ্তবিদ্যার চর্চায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত কাজ। তাদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গালগল্প-কিংবদন্তি লোকসমাজে প্রচলিত। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে অনন্তের মার বাড়িতে আগত প্রতিবেশী নারীদের আলাপে এ প্রসঙ্গ বিবৃত হয়--

> একজন গল্পের ঝাঁপি খুলিল, 'আমার শ্বশুরের অনেক কিচ্ছা আছে। তুমরি খেলা জানত। উঠানের দুই দিকে দুই উস্তাদ খাড়াইত। একজন মন্ত্র পইড়া সাপ চালান দিত, আরেকজন ময়ূর চালাইয়া সেই সপ্প সংহার করত। সেই মন্ত্র জানা না থাকলে মরণ। সেইজন আবার ফিরতি আগুন চালান দিত, অন্য একজন বরুণ মন্ত্রে মেঘ নামাইয়া আগুন নিভাইত। একবার কামরূপ কামিখ্যা হইতে এক উস্তাদ বাদ্যানী আইল আমার শ্বশুরের লগে তুমরি খেলতে। পরথম খেলা হইল গাওয়ের আর এক উস্তাদের লগে। বাদ্যানী সরষার মধ্যে মন্ত্র পইড়া উস্তাদের পরাণ টিপ্যা ধরল–বাদ্যানী সরষাবান্ধা গিরোর মধ্যে টিপ দেয়, আর উস্তাদের নাক দিয়া গল গল কইরা রক্ত পড়ে। উস্তাদ এর পাল্টা মন্ত্র জানত না। আমার শ্বশুর আছিল কাছেই। বাদ্যানীরে এক ধাক্কায় মাটিতে ফালাইয়া সরষা-বন্ধন খুইল্যা উস্তাদরে বাঁচাইল। বাদ্যানী রাইগ্যা আগুন। কইল, 'বাপের বেটা হওত, এই মারলাম ভীমরুল বাণ, বাঁচাও নিজেরে।' আমার শ্বশুর ধুলাবৃষ্টি বাণে সব ভীমরুলকে কানা কইরা দিল, আর পাল্টা এমন এক বাণ মারল–বাদ্যানীর পিন্ধনের শাড়ি কেবল উপরের দিকে উঠে, কেবল উপরের দিকে উঠে। দুই হাতে যতই নীচের দিকে টাইন্যা রাখতে চায়, শাড়ি ততই ফরাত কইরা গিয়া উপরে উঠে। শেষে বাদ্যানী এক দৌড়ে তার নাওয়ের ভিতরে গিয়া লাজ বাঁচাইল। (পৃ. ৪৪৭)

৩. লোকাচার-- এ উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের লোকাচারের উল্লেখ রয়েছে। নবজাতক শিশুর জন্মগ্রহণ থেকে তাকে মুখে খাবার তুলে দেয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে, বিয়ের অনুষ্ঠানের তথা উৎসবময়তার সঙ্গে লোকাচারের সম্পৃক্ততা এতটাই অচ্ছেদ্য যে, এদেরকে পৃথক করা চলে না। তবে সামাজিক আচারের মধ্যে কুটুম্বিতা, অচেনা মানুষকে আপন করে নিতে বিভিন্ন আচার পালন এসবও এর অন্তর্গত। বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদের নিমন্ত্রণ, উত্তরায়ন সংক্রান্তি উপলক্ষে মালোপাড়ার বাসিন্দাদের একের বাড়িতে অন্যের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি কুটুম সংক্রান্ত লোকাচারের দৃষ্টান্ত। গোকর্ণঘাট গ্রামে বসবাসের জন্য এলে অনন্তের মাকে গ্রামের নারীমহলের আপন করে নেয়ার চেষ্টা, পান সুপারি খেতে চাওয়া ও ছল করে তাকে বিব্রত করার মাধ্যমে নিজেদেরই সেসব বায়না মিটিয়ে তাকে কাছে টানা প্রভৃতি ঘটনায় লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারী বয়সে বাসন্তীর পালিত মাঘমণ্ডলের অনুষ্ঠানেও লোকাচারের পরিচয় রয়েছে বালকদের খাদ্য বিতরণের বিবরণে। মায়ের মৃত্যুর পর অনন্ত যে পোশাকে সজ্জিত হয় এবং যে কৃত্য পালন করে, এতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমান্তরালে লোকাচারও উপস্থিত। হবিষ্য খাওয়া ও শ্রাদ্ধ করা এর দৃষ্টান্ত। বাসন্তী আলো চাল দিয়ে মালসায় জাউ রান্না করে। সে কলার খোল কেটে সাতটি ডিঙ্গা বানায়। এতে জাউ ও কলা সাজিয়ে তুলসীতলায় নিবেদন করা হয়।ান শেষে অনন্ত এগুলোতে জল দেয়। এরপর সে সেখান থেকে সরে গেলে কাকেরা এসে তা খায়। এসবই প্রচলিত লোকসংস্কারের অন্তর্গত। এর মূল ভিত্তি হলো মৃত ব্যক্তি কাকের রূপ ধরে এসে এসব খেয়ে যায়, এ ধরনের বিশ্বাস। তাই যেদিন কাক আসে না, সেদিন অনন্তকেই ডোঙা হাতে নিয়ে কাকদের ডাকতে হয়। এক মাস ধরে এ লোকাচার পালন করা হয়। এর আগে মৃত অনন্তের মার পারলৌকিক কল্যাণার্থেও শ্রাদ্ধ করা হয়। এতেও লৌকিক ধর্মাচারের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুট হয়েছে--

> শ্রাদ্ধের দিন অনেক নারী দেখিতে আসিল। সেও আসিল। নাপিত আসিয়া অনন্তকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেল। অনন্ত কতকগুলি খড়ের উপর শুইত, সেই খড়গুলি, হাতের আধছেঁড়া নিত্যসঙ্গী কুশাসনখানা, কাঁধের ও কটিদেশের মাঠা-কাপড়ের চিলতা দুইখানা সেইনারীর কথামত নদীতীরে ঘাটের একটু দূরে কাদায় পুঁতিয়া_ান করিয়া আসিল। পুরোহিত চাউলভরা পাঁচটি মালসাতে মন্ত্র পড়িয়া অনন্তর মাতৃশ্রাদ্ধ সমাধান করিত। ... লম্বা একটা খোলে ভাতব্যঞ্জন সাজাইয়া সুবলার বউ বলিল, 'রাঁড়িরে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আর ত কোন দিন খাইতে আইব না। ... খোলের এককোণে একটু পান সুপারি, একটু তামাক টিকাও দেওয়া হইল। ... অনন্ত ভাত ব্যঞ্জন ভর্তি খোলটা হাতে করিয়া নদীর পারের দিকে চলিল, সঙ্গে চলিল সেই স্ত্রীলোকটি। সে নির্দেশ দিল, 'না-জল না-শুক্না, এমুন জায়াগত রাইখ্যা পাছ ফিরা আইয়া পড়, আর পিছনের দিকে চাইস না। ' (৪৯৪)

কিশোর ও তার হবু স্ত্রীর প্রণয় বাস্তবায়িত হয় পরিবার কর্তৃক বিয়ে প্রদানের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার মাধ্যমে। বাঁশিরাম মোড়লের স্ত্রীর মধ্যস্থতায় এ কাজ সম্পন্ন হয়। মোড়লের আদেশে কিশোর তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রণাম জানালে তাকে একটি ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। 'সেখানে নতুন একটা শাড়ি পরিয়া, পানের রসে ঠোঁট রাঙা করিয়া, এবং গালে-মুখে তেলের ছোপ লইয়া সেই মেয়েটা বারবার লাজে রাঙা হইয়া উঠিতেছে' (পৃ. ৪৩৪) ।এরপর মোড়লের স্ত্রী কিশোরের হাতে ফুলের মালা দিয়ে সেটি তার স্ত্রীর গলায় পরানোর আহ্বান জানায়। মালা বদল শেষ হলে সে তাদের ঐ ঘরে রেখে বাইরে থেকে শিকল বদ্ধ করে। এসব লোকাচারের পরিণতিতে কিশোরকে জানানো হয়, 'শাস্ত্রমতে বিয়া কইর দেশে গিয়া' (পৃ. ৪৩৪)। পরদিন কিশোরের শাশুড়ি তাকে দেখতে আসে। এক্ষেত্রে প্রচলিত লোকসংস্কার হলো, দম্পতির মালা বদল হবার পর বিয়ের অনুষ্ঠান পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবার আগ পর্যন্ত তারা দেখা করলে অমঙ্গল হয়। একারণে কিশোরের সঙ্গে তার স্ত্রীর মালা বদল হবার পরদিন তার শাশুড়ি বাঁশিরাম মোড়লের স্ত্রীকে নিষেধ করেছিল তাদের দেখা করাতে।

৪. লোকসাহিত্য-- তিতাসপাড়ের মালোদের লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এ উপন্যাসের আদ্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনেই শুধু নয়, পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের অংশ হিসেবেও লোকসাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা, মালোদের সংগ্রামশীল জীবনবাস্তবতা আর তাদের অনুসৃত লোকসংস্কৃতি – এ দুইয়ের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লোকপুরাণ, প্রবাদ, ধাঁধা, রূপকথা, ছড়া এবং লোকসঙ্গীতের অজস্র উল্লেখ তাদের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও উপকরণ। নিচে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো--

৪.১ লোকপুরাণ-- এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে লোকপুরাণের[৩০] বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিবৃত। তিতাসপাড়ের গোকর্ণ গ্রামের সনাতন ধর্মাবলম্বী মালোদের প্রাত্যহিক জীবনে লোকপুরাণের প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য উপস্থিতি লক্ষণীয়। নিছক ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষালাভের উৎস হিসেবেই এর ভূমিকা মালোদের নিকট সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবিকা নির্বাহ, প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের সঙ্গে ওঠাবসা- আলাপচারিতা, সঙ্গীত-পূজা-পার্বণ, ব্রতকথা, পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস ও সম্ভাষণ, প্রকৃতিনির্ভর দিনযাপনে অর্জিত অভিজ্ঞতা, নর-নারীর আন্তঃসম্পর্ক অর্থাৎ তাদের সামষ্টিক জীবনপ্রবাহে এর অবারিত ও নিরঙ্কুশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথাগত শাস্ত্রীয় রীতির পরিবর্তে লোকসমাজের একান্ত নিজস্ব ধর্মবোধ ও উপলব্ধি লোকপুরাণে অকৃত্রিমভাবে ফুটে ওঠে। কেননা, লোকমানুষেরা নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির যে দোলাচলে বিচরণ করে, এর সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীদের একাত্ম করতে বরাবর সচেষ্ট। এ উপন্যাসের 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, শুকদেবপুর গ্রামে বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ। বলিষ্ঠ, বয়স্ক ও সুদৃঢ় চেহারার মোড়লের পাশে তার তরুণী স্ত্রীকে দেখে কিশোর ভেবেছিল, সে যেন ছেলেবেলায় ivgvqY, gnvfviZ-এর গল্পে শোনা হনুমান, ভীম প্রমুখ বীরদের এতদিনে দেখছে। একপর্যায়ে তার ঘোমটাটানা স্ত্রীকে চকিতে দেখে কিশোরের মনে পড়ে ভৈরবকায় মহাদেবের পাশে উপবিষ্ট বালিকা-বধূ গৌরীর কথা। এভাবেই তার কল্পনায় শ্রুত লোকপুরাণ বাস্তবের পটভূমিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে অন্তর্লোকে সৃষ্টি করে বিশ্বাস ও সমীহবোধ। দরিদ্রের সংসারে

এলোমেলো, দীনভাব লক্ষ করে এক পর্যায়ে সে অকপটে মোড়লকে জানায়– 'তোমার দিকে চাইয়া আমার শিবঠাকুরের কথা মনে পড়ে। তোমার অত নামডাক, কিন্তু বাড়িঘরের ছিরি নাই। ... আমার মনে পড়ে যে শিবের কথা সে-শিব বুড়া। সকলের দরবারে তার নামডাক। কিন্তু ঘরে তার দৈন্য দশা।' ... শিশুর মত বাধিত হইয়া মোড়ল বলিল, 'তুমি আমারে শিব ঠাকুর বানাইলা। না জাল্লা, তুমি আমারে বুড়া শিব বানাইলা, আমার গৌরী বড় ভাল, তারে আবার নাচাইও না। আর আমরা ত শিবমন্ত্রী না, আমরা কিষ্ণমন্ত্রী' (পৃ. ৪২৩)। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে ভারতের বাড়িতে গ্রামের মোড়ল ও গণ্যমানদের উপস্থিতিতে গ্রামবাসী সমবেত হলে সেখানে জমিদারের খাজনা পরিশোধ নিয়ে দয়ালচাঁদের সঙ্গে বাদানুবাদ ঘটে কৃষ্ণচন্দ্র ও রামপ্রসাদের। দয়ালচাঁদকে কলহ থেকে বিরত রাখতে সেখানে উপস্থিত মাতবরদের একজন যে উদ্াহরণ দেয়, তাতে নিহিত রয়েছে i\gvqY-এর অনুষঙ্গ– 'দশের বৈঠকে লক্ষ্মণ-বর্জনের পালাখান তুমি কইর না বেপারী। ব্রজলীলার দিনে কুরুক্ষেত্তর ঘটাইয়া লাভ না।' ... 'কোন ত্রেতাযুগে কি কইরা রাখ্‌ছ অখন তারে ধুইয়া জল খাও' (পৃ. ৪৫২)। এ পরিচ্ছেদেই শ্যামসুন্দর বেপারীর বিয়ের বর্ণনা অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। তার বালক মনস্তত্ত্বে এ অনুষ্ঠান পৌরাণিক ভাবাবহে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্যামসুন্দরের মতো বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে নিতান্তই এক বালিকার বিয়ে তার অন্তর্লোকে রূপকথায় বর্ণিত দৈত্য কর্তৃক রাজকন্যার বন্দি হবার কাহিনিকে মনে করিয়ে দেয়। পাশাপাশি বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তিতে নাপিত কর্তৃক পঠিত হয়। 'গুরুবচন' তার কাছে শিব-গৌরীর বিয়ের বৃত্তান্তকেই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে বর্ষামুখর দিনের মেঘলা আকাশে আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত রামধনু দেখে বনমালীর স্মৃতিচারণায় ভেসে ওঠে বোন উদয়তারার শৈশবস্মৃতি। বনমালীর চেতনালোকে রাম-সীতার পৌরাণিক প্রসঙ্গ জেগে ওঠে তার কথা ভেবে। কেননা, বহুদিন হয়ে গেছে, নাইয়রে সে বনমালীর কাছে আসেনি। বনমালী শ্রুত 'সীতার বনবাস' পালায় এর যে লৌকিক ভাষ্যরূপ বিবৃত, সেখানে দশমাথা কুড়ি হাতের রাক্ষস রাবণকেও রামের ধনু হাতে তুলে নিতে মুখে রক্ত ওঠাবার মতো কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত রাম সেটি হাতে তুলে নেয়। 'হরধনু না কি বলিয়াছিল–তাই রামের হাতের ধনু। কিন্তু সীতা সে ধনু রোজই বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডানহাতে তলাকার জায়গাটুকু লেপিয়া পুছিয়া শুদ্ধ করিয়া দিত। তারপর সীতার বিবাহ হইয়া গেল। রাম তাকে নিয়া অযোধ্যাতে আসিল। তারপর সীতা আর বাপের বাড়ি আসে না' (পৃ. ৪৮৮)। লোকপুরাণাশ্রিত পালায় সীতার সঙ্গে উদয়তারার ভাবসাদৃশ্যে এভাবে বনমালীর চেতনালোকে বাস্তবের সমান্তরালে পৌরাণিক জগতের ভাবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই সে উদয়তারাকে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবেই তার ভাবনায় লোকপুরাণ বাস্তব আর কল্পনার যোগসাজষে নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। এ পরিচ্ছেদেই উদয়তারার আচরণে অনন্ত যেন প্রত্যক্ষ করে লোকপুরাণের কোনো শক্তিময়ী দেবীকে, যার কথা সে মায়ের কাছে গল্পে শুনেছিল। উদয়তারা যখন প্রবল ঝড়কে প্রতিহত করতে বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ে, অনন্ত তার উচ্চারিত সংলাপ শুনে সমীহ প্রকাশে বাধ্য হয়– 'দোহাই রামের দোহাই লক্ষ্মণের, দোহাই বাণ রাজার; দোহাই ত্রিশ কোটি দেবতার' (পৃ. ৪৯৫)। আবার, অনন্তকে আশ্রয় দিতে গিয়ে বাবা-মার কাছে অপমানিত বাসন্তী ক্ষিপ্ত হয়ে যে ভাষায় তাকে অভিশাপ দেয়, এতেও লোকপুরাণের অশুভ-অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে যম, ডাকিনী, যোগিনী ও কালীর প্রতি আহ্বান ঘোষিত। বাসন্তীর আশ্রয় হারিয়ে উদয়তারার কাছ থেকে অনন্ত মায়ের ¯েœহ পেয়েছিল। সেই নারীর অন্তর্লোকে সঞ্চিত লৌকিক ধর্মভাবনা ও দেবদেবী-অবতারের প্রসঙ্গ অনন্তের সরল-অপরিণত মনে অব্যাখ্যেয় নানা ভাবনার জন্ম দেয়। বিশ্বলোক, গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে লোকসমাজের বাসিন্দাদের বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকলেও তারা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ধারণা, লোককাহিনী, লোকপুরাণ ও কিংবদন্তিতে উপজীব্য বৃত্তান্তের আলোকে এর নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। এর পেছনেও একধরনের যুক্তি কার্যকর। হয়ত তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য নয়, কিন্তু লোকসমাজের বাসিন্দাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবার জন্য কল্পনা আর বাস্তব মিলিয়েই তারা নিজেদের মতো করে বিশেষ ধারণা তৈরি ও যুগযুগ ধরে তা লালন করে চলে। অনন্ত উদয়তারার কাছ থেকে শোনে, আকাশে যে তারাগুলো বিদ্যমান, সেগুলো তোলা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। স্বর্গে দেবতারা থাকে, তারাই আকাশে তারা ছিটিয়ে দিয়েছে – প্রচলিত এ লোকবিশ্বাস সম্পর্কে অনন্তের মনে সন্দেহ জাগলে সে এ ব্যাপারে

নিশ্চিন্ত হতে চায় উদয়তারার কাছে–‘স্বর্গে যে দেবতারা থাকে। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী, শিবঠাকুর, তারাও কি তুলিতে পারে না! ... তারা ইচ্ছা করিলে তুলিতে পারে, কিন্তু তোলে না। তারাই ছিটাইয়া দিয়াছে, তারাই তুলিবে? রোজ রাতে ছিটাইয়া দিয়া তারা মানুষেরে ডাকিয়া বলিয়া দেয়, দিলাম ছিটাইয়া যদি কেউ পার তুলিয়া নাও। কিন্তু তুলিবার লোক নাই। এখন দেবতার পূজা হইবে কি দিয়া! শেষে তারা মাটিতে নকল ফুল ফুটাইয়া দিল। সে-ফুল রোজ ফুটে, লোকে রোজ তুলিয়া নিয়া পূজা করে। যে-সব ফুল তোলা হয় না, তারা ঝরিয়া পড়িয়া যায়। বাসি হইয়া থাকে না। বাসি ফুলে পূজা হইতে পারে না’ (পৃ. ৫০৪)। উদয়তারা জানায়, সাধারণ মানুষের পক্ষে দেবতাদের আহ্বান বোঝা সম্ভব নয়। শুধু সাধু-মহাজনরাই তা বুঝতে পারে। তারা পূজা-অর্চনা, তপস্যা-ধ্যানের মধ্য দিয়ে দেবতাদের সঙ্গে আলাপ করে। ধর্ম সম্পর্কে এ ধরনের লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলেও রয়েছে বহুকাল ধরে প্রচলিত লোকপুরাণের প্রভাব। সেকারণে উদয়তারার আলাপে gbmvcivY-এর বেহুলা লখিন্দরের বৃত্তান্ত গুরুত্ব পায়। তবে স্মর্তব্য, শাস্ত্রীয় পুরাণের ক্রমবিবর্তিত রূপটিই কালিক প্রবাহে রূপান্তরিত হয়ে লোকসমাজে গৃহীত হয়। এতে লোকমানুষের চিন্তা-চেতনা, ভাবনা, বিশ্বাস ও কল্পনা সংযোজিত হয়, আবার বাহুল্য বিবেচনায় নানা প্রসঙ্গ ও ঘটনা কখনো পরিবর্জিত, কখনো পরিবর্তিত রূপে মূল পুরাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেকারণেই উদয়তারার বয়ানে এ কাহিনীতে বেহুলার নাম ‘ভেলইয়া’, লখিন্দর সম্বোধিত হয় ‘লখাই পণ্ডিত’। অনুধাবন করা চলে, বহুযুগ ধরে লোকসমাজে এসব পুরাণ প্রচলিত হতে হতে সময়ের বিবর্তনে বিশেষ লৌকিক আবহ, মেজাজ ও ভঙ্গিকে আয়ত্ত করেছে। উদয়তারার কাছ থেকে অনন্ত শোনে মৃত লখাইকে প্রাণ বাজি নিয়ে স্বর্গে গিয়ে ভেলইয়ার দেবতাদের তুষ্ট করে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার দুঃসাহসী অভিযানের কথা। শুধু তাই নয়, স্বর্গে বেহুলার যাত্রার পাশাপাশি উদয়তারা অনন্তকে, হিমালয় পর্বত বা ‘হিমাইল রাজা’র লোকপুরাণ শোনায়, যেখান থেকে হেঁটে যুধিষ্ঠির স্বর্গে তথা দেবতাদের আবাসস্থলে যায়। অনন্তের বালক মনেও কল্পনা জেগে ওঠে। সে বড় হয়ে হেঁটে হেঁটে তিতাসের তীর ধরে হিমাইল রাজার দেশ থেকে স্বর্গে যাবার ইচ্ছা পোষণ করে। সময়ের আবর্তনে পরিণত বয়সে বিদ্যার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে তার শহরে যাত্রার প্রচেষ্টায় যে পরিবর্তিত জীবনের প্রতি আসক্তি ও সচেতন আগ্রহ, তা বিবেচনায় রাখলে বলা চলে, সে-ও গ্রামীণ জীবন ছেড়ে শহুরে বাবু সংস্কৃতির ধারক-বাহক তথা মালোদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় দেবতাসুলভ খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। ফলে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তার সামাজিক পরিচয় ও মানসিকতাগত দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণ-যশোদার পৌরাণিক বৃত্তান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। উদয়তারার বাপের বাড়িতে এসে সে পরিচিত হয় জনৈক বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে। সাধুর বয়ানে ফুটে ওঠে বালগোপাল কৃষ্ণের নির্মল, ¯িœগ্ধ অভিব্যক্তির সঙ্গে অনন্তের সাদৃশ্য কল্পনাযোগে পৌরাণিককালের যশোদাজননীর সঙ্গে অম্ল-মধুর সম্পর্কের মানবিক আখ্যান। আবার অনন্তের মায়ের সঙ্গে কিশোরের এবং অনন্তের সঙ্গে অনন্তবালার আন্তঃসম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়েও অবলম্বিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী। এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে gbmvg½j-এর পুরাণ মালোদের প্রাত্যহিক জীবনে বিশিষ্ট পরিচয়ে উদ্ভাসিত। বলাবাহুল্য, শাস্ত্রীয় ধর্মাচার ও পূজার রীতি, পুরাণ পাঠের আদর্শের সঙ্গে মালোদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি-সংস্কার মিলেমিশে এতে সৃষ্টি হয়েছে স্বতন্ত্র লৌকিক পরিমণ্ডল। শ্রাবণ মাসে cÙvcivY পাঠ শেষে বেহুলার প্রসঙ্গকে স্মরণে রেখে জালাবিয়ার আয়োজন করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সেই লোকপুরাণের আখ্যানকে গল্পের আকারে জনসমাজে পরিবেশনের বৃত্তান্ত। ‘শ্রাবণের শেষদিন পর্যন্ত পদ্মাপুরাণ পড়া হয়, কিন্তু পুঁথি সমাপ্ত হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা বলিয়া শেষ দুটি পরিচ্ছেদ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা পড়া হয় মনসা পূজার পরের দিন সকালে, সেদিন মালোরা জাল বাহিতে যায় না। খুব করিয়া পদ্মাপুরাণ গায় আর বোল করতাল বাজায়। ‘দুরঙা প্রজাপতি’ পরিচ্ছেদে অনন্তের বিদ্যার্জনের যে বৃত্তান্ত রূপায়িত, এর সঙ্গে লোকপুরাণের সংযোগ রয়েছে। সে অল্প স্বল্প পড়তে জানলেও নিয়মিত বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ালেখার সুযোগ তার ছিল না। তার মুখে ivgvqY পাঠ শুনে গ্রামের নাপিতানী তাকে উদ্বুদ্ধ করে কুমিল্লা শহরে গিয়ে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে শিক্ষিত হতে। মালোদের লোকসঙ্গীতেও লোকপুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। তারা বংশপরম্পরায় এসব গানের চর্চা অব্যাহত রাখে। মোহন ও বাসন্তী মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে লোকসঙ্গীতের দ্বারস্থ হয়েছিল। রাধা-কৃষ্ণের

প্রণয়কথায় নর-নারীর সম্পর্কে বিদ্যমান আবেগানুভব, প্রেম-বিরহকাতরতা এসব গানের মধ্য দিয়ে লোকপুরাণের ভাবপরিমণ্ডলকেই মালোদের সমষ্টিচেতনায় ফিরিয়ে আনে। এর সঙ্গে যুক্ত লৌকিক দর্শনের সংযোগও মালোদের ভাবনায় বিশেষ আবেদন সঞ্চার করে––

> ‘কানাইরে বেলা হইল দুই রে প’র। প্রাণটি কাঁপে রাধার থর থর রে, মথুরায় বিকি যায় রে বইয়া রে সুন্দর কানাইরে।’ এই রাধা বৃন্দাবনের প্রেমাভিসারিকা রাধা নহে। এ রাধা জন্ম-মৃত্যু দুই তীরের পারাপারশীল মানব আত্মা। কংসনদী অর্থাৎ যমুনা নদী এখানে জন্মমৃত্যুর সীমারেখা। আত্মা তার খেলাঘর ছাড়িয়া উজান ঠেলিয়া চলিয়াছে। ... কানাইবেশী ভূমাই তাহাকে পার করিয়া চালাইয়া নিবার মালিক, আত্মা নিষ্কলুষ হইলে কি হইবে, তার পার্থিব দধিভাণ্ডের প্রতি মায়া জাগে। কিন্তু নারায়ণ তাকে ঐহিক সবকিছুর কলঙ্ক-স্পর্শ থেকে নির্মুক্ত করিয়া, পরিশুদ্ধ করিয়া লইকে চান, নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে এই জন্যে তিনি দধিরভাণ্ড স্পর্শ করিয়া সব দধি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সকল মালো এই সব অর্থ না বুঝিলেও, গানের সুরে সুদূরের কি কথা যেন ভাসিয়া আসিয়া তাদের জীবনে এক জীবনাতীতের বাণী শুনাইয়া গেল।’ (পৃ. ৫৪৮)

৪.২ লোককথা ও রূপকথার অনুষঙ্গ

> মাইয়া লোকে করতাল বাজাইয়া যা নাচে। নাচে ত না, যেন পরীর মত নিত্য করে। (পৃ. ৪২৮)

> ছেলেটা ঘরের এক কোণে মলাটের বাক্সে তার রূপকথার রাজা সাজাইতেছে। (পৃ. ৪৪১)

> একটি নেংটি ইঁদুর বুঝি ধানক্ষেতের প্যাঁচ হইতে বাহির হইয়া রূপকথার দেশে দেশে এক নদীর পারে গিয়া দেখিল সামনে রূপার নদী। গলানো উপছানো রূপার নদী। সে তো নদী নয়, হাজার বছরের না-শোনা গল্প দুই তীরের বাঁধনে পড়িয়া একদিকে বহিয়া চলিয়াছে। (পৃ. ৪৪২)

> অনন্ত উহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এরা বুঝি রূপকথার দেশের। এদের মনে মনে অনেক গল্প জমা আছে, বলিলে কোনোদিন ফুরাইবে না। (পৃ. ৪৪৭)

> রামপ্রসাদ ... নদীর দিকে চলিল। তার চোখে আজ রোদের সোনা মিশিয়া চারদিক সোনাময় হইয়া গিয়াছে। আজ এরা যেন সব সোনার শিশু। সোনার খেলনা হাঁড়িকুড়ি লইয়া রূপার বালিতে ভাত চাপাইয়া চাঁদ সুরুজের দেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে। (পৃ. ৪৫৯)

> সেই ঈশ্বর মালো আর ইচ্ছারাম মালো নামে রূপকথার মানুষ দুইটা। পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিয়া, খালবিল ডিঙ্গাইয়া, কত দেশদেশান্তরের বুক চিরিয়া তারা যেন এক বোঝাই গল্প লইয়া আসিয়াছে। (পৃ. ৫২৭)

> সামনে যে টোপর মাথায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে, সে বিরাট এক দৈত্য। ছোট মেয়েটাকে তার দলের লোকেরা ধরিয়া আনিয়া তার গুহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েটা চাহিয়া দেখে চারিদিকে লোকজন, পালাইবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না। তার চেয়ে এই ভাল। আপাতত দৈত্যকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তার মাথায় ফুল ছড়াইয়া তাকে তুষ্ট রাখা চলুক। তার লোকজন অন্যমনস্ক হইলে যেই একটু ফাঁক পাওয়া যাইবে অমনি মেয়েটি এখান হইতে পলাইয়া যাইবে। কোথায় যাইবে? যেখানে তার জন্য খেলার সাথীরা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। পালাইয়া অনন্তদের বাড়িতে গিয়া উঠিলে মন্দ হয় না। মা তাকে কিছুদিন লুকাইয়া রাখিবে। দৈত্যটা তাকে পাড়াময় বৃথাই খুঁজিয়া মারিবে। পাইবে না। অবশেষে একদিন তিতাসের জলে ডুবিয়া মরিবে। (পৃ. ৪৬৪)

এ উপন্যাসে মালোসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথা ও লোককথার অনুষঙ্গের উল্লেখ লক্ষণীয়। কখনো কখনো লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের বর্ণনায় এসব প্রসঙ্গ এলেও প্রধানত বালক অনন্তের শিশুসুলভ কল্পনা ও বিস্ময় পারিপার্শ্বিক জীবন-জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার আদলে রূপকথার সঙ্গে সাদৃশ্যধর্মী বিবেচিত হয়েছে এসব দৃষ্টান্তে। শ্যামসুন্দর ব্যাপারীর বিয়ের দৃশ্য বর্ণনায় রূপকথায় শ্রুত দৈত্য ও বন্দি রাজকন্যার কাহিনীর

ভাবসাদৃশ্য কল্পনা এর প্রমাণ। সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে বালক রমুর মনোলোকে গল্পকথার বিচিত্র ভুবনের প্রতি অনন্তের বিস্ময়সূচক ভাবনা নৌকা গড়ানোর কাজে আগত দুজন মালোর উপস্থিতিসূত্রে ভাষ্যরূপ পেয়েছে।

৪.৩ প্রবাদ

আ-ঘাটাতে ঘাট হয়, আ-পথে পথ হয়, আ-কুটুমে কুটুম হয়। (পৃ. ৪৪২)

জোয়ারে বাড়ে ভাটায় কমে, জলের আবার একটা বিশ্বাস। (পৃ. ৪৫৭)

গরিবের হাতে টাকা পড়িলে উড়িবার জন্য ছটফট করে। (পৃ. ৪৬৯)

মানুষের কুটুম আসা-যাওয়ায় আর গরুর কুটুম লেহনে-পুছনে। (পৃ. ৪৭০)

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। (পৃ. ৪৮৩)

তেলে জলে ... মিশে না (পৃ. ৪৮৫)

লোকে কয়, মা মরলে বাপ তালই, ভাই বনের পশু। (পৃ. ৪৮৭)

কাজের ভাসসি নাই, খাওনের গোঁসাই। (পৃ. ৫১৪)

মানুষে কয়, মা নাই যার, ছার কপাল তার। (পৃ. ৫১৬)

তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী, ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা। (পৃ. ৫১৬)

৪.৪ ধাঁধা

পান খাও রসিক জমাই কথা কও ঠারে, পানের জন্ম অইল কোন অবতারে। যদি না কইতে পারে পানের জন্ম কথা, ছাগল হইয়া খাও শ্যাওড়াগাছের পাতা। (পৃ. ৪৪৬)

সু-ফুল ছিট্যা রইছে তুলবার লোক নাই : সু-শয্যা পইড়া রইছে, শুইবার লোক নাই (পৃ. ৫০৪)

হিজল গাছে বিজল ধরে, সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে (পৃ. ৫০৮)

পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকিমিকি করে, ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে (পৃ. ৫০৮)

আদা চাচচাক দুধের বর্ণ, এ শিলোক না ভাঙ্গাইলে বৃথা জন্ম। (পৃ. ৫০৯)

৪.৫ ছড়া

বুড়ি ছড়া কাটে– 'কাউয়ার দাদা মরল, কুলা দিয়া ঢাকল, দূর হ কাউয়া দূর!' (পৃ. ৪৪৭)

জিভে কামড় শিরে হাত কেমনে আইল জগন্নাথ? (পৃ ৪৪৮)

আমার দিদি কাটুনি সুতা কাটতে পারে। একনাল সূতায় হস্তী বান্ধা পড়ে। (পৃ. ৪৪৯)

কি গ বিন্দাবনের নারী, কোন কালোচোরা লড়দা গেছে মাইরা বাঁশের বাড়ি। (পৃ. ৪৭০)

রামের হাতের ধেনু, লক্ষণের হাতের ছিলা, যেইখানের ধনু সেইখানে গিয়া মিলা। (পৃ. ৪৮৮)

আয়, লাভে রে লাভে রে লাভে রে লাভে, আরে লাভে! আয়, দুয়ে রে দুয়ে রে দুয়ে, আরে দুয়ে! আয়, তিনে রে তিনে রে তিনে, আরে তিনে– (পৃ. ৪৯০)

অনন্তবালা, সোনার মালা, যখনই পরি তখনি ভালা। (পৃ. ৫১৮)

দম্ব দম্ব তাই তাই, ঠাকুর লইয়া পূবে যাই। (পৃ. ৫২০)

অনন্তবালা ঘরের পালা, তারে নিয়া বিষম জ্বালা। (পৃ. ৫৫৪)

জিলাপির পেঁচে পেচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠাণ্ডা লাগে জল ছাড়া। (পৃ. ৫৫৬)

যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হইতে কতক্ষণ (পৃ. ৫৫৬)

৪.৫ লোকসঙ্গীত–– এ উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীতের [৩১] উল্লেখ থেকে মালোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বকীয়তা অনুধাবন করা যায়। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের আলাপে, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, এমনকি উৎসবেও লোকসঙ্গীতের জোরালো উপস্থিতি লক্ষণীয়। শুধু মালোদের সাংস্কৃতিক বলয়ভুক্ত সঙ্গীতই নয়, পাশাপাশি তাদের প্রতিবেশী মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত জারি-সারি গানের উল্লেখও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে দেশাত্মবোধক গান, কবিগান, জারি ও সারি গান, ব্রতের গান, ভাটিয়ালি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সঙ্গীত, মুর্শিদি-বাউল গান, বারোমাসী গান, পুঁথির গান, নৌকাবাইচের গান প্রভৃতি। এসব গানে মালোদের গোষ্ঠীচেতনা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে ‘দুরঙা প্রজাপতি’ পরিচ্ছেদে, যেখানে শহুরে জাকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রা তথা বহিরাগত সংস্কৃতির আধিপত্যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিলীন হবার নির্মম বাস্তবতা দিনদিন প্রকটিত হয়। বিশেষত বাসন্তী এবং মোহন এসব ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনের মাধ্যমে নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মরীয়া ছিল। তাই তারা এসব সঙ্গীতকে আঁকড়ে ধরে যাত্রাকে প্রতিহত করতে উদ্যোগী হয়েছিল, যদিও তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কেননা, সস্তা-লঘু বিনোদনের পাশাপাশি চোখ ঝলসানো আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন ও বাদ্যযন্ত্রের প্রলুব্ধকর আহবানে সাড়া দিয়ে মালোপাড়ার অধিকাংশ নরনারী নিজেদের সংস্কৃতি তথা লোকসঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। মূলত এ ঘটনার পরিণতিতে তাদের সাংস্কৃতিক পরাভব প্রবল হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে বিধৃত কিছু উল্লেখযোগ্য লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্ত–

ব্রতের গান

‘নারীরা গীত গাহিতেছে; ‘সখী ঐ ত ফুলের পালঙ রইরেলা, কই কাঁলাচাঁদ আইলো।’

ভাটিয়ালি গান

উত্তরের জমিনেরে সোনা-বন্ধু হাল চষে,

লাঙ্গলে বাজিয়া উঠে ধুয়া।

দক্ষিণা মলয়ার বায় চান্দমুখ শুখাইয়া যায়

কার ঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া। ...

নদীর কিনার দিয়া গেল বাঁশি বাজাইয়া,

পরার পিরীতি মধু লাগে।

কু-খেনে বাড়াইলাম পা’ খেয়াঘাটে নাইরে না,

খেয়ানীরে খাইল লঙ্কার বাঘে। (পৃ. ৪১৮)

নৌকাবাইচের গান

অকাঠ মান্দাইলের নাও, ঝুনুর ঝুনুর করে নাও, জিত্যা আইলাম রে নাওয়ের গলুই পাইলাম না। ...

তারে ডাক দে, দলানের বাইর হইয়া গেল, অ দিদি, প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে।।

আমার বন্ধু খাইবে ভাত, কিন্যা আনলাম ঝাগুর মাছ গো, অ দিদি, দুধের লাগি পাঠাইয়াছি, পয়সা কি সুকি কি টেকা গো, অ দিদি প্রাণবন্ধুরে তোরা ডাক দে।।

আমার বন্ধু ঢাকা যায়, গাঙ্ পারে রান্ধিয়া খায় গো, অ দিদি, জোয়ারে ভাসাইয়া নিল হাঁড়ি, কি ঘটি, কি বাটি গো, অ দিদি প্রাণবন্ধুরে তোরা ডাক দে।। (পৃ. ৫৩৪)

বারমাসী গান

হায় হায়রে, এহিত চৈত্রি না মাসে গিরস্তে বুনে বীজ। আন গো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ। বিষ খাইয়া মইরা যামু কানবে বাম মায়। আর ত না দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই। ...

আসিল আষাঢ় মাস হায় হায়রে, এহিত আষাঢ় মাসে গাঙে নয়া পানি। যেহ সাধু পাছে গেছে সেহ আইল আগে। হাম নারীর সাধু খাইছে লঙ্কার বাঘে। ...

হায় হায়রে, এহিত পৌষ না মাসে পুষ্প অন্ধকারী। এমন সাধের যৈবন রাখিতে না পারি। কে চায় রে আড়ে আড়ে কেহ চায় রে রইয়া। কতকাল রাখিব যৈবন লোকের বৈরী হইয়া। (পৃ. ৫২১)

বাউল গান

এলাহি দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা,

শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুক্‌নায় ডুবল ভেলা।

জলের আসন বসন দেইখ্যা সারাসারি,

বালুচরে নাও ঠেকাইয়া পলাইল বেপারী। (পৃ. ৪৩৮)

পুঁথি পাঠ

হাম্মক রাজার দেশেরে–

উত্তরিল শেষে রে। (পৃ. ৪৩৮)

কেচ্ছার গান

আর দিন উঠেরে চন্দ্র পূবে আর পশ্চিমে।

আজোকা উঠ্‌ছেরে চন্দ্র শানের বান্ধান ঘাটে। (পৃ. ৪৩৮)

যাত্রাগান

চুপ চুপ চুপ লাজে সরে যারে, ধীরে ধীরে চল, সজনী লো। ধূলা দিয়ে সখী আমাদের চোখে গোপনে প্রণয় রেখেছে ঢেকে, এবার ভোমর যাবে লো ছুটে, চল, না যেতে যামিনী লো (পৃ. ৫৪৯)

৫. লোকপ্রথা-- সামাজিক বিভিন্ন রীতিনীতি-প্রথা ও মূল্যবোধ মান্য করার শর্ত লোকমানুষের আন্তঃসম্পর্কে ক্রিয়াশীল। এ উপন্যাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। নাইয়র প্রথা,[৩২] অপরিচিত কারো সঙ্গে সখিত্ব ও বন্ধুত্ব পাতানো, এমনকি গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের পালিত অনুশাসন ও সামাজিক বিধান এর অন্তর্গত। এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই নাইয়র প্রথার উল্লেখ লক্ষণীয়। এটি 'বিয়ে'-কেন্দ্রিক লোকপ্রথার দৃষ্টান্ত, যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ই পালন করে। বিয়ের পর বিবাহিত নারীরা যখন নৌকায় চড়ে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যায়, তখন নৌকার ছইয়ে থাকে কাপড়ের বেড়া। যেন পরপুরুষেরা তাকে দেখতে না পারে, সেকারণেই এ রীতি প্রচলিত। তাকে মাথায় ঘোমটা টেনে অন্যের দৃষ্টি থেকে আড়ালে নিজেকে রাখতে হয়। সঙ্গে স্বামী থাকায় তার নির্দেশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতাবশত স্বাধীনভাবে বেড়ানোর আনন্দ থেকে সে অনেকটাই বঞ্চিত হয়। 'তারা স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আর বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যায় অনেক হাসি-কান্নার ঢেউ বুকে লইয়া। যে বউ স্বামীর বাড়ি যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল' (পৃ. ৪০৩)। তাছাড়া নিজের বাপ মা ভাই বোনকে ছেড়ে আসার বেদনায় তার মন বেদনায় ভারাতুর থাকে। কেননা, শ্বশুরবাড়িতে স্বামী, দেবর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ি ও অন্য স্বজনদের মন বুঝে তাকে চলতে হয়, বিয়ের পর ধীরে ধীরে সেই অপরিচিত সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। আবার শ্বশুর বাড়ি থেকে গৃহবধূ যখন বাপের বাড়িতে যায়, তখন তার নৌকায় বেড়া থাকে না। এমনকি মাথায় ঘোমটা টানার প্রয়োজনও ফুরায়। স্বামীর বাড়ির ঘাট দৃষ্টির আড়ালে গেলে তবেই সে স্বাধীনভাবে নৌকায় চড়ে বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করে। সে মনের আনন্দে যাত্রাপথের দৃশ্যরাজি উপভোগ করতে করতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। বিয়ের পরিণতিতে নিজের বাড়ি ছেড়ে আসার যে বেদনা, এর অনেকটাই ঘুচে যায় নাইওরে বাপের বাড়ি এলে। আবার পথে যেতে যেতে অচেনা কোনো নারীকে দেখে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বা সখী সম্পর্ক পাতানোর রীতিও লোকসমাজে প্রচলিত। বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ও পেশায় কৃষক কাদির মিয়ার একমাত্র মেয়ে জমিলা নাইওরে স্বামীর বাড়ি আসার সময় হঠাৎ করেই আমিনপুর গ্রামের বনমালীর বোন উদয়তারাকে দেখে তার সঙ্গে এ ধরনের সম্পর্ক পাতানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। 'বড় ভাল লাগিয়াছে তার মানুষটাকে। প্রথম দৃষ্টিতে সে তাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সেও কি তেমনি ভালবাসে নাই? কেমন অনুরাগের ভরে চাহিয়াছিল। ... আবার যখন বাপের বাড়ি যাইব, বাপকে বলিয়া রাখিব, এই রকম ওই মেয়েটি দেখিতে ঠিক আমার মত; তার বাপকে বলিয়া দেখিও, আমার মেয়ে তোমার মেয়ের সঙ্গে সই পাতিতে চায়, তুমি রাজি আছ কিনা' (পৃ. ৪০৪)। 'দুরঙা প্রজাপতি' পরিচ্ছেদে উদয়তারা বনমালী ও অনন্ত জমিলাদের বাড়িতে আসে। তখন জমিলা উদয়তারাকে এ বৃত্তান্ত জানায়। একথা শুনে 'উদয়তারা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার জমিলা নামটা খুব ভাল লাগিল। কিন্তু সে সংসারের সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ দেখিয়া বেদনা বোধ করিল' (পৃ. ৫৪১)। প্রকৃতপক্ষে, কিছুটা অপরিণতমনস্ক হলেও জমিলার এ আকুতি অসাম্প্রদায়িক ও উদারভাবাপন্ন মানবধর্মের অন্তরঙ্গ আহ্বানকেই ধ্বনিত করে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে। শুকদেবপুর গ্রামে আসার পর জনৈক ব্যক্তি কিশোরের সঙ্গে কুটুম্বিতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সে ইতোমধ্যেই তার সম্ভাব্য স্ত্রী এবং পরবর্তীকালে সন্তানের জননী তথা অনন্তের মার প্রেমে বিমুগ্ধ ছিল। তাই জনৈক ব্যক্তির প্রস্তাবকে সে সেই নারীর প্রেমাকুতি সম্পৃক্ত ভেবে এ প্রস্তাবে প্রথমে সাড়া দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন তার ভুল ভাঙে, সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি তার বন্ধু সুবলের সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে নতুন সাজপোশাক পরিয়ে কাপড় গামছা বদল করে 'বন্ধুস্তি'-র আহ্বান জানায়। পরিবারে প্রচলিত প্রথা, রীতির দৃষ্টান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। কালোবরণের পরিবার গোকর্ণঘাট গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরিবার। আর্থিক সঙ্গতিগুণে কালোবরণ ও তার ভাইয়েরা সকলের কাছে সমীহের পাত্র হিসেবে বিবেচিত। কালোবরণের বিধবা মা সংসারের কর্ত্রী। সংসারের যে কোনো ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তার নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য তার তিন ছেলে ও তাদের স্ত্রীদের নেই। দাপুটে, ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে তার মুখের কথাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিবারে প্রচলিত। ছেলেরা ভোরে মাছ ধরতে বেরিয়ে গেলে তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করে সঙ্গে দেয়ার জন্য তাদের স্ত্রীদেরও ঘুম থেকে উঠতে হয়। এরপর গ্রামের অন্য সব নারীর আগে নদীতে গিয়ে তাদের স্নান করে আসতে হয়। তাদের পক্ষে

কালোবরণের মায়ের এ নির্দেশ অমান্য করার সুযোগ নেই। সামাজিক প্রথার অংশ হিসেবে মালোদের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান বিয়ে সম্পর্কে দুটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। মালোদের বিয়েতে যৌতুক প্রথা শুধু প্রচলিতই নয়, এর অনুসরণ রীতিমতো বাধ্যতামূলক ব্যাপার। এক্ষেত্রে কনেপক্ষকে বরপক্ষের যৌতুক দিতে হয়। বনমালী তার তিন বোন নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমানতারার বিয়েতে তিনশত টাকা করে যৌতুক নিয়েছিল বরপক্ষের কাছ থেকে। কিন্তু নিজের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তার মাথায় শোলার মুকুট ওঠেনি। এজন্য উদয়তারার অনুতাপের অন্ত ছিল না। আবার, বিয়ের পর নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে এলে গ্রামের প্রতিবেশী সম্পর্কিত নারীদের জন্য পান-বাতাসা, পানের মসলা প্রভৃতি নিয়ে আসার প্রথা মালোসমাজে প্রচলিত। নতুবা তাকে নানাভাবে নিন্দা করা হয়। এ প্রথার নাম 'জামাইঠকানো'। জনৈক জামাই কোনো উপহার না নিয়েই শ্বশুরবাড়ি আসায় গ্রামের নারীরা তাকে নিন্দাপূর্বক গান পরিবেশন করে, 'জামাই খাইতে জানে, নিতে জানে, দিতে জানে না, তারে তোমরা ভদ্র বইলো না। জামাই যদি ভদ্র হইত, বাতাসার হাঁড়ি আগে দিত' (পৃ. ৫১১-৫১২)। মালো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং সামাজিক রীতি-নীতি, বিধিনিষেধ-অনুশাসনের দৃষ্টান্ত রয়েছে এ উপন্যাসের 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে। বিশেষত অনন্তের মা ছেলেকে নিয়ে তার স্বামীর গ্রাম গোকর্ণঘাটে বসবাসের জন্য মনস্থির করলে কার পরিবারভুক্ত হয়ে সে থাকবে, এ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গ্রামের মাতবররা সভায় বসে। পাশাপাশি নিজেদের বৈষয়িক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গও এ বৈঠকে উত্থাপিত হয়, যা থেকে বোঝা যায় তাদে সামাজিক কাঠামো ও বিধিব্যবস্থার স্বরূপ। 'দশের বিচার' নামে অভিহিত বৈঠকের ঘোষণা নগরে-বাজারে আগেই প্রচারিত হয়, গ্রামবাসীর উপস্থিতির জন্য। এতদিন গ্রামের মাতবরেরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায়, এমনকি কারো কারো গ্রামে অনুপস্থিতিহেতু এ বৈঠক মুতলবি ছিল। অবশেষে সকলে গ্রামে আসায় এটি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার আগে দুটি ছেলে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নিমন্ত্রণের বার্তা জানিয়ে দেয়, 'ঠাকুর সকল, ঘরে নি আছ, আসার একখান কথা। ভারতের বাড়িতে আজ দশজনের সভা। তোমরার নিমন্ত্রণ। পান তামুক খাইবা, দশজনের দশ কথা শুনবা' (পৃ. ৪৫০)। ভারতের বাড়ির উঠানে পাল খাটানো হয়। সেখানে ভালো আসনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এবং চারপাশে গ্রামবাসীর বসবার ব্যবস্থা করা হয়। রান্না ও ধান সিদ্ধ করার জন্য উঠানের বেড়া দেয়া অংশে নারীরা বসে। গোকর্ণঘাট গ্রামের বড় মাতবর রামপ্রসাদ যে কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী। তার পরেই রয়েছে রামদয়াল, নিতাইকিশোর ও কৃষ্ণচন্দ্র। এদের 'কেউ টাকার জোরে, কেউ গায়ের জোরে, ভাইয়ের জোরে, কেউ বুদ্ধির জোরে' মাতবর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সভায় উপস্থিত সকলের জন্য পান, তামাক ও হুকার বন্দোবস্ত ছিল। বৈঠকে জমিদারের বকেয়া খাজনা শোধ করা, ভারতের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া, তামসীর বাপের বাজারের কায়েতদের সঙ্গে অতিমাত্রায় যোগাযোগ ও সমাদর করা এবং অনন্তের মার গোকর্ণঘাট গ্রামে বসবাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সমষ্টিমানুষের কল্যাণ ও বৈষয়িক প্রয়োজনে, নিত্যদিনের নানা সমস্যা মেটাতে দশের বিচারে সলাপরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এভাবেই মালো সমাজের সংঘবদ্ধতা অটুট থাকে। কিন্তু একপর্যায়ে যখন সামাজিক রীতিকে তুচ্ছ করে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের প্রতি তারা আগ্রহী হয়, তখন গোষ্ঠীগত যূথবদ্ধতায় ভাঙন ধরে এবং তা বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয় তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার অবসানে। লোন কোম্পানির নিকট থেকে গৃহীত অর্থ পরিশোধের অসামর্থ্য এবং তিতাস নদীর শুকিয়ে যাবার পাশাপাশি বহিরাগত স্থূলরুচির সংস্কৃতির প্রভাবে তারা যখন স্বীয় লোকঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারকে সম্প্রসারণে ব্যর্থ হয়। বিশেষত নাগরিক সমাজের স্থূলরুচির চিত্তবিনোদন তথা যাত্রার চটুল, অশ্লীল, রঙ্গ-ব্যঙ্গসর্বস্ব তামাসার প্রাবল্যে মালোদের নিজস্বতার পরিচয়বহ সংস্কৃতি ও স্বকীয় জীবনধারায় ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ে--

> মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। ... মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। ... আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ... যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে। (পৃ. ৫৪৫)

৬. লোকপ্রযুক্তি-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে নিত্যদিনের কাজে প্রচলিত লোকপ্রযুক্তিগত বিভিন্ন কৌশলের পরিচয় রয়েছে, যা প্রয়োগ করে কাজে সফল হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই রয়েছে বাঁশ দিয়ে তৈরি সাঁকোর প্রসঙ্গ। বর্ষার প্লাবনে নদীসংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হলে সেখানকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ফলে নদীতীরবর্তী লোকসমাজে সাঁকোই তখন হয়ে ওঠে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের অবলম্বন। লক্ষণীয়, এটি বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকপ্রযুক্তি, যার উল্লেখ Ph\vc‡'-ও রয়েছে। তেমনিভাবে মালো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে মাছচাষ সংক্রান্ত কৌশলাদি। নয়ানপুরের বোধাই মালো বড় দিঘি ইজারা নিয়ে মাছের পোনা চাষ করে। মাছের খাবার দেয়া, যত্ন নেয়া, সেগুলো বড় হলে বিক্রির বন্দোবস্ত তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অংশ। তবে এক্ষেত্রে অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় শুকদেবপুরের মোড়লের কর্মকাণ্ডে। তার মালিকানাধীন চারটি বড় বিল বর্ষাকালে পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। নদীর সঙ্গে সংযুক্ত বিধায় তখন অজস্র মাছ বিলে ভেসে আসে। পানি কমে গেলে বিলগুলিতে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা হয়। বিপুল পরিমাণ মাছ ধরতে শুধু শুকদেবপুরের মালোরাই নয়, বরং বহুদূরের গোকর্ণঘাট এবং অন্যান্য গ্রামের মানুষেরাও দীর্ঘ ছয় মাসের জন্য প্রবাসে যায়। লক্ষণীয়, এ কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি অংশগ্রহণ করে। কেননা, মাছ কাটা ও সংরক্ষণের কাজে তারাই বেশি পটু। সেকারণে তাদের সাময়িক বাসস্থানের জন্য মোড়ল চালাঘর স্থাপন করে। প্রবাসীরা সেখানে সমবেত হয়ে এ কাজে অংশ নেয়।

> কারোর সঙ্গে কারোর কোনকালে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। এখানে আসিয়া সকলে এক সংসারের লোক হইয়া গিয়াছে। এক সঙ্গে খায়, থাকে, কাজ করে। ... মেয়েরা বঁটি মেলিয়া কাতারে কাতারে বসিয়া যায়। পুরুষেরা মাছের ঝুড়ি ধরাধরি করিয়া আনিয়া তাহাদের পাশে স্তূপ করিতে থাকে। ... এতবড় মাছটাকে পলকে ঘুরাইয়া পেটে পিঠে গলায় তিন পোচ দিয়া ঘাড়ের উপর দিয়া ছুঁড়িয়া মারে, সে মাছ যথাস্থানে জড়ো হয়। আরেক দল পুরুষ সেখান হইতে নিয়া ডাঙ্গিতে তোলে শুকাইবার জন্য। দিনের পর দিন এইভাবে তিন মাস কাজ চলে। ছয় মাসের প্রবাস সারিয়া তারা যার যার দেশে পাড়ি জমায়। ইহাকে বলে 'খলা-বাওয়া।' (পৃ. ৪২৯)

কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ দুর্দিনে আর্থিক সাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে শুকদেবপুরে প্রবাসে গিয়েছিল। ধৃত মাছ শুকিয়ে শুটকি বানানোর প্রক্রিয়া লোকসমাজে প্রচলিত। মাছ রোদে শুকাতে দেয়া হলে কাক চেষ্টা করে সেটি আত্মসাৎ করতে। সেকারণে কালোর মা মাছ পাহারা দিতে চৌকি পেতে কঞ্চি নিয়ে বসে। সে কাকের কয়েকটা ছেঁড়াপালক দড়িতে বেঁধে কঞ্চির আগাতে ঝোলায়। এর ফলে কাক ভয় পেয়ে মাছ চুরি থেকে দূরে থাকে। মাছ ধরার জন্য সুতায় তৈরি জাল বানানোর প্রক্রিয়াতেও রয়েছে লোকপ্রযুক্তি। লক্ষণীয়, কিশোর ও সুবল স্কুলে পাঠগ্রহণে অমনোযোগী বলে পরিবার থেকে তাদের ওপর সুতা পাকানো ও জাল বোনার নির্দেশ আসে। তারা তিতাসের প্রশস্ত তীরে এক দৌড়ের লম্বা পথে সুতা মেলে। এরপর বাঁশের চরকিতে কাঠি লাগিয়ে দুজনে প্রবল শক্তিতে সেসব সুতা পাকাত। আবার জাল বোনার জন্য পায়ের বুড়া আঙুলে ঠেকিয়ে দুজনেই দ্রুতগতিতে তকলি চালায়। এর ফলে জালে অনেক গিঁট পড়লেও কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে যায়। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে গোকর্ণঘাট গ্রামে আগত অনন্তের মার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হয়ে ওঠে সুতা দিয়ে মাছের জাল বোনার কাজ। তার বাবা জেলে হলেও অনন্তের মা এর আগে এ কাজ করেনি। ফলে কালোর মায়ের জাল বুনবার জন্য ধারে প্রাপ্ত দশ সের সুতা নিয়ে সে দুশ্চিন্তায় পড়লে বাসন্তী তাকে প্রয়োজনীয় কৌশল শিখিয়ে দেয়। "দুপুরের পর সুবলার বউ কতকগুলি সুতা কাটার হাতিয়ার লইয়া হাজির হইল। সেগুলি মাটিতে নামাইয়া বলিল, 'এই নেও বড় টাকু, মোটা সুতার লাগি; এই নেও ছোট টাকু, চিকন সুতার। আর এই একখান পিঁড়ি দিলাম, ঘাটে গিয়া শণের লাছি এর উপরে আছড়াইয়া ধুইয়া আনবা। তারিপর রইদে শুখাইবা' " (পৃ. ৪৪৯)। অনন্তের মা তার নির্দেশ মেনে সাত দিনে চৌদ্দ গোছা সুতা তৈরি করে। এর সাতটি মোটা, অন্যগুলো চিকন সুতার। মোটা সুতা এক টাকা এবং সরু সুতা দুই টাকা সের দরে সে এসব বিক্রি করে কারবারীর কাছে। এর আরো বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে 'রামধনু' পরিচ্ছেদে। মালো নারীরা বাড়ির উঠানে সুতা পাকায়। চোঙ্গার মতো মুখাকৃতির একটি খুঁটি স্থায়ীভাবে মাটিতে পোঁতা থাকে। এর ওপর সুতা ভর্তি

চাকতি বসানো হয়। টেকোয় সুতা বেঁধে উঠানের এক কিনারা থেকে অন্য কিনারা পর্যন্ত পোঁতকে তারা বেড় দিয়ে আনে। 'তারপর ডান হাঁটুর কাপড় একটু গুটাইয়া লইয়া, নগ্ন ঊরু তুলিয়া তুলিয়া হাতের তেলোয় ঘষা মারিয়া ঊরুতে টেকো ঘুরায়। একবারের ঘুরানিতে টেকো হাজার বার ঘুরে' (পৃ. ৫০১)। দশবার টেকো ঘুরলে এক বেড়ের সুতা তৈরি হয়ে যায়। এর পর ডান হাতের তালুতে টেকোর ডাঁট বা হাতল ঘুরানো হয়। বাঁহাত রাখা হয় টেকোর ঘাড়ে। সেই নারী সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চললে পাকানো সুতা টেকোতে গুটানোর কাজও শেষ হয়ে যায়। যদিও এসব নিতান্তই পুরুষালি কাজ, কিন্তু মালো পরিবারে নারীপুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ এ কাজ করে। কারণ জেলেরা নদীতে মাছ ধরা, ভাড়ায় নৌকা বাওয়া ও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। লোকপ্রযুক্তির এ ধরনের দৃষ্টান্ত মালোদের প্রাত্যহিক জীবিকা নির্বাহের বিশেষ সহায়ক অবলম্বন। এ উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'রাঙা নাও'-য়ে নৌকাবাইচের নৌকা বানানোর বিভিন্ন পর্যায়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় প্রতীয়মান, লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রামীণ লোকসমাজে বহুলব্যবহৃত লোকযান নৌকা সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষন করেছেন। বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ কাদিরের ছেলে ছাদির নৌকাবাইচের জন্য দেড়শ হাত লম্বা লিকলিকে পাতাম নৌকা বানানোর আয়োজন করে। অনেকটা ভেলার মতো দেখতে, ওপরে ছইটানা কাঠের বিশাল টুকরা বা 'চালি'তে চড়ে দুপাশ থেকে মোটা লগি তিতাসের স্রোতে ঠেলে গাঁছের গুঁড়ি ভাসিয়ে আনে দুজন মালো। সেটি কেটেই নৌকা তৈরি হয়। পরদিন চারজন করাতি এসে তিতাসের পাড়ে একস্থানে 'আড়া' বেঁধে প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িটিকে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে করাত দিয়ে সেটিকে চিরে টুকরো টুকরো করে দুইদিনে। এরপর তিতাসের পারে স্থায়ী চালাঘর তুলে চারজন ছুতারমিস্ত্রি বাক্সভতি সরঞ্জাম নিয়ে কয়েক দিনে নৌকার কাঠামো গড়ে তোলে। এসব কর্মকাণ্ড ছাদিরের বালকপুত্র রমুকে যেন ব্যাখ্যাতীত এক জগতে আহ্বান জানায়। তাই সে অধিকাংশ সময় নৌকা গড়ার কাজ দেখায় মনোনিবেশ করে--

> আগাপাছার 'ছেউ' ঠিক করিয়া যেদিন তাহারা নাও 'টাঙ্গিল', সেদিন রমুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নৌকার মেরুদণ্ড মাত্র পত্তন করা হইয়াছে। সেই মেরুদণ্ডের ডগা আড় হইয়া আকাশ ঠেলিয়া কতখানি যে উপরে উঠিয়াছে, রমুর ক্ষুদ্র দৃষ্টি তার কি পরিমাপ করিবে। কিন্তু মিস্ত্রী দুইজন অত উঁচুতে গিয়া বসিয়াও কেমন হাতুড়ি পিটাইতেছে, আর পেরেক ঠুকিতেছে।
>
> মাপজোখ লইয়া এই মেরুদণ্ড ঠিক করিতে কয়েকদিন লাগিল। তারপর পুরাদমে শুরু হইল কাজ। এক একটা তক্তায় কাদা মাখাইয়া আগুনে পোড়াইয়া টান দিয়া মোড়ন দিয়া বাঁকাইয়া, খাঁক কাটিয়া, জোড়া দেয়, একদিকে সামান্য একটু বসিলে, আরেকদিক ঘুরাইয়া খাঁজের উপর বসাইয়া হাতুড়ি দিয়া পিটিতে থাকে ... দেখিতে দেখিতে নৌকার অস্থিমাংস জোড়া লাগিতে লাগিল। (প. ৫২৮)

নৌকা তৈরি হবার পর সেটি কাত করে তলার অংশ পালিশ করে ছুতারমিস্ত্রিরা কাজের যবনিকা টানে। এরপর বহুদিনের পরিশ্রমের ফসল তথা নৌকাটিকে ঘিরে তাদের মন আনন্দে, তৃপ্তিতে ভরে ওঠে--

> এমন একখান চিজ তারা গড়িয়া দিল যে চিজ অনেক-অনেকদিন পর্যন্ত জলের উপর ভাসিবে- কত লোক তাতে চড়িবে, বসিবে, নদী পার হইবে-এক দেশ হইতে আরেক দেশে যাইবে-কত জায়গায় দৌড়াইবে, বখশিস পাইবে-আর একজনার হাতের স্বাক্ষর সগর্বে বহন করিতে থাকিবে। কেউ জানিবে না, কারা গড়িয়াছিল, কাদের বিন্দু বিন্দু শ্রম ও বুদ্ধির সঞ্চয় সম্বল করিয়া ধীরে ধীরে সে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নাও? সে কি ভুলিয়া যাইবে এই চারজনকে? কিছুতেই না। (পৃ. ৫৩২)

সেকারণেই তারা আত্মগর্বে বলীয়ান হয়ে লোকজন জড়ো করে নাচসহ গান গায় হাততালি বাজিয়ে 'শুনরে নগইরা লোক, নাও গড়াইতে কত সুখ' (পৃ. ৫৩২)। এরপর তিনজন কারিগর নৌকাটিতে বিভিন্ন রঙে লতা, পাতা, সাপ, ময়ূর ও একজোড়া পালোয়ান আঁকে। এভাবেই নৌকাবাইচের নৌকা তৈরি হলে ছাদির সেটি জলে ভাসায়। এ উপলক্ষে সে পাড়ার লোকজনকে ডেকে এনে এক হাঁড়ি বাতাসাও বিতরণ করে। এরপর তারা নৌকা জলে নামায় এ বুলি আউড়ে," 'জোর আছে? সকলে বলিল, আছে। আবার সকলে বলিল, 'যে জোর থুইয়া জোর না করে তার জোড় খায় মরা কাষ্ঠে রে-এ-এ' " (পৃ. ৫৩২)। তারপর তারা একত্রে সেই নৌকাকে তিতাসের বুকে ভাসায়।

৭. লোকউৎসব-- এ উপন্যাসে তিতাসপারের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন উৎসবের বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। এসব উৎসবের বেশির ভাগই ধর্মীয়, তবে সামাজিক উৎসব এবং চিত্ত বিনোদনের আয়োজনও এর অন্তর্গত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এসব উৎসব পালন করে। মালোপাড়ায় পালিত হয় বাসন্তী উৎসব। এর সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, বরং কৃষিভিত্তিক সমাজে ঋতু পরিক্রমায় বসন্তের আবির্ভাবকে বরণ করে নিতে এটি পালিত হয়। আরো রয়েছে উত্তরায়ন সংক্রান্তি। তবে ধর্মনির্ভর উৎসবের সংখ্যাই বেশি। এর মধ্যে রয়েছে মাঘ মণ্ডলের ব্রত, দোল পূর্ণিমার উৎসব, হোলি উৎসব, কালীপূজা, মনসা পূজা, যাত্রার আয়োজন, মনসার ভাসানগত পুঁথি পাঠ, প্রভৃতি, যা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত। বিয়ে ও অন্নপ্রাশনও ধর্মীয় উৎসবের অন্তর্গত। মুসলমান সমাজে প্রচলিত উৎসবের মধ্যে রয়েছে ঈদ ও মোহররম। প্রকৃতিতে নানা রঙের সমাহার নিত্যকাজে ব্যস্ত মালোদের মনকেও রঙিন করে তোলে। তারা বসন্তকালে নতুন রঙে রাঙায় মাছ ধরার নৌকাগুলিকে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মঙ্গলাচার। গৃহবধূরা ছোট থালায় আবির ও ধানদূর্বা নেয়। নৌকার মালিক সেই থালা থেকে আবির নিয়ে গলুইতে মেখে দেয়। সে ধানদূর্বাগুলি আঙুলে তুলে ভক্তিসহকারে আবির মাখানো স্থানের ওপর রাখে। এ সময়ে তার স্ত্রী জোকার দেয়। এভাবেই বসন্ত বন্দনার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যকে স্থায়ী করবার আকাঙ্ক্ষাবশত তারা এ উৎসব পালন করে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি মালোদের পালিত সাংস্কৃতিক উৎসব। পৌষ মাসের শেষদিন এটি যাপিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রাধান্য পায় বিবিধ খাবারের বর্ণাঢ্য আয়োজন। নতুন ধান উঠলে তা ভাঙিয়ে চালের গুড়ি তৈরি করা হয় পিঠা এবং অন্যান্য খাদ্য তৈরির জন্য। একারণে উৎসবের অন্তত পাঁচ-ছয়দিন আগেই চাল গুড়ো করে রোদে শুকিয়ে রাখা হয়। নতুন চালের মুড়ি ভেজে ছাতুও বানানো হয়। উৎসবের আগের রাতে মেয়েরা পিঠা বানিয়ে রাখে। এসব পিঠা বিভিন্ন ধরনের এবং বৈচিত্র্যময় স্বাদে ভরপুর। উৎসবের দিন সকালে মালোরা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকে। তবে কেউ কেউ গেলেও মাছ না ধরেই ফিরে আসে উৎসবে অংশ নিতে। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণ সফল করে। সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে গ্রামে কীর্তন শুরু হয়। সারা গ্রাম ঘুরে নাচ-গানে তারা মুখরিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় হরির লুট। এতে কদমা ও বাতাসা বিতরণ ও তা ধরার অলিখিত প্রতিযোগিতা চলে । সাহাপাড়া. যোগীপাড়া ও মালোপাড়া থেকে কীর্তনের পৃথক দল বের হলেও মালোরাই এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ করে। নাচগান, হৈহুল্লোড়, ঠাট্টা, তামাসার মধ্য দিয়ে জমজমাটভাবে কীর্তন পালিত হয়। নারীরা পরিজনের জন্য বিভিন্ন মুখরোচক, সুস্বাদু খাবার রান্না করে। এ উপন্যাসে ধর্মীয় লোকউৎসবের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে মাঘমণ্ডলের ব্রত। মাঘমাসের শেষদিন মালোপাড়ার কুমারী নারীরা মাঘমণ্ডলের পূজা ও ব্রত পালন করে। এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিয়ের উপযুক্ত পাত্র পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এ উৎসবের আচার হিসেবে তারা মাঘ মাসে প্রতিদিন তিতাস নদীতে প্রাতঃস্নান করে, এরপর বাড়ি ফিরে ভাঁটফুল ও দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়ে সিঁড়িতে পূজা নিবেদন করে, সেইসঙ্গে এ মন্ত্র পাঠ করে-' লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটার জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল' (পৃ. ৪১৪)। ব্রতের আচার হিসেবে তরুণ কলাগাছের এক হাত পরিমাণ লম্বা করে কাটা ফালি ও বাঁশের সরু শলা বিদ্ধ করে ভিত তৈরি করা হয়। এর ওপর গড়ে তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি ঘর। মাঘ মাসের শেষদিন ব্রত পরিসমাপ্ত হলে ব্রতিনীরা সেই চৌয়ারি মাথায় নিয়ে তিতাসের জলে ভাসায়, এর সঙ্গে ঢোল-কাসি বাজে, নারীরা গীত পরিবেশন করে। উঠানে আঁকা আলপনার মাঝে একটি চৌকিতে বসে বাসন্তী ছাতা মাথায় দিয়ে সেটি ধীরে ধীরে ঘুরাতে থাকে। তার মা এর ওপর খই ও নাড়ু ঢেলে দেয়, যা ধরতে পাড়ার ছেলেরা রীতিমতো কাড়াকাড়ি করে। নারীদের কণ্ঠে গীত হয় 'সখি ঐ তো ফুলের পালঙ রইলো, কই কাঁলাচাঁদ আইলো' (পৃ. ৪১৪)। এর সঙ্গে দুখাই বাদ্যকর ঢোল ও তার ছেলে কাসি বাজায়। এ উৎসব বহুদিন ধরে চলে আসছে। এরপর কুমারী মালো নারীরা গীত পরিবেশন করতে করতেই তাদের চৌয়ারিগুলো মাথায় নিয়ে তিতাসের জলে ভাসায়। মালো ছেলেরা সেগুলো ধরার জন্য হট্টগোল করে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে দোল পূর্ণিমার উৎসবের বিবরণ রয়েছে। কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ প্রবাসে গিয়ে শুকদেবপুর গ্রামে আায়োজিত এ উৎসবে অংশ নেয়। চৈত্রের মাঝামাঝি এটি পালিত হয়। এর অংশ হিসেবে গ্রামের মোড়ল সকাল থেকে রাত অবধি হোলি, গানবাজনা,

রঙ খেলা ও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে। রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার স্মৃতিময়তা এ উৎসবের প্রচলন ঘটিয়েছে– 'কে কাকে নিয়া কখন দুলিয়াছে। সেই যে দোলা দিয়াছিল তারা তাদের দোলনায়, স্মৃতির অতলে তারই ঢেউ। অমর হইয়া লাগিয়া গিয়াছে গগনে পবনে বনে বনে, মানুষের মনে মনে। মানুষ নিজেকে নিজে রাঙায়। তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রিয়জনকে রাঙায়, তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না– তখন তারা আত্মপর বিচার না করিয়া সকলকেই রাঙাইয়া আপন করিয়া তুলিতে চায়' (পৃ. ৪২৭-৪২৮)। হোলি খেলার বিশেষ আকর্ষণ হলো রঙ ছিটানোর উল্লাস। এজন্য ঝুড়িভর্তি আবির এনে গামলায় গোলা হয়। এছাড়া চারকোণা চার-তাকের একটি মাটির সিঁড়ির ওপর দুই পাশে পোঁতা দুটি বাঁশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটি সালু কাপড়ে কৃষ্ণের পুতুল তৈরি করে ঝোলানো হয়। দর্শনার্থীরা এসে এটিতে আবির মাখিয়ে দোল দিয়ে যায়। এরপর গ্রামের বাসিন্দারা একে অন্যকে আবির মাখিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে ভিত্তি করেই কিশোরের সঙ্গে উপন্যাসে নামহীন তার স্ত্রীর পরিচয় এবং পরিণয় ঘটে। হোলি খেলা শেষ হলে গানের আসর বসে। সেখানে একজনকে হোলির রাজা সাজানো হয়। 'তার গলায় কলাগাছের খোলের মালা, কলাপাতার টোপর, পরনে ছেঁড়া ধুতি, গায়ে ছেঁড়া ফতুয়া। মাঝে মাঝে উঠিয়া কোমর বাঁকাইয়া নাচে, আবার বসিয়া বিরাম নেয়। বুড়া মানুষ' (পৃ. ৪৩০)। যেহেতু রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কে কেন্দ্র করে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন, তাই গানের আসরে নারীরা রাধার এবং পুরুষেরা কৃষ্ণের দলে বিভক্ত হয়ে গান করে। দোল-মণ্ডলের চারদিকে সমবেত গ্রামবাসী করতাল নিয়ে বাজনা বাজিয়ে নাচগানসহযোগে এ অনুষ্ঠানকে জমজমাট করে তোলে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদেও এ উৎসবের বৃত্তান্ত রয়েছে। গোকর্ণঘাট গ্রামে আড়ম্বরের সঙ্গে এ উৎসব পালিত হয়।ান সেরে বাসন্তী, অনন্ত ও অনন্তর মা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আবির দেয়ার পরিকল্পনা করে। একারণে বাসন্তী অনন্তকে দিয়ে বাজার থেকে আবির কিনে আনায়। অপ্রকৃতিস্থ কিশোর আকস্মিকভাবে সামনে এসে আবির মাখার বায়না করায় অনন্তের মা তাকে আবির মেখে দেয়। অনন্ত দেখে, 'রূপকথার রাজ্যের লোকের মত পাগলটার চেহারা। আর তার মা ওটাকে আবির মাখাইতেছে। পাগলটা আবিরের থালা ফেলিয়া দিয়াছে' (পৃ. ৪৭৫)। এটিই এ দুই নরনারীর জীবনের ট্র্যাজেডি যে, চার বছর আগের দোলপূর্ণিমায় যারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, সময়ের ব্যবধানে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মানবজীবন এতটাই নাটকীয়তায় ভরা যে, দীর্ঘদিন পর সেই দম্পতিই আবার একে অন্যকে আবিরে রঞ্জিত করে। তবে উন্মাদ কিশোর জানে না, সেই নারী নিতান্তই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা তাদের পুনর্মিলনের সুযোগ করে দেয়। বাসন্তী শেষ পর্যন্ত রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আবির দিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে এবং অনন্তকেই পরম আদরে আবিরে রঞ্জিত করে। সন্তানহীন-অকালেই বিধবা এ নারীর মাতৃত্বের আকুলতা সমগ্র উপন্যাসেই অনন্তকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

মালোদের ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার সংযোগ। নতুন শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে বিবিধ লোকাচার সম্পর্কিত উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে কালোবরণের পরিবারে আগত নবজাতকদের ভূমিষ্ঠ হওয়া সংক্রান্ত অন্নপ্রাশন এরই দৃষ্টান্ত। কালোবরণের বাবা মৃত। তার মা সংসারের কর্ত্রী। কালোবরণ ও তার দুই ভাই বিবাহিত। আর্থিকভাবে যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন বিধায় এ পরিবারে অন্নপ্রাশন জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে মেজবৌ সন্তান প্রসব করে। তখন কালোর মা অনন্তের মাকে আহ্বান জানায়, 'জোকার' দিয়ে যেতে। শুধু সেই নয়, প্রতিবেশী অন্য নারীরাও কালোবরণের বাড়িতে এসেছিল নতুন শিশুকে এভাবে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে। লোকসমাজে এ নিয়ম মান্য, 'ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়' (পৃ. ৪৬১)। সকলেই পরম মমতা ও ভালোবাসায় তাকে কাছে টেনে নেয়। নবজাতক জন্মের ষষ্ঠ দিনে পালিত হয় দোয়াত কলম দেয়ার অনুষ্ঠান। 'এই রাতে চিত্রগুপ্ত আসিয়া সে দোয়াত হইতে কালি তুলিয়া সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখিয়া দিয়া যায় তার ভাগ্যলিপি' (পৃ. ৪৬১)। ধর্মীয় লোকসংস্কার ও লোকাচার মিলে মিশে মালোদের চেতনালোককে কীভাবে প্রভাবিত করে, তা এসব বৃত্তান্ত থেকে অনুধাবন করা চলে। অষ্টম দিনে পালিত হয় আট-কলাই। এদিন পাড়ার ছেলেদের খই, ভাজা-কলাই,

বাতাসা প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। তের দিন পর অশৌচ অন্ত পালিত হয়। এদিন নাপিত বাড়ি এসে কালাবরণ ও তার ভাইদের দাড়ি কামিয়ে যায়। মন্ত্রপাঠ শেষে পুরোহিত উঠে গেলে উঠানে চাটাই পেতে এতে ধান ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর নতুন শাড়ি পরে, নতুন রঙিন রুমালে জড়িয়ে মেজবৌ ছেলেকে কোলে নিয়ে চাটাইয়ের ওপর রাখা ধানগুলো সারা চাটাইয়ে ছড়িয়ে দেয়। তখন সেখানে সমবেত নারীরা কৃষ্ণের পৌরাণিক আখ্যানসম্পৃক্ত সঙ্গীত পরিবেশন করে। এরপর পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়ে নবজাতকের মুখে প্রসাদ দেবার শুভ দিন জেনে নেয়। এ অনুষ্ঠানের নামই অন্নপ্রাশন। সেদিন বাড়িতে নিমন্ত্রিত নারীরা শিশুকে নিয়ে গীত গায়। এদিন অনুষ্ঠান শুরু হয় স্নানযাত্রার মধ্য দিয়ে। ছেলে কোলে নেয়া ছোট বৌকে মাঝে রেখে নারীরা গান গাইতে গাইতে তিতাসের তীরে যায়। ‘ছোট বউ তিতাসকে নিজে তিনবার প্রণাম করিল, ছেলেকেও তিনবার প্রণাম করাইল। এক অঞ্জলি জল লইয়া তার মাথা ধোয়াইল। শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া নদীকে আবার নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল’ (পৃ. ৪৬২)। যে নদীকে ঘিরে মালোদের জীবিকা নির্বাহ হয়, এর সঙ্গে মানবপ্রজন্মের গ্রন্থনা এভাবেই বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার, আচার ও উৎসবের আবরণে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে খানিকটা সময় বিশ্রামশেষে তারা বাড়ি থেকে রান্নাকরা একথালা পরমান্ন নিয়ে রাধামাধবের মন্দিরে যায়। সেটিকে ঠাকুরের নিকট নিবেদন করে প্রসাদ বিতরণ করা হয় শুভার্থীদের মাঝে। ছোট বৌ তার ছেলের মুখে সেই প্রসাদ দেয়ার পর বাকিটা অন্য ছেলেদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এভাবেই শিশুর জন্মদান এবং তাকে মালোসমাজে সাদরে গ্রহণ করে নেয়ার ব্যাপারটি এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অন্নপ্রাশনের পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হয়।

মালোপাড়ায় সবচেয়ে বেশি আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয় কালীপূজা। প্রতিমা নির্মাণের জন্য ভিন্ন গ্রাম থেকে কারিগর আসে এবং পূজার একমাস আগেই প্রতিমা বানানো হয়। বাঁশের দীর্ঘ কাঠামোটি পাঁচ দিন ধরে তৈরি হয়। সেটিকে খড় ও পাটের সরু দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে প্রতিমার অবয়ব দেয়া হয়। মাথাহীন হাত, পা ও শরীরের আকৃতির কারণে সেটিকে অবশ্য মানুষের মতোই দেখায়। এসব কাজ শেষ হলে মাটির সঙ্গে কাটা পাটের কুচি মিশিয়ে পানি ঢেলে সেটিকে যথাসম্ভব নরম করা হয়। এ কাজের ভার মালোপাড়ার ছেলেদের। ‘তারা নাচিয়া কুদিয়া পাড়াইয়া মাড়াইয়া সে মাটি নরম করিল। এই মাটিতে আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি তৈয়ার হইবে। সে মাটির কাজ করা বড় গৌরবের, বিশেষত ছেলেদের পক্ষে’ (পৃ. ৪৬৪)। কারিগররা সেই মাটি দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করে। এরপর এর ওপর সাদা খড়িগোলা লাগিয়ে পালিশ করে এরপর বিভিন্ন রঙে একে সাজানো হয়। প্রতিমার চোখ আঁকা হলে সেদিন রাতে কালীপূজা করা হয়। প্রতিমার দেহে রঙ দিয়ে সাজসজ্জার কাজটি করা হয় সকলের আড়ালে। পাল খাটিয়ে পূজামণ্ডপ ঢেকে কারিগররা এ কাজ করে। পূজার ধর্মাচার পালনের জন্য কালোর মা নির্ধারণ করে, কে সংযমীর কাজ করবে। যেহেতু তার বাড়িতে এ আয়োজন চলে, কাজেই এ ব্যাপারে সে-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। অনন্তের মা ও বৃন্দার মাকে নিয়ে সে নিজেই সংযমীর দায়িত্ব পালন করে। ‘সংযমী যারা থাকে তারা আগের দিন নিরামিষ খায়, পূজার দিন প্রাতঃস্নান করে। পূজার জল তোলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় আর ফুলের মালা গলায় নামাবলী গায়ে যে পুরোহিত পূজায় বসে তার নির্দেশমতো নানা দ্রব্য আগাইয়া দেয় এবং প্রতিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নানা কাজ করে’ (পৃ. ৪৬৫)। প্রতিমার সাজসজ্জার কাজ শেষ হলে অনন্তের মা ধবধবে শাড়ি পরে নৈবেদ্য নিয়ে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করে। কালীপূজা গভীর রাতে শুরু হয়। সেকারণে দর্শনার্থীদের আশ্রয় নেবার প্রয়োজনে বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চালা বেঁধে একটি অস্থায়ী ঘর তৈরি করা হয়। বালক, যুবক, বৃদ্ধরা বাড়ি থেকে কাঁথা এনে ঘরের চটের ঢালাও বিছানার ওপর শুয়ে অপেক্ষা করে। আবার পূজামণ্ডপ ও চালাঘরের মাঝের স্থানে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে অনেকে গল্পগুজব করে সময় কাটায়। তাদের সঙ্গে ধূমপানের সরঞ্জাম হিসেবে থাকে হুকা ও তামাক। নির্দিষ্ট লগ্নে কাঁসি-ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা সম্পন্ন হয়। দর্শনার্থীদের অংশগ্রহণে পূজা শেষ হলে প্রসাদ বিতরণ করে তাদের বিদায় জানানো হয়। অনন্তের মা সবার হাতে প্রসাদ তুলে দেয়। কালীপূজায় আনন্দ উপভোগের জন্য চারদিন ধরে আট পালা যাত্রা ও কবিগানের আয়োজনও এ উৎসবের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে দিনের বেলা যাত্রা ও রাতে কবিগানের আয়োজন করা হয়। এসময় তারা মাছ ধরা ও পেশাগত

অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকে। পূজার সব আয়োজনের ব্যয়বাবদ মালোপাড়ার সকল ঘর থেকে গ্রামের মাতবররা চাঁদা তোলে।

মনসা পূজা মালোদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় লোকউৎসব। পুরো শ্রাবণ মাসে cÙvcivY পাঠ শেষ হলে তবেই এ পূজার আয়োজন করা হয়। বনমালী এ সময়ে দিনের বেলা মাছ ধরে এবং রাতের বেলা বিভিন্ন বাড়িতে পুথির আসরে cÙvcivY পাঠ করে। বিশেষ ভঙ্গিযোগে পুঁথি পাঠ এবং তা শ্রবণে আগ্রহী শ্রোতার উপস্থিতিতে মনসাপূজার আয়োজন তাদের নিকট বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। শ্রাবণ মাস অতিক্রান্ত হলে cÙvcivY পাঠ শেষে ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। এর অন্যতম অংশ হলো জালাবিয়া। কালনাগের দংশনে মৃত স্বামী লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্য বেহুলার অশেষ ধৈর্য ও সংগ্রামের পরিণতিতে বিজয়ী হওয়ার লোকপুরাণকে ভিত্তি করে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়।" 'বেহুলাসতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ি ও জাদিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, 'আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে।' চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এই ইতিহাস পুরাণরচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তারা বেহুলার এয়োস্তালির স্মারকচিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা-বিয়া "(পৃ. ৫১২)। এ বিয়েতে দুজন নারী বর ও কনের ভূমিকায় অভিনয় করে। প্রথমে বর সোজা হয়ে চৌকিতে দাঁড়ায়। এরপর কনে তাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে, পঞ্চপ্রদীপ নিজের কপালে ঠেকিয়ে তারপর বরের কপালেও স্পর্শ করায়। এরপর খই ও অতসী ফুলের রাশি মাথার ওপর ছিটিয়ে দেয়। দীপদানি আকৃতির একটি পাত্রে ধানের চারাগুলো রেখে বরের মুখের সামনে ধরে সেগুলো দিয়ে মুখ মুছে নেয়। এভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিয়ে হতে থাকে আর একদল নারী বেহুলা-লখিন্দরের প্রণয়মূলক গান গাইতে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র ভূমিকা না থাকলেও মনসাপূজার অংশ হিসেবে অবশ্যপালনীয়। শ্রাবণ মাসের শেষে মালোরা মনসাপূজা করে। অন্য পূজার চেয়ে এ পূজার আয়োজনে খরচ কম, অথচ জাঁকজমক বেশি হয়। মালোপাড়ার ছেলেরা বিল থেকে শাপলা তুলে মনসার প্রতিমাকে সাজায়। মনসার পুষ্পসজ্জার অনুষ্ঠান শেষ হলে পুরোহিত এসে পূজার আয়োজন সম্পন্ন করে। শ্রাবণের শেষ দিন পর্যন্ত cÙvcivY পড়া হয়, কিন্তু পুথি সমাপ্ত হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা অংশটুকু বাকি রাখা হয় এবং তা পাঠ করা হয় মনসাপূজার পরদিন সকালে। সেদিন মালোরা মাছ ধরা বন্ধ রেখে cÙvcivY পাঠ করে এবং খোল-করতাল বাজায়। আগামী বছরের জন্য সেটি পাঠশেষে তুলে রাখা হয়। একজন শ্রোতাদের বাতাসা ও খই বিতরণ করে।

৮. লোকখাদ্য-- তিতাসপারের গ্রামীণ সমাজের অন্তর্গত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ এ উপন্যাসে রয়েছে। এসব খাদ্যদ্রব্য তাদের ক্ষুধা মেটালেও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে জোবেদ আলীর বাড়ির দুই মুনীষ করমালী ও বন্দেআলীর আলাপে জানা যায়, তারা মনিবের বাড়িতে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলেও তাদের স্ত্রীরা শাক দিয়ে একমুঠো ভাত খেতে পায় কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের অংশ হিসেবে ঘরের আল্পনা সজ্জিত আঙিনায় ব্রতিনী বাসন্তী চৌকি নিয়ে মাথায় ধরা ছাতাটি ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকলে তার মা এর ওপর খই ও নাড়ু ঢেলে দেয়। সেখানে উপস্থিত বালকেরা সেসব কাড়াকাড়ি করে খায়। শুকদেবপুরে গানের আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের বাতাসা পরিবেশন করা হয়। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে কালোর মায়ের নাতির আট-কলাই অনুষ্ঠানে পাড়ার ছেলেদের খই, ভাজা-কলাই ও বাতাসা পরিবেশন করা হয়। কালীপূজার প্রসাদ হিসেবে চিনি, বাতাসা, সন্দেশ, কলা ও আলোচাল একত্রে মেখে দলা বানিয়ে মণ্ডপে আগতদের পরিবেশন করা হয়। তাছাড়া হরির লুটে কদমা ও বাতাসা বিতরণ করা হয়। তবে এ উপন্যাসে উৎসব উপলক্ষে পিঠা বানানোর মতো ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের বিবরণ রয়েছে 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদের অন্তর্গত উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। পৌষ মাসের শেষদিন এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে পাঁচ-ছয়দিন

আগে থেকেই মালোপাড়ার ঘরে ঘরে চাল ভাঙিয়ে গুড়ো তৈরি করা হয়। এছাড়া মুড়ি ভেজে ছাতু তৈরি করা হয়। চালের গুড়ি রোদে শুকিয়ে খোলাতে ঢেলে পিঠা বানানোর জন্য তৈরি করা হয়। উৎসবের আগের দিন সারারাত ধরে মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের ও ভিন্ন স্বাদের পিঠা বানায়। উৎসবের দিন সকালে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। এদিন তাদের নদীতে মাছ ধরায় আগ্রহ থাকে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা পিঠার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ উৎসব উপলক্ষে যে কীর্তনের আয়োজন করা হয়, তাতে কদমা ও বাতাসা হরির লুট দেয়া হয়। পুরুষেরা এতে অংশ নিলেও 'মেয়েরা ঘরে বসিয়া নানা উপকরণের পঞ্চান্ন-ব্যঞ্জন রান্না করে' (পৃ. ৪৬৯-৪৭০)। শুধু লৌকিকতার অংশ হিসেবেই নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিশ্বাস ও সংস্কার। রামকেশবের একমাত্র ছেলে কিশোর মাছ ধরতে প্রবাসে গিয়ে উন্মাদ হয়ে গ্রামে ফিরলে 'সে পরিবারকে জানাইল, পাগলের মঙ্গলের জন্য 'আলন্তি'র দিনে কয়েকজন লোককে খাওয়াইবে' (পৃ. ৪৬৯)। এজন্য সে যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ, প্রতিবেশী মঙ্গলা ও তার ছেলে মোহন, সুবলার শ্বশুরবাড়ির মানুষদের এবং অনন্ত ও তার মাকে নিমন্ত্রণ জানায়। 'নিমন্ত্রণ পাইয়া সুবলার শাশুড়ি মায়ে-ঝিয়ে অনেক চাউলের গুঁড়ি কুটিয়া রামকেশবের বাড়ি দিয়া আসিল। নিজেদের জন্য আগে যত গুড়ি কুটিয়া রাখিয়াছিল তাহাও পাঠাইয়া দিল। এবারের পরব তাদের বাড়িতে না হইয়া ঐ বাড়িতেই হোক' (পৃ. ৪৬৯)। বাসন্তী অনন্তের মাকে নিয়ে কিশোরদের বাড়িতে হাজির হয়। পিঠা বানানোর আয়োজন সম্পন্ন করে সে প্রথমে বানানো পিঠাটি রাধামাধবের জন্য তুলে রেখে এরপর অনন্তকে পিঠা খেতে দেয়। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ পর আগত মঙ্গলার মাও পিঠা বানাতে বসে। অনন্তের মা তার পাগল স্বামী কিশোরকেও প্রবল ভালোবাসার তাড়নাবশত পিঠা খেতে দেয়। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে অনন্ত তার মৃত মায়ের পারলৌকিক কল্যাণার্থে শ্রাদ্ধের পর পিণ্ডদান করে। বাসন্তীর উদ্যোগে পিণ্ডের বন্দোবস্ত করা হয়। বাসন্তী ভাত ও বিভিন্ন তরকারির পাশাপাশি পান, সুপারি, টিকা, তামাক প্রভৃতিও কলার খোলে দেয়। ধর্মাচারের সঙ্গে প্রাত্যহিক খাদ্যাভ্যাসের যোগাযোগ এ ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বহুদিন পর সাক্ষাৎ হলে পিঠা বানানোর আয়োজনের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। তিন বোন নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমানতারার বিয়ে হওয়ার দীর্ঘদিন পর একমাত্র ভাই বনমালীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। বোনেরা তাদের স্বামীদের নিয়ে তার বাড়িতে বেড়াতে এলে সে তাদের সমাদরের জন্য রান্নার বিবিধ সরঞ্জামের পাশাপাশি আতপ চাল, গুড়, তেল প্রভৃতিও আনে, পিঠা বানানোর জন্য। তিন বোন সারারাত জেগে গল্প করতে করতে পিঠা বানায়। cÜvcivY পাঠ শেষ হলে শ্রোতাদের বাতাসা ও খই বিতরণের উল্লেখও রয়েছে এ উপন্যাসে। ছাদিরের নৌকাবাইচের নৌকা বানানোর জন্য কাঠমিস্ত্রিদের খাবারের বন্দোবস্ত হিসেবে রমুর মা খুশি চিড়া ও দুধ পাঠায়। উদয়তারা ও বনমালী অনন্তকে নিয়ে বিরামপুরের কাদির মিয়ার বাড়িতে বেড়াতে এলে তাদেরকে জলচিড়া, দুধ ও বাতাসা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অনন্তর বাবা নেই বলে তার মনোলোকে নৈঃসঙ্গ্য ও কাতরতা বিদ্যমান। সে গ্রামের সমবয়সী অন্যদের লক্ষ করে সিদ্ধান্তে আসে, বাবা সম্বোধিত লোকটি তার ছেলেকে ছোলাভাজা, মটরভাজা, বিস্কুট কমলা প্রভৃতি কিনে দেয়। ছড়া বানাতে পটু উদয়তারার সংলাপে উল্লেখিত হয় লোকখাদ্যের নাম-- জিলাপির পেচে-পেচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠাণ্ডা লাগে জল ছাড়া!' (পৃ. ৫৫৬)।

পান খাওয়ার পাশাপাশি হুকা ও কল্কিতে তামাক পানের রীতি যে বাংলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এর বিবিধ দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসের আদ্যন্ত রয়েছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ দরিদ্র মালো গৌরাঙ্গ ও তার ভাই নিত্যানন্দের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লক্ষণীয়। নিত্যানন্দ অর্থাভাবে স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণে দিশেহারা হয়ে তামাক টানলে তার প্রতি গৌরাঙ্গ ক্ষিপ্ত হয়-- 'খালি তামুক খাইলে পেট ভরব?' (পৃ. ৪০১)। 'প্রবাস খণ্ড'-তে লক্ষণীয়, বাসন্তী তার বাবা দীননাথ মালোকে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের জন্য রঙিন কাগজের চৌয়ারি বানিয়ে দিতে বললে সে এ কথায় কর্ণপাত না করে 'গম্ভীর মুখে আগুন-ভরা মালসা, টিকা-তামাক-ভরা বাঁশের চোঙা, আর দড়িবাঁধা-কলকেওয়ালা হুকা লইয়া নৌকায় চলিয়া গিয়াছে' (পৃ. ৪১৩)। কিশোর ও সুবলের পাঠশালার শিক্ষকের কাকা বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী চটিপায়ে উঠানে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে

তামাক টানত। কিশোর প্রবাসযাত্রাকালে তার বাবা রামকেশব ছেলেকে বিদায় জানাতে নদীতীরে না এসে 'ঘরে বসিয়া ঘন ঘন কেবল তামাক টানিতেছিল' (পৃ. ৪১৬)। নৌযাত্রায় কিশোর বৃদ্ধ তিলকচাঁদকে বলেছিল, 'যাও তিলক, তামুক খাও গিয়া। দাঁড়টা দেও আমার হাতে' (পৃ. ৪১৭)। তিলক দাঁড় টেনে ক্লান্ত হলে অবকাশের প্রয়োজনে তামাক টানতে থাকে। তারা প্রবাসে গমনকালে নয়াকান্দা গ্রামে যাত্রাবিরতি টানে। শুধু বয়স্ক পুরুষই নয়, উঠতি বয়সের তরুণেরাও এতে অভ্যস্ত। সেকারণেই এ গ্রামের জনৈক বাসিন্দার সঙ্গে কিশোর আলাপকালে পরিচিত হয় এবং হুক্কাযোগে ধূমপান করে। লোকটির বালিকা মেয়ে বাড়ি থেকে হুক্কা এনেছিল। এ প্রসঙ্গে সে দিব্যি ছড়া কাটে–'আমি খাই তোমার হুক্কা, তুমি খাও আমার ঝিয়ের হুক্কা' (পৃ. ৫১৯)। বাঁশিরামের মোড়লের বাড়িতে আগত অতিথি হিসেবে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণের পর তার স্ত্রী কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদকে পান খেতে দেয়। আর বাঁশিরাম মোড়ল হুক্কায় ধূমপান করে। কিশোর ও সুবল কখনো কখনো ধূমপান করে হুক্কায়। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে অনন্তের মাকে তার স্বামীর গ্রাম গোকর্ণঘাটে পৌঁছে দিতে নৌকাযাত্রার একপর্যায়ে সেই নারী 'মালসা হইতে এইবার জ্বলন্ত টিকাটি তুলিয়া গৌরাঙ্গের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।' (পৃ. ৪৪১) পান-তামাক খাওয়া যে লোকসমাজের ব্যক্তিগত অভ্যাস নয়, বরং সমষ্টিমানুষের মধ্যে এটি বহুকাল ধরেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রচলিত, এর উদাহরণ রয়েছে এ পরিচ্ছেদেই। অনন্তের মা গোকর্ণঘাট গ্রামে এলে তার সঙ্গে পরিচিত হতে পাড়ার নারীরা আসে। তারা সমাদরের অংশ হিসেবে তার কাছে পান-তামাক খেতে চায়। কিন্তু অনন্তের মায়ের কাছে সেসব না থাকায় তারা নিজেরাই সঙ্গে আনা কাপড়ের থলে থেকে পান, চুন, সুপারি বের করে সকলে মিলে খেতে খেতে গালগল্পে ব্যস্ত হয়। পান সম্পর্কিত লোকসংস্কার ও ছড়ার উল্লেখও রয়েছে তাদের কথোপকথনে। আবার ভারতের বাড়িতে গ্রামের মাতবরদের সভা বসলে সেখানে আগতদের জন্য পান, তামাক ও হুক্কার বন্দোবস্ত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পান পরিবেশন এবং ব্যক্তিভেদে হুকা-তামাকের স্বতন্ত্র আয়োজন থেকে তাদের সামাজিক অবস্থান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়টি অনুধাবন করা চলে--

> কয়েকটি ছেলে হুকা কলকে মালসা ডিবা লইয়া বসিয়া গিয়াছে। অনবরত ছিলিম ধরাইয়া হাতে হাতে চালাইয়া দিতেছে ... একটা পরিষ্কার ঝকঝকে বড় কাঁসার থালাতে কয়েক বিড়া ধোয়ামোছা পান, সুচিক্কণ সুপারি, মাজাঘষা কয়েকখানি বাটিতে চুন ও অন্যান্য মশলা, থালাখানি হাতে করিয়া মধ্য বিছানায় নমস্কার করিল ভারত, 'দশজন পরমেশ্বর, আমার একখান কথা। পান নি দেওয়ার সময় অইছে?' সকলেই সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে তাকাইল। পরে রামপ্রসাদের দৃষ্টির ইঙ্গিত পাইয়া ভারত নিজে মাতব্বরদিগকে পান বাটিয়া দিল। পরে পাড়ার একটি ছেলের হাতে থালাখানা তুলিয়া দিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে এই জনারণ্যে পান বাটা শুরু করিল। (পৃ. ৪৫১)

ভারতের বাড়িতে বৈঠক শেষে নিজ বাড়ি ফেরার পথে রামপ্রসাদ পথ ভুলে মুসলমান সম্পন্ন গৃহস্থ এবং তার পরিচিতজন বাহারুল্লার বাড়িতে আসে। সেখানে আলাপের এক পর্যায়ে কুটুমকে আপ্যায়নের অংশ হিসেবে বাহারুল্লা তার জন্য হুকায় তামাকের বন্দোবস্ত করায় স্ত্রীকে দিয়ে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে গ্রামে কালীপূজার উৎসবের রাতে পূজার মণ্ডপের কাছেই অস্থায়ীভাবে দাঁড় করানো চালাঘরে সমবেত দর্শকেরা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে বসে। 'হাঁড়ি-ভরা তামাক টিকা কাছেই আছে। পাঁচ ছটা-হুকা জ্বলিতেছে নিবিতেছে। আগুনের তাপে আর তামাকের ধকে তারা একসঙ্গে উত্তাপিত হইতেছে' (পৃ. ৪৬৭)। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, আলুচাষী কাদির ও তার ছেলে ছাদিরের আলুবোঝাই নৌকা নদীতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত বনমালী ও তার সঙ্গীরা তাদের উদ্ধার করে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির মধ্যে ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে বনমালী সঙ্গে রাখা তামাক ও হুকা তাদের এগিয়ে দেয়।

৯. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন-- এ উপন্যাসে তিতাসপারের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত সাজপোশাক ও প্রসাধনের উল্লেখ লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে মালো নারীদের‌্‌ানের কাজে ব্যবহৃত এক পয়সা দামের কার্বলিক সাবান ব্যবহারের প্রসঙ্গ রয়েছে। তবে সাবান যে পুরুষদের পরনের পোশাক ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতার জন্যও জরুরি, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে। সুবল কিশোর ও তিলকচাঁদ প্রবাসযাত্রায় শুকদেবপুর

গ্রামের উজানিনগর খলায় বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে আশ্রিত থাকে। গানের আসরে অংশগ্রহণের জন্য সুবলের পরিচ্ছন্ন পোশাক প্রয়োজন বিধায় সে জনৈক বেদেনির নিকট থেকে সাবান কেনে। নদীর ওপারের হাটে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রসাধনসামগ্রী বিক্রি হলেও ভ্রাম্যমান বেদে বহরেও এসব পাওয়া যায়, গ্রামবাসীর চাহিদা থাকায়। 'বেদেনীরা আয়না চিরুনি সাবান বঁড়শি, মাথার কাঁটা, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা লইয়া নৌকা করিয়া শুকদেবপুরের ঘাটে বেসাত করিতে যায়' (পৃ. ৪২৮)। গানের আসরে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ ধুতি পরে, বিশেষ কায়দায় গামছা কাঁধ থেকে বুকে ঝুলিয়ে সাজ পূর্ণ করে। অন্যদিকে নারীদের সাজসজ্জার মধ্যে শাড়ি ও হাতের চুড়ির উল্লেখ রয়েছে। মালোপাড়ার পুরুষেরা শীতকালে গাতি বা বেশ কয়েক পরতে তৈরি বিশেষ ধরনের জামা পরে। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ তার ছোট ভাই গৌরাঙ্গকে বলেছিল, তার পিঠে গিঁট দেয়া গাতি খুলে দিতে। কেননা তখন ঠাণ্ডার প্রকোপ কমে গিয়েছিল। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, কালীপূজার অনুষ্ঠানে 'সংযমী' ধর্মীয় কার্যাদি সমাপনের দায়িত্বে নিয়োজিত অনন্তের মা ধবধবে সাদা শাড়িতে নিজেকে আচ্ছাদিত করেছিল। কাপড়ের দোকানের পাশেই বেদেরা পসরা সাজিয়ে বসে। তারা তাগা, মাদুলি, আয়না, জলে ভাসা সাবান, পুঁতির মালা, রেশমি ও কাঁচের চুড়ি প্রভৃতি বিক্রি করে। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে উদয়তারার বিয়ের স্মৃতিচারণায় বিবৃত হয়েছে বর-কনের সাজসজ্জার পরিচয়। 'সেদিন উদয়তারার সামনে বসিয়াছিল অজানা একটা নূতন পুরুষ মানুষ–চুলদাড়ি সুন্দর করিয়া ছাঁটা, মাথায় জবজবে তেল দিয়া বাঁকা টেরি কাটা– নূতন কাপড়ে তাকে সেদিন দেবতার মত দেখা গিয়াছিল। ... তাহাকেও কি খুব সুন্দর দেখাইতেছিল না সেদিন! তিন-চার জনে ধরিয়া তাহাকে চুল আঁচড়ানো, তেল-সিন্দুর পরানো, চন্দন-তিলক লাগানো প্রভৃতি কর্ম করিয়াছিল। মালোদের পুরোহিত গলায় একটি চাদর ঝুলিয়ে ও হাতে একটি দর্পণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি মনসাপূজা করে। দয়ালচাঁদ যাত্রায় যখন মুনি-ঋষির চরিত্রে অভিনয় করে, তখন 'কৌপীন পরিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া খড়ম পায়ে' (পৃ. ৪৫১) সে আসরে প্রবেশ করে। মালোপাড়ার গৃহবধূরা লাল-কালো ডুরি-ডুরি শাড়ি পরে, পায়ে রূপার মল সাজিয়ে জলে আনতে কলসি কাখে ঘাটে আসে। 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে মুসলমান কৃষক পরিবারের পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত পোশাকের উল্লেখ রয়েছে। বিরামপুর গ্রামের কাদির মিয়ার নাতি রমু শিক্ষালাভের জন্য মক্তবে যায় নতুন লুঙ্গি, গেঞ্জি ও টুপি মাথায় দিয়ে। মাগন সরকার গলায় রেশমী চাদর ঝুলিয়ে মসৃণ জুতা পরে বাড়ি ফেরার একপর্যায়ে তার সঙ্গে রশিদ মোড়লের দেখা হয়। 'রশিদ মোড়লের খালি পা, লুঙ্গি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া' (পৃ. ৫২৫)। আবার এ পরিচ্ছেদেই নৌকাবাইচের আসরে আগত অনন্ত ও অনন্তবালা দুজন খেলোয়াড়কে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। কারণ দুটি প্রকাণ্ড মাটির গামলা বিভিন্ন রঙে সাজিয়ে দুই হাতে দুটি করে বৈঠা নিয়ে তারা নদীতে সেগুলো ভাসিয়েছিল। 'উহাদের ... ফেশন করিয়া চুল দাড়ি ছাঁটাই করা, মাথায় জবজবে তেল, পরিষ্কার ধুতির উপর গায়ে সাদা গেঞ্জি' (পৃ. ৫৩৫)। 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মালো নারীদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা রীতিমতো বিলাসিতার পর্যায়ে চলে যায়, যাত্রার চাকচিক্যময় সাজসজ্জার অনুকরণে। 'সুযোগ পাইয়া স্যাকরারা নানারকম গহনার নমুনা লইয়া, মনোহারী দোকানের লোকেরা তেল গামছা সাবান লইয়া ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করিতে লাগিল' (পৃ. ৫৫০)। ফলে বাহুল্য মনোহারি পণ্য কিনতে গিয়ে দুর্দিনের সঞ্চয় খরচে তারা অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে, যা তাদের আর্থিক নিরাপত্তাকে বহুলাংশেই বিপর্যস্ত করে।

১০. লোকযান–– এ উপন্যাসে তিতাসপারের মালো সম্প্রদায়ের জীবনধারণ ও জীবিকা নির্বাহের মুখ্য অবলম্বন হিসেবে নৌকার বিবিধ ভূমিকা লক্ষণীয়। শুধু যাতায়াতের বাহন হিসেবেই নয়, নৌকা যে লোকসংস্কৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা এ উপন্যাসের আদ্যোপান্ত রূপায়িত। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভূ-ভাগ নদীমাতৃক পরিচয়ে খ্যাত। এদেশে অজস্র নদী জালের মতো ছড়ানো বলে নৌপথে যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে মালামাল পরিবহন, এমনকি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিবাদমান সংঘর্ষেও এর নির্বিকল্প ভূমিকা এ উপন্যাসের প্রারম্ভেই উল্লেখিত। জলাশয়নির্ভর বিভিন্ন লোকগোষ্ঠী তথা বেদে, জেলে বা ধীবর, মালো, কৈবর্তরা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে একে ব্যবহার করে, পাশাপাশি চাষী এবং অন্যান্য পেশাজীবী

মানুষেরাও এর দ্বারস্থ হয় নিত্যদিনের প্রয়োজনে। লেখক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে তিতাসনদীর বিবর্তন ও প্রবহমানতার সমান্তরালে মানবজীবনপ্রবাহের রূপরেখা উপস্থাপনায় মগ-মুগল-পাঠানদের যুদ্ধবিগ্রহের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সূত্রনির্দেশ করেছেন, যেখানে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নৌকার উল্লেখ। তবে তিতাসপারের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নৌকার ভূমিকাও বিবৃত এ পরিচ্ছেদেই। গ্রীষ্মকালে তিতাস শুকিয়ে গেলে এতে নৌকা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে সেটিকে তুলে রাখা হয় বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য। সেসময়ে অনেকেই বড় নৌকা নিয়ে চাঁদপুরের বড় গাঙ তথা মেঘনা নদীতে 'প্রবাসে' যায়, দুর্দিনে অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে। আবার ব্যবসার কাজে নিযুক্ত 'সওদাগরের নৌকা' বড় নদীতে পাল তুলে চলে। গন্তব্যে পৌঁছবার প্রয়োজনে নদীতেই যাত্রাবিরতি দিয়ে এর আরোহী মাঝিমাল্লারা 'নৌকায় রাঁধে, খায়, ঘুমাইয়া থাকে' (পৃ. ৪০২)। অন্যদিকে, ছই দেয়া বা ছই ছাড়া, যে কোনো খেয়া নৌকায় চড়ে বধূ কখনো যায় বাপের বাড়ি, কখনো শ্বশুর বাড়ি। জোবেদ আলীর তিন জোয়ান ছেলে নদীর ওপারের জমি চাষের জন্য ডিঙি নৌকায় চড়ে সেখানে যায়। তিতাসপারের জেলে পরিবারগুলোর মাছ ধরে হাটে বিক্রির প্রয়োজনে 'বাড়ি পিছু একটা করিয়া নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে।' (পৃ. ৪১২) ঋতুর বৈচিত্র্যময় পরিক্রমায় লোকসমাজের বর্ণাঢ্য উৎসবে-আয়োজনেও নৌকার উপস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয়, এটি তাদের বহমান সংস্কৃতিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে--

> রঙ মানুষের মনে মনে। তারা তাদের নৌকাগুলিকেও সাজায়। বউ-ঝিরা ছোট থলিতে আবির নেয়, আর নেয় ধানদূর্বা। জলে পায়ের পাতা ডুবাইয়া থালিখানা আগাইয়া দেয়। নৌকাতে যে পুরুষ থাকে সে থালির আবীর নৌকার মাঝের গুরায় আর গলুইয়ে নিষ্ঠার সহিত মাখিয়া দেয়। ধানদূর্বাগুলি দুই অঙ্গুলি তুলিয়া ভক্তিভরে আবির মাখানো জায়গাটুকুর উপর রাখে। এই সময়ে বউ জোকার দেয়। সে-আবিরের রাগে তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জাগে। (পৃ. ৪১৩)

মালো পরিবারের পুরুষদের বিয়ের পূর্বেই নিজের নৌকা ও জাল কেনার বন্দোবস্ত করতে হয়। নতুবা কনের পিতা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। সুবলের বাপ গগন মালো এ শর্তে সম্মত হয়ে তবেই বিয়ে করেছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে আজীবন অন্যের নৌকায় মজুরির বিনিময়ে কাজ করে সংসার চালাতে হয়। সেকারণে সুবলের মা তাকে সুযোগ পেলেই খোটা দেয় –'এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা। এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেন? ... খাইবা বুড়াকালে পরের লাথি উষ্টা' (পৃ. ৪১৫)। ফলে তার ছেলে সুবল বাপের মৃত্যুর পর বন্ধু কিশোরের নৌকায় 'মাথা তোলা' হয়ে মাছ ধরার কাজ নেয়। এরপর তারা একদিন অভিজ্ঞ বৃদ্ধ তিলকচাঁদকে নিয়ে নৌকা সাজায় প্রবাসে যাত্রার জন্য। যেহেতু বড় নদীর বুকে বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে, তাই 'তারা পুরানো ছই নতুন করিল, নৌকা ডাঙায় তুলিয়া গাবকালি মাখাইল। জালগুলিকে কড়া গাব খাওয়াইয়া তিনদিন বিশ্রাম দিল। অতিরিক্ত কিছু বাঁশ আর দড়াদড়িও জোগাড় করিল' (পৃ. ৪১৬)। প্রবাসযাত্রার একপর্যায়ে তারা যখন ভৈরব বন্দরে যাত্রাবিরতি করে, সেখানেও দেখা মেলে 'নানা ব্যবসায়ের অসংখ্য নৌকা। কোনো নৌকাই বেকার বসিয়া নাই। সব নৌকার লোক কর্ম-চঞ্চল। নৌকার অন্ত নাই' (পৃ. ৪১৭)। সারারাত নৌকায় যাত্রার পর পরদিন ভোরে তারা নয়াকান্দা গ্রামে হাজির হয়। কিশোরদের সঙ্গে আলাপকালে তাদের একজন জানায়, তারা আগে পশ্চিমপারের জনৈক জমিদারের গ্রামে থাকলেও তার স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে এ স্থানে ত্রিশ-চল্লিশ ঘর মালো পরিবার বসতি গড়ে তুলেছে। যদিও এ পাড়া থেকে স্থানীয় হাটবাজার দূরে, তবু এখানকার বাসিন্দারা নৌকায় চড়েই সাংসারিক কাজকর্ম ও মাছ ধরার বন্দোবস্ত করে। প্রবাসযাত্রা শেষে নিজ গ্রামে ফেরার পথে কিশোরের নৌকা যখন মেঘনার মোহনাসংলগ্ন খাড়িতে যাত্রাবিরতি করে, 'সেখানে অনেক নৌকার সমারোহ। তার বেশির ভাগ ধান-বেপারী, কাঁঠাল-বেপারী, পাতিল-বেপারীর নৌকা। সকলেই এখানে এক রাতের জন্য আশ্রয় নিয়াছে' (পৃ. ৪৩৮)। কিশোরের স্ত্রী ছেলে অনন্তকে নিয়ে আশ্রয়লাভের জন্য স্বামীর গ্রামে আসে । পথে অনন্ত তিতাসপারের মালোপাড়ার যে দৃশ্য দেখে, সেখানেও নৌকার উপস্থিতি লক্ষণীয়– 'একটির পর একটি করিয়া বাঁধা নৌকা। সব নৌকা একই আকারের, একই গড়নের। সারি সারি বাঁশের

খুঁটি পোঁতা আছে। তারই একটির সঙ্গে একটি করিয়া নৌকা বাঁধা। নৌকার পেছনের দিকে এক একটা ছই। ছইয়ের দুই দিকই খোলা' (পৃ. ৪৪৪)। এ উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ'-তে 'জিয়লের ক্ষেপ' দিতে গিয়ে কালোবরণের কর্মচারী সুবলের নৌকা চাপা পড়ে মৃত্যুর মর্মান্তিক বিবরণ রয়েছে। ঝড়ের তোড়ে নদীতীরে সেই নৌকাটি যখন আছড়ে পড়ার অবস্থা হয়, তা প্রতিহত করতে কালোবরণ তাকে আদেশ দেয় লগি নিয়ে তীরে লাফিয়ে নৌকা ঠেকাতে। অন্যদেরও সুবলের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ছিল। কিন্তু তারা তা না করায় একাকী সুবলের পক্ষে এত বড় নৌকাকে ঝড়ের মধ্যে সামলানো সম্ভব হয়নি। ফলে সুবল সেই নৌকার তলে চাপা পড়ে প্রাণ হারায়। এ উপন্যাসের 'তিন' অধ্যায়ের 'রামধনু' পরিচ্ছেদে মুসলমান কৃষক ও আলুচাষী কাদির এবং তার ছেলে ছাদিরের আলুবোঝাই নৌকাডুবির প্রসঙ্গ রূপায়িত। তাদের বিপন্ন মুহূর্তে জেলে বনমালী ও ধনঞ্জয় নিজেদের মাছ ধরার নৌকা নিয়ে এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামলায়। এ ঘটনায় হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মা-বাপ হারা অসহায় এতিম বালক অনন্ত বনমালীর নিকট আশ্রয় লাভের আশায় বাজারের ঘাটে অপেক্ষা করে। কিন্তু বনমালী দিনের পর দিন ব্যস্ত থাকায় তার হাটের দিকে আসা হয় না। এমতাবস্থায় দারিদ্র্যের পীড়নে জর্জরিত বাসন্তী ও তার পরিবারের নিকট থেকে আশ্রয় হারিয়ে অনন্ত অবশেষে খালের মুখে ফেলে রাখা মস্তবড় একটি ভাঙা নৌকায় আশ্রয় নেয়। এর পেছন দিকে রয়েছে কয়েকটা পালিস করা কিছু পাটাতন, ফলে সেখানে থাকলে রোদবৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নৌকাকে কেন্দ্র করে তিতাসপারের গোকর্ণঘাট, নয়ানপুর, আমিনপুর, বিরামপুর, গোসাইপুর, নবীনগর, রাধানগর, কেষ্টনগর, মনপুরা প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে কোলাহল ও উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে বর্ষাকালে। কারণ এসময় নদনদী-বিল, দিঘি বর্ষার পানিতে থইথই করে বলে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। এ উপন্যাসের একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের শিরোনাম, 'রাঙানাও' যা থেকে অনুধাবন করা যায় তিতাসপারের বাসিন্দাদের জীবনে নৌকার ভূমিকা। এটি যে তাদের নিত্যদিনের কর্ম সম্পাদন ও জীবিকার বাহন, যাতায়াতের অবলম্বন হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হয় না, বরং একে ঘিরে তাদের চিত্তবিনোদন ও আমোদ লাভের সুযোগও খেলার মাধ্যমে ঘটে থাকে, তা প্রতীয়মান হয়। বাইচে বা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নৌকার মালিক তার দলের সঙ্গীদের নিয়ে নৌকা চালানোর তালিম নেয়। পুরাতন নৌকার মেরামত ও রঙ করার কাজটিও এ উপলক্ষে চলতে থাকে। সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গান-বাজনাযোগে একে ঘিরে বালকবালিকাদের ঔৎসুক্য যে অপরিসীম, তা বিবৃত হয়েছে অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে––

> রাঙা নাও। ... নৌকাটি তিতাস পার হইয়া দূরের একখানা পল্লীর দিকে রোখ করিয়াছে। ...নৌকা সাজাইয়া রঙ করাইয়া লোকজন লইয়া তালিম দিতে গিয়াছিল। ... সাপের মত হিস্ হিস্ করিয়া চলিয়াছিল, ঐ-গাঁয়ে উহা থামিতেই পারে না। সারা গায়ে লতাপাতা সাপ ময়ূরের ছবি লইয়া রঙিন দেহ তার একের পর এক পল্লী পাশ কাটাইয়া আর হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মন পাগল করিয়া ছুটিয়াই চলিয়াছে। (পৃ. ৫১৮-৫১৯)

বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ কাদিরের বিবাহিত ছেলে ছাদিরের নৌকাবাইচে অংশগ্রহণের উদ্যোগ ও এ সংক্রান্ত কর্মতৎপরতার সূত্রে 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে নৌকাবাইচকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিতাসপারের বাসিন্দাদের ভাবাবেগের স্বরূপ। ছাদির নৌকাবাইচে[৩৩] অংশগ্রহণের জন্য পাট বিক্রির চারশ টাকা দিয়ে বড় নৌকা বানানোর অনুমতি চায় কাদিরের কাছে। কাদির এ প্রস্তাব বিনা যুক্তিতে মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু ছাদির তাকে যুক্তি দেখায়, আশেপাশের অন্য সব গ্রামের মানুষের নৌকাকে পরাস্ত করে বিজয়ী হবার সম্মান শুধু তার পরিবারের নয়, বরং সমগ্র বিরামপুর গ্রামের। বিপুল টাকা খরচ করে বানানো নৌকা নৌকাবাইচের পর কী কাজে লাগবে, কাদির জানতে চাইলে ছাদির প্রত্যুত্তরে বলে, 'বর্ষার যে কয়মাস ক্ষেতেখামারে পানি থাকিবে, এ নৌকা লইয়া বিলে গিয়া বোঝাই ভরতি ঘাস কাটিয়া আনা যাইবে গাই-গরুর জন্য ...বিলের পানি শুকাইয়া গেলে ... গেরাপি দিয়া তারে তিতাসের পানিতে ডুবাইয়া রাখিব, তার পেটে কতগুলি ডালপালা রাখিয়া দিব, আশ্রয় পাইয়া মাছেরা আসিয়া জমিবে; তখন সময় সময় জল সেঁচিয়া সে মাছ ডোলা ভরিয়া বাড়িতে আনিব' (পৃ. ৫২৭)।

ভাদ্র মাসের প্রথম দিন বিকেলে তিতাসের বুকে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। এতে পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত ছিল মেডেল, পিতলের কলসি ও একটি বড় খাসি। সেদিন সকালেই কাদিরের বাড়িতে গ্রামের তরুণ চাষীরা সমবেত হয়। তারপর তারা রাঙা বৈঠা নিয়ে নৌকা চালনার তালিম গ্রহণের জন্য নতুন নৌকা নিয়ে বিলে নামে। তারা বুঝতে পারে, 'সব লোকে একযোগে বৈঠা মারলে সাপের মত হিস হিস করিয়া চলে, শিকারীর তীরের মত সাঁ সাঁ করিয়া চলে, গাঁঙের সোতের মত কলকল করিয়া' (পৃ. ৫৩৩) নৌকাটি চলে। দুপুরের আহারের পর ছাদিরের নৌকার দুই পাশে দুই সারি লোক বৈঠা নিয়ে বসে। তাদের মাঝে কয়েকটি তক্তার ওপর মাস্তুলের মত একটি ছোট খুঁটিকে আশ্রয় করে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি কয়েকটি ঢোল, করতাল ও লাঠি নিয়ে নৌকায় ওঠে। তারপর তারা ইসলামের বীরপুরুষ আলীর নাম স্মরণপূর্বক নৌযাত্রা শুরু করে। তিতাস নদীর অপেক্ষাকৃত চওড়া অংশে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। সেখানে হাজার হাজার ছোট বড় ছইওয়ালা নৌকা খুঁটিতে আবদ্ধ। ক্রীড়ামোদী লোকজন এসব নৌকায় চড়ে ভিড় জমায়। নদীর ঠিক মাঝখানে প্রায় একমাইল বিস্তৃত স্থানে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা পড়ার পরই বিভিন্ন নৌকায় নানা সুরে সারিগান গাওয়ার হিড়িক পরে। কিন্তু নৌকাবাইচকে ঘিরে প্রতি বছরই এক গ্রামের মানুষের সঙ্গে অন্য গ্রামের মানুষের সংঘর্ষ বাঁধে। এক্ষেত্রে কখনো পুরাতন বিবাদের জের, কখনো বা খেলায় জয়ী হবার প্রচেষ্টা, কখনো বা অন্যের সুন্দর নৌকা ধ্বংস করার মনোভাব প্রভৃতি এক্ষেত্রে দায়ী। সেই সঙ্গে নৌকাতেই লাঠি ও বাঁশ থাকায় একদলের সঙ্গে অন্যদলের মারামারিও অনিবার্য হয়ে পড়ে সেই পরিস্থিতিতে। প্রতি বছরই এরূপ ঘটনা ঘটে। এতে অনেকেই আহত, নিহত হয়। প্রতিপক্ষের নৃশংসতার কারণে ছাদিরের নৌকা বিধ্বস্ত হয়। অপরিচিত প্রতিপক্ষের আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব ছাদির এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হবার কারণ অনুধাবন করতে পারেনি। নদীতে বিপন্ন অবস্থায় তাকে বনমালী উদ্ধার করে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তিতাসপারের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবন ও সংস্কৃতিতে নৌকার গুরুত্ব অনুধাবন করা চলে।

১১. লোকশিল্প-- এ উপন্যাসে লোকশিল্প হিসেবে বাঙালি গ্রামীণ নারীসমাজে প্রচলিত সূচিশিল্প ও আলপনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। তবে 'শিল্প' অর্থে নয়, বরং জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন এবং ধর্মাচারের অংশ হিসেবে এসবের প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন 'তিতাস একটি নদীর নাম' পরিচ্ছেদে জোবেদ আলীর গৃহকাজে নিযুক্ত কামলা করমালীর স্ত্রী সারদিন থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি কাঁথা সেলাই করে। সে এ কাজ করে কিছু অর্থ পায়। তবে সেলাইয়ের কাজ করতে গিয়ে তার হাত সুঁইয়ের ফোঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। করমালীর সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাসিক্ত বেদনার্তি– 'আমি ছিঁড়া খাঁথায় গাও এলাইয়া দিয়া পথের পানে চাইয়া থাকি। সে তখন পরের বাড়ি খাঁথা সিলাই করে, আর সে সুঁইচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে' (পৃ. ৪১২)। তাছাড়া মালোপাড়ার নারীরা যে বয়ন শিল্পে পটু এবং ঘরে বসেই সুতা বানিয়ে মাছ ধরার জাল তৈরি করে, এ প্রসঙ্গে আমরা দৃষ্টিপাত করেছি লোকপ্রযুক্তি প্রসঙ্গে আলাপকালে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের বিবরণ রয়েছে। দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী এ ব্রত পালন করে। ব্রতের অংশ হিসেবে বাড়ির উঠানে আলপনা[৩৪] আঁকতে হয়। কিন্তু বাসন্তী এ কাজে অনভিজ্ঞ ও অপটু বলে প্রতিবেশী কিশোর ও সুবলকে দিয়ে তার মা আলপনা আঁকিয়ে নেয়। তারা হাতি, ঘোড়া ও পাখি আঁকে। একারণে বাসন্তী বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কারণ 'সারা মালোপাড়ার কারো উঠানে হাতিঘোড়া নাই; কেবল তারই উঠানে থাকিবে। শিল্পীদের অপটু হস্তচালনার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বাসন্তী এক সময় খুশিতে হাসিয়া উঠিল' (পৃ. ৪১৪)।

১২. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে তিতাসপারের মালো, কৃষক ও বেদে সম্প্রদায়ের লোকভাষা[৩৫] ফুটিয়ে তোলার সতর্ক প্রয়াস লক্ষণীয় কুশীলবদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত সংলাপে, কথোপকথনের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, বাগধারা ও অলংকারাশ্রিত বাক্যবিন্যাসে। লেখক এতদঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে যে সম্যক অবহিত ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকভাষার বিশেষ মেজাজ, ভঙ্গি ও পরিসর এ উপন্যাসে একেবারেই

বাস্তবানুগ রূপ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে। বিশেষ ধরনের উচ্চারণ, দেহভঙ্গিমা এবং আঞ্চলিকতার প্রভাবজাত পরিবর্তিত উচ্চারণ কুশীলবদের আলাপে, বাগবিন্যাসে প্রতিফলিত হওয়ায় পাঠকের কাছে এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো ধরনের সন্দেহের উদ্রেক ঘটে না। এ ভাষাকে আশ্রয় করেই তাদের নিত্যদিনের ওঠাবসা ও বৈষয়িক কর্ম সম্পন্ন হয়। আবার একটি নির্দিষ্ট লোকসমাজের বিশেষ চারিত্র্যও লোকভাষাকে ভিত্তি করেই প্রামাণ্য রূপ পায়। লোকভাষায় নারী-পুরুষ ভেদে উচ্চারণ ও রূপগত ভিন্নতা, স্বতন্ত্র মনোবাস্তবতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন ঘটায় একে ভিত্তি করে সেই সমাজের স্বরূপ অনুধাবন করা চলে। পাশাপাশি, এ ভাষাকে ভিত্তি করে রচিত লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারেও বিধৃত হয় সমাজভুক্ত বাসিন্দাদের সমষ্টিমানসের পরিচয়। তিতাসপারের লোকভাষা যে অন্য অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা থেকে ভিন্ন, এবং এ ভিন্নতাকে যে লেখক যথাযথ গুরুত্বসহযোগে এ উপন্যাসে বাঙ্ময় করে তুলেছেন, তা বুঝে উঠতে আমরা কুশীলবদের শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা বিবেচনায় রেখেছি।

১৩.১ শব্দভাণ্ডার– এ উপন্যাসের আদ্যন্ত তিতাস তীরবর্তী লোকসমাজে প্রচলিত দেশজ ও কথ্য, আঞ্চলিক শব্দরাশির প্রয়োগ ঘটেছে। এর কিছু শব্দের ব্যবহার শুধু মালো ও কৃষক গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ উপন্যাসে বিবৃত বর্ণনার পাশাপাশি কুশীলবদের ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজনহেতু এসব শব্দরাশির প্রয়োগ প্রাসঙ্গিক, যথাযথ; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিকল্পহীন।

বিশেষণ– চোরা, কাঙাল, তাতিয়া, উবু, সবুজিমা, পচা, নাদুসনুদুস, টুকটুকে, ছোবল, চওড়া, হলদে, টুকিটাকি, কোনাকুণি, ঢঙ্গী, গলানো প্রভৃতি।

ক্রিয়া– ভাঙ্গে, তাতায়, পাড়াইতে, সাঁতরাইতে, ফোলায়, মাতিয়াছে, ফসকাইয়াছিল, বাহিয়া, ডুবিয়া, টানিয়া, মাজে, কাচে, ঢালাইতেছে, ঠেলা, ঝিমাইতেছে, নেতাইয়া, ঠেকাইয়া, খেকাইয়া, এলাইয়া, গুটাইতেছে, চুবাইয়া, গুঁজিয়া, রসাইয়া, চাপিয়া, ঘসাইয়া, গুলাইয়া, খেলাইয়া, ঝুলানো, ভানিয়া, গুজরায়, প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– মরাই, ব্যাপারী, ছিপ, পাল, কাঁকন, বাঁশ, সাঁকো, ঠেলাজাল, কুটুম, নিকারী, গাঙ, ঠেলা, চিপা, ডোলা, খেউ, চুনো-পুঁটি, খানাডোবা, ডালা, ভিটা, জটা, প্যাঁচ, বেড়া, ছই, আল, ডিঙি, মাড়, ঘাস, ভূষি, খইল, জোকার, খরা, ঠেলা, মটকি, চরকি, টেকো, তকলি প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়– গম্ গম্, কনকনে, ঠন্ঠনে, ভুরভুরি, টগবগ, কিলবিল, ধুকধুকানি, ছপছপ, ছল্যাৎ, ঝপাঝপ, সাঁ সাঁ, তাতা থৈতৈ, ঠকাঠক, গুনগুন, গল গল, ঝা ঝা ঝম্‌ঝম্, ঠকাঠক, ধপাস্ ধপাস্, হিসহিস, ফিসফাস, দুরুদুরু প্রভৃতি।

দ্বিরুক্ত পদ– ছুঁইয়া ছুঁইয়া, নাচিতে নাচিতে, টিপিয়া টিপিয়া, খাঁ খাঁ, ধূধূ, টুকিটাকি, ভানতে ভানতে, ফকফক, ভেনভেন, হিস হিস, দড়াদড়ি, ঠনঠন প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– শুকিয়ে>শুখাইয়া, বিজন>বিজনা, লেজ>ল্যাজ, উঠে>উইঠ্যা, পরে>পিন্ধে, ঝগড়া>কাইজ্যা, ছিনিয়ে> ছিনাইয়া, সাঝি>নাইয়া, উড়ে>উইড়া প্রভৃতি।

১৩.২ বাগধারা

ক. মালোরা যখন দুই চোখে অন্ধকার দেখে তখন তারা যায় বোধাইর বাড়িতে। (পৃ. ৪০১)

খ. আমার ভাই অত কথায় কথায় শ্বাস পড়ে না। (পৃ. ৪১২)

গ. সুবল 'মাথাতোলা' হইয়া কিশোরের নৌকায় গিয়া উঠিল। (৪১৫)

ঘ. কোনো লাভ হইবে না বলিয়া ডাকাতের মন ভিজাইতে হইবে। (পৃ. ৪১৬)

ঙ. কিছুদিন আগে পিছে দুজনেরই নাও-জালে হাতেখড়ি হইল। (পৃ. ৪১৬)

চ. আরো সুবলা, তুই বুঝবি কি! তারা মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া-লোকের উপর। (৪১৭)

ছ. দেশদেশান্তরের মাছ, এই সব বিলে আসর জমায়। (পৃ. ৪২৯)

জ. তোমাকে কি মধ্যে মধ্যে ভূতে ভর করে? (পৃ. ৪৩৬)

ঝ. একদিন সে মুখে ফুলচন্দন পড়িল। (৪৩৭)

ঞ. এই তো জগৎবেড় ফেলিয়াছে। এদিকে রাঘব-বোয়াল আছে মনের আনন্দে। (পৃ. ৪৪৮)

ট. কি সোনার মানুষ গো দিদি কত আদর করে আমারে আর আনন্দেরে। (পৃ. ৪৪৮)

ঠ. দশ সের সূতা লইয়া সে অথৈ জলে পড়িল। (পৃ. ৪৪৯)

ড. বিয়া হইল গগনের পুত সুবলার সাথে। সেই সুবলা মরল। ছেমড়ি তার নামের জয়ঢাক হইয়া রহিল। (পৃ. ৪৪৯)

ঢ. অ মহনের মা, আজ যে দেখি আঘাটাতে চন্দ্র উদয়। (পৃ. ৪৪৯)

ণ. এই যে কানা মানুষ ... তিনি লোকের বিচার করিতে গিয়া 'শ্বশুরের বিছানায় বউ শোয়ায়, জামাইর বিছানায় শাশুড়ী শোয়ায়' (পৃ. ৪৫১)

ত. কথা কি আর আমরা বুঝতে পারি না। হাঁ করতে আলাজিহ্বার টের পাই। (পৃ. ৪৫২)

থ. গুবলার বউ গম্ভীর হইয়া গেল। এই ত জগৎবেড় ফেলিয়াছে! এদিকে রাঘব-বোয়াল আছে মনের আনন্দে। (পৃ. ৪৪৮)

দ. তিন বিবাহের তিন ছেলের বাপড হইয়া শ্যামসুন্দর বেপারী যদি আবার বিবাহ করে তো পূবের চাঁদ পশ্চিমে উদয় হইবে। (পৃ. ৪৬২)

ধ. সে নিজেও সব জানিয়া-শুনিয়া জড়ভরত হইয়া আছে। (পৃ. ৪৭৯)

ন. মালোদের পুরোহিত ডুমুরের ফুলের মত দুর্লভ। (পৃ. ৫১৪)

প. একেবারে হাতে-বৈঠা-ঘাটে-নাও অবস্থা (পৃ. ৫২৫)

ফ. উপরওয়ালা ফেলিয়াছে চৌদ্দ সানকির তলায়, কাঁদিয়া কি করিব (৫৫০)

ব. আগে নিজের ঘর সামলা। তারপর পরের তরকারিতে লবণ দিতে আসিস। (পৃ. ৫৫০) বাগধারান অর্থযোগে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিভুক্ত উপাদানসমূহের ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ কালজয়ী উপন্যাস। নিছক সাহিত্যচর্চার প্রচেষ্টা হিসেবে এটি লিখিত হয়নি। বরং তিনি নিজে যেহেতু তিতাসপারের মালো সম্প্রদায়ের বাসিন্দা ছিলেন, তাই এতদঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব, আন্তরিকতা এবং দায়বোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহের বিশ্বস্ত শিল্পভাষ্য উপস্থাপনে। মালো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীজীবনের বিশিষ্ট গড়ন, বিস্তার ও ভাঙনের যে অনুপুঙ্খ চালচিত্র তিনি রূপায়িত করেছেন, তা মোটেই কল্পিত বা বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। বরং ব্যক্তিজীবনে আহরিত নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, তাদের সঙ্গে অন্তর্গত সম্পৃক্ততা এবং মানবিক মূল্যবোধের তাড়নাহেতু তিনি এখানকার লোকমানুষের চালচিত্রকে গ্রন্থনায় উজ্জীবিত হয়েছেন, যার প্রতিফলন এর আদ্যন্ত লক্ষণীয়। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারকে সফলভাবে শিল্পায়নের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা এক কথায় অনন্যরহিত। লোকমানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর এ কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শওকত ওসমান

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পথিকৃতদের মধ্যে শওকত ওসমানের (১৯১৮-১৯৯৭) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ধারায় আন্তরিক প্রচেষ্টার সাক্ষর গদ্যশিল্পে বিচ্ছুরিত হলেও, কবিতা

দিয়েই তাঁর লেখনীর সূত্রপাত। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ, স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী প্রভৃতি তাঁর সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন। বহুপ্রজ লেখক হিসেবে তিনি যে খ্যাতি ও স্বীকৃতি জীবদ্দশাতেই অর্জন করেছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। গল্প লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা ক্রমশ সম্প্রসারিত হলেও পরিণত লেখক হিসেবে উপন্যাসেই তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সমকালীন কথাশিল্পী আবু রুশদ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অমূলক ছিল না– 'কবিরূপে শওকত ওসমান প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন কি পারবেন না, কোনোটাই এখন ঠিক করে বলা যায় না। এদিক দিয়ে তাঁর সম্ভাবনা এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি আশা করবার মতো প্রতিশ্রুতিও তিনি এ পর্যন্ত দিতে পারেন নাই। তবে সৌভাগ্যের কথা এই, গদ্যলেখক হিসেবে শওকত ওসমান ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন। কথাশিল্পী রূপে তাঁর সম্ভাবনা প্রচুর।'[৩৬] eYx Av'g শওকত ওসমানের লেখা প্রথম উপন্যাস। এটি ১৯৪৬ সালে লেখা শুরু হলেও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই অংশটুকুই ১৯৪৬ সালে AvRv' পত্রিকার ইদসংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এরপর লিখিত অংশের পাণ্ডুলিপি লেখকের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমি থেকে পাণ্ডুলিপি পুনরুদ্ধার করা হয় এবং অসমাপ্ত উপন্যাসটি সমাপ্ত করে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে ১৯৯০ সালের ঈদসংখ্যা weÌPÎvয় প্রকাশিত হয়।'[৩৭] বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত নিরীক্ষায় সবচেয়ে উৎসাহী ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান। তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক বাংলাদেশ ভূখণ্ডের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সংকটের ইতিহাসের স্মারক হয়ে আছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলো রচিত হয়েছে ষাট এবং সত্তরের দশকে। সরাসরি বক্তব্য প্রকাশের জটিলতাহেতু তিনি আঙ্গিকে এনেছেন অভিনবত্ব। "স্বাধীনতা পূর্বকালে কলোনি-শোষণ ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ হিসেবে পুরাণাশ্রিত-ঐতিহ্য ও ইতিহাস-অবলম্বী রূপক ও প্রতীকী উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক উপন্যাসের এ মননশীল প্রকরণকে তিনি সচেতনভাবেই অবলম্বন করেছেন [৩৮] আপাতদৃষ্টিতে অতীতচারী হলেও তাঁর শিকড় প্রোথিত ছিল সমকাল তথা বর্তমানে। শওকত ওসমান তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনের তাগিদে মুসলমান ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। বর্তমানকে অতীতের দর্পণে অভিব্যঞ্জিত করতে গিয়ে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের আঙ্গিকের উপাদানগুলো পেল নতুনত্ব। মুসলমান ঐতিহ্যকে স্বকীয়রূপে সংযুক্তির পাশাপাশি উপন্যাসের আখ্যানবিন্যাস, ভাষা, দৃষ্টিকোণ, চরিত্রায়ণ, পরিচর্যারীতি আলাদা রূপ ধারণ করেছে। বাংলার গ্রামীণ জীবনবাস্তবতা, প্রান্তিক মানুষের নিত্যদিনের টানাপোড়েন আর অভাব-অনটনের হাহাকার, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় জীবনবাদী অবস্থান তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়। তাঁর কথাসাহিত্যে বারবার উঠে আসে "পল্লীজীবনের দুর্দশা ও পরিস্থিতির চাপে আত্মবিনাশের চিত্র, ... প্রতিবাদ বিদ্রোহের অসামান্য রূপ; ... সমাজের অজস্র অপরাধের শাণিত সমালোচনা। গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন তিনি বারবার; ধর্ম ব্যবসায়ী ও মুখোশধারীদের অভ্যন্তর উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি; পৌনঃপুনিকভাবে পরিহাস বিদ্রুপ ঝলক দিয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়"।[৩৯] তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো eYx Av'g, Rbbx , µxZ'v‡mi nvwm, †PŠimwÜ, mgvMg, ivRv DcvL¨vb , Rvnvbg nB‡Z we'vq , 'B ^mwbK, †bK‡o AiY¨, RjvsMx , ivRmvÿx , cZ½ wcÄi, AvZbv', wcZcix‡li cvc , ivRcix‡l প্রভৃতি।

Rbbx

শওকত ওসমানের 'জননী'[৪০] উপন্যাসে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের জমিদারী শাসনভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের[৪১] মহেশডাঙা গ্রামের কৃষিজীবী প্রান্তিক লোকগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও বহমান সংস্কৃতির পরিচয়[৪২] মেলে। যদিও এ গ্রাম মুসলমান অধ্যুষিত, তবু স্বল্পসংখ্যক সনাতন ধর্মাবলম্বী বাগদি ও তিওররাও এখানকার বাসিন্দা। গ্রামটির

অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের পরতে পরতে মিশে আছে বাঙালি লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান। মহেশডাঙার বাসিন্দাদের বিশিষ্ট পরিচয় তথা ওই সমাজের লোকজচেতনায় সন্নিহিত রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন, প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, চালচলন, কথাবার্তা, অনুসৃত ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি। শাস্ত্রীয় ধর্মের অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে বহুযুগ ধরে প্রচলিত ধর্মের লৌকিক আবহকে মিলিয়ে নেয়ার প্রবণতাও তাদের আচরণে লক্ষণীয়। ফলে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতিও যে আন্তরিকতার টান গ্রামবাসীর মধ্যে জেগে ওঠে, তা-ই তাদের মধ্যে বিস্তার ঘটায় উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক চেতনার। এ উপন্যাসে[৪৩] হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোকসমাজের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি-আচার, বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধ শাস্ত্রীয় ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করে যায়। প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজন, বিবিধ প্রতিকূলতা ও ভবিষ্যত জীবনের অনিশ্চয়তা লোকসমাজের এরূপ আচরণের অন্তরালে সক্রিয়।[৪৪] নিজেদের অজান্তেই লোকসমাজভুক্ত মানুষেরা পরস্পরের প্রতি মমতা, দরদ ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যা যেকোনো জনগোষ্ঠীর সংহতি ও স্থায়িত্বকে টিকিয়ে রাখার মুখ্য অবলম্বন। ধর্মকে হাতিয়ার করে স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসারীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথে উস্কে দিয়ে ফায়দা হাসিল ক্ষমতালোভী হিন্দু জমিদার রোহিণী চৌধুরী ও তার প্রতিপক্ষ হাতেম মওলানার অনুসারীদের পক্ষে যে অসম্ভব, এর দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে রয়েছে। লোকমানুষের সংস্কৃতিতে বহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনার অন্তর্নিহিত শক্তির এ বিশেষত্ব নির্ভর করে তাদের আন্তঃসম্পর্কের গভীরতার ওপর। এ উপন্যাসে মহেশডাঙা গ্রামের প্রান্তিক কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর চালচিত্র সাবলীলভাবে রূপায়িত হয়েছে। এতে কুশীলবদের অনুসৃত লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার অনবদ্যভাবে উপস্থাপিত।[৪৫]

১. লোকবিশ্বাস– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব লোকবিশ্বাস তাদের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। লোকসমাজে প্রচলিত এসব লোকবিশ্বাসে সন্নিহিত রয়েছে জাগতিক সংকট ও প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা এবং পারমার্থিক শুভবোধ। মুসলমান সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাসগুলো মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণ ও রীতিনীতি, ইহলৌকিক সমৃদ্ধি ও পারলৌকিক কল্যাণ সম্পর্কিত––

> ক.দরিয়াবিবি এক বদনা পানি আনিয়া দিল। ... এক কাজ করো না, ওজু করতে একটু ডান ধারে সরে যাও। কতগুলো ছাঁচি কদুর বীজ পুঁতেছিলুম, কড়ে আঙুলটাক গাছ বেরিয়েছে। পানি ত রোজ দিই। আজ একটু ওজুর পানি পড়ুক। আর হুজুরের কদম-ধোওয়া পানি। (পৃ. ১৩৩) [৪৬]

> খ. বৌমা ... দরিয়াবিবির জবাব সংক্ষিপ্ত : কী। তোমার কাপড়ের টানাটানি। দুটো কাপড় পেয়েছিলাম। ... আসেক্‌জান তারপর আঁচল-ঢাকা দুটো কাপড় বাহির করিয়া বলিল, দুটো কাপড় তুমিই পর। আমার যা আছে চলে যাবে। ... দরিয়াবিবির কণ্ঠস্বর চাঁচাছোলা : কোথা থেকে পেলে শুনি? ... ও পাড়ার ইজাদ চৌধুরীর মা ইন্তেকাল করেছিল, কাল মিশকীন খাওয়ালে আর কাপড় জাকাত দিলে। ... জাকাত! আমি নেব জাকাতের কাপড়? আমার স্বামী বেঁচে নেই? ছেলে নেই? মুখে তোমার আটকালো না? (পৃ. ১৫৭)

> গ. আসেক্‌জান প্রায়ই গাঁ হইতে ... দাওয়াৎ পায়। ধনীদের বাড়িতে চর্ব-চোষ্যের বহু আয়োজন হয়। আসেক্‌জান শুধু নিজের উদরপূর্তি করিয়া আসে না। অনেক সময় নানা খাবার সঙ্গে আনে। অন্ধকার ঘরে তার অংশ ভোগ করে আমজাদ অথবা নঈমা। দরিয়াবিবির চোখে কয়েকবার ধরা পড়িয়াছে তারা। আসেক্‌জানও তার জন্য তিরস্কার ভোগ করে। ... পরলোকগত ব্যক্তির চল্লিশার খাবার সঙ্গে করিয়া আনিতে আসেক্‌জানের কোন দ্বিধা নাই। দরিয়াবিবি ছেলেদের অমঙ্গল চারিদিকে যেন দেখিতে পায়। (পৃ. ১৬৬)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'অজু' বা শরীর ধোয়া পানির 'পবিত্রতা'গুণ বা অলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে দরিয়াবিবির সংলাপে। তার মতে, যেহেতু আজহার পরহেজগার ব্যক্তি, তাই তার অজুর পানি পেলে চারাগাছটি সতেজ ও সবলভাবে বেড়ে উঠবে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়, দরিয়াবিবি আসেক্‌জানের

Dhaka University Institutional Repository

দান হিসেবে গৃহীত জাকাতের শাড়ি গ্রহণে অসম্মত। ইসলাম ধর্মে অর্থসম্পন্ন, ব্যক্তির পক্ষে দরিদ্র, অসহায়, নিরন্ন মানুষের জন্য দান-খয়রাতের বিধান প্রচলিত। তবে এ অনুশাসনের সঙ্গে কালপরিক্রমায় যুক্ত হয়েছে বাঙালি লোকবিশ্বাস। তাই দরিয়া বিবি নিজের সংসারের অনটন সত্ত্বেও ইজাদ চৌদুরীর মায়ের মৃত্যু উপলক্ষে বিতরণ করা শাড়ি গ্রহণে অসম্মত। তার ধারণা, এর ফলে সংসারে কোনো বিপদ ঘটতে পারে। বিশেষত, স্বামী-সন্তানদের নিয়ে কায়ক্লেশে দিনযাপনের আশঙ্কাবশত সে আসেক্জানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বলাবাহুল্য, এর অন্তরালে যুক্তি-বুদ্ধির কোনো ভূমিকা নেই। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আর্থিক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের ধর্মীয় আচরণের অংশ হিসেবে পরিবারের মৃত সদস্যদের পারলৌকিক মঙ্গলের অভীপ্সায় গরিব, অনাথ ব্যক্তিদের একবেলা ভালো খাবার খাওয়ানোর রীতি বা চল্লিশার উল্লেখ লক্ষণীয়। আসেকজান সুযোগ পেলেই এতে অংশ নেয়। তবে দরিয়াবিবি কোনোমতেই চায় না, তার ছেলেমেয়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে গরিব-দুঃখীকে বিতরণ করা খাবার খাক। আকস্মিক কোনো বিপদের আশঙ্কাবশতই সে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে।

২. লোকসংস্কার-- লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কারের সম্প্রসারণ কালের প্রবাহে লোকসংস্কারে পরিণত হয়। ব্যক্তি যেসব লোকবিশ্বাসে একান্তভাবে শ্রদ্ধাশীল, তার অন্তর্গত অনেকগুলোই সমষ্টিমানুষের হিত-কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন আচার, রীতি-নীতি সহযোগে নতুন রূপ লাভ করে লোকসংস্কারের মাধ্যমে। পেশা, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ভেদে লোকসংস্কারের রূপ বহুলাংশেই পৃথক হলেও কখনো কখনো একই লোকসংস্কার প্রায় অভিন্ন চেহারায় পৃথক লোকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। এ উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এরূপ লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। বহুযুগ ধরে প্রচলিত এসব সংস্কার লোকমানসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সাংসারিক গণ্ডিতে নিত্যদিনের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের তাগিদে, পারস্পরিক মঙ্গল কামনায়, সর্বোপরি তাদের গোষ্ঠীগত ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার প্রয়োজনে।

২.১ পানি পড়া, তাবিজ সংক্রান্ত-- ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি, রক্ষণশীল ভাবনা গ্রামীণ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্বাস-সংস্কার ও ধ্যানধারণার মাধ্যমে শিকড় গেড়ে বসে। এক্ষেত্রে ধর্মকে ভিত্তি করে লোকসমাজে আধিপত্য বিস্তারে পীর-ফকির, দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অলৌকিক শক্তি ও ধর্মীয় পরিচয়ের সুবাদে তাদের প্রতি লোকসমাজের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর সক্রিয় থাকে। প্রাত্যহিক জীবনে নানা সমস্যার সুরাহার প্রয়োজনে অশিক্ষিত লোকমানুষ তাদের শরণাপন্ন হয়। লোকসমাজে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা কাহিনী-কিংবদন্তি-গুজবের মাধ্যমে পল্লবিত হয়। সেকারণেই নির্দিষ্ট সম্মানীর বিনিময়ে ঝাড়ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ বিতরণ ও অন্যান্য উপায়ে সমস্যার সমাধানের জন্য লোকমানুষেরা তাদের দ্বারস্থ হয়। মৃত পীরের কবরকে ভিত্তি করে দরগা গড়ে তোলা, সেখানে আগরবাতি জ্বালানো ও পীরের উদ্দেশ্যে মানত করা প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্কার বহুকাল ধরে বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত। কখনো কখনো তা প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও লৌকিকতার আবহে লোকসমাজে এসব সংস্কারের প্রচলন এর গ্রহণযোগ্যতারই ইঙ্গিতবহ।

> ক. আমু, বাছুর খুঁজতে তুমি কতদূর গিয়েছিলে? ... মাঠের দিকে গিয়ে কত ডাকলুম। কবরস্থানের কাছে ... তুই গিয়েছিলি পুরানো কবরস্থানের দিকে? ... শহীদি কবর-গাহের নাম পুরাতন কবরস্থান। হাল-আমলের অন্য গোরস্থান আছে। ... বারবার মানা করব, আমার কথা ত শুনবি নে। ... আমার ভয় লাগেনি ত, মা। ... নেই লাগুক। দাঁড়া, একটু বড়পীরের পানি-পড়া আনি। দরিয়াবিবি একটি বোতল ও মাটির পেয়ালা সঙ্গে আনল। ... আজহার খাঁ তীরবেগে ছুটিয়া আসিল তাহাদের নিকট। ... এসব কী! পানি-পড়া খাওয়াচ্ছ? ওহাবীর ঘরে এসব বেদাৎ। লোকে কী বলবে? ... এসব নিয়ে কেন গোলমাল বাধাও? ছেলেদের রোগ-দেড়ী আছে। আমি খাচ্ছি নাকি? ... দরিয়াবিবির হাতের কামাই নাই। পেয়ালার পানিতে এতক্ষণ আমজাদের কণ্ঠ ভিজিয়া গেল। (পৃ. ১৩১)

> খ. ব্যাপারটা আজহারের কানে গেলে সে একদিন আমজাদকে মখতবের মৌলবী সাহেবের কাছে লইয়া গেল। তিনি ফুঁক দিয়া দিলেন। সঙ্গে এক গ্লাস পানি-পড়া। গোটা একটা টাকা বাহির হইয়া গেল দুই ফুঁকের ঠেলায়। (পৃ. ২৬২)

গ. সাকেরের মা সংসারের কথা জুড়িল। ... ছেলেমানুষ বৌটা তেমনি হয়েছে। ভয়েই মরে। চাষবাস করে খেতে বল, নিজের মানুষকে হাত কর। তা না। খালি দিনরাত ছেলের জন্য কান্না। কাঁচা বয়েস। ছেলে হওয়ার সময় কি পার হয়ে গেছে, বাবা? ..হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত আজহার জবাব দিল, না, আমাদের হাসুবৌর আর কত বা বয়েস। কুড়ি পেরোয় নি। ... এখনই ছেলের জন্য হাঁপাহাঁপি। দোয়া তাবিজ আমি কি কম করতে বাকী রেখেছি! তবে মাস দুই হলো নিস্তার। (পৃ. ১৭৩-১৭৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সন্তানের অমঙ্গলজনিত উৎকণ্ঠায় শঙ্কিত দরিয়াবিবি পীরের পানিপড়ার প্রতি আগ্রহী। আমজাদ বাছুর খুঁজতে কবরস্থানে গেছে, একথা শুনে দরিয়াবিবি ভীত হয়। কোনো রোগব্যাধি বা অশুভ শক্তির নজর থেকে ছেলেকে রক্ষার জন্য আজহারের নিষেধ সত্ত্বেও সে আমজাদকে পীরের পড়া পানি পান করায়। প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী, এরূপ আচরণ 'বেদাৎ' বা নিষিদ্ধ হলেও এ ব্যাপারে সে কোনো ঝুঁকি নিতে নারাজ। লোকসমাজে যুক্তি-বুদ্ধি ও ধর্মীয় অনুশাসন যে মানবিক মূল্যবোধের চেয়ে অধিক সক্রিয়, এটি তারই দৃষ্টান্ত। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বালক আমজাদের মনোলোকে দাদী আসেক্‌জানকে ঘিরে গড়ে ওঠা ভীতিবোধ কাটাতে তার বাবা-মার মক্তবের মৌলবির পানি পড়া পান করানোর তাগিদ লক্ষণীয়। স্কুলে ভূত সম্পর্কিত কাহিনী তার মনে যে ভীতিবোধ জাগিয়ে তোলে, তা সম্প্রসারিত হয় আসেকজানের মৃত্যুর ঘটনায়। সেকারণেই নগদ এক টাকার বিনিময়ে মৌলবির দোয়া পড়ে দুবার ফুঁ দেয়া পানি পান করিয়ে আজহার-দরিয়াবিবি দম্পতি স্বস্তি পায়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লোকসমাজে পীরের দোয়া ও তাবিজের প্রতি ভক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। সন্তান গর্ভে ধারণের তাগিদে নারীরা পীরের দ্বারস্থ হয় তাবিজ, পানিপড়া বা ঝাড়ফুঁকের জন্য। এ উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়, হাসুবৌর শাশুড়ি নাতির মুখ দেখতে উদগ্রীব। কারণ, তার লাঠিয়াল ছেলে সাকের সংসারের প্রতি উদাসীন। তার মার ধারণা, হাসু ছেলের জন্ম দিলে তবেই সাকের সংসারের প্রতি মনোযোগী হবে। সেকারণেই সে হাসুর গর্ভধারণের জন্য পীরের দোয়া-তাবিজ সংগ্রহ করে।

২.২ মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ-- প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে লোকসমাজের অন্তর্গত সমষ্টিমানুষের ভালো-মন্দ, উন্নতি-অবনতি, কল্যাণ-অকল্যাণ জড়িত। আবার, পরিস্থিতিসাপেক্ষে যে ঘটনা একজনের পক্ষে হিতকর অন্য কারো ক্ষেত্রে তা ঠিক এর বিপরীত প্রতিপন্ন হতে পারে। লোকসমাজে গতানুগতিক ধারণায় আস্থা পোষণ ও অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মানসিকতা গুরুত্ব পায়। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ প্রায়ই থাকে না। তাই পারিপার্শ্বিক জগৎ-জীবন-প্রকৃতি সংক্রান্ত নানা ঘটনার যথাযথ কার্য-কারণ অনুধাবন করা তাদের পক্ষে কঠিন। এক্ষেত্রে তারা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত নানা সংস্কার ও মূল্যবোধের আলোকে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

ক. দরিয়াবিবি এক বদ্‌না পানি লইয়া বৃদ্ধার শনের মত শাদা চুলের উপর ঢালিতে লাগিল। ... আসেকজানের শরীর ভারমুক্ত হইতেছে। আহ্ শব্দে তার আনন্দ ধরা পড়ে। নারিকেল তেল আনিল দরিয়াবিবি। চুলের গুছির ভেতর বেশ চুকচুকে করিয়া দিতে লাগিল। ... খালা, দশ ঝঞ্ঝাটে শরীরটা জ্বলে গেল। মেজাজ ঠিক থাকে? কখন যে কাকে কি বলি–হদিস থাকে না। ... মা, জানটা আসান হলো। আল্লার দোয়া লাগুক তোমার শরীরে। (পৃ. ১৬৭)

খ. আমজাদের ছোট বেলায় একবার খুব ম্যালেরিয়া হয়। জীবনের কোন আশা ছিল না। শৈরমী প্রতিদিন তাকে দেখিতে আসিত। একদিন সে কয়েকটি বাতাসা আনিয়া দরিয়াবিবির হাতে দিয়াছিল। ... কী হবে শরীদি? ... খোকাকে খাইয়ে দাও একটা। ... কিসের বাতাসা? ... শৈরমী মিথ্যা কথা বলে নাই। গ্রামের বারোয়ারীতলায় শিবালয়ে সে হরির লুট দিয়া আসিয়াছে আমজাদের নামে। তারই বাতাসা। ধর্মে বাধেই ত। দরিয়াবিবির মনেও খটকা লাগিয়াছিল। মরণাপন্ন পুত্রের শিয়রে দরিয়াবিবি কারো প্রাণে আঘাত দিতে রাজি ছিল না। যদি বাছার গায়ে 'বদদোয়া' লাগে। শৈরমীর সম্মুখেই সে আমজাদকে বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। আল্লা কি মানুষের মন দেখেন না, যিনি সব দেখেন? অখ্যাত পল্লীর জননী হৃদয়েও সেদিন এই প্রশ্নই বারবার জাগিয়াছিল। (পৃ. ২৩২)

গ. জলিল শেখ পাটের ব্যাপারী। নৌকা আছে তিন চারখানা। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। সেখানকার আয়োজন কল্পনাই করা চলে। ... কাপড় দু'টি দরিয়াবিবি আধ-অন্ধকারে বারবার তুলনা করিয়া বলিল, এই লাল সরু পাড়টা নিলাম, খালা। ... বেশ, বেশ! আমার কি আর এসব মানায়, মা! শাদা কাফন পরে কবরে যেতে পারলেই ভাল। ... বাজে কথা কেন, মুখে, খালা? এই সকালে আর কোন কথা মুখে আসে না বুঝি। (পৃ. ১৬৭)

ঘ. কাজের চাপে ক'দিন আমিরন চাচী এই বাড়ি আসিতে পারে নাই। ... একদিন আসিয়া জেরা শুরু করিল, বুবু, তুমি নাকি ছেলেদের বড় মারধোর কর? ... পোড়াজানে যদি মারধর করি, কী অন্যায়টা করি? এগুলো মরলে আমার হাঁড় জুড়োয়। ... আমিরন চাচী বাধা দিল, ছি ছি বুবু, এমন অপয়া কথা মুখে আনে! আমার একটা। সেও কম জ্বালায় না। ... একটা আর দুটো। এরা জ্বালাতেই আসে। একজন ত মুখই আর দেখায় না। তার জন্য জ্বলছি। আর সঙ্গে যে ক'টা আছে, তারাও কম জ্বালাচ্ছে না। আল্লা এগুলো তুলে নিতে পারে না? (পৃ. ২৯৯)

ঙ. দরিয়াবিবি মরহুম শ্বশুরের অজ্ঞতার উপর হাজার লানত বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি জীবিত অবস্থায় এই বণ্টন-ব্যবস্থা করিয়া গেলে পথের ভিখারিণী হইত না সে। (পৃ. ১৬৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দরিয়াবিবির ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তার মঙ্গল কামনায় আসেক্‌জানের স্রষ্টার নেকনজর প্রার্থনা করা নিছক ব্যক্তিগত আচরণ নয়। লোকসমাজে এরূপ সংস্কার বহুকাল ধরে প্রচলিত। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শৈরমীর আচরণে প্রকাশিত হয়েছে নারীর লোকসংস্কারের প্রতি অনুরাগের দৃষ্টান্ত। গ্রামসম্পর্কে পরিচিত অথচ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শৈরমী দরিয়াবিবিকে 'ভাবী' সম্বোধন করে। শুধু তাই নয়, সাংসারিক প্রয়োজনে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক প্রয়োজনের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে হাসি-ঠাট্টা ও আলাপের মাধ্যমে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। তাই শৈরমী বিড়ম্বিত জীবনের আক্ষেপ ও বেদনা অকপটে দরিয়াবিবিকে জানায়। সে দরিয়াবিবির অসুস্থ ছেলে আমজাদের সুস্থতা কামনায় গ্রামের বারোয়ারী মন্দিরের শিবালয়ে তার নামে হরির লুট দেয়. পূজার উপচার বাতাসা এনে খেতে দেয়। ধর্মীয় দূরত্বের চেয়ে হার্দ্যিক আন্তরিকতার আবেদন যে লোকসমাজে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে, এ দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আসেক্‌জান ও দরিয়াবিবির পারস্পরিক সংলাপে লোকসমাজে মৃত্যুর অনুষঙ্গবাহী 'সাদা থান' প্রতীকার্থে গৃহীত। সাদা রঙ একদিকে যেমন শুভ্রতা-নিষ্কলুষতার প্রতীক, অন্যদিকে তা রঙহীনতা বা মৃত্যুর প্রতীকও বটে। আসেক্‌জানের সংলাপে উচ্চারিত সাদা থানের প্রসঙ্গ দরিয়াবিবিকে অমঙ্গলজনিত শঙ্কায় সন্ত্রস্ত করে তোলে। কেননা, বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু লোকসমাজে মৃতের সৎকারের জন্য সাদা থানের ব্যবহার প্রচলিত। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আমিরন চাচীর সঙ্গে আলাপে সাংসারিক যন্ত্রণায় জর্জরিত দরিয়াবিবির সন্তানদের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রকাশ লক্ষণীয়। অভাবের কশাঘাত, স্বামী আজহারের খামখেয়ালিপনা, ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা মেটানোর অসামর্থ্য প্রভৃতি তার অন্তর্লোকে যে বিক্ষোভ জাগায়, এরই পরিণতিতে সে তাদের মৃত্যু কামনা করে। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে বিপর্যস্ত দরিয়াবিবি নিজের ভেতর পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে প্রকাশের জন্যই হঠাৎ খামখেয়ালের বশে এ অমঙ্গলসূচক কথা উচ্চারণ করে, যা শুনে আমিরন চাচী তাকে শান্ত করতে চায়। 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শ্বশুরের অদূরদর্শিতায় বিক্ষুব্ধ দরিয়াবিবির মনস্তাপ প্রকাশিত হয়েছে অভিশাপরূপে। কেননা, বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পিতার জীবদ্দশায় সন্তানের মৃত্যু হলে তার বিবাহিত স্ত্রী ও সন্তানেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সেকারণেই মোনাদিরের স্বার্থান্বেষী চাচারা তার ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেয়নি। দরিয়াবিবি তার মৃত শ্বশুর জবেদ হোসেনের হঠকারিতায় ক্ষিপ্ত হয়। কেননা তার স্বামী বেঁচে থাকতে উক্ত সম্পত্তি ভাগাভাগি হলে দরিয়াবিবিকে সাংসারিক অনটনের পীড়নে প্রতিনিয়ত ভুগতে হত না।

২.৩ জ্বিন-ভূত, অশরীরী–– গ্রামীণ লোকসমাজে বহুযুগ ধরে জিন, ভূত-প্রেত, অশরীরী সংক্রান্ত বিভিন্ন লোকসংস্কার প্রচলিত। বিজ্ঞানচেতনাহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসে উদ্ভব ঘটলেও আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত এসবের টিকে থাকার ব্যাপারে ধর্মীয় শাস্ত্রের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। প্রকৃতির নানা অমীমাংসিত রহস্য, মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, মৃত্যু সম্পর্কিত ভীতিবোধ ও পরলোকে অনিশ্চিত পরিণতি সম্পর্কে উৎকণ্ঠা, এ

পৃথিবীতে প্রিয়জনদের নিয়ে চিরকাল সুখেশান্তিতে বসবাসের আকুতি প্রভৃতি মিলেমিশে লোকসমাজে বিচিত্র সব কাহিনী, কিংবদন্তি ও আখ্যানের জন্ম দিয়েছে। নানা ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অনুশাসনের সমন্বয়ে এ ধরনের সংস্কারের প্রচলন কালেকালে লোকসমাজে ঘটেছে। এসবের বিস্তার লোকসমাজে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে চলে। মহেশডাঙার বাসিন্দাদের চেতনালোকে এসব বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

> ক. আজহার খাঁ লাঙল কোণে দাঁড় করাইয়া ফিরিতেছে। তাহার মনে হইল কে যেন দহলিজের কোণ হইতে পূর্বদিকে চলিয়া গেল একদম দাওয়ার কোণে। ... কে গো! ... কোন জবার আসে না, ছায়া-মূর্তি অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ... কে গো! ... আমজাদ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল, ভয় পায় সে। জ্বীন আসিয়াছে দহলিজে! মার কাছে জ্বীনের গল্প শুনিয়াছে সে। দহলিজে কোরান শরীফ আছে একখানি। রাত্রে তাহারা নাকি কোরান মজীদ পড়িতে আসে। (পৃ. ১৫৩)

> খ. টাঁটি খুলিয়া দরিয়াবিবি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। না, কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। মনে একটু খটকা লাগিল। আনমনা দরিয়াবিবি আবার চুলাশালে ফিরিয়া আাসিল। ... এইবার চোখকে অবিশ্বাসের কিছু নাই। সেই ছায়া তেমনই অবিকল টাঁটির উপর। কিন্তু অগ্রসর হওয়ামাত্র মিলাইয়া গেল। ... ভয়ানক ধাঁধায় পড়িয়াছিল দরিয়াবিবি। জীন-ভূতের ব্যাপার নয় ত। একটু ভীত হইল আজহার-পত্নী। (পৃ. ২১৬)

> গ. শাশুড়ী এই নির্বোধ রুগ্ন বধূটিকে চোখে চোখে রাখিতে চায়। জ্বীন-ভূতের পাল্লায় সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে তার। সংসারে বংশধর না আসিলে পুত্র আর ঘরমুখো হইবে না। (পৃ. ২৪২)

> ঘ. আমজাদ কিন্তু ভয়ে একা একা ঘুমাইতে পারিল না কয়েকদিন। মোনাদির নাই কাছে। নিজের ছোট কুঠরীতে শুইতে তার বড় ভয় লাগে। ... স্কুলে পণ্ডিতের মুখে আমজাদ ভূতের কাহিনী শুনিয়াছিল। মন হইতে তা সহজে মুছিয়া যায় না।... মাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, মরে গেলে ভূত হয় মানুষ? ... যারা খারাপ লোক, তারা ভূত হয়। ... আসেক্ দাদি কি হোয়েছে? ... দরিয়াবিবি ঈষৎ বিচলিত হয় মনে মনে। ... আমার ভয় করে। দাদি রাত্রে পাশে ঘুমায়। ... আমজাদ তবু রাত্রে দরিয়াবিবির কোল ঘেঁষিয়া ঘুমাইত। বাহিরে কাঁঠাল গাছের বনে বনে দম্‌কা বাতাস লাগিলে সে মাকে জড়াইয়া ধরিত। গোরস্থান হইতে আসেক্‌জান দাদি লাঠি হাতে কারো চল্লিশা খাইতে যাইতেছে। (পৃ. ২৬১-২৬২)

‘ক’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রাতের অন্ধকারে দহলিজের কাছে আসতেই একটি ছায়ার অস্তিত্ব টের পেয়ে আজহারের অবচেতনলোকে ভীতিবোধ জাগ্রত হয়। ব্যাপারটি পাশে উপস্থিত আমজাদকেও আচ্ছন্ন করে। মায়ের কাছে শোনা জিন-সংক্রান্ত গল্প এভাবেই তার ভাবনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। ‘খ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে জিন সম্পর্কে দরিয়াবিবির মনোলোকে পুঞ্জীভূত ভীতিবোধের প্রকাশ ঘটে, যখন সে অঘ্রাণের এক ভোরে চারপাশের নিস্তব্ধ প্রকৃতিলোকে আকস্মিকভাবে তার প্রথম পক্ষের ছেলে কিশোর মোনাদিরের সাক্ষাৎ পায়। মোনাদির অভিমানবশত চাচাদের বাড়ি ছেড়ে চলে এলেও মায়ের কাছে আসতে সে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কেননা, তার বাবা মৃত। সৎবাবা আজহারের বাড়িতে এর আগে সে আসেনি। তাই রান্নাঘরের পাশের বেড়ার ওপর তার ছায়া দেখে দরিয়াবিবির মধ্যে জ্বিনসংক্রান্ত ভীতিবোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ‘গ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সাকেরের মায়ের অবচেতনলোকে জিনসংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটে পুত্রবধূ হাসুর সন্তানহীনতায়। তার মধ্যে এরূপ বিশ্বাস ক্রমশ সুদৃঢ় হয় যে, জিনের নজর পড়ায় হাসু দিন দিন রুগ্ন হয়ে চলেছে। তাই সে গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারছে না। ‘ঘ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বালক মনস্তত্ত্বে জিন-ভূত বিষয়ক লোকসংস্কার কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত। স্কুলে পণ্ডিতের মুখে ভূত-সম্পর্কিত কাহিনী তার মনে যে ভীতিবোধের উদ্রেক করেছিল, তা নতুনভাবে পল্লবিত হয় দাদী আসেক্‌জানের মৃত্যুর ঘটনায়। আমজাদ তার সঙ্গে রাতে ঘুমাতে অভ্যস্ত ছিল। সে ভয় পায় একারণে যে, দাদী হয়ত তার পাশেই শুয়ে আছে। কখনো বা রাতের অন্ধকারে কাঁঠালবনে দমকা বাতাসের কাঁপন তার মনোলোকে এ ভাবনা জাগিয়ে তুলত যে, আসেকজান লাঠি হাতে নিয়ে কারো চল্লিশা খেতে যাচ্ছে।

২.৪ দিব্যি দেয়া, শপথ করা, সত্য বলে প্রতিজ্ঞা করা–– নিজের বক্তব্যকে জোরালোভাবে উপস্থাপনের জন্য অথবা বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে স্রষ্টা বা ধর্মীয় গ্রন্থ বা বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কিরা কাটা, দিব্যি

দেয়া, শপথ করা প্রভৃতি বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কার। আবার কখনো কখনো কোনো ব্যাপারে কাউকে দিয়ে জোরপূর্বক শপথ বা দিব্যি করিয়ে নেয়া হয় এ ভাবনা থেকে যে, শপথকারী যদি তার শপথ পূর্ণ না করে অথবা ভঙ্গ করে, তবে তার বিশেষ ক্ষতি বা অমঙ্গল হবে।

> ক. দরিয়াবিবি একটি পান শৈরমীর হাতে দিয়া বলিল, দিদি, আঁচলের আড়ালে নিয়ে যাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বলো না, আমাদের ঘড়াটা। দিব্যি রইল, দিদি। ... শৈরমী উঠিয়া পড়িল। আবার বৃষ্টি শুরু হইয়াছে। দরিয়াবিবি তখনও ঘড়াটা নাড়াচাড়া করে। কত অনিচ্ছার প্রতিরোধ মনে, তবু ধীরে ধীরে পিতলের সামগ্রী শৈরমীর হস্তে তুলিয়া দিতে হইল। ... কাউকে বল না কিন্তু, দিদি। আমার মাথার দিব্যি। (পৃ. ১৮৯)

> খ. আচ্ছা ভাবী, আমার মাথার কিরে–দাদার কোন খবর পাওনি? তবে চুপচাপ বসে আছো? ... আর খবরের কোনো দরকার নেই। (পৃ. ১৯৯)

> গ. কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে বৌ আমজাদের হাত ধরিয়া বলিল, চাচা, আমার দোয়া লিখে দিয়েছো? ... দিয়েছি, হাসু চাচী। ...সত্য? কিরা দিচ্ছি আমার গা ছুঁয়ে বল। ... আমজাদ হাসুবৌর কাঁধ ছুঁইয়া বলিল, দিয়েছি, দিয়েছি, দিয়েছি, তিন সত্যি। (পৃ. ২৯৬)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দরিয়াবিবি শৈরমীকে দিব্যি করায় পিতলের ঘড়াটি অধর সাতের মায়ের নিকট বন্ধক দিয়ে পাঁচ টাকা এনে দেয়ার ঘটনাটি কারো কাছে প্রকাশ না করতে। কেননা, এ ঘটনাটি জানাজানি হলে মহেশডাঙায় খাঁ পরিবারের বংশমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। শৈরমীকে আপন ভেবে বিশ্বাস করায় দরিয়াবিবি তার সাহায্য গ্রহণের পাশাপাশি এ ঘটনাটি নিজেদের মধ্যে গোপন রাখতে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শৈরমী দরিয়াবিবির কাছে আজহারের প্রসঙ্গে জানতে যে মরীয়া, তার প্রকাশ ঘটে কিরা কাটার ঘটনায়। এর প্রত্যুত্তরে স্বামীর উদাসীনতা ও খামখেয়ালীপনা সম্পর্কে অতিষ্ঠ দরিয়াবিবির অসহিষ্ণুতা তার সংলাপে স্পষ্ট। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয় মোনাদিরকে সম্বোধন করে লিখিত চিঠিতে হাসুবৌর তার প্রতি ভালোবাসার আকুতি। অনাথ বালকটির প্রতি হাসুবৌ আগ্রহী। তাই সে দোয়া প্রার্থনা করে আমজাদকে দিয়ে চিঠি লেখায়। অন্যদিকে আমজাদ যেহেতু চিঠি লিখতে সমর্থ, তাই সে চিঠিতে হাসুবৌর দোয়াও লিখে পাঠায় মোনাদিরের প্রতি এবং তিন সত্যি দিব্যি উচ্চারণের মাধ্যমে হাসুবৌর সমীহ ও বিশ্বাস অর্জন করে।

২.৫ অসুস্থতার প্রতিকারার্থে মানত করা, হরির লুট দেয়া-- লোকসমাজে অসুস্থতার প্রতিকারার্থে পীর-দরবেশ ও মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করা, হরিলুটের বন্দোবস্ত করার রীতি বহুদিন ধরে প্রচলিত। আরোগ্য কামনায় অসুস্থ ব্যক্তির নিকটজনের এ ধরনের আচরণের পেছনে যুক্তি-বুদ্ধি কার্যকর না হলেও লোকসংস্কার সক্রিয়। পীর-দরবেশ ও দেবতার অলৌকিক শক্তিতে আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে করুণা লাভ এ ধরনের লোকসংস্কার মেনে চলার উদ্দেশ্য।

> পথে একা-একা চলা আমজাদের সাহসে কুলায় না। পীরের মাজার রহিয়াছে বকুলতলায়। গাঁয়ের লোকেরা প্রতি জুম্মার রাত্রে মানৎ শোধ করিয়া যায়। আজদাহা সাপের পিঠে আরোহণ করিয়া দরবেশ সাহেব গভীর রাত্রে গ্রাম-ভ্রমণে বাহির হন। বড় মেহেরবান পরলোকগত এই দরবেশ, শাহ্ কেরমান খোরাসানী। সকলের দুঃখের পশরা তিনি একাকী বহিয়া বেড়ান। সামান্য অসুখে-বিসুখে পীরের মাজার একমাত্র আশ্রয়। ... কুড়িহাত বেড় মোটা বকুলের ... গুঁড়ির উপরে মোটা দু'টি ডাল। তার মাঝখানে একটি বিরাট গহ্বর। আজদাহা সাপ এইখানে বাস করে। মাঝে মাঝে দিনে বাহির হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। ... কিংবদন্তির অন্ত নাই। কত কাহিনী না দরিয়াবিবির কাছে আমজাদ শুনিয়াছে। গা ছমছম করে তার। ... জাগ্রত দরবেশ। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মানত করে এই মাজারে। (১৫২)

এ উদ্ধৃতিতে বকুলতলার পীরের মাজারে শুক্রবার রাতে গ্রামবাসীর মানত করার রীতি প্রচলিত। তাদের ধারণা, তিনি গ্রামবাসীর দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারে সমর্থ। তার উদ্দেশ্যে মানত করা হলে মনোভিলাষ বাস্তবায়িত হবে, এরূপ

লোকসংস্কার মহেশডাঙার মুসলমান কৃষকসমাজে সক্রিয়। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সমধর্মী আচরণ লোকমানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বহুযুগ ধরে প্রচলিত সংস্কারগুলোকে প্রাত্যহিক জীবনে কোনো না কোনোভাবে মেনে চলতে।

২.৬ নারী সংক্রান্ত-- পুরুষতান্ত্রিক লোকসমাজে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান বহুকাল ধরেই গৃহ ও সংসারের গণ্ডিতে আবদ্ধ। সামাজিক উৎপাদন প্রণালি ও সাংসারিক ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য সেখানে পুরুষকে ঘরের বাইরে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। এর বিপরীতে নারীকে পরিবারের তত্ত্বাবধান, সন্তানের জন্মদান ও লালনপালন, রান্না এবং অন্যান্য গৃহস্থকর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এ উপন্যাসের নারীরাও অনুরূপ সামাজিক অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

> দরিয়াবিবি একটি পান শৈরমীর হাতে দিয়া বলিল, দিদি, আঁচলের আড়ালে নিয়ে যাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বলো না, আমাদেও ঘড়াটা। ... অদেষ্ট খারাপ না হোলে ঘরের লক্ষ্মী পরের ঘরে কেউ রেখে আসে? (পৃ. ১৮৯)

এ উদ্ধৃতিতে আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত দরিয়াবিবি পুরাতন একটি ঘড়া কারো কাছে ঋণের জন্য বন্ধক দিতে শৈরমীর সাহায্য চায়। তবে এ ঘটনা কেউ যেন জানতে না পারে, সেজন্য সে শৈরমীকে অনুনয় করে। কেননা, খাঁ বাড়ির মর্যাদা যে সময়ের প্রবাহে ধূলিসাৎ হতে চলেছে, দরিয়াবিবি তা গ্রামবাসীকে জানাতে অসম্মত। যতদিন সে এ সংসারে আছে, ততদিন শত কষ্ট মেনেও তা চালিয়ে যেতে মরীয়া। কিন্তু বাঙালি লোকসমাজে এরূপ সংস্কার প্রচলিত যে, গৃহস্থ সামগ্রী ঘরের বাইরে গেলে অর্থাৎ অন্যের হাতে পড়লে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। যেহেতু আজহারের বাউণ্ডেলেপনা ও খামখেয়ালের কারণে দরিয়াবিবিকে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাই শৈরমীর সংলাপে ভবিষ্যতে আজহারের অমঙ্গলজনক পরিণতির ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে।

২.৭ অন্যান্য

> ক. আর সে ফিরে আসবে! কোথা গেল, অতটুকু কচি ছেলে। ... আমি গণৎকারের কাছে শুনিয়ে আসব। কোন দিকে গেছে, কবে ফিরে আসবে ঠিক বলে দেবে, সেবার আমার বোনের দেবর এমনি–। (পৃ. ২৭৭)

> খ. অত ঘন জঙ্গলে আর যেয়ো না। বড় বড় সাপ আছে। ... কি সাপ আছে, মা? আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল। ... খুব বিষ সাপের, জাতসাপ আছে। ... মোনাদির হাসিয়া উঠিল– হ্যাঁ, সাপ আছে না হাতি। কই, আমরা একটা সাপের লেজও দেখিনি। ... আমজাদ হাসিতে যোগ দিল। –মা, বড়ভাই সাপের লেজ দেখেনি। সাপ কাটলে লেজ খসে যায়। না, মা? (পৃ. ২২৫-২২৬)

> গ. রহিম খাঁয়ের বাবাকে কে না জানত? সুদখোর। সুদের পয়সায় জমিদার–। ... চন্দ্র কোটাল বাধা দিয়াছিল এই সময়ঃ তোমরা জান না, গরুর গায়ে ঘা হলে ন'টা সুদখোরের নাম লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। পোকা পড়ে যায়। (পৃ. ১৪৯)

> ঘ. শাশুড়ি হাসুবৌকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ... ওই যে অভাগীর বেটি, দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে কি আর আল্লা দেবে। সাকের না হলে আমাদের এত জ্বালাবে কেন? ... হাসুবৌ কোনো জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ মাটির সমতলে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। ... খামাখা রাগ করো কেন, চাচি। এমন কচি বয়স, ছেলেমানুষ। পোয়াতিকে এমন ফজিয়ৎ করলে রোগে পড়বে যে। (পৃ. ২০৩)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে অদৃষ্টের ওপর লোকমানুষের ভক্তির প্রকাশ লক্ষণীয়। যা অজ্ঞাত, রহস্যময়, অজানা অথচ নিজের জীবনঘনিষ্ট, তার স্বরূপ জানতে অসীম কৌতূহল লোকসমাজে বরাবর পরিলক্ষিত হয়। তাই গণৎকারকে দিয়ে হাতের রেখা পরীক্ষার মাধ্যমে অনাগত ভবিষ্যত সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত। দরিয়াবিবির কাছে ফিরে আসার একপর্যায়ে সৎপিতা আজহারের দ্বারা প্রহৃত হয়ে অভিমানবশত মোনাদির গোপনে অন্যত্র চলে যায়। ছেলের হদিশ পেতে দরিয়াবিবি প্রতিবেশী আমিরন চাচীর সাহায্য নেয়। তারই পরামর্শে গণৎকারের নিকট ছেলের সন্ধান লাভের উদ্যোগ দরিয়াবিবির সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ

হলেও সন্তানের জন্য ব্যাকুল মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা এ ঘটনায় পরিস্ফুট। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সাপ সম্পর্কে লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘন জঙ্গলে বসবাসকারী বিষাক্ত জাতসাপের লেজ রয়েছে এবং কাউকে কামড়ালে সেই সাপের লেজ খসে পড়ে, এরূপ সংস্কার লোকসমাজে প্রচলিত। বালক আমজাদ এ প্রসঙ্গে অবহিত হলেও তার সৎ বড়ভাই মোনাদির এ বিষয়টিকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সুদখোর ব্যক্তির প্রতি লোকসমাজের ঘৃণ্য মনোভঙ্গি প্রকাশিত। যেহেতু গ্রামবাসী আর্থিক সংকটে বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার নিকট থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে বাধ্য থাকে তাই তার এরূপ নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় গরুর অসুস্থতার প্রতিকারের জন্য তার নাম ব্যবহারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সুদখোর সম্পর্কে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। একারণেই ব্যক্তিমানসে এরূপ লোকবিশ্বাসের প্রচলন হয়। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সন্তান জন্মদানে অসমর্থ তরুণী হাসুবৌর প্রতি তার শাশুড়ি সাকেরের মায়ের ভৎর্সনা প্রকাশিত হয়েছে। এরই সূত্র ধরে দরিয়াবিবি তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে জানায়, অসুস্থ গর্ভধারিণীকে গালিগালাজ করলে রোগে ভুগে বরং তার অমঙ্গল হবে।

৩. লোকাচার-- লোকসমাজে পরস্পরের সঙ্গে নিত্যদিনের ওঠা-বসা, চাল-চলন, কথাবার্তা, আলাপ ও কুশল বিনিময় প্রভৃতির সূত্রে নানা লোকাচারের সাক্ষাৎ মেলে। অশিক্ষিত লোকগোষ্ঠীর মধ্যেও সাংসারিক প্রয়োজনে, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। নবজাতকের জন্ম সংক্রান্ত, বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত, আতিথেয়তা, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে লোকসমাজে মান্য নানা লোকাচারের দৃষ্টান্ত রয়েছে এ উপন্যাসে। পারস্পরিক সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার ও সম্পর্কের প্রগাঢ়তা এসব লোকাচারের মাধ্যমে লোকসমাজের সংহতি ও ঐক্য ধরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লোকসমাজে গোষ্ঠী, বৃত্তি, পেশা ও ধর্মীয় পরিচয়সূত্রে বিভিন্ন লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব লোকাচার কখনো কখনো ধর্মীয় রীতিনীতির অংশ, যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জাগতিক কল্যাণ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন; পাশাপাশি পারলৌকিক উন্নতি সাধন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব লোকাচার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়ার অংশ। প্রাত্যহিক জীবনধারনের নানা কাজে একের ওপর অন্যের নির্ভরশীলতা, বিপদে-আপদে এগিয়ে আসার মানসিকতা, সাধ্য অনুযায়ী পরস্পরকে সাহায্য করার অন্তর্তাগিদ লোকাচারের অংশ হয়েও নিছক এ গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পারস্পরিক আলাপচারিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গোষ্ঠীগত বা ধর্মীয় পরিচয়ের সীমানা পেরিয়ে লোকসমাজে সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এ উপন্যাসে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত লোকাচারের চেয়ে লোকমানুষের যাপিত জীবনে একের প্রতি অন্যের বন্ধুত্বময় আচরণে এর পরিচয় অনুপুঙ্খভাবে পাওয়া যায়। যেমন-- আজহারের খালা বৃদ্ধা আসেক্‌জান নিজের ভরণপোষণের জন্য মহেশডাঙার অর্থসঙ্গতিপন্ন পরিবারের দান-খয়রাত, জাকাত, মিসকিন খাওয়ানো প্রভৃতির ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল। অথচ জাকাত হিসেবে ইদে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে শাড়ি পেলে সে দরিয়াবিবিকে তা নির্দ্বিধায় দিতে চায়। শুধু তাই নয়, দাওয়াত হিসেবে প্রাপ্ত খাবারের উদ্বৃত্ত অংশটুকু সে আমজাদ ও নঈমার জন্য আনে। কখনো বা বাড়িতে চাল না থাকলে সে কারো কাছ থেকে আনা চালে দরিয়াবিবির সংসারের অন্নাভাব সামলাতে চায়। নিছক আত্মীয়তার খাতিরে নয়, বরং ভালোবাসা, মমতার প্রগাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ বলেই তাদের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা লক্ষণীয়। তেমনিভাবে দরিয়াবিবি যখন প্রতিবেশী সাকেরের মায়ের কাছে পুত্রবধূ সন্তানের জননী হওয়ার আনন্দে দাওয়াত খাওয়ার বায়না করে, সে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। শুধু দরিয়াবিবি, তার স্বামী আজহার ও তাদের ছেলেমেয়েই নয়, আসেক্‌জানকেও দাওয়াত দেয়া হয়। সাকেরের স্ত্রী হাসু যে কোনো প্রয়োজনে দরিয়াবিবির পরামর্শ নেয়। শাশুড়ির দ্বারা কখনো কখনো তিরস্কৃত হবার বেদনা, এমনকি মাতৃত্বজনিত অপূর্ণতার কষ্ট তার কাছে জানিয়ে মনের গ্লানি দূর করে। দরিয়াবিবিও চন্দ্র কোটালের খাতিরযত্নে বরাবর সচেষ্ট। যেহেতু চন্দ্র কোটাল পান খেতে ও ধূমপান করতে পছন্দ করে, তাই সে বাড়িতে এলেই দরিয়াবিবি আমজাদকে দিয়ে সেসব পাঠিয়ে তাকে আপ্যায়ণে সচেষ্ট থাকে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দরিয়াবিবির সামাজিক সম্পর্ক লোকাচারের গণ্ডিকে ছাপিয়ে আত্মীয়সুলভ ঘনিষ্ঠতায় উন্নীত হয়।

> আমিরন চাচীর সংসার ছোট। কিন্তু দরিয়াবিবির সংসারের এতগুলি পেট চালানো সহজ নয়। প্রথম দিকে সহানুভূতি কারো কম ছিল না। কিন্তু তারও সীমা আছে। বেচারা চন্দ্র নিজেই অস্থির। সে চাষ করে, মাছ ধরে, গান করে। কিন্তু সব সময় রোজগার হয় না। তবু তার আন্তরিকতা অকৃত্রিম। নিজে না আসিলেও বোনকে পাঠাইয়া খোঁজ-খবর লয়। এলোকেশী খালি হাতে আসে না। কোন দিন মাছ, মাঠের ফসল, অন্ততঃ একখানি কুমড়া হাতে সে লৌকিকতা রক্ষা করে। (পৃ. ২৯২)

আসেক্জানের মৃত্যুর পর দরিয়াবিবি তার দাফন এবং মিসকিন খাওয়ানোর মতো ধর্মীয় লোকাচার সুষ্ঠুভাবে পালন করে। তেমনিভাবে গার্হস্থ্যবিষয়ক লোকাচারেও সে মনোযোগী।

> তখনও সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই, দরিয়াবিবির খেয়াল ছিল না। তাই আবার বলিল, আমি ডিপে জ্বেলে দিচ্ছি, একটু সবুর কর বাবা।
>
> নাচ-দুয়ারে প্রদীপ দেখাইতে আসিয়া দরিয়াবিবি গরুগুলির চেহারাও একবার দেখিয়া লইল। ... নিমগাছের নিচে গোয়াল-খড়ের গাদাটি বড় অদ্ভুত ঠেকিল আজ দরিয়াবিবির। নিঃসঙ্গ মনে হয় ভিটের আশ-পাশ। প্রদীপ দেখাইয়া তাই তাড়াতাড়ি সে পুত্র-কন্যার নিকট ফিরিয়া আসিল। (পৃ. ১৮১)

ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নিচুবর্ণের বাগদি নারী শৈরমীকে গ্রামের ব্রাহ্মণরা হরহামেশা তিরস্কার করলেও দরিয়াবিবি তার প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক। এমনকি সে তাকে 'সখী' বিবেচনায়ও দ্বিধাহীন। আর্থিক অনটনকালে কখনো বা তার কাছ থেকে শাক সংগ্রহ করা, কখনো বা পিতলের ঘটি বন্ধক দিয়ে কারো কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য সে শৈরমীর ওপর নির্ভরশীল। তার অসুস্থ যুবক পুত্র গণেশের মৃত্যুতে দরিয়াবিবি শোকার্ত।

৪. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে মহেশডাঙার লোকসমাজে প্রচলিত লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান লক্ষণীয়। এসব উপাদান গ্রামবাসীর নিত্যদিনের আচরণ, অভ্যাস, বিশ্বাস ও মানসিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কোনো লোকগোষ্ঠীর সৃষ্টিশীলতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। আর, বিভিন্ন লোকসমাজের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনেও সেই লোকগোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীদের সৃষ্টিসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। লোকসাহিত্য বংশপরম্পরায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়। আমজাদ আসেক্জান ও তার মায়ের কাছে জিনের, স্কুলের পণ্ডিতের কাছে ভূতের কাহিনী শোনে। গ্রামবাসীর মধ্যে দরবেশ সম্পর্কিত নানা কিংবদন্তি প্রচলিত। চন্দ্র কোটাল মুখেমুখে নানা ছড়া ও লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে; সে ভাড়-নাচের দলপতি। লোকসমাজে প্রচলিত প্রবাদ, বাগধারা ও রূপকথার অনুষঙ্গও গ্রামবাসীর মনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করে।

৪.১ লোকসঙ্গীত--এ উপন্যাসে মোট সাতটি লোকসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পূর্ণরূপে, অন্যগুলো কয়েক চরণের আংশিক রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। এসব গানের গীতিকার ও গায়ক চন্দ্র কোটাল, যার ভাড়নাচের দল রয়েছে এবং বিভিন্ন উৎসবে-আয়োজনে গ্রামে সে এর আসর বসায়। উপন্যাসের '২' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, বালক আমজাদের সঙ্গে পরিহাসের সুযোগ হিসেবে সে 'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত গানটি গায়। '৭' পরিচ্ছেদে পিতার প্রতি অভিমানী আমজাদকে খুশি করতে সে 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত গানটি শোনায়। 'গ' ও 'ঘ' উদ্ধৃতিভুক্ত গান দুটি রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কেন্দ্রিক, যা চন্দ্রকোটাল পরিবেশন করেছিল আজহারের সঙ্গে আলাপকালে। আজগার ধর্মপরায়ণ হলেও ভাঁড়দলের নাচের আসরের প্রতি আগ্রহী। ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনীর অভিনয় ও এ বিষয়ক গান তাকেও আকৃষ্ট করে। 'ঙ' সংখ্যক গানটি ব্যঙ্গাত্মক হলেও তা শুনে শ্রোতা হিসেবে আমজাদ ও মোনাদির খুশি হয়। সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতা গ্রামের মানুষের মাঝে বিভাজন সৃষ্টির অন্যতম উপায়। তাই স্রষ্টার দোহাই দিয়ে ক্ষমতালোভী গোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বলে এর বিরুদ্ধে চন্দ্রকোটালের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে 'চ' সংখ্যক গানে। 'ছ' কবিগানের প্রতিনিধি হিসেবে 'ছ' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত গানে হাস্য-পরিহাসেরই প্রাধান্য, যা শ্রোতাদের মনোযোগ ও আগ্রহকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ।

ক. m‡l †ÿ‡Zi Avwj nj Pv',

†Pv‡L Zvi gvbl-aiv dv‘

l D‘wmbx †jv (পৃ. ১৪১)

খ. K_v Kq bv

Avgvi gqbv,

nvq, nvq †i ... (পৃ. ১৮৪)

গ. g_ivq wd‡i G‡m

f‡j †MQ e›‘ve‡bi K_v|

Awg †Zvgvq wP‡bwQ k¨vg,

LvBwb †Pv‡Li gv_v| (পৃ. ২১১)

ঘ. g_iv †Q‡o †KvUvj hgvj‡q P‡j,

gv‡V gv‡V †Mwcbxiv fv‡m †Pv‡Li R‡j,

l-l-l-lÑ| (পৃ. ২১৩)

ঙ. cvY hw‘ w‘‡j Zwg

cvY-†Pvi †k‡lÑ

†KwKj †Kb †i‡L †M‡j

Ggb †cvov †‘‡k| (পৃ. ২২১)

চ. fMevb, †Zvgvi gv_vq SvUv,

l †Zvgvi gv_vq SvUv|

†h †P‡q‡Q †Zvgvi w‘‡K

ZviB †Pv‡L j¼v-evUv|

l Qwo‡q w‘‡j, Qwo‡q w‘‡j

gvi‡j Zv‡i wZ‡j wZ‡j

l Avgvi e_v dmj KvUv

l †Zvgvi gv_vq SvUv| (পৃ. ২৬৭)

ছ. PvPv Gj A‡ejvq|

GLb †Kv_vq wK cvB?

Dhaka University Institutional Repository

†L‡Z †' Iqv 'vq|

nvm i‡q‡Q cKi cv‡o

giwM Avi wWg bv cv‡o

†Sv‡c-Sv‡o eb-ev'v‡o

†kqvj Qvbv I bvB\ ...

fvB‡cv Zwg Ki bv fvebv

Awg Ime wKQB Lve bv|

N‡i Av‡Q gUKx PvPx

Zv‡i Ki bv RevB\

Avnv PvPv, Av‡°j e‡U

ewjnwi, ewjnwi hvB|| (পৃ. ২৮৯)

৪.২ কিংবদন্তি--

ক. ভিটা সংলগ্ন একটি বড় পুষ্করিণী ছিল। বর্তমানে মজা পুকুর মাত্র। পাড়ে কাঁটাবন দুর্ভেদ্য। কয়েক বছর আগেও পদ্মপাতায় পুকুরের সামান্য পানিও দেখা যাইত না। ... খাঁর পুকুরে পীরের কুমির ছিল। সেই প্রবাদ এখনও মুখে মুখে ফেরে। (পৃ. ১২২)

খ. পথে একা-একা চলা আমজাদের সাহসে কুলায় না। পীরের মাজার রহিয়াছে বকুলতলায়। গাঁয়ের লোকেরা প্রতি জুম্মার রাত্রে মানৎ শোধ করিয়া যায়। আজদাহা সাপের পিঠে আরোহণ করিয়া দরবেশ সাহেব গভীর রাত্রে গ্রাম-ভ্রমণে বাহির হন। বড় মেহেরবান পরলোকগত এই দরবেশ, শাহ্ কেরমান খোরাসানী। সকলের দুঃখের পশরা তিনি একাকী বহিয়া বেড়ান। সামান্য অসুখে-বিসুখে পীরের মাজার একমাত্র আশ্রয়। ... কুড়িহাত বেড় মোটা বকুলের ... গুঁড়ির উপরে মোটা দু'টি ডাল। তার মাঝখানে একটি বিরাট গহ্বর। আজদাহা সাপ এইখানে বাস করে। মাঝে মাঝে দিনে বাহির হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। ... কিংবদন্তির অন্ত নাই। কত কাহিনী না দরিয়াবিবির কাছে আমজাদ শুনিয়াছে। গা ছমছম করে তার। ... জাগ্রত দরবেশ। (পৃ. ১৫২)

৪.৩ রূপকথার অনুষঙ্গ--

দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ দরিয়াবিবির চোখে যেন এই প্রথম ধরা দিল। সে কেন এখানে আসিয়াছে স্বর্ণপুরী হইতে নির্বাপিত রাজকন্যার মত? (পৃ. ১৫৭)

কেমন বর্বর মনে হয় চন্দ্র কোটালকে খলিলের নিকট। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুগোল, গুম্ফবিশিষ্ট কোন দৈত্য নয়, হঠাৎ শাহানপুরে আসিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গেল। (পৃ. ২১৩)

হাসুবৌ শাশুড়ীকে দজ্জাল আখ্যা মনে মনেই দিতে থাকে। কাঠ-কুড়োনী বুড়ি বলিলে তবে আমজাদের গায়ের রাগ যায়। (পৃ. ২২৩)

Dhaka University Institutional Repository

> আলীবাবা ও চল্লিশ দস্যুর কাহিনী পাঠ করিতেছিল মোনাদির। কাসেম রত্ন-গুহার মধ্যে আবদ্ধ। বাহিরে আসিবার মন্ত্র সে ভুলিয়া গেছে। 'সিসেম খোল' এইটুকু শব্দ মোনাদিরের মুখে–আবার তাকে পাঠ থামাইতে হইল। (পৃ. ২২৪)

> আমার দরিয়াবুবু কেমন? তার ছেলে রাজপুত্তুরের মত দেখতে হবে না? (পৃ. ২৩০)

> পাঁচটি টাকা সাত রাজার ধন নয়। তবু সে কথাই আগে ভাবিতে হয়। (পৃ. ২৯৩)

৫. লোকখাদ্য--এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্রসামগ্রীর উল্লেখ রয়েছে। আর্থিক দৈন্য ও টানাপড়েনে ভুক্তভোগী স্বল্পআয়ের মানুষের পক্ষে সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী অধিক অর্থব্যয়ে খাওয়া অসম্ভব। তাই কোনোমতে পেটের ক্ষুধা মেটাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তাদের খাদ্যতালিকাভুক্ত। বাঙালি মুসলমান কৃষক পরিবারের খাদ্যতালিকা লক্ষ্য করতে হলে আজহার-দরিয়াবিবি দম্পতির প্রাত্যহিক আহারের দিকে লক্ষ্য করা জরুরি। দরিয়াবিবি ছেলেকে প্রায়ই গরম ভাত খেতে দিতে পারে না। আমজাদ পান্তা ভাত খেতে চায় না। আর্থিক সঙ্গতি থাকলে দরিয়াবিবি কখনো ডাল ও চুনা মাছের ঝোল, কখনো আলুভাজি করে। মেহমান এলে ঘরে পালা মুরগির ডিম, কখনো বা মুরগি জবাই করে মাংস রান্না হয়। আমজাদ কখনো কখনো ভাতের পরিবর্তে চালভাজা খেয়ে রাত কাটায়। আজহার দিনের পর দিন বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলে তখন শৈরমীর পুটুলি বেঁধে আনা মেটেশাক ও কলমীশাকই দরিয়াবিবির অবলম্বন। কখনো কখনো চন্দ্র কোটাল, হাসুবৌ ও আমিরন চাচী দরিয়াবিবিকে সাহায্য করে। কোনোমতে চেয়েচিন্তে ছোটখাটো কাজকারবারের মাধ্যমে তারা সাংসারিক ব্যয়ভার নির্বাহ করে। চন্দ্র কোটাল কখনো কখনো আমজাদকে দশ-বারোটি বড় আকৃতির চিংড়ি, কখনো বা আজহারের হাতে দুটি তপসে মাছ গুঁজে দেয়। তেমনিভাবে মোনাদির ও আমজাদ চন্দ্র কোটালের বাড়ি গেলে এলোকেশী তাদের কখনো মুড়ি, কখনো সেদ্ধ আলু দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করায়। হাসুবৌ মাতৃত্ববশত আমজাদ, মোনাদির ও আম্বিয়াকে সন্দেশ খেতে দেয়। সে একদিন দরিয়াবিবি ও তার ছেলেমেয়েদের দাওয়াত করে নতুন ছাচি লাউ দিয়ে ক্ষীর রান্না করে। কখনো বা দরিয়াবিবি নঈমাকে দেয়, ময়রার দোকান থেকে মিঠাই কিনে খেতে। আমিরন চাচীর ঘরে ছেলেমেয়েদের জন্য মোয়া, নাড়ু বরাবর মজুত থাকে। আজহার জীবিকা নির্বাহের তাগিদে রাজমিস্ত্রির কাজে ভিনগাঁয় গেলে কখনো কখনো রান্নাবান্নার ঝামেলা এড়াতে দু'পয়সার মুড়ি ও বাতাসায় রাতের ক্ষুধা মেটাতো। দরিয়াবিবির সাংসারিক অনটন সম্পর্কে অবহিত আমিরন চাচী কখনো কখনো তার প্রতি অভিমান করত, সে নিতান্ত প্রয়োজনেও চাচীকে আপন না ভাবায়। অথচ সাংসারিক প্রয়োজনে কারো সাহায্য গ্রহণ করতে দরিয়াবিবি বরাবর কুণ্ঠিত থাকত।

> উপবাস এই সংসারে দরিয়াবিবির জন্য অচেনা কিছু নয়। মাঝে মাঝে কোনদিন ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েরা হাঁড়িতে ভাত থাকা পর্যন্ত আর ক্ষান্ত হয় না। দরিয়াবিবি তখন পরিবেশন করিয়াই খুশি। এই চালাকি মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। তখন আমজাদ লজ্জিত হয়। নঈমা, শরীফা কি-বা বোঝে। আমিরন চাচীর কাছে ধরা পড়িলে দরিয়াবিবি খুব বকুনি খায়। একদিন ত চাচী অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, আমরা ত আত্মীয়-স্বজন নই, আমাদের কাছে কেন কিছু বলবেন, বুবু। দুমুঠো চাল কি তরকারী আমজাদকে দিয়ে আনালে কি আমি অসুবিধায় পড়তাম? (পৃ. ২৯৭)

খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে চুন দিয়ে পান খাওয়া ও হুকায় তামাক সেবন গ্রামীণ লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত। চন্দ্র কোটাল আজহারের বাড়িতে গেলে আমজাদকে দিয়ে সে দরিয়াবিবির কাছে চুন সহযোগে পান ও তামাক খাওয়ার আর্জি জানায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মহেশডাঙার বাসিন্দারা পান খেতে অভ্যস্ত। নারকেলী হুকায় তামাকের ধূমপানের অভ্যাস মহেশডাঙার গৃহস্থদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মহেশডাঙার পুরুষেরা হুকায় ধূমপানে অভ্যস্ত। এটি নিছকই অভ্যাস নয়, বরং বাড়িতে অতিথি এলে আতিথেয়তার অংশও বটে। চন্দ্রকোটাল আজহারের সঙ্গে দেখা করতে এলে দরিয়াবিবি আমুকে দিয়ে হুকা, তামাক ও পান পাঠায়। নিছক অভ্যাস হিসেবেই নয়, ক্ষেতে ফসল তোলা বা ফসল বোনার কাজে বিরতিকালে, এমনকি দুপুরে ও রাতে খাবারের পরও মহেশডাঙার গৃহস্থরা ধূমপানে মেতে ওঠে।

৬. লোকচিকিৎসা–– মহেশডাঙার গ্রামীণ সমাজে লোকচিকিৎসা বলতে প্রচলিত রয়েছে কবিরাজি চিকিৎসা। দূরবর্তী শহরে গিয়ে বেশি টাকা খরচ করে নামকরা চিকিৎসক দেখানোর সামর্থ্য তাদের নেই বললেই চলে। যে কোনো রোগের প্রতিকারার্থে গ্রামবাসী দরবেশ ও পীরের পানিপড়া, তাবিজ, ও মৌলবির দোয়া-দরুদের ফুঁকের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে তারা পীর-দরবেশের দরগায়, দেবতার মন্দিরে মানত পূর্ণ করা, হরির লুট প্রভৃতির আয়োজন করে। এছাড়া বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কারো বিপদ হলে টোটকা বা ঘরোয়া চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কেও তারা অবহিত। যেমন–

> ক. বাতাসে দরিয়াবিবির চুল এলোমেলো, হঠাৎ এক মুঠো খড় হাতে সে ডাকে, আমু, এদিকে আয় ত বাবা, আমার চোখে কি পড়েছে দ্যাখ্‌। ... দরিয়াবিবি ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়াছে। ... ভারী কর্‌কর্‌ করছে চোখটা। ... দরিয়াবিবি কাপড়ের খুঁটে মুখের ভাপ দিতে থাকে। ... আমজাদ ফালি লুঙি পরিয়াছিল। মা'র দেখাদেখি সে-ও লুঙির খোঁট মুখের ভিতর ঢুকায়। (পৃ. ১২৮-১২৯)

> খ. খলিলের ডান হাতের আঙুলের আগাগুলো ফোঁসকায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ... চটপট আলু বাটিতে বসিল আজহার। ... ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া আলুর পুল্‌টিশ বাঁধিয়া দিল আজহার। হাতের যন্ত্রণা কমিয়া আসিতেছে ধীরে ধীরে। (পৃ. ২১০)

> গ. (আজহার) জেলা-জেলান্তর ঘোরার ফলে বাঁকুড়ার দুরন্ত ম্যালোরিয়া আগেই দেহে বাসা বাঁধিয়াছিল। ... রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে এক মন্দিরের ঠাকুরের কাছ হইতে চন্দ্র গাছের শিকড় আনিয়া আজহারের হাতে বাঁধিয়া দিল। (পৃ. ২৯০)

> ঘ. সাকের ভাই কোথায়? ... এবার পায়ে চোট লেগেছে। চুন-হলুদ করে দিলাম কাল। আজ ভালো আছে। (পৃ. ২৯৫)

৭. লোকপ্রযুক্তি–– লোকসমাজে আধুনিক শিক্ষার অপ্রতুলতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ না পাওয়ার ব্যাপারটি বরাবর লক্ষণীয়। তবে তারাও প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারকে নানা প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের সামর্থ্য রাখে। বংশপরম্পরায় অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং স্বভাবগত কৌতূহল তাদের মনোলোকেও নতুন কিছু আবিষ্কারের ব্যাপারে উৎসাহ যোগায়। এ উপন্যাসে তেমন দৃষ্টান্ত স্বল্প হলেও লক্ষণীয়। যেমন––

> ক. চন্দ্র আবার উঠিয়া পড়িল। নদী-পথের দিকে তার মুখ। বাধা দিল আজহার। সে জিজ্ঞাসা করে, কি হলো চন্দর? ... সারাদিন রোদ পেয়েছে, তরমুজ খুব গরম। ছেলেটার খেয়ে আবার শরীর খারাপ করবে। ... আজহার ঈষৎ বিরক্ত হয়। ... এখন তবে কী করবে? ... নদীর হাঁটু-জলে বালির তলায় পাঁচ মিনিট রাখলেই, ব্যস। ... একদম বরফ। ব-র-ফ। (পৃ. ১৪৪)

> খ. দরিয়াবিবি মাটির ডিপা আর করঞ্জ তেল আনিল। কেরোসিন সব সময় কেনার পয়সা থাকে না। দরিয়াবিবি খুব ভোরে উঠিয়া করঞ্জ ফল কুড়াইয়া আনে। তাই কলুর ঘানি হইতে তেল হইয়া ফেরে। (পৃ. ১৫৫)

৮. লোকক্রীড়া–– এ উপন্যাসে যেসব লোকক্রীড়ার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো হলো লাঠিখেলা, লুকোচুরি ও মার্বেল খেলা। মোনাদির অন্য গ্রাম থেকে যখন মহেশডাঙায় ফিরে আসে, তখন আমজাদের জন্য লাটিম আনে। তারা আমিরন চাচীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মার্বেল খেলে। কারণ মার্বেল খেলার উপযোগী প্রশস্ত চত্বর তাদের বাড়িতে নেই। এছাড়া দুই ভাই কখনো কখনো মহেশডাঙার নির্জন অরণ্যে, তরুলতার জঙ্গলে, মূল ভিটার আশেপাশে লুকোচুরি খেলে। তাদের প্রতিবেশী সাকের লাঠিয়াল। মারমুখো ও দুরন্ত স্বভাবের সাকের ছোটবেলায় নিজের গরজে লাঠিখেলা শিখেছিল। সে জমিদারের হুকুমে বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করতে লাঠি চালায়। তাকে দেখে মোনাদির ও আমজাদের লাঠিখেলা শেখার শখ জাগে।

৯. বিনোদন–– এ উপন্যাসে মহেশডাঙার বাসিন্দাদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ভাড়-নাচের উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয়, গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজে নাচ-গান-বাজনাযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন বা

এতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবু লোকমানুষেরা সাংসারিক কর্মব্যস্ততা ও জীবিকা নির্বাহে পরিশ্রান্ত হলে ভাড়-নাচ দেখে পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী চন্দ্র কোটাল গান গাইলে আমজাদ তার প্রতি বিরক্ত হয়। কেননা, গান গাওয়া ইসলামী অনুশাসনে নিষিদ্ধ। তবে চন্দ্র কোটাল ধর্মীয় রীতিনীতি মান্য করার পরিবর্তে নিজের খেয়ালে চলতে আগ্রহী। জীবনসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে সে ভাড়-নাচের দল গঠন করে অভিনয় চালাত রঙ্গমঞ্চে। শুধু নিজ গ্রাম থেকেই নয়, আশপাশের গ্রাম থেকেও পূজা-পার্বণে তার দলকে বায়না করা হত। গ্রামবাসী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভাড়-নাচ উপভোগ করলেও একপর্যায়ে এলোকেশীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় চন্দ্র কোটাল অবশেষে গার্হস্থ্য জীবনে স্থিত হয়ে কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় কৃষিকাজের স্বল্প আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাওয়ায় এবং রাজেন্দ্রের মতো অর্থশালী যুবকের অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে সে পুনরায় ভাড়-নাচের দল চালায়। রাজেন্দ্র কৃষকের সন্তান হলেও অনেকদিন শহরে থেকে সেখানকার থিয়েটারে অভিনয় করে সুনাম কামিয়ে, ভাড়-নাচের ব্যাপারে খুঁটিনাটি পর্যন্ত জেনেবুঝেই চন্দ্র কোটালকে নিয়ে মহেশডাঙায় নিজেদের দল চালায়। যেমন অভিনয়ে, তেমনি গান গাইতে ও বেহালা বাজাতে সে পারদর্শী। অন্যদিকে চন্দ্র কোটালও যে কোনো পরিস্থিতিতে মুখে মুখে তৎক্ষণাৎ গান রচনা করতে পারদর্শী। কোন পালার অভিনয় করতে হবে, কাকে কোন চরিত্রে মানাবে, তাদের সাজসজ্জা ও পোশাকাদি, সবকিছুর ব্যাপারেই রাজেন্দ্র সচেতন। আজহার চন্দ্র কোটালের সঙ্গে আলাপকালে লক্ষ করে--

> চন্দ্র কোটাল অলস নয়। রোজগারের পন্থা সে সহজে আবিষ্কার করে। আজহার অবাক হইয়া গেল। চন্দ্র কোটাল বাস্তুর ঢিবির পাশেই আর এক চালাঘর তুলিয়াছে। তার ভিতর একটি ভাঙা হারমোনিয়াম, পুরাতন বেহালা, পরচুলা আর বাইজি সাজার পোশাক। (পৃ. ২৩৭)

'বস্ত্রহরণ পালা'র আয়োজন করে অচিরেই চন্দ্র কোটালের ভাড়-নাচের দল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যে বছর কৃষকদের ক্ষেতের ফসল বেশি ফলে, সে বছর তারা ভাড়-নাচের প্রতিও উৎসাহী হয়ে ওঠে। দশ-বিশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম-গঞ্জ থেকেও এ দলের জন্য বায়না আসায় চন্দ্র কোটালের দলের আর্থিক উন্নতিও দ্রুতই ঘটতে থাকে।

১০. লোকভাষা-- এর অন্তর্গত হলো লোকসমাজে প্রচলিত লোকভাষায় আশ্রিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ ও পদসমূহ, বাগধারা প্রভৃতি। লক্ষণীয়, গ্রামীণ সমাজে ব্যবহৃত হলেও লোকভাষা স্বভাবে একান্তই অমার্জিত ও রুচিহীন নয়। গালিগালাজ ও প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দরাশি, ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ, বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি লোকভাষায় লক্ষণীয়। এছাড়া আঞ্চলিকতার প্রভাবও এভাষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রাম, মফস্বল, শহর, নগর, বন্দর এমনকি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বা স্বল্পব্যবহৃত শব্দরাশিও লোকভাষার অন্তর্গত। তবে এ উপন্যাসে লেখক কুশীলবদের সংলাপ হিসেবে বেছে নিয়েছেন শিষ্টজনের উচ্চারিত প্রমিত বাংলা কথ্যরীতিকে, যা পাত্রপাত্রীর জীবনবাস্তবতা ও ভাষিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তেমন মানানসই হয়নি। এর ফলে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ লোকসমাজের প্রাত্যহিক জীবনে আশ্রিত মুখের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাঠক পায় না। অন্যদিকে, উপন্যাসের কোনো দৃশ্য বা পরিস্থিতির বিবৃতি, বর্ণনা এমনকি চরিত্রসমূহের অন্তর্ভাবনাকে ভাষ্যরূপ দিতে গিয়ে লেখক গ্রহণ করেছেন সংস্কৃতানুসারী গুরুগম্ভীর সাধু রীতিকে, যা বহুলাংশেই চরিত্রের মনোভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতাকে ক্ষুণ্ন করে। তবে, মহেশডাঙার বাসিন্দাদের ভাষার আস্বাদনে কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হয় চরিত্রসমূহের সংলাপে আশ্রিত বাগধারা, প্রবাদ, ছড়া, টিকা-টিপ্পনি ও রঙ্গ্য-ব্যঙ্গ, দেশজ কথ্য শব্দ ও পদসমূহের সমাহারে। বাঙালি মুসলমান কৃষক জীবনের ইতিবৃত্ত উপস্থাপনায় তিনি প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দরাশিও নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। এ উপন্যাসে লোকভাষার অন্তর্গত উপাদানসমূহের মধ্যে শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১০.১ শব্দভাণ্ডার

দেশজ শব্দরাশি-- পাতাপুতি, ডোবা, বেউড়, চাতাল, উঠান, মজা, হলকা, আঁটি, মুঠি, কুঁচো, খড়কুটো, খামাখা, দমকা, ফুড়ুক, ঝিলিক, গুড়ুক, বাজখাঁই, দাউদাউ, ঝাঁকড়া, পিচুটি, উস্‌খুস্‌, ছাঁচি, কড়ে, খুঁতখুঁত, টিপ্‌পনী, চাড়, কোল, পাড়া, কোন্দল, মেলা, গুম, ঘাট, কোল, ঘুপটি, চাঁটি, ঝোপ, পিঠুলি, দমকা, হাঁপ, পশলা, আঁজলা, ঝামাল, ঢেলা, ভ্যাবাচ্যাকা, জাবর, টোকা, আল, এলোপাথাড়ি, প্যাঁচাল, সটান, হেঁয়ালি, ঝাঁকড়া, বিবাগী, হল্লা, খটকা, ধাড়ী, ন্যাওটা, হল্লা, লণ্ডভণ্ড, মশকরা, ভাঁটা, চোঁয়াড়ে, ডিংরে, বেয়াড়া, গুড়ুম, প্যানপ্যান, লুটেপুটে, ছিট, খটকা, ছ্যাচড়, মুনিশ, পুটুলি, উস্‌খুস্‌, ভ্যাপসা, খোয়ারি, কুটনি, ঘাবড়ে, হিমশিম, পোয়াতি, ঝুনঝাট প্রভৃতি।

ক্রিয়া-- ঠেকে, সেঁকিতে, ঝাঁপাইয়া, ঢালিতে, ঝেটিয়ো, ছুঁতে, চাখিবার, নিভিয়া, চুকিয়া, খেটেপুটে, গুঁজিয়া, মুছাইয়া, ঢুলিতে, পুঁতেছিলুম, চুকিয়াছে, গুটাইতে, হেলানো, ঘামিয়া, কুঁচকাইতেছিল, বকাসনি, ঝেটোনো, ঝিমাইতেছিল, খেটেপুঁটে, ভাসিয়া, ঢুলিতেছিল, ভ্যাবাচ্ছে, চোঁয়াইতে, সোঁধায়, বাছিতে, বহিয়া, ঢলিয়া, হাঁকছিলে, গিলেছি, জুড়িয়া, কুটিতে, জিরোই, থমকিয়া, চটাইতে, চুকাইয়া, ঠেঙাইতে, সেঁধোবে, থমকিয়া, কুটিতে, মুষড়াইয়া প্রভৃতি।

বিশেষণ-- চাড়, ফিকে, তোলপাড়, দমকা, কুঁচানো, খামাখা, ফালি, সিদরে, ঝাঁকড়া, উসখুস, ক্ষওয়া, খোঁটা, দুঁদে, গুঁতো, খেই, তেতে, ঝলসানো, কুচকুচে, ভ্যাবাচ্যাকা, এলোপাতাড়ি, প্যাঁচাল, পিটপাট, দুলকি, খটকা, ধাড়ী, চাঁচাছোলা, ফ্যাকাশে, ডরুক, উপচিয়া, ধান্দা, ডিংরে প্রভৃতি।

অনুকার অব্যয়-- দুম্‌দুম্‌, চিড়বিড়, কর্‌কর্‌, ফুড়ুক-ফুড়ুক, ঝিরিঝিরি, খলখল, হুড়ুম-দুড়ুম, ঝম্‌ঝম্‌, হাউমাউ, ভক্‌ভক্‌, ঝনঝনা, হাঁপাহাঁপি, খনখনে, ঝমঝম, ঠক্‌ঠক্‌, হাঁকাহাঁকি, টসটস, প্যানপ্যান, গনগনে প্রভৃতি।

১০.২ বাগধারা-- পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে বক্তার মনের ভাব শ্রোতার নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে বাগধারার ভূমিকা রয়েছে। লোকসমাজের ভাষিক ভুবনে বাগধারার ব্যবহার অনায়াসেই ঘটে থাকে। কথোপকথনের বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী বাগধারার ব্যবহার বক্তার মনোভঙ্গিকে স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল করে তোলে। যেহেতু এসব বাগধারা লোকসমাজে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয় মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে, তাই মহেশডাঙার লোকমানুষের প্রাত্যহিক ভাষায় এর উপস্থিতি লক্ষণীয়।

দেখি, কোন দিকের জল কোন দিকে গড়ায়। কার কপাল কত চওড়া হয়, দেখা যাক। (পৃ. ১৪৫)

দরিয়াবিবি ব্যঙ্গ স্বরে বলে, ওই মুখে ফুল-চন্দন দিতে ইচ্ছা করে। (পৃ. ১৬২)

সারাদিন কত কাজ করি, তবু মা'র কাছে গিয়ে লাগাবে, তোমার বউ পটের বিবি হয়ে শুয়ে থাকে। (পৃ. ১৬৪)

পরের হাত-তোলা খাওয়ার দরকার নেই আমার। (পৃ. ১৬৫)

কখন থেকে বসে আছি। ডুমুর ফুলের খোঁজ নেই। (পৃ. ১৭০)

আমাদের অবস্থা দেখছ না? হাত জানে ত মুখ জানে না। (পৃ. ১৭১)

যা, আর কথার খই ফোটাতে হবে না। (পৃ. ১৮০)

নদীর মোহনার কাছে একটা পিঠুলী গাছের তলায় বসিয়া আমজাদ আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। (পৃ. ১৮৪)

তুমিও দিদি, সামান্য বাতাসেই হেলে পড়ো? (পৃ. ১৮৮)

বৌ নিয়ে হাড় মাংস পুড়ে ছাই হতে বসেছে। (পৃ. ১৯৮)

তুমি আর অত ফফর-দালালি করো না। (পৃ. ২০১)

দরিয়া ভাবী বলে সংসার করছে, আর কেউ হোলে টি টি করে ছাড়ত। (পৃ. ২১২)

হাঁড়ির খবর আর হাটে ভেঙে লাভ নেই। (পৃ. ২১২)

বুড়ো পাখি কী পোষ মানে বৌমা, চাল-ছোলা খাওয়ানোই সার। (পৃ. ২১৯)

আমজাদ থ বনিয়া গেল। (পৃ. ২২০)

পয়পয় করে মানা করেছি, কবরস্থানের দিকে যাস নে বাবা–বাবারা কান কুলো করে বসে থাকবে। (পৃ. ২২৫)

একদম ভিজে বেড়াল-ছানা বনে গেলি যে (পৃ. ২৩০)

দেখি কপাল ঠুকে–যা আছে ভাগ্যে। (পৃ. ২৩৯)

চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি। (পৃ. ২৪০)

চন্দ্র কোটাল পালের গোদা সাজিয়াছে। (পৃ. ২৫২)

দাদা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, আমরা উলুখড়। (পৃ. ২৬২)

মনের সুখে সে হাতের সাধ মিটাইল। (পৃ. ২৬৫)

যখন কেউ বিনা দোষে তোমার উপর জুলুম করে, তখন ত ভিজে বিড়াল সেজে বসে রইলে। (পৃ. ২৬৬)

আজ মোনাদির কি আজহারের প্রসঙ্গ আমিরন চাচী মুখ দিয়া বাহির করিল না, পাছে দরিয়াবিবি কষ্ট পায় বা হঠাৎ কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়। (পৃ. ২৮৬)

পান হইতে চুন খসিলে শাঁসানি-বকুনি। (পৃ. ৩০০)

গৃহে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর উপায় নাই। তা-ই হইল। ইয়াকুবের অগস্ত্য যাত্রা। (পৃ. ৩১২)

শওকত ওসমানের Rbbx উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙা গ্রামের লোকসমাজের চালচিত্র বিশ্বস্ত শিল্পভাষ্যে উত্তীর্ণ। মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে সেখানকার শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষেরা নিত্যদিনের দিনযাপনে বংশপরম্পরায় বহমান লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাদের সমষ্টিচেতনায় সন্নিহিত এসব লোকজ উপাদান এ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচয় নির্দেশের স্মারক। এ উপন্যাসভুক্ত লোকসমাজের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক ওঠাবসায়, চালচলনে, আলাপচারিতায় বহুযুগ ধরে মেনে চলা বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধের পেছনে বিশেষভাবে সন্নিহিত রয়েছে যাবতীয় বিপদ, প্রতিকূলতা, লক্ষ্য অর্জনের বাধাকে পরাভূত করে পরিবাব-পরিজনকে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রত্যাশা। সমষ্টিমানুষের সংহতি ও মানবিক চেতনার উজ্জীবনের তাগিদে এ উপন্যাসে বাঙালি লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানসমূহ প্রযুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

প্রাগ্রসর জীবনবোধ, শৈল্পিক উৎকর্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক মনোভঙ্গিসমৃদ্ধ লেখনীর মাধ্যমে পাঠকসমাজের চেতনালোকে নতুনভাবে আলোড়ন সৃষ্টির বিস্ময়কর সামর্থ্যের পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সচেতন আধুনিক কথাশিল্পীর গৌরবান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)। পূর্ব-পাকিস্তানের কথাসাহিত্যের স্বতন্ত্র মেজাজ ও ধরনকে তিনিই প্রথম সনাক্ত করেন এবং গল্প, উপন্যাসে নিজস্ব ভঙ্গিতে পুটিয়ে তোলেন। তাঁর সমকালীন কথাশিল্পী শওকত ওসমান 'দেশ' পত্রিকায় অভিমত জানিয়েছিলেন– 'বাঙালি-মুসলমানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে সত্যিকার চেতনা নির্মাণের দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁদের অন্যতম মহৎ

কারিগর।'[৪৭] পারিবারিক অবস্থান, সামাজিক কর্মবলয়ে বিশিষ্ট পরিচিতি, পঠন-পাঠনগত বিপুল অধ্যবসায়, শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অন্তরঙ্গ অনুরাগবশত লেখালেখিতে এর সাক্ষর রাখার পরিশ্রমী অভিনিবেশ অব্যাহত রাখা সর্বোপরি দৈশিক ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে কর্মপরিসরে যোগাযোগ সাধন প্রভৃতির সমবায়ে যে ব্যতিক্রমী শিল্পমনীষাকে তিনি ক্রমশ আত্মস্থ করেছিলেন, এর যোগ্য দৃষ্টান্ত সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে রীতিমতো ব্যতিক্রমী ঘটনা। সতের বছর বয়সে 'সীমাহীন এক নিমিষে' গল্প লিখে ব্যক্তিক নৈঃসঙ্গ্যবোধের উপলব্ধিকে তিনি যেভাবে রূপায়িত করেছেন, এ ভাবনা তাঁর সমগ্র সাহিত্যভাবনাতেই গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ পেয়েছে। স্বল্পসংখ্যক গল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখেই তিনি নিজের সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলেছেন বাংলাদেশের সাহিত্যবলয়ে। গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর জিজ্ঞাসাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং গোঁড়ামিমুক্ত, পক্ষপাতহীন ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) প্রভৃতি উপন্যাসে, 'বহিপীর (১৯৬০) ও তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪) নাটকদ্বয়ে। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের তাড়নাবশত তিনি যে সাহিত্যকর্মে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলোতে। পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও আদর্শ, দার্শনিক ভাবনা ও ব্যক্তির অস্তিত্বজিজ্ঞাসাকে তিনি নিগূঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সেকারণেই তাঁর উপন্যাসে এসবের প্রতিফলনও লক্ষণীয়। 'শিল্পপ্রমূর্তির প্রশ্নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তপস্যাশুদ্ধ, অতিক্রমণের প্রশ্নে পরীক্ষাপ্রিয়। যুগচৈতন্যের দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ সমাজমর্মমূলে শিকড়সঞ্চার করে তাঁর উদ্ভব। শিল্পবোধ ও শিল্পসূত্রের প্রশ্নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন পূর্বাপর সপ্রতিভ, সতর্ক ও বিশ্বপ্রসারিত। জীবন-অনুধাবন ও শিল্পপ্রকরণে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র এবং ক্রমাগত সূক্ষ্মতর সৃষ্টি-সাফল্যের অভিযাত্রী। তাঁর লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা এবং কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাস-ত্রয়ের কোনটিই ঘটনাভুক কিংবা সংবাদপ্রিয় পাঠকশাসিত নয়; বরং মেধাবী হৃদয় আর আত্মসন্ধানী ব্যক্তির জন্য মূলত প্রতীক্ষাপ্রবণ।[৪৮] অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ধরনের গদ্যরীতি এবং তীক্ষ্ম, শাণিত ভাষা, শিল্পময় পরিচর্যকৌশল ও অপ্রচলিত আখ্যানবিন্যাসের গুণে তাঁর উপন্যাসগুলো বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার পথনির্মাণ করেছে। সেকারণেই শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যপাঠক ও সমালোচকমহলেও তাঁকে নিয়ে আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা ক্রমশ বাড়ছে।[৪৯] ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'কদর্য এশীয়' এবং 'কীভাবে শিম রান্না করতে হয়' উপন্যাসদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল ও রাজনীতি, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী অবস্থান এবং যুদ্ধবিরোধী চেতনা সম্পর্কে তিনি কতটা প্রাগ্রসর এবং সচেতন ছিলেন।

jvjmvj

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) ধর্মভাবনা ও সমাজচিন্তার অনন্য নিদর্শন তাঁর প্রথম উপন্যাস jvjmালু[৫০] (১৯৪৮)। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মচেতনার স্বরূপ অনুধাবনে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ[৫১] এ উপন্যাসের আদ্যন্ত লক্ষণীয়। শস্যহীন জনবহুল দারিদ্র্যপীড়িত যে অঞ্চলের বাসিন্দাদের কঠোর জীবনসংগ্রামের বৃত্তান্ত জানিয়েছেন তিনি এ উপন্যাসে, এর নাম অনুল্লেখিত। তবে এতে বিবৃত একাধিক দৃশ্যে সমগ্র দেশের উল্লেখ থেকে ধারণা করা সম্ভব, তিনি প্রকারান্তরে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানকেই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট[৫২] হিসেবে নির্দেশ করেছেন। ফলে, মহব্বতনগর নির্দিষ্ট স্থানিক ও ভৌগোলিক সীমারেখায় গণ্ডিবদ্ধ না থেকে সম্প্রসারিত অর্থে সমগ্র দেশেরই রূপকে উন্নীত হয়। এ উপন্যাসে প্রকৃতিনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের অদৃষ্টবাদী

জীবনদৃষ্টি ও লোকজচেতনার সঙ্গে শাস্ত্রীয় ধর্মাদর্শের অন্তর্গত আচারসর্বস্বতার সংঘাত রূপায়িত হলেও লেখকের শিল্পদৃষ্টি এক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন।[৫৩] তাই তিনি মহব্বতনগরের লোকসমাজের জীবনসংগ্রামের চালচিত্র গ্রন্থনায় আগ্রহী হলেও তাদের নিত্যদিনের বিবিধ প্রতিকূলতা ও সংকটের সমাধান নির্দেশে নীরবতা মান্য করেন। কেননা, বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের সামগ্রিক অবস্থা অনুধাবন করুক, সমস্যা চিহ্নিত করে এর সমাধানে অগ্রসর হোক, উপন্যাসটি পাঠ করলে লেখকের এরূপ অভিপ্রায়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে বাঙালি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করা চলে।

১. লোকসংস্কার-- এ উপন্যাসে মহব্বতনগরের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার ও মূল্যবোধের প্রাধান্য রয়েছে। এছাড়া নারীর আচার-আচরণ, কৃষিকর্ম, গার্হস্থ্য ও অশুভ-অমঙ্গল, জ্বিন-ভূত সংক্রান্ত নানা লোকসংস্কার, এ উপন্যাসেও লক্ষণীয়।

১.১ পীরকে ভক্তি ও মাজারপূজা-- পীরপূজা, পীরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন, তার অলৌকিক ক্ষমতায় ভক্তি নিবেদন, তার দোয়া-দরুদ পড়া পানি পান, তাবিজ ধারণের মাধ্যমে অসুস্থতা ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এর অন্তর্গত। আউয়ালপুরের পীরের বৃত্তান্তে এসবের উল্লেখ লক্ষণীয়। লেখক জানিয়েছেন, সারা দেশেই পীরদের সফর শুরু হয় এমন সময়ে, যখন গৃহস্থদের গোলা নতুন ফসলে ভরপুর থাকে এবং আর্থিকভাবেও তারা স্বচ্ছল। গ্রামবাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য পীরদের বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। মহব্বতনগর থেকে তিন গ্রাম দূরবর্তী আউয়ালপুরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব মিঞার বাড়িতে আগত জনৈক পীর সম্পর্কে নানা কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভাগ্যান্বেষণে তার পূর্বপুরুষদের এদেশে আগমনকাল স্মরণে রাখতে এক পাঠান বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে মিলিয়ে সেই দিনক্ষণ স্থির করা হয়। দ্বিতীয়ত, পারিবারিকভাবে ময়মনসিংহে বসবাসের সূত্রে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারে সে অভ্যস্ত হলেও ভক্তবৃন্দের নিকট হতে সমাদর লাভের জন্য উত্তর ভারত থেকে উর্দু ভাষা শিখে আসে। যৌবনে তার দুচোখে আগুন জ্বলত, সে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এবং মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে, এমনকি সূর্যকে ধরে রাখার ক্ষমতাও তার রয়েছে, এরূপ কাহিনী পীর হিসেবে তার মহিমাকে লোকসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করে। কাজেই তার উপস্থিতিতে মহব্বতনগরের ধর্মান্ধ মানুষেরা যখন মোদাচ্ছের পীরের মাজার ছেড়ে সেদিকে ধাবিত হয়, এ ঘটনা মজিদকে বহুদিন পর পুনরায় অস্তিত্বসংকটে ধাবিত করে। 'জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। 'ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত মিলিয়ে যাবে, অন্য আরেক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে' (পৃ. ৩২)।[৫৪] তাই আউয়ালপুরে আগত পীরের প্রতারণা জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য সে সমাবেশে উপস্থিত হয় এবং তার বিরাট ভক্তমণ্ডলীর ভাবোন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আসরের ওয়াক্তে জোহরের নামাজ পড়িয়ে সেই পীর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নামাজকে মকরুহ করছে, যার ফলে তারা গুনাহের ভাগীদার হচ্ছে-- এ অভিযোগ তুলে মজিদ অবশেষে সেই পীরের ভণ্ডামিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে। এর ফলে অচিরেই মহব্বতনগরের বাসিন্দাদের সঙ্গে উক্ত পীরের কলহ বাঁধে। ধর্মকে পুঁজি করে স্বার্থান্বেষী মহলের অপতৎপরতার স্বরূপ উপস্থাপনায় লেখক এ উপন্যাসে সচেষ্ট। এ ঘটনার পরিণতিতে খালেক ব্যাপারী সিদ্ধান্ত জানায় 'এ গ্রামের কোন মানুষ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না' (পৃ. ৩৮)। কাজেই তার প্রথম স্ত্রী আমেনা বিবি যখন দীর্ঘ সতের বছর দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়ে উক্ত পীরের পানিপড়ার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে, তখন তাকে মজিদের নির্মম আচরণের পরিণতিতে মিথ্যা কলঙ্কের অভিযোগ মেনে নিয়ে সংসারের গণ্ডি পরিত্যাগ করতে হয়। খালেক ব্যাপারীর কাছে মজিদ স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিল, কেন সে আমেনা বিবির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছে –'খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল? আমার মুখে কী জোর নাই? (পৃ. ৪৫)। মজিদের প্রতি আমেনা বিবির ভক্তি ছিল না। তবু পেটে বেড়ি পড়েছে বলেই সে সন্তান ধারণে অসমর্থ– মজিদের এরূপ সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হয়ে আমেনা বিবি এ সমস্যার সমাধানের জন্য মজিদের নির্দেশ অনুসারে তার পড়া

পানি গোসলের আগে পেটে মেখে, শুদ্ধ হয়ে মাজারে সাতবার ঘুরে। কিন্তু তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যায়। কেননা, মজিদ ধর্মপতি হিসেবে তার সংসার তছনছের পরিকল্পনাকে অবশেষে কার্যকর করেছিল খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তালাক পাঠানোর মাধ্যমে। ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের উপায় হিসেবে পীরবাদ, মাজারপূজা প্রভৃতি লোকসমাজে যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, তা এসব ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে মজিদ গ্রামবাসীর অজ্ঞাত মোদাচ্ছের পীরের মাজারের ব্যাপারে তাদের ভৎর্সনা করে এবং এ বিষয়টিকে ভিত্তি করেই নিজের আখের গুছিয়ে নিতে চায়।

> আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন? ... গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। ... সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ... যেন একদিন কার বাগান ছিলো সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ। যুগযুগের হাওয়ায় কালচে।... ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার? ভেতরে সুড়ঙ্গের মত। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার? (পৃ. ৭)

গ্রামবাসীর মধ্যে মোদাচ্ছের পীরের ব্যাপারে কোনো সংশয় জাগে না। কেননা, তারা ইতোমধ্যেই আউয়ালপুরের পীরকে পূজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ প্রবণতা আরো বাড়ে, যখন মজিদ মোদাচ্ছের পীরের কবরকে লাল সালুতে মোড়ানো দরগায় রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাত্যহিক নানা প্রয়োজনে গ্রামবাসীকে এর ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।

> ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোন মানুষের কবরের মত নোতুন দেহ ধারণ করলো। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মত সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগলো, মোমবাতি জ্বলতে লাগলো রাতদিন। ... এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে লোকেরা আসতে লাগলো। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মত অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগলো দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা– ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগলো। (পৃ. ৮-৯)

ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে কড়াকড়িভাবে পালনে সহায়তার ছলে মজিদ সুকৌশলে গ্রামবাসীকে মাজারের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। তাহের-কাদেরের বাপকে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্নি বিতরণের নির্দেশ, কোনো প্রয়োজনে গ্রামবাসীর মাজার জিয়ারত করে মানত হিসেবে পয়সা বিতরণ, মাজারকে ঘিরে জিকিরের আয়োজন, আমেনা বিবির ওপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের পাশাপাশি তার বন্ধ্যাত্ব মোচনের উপায় হিসেবে সাতবার মাজার জিয়ারত করা, এমনকি জিনের আসরের প্রভাবে জমিলা মজিদের মুখে থুথু ছুঁড়ে মেরেছে– এ অভিযোগে তাকে সারারাত মাজারঘরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা প্রভৃতি ঘটনার অন্তরালে মজিদের অভিপ্রায় ছিল মাজারের প্রতি গ্রামবাসীর সমীহ বৃদ্ধি করা।

> নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে-শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। ... মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল। (পৃ. ১৫)

মোদাচ্ছের পীরকে গ্রামবাসীর নিকট মাহাত্ম্যব্যঞ্জক ভাবমূর্তিকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মজিদের পরিকল্পনায় তার স্ত্রী রহীমার পরোক্ষভাবে ভুমিকা পালনের বিষয়টিও লক্ষণীয়। মজিদের স্ত্রী হিসেবে গ্রামের নারীমহল যে তার দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য, সুচতুর মজিদ বিষয়টি জানত। তাই সে রহীমাকে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনে অভ্যস্ত করতে তৎপর ছিল। মজিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ অসম্ভব বলেই হাসুনির মা তার বাবা-মায়ের দাম্পত্য কলহের অবসানের বিষয়টি রহীমার কাছে জানিয়েছিল। অন্যদিকে, গ্রামবাসীর মতো রহীমার চেতনালোকেও মোদাচ্ছের পীর ও তার মাজার ক্রমশই অস্তিত্বশীল হয়ে উঠেছিল।

> রহীমা শোনে তাদের [গ্রামবাসী নারীদের] কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মত স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, ... ভাবে, কোন মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন–যাঁর রুহ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে ... কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহীমা একটা আর্জি জানায়। বলে, তার সন্তান নেই: সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। ... কোনদিন রহীমা সারা মানবজাতির জন্য দোয়া করে। ও-পাড়ার ছুনুর বাপ মরণরোগে যন্ত্রণাা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে–তার ওপর করুণা করো। কারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপরও করুণা করো, রহমত করো। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়। (পৃ. ১৫-১৬)

১.২ নারীর আচরণ ও চালচলন সম্পর্কিত–– পুরুষতন্ত্রের মূল অভিপ্রায়ই হলো যে কোনোভাবে পারিবারিক ও সাংসারিক গণ্ডিতে নারীকে আবদ্ধ রাখা। সেটি কখনোবা ধর্মীয় বিধানের ছলেই হোক, অথবা স্ত্রী-জননী-পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে নারীকে নির্দিষ্ট সাংসারিক ভূমিকা পালনে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে হোক। নারী যেন কখনো পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে না পারে, সে ব্যাপারে পুরুষতন্ত্র অত্যন্ত সচেতন। মজিদ মহব্বতনগরে আস্তানা গড়ে তোলার পর রহীমাকে যেভাবে করায়ত্ত করে ধর্মীয় রীতিনীতি মান্য করিয়ে––এর দ্বারা গ্রামবাসী অচিরেই প্রভাবিত হয়। কেননা, রহীমাও এ গ্রামেরই মেয়ে। কাজেই ধূর্ত ও শঠ মজিদের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় রহীমার ভূমিকা বরাবর স্বামীকে প্রভুর মতো মর্যাদা দান, তার আদেশ-নিষেধের শৃঙ্খলে নিজেকে আটকে রেখে পারলৌকিক কল্যাণের প্রত্যাশা। রহীমার স্বাধীন, নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে প্রতিনিয়ত অবদমিত করার নির্দেশ ধর্মান্ধ মজিদের আচরণে, সংলাপে, প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে মজিদের ধর্মীয় নেতৃত্ব, মোদাচ্ছের পীরের শিষ্যত্ব ও তার অলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত কিংবদন্তিতুল্য প্রচার।

> ক. ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, ... অমন করি হাঁটতে নাই। ... অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা– শেষে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুণাহ। ... এ-কথা আগেও শুনেছে মজিদ। মুরুব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়রা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়। ... মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে রহীমার চোখে ভয়। ... মধুরভাবে হেসে আবার বলে, ... অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে। (পৃ. ৯-১০)

> খ. পুকুরে গোসল করে সিক্ত বসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহীমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির আল পায় না, সে-দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে। কিন্তু রহীমার চেতনা নেই। ... গলা কেশে মজিদ বলে, ... খোলা জাগায় অমন বেশরমের মত দাঁড়াইও না বিবি। ... সচকিত হয়ে রহীমা হাত নামায়, বুকে ভালো করে আঁচল দেয়, পেছনে সাপ্‌টে থাকা কাপড় আলগা করে দিয়ে এধার- ওধার যেন বেগানা-বেগায়ের লোকের সন্ধানে তাকায়। ...অবশেষে লজ্জা আসে রহীমার সারা দেহে। দ্রুত পায়ে সে আড়ালে চলে যায়। (পৃ. ১০)

> গ. মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহীমার ওপর। মেয়েমানুষেরা আসে তার কাছে। ...প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ একে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। ... মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা। ... রহীমা শোনে তাদের কথা। (পৃ. ১৫)

‘ক’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লোকসমাজে ভূমিসংলগ্ন আদিম সংস্কারের প্রতি ভীতিব্যঞ্জক শ্রদ্ধাবোধের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। মানুষ মাটির সন্তান, তাই তাকে মৃত্যুর পর মাটির বুকে আশ্রয় নিতে হয়। গর্বভরে দাপটের সঙ্গে মাটিতে হাঁটলে মৃত্যুর পর কবরে তাকে শাস্তি পেতে হবে, এরূপ ভাবনা রহীমাকে স্বীয় আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করতে পারেনি। কারণ, লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার ও মূল্যবোধের প্রতি লোকমানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই কঠোর

শৃঙ্খলায় আবদ্ধ নয়। সেকারণেই এসবের প্রতি একধরনের ঔদাসীন্য বা নিষ্ক্রিয় মনোভঙ্গি কারো কারো আচরণে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অথচ মজিদ যখন সে বিষয়টিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় মৃত্যুত্তর শাস্তির অনুষঙ্গে, তখন রহীমার মনোলোকে ভীতিবোধ জাগ্রত হয়। ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি লোকসমাজের ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায় মজিদকে এরূপ আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রহীমার সহজাত আচরণের ওপর মজিদের নিষেধাজ্ঞা আরোপের অবলম্বন হয়েছে পর্দাপ্রথা মান্য করার মাধ্যমে পরপুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নারীর সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়টি। অথচ এ উদ্ধৃতিতে মজিদ নিজেই রহীমার প্রতি কামুক ভাবনায় নিমগ্ন। স্বামীর আদেশ মেনে চলতে অভ্যস্ত রহীমা নির্দ্বিধায় নিজের ইচ্ছা, আবেগকে পরিহার করে এবং এভাবেই নিজের পছন্দ, অভিরুচিকে বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমে সে ক্রমশই স্ত্রী থেকে সেবাদাসীতে অবনমিত হয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লোকসমাজে ধর্মের আধিপত্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলে, এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। শঠ, প্রতারক মজিদ মিথ্যা স্বপ্নের বয়ানকে হাতিয়ার করে মোদাচ্ছের পীরের ভক্ত হিসেবে মহব্বতনগরে ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার করে। এ চক্রান্তের অংশ হিসেবেই সে স্ত্রী রহীমাকেও বশীভূত করে। রহীমার আচার-ব্যবহারের রূপান্তর গ্রামের নারীমহলকে ভাবিত করে। কেননা, ধর্মীয় সংস্কার মান্য করার ঝোঁক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণেই নারীদের মধ্যে অধিক সক্রিয়। পুরুষ হিসেবে যা সম্ভব ছিল না, তা রহীমার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় মহব্বতনগরে মজিদের সর্বাধিপত্য বিস্তার ক্রমশই সহজ হয়ে ওঠে।

১.৩ জিন, ভূত-প্রেত সংক্রান্ত–

> ক. আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝখানে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ পড়ে, এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমত দেবংশি। ... কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ঐ তেঁতুল গাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ... রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। (পৃ. ৪২-৪৩)

> খ. আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূত-প্রেতও রক্ষা পায় নাই। এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। ... জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এই সব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক প্রহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। ... ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহীমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে ... হে কই? ... মাজারে। ... ও ভয় পাইব না? ... কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ঐ দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে। (পৃ. ৮৫-৮৬)

> গ. আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মত খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো ... দিনের বেলা হলে ... বউরা আসতো বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটতো বাইরে, লুফে-লুফে খেতো খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা। ... ছেলে ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে–তা দিন-রাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে মাঠে নধর-কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার যাত্রীদের মত আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে। (পৃ. ৮৮)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ভূত-প্রেত সম্পর্কে লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ধলা মিঞাকে কীভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে, সেই ইঙ্গিত লক্ষণীয়। তেতুল গাছ ভূত-প্রেতদের আশ্রয়স্থল, তদুপরি আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝখানে জন্মানো গাছটিতে ব্রহ্মদৈত্য থাকে; এরূপ গালগল্প বহুদিন থেকেই গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেকারণেই অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধলা মিঞার নিকট অবাস্তব, অযৌক্তিক বিষয়ও কীভাবে বাস্তবতুল্য বলে গণ্য হয়, তা অনুধাবনের জন্য লেখক এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মহব্বতনগরের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তি মজিদের সর্বাধিপত্য ও দাপটের স্বরূপ পারস্পরিক সংলাপে প্রকাশিত। ধর্মকে হাতিয়ার করে সে যেভাবে লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউই নেই। মহব্বতনগরের গ্রামবাসীর পাশাপাশি

জ্বিন, ভূত-প্রেতদের নিয়ে গড়ে ওঠা যে অশরীরী জগতের অস্তিত্ব লোকসমাজে উপস্থিত, সেখানেও মজিদের একক কর্তৃত্ব স্বীকৃত বলে সে গ্রামবাসীকে ধারণা দেয়। ধর্মকে আত্মস্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত মজিদের প্রতারক স্বভাব তার দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলার কাছে ধরা পড়লে সে তার ধর্মীয় নেতৃত্বকে লাঞ্ছিত করে। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে অবশেষে মজিদ মিথ্যার শরণাপন্ন হয়, জমিলাকে জিনেধরা নারী হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত রয়েছে শয়তান ও স্রষ্টার সাংঘর্ষিক সম্পর্কের বৃত্তান্তে। বিজ্ঞানচেতনাহীন মানুষেরা মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে শিলা বর্ষণের যুক্তিনিষ্ঠ, কার্যকারণসম্মত ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ না হলেও এ ঘটনাকে নিজেদের অবাধ কল্পনার আশ্রয়ে কাহিনীর মাধ্যমে লোকসমাজে বহুদিন আগেই প্রচলিত করেছে। তবে এ উদ্ধৃতির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো, ফসলকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার জন্য ধর্মভীরু মানুষদের দোয়া-দরুদ পড়ে স্রষ্টার নিকট করুণা প্রার্থনা করার বিষয়টি। কেননা, স্রষ্টার রহমত বর্ষিত হলে তারা এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হবে, এরূপ আশাবাদ তাদের চেতনালোকে গভীরভাবে প্রোথিত, যার মূলে রয়েছে অদৃষ্টবাদী জীবনভাবনা।

১.৪ অন্যান্য-- কাউকে অভিশাপ দেয়ার ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকে একের অমঙ্গল কামনায় অন্যের সক্রিয়তা। পারস্পরিক সম্পর্কের বৈরিতা থেকে লোকমানুষের মধ্যে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, তা তাকে উদ্বুদ্ধ করে অন্যের অকল্যাণ বা অশান্তি ত্বরান্বিত করতে। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় না। তবু লোকসমাজে এ ধরনের আচরণ প্রচলিত রয়েছে, সম্ভবত ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এরূপ ব্যক্তির নিজেকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে। যার দ্বারা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, তার উদ্দেশ্যে অভিশাপ উচ্চারণ করে সেই কাজ থেকে বিরত রাখার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে লক্ষণীয়। পাশাপাশি, কোনো অনিষ্ট বা ক্ষতি সাধিত হয়ে গেলে এর দায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর চাপিয়ে পরোক্ষভাবে পরিতৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যও অভিশাপ উচ্চারণের পেছনে উপস্থিত থাকে। এছাড়া, নিজের অনিষ্ট চেয়ে কাউকে অনুরোধ করাও লোকসমাজে অশুভ ভাবনা হিসেবে স্বীকৃত। দিব্যি দেয়ার অন্তরালে সক্রিয় থাকে উচ্চারণকারীর বক্তব্যকে শ্রোতার কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করানোর অভিপ্রায়। সেকারণেই বিশেষ কারো নামে (প্রায়শই স্রষ্টা বা ধর্মীয় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কারো নামে) প্রতিজ্ঞা করা বা শপথ নেয়ার রীতি লোকসমাজে প্রচলিত।

> ক. জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মত মেয়েটি যেন এ সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বালা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। ... ওদিক থেকে ফিরে রহীমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে–বিবি শোন। তোমার লগে কথা আছে। ... বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলা নি? ... তওবা-তওবা, কী যে কন। (পৃ. ৭৯)

> খ. একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরানো আর্জি জানায়। রহীমাকে বলে, ... ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়। ... হঠাৎ রহীমা রুষ্ট স্বরে বলে ... অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে। (পৃ. ২৮)

> গ. গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না [বুড়ি] তখন শেষ অস্ত্র হানে। –ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী–হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না। (পৃ. ১৭)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গ্রামবাসীর নিকট প্রতিষ্ঠিত মজিদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পীরসুলভ মর্যাদা বিঘ্নিত হয় কিশোরী জমিলাকে বিয়ের পরিণতিতে। বয়সের অসম ব্যবধান, ধর্মাচারের দোহাই দিয়ে জোরপূর্বক জীবনের আনন্দ-উল্লাসকে পদদলিত করে স্বামী হিসেবে তার হুকুমের দাসীতে পরিণত করার বিরুদ্ধে জমিলার প্রতিবাদ, সর্বোপরি মন থেকে ধর্মের মর্মার্থ উপলব্ধির পূর্বেই মজিদের নানাবিধ অনুশাসনের শৃঙ্খল জমিলাকে ক্রমশ বিদ্রোহী করে তুলেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় মজিদ ব্যাপারটিকে তার প্রথম স্ত্রী রহীমার বদদোয়া বা অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা

করে। কেননা, মজিদ জমিলাকে বিয়ে করার ব্যাপারে রহীমার সম্মতি পায়নি। স্বামীর প্রতি রহীমার অন্ধ আনুগত্যের সমান্তরালে জমিলার ঘৃণা ও অবাধ্যতাই মজিদকে এরূপ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পিতা-মাতার দাম্পত্য কলহে অতিষ্ঠ হাসুনির মা নিজের মৃত্যু কামনা করলে রহীমা ভৎর্সনার মাধ্যমে তাকে নিরস্ত্র করে। কেননা, লোকসমাজে এরূপ ধারণা প্রচলিত, কেউ নিজের বিপদের আশঙ্কার কথা অথবা নিজের অনিষ্ট কামনা করে অন্যকে জানালে তার বা তার পরিজনের কোনো বিপদ ঘটতে পারে। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে তাহের-কাদেরের বাপ-মার দাম্পত্য কলহের মূলে সক্রিয় রয়েছে সন্তানদের জন্মসংক্রান্ত বৃত্তান্ত। লোকস্বভাবের বিশেষ প্রবণতাই এ ঘটনায় প্রকাশিত। পরপুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত যে গুজব প্রচলিত ছিল তাহের-কাদেরের মা সম্পর্কে, একে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সেই নারী স্বামীর সঙ্গে কলহে বিজয়ী হতে চায়। সমগ্র ঘটনাটি অত্যন্ত কদর্য হলেও স্বয়ং স্রষ্টার দোহাই দিয়ে এ গুজবকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থেকে প্রতীয়মান হয় স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের দূরত্ববোধ ও বিতৃষ্ণা।

২. লোকাচার–– লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সেই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের আবেগ, অনুভব, কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধের সম্পর্কও প্রায়শ জড়িত থাকে। মজিদ মহব্বতনগরে আসার পূর্বে গ্রামবাসীর সামষ্টিক আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ লোকাচারের নমুনা। বিয়ের আসরে ও ধান ভানার সময় মেয়েদের সমবেত কণ্ঠে গীত পরিবেশন, বাসররাতে নবদম্পতির ঘরে লুকিয়ে থেকে ঠাট্টা-তামাসা করা, ফসল ফলাতে গিয়ে কৃষকদের মাঠে নাচ-গান করা, শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালির শরণাপন্ন হওয়া, শিরালির মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নগ্ন নৃত্য পরিবেশন প্রভৃতি ঘটনা থেকে গ্রামবাসীর সাংস্কৃতিক লোকাচারের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। মজিদ মহব্বতনগরে আসার পর এসব আচারকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ, লোকজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার কখনো পরিচয় ঘটেনি। ধর্মকে আঁকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহের জন্য আজীবন লড়াই করে চলা মজিদ অস্তিত্বসংকটে ভুগতে থাকায় কৃষিজ সংস্কৃতির উৎসবমুখর কোলাহলকে, যা বিশেষভাবেই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমবেত অংশগ্রহণের সাক্ষ্যবহ, অস্বীকারে সচেষ্ট থেকে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল–

> কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। ... কিসের এত গান, এত আনন্দ? ... ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ... হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন। (পৃ. ১২)

মহব্বতনগর গ্রামের কৃষিজীবী লোকসমাজে ধর্মের প্রভাব এতটাই প্রবল যে, এ জনগোষ্ঠী ফসলের বীজ বপন, ফসল বেড়ে ওঠার পরিবেশ, রোগ বালাইয়ের উৎপাত, খরা-অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির দাপট প্রভৃতির সঙ্গে নিয়তি, দৈব, স্রষ্টার রহমত বা গজব প্রভৃতি বিশ্বাসকে লালন করে। ফসলের প্রাচুর্যকে স্রষ্টার রহমত বলে সন্তোষ প্রকাশ, আর ফসল না হওয়া বা কোনো কারণে পরিবারের প্রতিপালনের জন্য কেটে ঘরে নেয়ার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়াকে স্রষ্টার গজব হিসেবে বিবেচনার সংস্কার প্রাচীনকালের। এসব বিশ্বাস বহুযুগ ধরে প্রচলিত বলেই এর প্রতিকারার্থে তারা শিরালির, কখনো বা ইমাম, মোয়াজ্জিন, ধার্মিক ব্যক্তির[৫৫] দোয়া-দরুদের শরণাপন্ন হয়। লক্ষণীয়, মজিদ মহব্বতনগরে আসার পূর্বে এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি এড়াতে গ্রামবাসী নানা ধরনের গান গাইত ফসলের মাঠে। মজিদ আসবার পর তারা তাকে দিয়ে কখনো কোরান খতম পড়ায়, কখনো দোয়া-দরুদ পড়িয়ে মোনাজাত করিয়ে নেয়, এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়াতে। গ্রামবাসী মজিদের নিকট থেকে এসব ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হয়–

> মাজার জিয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে-চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাড়িতে হাত বুরিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আর তানার দোয়া। ... মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে-মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়–বর্ধিত না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মত লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে। (পৃ. ৩১)

সেকারণেই সে এ গ্রামে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রসারে উদ্যোগী হয়। এক্ষেত্রে মোদাচ্ছের পীরের মাজার স্থাপন করিয়ে তার উত্তরসূরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় বিভিন্ন ধর্মাচারের অন্তরালে সক্রিয় ছিল। যেমন, গ্রামবাসীকে কলেমা ও বিভিন্ন দোয়া-দরুদ শিখতে খালেক ব্যাপারীর মক্তবে যাবার নির্দেশ দেয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ও রোজা রাখা, জনৈক বয়স্ক পুরুষ ও তার ছেলেকে জোরপূর্বক একত্রে খৎনা দেয়া, সন্তানদের জন্মদান সম্পর্কিত কুৎসা প্রচারের অভিযোগে তাহেরের বাপকে অন্যায়ভাবে জনসমক্ষে অপমান করে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্নি বিতরণের আদেশ দেয়া, যুবক ও বয়স্ক পুরুষদের দাড়ি রাখার নির্দেশ, নারীদের পর্দাপ্রথা মেনে চলার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা, মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে রূপালি ঝালরবেষ্টিত লাল সালুতে আবৃত করা, তার মাজারকে ঘিরে জিকিরের আসর বসানো, শিরনি রান্নার বন্দোবস্ত ও এতে গ্রামবাসীর সমবেত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সর্বোপরি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দশ গ্রামের মধ্যে গর্ব করার মতো পাকা মসজিদ নির্মাণের বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি ঘটনায় মহব্বতনগর গ্রামের বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় লোকাচারের বিপ্রতীপ অবয়বকে লেখক স্পষ্ট করেছেন।

৩. লোকযান-- এ উপন্যাসে লোকযান হিসেবে নৌকা, মহিষের গাড়ি এবং পালকির উল্লেখ রয়েছে। নদীমাতৃক বাংলার সর্বত্রই জালের মতো অজস্র নদী ছড়িয়ে রয়েছে। তদুপরি বর্ষাকালে নিচু জলাভূমি ও ডোবা, ধানক্ষেত বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। এ উপন্যাসে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের দিনের যে বর্ণনা রয়েছে, সেটি ছিল শ্রাবণের শেষভাগের নিরাকপড়া এক বিকেল। এমন দিনে গ্রামবাসী কোঁচ-জুতি নিয়ে নৌকায় চড়ে ধানক্ষেতে মাছ ধরে। তাহের-কাদের যেভাবে মাছ ধরছিল, তা থেকে বোঝা যায়, নৌকা চালনা এবং মাছ ধরা, দুটি কাজেই তারা কতটা পটু। অন্যদিকে শস্যহীন জনবহুল খরার দেশের বাসিন্দা মজিদ যখন কোরান মুখস্ত করে হাফেজ হয়ে পরিচিত কোনো মসজিদে ইমামতির সুযোগ না পেয়ে অবশেষে পরিবার-পরিজন ছেড়ে গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছায়, তাকে মহিষের গাড়িতে খড়ের গাদায় কয়েক রাত ঘুমিয়ে সেখানে যেতে হয়। তবে সেখানেও জীবিকার সংস্থান না হওয়ায় পুনরায় তাকে মহব্বতনগর গ্রামে আসতে হয় অন্নপূর্তির তাগিদে। লোকযান হিসেবে পালকির ব্যবহার অতীতে গ্রামে প্রচলিত ছিল, যার দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে রয়েছে। তবে মহব্বতনগরের সাধারণ মানুষের পক্ষে পালকি চড়ার সামর্থ্য ছিল না। গ্রামের মাতবর খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী হিসেবে আমেনা বিবি পালকি ব্যবহারে বাধ্য। পালকি বৈষয়িক সমৃদ্ধি, সম্ভ্রম ও আভিজাত্যের প্রতীক। একারণেই ব্যাপারীর বাড়ি থেকে মজিদের বাড়ির দূরত্ব এক ঢিলের পথ হলেও আমেনা বিবি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারে না। পরপুরুষের সামনে পর্দাপ্রথা বজায় রাখতে খালেক ব্যাপারীর ইচ্ছা অনুযায়ী আমেনা বিবিকে পালকিতে চড়তে হয়। বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে এলে, কখনো বা নাইয়রে বাপের বাড়ি যেতে আমেনা বিবি পালকি ব্যবহার করত। এমনকি সে যখন স্বামীর কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয়, তখনো পালকিতে চড়েই বাপের বাড়িতে ফিরে যায়।

৪. লোকজ সংস্কৃতির রূপায়ণ-- এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে মহব্বতনগরের বাসিন্দাদের লোকসংস্কৃতির পরিচয় উপস্থাপন লেখকের অভীষ্ট ছিল না। বরং ধর্মের মতো প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের চাপে তারা কীভাবে নিজেদের কৃষিজ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পথ থেকে সরে আসে, সেই ভাষ্য রূপায়ণে তিনি আগ্রহী। তবু মজিদ মহব্বতনগরে আসার আগে তাদের লোকসংস্কৃতির আভাস উপন্যাসের বিভিন্ন দৃশ্যে সংক্ষেপে আভাসিত। যেমন– কৃষকরা ফসলের মাঠে গলা ছেড়ে গান গায়। হাসুনির মা দ্বিতীয়বার নিকা করতে গিয়ে প্রতিবেশী মানুকে নিয়ে

স্বপ্নে বিভোর হয় কারণ সে 'গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে' (পৃ. ১৮)। ফসলের মাঠে শিলাবৃষ্টি নামলে তারা শিরালির ওপর নির্ভর করে। রহীমা ও জমিলা সূচিশিল্পে আগ্রহী। তারা ঘরের দাওয়ায় বসে কাথা সেলাই করে, পাটি বোনে। গ্রামীণ নারীর পোশাক হিসেবে শাড়ির উল্লেখ থাকলেও অবস্থাপন্ন পরিবারের নারী আমেনা বিবি শাড়ির ওপর চাদরও পরিধান করে। জমিলা হাতে মেহেদি দেয়, আয়নার সামনে বসে চুলে তেল দেয়, হাতে চুড়ি পরে। তানুবিবির নাকে নাকছাবি এবং রহীমার বালিকাবয়সে হলুদ শাড়ি ও নাকে নোলক পরে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি ছোটাছুটির প্রসঙ্গও উপন্যাসে রয়েছে। পুরুষদের পরনের পোশাক হিসেবে লুঙ্গি ও জামার উল্লেখ থাকলেও মজিদ জুম্মার দিন বা জিকিরের সময় সাদা আলখাল্লা বা কোর্তার সঙ্গে পাগড়ি পরিধান করে। এছাড়া সে আতরও ব্যবহার করে। লোকখাদ্য হিসেবে এ উপন্যাসে চিড়া, গুড়, শিরনি, ফিরনি, খিচুড়ি প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। এর পাশাপাশি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পান-সুপারি খাওয়ার প্রসঙ্গও লক্ষণীয়। আমেনা বিবি মজিদের নির্দেশে পেটের বেড়ি পরার সমাধানের জন্য মোদাচ্ছের পীরের মাজার জিয়ারত করবে, এরকম গল্প তানুবিবির মাধ্যমে ছড়ালে প্রতিবেশী নারীরা খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে এসে এ সম্পর্কে নিচুকণ্ঠে তানুবিবির সঙ্গে আলাপ করে। 'তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়' (পৃ. ৪৯)। অন্যদিকে 'রহীমা মনে-মনে স্থির করেছিলো, পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফির্‌নিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু-দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করবে' (পৃ. ৫৪)। গ্রামীণ সমাজে হুকায় ধূমপানের রীতি প্রচলিত থাকলেও এ উপন্যাসে শুধু মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর ধূমপানের একাধিক উল্লেখ রয়েছে। 'মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই বসে রইলো, দুজনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দরমহলের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেল। দুজনেই এক এক করে হুকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।' (পৃ. ৫৪)

৫. লোকভাষা-- এ উপন্যাসের লোকভাষা চিহ্নিত করার প্রধান সমস্যা হলো, লেখক তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে এতে প্রতিপাদ্য করেননি। শস্যহীন জনবহুল খরাপীড়িত দরিদ্র অঞ্চল হিসেবে মহব্বতনগর গ্রামকে কোনো স্থানিক ভূগোলের গণ্ডিতে চিহ্নিত করা যায় না।[৫৬] সেদিক থেকে বলা চলে, মহব্বতনগর সমগ্র পূর্ব-বাংলারই প্রতিনিধি। তবু, গ্রামীণ লোকজ জনগোষ্ঠীর ভাষাভঙ্গিতে আঞ্চলিকতার প্রভাব স্পষ্ট। এ উপন্যাসের কুশীলবদের মুখের ভাষায় এমন কিছু শব্দের সমাহারও লক্ষণীয়, যা কালের প্রবাহে তাল মেলাতে না পেরে বর্তমানে অচল। পাশাপাশি, উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিবেচনায় রেখে লেখক নির্দ্বিধায় বিভিন্ন আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি মহব্বতনগর গ্রামের যে মুসলমান কৃষিজীবী লোকগোষ্ঠীকে রূপায়িত করেছেন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের প্রভাব বরাবর লক্ষণীয়। তাই তারা নিজেদের আলাপচারিতায়, কথোপকথনে এসব আরবি-ফারসি শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করে। লোকজ সংস্কৃতির অন্তর্গত বিধায় ভাষিক উত্তরাধিকারের পরম্পরায় এসব শব্দ তাদের প্রাত্যহিক বাগভঙ্গিতে ঠাঁই পেয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনা ও কুশীলবদের অন্তর্লৌকিক সংবেদনারাশির ভাষ্য উপস্থাপনে লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে শিক্ষিত ভদ্র নাগরিক সমাজে প্রচলিত কথ্য চলিত রীতির সঙ্গে ভাবগম্ভীর, ওজস্বী তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদকে ব্যবহার করলেও সংগত কারণেই গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে এর রয়েছে মেরুদূর ব্যবধান। এ উপন্যাসে পরিচর্যিত লোকভাষার উপাদান হিসেবে শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা উল্লেখযোগ্য--

৫.১ শব্দভাণ্ডার

দেশজ শব্দভাণ্ডার-- টাল, ঢিমেতেতালা, উচক্কা, ঠাট, ধপাস, ঠায়, ল্যাট, ঢিলা, গতর, বালা, টক্কর, ঝাপটা, টেপা, ঢঙ, ভাতার, ঝাঁকুনি, লোহালক্কড়, হলকা, খুপরি, আচমকা, ছোকরা, গিরে, আকিবুকি, চিবুক, চড়া, খাবি, বাহে-মুলুক, গাদা, ভিটে, পুটুলি, জটলা, উঁকি, কোটর, হেঁটে, বিভুঁই, চড়াই-উৎরাই, আওলা, খোলস, খরা, খেলাল, খুঁটি, ছিট, ফুটো, ছুকড়ি, ফ্যাসাদ, মুঠো, ঢোক, আমতা-আমতা, আড়ি, আছাড়, আশ, খাম্বা, পাছা, থই, দড়া, লোটা, ভাঁপ, হেলে, লেজুড়, ঠোহর, খায়েশ, ঢঙ, ফিচকি, হকচকিয়ে প্রভৃতি।

ক্রিয়া-- লুটালুটি, ছুটোছুটি, দুমড়ে, ছাপিয়ে, ঝাড়ে, গোঙানি, হুনছস্, ঠ্যাঙা, জিরুচ্ছে, ডরায়, ছাপাইবার, আছড়াতে, গুমরায়, ভানা, টিপা, সটকাইছে, কুচকে, ঝেঁকে, ফাড়ে, ছোড়াছুড়ি, ধোয়া-পাকলা, থোবড়ানো, ঠ্যাঙানি, হাতড়ায় প্রভৃতি।

বিশেষণ-- ঝিম, জানপছান, নিশুতি, বিরাণ, নাচুনি, নুলা, ন্যাংটা, ফিরে, চড়া-পড়া, নিরাক, আলগোছে, টালখাওয়া, চিকনাই, স্যাঁতসেঁতে, খটখটে, ভাঁপসা, বতোর, আলি-ঝালি, চওড়া, বেওয়া, গোয়ার, ধামড়া, ঝিলিক, থমকে, সাপটে, তাগড়া, উজাড়, মেঠো, খাবলা, রুঠা, ডাসা, জলো, নধর, গাট্টাগোট্টা, মদ্দ, ধাড়িধাড়ি, দমকা, ঢেঙা, কুঁকড়ানো, চিকনাই, খিটখিটে, ছটফটে, উড়ুনি, বাজখাঁই, জুঁতসই, সটান, ঝলসে, হাড়গিলে, আনাড়ি, দেমাকি, বেয়াড়া, ঢিলা, বাজা, ঝিমিয়ে, নিবন্ত, হ্যাচকা, ঝলসে প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়-- ছলছল, খিলখিল, পিটপিট, কড়মড়, ঘেউঘেউ, ঠাস্‌ঠাস, চড়চড়, কুর-কুর, সপসপ, ঢকঢক, ধপধপ, গনগনে, সিরসির, জলজল, খচখচ, ট্যাঁ-ট্যাঁ, ফ্যাৎ-ফ্যাৎ, চুকচুক, ফড়ফড়, গদগদ, ছলছল, চিনচিনে, খিঁটখিটে, ধিকিধিকি, ভনভন, গবগব, সোঁ-সোঁ, মড়মড়, হুহুহু, দপদপ, কিড়মিড়, হনহনিয়ে, ঝিমঝিম, থরথর, পিটপিট, গোঁ গোঁ, থরথর, চিড়চিড়, থরথর, ছলছল প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি-- বেটি>বিটি, ছেলে>পুত, মুছিবত>মছিবৎ, , সবাই>ব্যাক্ক, কেন>ক্যান, সেই>হেই, তাকে>তানারে>, মৃত্যু> মওত, খেয়েছিস>খাইছস, ছোঁয়া>ছোঁয়াচ, লুকাতে>লুকাইবার, চারটা>চাইরডা, কাজ>কাম, ছেলে>পোলা, থেকে>থিকা, নিয়ে>লইয়া, হব>হমু, শুনেছিস>হুনছস, বলব>কমুনে, যেন>যানি, বোন> বইন, অকারণে>বেহুদা, মেয়ে> মাইয়া প্রভৃতি।

৫.২ বাগধারা

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। (পৃ. ১৮)

সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। (পৃ. ১৯)

যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পীর সাহেবদের। (পৃ. ৩২)

মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এদিকে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। (পৃ. ৩৯)

ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মত। (পৃ. ৪৪)

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। (পৃ. ৬০)

আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলো। (পৃ. ৬০)

মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। (পৃ. ৬১)

খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেওয়া হয়। ... খায়েশ-খোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। (পৃ. ৬৩)

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামীণ বাংলার লোকজীবনের ভাষ্য উপস্থাপনায় jvjmvj বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। বাঙালি মুসলমানের ধর্মচেতনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্বরূপ অনুধাবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। লোকসমাজের বহমান ঐতিহ্যের নিজস্ব ধারার সঙ্গে বহিরাগত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা মিলেমিশে এতদঞ্চলের গ্রামজীবনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের যে নবতর রূপরেখা নির্মিত হয়েছিল, এর শিল্পায়নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পক্ষপাতশূন্য, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের টানাপোড়েন শ্রমজীবী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কীভাবে প্রভাবিত করে, এর পরিণতিতে তারা কীভাবে জীবনসংগ্রামে ধর্মের মুখোশধারী স্বার্থান্ধ ব্যক্তির দ্বারা অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মান্য করে পর্যুদস্ত হয়, তা এ উপন্যাসে বিস্তৃতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আবু ইসহাক

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) খ্যতি এবং প্রতিষ্ঠার অবলম্বন তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত mh‘xNj-evox। জীবদ্দশায় আরো দুটি উপন্যাস এবং দুটি গ্রন্থভুক্ত কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প লিখলেও সেগুলোর সাহিত্যগুণ ও শিল্পখ্যাতি অনেকটাই আড়ালে থেকে গেছে এটির প্রসিদ্ধিগুণে। এক্ষেত্রে উপন্যাাসটির চলচ্চিত্রে রূপায়ণ এবং বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জনের ঘটনাও এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভুমিকা রেখেছে।[৫৭] ১৯৪০ সালে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে নবম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘নবযুগ’ পত্রিকায় ‘অভিশাপ’ নামের গল্প পাঠানো এবং তা প্রকাশিত হবার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর সাহিত্যপথে যাত্রার পালা। তবে তারও আগে পঞ্চম শ্রেলিতে পড়ার সময়ই তিনি কবিতা ও গল্প রচনা করেছিলেন। স্কুলের দেয়াল পত্রিকা ‘প্রভাতী’-তেও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কয়েকটি লেখা।[৫৮] ১৯৪৪ সালে নারায়ণগঞ্জে থাকাকালেই আবু ইসহাক mh-‘xNj evox লিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে বদলি হয়ে কলকাতায় এবং সেখান থেকে পাবনায় অবস্থানকালে ১৯৪৮ সালে এ উপন্যাস লেখা শেষ হয়। কিন্তু দেশবিভাগের পরবর্তী প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং অন্যান্য জটিলতার জন্য এটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। চেক ভাষায় উপন্যাসটি

অনূদিতও হয়। এ উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার অর্জন করেন।[৫৯] তেতাল্লিশের মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, দেশবিভাগ ও নতুন স্বাধীন দেশের বিবিধ প্রতিকূলতার পটভূমিতে গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতা ও অস্তিত্বরক্ষার লড়াইকে সহজ, অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে গতিময় ভাষায় রূপায়ণের বিস্ময়বিমুগ্ধতাগুণে উপন্যাসটিকে এককালে পূর্ব-বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। তবে, নিভৃতচারী কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের সাহিত্যসাধনা ও অধ্যবসায় যে একজন আন্তরিক ও জাত শিল্পীর প্রত্যাশাকে লেখনীতে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে, এর ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস cÙvi cwjØxc রচনা ও প্রকাশিত হবার ঘটনায়।[৬০] আবদুল হকের সঙ্গে আলাপকালে লেখক জানিয়েছিলেন, 'পদ্মার পলিদ্বীপ একটি এপিক উপন্যাসের প্রথম খণ্ড, যদিও উপন্যাসে সে কথা লেখা হয়নি।'[৬১] কথাশিল্পী হরিপদ দত্ত উভয় উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে আবু ইসহাকের পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধ, সংবেদনশীল ব্যক্তির সচেতন অবস্থান থেকে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও জনমানুষকে অবলোকনের অভীপ্সা।[৬২]

mh-'xNj evox

আবু ইসহাকের mh-'xNj ewo[৬৩] গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বসংগ্রামের বিশ্বস্ত শিল্পরূপ। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সূত্রপাত তেতাল্লিশের মন্বন্তরের বিভীষিকায় গ্রামীণ জনজীবনের সার্বিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিতে, যার পরিসমাপ্তি নির্দেশিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভালোভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্নভঙ্গে জর্জরিত মানুষগুলোর জীবিকার তাড়নায় ভিটেমাটি ছেড়ে নতুন আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে অজানার পথে যাত্রার বাধ্যবাধকতায়। কোনো নির্দিষ্ট গ্রামের নামকরণ ও এর ভৌগোলিক বিবরণ না থাকা সত্ত্বেও এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজের প্রাত্যহিক চালচিত্র যেভাবে রূপায়িত, তাতে প্রতীয়মান হয়, লেখক সম্প্রসারিত অর্থে তদানীন্তন পূর্ব-বাংলাকেই এতে মূর্তময় করেছেন। জয়গুন ও তার ভাজ শফির মায়ের পারিবারিক বৃত্তান্ত উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় অবলম্বন হলেও শুধু তাদের সাংসারিক নির্বাহরীতির অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনাতেই এর ঘটনাস্রোত সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ উপন্যাসে তিনি গ্রামীণ পরিমণ্ডলে বহুকাল ধরে প্রচলিত অভ্যাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ লোকবিশ্বাস ও সংস্কার, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিকঐতিহ্য, রীতিনীতি ও অনুশাসনকে কুশীলবদের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র ও অন্তর্বাস্তবতার রূপায়ণে নিপুণভাবে গ্রন্থিত করেছেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তিতে প্রতিনিয়ত বিড়ম্বিত মানুষগুলোর স্বপ্ন ও প্রত্যাশা কীভাবে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে বারবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, এর অকৃত্রিম শিল্পভাষ্য এ উপন্যাস। গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিবিধ রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি, কূপমণ্ডুকতা ও

স্বার্থপরতা ধর্মীয় আবহে লালিত হয়ে জনজীবনের স্বতঃস্ফূর্ততাকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে। এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির রূপাঙ্কনে ও লোকমানসের বিশিষ্টতার পরিচয় নির্দেশে লেখকের আন্তরিক আগ্রহ ও সতর্ক প্রয়াস অনস্বীকার্য।[৬৪]

১. লোকবিশ্বাস–– এ উপন্যাসে পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ মুসলমান লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের পরিচয় লক্ষণীয়। গ্রামের নিরক্ষর, বিজ্ঞানভাবনাশূন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসে বহুযুগ ধরে প্রচলিত নানা লোকবিশ্বাসের প্রতি অটুট আস্থা বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত বিবিধ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রীতি-নীতি তাদের চেতনালোকে নানা লোকবিশ্বাসের উদ্ভব ঘটায়। এ উপন্যাসে সূর্য-দীঘল বাড়ি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসসমূহের পাশাপাশি ভূত-পেত্নী, অশরীরীতে বিশ্বাস, এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত––

১.১ সূর্য-দীঘল বাড়ি সম্পর্কিত––

> ক. পূর্ব ও পশ্চিম-সূর্যের উদয়াস্তের দিকে। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ীর নাম তাই সূর্য-দীঘল বাড়ী। সূর্য-দীঘল বাড়ী গ্রামে ক্কাচিৎ দু'একটা দেখা যায়। কিন্তু তাতে কেউ বসবাস করে না। কারণ, গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস–সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ টিকতে পারে না। যে বাস করে তার বংশ ধ্বংস হয়। বংশে বাতি দেয়ার লোক থাকে না। গ্রামের সমস্ত বাড়ীই উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী। ... সূর্য-দীঘল বাড়ীর ইতিহাস ভীতিজনক। সে ইতিহাস জয়গুন ও শফির মা-র অজানা নয়। ... সে অনেক বছর আগের কথা। এ গ্রামের হাতেম ও খাদেম নামে দুই ভাই ছিল। ঝগড়া করে ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে যায়। খাদেম আসে সূর্য-দীঘল বাড়ীটায়। বাড়ীটা বহুদিন ওখানেই খালি পড়ে ছিল। ... এখানে এক সময়ে লোক বাস করত, সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বংশ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা কেউ জানে না। তবুও লোকের ধারণা, সূর্য-দীঘল বাড়ীতে নিশ্চয়ই বংশ লোপ পেয়ে যাবে। নচেৎ এরকম বিরান পড়ে থাকবে কেন? ... যাই হোক, শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে খাদেম এসে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে বসবাস আরম্ভ করে। কিন্তু একটি বছরও ঘুরল না। বর্ষার সময় তার একজোড়া ছেলে-মেয়ে পানিতে ডুবে মারা গেল। সবাই বুঝতে পারল-বংশ নির্বংশ হওয়ার পালা শুরু হল এবার। বুড়োরা উপদেশ দিলেন বাড়ীটা ছেড়ে দেবার জন্য। বন্ধু-বান্ধবরা গালাগালি শুরু করল–আল্লার দুইন্যায় আর বাড়ী নাই তোর লাইগ্যা। সূর্য-দীগল বাড়ীতে দ্যাখ্ কি দশা অয় এইবার। ... খাদেমের মনেও ভয় ঢুকে গিয়েছিল। সাতদিনের মধ্যে ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে সে অন্যত্র উঠে যায়। (পৃ. ২২৯-২৩০)

> খ. আমাগ সূর্য-দীঘল বাড়ী। এই বাড়ীতে মানুষ উজাইতে পারে না। আবার এক বচ্ছর ধইর‍্যা পাহারা নাই। এমন সোনার চান মানিক্‌রে এইখানে আন্‌লে যদি এটটু উন্নিশ-বিশ অয়, তয় বদনাম অইব তোর। ... ক্যাঁ। আমরা তো কতদিন ধইরা আছি। আমাগ কি অইছে? ... আমাগ কতা আলাদা। আমাগ সইয়া আইছে। আর এতদিন বাড়ীর পাহারা আছিল। পাহারা যেই দিন তন নাই, হেই দিন তন আমার জ্বর যেন ঘন ঘন ওঠতে আছে! আবার মায়মুনেরও পরের বাড়ীর ভাত ওঠল। এইগুলা কি কম চোট্? ... সূর্য-দীঘল বাড়ীর অমঙ্গল আশঙ্কা করে জয়গুন সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। তবুও তার মন মানে না। তার অন্তর কেঁদে ওঠে। রোগশীর্ণ কাসুর কান্না শুনতে পায় সে অন্তরে। স্পষ্ট দেখতে পায়, ঘুমের থেকে জেগে কাসু মা-মা বলে কাঁদছে। (পৃ. ৩১৩)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সূর্য-দীঘল বাড়ি সম্পর্কে গ্রামবাসীর ভীতিবোধ ও শঙ্কার পরিচয় নিহিত। যেহেতু এ ধরনের বাড়িকে ঘিরে নানা অপপ্রচার, কাহিনী ও গুজব লোকসমাজে প্রচলিত, তাই এর বাসিন্দাদের জীবনে ঘটে যাওয়া যে কোনো দুর্ঘটনার জন্য বাড়িটিকেই দায়ী করা হয়। শুধু তাই নয়, যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের পরিবর্তে বাড়িটির ওপর দোষারোপের প্রবণতা এ ধরনের অমূলক লোকবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে জয়গুন ও শফির মায়ের পারস্পরিক আলাপে সূর্য-দীঘল বাড়ি সম্পর্কিত শঙ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও জয়গুন তার স্বভাবজাত দৃঢ়তা ও সাহসের বলে এ সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসকে অস্বীকার করতে সচেষ্ট, তবু শফির মায়ের ভাবনা তাকে প্রভাবিত করে প্রিয় পুত্র কাসুকে হারানোর উদ্বেগে। স্বামী করিম বক্‌শের নিকট রয়ে যাওয়া ছেলেকে দীর্ঘদিন দেখতে না পাওয়ার উৎকণ্ঠা সেকারণেই তাকে বিচলিত করে।

১.২ ধর্মীয়––

ক. গ্রামের মসজিদ। জুম্মার নামাজ হচ্ছে। হাসু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে। সব লোক এক সঙ্গে উঠছে, বসছে, সেজদা দিচ্ছে। হাসুর কেমন ভয় হয়। তারও নামাজের বয়স হয়েছে। সে ভাবে–বারো বছরের হলেই তো নামাজ পড়তে হয়। ... নামাজ শেষ হলে হাসু গামছায় বাঁধা ডিম কয়টা নিয়ে এগোয়। একজন নামাজী শিরনি বিলিয়ে দিচ্ছিল সকলের মধ্যে। গামছা খুলে হাসু তার হাতে দিয়ে দেয় ডিম কয়টা। ... ইমাম সাহেবের চোখ এড়ায় না। তিনি ডেকে বলেন,– নিয়া আস আণ্ডা কয়ডা এদিকে। ... কাছে যেয়ে আবার বলেন,–যাও, দিয়া আস গিয়া আমার ওখানে। কে দিল হে? ...ঐ যে ঐ ছ্যাঁড়া! আঙুল দিয়ে দেখায় সে। ... একজন বলে,–সূর্য-দীঘল বাড়ীর। ... আর একজন বলে,–চিনেন না হুজুর? জব্বর মুন্সীর পোলা। ... ইমাম সাহেব চমকে ওঠেন,–ও-ওই! তওবা! তওবা! হারাম! হারাম! ... তিনি ডিম কয়টার দিকে তর্জনীর নির্দেশ দিয়ে বলেন,–নিয়া যাও জলদি আমার কাছ থাইক্যা। মসজিদের মধ্যে কে আন্‌ল এই আণ্ডা? ফিরাইয়া দ্যাও অহুনি। বেপর্দা আওরতের চীজ। ছি! ছি! ছি!–তাঁর চোখে মুখে ঘৃণার তীব্রতা ফুটে ওঠে। ... একজন ইঙ্গিত করে,–একলা একলা সে ময়মনসিংহে যায় টেরেনে কইর্‍যা। কী হিম্মত! ... ইমাম সাহেব বলেন,–দেখলা মিয়ারা, ইমানদারকে খোদাওন্দ করিম হারাম থাইক্যা কি ভাবে হেফাজত করেন। ... আর একজন বলে,– জব্বর মুন্সী কত পরহেজগার আছিল। খোদার এমন পিয়ারা আছিল। আর তার পরিবার– (পৃ. ২৩৭)

খ. হাসু এবার অন্য কথা পাড়ে,– তুমি আর বাইরে যাইও না, মা। মাইনষে কত কতা কয়, বেপর্দা– ... ছেলের পাকামি দেখে জয়গুন ধমক দেয়,–বাইরে যাইমু না! ঘরে আইন্যা কে মোখের উপর তুইল্যা দিব? ... আমি যা পাই। না পাইলে না খাইয়া মইর্‍যা যামু। হেই অ ভালা, ত মাইনষের কতা আর সয় না। ... জয়গুন এবার বলে,–খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর্‍যাও খাই না, খ'রাত কইর্‍যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা'– ... কঠিন তার কণ্ঠস্বর। ... কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়– সে খোদার কাছে পাপ করছে। বাড়ীর বার হয়ে খোলা রাস্তায় সে পুরুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। গাড়ীতে কত বেগানা মানুষের মাঝে বসে সে চলে। বেপর্দা মেয়েলোকের কি আজাব হয়, সে জানে। তার প্রথম স্বামী-হাসুর বাপ মুনশী ছিল। পুঁথি পড়ে শোনাত দোজখের শাস্তির বিবরণ। পুঁথির কয়েকটা লাইন তার আজো মনে পড়ে ... জয়গুন শিউরে ওঠে। সাপ, বিছা, জোঁক ...! তার প্রথম স্বামীর মুখখানাও মনে পড়ে যায়। কী সুন্দর চাপদাড়ি-শোভিত মুখখানা জব্বর মুন্‌শীর। বেহেস্ত-দোজখের কত কথাই সে বলত! বেহেস্তে কত সুখ! আর দোজখ! দোজখের নামে আর একবার আঁতকে ওঠে সে। তার বিশ্বাস, হাশরের দিন জব্বর মুন্‌শী কিছুতেই তাকে তার বেপর্দার জন্য নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না। (পৃ. ২৩৯)

গ. মেহেরনের দরজা খুলে দিতে দেরী হয়েছিল। তাকে হাতের এই লাঠিটা দিয়েই সে মেরেছিল। গর্ভবতী মেহেরন সে আঘাত সহ্য করতে পারেনি। তারপর গলায় রশি বেঁধে গাবগাছে লট্‌কিয়ে সে রেহাই পেয়েছিল। হাজারখানেক টাকা অবশ্য খরচ করতে হয়েছিল এ ব্যাপারে। ... তার আরো মনে হয় আজকাল, লাঠিটা হয়তো হাশরের দিন তার বিরুদ্ধেই সাক্ষী দেবে খোদার কাছে। (পৃ. ২৪৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতির বক্তব্য পূর্বের উদ্ধৃতিরই ধারাবাহিক সম্প্রসারণ, এবং এক্ষেত্রেও লোকবিশ্বাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জয়গুন পর্দাপ্রথা অগ্রাহ্য করে জীবিকার তাড়নার সস্তায় চাল কিনতে একাকী ট্রেনে চেপে ময়মনসিংহে যায়। ফলে, পথে পরপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়। তার প্রথম স্বামী জব্বার মুন্সী পরহেজগার বান্দা ছিল। তার স্ত্রী হিসেবে জয়গুনের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামের মসজিদের ইমাম একাজ থেকে বিরত থাকতে তাকে নিষেধ করেছিল। কিন্তু তা মান্য করার সুযোগ জয়গুনের ছিল না। সেকারণেই 'বেপর্দা আওরতের চীজ' বিবেচনা করে তার প্রদত্ত ডিম ফিরিয়ে দেয়া হয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে জয়গুনের অন্তর্লৌকিক টানাপোড়েনের স্বরূপ নির্দেশিত। ছেলে হাসুর কাছেও তাকে নিন্দিত হতে হয় পর্দাপ্রথা অগ্রাহ্য করে জীবিকার টানে রাস্তায় নেমে আসায়। তবে এ ব্যাপারে সে সতর্কভাবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখেই নিজের কৃতকর্মের ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করে। অথচ ধর্মীয় বিশ্বাস তার চেতনালোকে সক্রিয় বলেই সমাজারোপিত পাপ-পুণ্যের বিধান স্মরণ করে একপর্যায়ে সে ভীতিবোধে আক্রান্ত হয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে করিম বকশের চেতনালোকে সন্নিহিত পাপবোধের মূলে রয়েছে ধর্মীয় বিধানের প্রভাব। বিনাকারণে লাঠির আঘাতে স্ত্রীকে হত্যার ভয়ংকর পরিণতি হিসেবে কেয়ামতের দিনের বৃত্তান্ত তাকে শঙ্কিত করে।

১.৩ অন্যান্য––

কাসুর নাক, কাসুর চোখ, তার কপাল, ভ্রুযুগল গায়ের রঙ কেমন ছিল আজও জয়গুনের চোখের সামনে ভাসে। কারও ছোট ছেলে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে মন্তব্য করে,–ওর নাকটা আমার কাসুর নাকের মতন। আমার কাসুরও এই রকম জোড়-ভুরু। জোড়-ভুরু ভাইগ্যমানের লক্ষণ। (পৃ. ২৭৮)

এ উদ্ধৃতিতে আকস্মিকভাবে কাসুকে দেখেও চিনতে না পারা জয়গুনের মনোলোকে প্রিয় পুত্রের প্রতি মঙ্গল কামনাজাত আবেগের বহিঃপ্রকাশ বাঙালি লোকসমাজে জোড়াভ্রু সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসকে উপলক্ষ করে প্রকাশিত। যদিও এর অন্তরালে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তবু এরূপ লোকবিশ্বাস গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত।

২. লোকসংস্কার––

ভূত-পেত্নী সংক্রান্ত––

ক. বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়ী। সর্বত্র হাঁটু-সমান ঘাস, কচুগাছ, মটকা ও ভাঁট-শেওড়া জন্মে অরণ্য হয়ে আছে। বাড়ীর চারপাশে গোটা কয়েক আমগাছ জড়াজড়ি করে আছে। বাড়ীর পশ্চিম পাশে দুটো বড় বাঁশের ঝাড়। তা ছাড়া আছে তেঁতুল, শিমুল ও গাবগাছ। গ্রামের লোকের বিশ্বাস–এই গাছগুলোই ভূত-পেত্নীর আড্ডা।

অনেকদিন আগের কথা। সন্ধ্যার পর গদু প্রধান সোনাকান্দার হাট থেকে ফিরছিল। তার হাতে একজোড়া ইলিশ মাছ। সূর্য-দীঘল বাড়ীর পাশের হালট দিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পায়– অই পরধাইন্যা, মাছ দিয়া যা! না দিলে ভালা অইব না।

প্রথমে গদু প্রধান ভ্রুক্ষেপ করেনি। পরে যখন পায়ের কাছে ঢিল পড়তে শুরু করে, তখন তার হাত থেকে মাছ দুটো খসে পড়ে যায়। সে 'আউজুবিল্লাহ' পড়তে পড়তে কোনো রকমে বাড়ী এসেই অজ্ঞান।

রহমত কাজী রাত দুপুরের পর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বার জন্যে ওজু করতে বেরিয়ে ফুটফুটে জোছ্নায় একদিন দেখেছে–সূর্য-দীঘল বাড়ীর গাবগাছের টিকিতে টুল ছেড়ে দিয়ে একটি বউ দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে দেখছিল। চোখের পলক ফেলে দেখে আর সেখানে বউ নেই। একটা ঝড়ো বাতাস উত্তর-পশ্চিম কোণাকুণি করম আলী হাজীর বাড়ীর ওপর দিয়ে চলে গেল। পরের দিনই করম আলী হাজীর পুতের বউ' কলেরায় মারা যায়। দু'দিন পরে তার হালের তিনটা তরতাজা গরু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে খতম।

আরও অনেকের সাথেই নাকি অনেক বেশে ভূতের দেখা হয়েছে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূতের গল্পের অন্ত নেই। তাই দিন-দুপুরেও পারতপক্ষে এ বাড়ীর পাশ দিয়ে কেউ হাঁটে না। (পৃ. ২৩০-২৩১)

খ. মায়মুনের বড় ভূতের ভয়। ... রাত গোটা নয়ের সময় হাসু আর হাসুর মা আসে। শব্দ পেয়ে মায়মুন মাথার ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে। (পৃ. ২৩৪)

গ. শফি গাছে চড়তে বেশ ওস্তাদ। এক গাছের ডাল বেয়ে সে আর এক গাছে চলে যায়।

মায়মুন বলে,–আর ওই মুহি যাইও না শফি ভাই, ওই গাবগাছে–

–কি ঐ গাবগাছে?

–আলেক মোড়লের বউ গলায় দড়ি দিছিল ঐ গাবগাছে, তুমি বুঝিন জান না?

–হেতে কি অইছে?

–উঁহু, আমার ডর করে। তুমি নাইম্যা আহ হবিরে।

শফি গাছ থেকে নেমে বলে,–মায়মুন চাইয়া দ্যাখ দেহি, ঐ দিক ঐ গাবগাছে কালা একটা কি দ্যাহা যায়।

মায়মুন ঐ দিকে না চেয়েই ওগো মাগো বলে শফিকে জড়িয়ে ধরে। (পৃ. ২৫৯)

ঘ. আবছা আলোয় দূর থেকে জয়গুন দেখতে পায় স্টেশনের চালাঘরে হাসু গোল হয়ে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে হাত রাখতেই হাসু ধড়ফড়িয়ে ওঠে। মা-কে সামনে পেয়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

জয়গুন দেখে, হাসুর সারা মুখে মশার কামড়ের দাগ। চোখ দুটোও লাল। মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছায়া! সে বলে–ডরে ধরছিল, অ্যাঁ?

হাসু মাথা নেড়ে স্বীকার করে।

–ডরে ধরছিল! কিছু দেখছিলি নি?

–হ। কি ঘুডঘুইডা আন্ধার গো মা! একটা মাইন্ষের আলয় নাই। এইহানে ওইহানে এট্টু পরে পরে কিয়ের জানি খচ-খচানি। বিলের মধ্যে কিয়ের যেন বাত্তি–এই জ্বলে, এই আবার নিবে। আবার কিয়ের বিলাপ হুনলাম। মাইনষের মতন কান্দে। ডরে আমি এক্কেরে মাডির লগে মিশ্যা আছিলাম। এই আলোগুলা আলৈয়া, না মা?

–যাউক, অই হগল কওয়ন ভাল্ না। তোর অহনও ডর করে অ্যাঁ?

হাসু হাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

–না–না, ওগুলো কিচ্ছু না। ...

শফি বলে,–দ্যাহ মা, মোখটা কেমুন দরমা-দরমা অইয়া গেছে! ...

শফির মা বলে,–মশার কামড়, না আর কিছু! তোরা দ্যাখ দেহি ভাল কইর‍্যা চউখ লাগাইয়া। আমি আবার চউখে দেহি না।

জয়গুন ভালো করে দেখে বলে,–মশার কামড়ই।

–নালো, আমার কিন্তুক ভালা ঠেকে না। দিনকাল খারাপ। শেখপাড়ায় এক ঘরও বাদ নাই। মোল্লা-পাড়ায়ও দয়া অইছে। আমি এই ডরেই আর খ'রাত করতে ঠ্যাং বাড়াই না ওই মুখি। হোনলাম ছয়জন পাড়ি দিছে।

হাসু শিউরে ওঠে ভয়ে। সে নিজের কানেও শুনেছে খোদাই শিরনী দেয়ার চিৎকার।

জয়গুন চিন্তিত হয়। বলে,–রাইতে ডরেও ধরছিল, ভাজ। আমারও চিন্তা লাগে।

–ডরে ধরছিল!

শফির মা চমকে ওঠে। সে আবার বলে,– তোরা কি কথা কস! আমার এক্কেরেই ভালা ঠেকে না।

–অহন কি উপায় করি, বইন?

–এক কাম কর। গোসল না করাইয়া ওরে ঘরে নিস না। সোনা-রূপার পানি দিয়া গোসল করাইয়া তারপর ঘরে লইয়া যা। (২৭২-২৭৩)

ঙ. তেঁতুল গাছের কাছাকাছি যেতেই কি রকম এক গোঙানির শব্দ শুনে কাসু থমকে দাঁড়ায়।

করিম বক্শ বলে,–কিরে, কি অইল?

–অইডা কি দ্যাহা যায়? তেঁতুল গাছের টিকিতে বইয়া রইছে!

করিম বক্শ কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলে,–সত্যই ত! পাক্না চুল ছাইড়্যা বইয়া রইছে! আবার গোঙায়! ...

কাসু এবার করিম বক্‌শের হাত ধরে তার গায়ের সাথে মিশে দাঁড়ায়। করিম বক্‌শ কাসুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

–কাসু, শিগগির আমার কোলে ওঠ্। বাপ্‌রে ব্‌প। এইডা ত আর কিচ্ছু না! এইডা যে গোঙাবুড়ি! গলা টিপ্যা ধরব! আল্লা! আল্লা, বাঁচাও! ...

কাসু করিম বক্‌শের বুকের মধ্যে মুখ লুকায়। ভয়ে চোখ বন্ধ করে। কাঁপে থরথর করে। করিম বক্‌শ কাসুকে কোলে নিয়ে দৌড় দেয়। বাড়ী এসেও কাসু চোখ খোলে না।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে করিম বক্‌শ বলে,–কাসু, আমার বা'জান কইয়া ডাক দে। বা'জান না ডাকলে গোঙাবুড়ী বুলাইমু। ... কাসুর ভীত-কম্পিত কণ্ঠ অস্ফুট শব্দ করে,–বা'জান।

করিম বক্‌শ সাড়া দেয়। তারপর বলে,–কাসু, বাড়ীর বাইরে যাইস্ না কিন্তুক, খবরদার! ঐ গোঙাবুড়ী গলা টিপ্যা ধরব! তেঁতুল গাছে আরো একটা পিচাশ আছে! হেইডার নাম ছালাবুড়ী। ছালার মইদ্যে ভইর্যা তোর মতন ডেগা পোলা পাইলে লইয়া যায়। তারপর তেঁতুল গাছে বইস্যা রক্ত খায়। ...

সে আবার বলে,–খবরদার। কানাবুড়ীর সুরত ধইর্যা ছালাবুড়ী ধইর্যা লইয়া যাইব। (পৃ. ২৯৫-২৯৬)

চ. করিম বক্‌শের মতলব হাসিল হয়েছে। কাসু এখন আর বাড়ী থেকে বের হয় না। ... মা-র মধুর চিন্তা তার মনে বার বার যে ছাপ রেখে গেছে, তা কখনও মুছবার নয়। সে স্থায়ী ছাপকে এখন ভূতের বীভৎস মূর্তি যেন রাহুর মত গ্রাস করছে। গোঙাবুড়ীর গোঙানি, ছালাবুড়ীর ছালা, তাদের নখর ও দাঁতের এলোমেলো কল্পনা কাসুকে সব সময় সন্ত্রস্ত করে রাখে। কোনো ঠুংঠাং শব্দ শুনলেই সে ভয়ে অস্থির হয়। রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে চীৎকার করে ওঠে। ... হঠাৎ একদিন কাসুর জ্বর হল। বিছানায় পড়ে পড়ে কাসু প্রলাপ বকে।

করিম বক্‌শ দাওয়ায় বসে মাটির ওপর আঁচড় কেটে বাকী খাজনার হিসেব করছিল। সে ঘরের মাঝে উঠে এসে বলে,–কাসু, অ কাসু! কি অ্যাঃ? অমুন করস্ ক্যাঁ?

–ছালাবুড়ী আইল! উঃ–উঃ-উঃ! না-না, বা'জান কইতাম না। (পৃ. ২৯৬)

ছ. সোলেমান খাঁর এজলাসে প্রায়ই এ ব্যাপারে শুনানি হতে থাকে। একদিন সোলেমান খাঁর স্ত্রী বলে,–ভাত খাইত ত কম খায় না। আমাগ দুনা ভাত খায়। যদি জিগাই আর নিবি বউ? তয় কোন দিন 'না' করব না। আঁসের মতন গলা-সমান খাইয়া ঠাববুস অইয়া তারপর উঠ্‌ব। এত খাওয়া ত' বড় অওয়নের নাম নাই। আর অইবই বা কেমনে। সূর্য-দীগল বাড়ীর মাইয়া। পরাণ লইয়া বাঁইচ্যা আছে, এই কফেলের ভাইগ্য। তোমারে হেইসুম কত কইর্যা যে কইলাম, সূর্য-দীগল বাড়ীর মাইয়া আননের কাম নাই। হেইয়া হোনলা না। মাইয়ার উপরে পেত্নীর দিষ্টি না আছে ত কি কইলাম। (পৃ. ৩০১)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সূর্য-দীঘল বাড়ি সম্পর্কে গ্রামবাসীর ভীতিবোধের দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। গদু প্রধান ও রহমত কাজীর সঙ্গে সম্পৃক্ত দুটি ঘটনাতেই প্রতীয়মান, দীর্ঘকাল ধরে গ্রামীণ লোকসমাজে ভূত-পেত্নী, অশরীরী সম্পর্কিত কাহিনী, গুজব ও কল্পকথা তাদের অবচেতনলোকে কীভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো পরবর্তীকালে লোকমুখে প্রচারিত হয় এবং এভাবেই এ সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস এত জোরালোভাবে সম্প্রসারিত হয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি থেকেও বিষয়টি অনুধাবন করা চলে। বালিকা মায়মুন কখনো ভূত-পেত্নী না দেখলেও এ সংক্রান্ত রটনা তাকে ভীত করে। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে অপঘাতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির প্রেতাত্মায় পরিণত হওয়া বিষয়ক লোকবিশ্বাস। আলেক মোড়লের স্ত্রী গাবগাছে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, এ ঘটনা মায়মুনের চেতনালোকে ভীতিবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। তাই শফি তাকে এ বিষয়ক ইঙ্গিত করতেই সে ভয়ে শিউরে ওঠে। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে অচেনা স্থানে মোট বহন করতে গিয়ে একাকী রাতযাপনে বাধ্য কিশোর হাসুর মনোলোকে সঞ্জাত ভীতিবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সে বিলের পচা কচুরিপানা ও কাদার সম্মিলনে উদ্ভূত বায়োগ্যাসকে (মিথেন) আলেয়া বা অলৌকিক আগুন ভেবে শিহরিত হয়েছিল। এরূপ অভিজ্ঞতার শিকার হয়ে সে বাড়ি ফিরে কিছুটা অসংলগ্ন আচরণ করায় একে বোবায় ধরা হিসেবে ভেবে নেয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মশার

কামড়ে তার শরীর ফুলে যাওয়ায় সেটিকেও বসন্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। হাসুর সমুদয় দুর্বিপাকের প্রতিকারার্থে সোনা-রূপার পানি দিয়ে গোসল করিয়ে শুদ্ধাবস্থায় ঘরে নিলে তার সমুদয় বালা-মুসিবত ও খারাপ নজর কেটে যাবে বলে শফির মা পরামর্শ দেয়। এসব লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার গ্রামীণ লোকজীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। 'ঙ' ও 'চ' সংখ্যক উদ্ধৃতিদ্বয়ে বালকমনস্তত্ত্বে ভূত-পেত্নী সংক্রান্ত ভীতিবোধের নেতিবাচক অভিঘাত লক্ষণীয়। কাসু যেন তার সৎভাই হাসুর সঙ্গে মা জয়গুনের কাছে যেতে না পারে, সেজন্য করিম বক্শ তাকে ভয় দেখাতে গোঙাবুড়ি ও ছালাবুড়ির কল্পকাহিনী শোনায়। এর ফলে একপর্যায়ে কাসুর অবচেতনলোকে এ সংক্রান্ত বিকারগ্রস্ততার উদ্ভব ঘটে, যা তাকে ক্রমশ অসুস্থ করে তোলে। ছেলের নিকট থেকে 'বাপজান' সম্বোধনসূচক ভালোবাসা আদায়ের জন্য করিম বক্শের প্রচেষ্টার অন্তরালে কাসুর মানসিক বিপর্যয় ঘটার যে ঝুঁকি রয়েছে, তা গ্রামীণ লোকসমাজের বাসিন্দাদের অজানা থাকলেও এর পরিণতি কল্যাণকর ছিল না, যা উপন্যাসের পরিসমাপ্তি অংশে নির্দেশিত। 'ছ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সোলেমান খাঁ ও তার স্ত্রীর সংলাপে পুত্রবধূ মায়মুনের প্রতি বিরূপ মানসিকতার প্রভাব প্রসঙ্গে সূর্য-দীঘল বাড়ি সম্পর্কিত নেতিবাচক ধারণা ক্রিয়াশীল। যথেষ্ট ভাত খাইয়েও মায়মুনের ক্ষুধা মেটানো সম্ভব হয় না, কেননা তার ওপর পেত্নীর নজর রয়েছে, এরূপ অমূলক ধারণা সোলেমান খাঁর স্ত্রীর ভাবনায় বদ্ধমূল হয়ে ওঠে।

২.২ ভূত-পেত্নীর প্রতিকার সম্পর্কিত--

এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের মধ্যে ভূত-পেত্নী, অশরীরী সম্পর্কিত ভাবনার পরিচয় উল্লেখযোগ্য। সূর্য-দীঘল বাড়ি এবং এর বাসিন্দাদের ঘিরে নানা গালগল্প, কাহিনী, গুজব ও রটনা লোকমানসে রীতিমত বিভীষিকা সঞ্চার করে। এসব লোকবিশ্বাস যখন গ্রামবাসীর আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণায় প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, তখন এর প্রতিকারার্থে বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়। এগুলোর সঙ্গে সমষ্টিমানুষের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রসঙ্গ জড়িত। এ উপন্যাসের শুরুতেই লক্ষণীয়, জয়গুন ও শফির মাকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সূর্য-দীঘল বাড়িতে বসবাসের প্রয়োজনে সেটিকে ত্রুটিমুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হয়। এক্ষেত্রে তারা জোবেদ আলী ফকিরের সাহায্য গ্রহণ করে।

> জয়গুন ও শফির মা সাত-পাঁচ ভেবে এ বাড়ীতে বাস করার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ছেলেমেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করেই নিরস্ত হয়েছিল বিশেষ করে। কিন্তু একদিন এক নামকরা ফকির–জোবেদ আলী এ সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর চারকোণে চারটা তাবিজ পুঁতে এসে সে জানিয়ে দেয়– এই বার চউখ বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়ীতে। আর কোন ডর নাই। ধুলাপড়া দিয়া ভূত-পেত্নীর আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি। চাইর কোণায় চাইড্যা আলীশান আলীশান পাহারাদারও রাইখ্যা আইছি। সব আপদ-বিপদ ওরাই ঠেকাইব। বাড়ীর সীমানার মইদ্যে ভূত-পেত্নী; জিন-পরী, ব্যারাম-আজার–কিচ্ছু আইতে পারব না। ... ফকির আবার বলে– হোন, আর এক কথা। বচ্ছর বচ্ছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব। যেই চারজন এইবার রাইখ্যা গেলাম, হেইগুলো কমজোর অইয়া যাইব সামনের বচ্ছর। বোঝতেই পার, দিনরাতই ভূত-পেত্নীর লগে যুদ্ধ করা কি সোজা কাণ্ড! (পৃ. ২৩১-২৩২)

তবে একপর্যায়ে ফকিরের আচরণে জয়গুন উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়, পুরো ব্যাপারটি নিতান্তই প্রতারণামূলক। সেকারণেই সে পরবর্তী তিন বছরেও এ বাড়ির পাহারাদার বদলাবার জন্য শফির মায়ের তাড়নায় আগ্রহী হয়নি। জয়গুন স্পষ্টভাবেই তাকে জানায়, 'পাহারা না ছাই। ফুক্কা দিয়া টাকা নেওয়ার ছল-চক্কর' (পৃ. ২৬২)। অন্যদিকে করিম বক্শ ছেলে কাসুকে তার মা জয়গুনের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখতে প্রতিবেশী হারুনের সহায়তায় 'গোঙাবুড়ী' ও 'ছালাবুড়ী'র যে ভীতিকর বৃত্তান্ত উপস্থাপন করে, তাতে একপর্যায়ে সে মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তার ওপর ভূত ভর করেছে, এরূপ সিদ্ধান্তে স্থিত হয়ে করিম বক্শ এর প্রতিকারার্থে গ্রামের সেরা ফকির দিদার বক্শের শরণাপন্ন হয়। সে কাসুর ওপর থেকে ভূতের আসর নামাতে যে ভয়ংকর প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, এর পরিণতিতে সে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ফকিরের নির্দেশ মত করিম বক্‌শ ন্যাকড়া ও সর্ষের তেল নিয়ে আসে। ন্যাকড়া দিয়ে দড়ি পাকিয়ে ফকির তার এক প্রান্ত ডুবিয়ে ধরে তেল-ভরা ঝিনুকের মধ্যে। তারপর বাতির শিখার ওপর দড়ির তেল-মাখানো মাথাটা পোড়া দেয়। দড়ির প্রান্ত থেকে যখন ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে, তখন ফকির কুণ্ডলায়িত ধোঁয়াসহ গরম প্রান্তটা কাসুর নাকের মধ্যে বারবার প্রবেশ করিয়ে দেয়। কাসু যন্ত্রণায় উঃ করে ওঠে প্রত্যেক বার। তার কোমরটা বিছানা ছেড়ে উঁচু হয়ে ওঠে। শক্তি নিঃশেষ করে হাঁচি দেয় কয়েক বার।

মুখে হাসি টেনে ফকির বলে,–অ্যাঁচি দিছে, আর চিন্তা নাই। এই অ্যাঁচির ঠেলায় আলাই-বালাই পলাইব। যদি একেন্ত না-ই পলায়, তয় মগরিবের ওক্তে একবার খবর দিও। আইজ রাতেই বৈঠক দিমু। হেইখানে বোলাইয়া ওর চৌদ্দ- গোষ্ঠির ছেরাদ্দ করুম। (পৃ. ২৯৭)

এরপর সে 'ভূত-পেত্নী, দানা-পিচাশ, জিন-আতশ' (পৃ. ২৯৭)-দের বোতলে বন্দি করার যে অলৌকিক বৃত্তান্ত পরিবেশন করে, তাতে তার প্রতি গ্রামবাসীর ভক্তি ও সমীহ আরো বৃদ্ধি পায়। কাসুকে চিকিৎসার বিনিময়ে করিম বক্‌শ তাকে সোয়া সের চাল ও সোয়া পাঁচ আনা পয়সা উপঢৌকন দেয়। সেদিন মাঝরাতে সে মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালিয়ে লোকজন ও শাগরেদদের নিয়ে কাসুর ওপর ভর করা ভূত তাড়ানোর আসর বসায়। গ্রামবাসীদের কেউই ভূত চালানের বাহন হতে রাজি নয় বলে অবশেষে তার জনৈক সাগরেদকে সে একাজে সম্মত করায়। লেখক এ আসরের যে আধিভৌতিক বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে প্রতীয়মান হয়, অশিক্ষিত গ্রামবাসী দিদার ফকিরের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল এবং ভূত-প্রেতকে প্রচণ্ড ভয় পায়। যদিও কাসুর চিকিৎসার প্রয়োজনে করিম বকশকে দিদারের সেই সাগরেদের জন্য নানা ভোজনবিলাসী খাবার ও কাসুর জন্য সাত পুকুরের পানি দিয়ে গোসল করানোর বন্দোবস্ত করতে হয়, তবু শেষ পর্যন্ত আরোগ্যলাভের পরিবর্তে তার ডবল নিউমোনিয়া ও ঘা দেখা দেয়। মুমূর্ষু কাসুকে অবশেষে রমেশ ডাক্তারের আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, সূর্য-দীঘল বাড়িতে ভূত ক্ষেপে যাওয়ায় জয়গুনের ঘরের বেড়া ও চালের ওপর ঢিল পড়তে থাকে। শফির মায়ের ধারণা, বাড়ির পাহারা বছর বছর না বদলানোর ফলে এবং বসতভিটা সংলগ্ন গাছ কাটার কারণে ভূত উৎপাত শুরু করেছে। একারণে গ্রামবাসীর মধ্যেও শঙ্কা ও ভীতিবোধ প্রবল হয়ে ওঠে।

গ্রামের বুড়ো সোনাই কাজী বলে,–সূর্যু-দীগল বাড়ীর ভূত ক্ষেপছে, আর উফায় নাই। সূর্যু-দীগল বাড়ীতে মানুষ উজাইতে পারে না, বুড়া-বুড়ীর কাছে হুনছি। সূর্যু-দীগল হাটেরও উন্নতি অয় না। ...থুত্থুরে বুড়ী হনুফা বিবি বলে,–আমার মামু একবার সূর্যু দীগল মৌপোকের বাসা ভাঙছিল। আমার মনে আছে। গাছের তন নামতে না নামতে আঁড়ির তলা ভাইঙ্গা মধু পইড়্যা গেল! কী তেজ! বাপ্পুসরে! (পৃ. ৩২০-৩২১)

জয়গুনের প্রতি ভালোবাসাবশত করিম বক্‌শ সূর্য-দীঘল বাড়িকে ভূতের উপদ্রবমুক্ত করতে জোবেদ আলী ফকিরের নির্দেশানুযায়ী অমাবস্যার মাঝরাতে একাকী বাড়ির চার কোণে মন্ত্রসিদ্ধ চারটি গজাল পুঁতে আসার পথে কুচক্রী গদু প্রধান ও তার দুই দোসরের হাতে নিহত হয়। কেননা, গদু প্রধান জয়গুনকে কোনোভাবেই বশীভূত করতে পারেনি। তাই তাকে বসতবাড়ি থেকে উৎখাতের জন্য সে ভূতের দোহাই দিয়ে এ অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। পরদিন করিম বক্‌শের মৃতদেহ দেখে 'সকলেই একমত–সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত তার গলাটিপে মেরেছে' (পৃ. ৩২২)। এ ঘটনার পর জয়গুন ও শফির মাকে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পুনরায় পথে নামতে হয়। সূর্য-দীঘল বাড়ি সংক্রান্ত নানা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার এভাবেই তাদের উদ্বাস্তু মানুষের পর্যায়ে অবনমিত করে।

২.৩ বশীকরণ––

ক. সেদিন আঞ্জুমন এক বেদেনীর কাছ থেকে মেয়ের অসুখের জন্য কিসের তাবিজ রাখছিল! করিম বক্‌শ হাট থেকে এসে দেখেই আগুন। জিজ্ঞেস করে,–কিয়ের তাবিজ, অ্যাঁ? আমারে টোনা করবি নি?

তার এই এক অকারণ সন্দেহ।

আঞ্জুমন রেগে যায়, বলে, –হ, টোনা করমু। ভেড়া বানাইয়া রাখমু তোমারে।

–হারামী! বৈতাল মাগি! বলে সে উঁচু করে পুরানো লাঠিটা।

–আত উডাইও না কইতে আছি। খইয়া পড়ব আত। কুড়-কুষ্ঠ অইব। (পৃ. ২৪৫)

খ. করিম বকশ এবার ফতুয়ার পকেট থেকে একটা পান বের করে শফির মা-র হাতে দিয়ে বলে,– খবরদার কেও যেন না জানে। তোমার ঘরে ডাক দিয়া এই পানডা খাওয়াইয়া দিও। নাগর বাইদ্যার আতে পায়ে ধইর‍্যা এইডা যোগাড় করছি। বান্দরের নউখের কলম আর মানিকজোড়ের রক্ত দিয়া এই পানের উপরে লেইখ্যা দিছে আর কইয়া দিছে,–'সাত রোজের মইদ্যে যদি ও তোমার লেইগ্যা পাগল না অয় তো আমার নামে কুত্তারে ভাত দিও।' (পৃ. ৩১৫)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বশীকরণ ও অভিশাপ প্রদান সংক্রান্ত লোকসংস্কারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সংসারের কর্তৃত্ব দখলের জন্য নারীরা পুরুষদের আয়ত্তে আনতে বশীকরণের দ্বারস্থ হয়, এরূপ ধারণা গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত। আঞ্জুমন মেয়ের চিকিৎসার জন্য বেদেনির নিকট থেকে তাবিজ সংগ্রহ করলেও করিম বক্শের সংশয়গ্রস্ত মনোভঙ্গিতে এ ঘটনা ভিন্নভাবে প্রতিপন্ন হয়। তাই সে আঞ্জুমানকে প্রহার করতে উদ্যত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে সে অভিশাপ উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ হয়। স্বামীর বেসামাল মেজাজ সামলাতে সে এ পন্থা অবলম্বন করে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে তালাক দেয়া স্ত্রী জয়গুনকে পুনরায় বিয়ের জন্য রাজি করাতে ব্যর্থ করিম বক্শের প্রচেষ্টার অবলম্বন হয়ে ওঠে বশীকরণ। শফির মাকে দিয়ে নাগর বেদের নিকট থেকে প্রস্তুতকৃত বিশেষ পান খাইয়ে জয়গুনের সম্মতি আদায়ে তার প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। সংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসে যে কোনোভাবে কাজে সফল হবার অভিলাষ প্রবল থাকায় গুণীন, ফকির, বেদেদের পসার ঘটে।

২.৪ দিব্যি দেয়া বা স্বীকার করা––

ক. কাল মায়মুন বাচ্চা দুটো নিয়ে এসেছে। সোনাচাচী বলে দিয়েছে– আমারে এক আলি আণ্ডা দিবি। আমারে না খাওয়াইলে পাতিহিয়ালে ধইর‍্যা লইয়া যাইব তোর আঁস, কইয়া রাখলাম।

মায়মুন স্বীকার ক'রে এসেছে। সোনা চাচীকে প্রথম দুই দিনের ডিম সে দেবে। তাকে আগে না খাইয়ে নিজেরা ছোঁবেও না ডিম। (পৃ. ২৫৭)

খ. খড়ের আগুনের মত দপ করে জ্বলে ওঠে জয়গুন,–হুঁহ, আমারে তাড়াইতে পারলে লুইট্যা-লাপইট্যা ফলার কইর‍্যা খাইতে পারবা। তা মনেও জাগা দিও না, কইয়া দিলাম।

–তোবা! তোবা! তোর চীজ ছুঁইলে যেন আত খইয়া পড়ে, তোগ গাছের একটা পাতা ছিঁড়লে যেন রাইত না পোয়ায় আমাগ। (পৃ. ২৬৩)

গ. লেদু কল্কেটা তুলে গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বলে,–রাগ করলা নি, চাচা? আর কোনোদিন কিছু কইমু না। এই কান ডলা খাইলাম দশবার। (পৃ. ২৯৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সোনাচাচীর সংলাপে মায়মুনের প্রতি সতর্কবাতায় প্রকারান্তরে অভিশাপকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেহেতু মায়মুন তার নিকট হতে কিছু সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট, তাই এর বিনিময়ে সেও নিজের প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নিতে আগ্রহী। অন্যদিকে, বালিকা মায়মুন বাধ্য হয়েই সোনাচাচীর আরোপিত শর্ত অকপটে স্বীকার করে। 'খ' সংখ্যক সংলাপে শফির মায়ের প্রতি জয়গুনের বিরোধাত্মক সংলাপে মূর্তময় হয়েছে সূর্য-দীঘল বাড়িতে তার

মালিকানা আত্মসাতের জন্য মায়মুনের বিয়ের প্রস্তাব আনার বিষয়টি। জয়গুনের ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করতে এরপর শফির মা নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে অভিশাপ উচ্চারণ করে এবং এভাবেই তার অবস্থান তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়, লেদুর আচরণগত ভুল স্বীকারের জন্য দশবার 'কানডলা' খাওয়ার ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, কাসুকে তার মা জয়গুনের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলার ব্যাপারটি তার বাবা করিম বক্শের নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে সে ক্রোধের বশে লেদুকে হুকা ছুঁড়ে মেরেছিল। তখন লেদু পরিস্থিতি সামলাতে নিজের ভুল স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতেও এ সম্পর্কে সতর্ক থাকার আশ্বাস দেয়।

২.৫ মানত করা--

ক. করিম বক্শ দোর গোড়া থেকে বলে,–আল্লা যদি কাসুরে দুইন্যায় রাইখ্যা যায়, তয় আমি জমিনের উপরে খাড়াইয়া মান্‌তি করলাম, কাসুর একটা জানের বদলে দুইডা খাসি জবাই কইর‍্যা তার গোশ্‌ত গরীব মিস্‌কিনরে বিলাইয়া দিমু। কাসুরে আজমীরশরীফ খাজা বাবার দরগায় লইয়া যামু। (পৃ. ৩০৪)

খ. পেটের জ্বালা এদিকে বেড়েই চলছে দিন দিন। দুই দিন এক রকম কিছুই খাওয়া হয়নি।

কাল রাত্রে খাওয়ার সময় কাসু জিজ্ঞেস করেছিল,–তুমি খাইবা না, মা?

–আমি রোজা আছি। তোরা খাইয়া ওঠ্। তোর ব্যারামের সময় মান্‌তি করছিলাম তিনডা রোজা রাখতাম বুইল্যা। (পৃ. ৩১৭)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে অসুস্থ ছেলে কাসুর সুস্থতা প্রত্যাশায় করিম বক্শের মানতের অন্তরালে রয়েছে স্রষ্টার অনুগ্রহের ওপর অটুট বিশ্বাস। সেকারণেই সে ছেলের সুস্থতার বিনিময়ে গরিব, অনাহারী মানুষদের খাসির মাংস খাওয়ানোর আয়োজনে সম্মত। বলাবাহুল্য, এরূপ ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণের প্রচেষ্টায় ব্যক্তির মনস্তত্ত্বে প্রিয়জনকে হারানোর শঙ্কাই সক্রিয় থাকে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কাসুর সঙ্গে জয়গুনের আলাপে উপজীব্য হয়েছে সাংসারিক দৈন্য আড়ালের তাগিদ। জয়গুন নিজে না খেয়ে সেই খাবারটুকু দিয়ে তিন ছেলেমেয়ের ক্ষুধা মেটাতে সচেষ্ট। কাসুর কাছে সে এ অবস্থা জানাতে অসম্মত বলেই অকপটে মানতের দোহাই দিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি সামলায়।

২.৬ বিবিধ--

ক. শফির মা ডাকে,–হাসুর মা?

–হ ভাজ, আমি অই।–আহো আমার ঘরে।

জয়গুন এসে দরজায় দাঁড়ায়। শফির মা বলে,–তোর হায়াত আছে। অনেক দিন বাঁচবি তুই। এই এটটু আগেই তোর নাম নিছিলাম। (পৃ. ২৬১-২৬২)

খ. আলাউদ্দিন, তুমি এসো। কি তোমার?

-প্যাটটা ফুইলা রইছে দুই দিন ধইর‍্যা। একবার খাইলে আর খাইতে ইচ্ছে করে না। ভাত দেখলে বমি আহে। খোয়াবে খাইলে হুন্‌ছি এই রহম অয়।

–অ্যাঁ, কি বল্লি?

–মা কইছে, খোয়াবে যারা খায়, তাগ প্যাট ভার অইয়া থাকে এই রহম। অজম অয় না।

Dhaka University Institutional Repository

বুড়ো ন'কড়ি বলে,– ডাক্তারের কাছে এ-গুলা কইস না। এই সব ভূতের ব্যামোর কিছু ডাক্তার বুঝবও না, বিশ্বাসও করব না। আমিও কত দিন স্বপ্নে খাইছি–রসগোল্লা, সন্দেশ, জিলাফি, কচরী, পানতুয়া–ন'কড়ি মিষ্টির নামের শিকলি ছাড়তে শুরু করে।

মুচকি হেসে ডাক্তার বলেন,–খেতে কেমন লাগে?

–কেমন লাগবে আবার! ভালা। ঠিক হালুইকরের মিষ্টির মতন। কিন্তুক অজম অইতে চায় না। অজম অইলে কি আর কথা আছিল?

ডাক্তার রহস্য করে বলেন,– সত্যি, হজম হলে আর কোন কথা ছিল না। বাজারে যখন রসগোল্লা সন্দেশ পাওয়া যায় না আজকাল, তখন স্বপ্নে বিনা পয়সায় ...

– বেশ মজা কইর‍্যা খাওয়ন যাইত। ডাক্তারের মুখের কথা লুফে নিয়ে ন'কড়ি বলে।

ডাক্তার এবার গর্জন করে ওঠেন,–হুঁহ, যত সব আহম্মক নিয়ে কারবার। যা এখান থেকে। স্বপ্নে রসগোল্লা খা গে। ওষুধ খেতে হবে না। (পৃ. ৩০৭-৩০৮)

গ. জয়গুন তাড়াতাড়ি চুলো ধরায়। রাতের জন্য মুঠ মেপে ছয়মুঠো ও ভোরের জন্য আরো ছয়মুঠো চাল নিয়ে সে হাঁড়ি বসায় চুলোর ওপর। ছেলেকে হুকুম দেয় কয়েকটা কুমড়ো পাতা তুলে আনতে। নিজে সে যায় না। বাচ্চা-কাচ্চার মা, রাত-বিরাতে গাছের ফল-পাতা ছিঁড়তে নেই। (পৃ. ২৩৫)

ঘ. মার কথা শুনতে শুনতে সে (কাসু) তন্ময় হয়ে যেত। আর ভাবত আহা–মা থাকা কত সুখের! গঙ্গে সঙ্গে তার মনে জাগত সমবয়সীদের কথা। হামিদের মা হামিদকে কত স্নেহ করে। সেলিমের মা কত আদর করে সেলিমকে। কিন্তু তাকে আদর করবার কেউ নেই।

তারপর থেকে সে প্রায়ই কবরটাকে দেখতে আসতো। মাঝে মাঝে করিম বক্শের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে মোমবাতি কিনে কবরে দিত। (পৃ. ২৮০)

ঙ. সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে সাঝঁ বাতি দেখিয়ে আবার নিবিয়ে দেয় মায়মুন। (পৃ. ২৩৪)

চ. শফির মা জ্বরের শরীর নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসে। বলে,–আহা, হুকাইয়া এক্কেরে কাষ্ঠ অইছে মানিক। খালি আড়গুলা আছে।

–আড় বাঁইচ্যা থাকলে মাংস একদিন অইবই। কাসুর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জয়গুন বলে।

–হ, আল্লায় বাঁচাইয়া রাখুক। আমার যত গাছ চুল আছে, তত বচ্ছর আয়ু যেন খোদায় ওরে দ্যায়। (পৃ. ৩১৪)

ছ. –কারা ওইখানে? কেডা, কেডারে? শফির মা চেঁচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। –খবরদার, ফলগাছে কোপ দিলে আজগাই ঠাডা পড়ব মাতায়, কইয়া রাখলাম। (পৃ. ৩১৫)

জ. করিম বক্শ নিশ্চুপ ওত পেঁতে থাকে। চারিদিকে চোখ বুলায় একটা ধান গাছ নড়ে কিনা। কখনও কোঁচ নিয়ে, কখনও যুতি হাতে নিয়ে সে তাক করে। ...

করিম বক্শ কোঁচটা তুলে নিরাশ হয়। বলে,– দুশশালা! আইজ যাত্রাটাই খারাপ। আর কেওর কোঁচের নিচে পড়তে পারলি না? আমারডার নিচেই–

–কি মিয়া, কাছিম নাহি? একজন জিজ্ঞেস করে।

–আরে কইও না মিয়া। আইজ যাত্রাডাই খারাপ।

–যাত্রা খারাপ! ক্যাঁ? বউর মোখ দেইক্যা যাত্রা কর নাই মিয়া? ...

আরো কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে যখন আর মাছের সাড়া পাওয়া যায় না, তখন করিম বকশ বলে,–কি জানি এইর'ম অইতাছে ক্যান। তোরা কাপড় উল্টা কইর‌্যা পিন্দা নে, দেহি কি অয়।

করিম বক্‌শ নিজেও গামছা পরে লুঙ্গি ছাড়ে। লুঙ্গির দিক পালটিয়ে নিয়ে আবার পরে। (পৃ. ২৪৬)

ঝ. বিকেল বেলায় মায়মুন তেঁতুল তলায় বড়শী নিয়ে বসে। তার কোলের কাছে হাঁসের বাচ্চা দুটো। আবার শফি এসে জোটে সেখানে। একটা ঢিল ওর বড়শীর কাছে ছুঁড়ে শফি তেঁতুল গাছের আবডালে পালায়।

মায়মুন কিছু দেখতে না পেয়ে দাঁড়াতেই হেসে ওঠে শফি–হিঁ-হিঁ-হিঁ! ...

–হ রে হ। কি মাছ পাইছস?

–কিচ্ছুই না। একটা তিঁত পুডিও না।

–কিচ্ছুই না?

–উঁহু!

শফি আশ্চর্য হয়। তারপর গম্ভীরভাবে বলে,– তোর বড়শীতে ক্যার জানি মোখ লাগছে রে! কেও নষ্ট না করলে এমুন অয়? আমার মনে অয়, কেও ডিঙ্গাইয়া গেছে তোর ছিপ। হেই-এর লাইগ্যা মাছ ওঠতে আছে না।

মায়মুন শফির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

শফি বলে,– পোড়াইয়া নে আগুনে। ঠিক অইয়া যাইব।

শফি ও মায়মুন মাটির হাতায় আগুন নিয়ে বড়শীটা পোড়া দেয়। (পৃ. ২৫৯-২৬০)

ঞ. হাসু বলে,–কাল অই আণ্ডা বিরান খাইমু মা, পান্তা ভাত দিয়া। ... ই-স, বাচ্চা ফুডাইমু আমি। প্রতিবাদ করে বলে মায়মুন। ... জয়গুন বলে,–ওঁহো। পয়লা দিনের আণ্ডা। আণ্ডা দুইডা জুম্মার ঘরে দিয়া আবি নামাজের দিন। ... সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে (মায়মুন) হাঁস দুটো ছাড়তে যায়। ঠিক ঠিক দুটো ডিমই পেড়েছে আজো। ... জয়গুন আরো বলে,–দুফরে যাবি জুম্মার ঘরে। আণ্ডা চাইড্যা দিয়া আ'বি। ... চাইড্যা অই! হাসু আশ্চর্য হয়ে যায়,–তুমি না হেদিন কইলা, পয়লা দিনেরডা কেবল? ... দুইড্যা আণ্ডা জুম্মার ঘরে কেমন কইর‌্যা দেই, পাগল? এক আলির কমে– (পৃ. ২৩৫-২৩৬)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত লোকসংস্কারেরর অবলম্বন আয়ুষ্কাল। যে ব্যক্তির কথা ভাবা হয়, অথবা তাকে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করা হয়, আকস্মিকভাবে সেখানে সে আবির্ভূত হলে তার দীর্ঘায়ু রয়েছে, এরূপ সংস্কার লোকসমাজে প্রচলিত। জয়গুন সম্পর্কে শফির মায়ের সংলাপে এ বিষয়টিই প্রকাশিত, যদিও এর অন্তরালে কোনো যুক্তি বা কার্য-কারণ সম্পৃক্ত নয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নিরক্ষর, সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর স্বপ্ন সংক্রান্ত অতিলৌকিক সংস্কারের সমান্তরালে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রমেশ ডাক্তারের যুক্তিনিষ্ঠ মনোভঙ্গির পরিচয় প্রকাশিত। অসুস্থ আলাউদ্দিনের পক্ষে আর্থিক দৈন্যের কারণে মিষ্টি খাওয়ার সুযোগ না ঘটায় সে স্বপ্নে সেই সাধ পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে, হজমের সমস্যার কারণে তার পেটে গণ্ডগোল দেখা দিলে সে পুরো ব্যাপারটিকে স্বপ্নে মিষ্টি খাওয়ার দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়। এ ধরনের লোকসংস্কার উদ্ভূত হয় মূলত ব্যক্তির অপূর্ণ সাধ চরিতার্থ করার বাসনাহেতু, কেননা বাস্তবে তার পক্ষে সেটি সম্ভব নয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর প্রতি নিষেধাজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রাচীন সংস্কারবশত। গাছ যেহেতু ফুল ও ফল ধারণ করে, তাই তার সঙ্গে নারীর সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের অভিন্নতাহেতু রাতের বেলা গাছের ফল-পাতা না ছেঁড়ার রীতি লোকসমাজে প্রচলিত। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কাসুর বাল্যহৃদয়ের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে মৃত মায়ের কবরে মোমবাতি প্রজ্বলনের লোকসংস্কার অনুসরণের ঘটনায়। কোনো মৃত ব্যক্তি অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, তাই তার কবরে আলো জ্বেলে সান্ত্বনা পাবার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তার প্রিয়জনদের হৃদয়ে সেই ব্যক্তির

জন্য লালিত ভালোবাসারই রূপায়ণ এ লোকসংস্কারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে অন্ধকারের প্রতি মানুষের ভীতিবোধের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। দিন ও রাতের কালগত বিভেদকারী সন্ধ্যা সম্পর্কে গ্রামীণ লোকসমাজে নানা বিশ্বাস, সংস্কার প্রচলিত। যেহেতু অন্ধকার অশুভ, অকল্যাণের এবং আলো কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতীক, তাই সন্ধ্যাবেলায় সাঁঝবাতি জ্বালানোর রীতি অনুসৃত। 'চ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে অন্যের কল্যাণকামনায় পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকদের আশীর্বাদ জানানোর রীতি লক্ষণীয়। করিম বক্শের হঠকারিতাবশত কাসু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় সে শারীরিকভাবেও ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই কাসুকে দেখতে এসে শফির মা তার প্রতি করুণাবশত এ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে। 'ছ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শফির মায়ের সংলাপে অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে গফুর শেখের প্রেরিত কাঠুরেদের প্রতি, যারা তাকে না জানিয়েই 'টিয়া-ঠুঁইট্যা' আমগাছটি কাটতে উদ্যত হয়েছিল। জয়গুন তাকে এ বিষয়টি অবহিত না করায় শফির মা এভাবে কাঠুরেদের নিরস্ত্র করতে চেয়েছিল। ফলের গাছ কাটলে অকল্যাণ হয়, এরূপ লোকসংস্কারই মূলত শফির মাকে এ অভিশাপ বাণী উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'জ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মাছ ধরতে নেমেও উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় করিম বক্শের অভিযোগ দাঁড় করানোর অন্তরালে রয়েছে বাড়ি থেকে যাত্রাবিষয়ক লোকসংস্কার। প্রথমে তার কোচে কচ্ছপ ধরা পড়া, এরপর মাছ ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়া–দ্বিবিধ জন্য সে উক্ত লোকসংস্কারকেই দায়ী করে। এরপর এর প্রতিকার হিসেবে সে নিজের পরনের লুঙ্গি উল্টে পরিধানের পাশাপাশি সঙ্গীদেরও অনুরূপ নির্দেশ দেয়। 'ঝ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মাছ ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার অজুহাত হিসেবে লোকসমাজে প্রচলিত একাধিক সংস্কারের পরিচয় প্রকাশিত। মায়মুনের বড়শিতে কোনো মাছই ধরা না পড়ায় শফি ধারণা করে, হয়ত কেউ সেই বড়শিতে মুখ লাগিয়েছে অর্থাৎ সেটি সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশংসা করেছে। নতুবা কেউ সেই বড়শি ডিঙিয়ে গেছে বলেই মায়মুন সেটি দিয়ে মাছ ধরতে পারছে না। এর প্রতিকার হিসেবে তারা আগুনে বড়শি পোড়ায়। বলাবাহুল্য, লোকসমাজে এসব সংস্কার প্রচলিত বলেই বালক-বালিকারা তা আয়ত্ত করে এবং ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ ঘটায়। 'ঞ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে জয়গুনের আচরণে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব লক্ষণীয়। মায়মুনের পালিত হাঁসের প্রসব করা প্রথম দুটি ডিম মসজিদে দিয়ে এলে রহমত বাড়বে, এরূপ ধারণা তার ভাবনায় সক্রিয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সে এ সিদ্ধান্ত বদলায়। কারণ দুটি ডিম মসজিদের ইমামকে দান করা দৃষ্টিকটূ ভেবে সে হাসুকে চারটি ডিম দিয়ে মসজিদে পাঠায়। পারলৌকিক কল্যাণের অভীপ্সা মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে, এটি তারই দৃষ্টান্ত।

৩. লোকসাহিত্য–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ লক্ষণীয়। লোকমানুষের নিত্যদিনের কথোপকথনে ও পারস্পরিক আলাপচারিতায় এসব উপাদানের প্রয়োগ ঘটে। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তাদের সৃজনশীলতা ও মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনিভাবে সেই সমাজভুক্ত মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার পরিচয়ও মেলে। বিশেষত, বিবিধ ধর্মীয় অনুশাসন, সংস্কার ও মূল্যবোধকে ধারণের প্রচেষ্টা প্রবাদ, লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা প্রভৃতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৩.১ প্রবাদ––

খাইতে নাই হুইতে রাঙ্গা পাড়ি। (পৃ. ২৩৮)

অদিষ্টে কষ্ট থাকলে খণ্ডাইব কে? (পৃ. ২৪০)

পাপে বাপেরেও ছাড়ে না। (পৃ. ২৪১)

ঘর নাই, দুয়ার দিয়া হোয় (পৃ. ২৫৪)

সুখে থাকতে ভূতে কিলায়? (পৃ. ২৫৮)

মোখ দিছে যে, আহার দিব সে। (পৃ. ২৮৮)

পেডের জ্বালা বড় জ্বালা মাইনষের। (পৃ. ২৯০)

কে কখন কোন তাল দিয়ে বসে বলা যায় না। ... তাল দিতে পারে সবাই, মিঠাই দিতে পারে না কেউ। (পৃ. ২৯৪)

যেমন কর্ম তেমন ফল (পৃ. ৩০৫)

৩.২ লোককাহিনী--

ক. শফির মা শুয়ে শুয়ে গল্প আরম্ভ করে,–ভীম একদিন তার মা-রে জিগায়– 'মা, আমার তন বড় জোয়ান কে?' তার মা কয়,–'আছে একজন। গাঙ্গের পাড় দিয়া আঁটলেই তার দ্যাহা পাইবা।' তহন পৌষ-মাইস্যা রাইত। ভীম কতক্ষুণ পর শীতে ঠকঠক করতে করতে বাড়ীতে আহে। মায় জিগায়–দ্যাহা পালি বা'জান? ভীম কয়,–'হ গো মা। (পৃ. ৩১১)

খ. শফির মা আর পুরাতন স্মৃতি ঘাঁটতে সাহস পায় না। ... তার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে সে নয় সন্তানের জননী। কিন্তু একমাত্র শফিই বেঁচে আছে। ...মাঝে মাঝে শফির মা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বলে,–আমার ওরা বাঁইচ্যা থাকলে এই দশা আমার? আইজ আমি খরাত কইর‍্যা খাই! ওরা বাঁইচ্যা থাকলে আমার বাদশাই কপাল আছিল। ওরা কামাই করত। ওগ বউ আইত ঘরে। ওরা রাইন্দা-বাইড়্যা সামনে ধরত। সোনার খাটে বইস্যা, রূপার খাটে পাও রাইখ্যা আমি সব দ্যাখতাম আর হুকুম করতাম। নাতি-নাতকুড় ঘিরা বইত চাইর পাশে। ক্যাঁচম্যাচ করত কিচ্ছা হোননের লেইগ্যা। (পৃ. ২৬১)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত লোককথায় প্রকাশিত হয়েছে গ্রামীণ জনজীবনে শীতের দাপটে কাবু বীর ভীমের নাজেহাল অবস্থার স্বরূপ। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শফির মায়ের মনস্তত্ত্বে রূপকথার প্রভাব লক্ষণীয়। সে শুধু শফি ও মায়মুনকে কেচ্ছাই শোনায় না, সেইসঙ্গে অবচেতনলোকে সন্নিহিত রূপকথার ভাবাবহ ও অলৌকিক পরিমণ্ডলকে নিজের জীবনবাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায়। প্রিয় সন্তানদের বারবার হারাবার বেদনা তার জীবনে যে দুর্বিষহ অভিঘাত সৃষ্টি করেছে, তার রেশ আজীবন তাকে বিয়োগব্যথায় কাতর করে তোলে। সে প্রাণপ্রিয় সন্তান ও পরিজনদের নিয়ে যেভাবে বয়সকালে দিন কাটাতে চেয়েছিল, সেই প্রত্যাশাই এ উদ্ধৃতিতে অভিব্যক্ত হয়েছে রূপকথার অনুষঙ্গে।

৩.৩ লোকসঙ্গীত--

গ্রাম্য লোকগীত--

আত আছিল, পাও আছিল,
আছিল গায়ের জোর,
আবাগী মরল ওরে
বন্দ কইরা দোর। (পৃ. ৩১৯)

ভিক্ষুকের গান--

যে জন করিবে দান অন্ধ মিসকিনে
বকশিশ পাইবে সেই হাশরের দিনে।।
এক পয়সা যেই দিবে খুশী খোশালিতে।
সত্তুর পয়সা পাইবে আল্লার রহমতে।।
বরকত হইবে তার রুজি- রোজগারে।

Dhaka University Institutional Repository

বাল-বাচ্চা জিন্দা রবে সুখের সংসারে। (পৃ. ২৪২)

কৃষকদের মাঠে ধান কাটার গান--

কচ্-কচা-কচ কচ্-কচা-কচ
ধানরে কাটি,
মুঠা মুঠা ধান লইয়া বান্দি আঁটি-রে।
(ও ভাই) ঝিঙ্গাশাইলের হুডুম ভালা
বাঁশফুলের ভাত,
লাহি ধানের খইরে ভালা,
দইয়ে তেলেসমাত-রে।

কস্তুরগন্ধী চাউলরে আলা,
সেই চাউলেরি পিঠা ভালা,
সেই না পিঠায় সাজিয়ে থালা
দাও কুটুমের হাত-রে।

আল্লাদি বউ কোটে চিড়া
মাজায় রাইখ্যা হাত,
সেই না চিড়ায় কামড় দিয়া
বুইড়ার ভাঙে দাঁত–রে।

মিয়া বাড়ী ঘটক আসে
কন্যা-বিয়ার কথার আশে,
বোরো দানের ভাত খাওয়ানে
মিয়ার গেল জাত–রে। (পৃ. ২৯৩)

৩.৪ ছড়া-- এ উপন্যাসে লোকসংস্কারমূলক, পেশাগত, বালক-বালিকাদের হাসি-ঠাট্টা, এমনকি ভূত-প্রেতের ভর করা প্রভৃতি বিষয়ক ছড়া লোকমানুষের আচরণ-মনোভঙ্গি প্রকাশের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিচে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হলো।

লোকসংস্কারমূলক--

পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।

কন্যা সে মাথায় বোঝা কূলে দেয় দাগ। (পৃ. ২৪০)

চানাচুর বিক্রেতার ছড়া--

খেয়ে যান মজার নাশতা,

নিয়ে যান সস্তা সস্তা,

এক আনায় দুই বস্তা! (পৃ. ২৪২)

বালক-বালিকাদের ছড়া--

শামুক খাজারে, আমার বাড়ী আয়,

কুচি কুচি শামুক দিমু হলদি দিমু গায়,

ওরে শামুক খাজারে।

তোর বাড়ী অনেক দূরে, সাত পাক ঘুইরে ঘুইরে

আমার বাড়ী আয়। (পৃ. ২৫৮)

বড়শিতে কারো নজর বা মুখ লাগলে তা কাটানোর ছড়া--

বড়শী পুড়ি, বড়শী পুড়ি,

ট্যারা পড়শীর মোখ পুড়ি,

মাছ ধরমু দুই কড়ি।।

লোয়ার বড়শী সুতার ডোর

পুঁডি পাবদা, শিং মাগুর।।

বড়শী আমার প্যাদা

ধইর‍্যা আনব ভ্যাদা-

ধইরা আনব ভ্যাদা-

ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়,

পুঁডি মাছে পান চাবায়।

অ- হো-হো-হি-হি-হি! (পৃ. ২৬০)

ভূত ভর করা মানুষের ছড়া--

আমার নাম দিদার বকশ শুইন্য মন দিয়া

আমার নামে ভূত-পেত্নী সবাইর কাঁপে হিয়া!

শেখ ফরিদের নাম লইয়া যদি মন্তর ঝাড়ি,

হাজার গণ্ডা ভূত-পেত্নী ভেল্টাইবার পারি।

হ্যাঁরে–হাঁই–হুম–হাঁই–হুম–হাঁই।

তোমার লেইগ্যা বইস্যা আছি, কও তোমার নাম।

কিবা জাত, কিবা গোত, কোন খানেতে ধাম?

হ্যাঁরে–হাঁই–হুম–হাঁই–হুম–হাঁই। (পৃ. ২৯৮)

বালক-বালিকাদের ঝিঁঝিপোকা ধরার ছড়া––

ঝিঁঝি লো, মাছি লো,

বাঁশতলা তোর বাড়ী,

সোনার টুপি মাথায় দিয়া

রূপার ঝুমুর পায়ে দিয়া

আয়-লো তাড়াতাড়ি।

ঝিঁঝি ঝিঁঝি করে মায়,

ঝিঁঝি গেছে সায়বের নায়,

সাতটা কাউয়ায় দাঁড় বায়,

ঝিঁঝিলো তুই বাড়ীত্ আয়।

ঝিঁঝির বাপ মরছে্

কুলা দিয়া ঢাক্ছে

ঝিঁঝির মা কানছে,

আয়-লো ঝিঁঝি বাড়ীত্ আয়। (পৃ. ৩১৮)

৩.৫মন্ত্র

খাটো কাপড় উলট বেশে

বাণ মারলাম হেসে হেসে।

সেই বাণে মেদিনী কাঁপে,

জল কাঁপে, থল কাঁপে,

চান কাঁপে, তারা কাঁপে,

পাতালের বাসুকী কাঁপে,

আগে ভাগে ভূত পেরেতে,

জিন ভাগে শেষে।

কলা বাণে ভূত মারলাম,

পেত্নী বানলাম কেশে। (পৃ. ৩২১)

৩.৬ ধাঁধা–

ক. মাছ করে ঝক ঝক ছোট্ট এক বিলে

একটা মাছে টিপ দিলে বেবাকগুলো মিলে। (পৃ. ২৬১)

খ. আসমানী বিরিক্ষর ফল,

তল নাই দীঘির জল,

যা খাইলে হয় অসুরের বল। (পৃ. ২৮১)

৪. লোক-উৎসব-- বাঙালি সমাজে বিয়েকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকউৎসবের আয়োজন প্রচলিত। মানবজীবনের পরিণত আচরণের অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর ভূমিকা ও প্রভাব অনস্বীকার্য। বিয়েকে কেন্দ্র করে নানা লোকাচার আদিকাল থেকেই প্রতিটি সমাজে প্রচলিত। এতে দুজন নর-নারীকে ঘিরে যে উৎসবময়তা তাদের পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি সম্প্রসারিত। এ উপন্যাসে বিয়েসংক্রান্ত দুটি প্রাসঙ্গিক বিবরণ লক্ষণীয়। গেদি-লালুর বিয়ের প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপজীব্য হলেও জয়গুনের মেয়ে মায়মুনের বিয়ের বৃত্তান্ত দীর্ঘ পরিসরে উপস্থাপিত। দরিদ্র বাঙালি মুসলমান পরিবারে বাল্যবিবাহের রীতি প্রচলিত। জয়গুনের স্বল্পদরে চাল কেনার সঙ্গী লালুর মা ও গেদির মায়ের নিজেদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তে বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। গেদির বয়স মাত্র পাঁচ বছর হলেও লালুর মা তার ছেলে লালুর জন্য তাকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করে। বিয়েতে গহনা হিসেবে লালুর মা পুত্রবধূর কানে কানফুল, নাকে নাকফুল আর বালি, 'আতে বয়লা', 'পায়ে ব্যাকখাড়ু' দিতে চায় । তবে সে এসব গহনা রূপার নয় বরং কেমিকল আর বেলী' দিয়ে চালাতে চাইলে গেদিও মা এতে অসম্মতি জানায়। সে দাবি করে, রূপার অন্তত একটি অলংকার দিতেই হবে। সঙ্গে আরো দিতে হবে 'গলার অড়কল আর কোমরের নাবীসঙ্গ'। লালুর মা জানায়, সে 'নাবীসঙ্গ', 'অড়কল' এবং 'খাড়ু' দিতে না পারলেও পায়ের 'ঝুনঝুনি' দেবে। কোন মাসে বিয়ে হবে, এরূপ সংস্কারও লোকসমাজে প্রচলিত। শ্রাবণ মাসে গেদির সঙ্গে লালুর বিয়েতে গেদির মা সম্মত নয়, কেননা এ মাসে তার মেয়ে জন্মেছে। আবার 'ভাদ্দর মাসে বিলাই পার করে না ঘরতন' (পৃ. ২৪২)। সেকারণে এ বিয়ের দিনক্ষণ আশ্বিন মাসে চূড়ান্ত করার ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে মায়মুনের বিয়ের বৃত্তান্তে বাঙালি মুসলমান লোকসমাজে প্রচলিত নানা রীতি-নীতি, সংস্কার ও আচার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। শফির মা মায়মুনের জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে। দশ বছরের মায়মুনের জন্য সদাগর খাঁর নাতি ও সোলেমান খাঁর ছেলে ওসমান, যার প্রথম স্ত্রী মৃত, তাকে নির্বাচন করা হয়। তার বয়স পঁচিশ বছর পেরিয়েছে। অন্যদিকে মায়মুন অপুষ্টির শিকার বলে তাকে দেখতে সাত বছরের বালিকা মনে হয়। জয়গুন মেয়ের অল্প বয়সের অজুহাত দিয়ে এ প্রস্তাব এড়াতে চাইলে শফির মা জানায়, 'দুধের মাইয়া! কি যে কস্ তোরা ছাই-মুণ্ডু। মাইয়ারা এই বয়সে বাচ্চা বিয়ায়। আমার

মা-র এগারো বচ্ছরের কালে আমার জর্ম অয়’ (পৃ. ২৬৩-২৬৪)। বিয়ের সম্ভাব্য দিন নির্ধারণের আগে সেটি শুভ কি না তা যাচাই করার রীতি বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে বহুদিন ধরে প্রচলিত। শফির মা লতিফ মিয়ার বাড়িতে গিয়ে জেনে এসেছিল, ৯ই অগ্রহায়ণ বিয়ের দিন হিসেবে শুভ কি না।

> লতিফ মিয়া তার পকেট পঞ্জিকা বের করে। একটা পাতার ওপর নজর দিয়ে সে আপন মনেই বলে–ÔP› ‘ i√R√ ea gŠ¡|Ô তারপর শুভকার্যের নির্ঘণ্ট দেখে বলে দেয়,–অগ্রাণ মাসের ৯ তারিখে একটা শুভদিন আছে। আর একটা আছে শেষাশেষি–২৭ তারিখ। এছাড়া অগ্রাণ মাসে আর দিন নেই। ... পঞ্জিকার ওপরের রাশিচক্র অঙ্কিত মলাটের দিকে তাকিয়ে লতিফ মিয়ার গণনায় শফির মার মনে একটু সন্দেহও জাগে না। সে ভাবে–এমন বই-এর গণনা কখনও ভুল হতে পারে না। (পৃ. ২৮৫)

বিয়ের আয়োজনে বরপক্ষের প্রদত্ত অর্থে কনেপক্ষ নিমন্ত্রণের বন্দোবস্ত করে। কতজন বরযাত্রী উপস্থিত থাকবে, তার ভিত্তিতে পুরো আয়োজন সম্পন্ন হয়। কী খাওয়ানো হবে, সেই তালিকা প্রস্তুত ও তা রান্না, পরিবেশনের ভার কনেপক্ষকে সামলাতে হয়। সন্ধ্যার পর নতুন জামাই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। হাসু ও শফি হোগলা পেতে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করে। জয়গুনের বাড়ির উঠানের এক পাশে পা ধোয়ার জন্য পানিপূর্ণ কলস, বদনা, বসবার জলচৌকি ও খড়ম রাখা হয়। আর্থিক দৈন্যের কারণে নতুন জামাইকে পালকির পরিবর্তে সঙ্গীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে হয়। মায়মুনের জামাই ওসমানের পরনে গোলাপি মাদ্রাজী লুঙ্গি, গায়ে বেগুনি রঙের পাঞ্জাবি ও মাথায় লাল টুপি। বয়স্ক ও কুশ্রী জামাইকে দেখে জয়গুনের মনে হয়, ‘মেয়েকে নদীতেই ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে’ (পৃ. ২৮৬) নিতান্তই অভাবের তাড়নায়। বরযাত্রীদের মধ্যে ওসমান ও গদু প্রধান ব্যতীত অন্যরা খালি পায়েই আসায় তারা পা ধুয়ে মজলিসে বসে। নতুন জুতা চুরি হওয়ার শঙ্কাবশত এ নিয়ে রসিকতার সৃষ্টি হয়। আগত অতিথিদের সংখ্যা গুনে হাসু জয়গুনকে জানালে এ নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। কেননা, বরপক্ষের কতজন অতিথি আসবে, সেটি আগেই কনেপক্ষকে অবহিত করা হয়েছিল এবং সেই অনুপাতে রান্নার আয়োজন করা হয়েছিল। বাড়তি মানুষের খাবারের ভার সামলাতে বুদ্ধিমতি শফির মা তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। কেননা, ‘যেমুন মাছ, তেমুন বড়ি না অইলে কি দুইন্যাই চলে? পালবরাদ্দে আইচে যেমুন, খাইব তেমুন ঝুড়া পানি’ (পৃ. ২৮৭)। মৌলবি বিয়ে পরাবার সময় জয়গুনকে তওবা করতে হয় যে, সে বেপর্দা অবস্থায় পরপুরুষের সামনে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনেও রাস্তায় নামবে না। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে জয়গুনকে সামাজিক চাপ মেনে নিয়ে এ শর্তে রাজি হতে হয়। এরপর মৌলবি তার মাথার লম্বা পাগড়ি খুলে এর এক প্রান্ত মেয়েপক্ষের প্রতিনিধি কেরামতের হাতে দিয়ে অন্যপ্রান্ত নিজের হাতে রাখে। কেরামত মায়মুনের বসবার আয়োজনে উপস্থিত হয়ে জয়গুনকে জানায় ‘ধইর‍্যা, থাক, চাচি। হুজুর যা যা কইবেন, খেয়াল কইর‍্য’ (পৃ. ২৮৯)। একপর্যায়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে ভোজনপর্ব শুরু হয়। এরপর বরপক্ষের প্রদত্ত উপহারাদি মিলিয়ে নিয়ে কেরামত মায়মুনকে নতুন পোশাকে সাজানোর ব্যাপারে তদারক করে।

> সোলেমান খাঁ একটা টিনের পুরাতন স্যুটকেস খুলে গয়নাগুলো গামছার ওপর আলাদা করে জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে রাখে। গয়নার মধ্যে বয়লা, গোলখাড়, নাকফুল, নোলক। এগুলো হাত দিয়ে নেড়ে প্রথমেই আপত্তি করে কেরামত,–আপনেরা গয়নার জোখা নেন নাই? এত বড় গয়না কে পরব? ... বড় অওয়ন ভালা। বউ আমাগ অহন ডেগা অইলে কি অইব? এক বচ্ছর পর যহন সিয়ানা অইব তহন ঠিক কাপাকাপা অইব। ভাঙা-গড়া করলে রূপা আর রূপা থাকে না। ফুক্কা অইয়া যায়। ... ওসমানের প্রথম স্ত্রীর পাটের শাড়ী, একখানা লাল পেড়ে শাড়ী ও গয়নাগুলো ঘরে নিয়ে যায় কেরামত। হাতের বয়লা ও পায়ের গোলখাড়ু সুতো দিয়ে বেঁধে পরিয়ে দেওয়া হয় মায়মুনকে। পাটের দশ হাত শাড়িটা এমন পেঁচিয়ে সামলান হয় যে, দূর থেকে মায়মুনকে দেখে বোঝা যায় না। মনে হয় একটা কাপড়ের পুটলি। (পৃ. ২৯০)

মায়মুন আবদার জানায়, তার সঙ্গে জয়গুনকেও শ্বশুরবাড়িতে যেতে। কিন্তু সে সম্মত না হওয়ায় হাসু ও শফি তার সঙ্গে যাবে, এরূপ সিদ্ধান্ত হয়। দুদিন সেখানে থেকেই মায়মুন নাইওরে আসবে মায়ের কাছে, জয়গুন তাকে জানায়। এরপর বিয়ের অনুষ্ঠানের সাক্ষী ও উকিলের উপস্থিতিতে মায়মুনকে এ বিয়েতে পঞ্চাশ টাকা দেনমোহরের

বিনিময়ে সম্মতিদানের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে সে জয়গুনের পরামর্শ মেনে প্রস্তাব মেনে নেয়। মেয়েকে বিদায়কালে 'জয়গুন এক গ্লাস শরবত মায়মুনের হাতে দিয়ে বলে,– নে লক্ষ্মী, এক চুমুক খাইয়া গেলাসটা দিয়া দে' (পৃ. ২৯১)। এরপর ওসমানের পিতা সোলেমান খাঁ ছেলে ও পুত্রবধূকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়।

৫. লোকখাদ্য–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজভুক্ত মানুষের নিত্যদিনের আহারাদির পাশাপাশি বিয়ে ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্যের উল্লেখ রয়েছে––

> ক. ওজু করে জয়গুন ঘরে যায়। শেষ রোজার ইফতারের জন্য আজ একটু আলাদা আয়োজন–চার ফালি শশা ও এক খোরা গুড়ের শরবত। (পৃ. ২৫১)
>
> খ. হাসু আসে রাত আটটায়। মোট বয়ে বারো আনা পেয়ে সে চার আনা দিয়ে একটা নারকেল নিয়ে আসে। জয়গুন দেখে রাগ করে,– তোর আর আক্কল অইব কোনদিন! অত পয়সার নাইকল কিনতে গেলি ক্যান? ... ইদের দিন এট্টু শিন্নিও খাইমু না? ... (পৃ. ২৫২)
>
> গ. বাজারের এক জায়গায় সারি সারি গুড়ের হাঁড়া ও জালা সাজিয়ে দোকানদাররা বসেছে। আজ ওদিকে খুব ভিড়। মাছি-মৌমাছিও ভিড় করেছে গুড়ের ওপর। (পৃ. ২৫৫)
>
> ঘ. বিকেল বেলা ঘুরে ঘুরে জয়গুন অনেক গন্ধভাদালপাতা যোগাড় করে আনে। শহরের গিন্নিরা এ জংলী শাকের বড়া খেতে ভালবাসে। (পৃ. ২৭৫)
>
> ঙ. হাসু ও শফি আসে বিয়ের বাজার করতে। চার সের দুধ, দুটো শোল মাছ, দুটো লাউ আর চাল-ডাল এবং আরো কিছু সওদা নিয়ে তারা বাড়ী আসে। ... পান-শরবত খাওয়াইয়া বিদায় করমু। ... শইল মাছ আর কদু দিয়া একটা ঘণ্ট, ডাইল আর দুধ-বাতাসা, ব্যস! আবার কি! (পৃ. ২৮৬)
>
> চ. সাদত আলী বলে,–পরধানের মনে আছে? হেই মধু আলইকরের দোকানে তুমি আর আমি বাজী রাইখ্যা রসোগোল্লা খাইছিলাম। তুমি আমার তন ছয়খান বেশী খাইছিলা। আমি খাইছিলাম একচল্লিশটা (পৃ. ২৮৯)
>
> ছ. কাসুকে ওর ফুফর বাড়ী থেকে নিয়ে আসার পর যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তাতে কাসু হয়তো অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছে। তবুও সে সাধ্যমত চেষ্টা করে। বাজার থেকে বিস্কুট, জিলিপি, কদমা, এনে কাসুকে খেতে দেয়। (পৃ. ২৯৪)

পান খাওয়ার গ্রামীণ সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রচলিত। এ উপন্যাসে জয়গুন, ছমুর মা ও শফির মাকে এ অভ্যাসের বশবর্তী হতে দেখা যায়––

> খাওয়া শেষ হলে জয়গুন ... পানের ডিবাটা নিয়ে বসে এবার। আজ আর পানের ডিবা নেয়ার কথা মনে ছিল না তার। গাড়ীর মধ্যে ছমুর মা-র কাছ থেকে চেয়ে একবার মুখ দিয়েছে একটু। আর সারা দিনের মধ্যে সে পান খায়নি। তবু হাসু অনুযোগ দেয়,–পান খাওয়া ছাইড়্যা দ্যাও, মা। পান আর আনতাম না আমি। চাইর পয়সা কি কম? ... পান খাওয়া সে অনেক কমিয়েছে। চার পয়সার পানে দু'দিন যায় আজকাল। পান চিবোতে চিবোতে সে সারাদিনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতে চেষ্টা করে। (পৃ. ২৩৫)

গ্রামীণ সমাজে পুরুষদের মধ্যে হুকায় ধূমপানের রীতি প্রচলিত। তবে এ উপন্যাসে শুধু করিম বক্‌শের আচরণেই হুকায় ধূমপানের অভ্যাস লক্ষণীয়––

> খ. করিম বকশ তার নারকেলের হুঁকোটা কাসুর হাতে দেয়, আর আগুনের মালসাটা নিজের হাতের তালুতে বসিয়ে অপর হাতে দুটো কাস্তে নিয়ে মাঠে রওয়ানা হয়। ... করিম বকশ কয়েক 'ঘোপ' কেটে আলের ওপর এসে পা ছড়িয়ে বসে। পাশের জমি থেকে ধানকাটা রেখে লেদু মিয়া আলের দিকে আসতে আসতে বলে,–ভালা কইর‍্যা তামুক সাজ, চাচা। একটা দম দিয়া যাই।
>
> করিম বক্‌শ বাঁশের ডিবা হতে তামাক নিয়ে সাজাতে থাকে। (পৃ. ২৯২-২৯৩)

৬. লোকজ্ঞান–– গ্রামীণ লোকসমাজের অন্তর্গত মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার সঙ্গে প্রকৃতি-নিসর্গের নিবিড় সম্পর্ক বহুকাল থেকেই বিদ্যমান। কেননা, প্রকৃতির ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরতা তাদের অস্তিত্বসংগ্রামের অনিবার্য অংশ। ফলে, ভূমি, কৃষিকর্ম, ঋতুভিত্তিক প্রাকৃতিক পরিবর্তন, স্থানীয় ভৌগোলিক প্রতিবেশ, নদী-সাগর সংশ্লিষ্ট জীবিকা, আবহাওয়া, জলবায়ু, ফসল উৎপাদন প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সতর্ক দৃষ্টিপাত বিশেষ ধারণার জন্ম দেয়, যাকে লোকজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে দিনযাপনের আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য লোকমানুষ বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও মাধ্যমের শরণাপন্ন হয়, যেখানে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং কাজটির সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান। এসব অভিজ্ঞতা লোকসমাজে বংশপরম্পরায় বাহিত হয়। এ উপন্যাসে লোকজ্ঞানের দৃষ্টান্ত––

> শফির মা ... বলে ... চানডা সিয়ানা অউক। আ-গো হাসুর মা–এইবার কোন মুহি কাইত অইয়া ওঠছে গো চানডা? দহিণমুহি? ... এইবারে সোজাসুজিই ওঠছে বইন। ব্যাকা-ত্যাগড়া ওডে নাই। লক্ষণ ভালো না? ... হ বইন, আর আহাল অইব না এইবার দেহিস্। যা কইলাম যদি না ফলে তহন কইস, কানা বুড়ী কি কইছিল। ... শফির মা বলে,– হেই আকালের বচ্ছর পঞ্চাশ সনে দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া ঈদের চান উঠছিল। আমি নিজে দেকছি। চউখ তহন তাজা আছিল। আমি দেইক্যা কইছিলাম তহন–এইবার না জানি কি আছে কপালে। ... দক্ষিণ মুহি কাউত অইয়া ওঠলে আকাল অইবই। বুড়ো-বুড়ীর কাছে হুনছি, দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া চান যদি সমুদ্দুরের ওপরে নজর দেয়, তয় বান ডাইক্যা দ্যাশ-দুইন্নাই তলাইয়া যায়।... মায়মুন বলে,– উত্তর মুহি কাইত অইয়া ওঠলে কি অয় মা? ... মড়ক লাগে। কলেরা-বসন্ত অয়। মানুষ মইর‍্যা সাফ অইয়া যায়। (পৃ. ২৫১)

এ উদ্ধৃতিতে শফির মা ও জয়গুনের লোকঅভিজ্ঞতার প্রমাণ মেলে ইদের চাঁদের আকাশে অবস্থানের সঙ্গে বিবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংযোগ অনুধাবনের ঘটনায়, যা বালিকা মায়মুনের মনোলোকেও কৌতূহল সঞ্চারের পাশাপাশি সেই ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মড়ক প্রভৃতি লোকজীবনে বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি করে বলেই তাদের চেতনালোকে এতদ্বিষয়ক আগ্রহ ও পরিস্থিতিগত সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

৭. লোকপ্রযুক্তি–– এ উপন্যাসে বিবৃত লোকপ্রযুক্তির দুটি দৃষ্টান্ত––

> ক. মা চলে যাওয়ার পর মায়মুনের পূর্ণ স্বাধীনতা। এবার তাকে বলবার কেউ নেই। বাচ্চা দুটোকে খাঁচার মধ্যে রেখে সে উঠানের দক্ষিণ পাশে লাউ মাচার নিচে একটা জায়গা বেছে নেয়। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চৌকা একটা গর্ত করে। পানি ঢেলে সেটাকে ভরে। তারপর বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দেয় তার মধ্যে। ... মায়মুন গর্তটার চারদিকে কতগুলো লম্বা পাটখড়ি পুঁতে দেয়। এমনি ভাবে লাউ মাচার সমান উঁচু করে সে একটা বেড়া বানিয়ে ফেলে। চিল বা বাজ ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে না পারে, সে জন্যে এ সতর্কতা। (পৃ. ২৫৮)

> খ. এক প্রহর বেলা। করিম বকশ গোয়াল থেকে গাইটা বের করে উঠানে কাঁঠাল গাছের সাথে বাঁধে। আঞ্জুমন ঝিনুকে করে সর্ষের তেল এগিয়ে দেয়। ... করিম বকশ হুকুম করে,–হাম্বাডা লইয়া আয়। বাজারের বেইল অইয়া গেছে। ... আমার ঘিন্ করে। তুমিই যাও। ... করিম বকশ গোয়ালের এক পাশে ঝুলানো হাম্বাটা নিয়ে আসে। ... গাইটার বাছুর মরেছে অনেক দিন। দুধ-চোর গাই বাছুর না দেখলে দুধ ছাড়ে না। কোথায় লুকিয়ে রাখে। বাছুর না দেখলে বাঁটে হাত দেওয়াও মুস্কিল। ঠ্যাং দিয়ে লাথি মারে। এসব অসুবিধার জন্যে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা। মরা বাছুরটার চামড়ার খোলসে খড়-বিচালি ভরে নকল বাছুর তৈরী করা হয়েছে। ... করিম বকশ হাতে সর্ষের তেল নিয়ে বাঁটে মাখিয়ে দেয়। তারপর নকল বাছুরটার মুখ বাটের কাছে নিয়ে বাছুরের অনুকরণে গুঁতো মারে। এ রকম করলে যখন বাঁটে দুধ নেমে আসে, তখন দুই হাঁটুর মাঝে হাঁড়ি রেখে করিম বকশ দুইতে আরম্ভ করে। (পৃ. ২৮২)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে হাঁসের বাচ্চা লালনের জন্য মায়মুনার সযত্ন প্রয়াসের যে বর্ণনা উল্লেখিত, তা থেকে অনুমারন করা চলে, সে এ ব্যাপাওে ধারণা পেয়েছে অন্য কারো কাছ থেকে ব্যাপারটি দেখে। তাই উপযুক্ত সুযোগ পাওয়ামাত্র সে তা কাজে লাগিয়েছে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পালিত গরুর দুধ আহরণের প্রয়োজনে করিম বকশের

এ কৌশল গ্রহণের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, এ ব্যাপারেও তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে দ্বিধাহীন।

৭. লোকচিকিৎসা–– গ্রামীণ লোকসমাজে শিক্ষার পশ্চাৎপদতাহেতু আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার প্রতিফলন প্রায় অনুপস্থিত। সেকারণেই প্রাত্যহিক জীবনে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা আকস্মিক কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে পীর-ফকির, কবিরাজ ও হাতুড়ে ডাক্তারের দ্বারস্থ হবার মানসিকতা প্রচলিত। পাশাপাশি, বহুযুগ ধরে অনুসৃত ঘরোয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কৌশলকেও তারা মান্য করে থাকে। যেমন–

> ক. জয়গুন সর্ষের তেলের শিশি থেকে একটু তেল নিয়ে হাসুর ঘাড়ে মালিশ করতে করতে বলে,–পায়ে তুঁইত্যার পানি দিছিলি কাইল? ... জয়গুন পায়ের ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে বলে,–দ্যাখ, ক্যাদায় চামড়া খাইয়া ঝাঁজরা কইর‍্যা দি'ছে। ... একটা নারকেলের মালায় তুঁতে গোলা নিয়ে আসে জয়গুন। হাঁসের পালক ভিজিয়ে হাসুর পায়ের তলায়, আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তুঁতের পানির পোচ দেয়। ... হাসু উ-হু-হুঁ করে উঠে। বলে,–আর দিও না। বড় পোড়ায়। ... না দিলে চামড়া পইচ্যা যাইব এক্কেরে। আঁটতে পারবি না। রাস্তা-ঘাটে যেই ক্যাদা। ... জয়গুন নিজের পায়েও তুঁতে গোলা দিয়ে প্রলেপ লাগায়। মায়মুনের পায়েও লাগিয়ে দেয়। বাড়ীর উঠানে পর্যন্ত কাদা হয়েছে। পায়ের পাতা অবধি ডুবে যায় কাদায়। তুঁতের প্রলেপ দিলে পায়ের তলা অত হেজে যেতে পারে না। (পৃ. ২৬৫)

> খ. জয়গুন আবার ডাকে,–কাসু, বা'জান একবার চউখ মেইল্যা দ্যাখ। ... করিম বকশ ডেকে বলে,–কাসু, চাইয়া দ্যাখ তোর মা আইছে। ... আঞ্জুমন বলে,–দুই দিন আগেও টাস টাস কতা কইছে। দুই দিন ধইর‍্যা জ'ব বন্ধ। কত ফকির-কবিরাজ, কত কত পানি পড়া, তাবিজ-তুমার। কিছুতেই কিছু অইল না। যে যা কইছে কোন তিরুর্ডি অয় নাই। (পৃ. ৩০৪)

> গ. সাধারণভাবে গ্রামের লোকের আস্থা নেই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ওপর। তাদের ধারণা–অ্যালোপ্যাথিকের তেজালো ওষুধ পেটে গেলে রোগী যা-ও দু'ঘণ্টা বাঁচত, তাও শেষ হয়ে যায় দুঘণ্টা আগেই। গ্রামে তাই ফকির-কবরেজদের পসার বেশী। ওষুধ মেশানো পানির চেয়ে বেশী কদর মন্ত্র-পূত পানির। সোয়া সের চাল আর সোয়া পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে যেখানে ফকির বিদায় করা যায়, সেখানে টাকা খরচ করে ডাক্তার বড় কেউ ডাকে না। (পৃ. ৩০৫)

> ঘ. মুখ বিকৃত করে রমেশ ডাক্তার বলেন–মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত! তবে দেব এক ফোঁটা পটাশিয়াম সায়ানাইড? দেখি কে বাঁচায়? ... নিত্যানন্দ বলে,–তোমার ঐ বাজে কথা রাখ ডাক্তার। ...জগদীশ ডাক্তার চৌধুরীকে বলল–আমরা ওষুধ দিতে পারি, জীবন তো আর দিতে পারি না। ... ও সব ফাঁকা কথা বুঝলে? অজ্ঞতা ঢাকবার পথ ওটা। লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার বুলি। আসলে ও কথার কোনো অর্থ হয় না। এমন অনেক রোগী আছে, যার বাঁচবার ভরসা ছিল না, আমাদের ওষুধ খেয়ে সে হয়তো বেঁচে যায়। যখন বেঁচে ওঠে তখন নাম হয় উপরওয়ালার। তাঁর গুণকীর্তন হয়। মসজিদে শিরনি দেওয়া হয়। হরিলুট দেওয়া হয় মন্দিরে। আমাদের নামও নেয় না মুখে। জালাল শেখের টাইফয়েড হয়েছিল ... দুই মাইল পথ হেঁটে রোজ সকালে বিকালে হাজিরা দিয়েছি, ওসুধ দিয়েছি। ... যখন বেঁচে গেল, তখন একদিন দেখাও করলে না এসে। আমাকে দিয়েছিল কত জানো? তিন টাকা। শুনেছি, আজমীরের দরগায় জালাল পাঁচ টাকা মানত পাঠিয়েছে। (পৃ. ৩০৬)

> ঙ. ডাক্তারের ব্যাগটা হাসু হাতে করে নেয়। ... ডাক্তার রোগী দেখে চিন্তিত মুখে বলেন,–ডবল নিমোনিয়া। এত দিন ছিলে কোথায়?... করিম বকশ বলে,–ফকিরে দেখছিল এতদিন। ..নাকের ওপর ঘা হয়েছে কেমন করে? ... দড়ি-পড়া দিছিল ফকির। ...ডাক্তার দাঁতে দাঁত চেপে বলেন,–ফকির! দড়ি পড়া! দেশের শাসন-ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে ব্যাটাদের ফক্করবাজি দেখিয়ে ছাড়তাম। ফাঁসি দিতাম ব্যাটাদের। এ নরহত্যা ছাড়া কিছু নয়। (পৃ. ৩১০)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কাদায় পায়ের পচে যাওয়া চামড়ার ব্যথা থেকে প্রতিকারার্থে তুতগোলা পানি হাঁসের পালক দিয়ে প্রলেপের ঘরোয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে জয়গুনের অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে। 'খ', 'গ', 'ঘ' প্রভৃতি উদ্ধৃতিতে গ্রামীণ লোকসমাজে চিকিৎসাপ্রণালি সম্পর্কে ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে আধুনিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তে দৈবনির্ভরতা ও কূপমণ্ডুকতা, রক্ষণশীল মানসিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ফকিরের হাতুড়ে

চিকিৎসাবৃত্তি সম্পর্কে রমেশ ডাক্তারের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় অনুধাবন করা যায়, কাসুর অসুস্থতা কীভাবে প্রলম্বিত হয়েছে।

৮. লোকযান-- এ উপন্যাসে লোকযান হিসেবে কোষা নৌকার পুনর্পুন উল্লেখ রয়েছে। যদিও এ উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট গ্রামের নামোল্লেখ নেই, তবু পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের বর্ণনা ও বিভিন্ন তথ্য থেকে ধারণা করা চলে, এটি এমন একটি গ্রাম, যেটি বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বলে বাসিন্দাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াতের জন্য নৌকার প্রয়োজন হয়। জয়গুনের এবং তার প্রাক্তন স্বামী করিম বক্শের কোষা নৌকা ব্যবহারের প্রসঙ্গ উপন্যাসের একাধিক দৃশ্যে লক্ষণীয়। জয়গুনের ছেলে হাসু মাকে রেলস্টেশনে পৌঁছে দিতে এটি নিয়মিত ব্যবহার করে। এরপর সেটি রেল-রাস্তার ধারে কচুরিপানায় ডুবিয়ে রাখে, যেন কেউ সেটি চুরি না করে। কখনো কখনো জাহাজঘাটের মোট বইতেও সে কোষা নৌকা নিয়ে নদীতে নামে। তারপর সেটি নোঙর করে গন্তব্যস্থলে যায়। সৎপিতা করিম বক্শের বাড়িতে গিয়ে সৎভাই কাসুকে দেখতে, বিভিন্ন উপহার দিতে হাসুর সম্বল এ নৌকা। কখনো কখনো তার মামী শফির মা এবং মামাতো ভাই শফি এ নৌকায় চড়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে, জয়গুন ও তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাদের প্রাত্যহিক জীবিকা নির্বাহে এটি অত্যাবশ্যকীয় অবলম্বন। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের করিম বকশও ছেলে কাসু ও সঙ্গীদের নিয়ে কোষা নৌকায় চড়ে ধানক্ষেতে মাছ ধরে। গ্রামবাসীদের প্রাত্যহিক দিনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোষা নৌকার প্রতি নির্ভরতা অনস্বীকার্য।

৯. লোকভাষা-- এ উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে লেখকের সচেতনতার পরিচয় বারবার পাওয়া যায়। বিশেষত, সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত বলেই, এ উপন্যাসে লেখকের বর্ণনা আধুনিক চলিত প্রমিত বাংলা গদ্যরীতির অনুসারী। সহজ, গতিশীল ও যথোপযুক্ত শব্দের প্রয়োগে তাঁর আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ। দীর্ঘ বাক্যের ঘনঘটা, সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের বাহুল্য প্রয়োগ, বক্তব্য উপস্থাপনে অকারণ গুরুগাম্ভীর্য আরোপ প্রভৃতি ত্রুটি থেকে এ উপন্যাস মুক্ত। অন্যদিকে, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব এ উপন্যাসের কুশীলবদের অনুসৃত লোকভাষায় লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তিনি স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভাষাবিন্যাসে যথাসম্ভব সচেতন। পরিস্থিতি ও বক্তব্য অনুযায়ী লোকভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্য এ উপন্যাসের শিল্পসাফল্যের অন্যতম পাথেয়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের পটভূমিতে গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজের বাসিন্দাদের অনুসৃত সংস্কৃতি, অভ্যাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় ভাবাবহের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সামষ্টিক লোকমানসের চেতনালোকের অনুকূল পরিচয় নির্দেশে এ লোকভাষার ব্যবহার বিকল্পহীন। এ উপন্যাসে প্রযুক্ত লোকভাষার অন্তর্গত শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা সম্পর্কে আলেকপাত করা হলো–

৯.১ শব্দভাণ্ডার

ক. দেশজ শব্দরাশি-- ভিরমি, উদর, ধনুক, ভিটে, ঝাড়, ঢিল, হাট, আড্ডা, হালট, টিকি, হাল, ঝাপটা, চর, ঝুলি, কলসি, খিলি, চুন, ঘাট, পিঁড়ে, থালা, পাত, পান্তা, প্যাট, মুঠো, ডিবা, পান, কোষা, চোঙা, খেপ, ঝুলি, চট, পাক, খাঁচা, তুষ, হাঁড়ি, লাকড়ি, বড়শী, পিঠালী, সাঁঝ, কেচ্ছা, ঝাঁপ, কাঁথা, চুলো, মুঠ, বাসন, ফেন, পাত, খেপ, ঝুলি, উম, ছ্যাড়া, কোষা, মোট, চুড়ি, জালি, চরকি, তিল, কদমা, বলদ, ডেলা, লগি, খোটচ, পোঝা, পাড়ি, বেবাক, বাহন, লাইগ্যা, ঘাট, প্যাট, জালি, লগে প্রভৃতি।

খ. ক্রিয়া-- খসে, ঠেকানো, বিছিয়ে, ফুটে, মেখে, মাজা, ঘেঁটে, সেঁচে, ফুডাইমু, বেচতাম, কুটে, মেপে, যাওন, ছাইড়্যা, নিবিয়ে, বাছাই, দ্যাখ, মাজা, ঘেঁটে, খাড়া, ফালাইমু, আইছি, কোটে, খাইমু, কইলা, ধইর্যা, লইয়া, কইর্যা, যাওন, লেপে, লইয়্যা, ভানে, কোটে, লেপে, এগোয়, বিলিয়ে, কান্দে, কাটস, দেইক্যা, হুইন্যা, বেইচ্যা প্রভৃতি।

গ. বিশেষণ-- গড়াগড়ি, নেতিয়ে, কাড়াকাড়ি, ঠমক. ধুকধুকে, হুঁচোট, বিরান, জড়াজড়ি, কোনাকুনি, তরতাজা, বিকিয়ে, নওল, পোড়া, উপুর, মাজাঘসা, ডাঙর-ডোঙর, নিবিয়ে, ছেঁচে, ফকফকে, উমে, প্যাচপেচে, তেড়ে, লাফ, কিড়মিড়, রাঙ্গা, বেইচ্যা, পাকামি প্রভৃতি।

ঘ. আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি-- লেগে>লাইগ্যা, দীঘল>দীগল, দেখ>দ্যাখ, হয়>অয়, ভালো>ভালা, প্রধান? পরধাইন্যা, মাড়ি>মাটি, ভদ্র>ভর্দ, দেহাও>দেখাও, তোমাদের>তোমাগো, গ্রাম>গেরাম, সমান>হমান, থেকে>তনে, দেখা>দেহা, কীভাবে>ক্যামনে, সেইদিনের>হেইদিনের, নদী>গাঙ, চোখ>চউখ, বুজে>বুইজ্যা, ভয়>ডর, চার>চাইর, রেখে>রাইখ্যা, মধ্যে>মইদ্যে, অসুখ>ব্যারাম, মানুষ>মানু, শোনো>হোনো, বছর>বচ্ছর, হবে>অইব, এসে> আইয়া, স্বপ্নেও>হপনেও, দেখা>দ্যাহা, মরে>মইর্‍্যা, জাত>জাইত, করেও>কইর‍্যাও, হাত>আত, মরে>মইর্‍্যা, মোলায়েম>মুলাম প্রভৃতি।

৯.২ বাগধারা--

হাসুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। (পৃ. ২৩৮)

জয়গুন কোনো দিন কাসুকে ফুসইল দেয়নি, আর দিবে না (পৃ. ২৭৯)

মাঠের কাদা যতই শুকিয়ে আসতে থাকে, কাসুর মনও ততই উড়ু-উড়ু করতে থাকে। (পৃ. ২৮২)

কাসু পেছন দিকে তাকিয়ে 'থ' হয়ে যায়। (পৃ. ২৮৪)

আরো কত দ্যাখ্‌বা মিয়া, মাত্র বিছমিল্লা। (পৃ. ২৮৭)

বুড়ীরে দ্যাখলে ভালা মানুষ বুইল্যা মনে হয়। কতাও কয় যেন মিছরির শরবত। (পৃ. ২৯২)

মায়মুন শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছে। জয়গুন রাগে ফেটে পড়ে। কঠিন স্বরে জেরা করতে আরম্ভ করে,- না কইয়া পলাইয়া আ'লি ক্যাঁ? এহন মাইনষে হুনলে ঝাঁটা মারব মোখে। (পৃ. ৩০০)

তুমি কি চউখের মাথা খাইয়া বউ দেখছিলা? (পৃ. ৩০০)

তুমি বুড়া অইছ বাতাসে। তোমার কথায় মাড়ি খাইছি আমি। (পৃ. ৩০৩)

সোনার চান মানিক্‌রে এইখানে আন্‌লে যদি এট্টু উনিশ বিশ অয়, তয় বদনাম অইব তোর। (পৃ. ৩১৩)

আবু ইসহাকের লোকসংস্কৃতিপ্রীতি ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি মমত্ববোধের প্রাতিস্বিক স্ফুরণ এ উপন্যাসের আদ্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের পটভূমিতে পূর্ব-পাকিস্তানের খেটে খাওয়া গ্রামীণ লোকজীবনের অকৃত্রিম চালচিত্র হিসেবে এ উপন্যাসের কালজয়ী আবেদন অনস্বীকার্য। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা, শৈল্পিক সৃজনশীলতা আর লোকমানুষের চেতনালোকের বিশিষ্ট রূপকে ভাষ্যদানের বিরল আগ্রহ তাঁর লেখনিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। লোকজজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি লেখকের আন্তরিকতার অনুভব এ উপন্যাসের শিল্পসাফল্যের অন্যতম পাথেয়।

cÙvi cwjØxc

পদ্মাবিধৌত চরাঞ্চলের লোকমানুষের অস্তিত্বসংগ্রাম ও প্রাত্যহিক জীবনের চালচিত্র উপস্থাপনে আবু ইসহাকের (১৯২৬-১৯৯৭) cÙvi cwjØxc[৬৫] (১৯৮৬) কালজয়ী মর্যাদায় অভিষিক্ত। বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের কালিক পটভূমিতে বিস্তৃত এ উপন্যাসে[৬৬] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিঘাত গ্রামীণ জীবনকে কীভাবে বিধ্বস্ত করে তুলছে, সেই প্রসঙ্গও সংক্ষিপ্ত ভাষ্যরূপ পেয়েছে। বিক্রমপুর-মুন্সিগঞ্জের বাসিন্দাদের পদ্মার বুকে জেগে ওঠা বিভিন্ন চরের মালিকানাকে নিজেদের আয়ত্তে রাখার ইতিবৃত্তকে ঘিরে উপন্যাসটি আবর্তিত। এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবিকা, আশ্রয়, দিনযাপনের রূপরেখা নির্ধারণে এ নদীর ভূমিকা রহস্যময়, খামখেয়ালী, আবার কখনো পরম আপনজনসুলভ। দিনের পর দিন উর্বর পলি জমে গড়ে ওঠা চরে খেটে খাওয়া মানুষ ভিটেবাড়ি গড়ে তুলে পরিজনকে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, মাটিতে ফসল ফলায়, নদী থেকে মাছ আহরণ করে। কিন্তু প্রকৃতির ক্রূরতায় তাদের স্বচ্ছন্দ, নিশ্চিন্ত দিনযাপনে আকস্মিকভাবেই ছন্দপতন ঘটে পদ্মার আগ্রাসী, ধ্বংসাত্মক তৎপরতায়। প্রবল স্রোতের তোড়ে কীর্তিনাশা পদ্মা গ্রাস করে চরাঞ্চলের লোকালয়, তছনচ করে আবাদী জমি, ক্ষেতের ফসল, ভাসিয়ে নেয় বসতি ও গবাদিপশু, এরপর বিলীন হয়ে যায় নিজের অতল গর্ভে। তবে এ উপন্যাসে পদ্মার ভাঙা-গড়াই শুধু উপজীব্য হয়নি। এর সমান্তরালে লেখকের শিল্পীমানসে সবিশেষ অভিনিবেশ পেয়েছে পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চর লটাবনিয়া বা খুনের চর দখলকে কেন্দ্র করে এরফান মাতবর ও তার ছেলে ফজলের দলের সঙ্গে প্রতিপক্ষ জঙ্গুরুল্লা ও তার দলের লোকজনের বিবাদ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত। এরই সূত্র ধরে চরাঞ্চলের লোকমানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও চিন্তাচেতনাগত স্বাতন্ত্র্য এ উপন্যাসে ভাষ্যরূপ পেয়েছে। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান যথা লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, লোকপ্রযুক্তি, লোকখাদ্য, লোকক্রীড়া[৬৭] লোকশিল্প[৬৮] লোকভাষা[৬৯] প্রভৃতি এ উপন্যাসে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

১. লোকসংস্কার–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কারের প্রভাব রূপায়িত। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নির্ধারিত পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণের প্রসঙ্গ। মুসলমান সমাজে কৃষিকাজ যতটা সম্মানজনক, মাছ ধরা সেই তুলনায় নিন্দনীয়। সেকারণেই উপন্যাসের ‘এক’

পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সাংসারিক অনটন চরমে ওঠায় এর প্রতিকারের জন্য এরফান মাতবরের ছেলে ফজল অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে মাছ ধরে এবং বিক্রি করে। কেননা, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজন একথা জানতে পারলে সামাজিকভাবে তাকে এবং তার পরিবারকে হেয় হতে হবে। এমনকি 'দুষ্ট লোকের মুখে মুখে হয়তো একদিন মালো বা নিকারি খেতাব চালু হয়ে যাবে' (পৃ. ১৬)। তার বা-মা প্রথমদিকে এ নিয়ে আপত্তি তুললেও আর্থিক সংকট মেটানোর তাগিদে তারা ধীরে ধীরে এর প্রতি সমর্থন জানায়। লক্ষ্মীর চরের আবাস তুলে নিজেদের মালিকানাধীন লটবুনিয়া বা খুনের চরে বসতি গড়ার সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য অর্থের অভাবে ফজল চরের জমি নিতে আগ্রহী মজুরদের পরামর্শ দিয়েছিল মাছ ধরে বিক্রির টাকা জোগাড় করতে। কিন্তু এতে প্রথমদিকে তারা আপত্তি জানিয়ে বলেছিল 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোবা তোবা তোবা! মাইনষে হোনলে কইব কি?' ... জাউল্যা কইব। ছাই দিব মোখে।' (পৃ. ৪০) এমনকি ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়েও গ্রামবাসীর নিন্দার পাত্র হবে বলে তারা এ প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু ফজল তাদের বোঝাতে সমর্থ হয়, 'কামলা খাইলে যদি জাত না যায়, ধান-পাট বেচলে যদি জাত না যায়, তবে মাছ বেচলে জাত যাইব ক্যান?' (পৃ. ৪০)। এরফান মাতবরকেও তারা এ কাজে রাজি করাতে সমর্থ হয় এবং এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে পেশা সংক্রান্ত এ সম্পর্কিত সংস্কারের প্রতি তাদের মনোভাব বদলায়। তারা অবশ্য রাতের অন্ধকারে গোপনে মাছ ধরা ও বিক্রির কাজটি করলেও একসময় তা জানাজানি হলে ইরফান মাতবরের পরিবারকে এজন্য অন্যদের হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষত, তার বেয়াই আরশাদ মোল্লা ফজলের স্ত্রী ও নিজের মেয়ে রূপজানকে স্বামীর সংসারে পাঠাতে যে দুটি কারণে আপত্তি জানিয়েছিল, এর প্রথমটি ছিল ফজলের গোপনে মাছ ধরে বিক্রির বন্দোবস্ত। 'পঁচিশ' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, খুনের চরে যারা জমি কিনেছিল, তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ফজল সকলকেই ঐ প্রস্তাব দিয়েছিল। জাবেদ লশকর এর বিরোধিতা করলে সে পাল্টা যুক্তি পেশ করে, 'পা-না ধোয়ার (জঙ্গুরুল্লা) কোলশরিকরা মাছ বেচে নাই? ওরাও তো বেড়ের মাছ বেইচ্যা সংসার চালাইছে। জঙ্গুরুল্লাও তো ঐ টাকার ভাগ নিছে। জাইত যাওনের ভয় খালি আপনাগ!' (পৃ. ১৭০)। এভাবেই সামাজিক সংস্কারকে এড়িয়ে ফজল গ্রামবাসীর নিকট নতুন ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। ধর্মীয় লোকসংস্কারের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনাচরণে স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সংকট থেকে মুক্তিলাভের জন্য পীরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসবশত তাকে সমীহ, সন্তুষ্ট করার প্রবণতা এ উপন্যাসের কুশীলবদের মনস্তত্ত্বে লক্ষণীয়। যেমন, নতুন চরে নৌকায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যাত্রাকালে এরফান মাতবর নৌকায় উঠেই মাঝিদের তাড়া দেয় দ্রুত বৈঠা চালানোর জন্য। এরপর সে 'আল্লাহ'র নাম নিয়ে রওনা হবার আহ্বান জানায়। এর জবাবে মেহের মুনশী যখন চারদিকে সজোরে কলেমা পড়ে হাঁক দেয়, 'আল্লা-রসুল বলো ভাইরে ম-মী-ী-ী-ন'... (পৃ. ৩০)। নৌযাত্রার অন্য সঙ্গীরাও এর সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়। এরফান মাতবর নতুন চরে পৌঁছার পর চরের জমি কিনতে আগ্রহী বাসিন্দাদের নির্দেশ দেয় 'যার যার জাগায় ডিঙ্গা লইয়া চইল্যা যাও। আমরা 'আল্লাহু আকবর' কইলে তোমরা ঐলগে আওয়াজ দিও। এই রহম তিনবার আওয়াজ দেওনের পর 'বিছমিল্লা' বুইল্যা বাঁশগাড়ি করবা' (পৃ. ৩১)। আসরের নামাজ আদায়ের পর সে ছেলে ফজলকে পূর্বের মত একই নির্দেশ দেয়। অন্যরা তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলানোর পর তারা পদ্মার বুকে পুনরায় জেগে ওঠা লটাবনিয়া চরের চারদিকে নিজেদের মালিকানার চিহ্নসূচক অনেকগুলো বাঁশ পুঁতে দেয়।

পীরের দেয়া তাবিজের প্রতি ভক্তি লোকসমাজের পরিচিত সংস্কার। 'তিন' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, ফজল তার দশবছর বয়সী ভাইপো নূরুকে শ্বশুরবাড়িতে মাছ দিয়ে পাঠালে ফেরার পথে চাচী রূপজান কাগজের মোড়কে জড়ানো একটি তাবিজ তার হাতে দেয়। সে তাকে জানায়, এতে পীরসাহেবের দোয়াপড়া একটি তাবিজ রয়েছে, যেটি ফজল কোমরে সুতাসহ পরিধান করলে তার কোনো বিপদ ঘটবে না। এটি পবিত্র বলেই নাকি অজু করে মোড়কটি খুলতে হবে। নতুবা যে এটি ধরবে, তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। 'পনের' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, ক্ষমতাধর জোতদার জঙ্গুরুল্লার পীরের প্রতি ভক্তি অশেষ। এর অন্তরালে তার ব্যবসায়িক স্বার্থও জড়িত। তাই তার পীর মৌলানা তানবীর হাসান ফুলপুরী বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মুরিদদেও বাড়িতে তসরিফ রাখতে এলে সে আরশেদ

মোল্লাকে প্ররোচিত করে পীরের সঙ্গে তার মেয়ে রূপজানের বিয়ে দিতে। আরশেদ মোল্লার ধারণা, 'পীর-দরবেশরা তো আল্লার নিজের আতের তৈয়ারি। উনাগ চেহারাই আলাদা।' (পৃ. ১০০) তাছাড়া নতুন চরে বিপুল পরিমাণ জমি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জঙ্গুরুল্লা আরশেদ মোল্লাকে রাজি করায় পীরের সঙ্গে রূপজানের বিয়ে দিতে। কিন্তু রূপজান কোনোমতেই স্বামী ফজলকে তালাক দিতে এবং বুড়ো পীরকে বিয়েতে সম্মত না হলে তাকে বশীকরণের জন্য জঙ্গুরুল্লা আরশেদ আলীকে প্রলুব্ধ করে, 'পীরবাবা আল্লার পিয়ারা দোস্ত। তার লগে মাইয়া বিয়া দিলে গুষ্টিশুদ্ধ বেহেশতে যাইতে পারবা।' (পৃ. ১৩৯) জঙ্গুরুল্লা রূপজানকে বশীকরণের জন্য আরশেদ মোল্লার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে। সোয়াসের জিলাপি ও এক শিশি সুবাসিত তেল (রওগনে আম্বর) দরদাম না করে বরং দোকানির দাবিকৃত অর্থে কিনে সে সেগুলো নিয়ে পরদিন পীরের নিকট হাজির হয়। পীর সেগুলোতে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে জঙ্গুরুল্লা তাকে জানায়, এই জিলাপি খাইয়ে রূপজানের মাথায় প্রতিদিন তেল দিলে সে অচিরেই নাকি পীরের প্রতি আসক্ত হবে। সে আরো জানায়, পীরসাহেব যেহেতু রূপজানের নামে মন্ত্র পড়েছে, তাই অন্য কেউ এ জিলাপি খেলে তার ওপর বশীকরণের প্রভাব পড়বে না। যেহেতু জিলাপিতে কুফরি কালাম বা 'জাদু-টোনার মন্তর-তন্তর' রয়েছে, তাই স্রষ্টার নাম নিয়ে তা পাঠ করা নিষেধ; 'বিসমিল্লাহ কইয়া মোখে দিলে বেবাক বিষ পানি অইয়া যায়' (পৃ. ১৪০)। এভাবে জঙ্গুরুল্লা আরশেদ মোল্লাকে সমগ্র বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়। সে আরো জানায়,

> জিলাফি খাওনের তিনদিন পর যখন জিলাপির মন্তর গিয়া ঢুকব শরীলের মইদ্যে তখন মাইয়ারে টোনার কথা জানাইতে অইব। তোমার বিবিরে তালিম দিয়া দিও। এমুন কইর‍্যা কইতে অইব, পীরবাবা তোরে টোনা করছে, রাইতে খোয়াবে পীরবাবার কাছে চইল্যা যাবি। তুই ঘুমাইলে তোর রুহু চইল্যা যাইব পীরবাবার কাছে। এই কথাগুলা দিনে তিনবার–ফজর, জহুর আর এশার নামাজের পর কওন লাগব।' (পৃ. ১৪০)

কিন্তু পীরের নির্দেশমত সব কাজ সম্পন্ন করা সত্ত্বেও রূপজানের মনে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অন্যদিকে, পীরের সঙ্গে রূপজানের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে জঙ্গুরুল্লার অতি উৎসাহের মূলেও রয়েছে এ সংক্রান্ত লোকসংস্কার। তার ধারণা, পীরকে যদি কোনোভাবে লটাবনিয়া চরে স্থায়ীভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করানো যায়, তবে নাকি সেই চর পুনরায় পদ্মার গর্ভে বিলীন হবে না। এমনকি, চরে বসবাসরত অবস্থায় পীরের মৃত্যু ঘটলে তার কবরকে মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও জঙ্গুরুল্লা করে। একদিকে আর্থিক প্রলোভন, অন্যদিকে চরের স্থায়িত্ব-- এ দুই ভাবনা এক্ষেত্রে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তার আরো ধারণা "পীরবাবা যখন ইন্তিকাল করবেন তখন ওনারে কবর দিমু আমাগ চরে। তারপর আল্লায় মকসুদ পুরা করলে কবরডারে পোস্তা কইর‍্যা দিমু। তখন আল্লাহই হেফাজত করব তার পিয়ারা দোস্তের কবর। এর পর গাঙ ক্যান্‌, গাঙ্গের বাপেরও 'পাওর' থাকব না এই চর ভাঙনের।" (পৃ. ১৪২)

এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে বহুল পরিচিত লোকসংস্কার হিসেবে জ্বিনের প্রতি বিশ্বাস ও ভীতিবোধের পরিচয়ও রয়েছে। পীরসাহেব অনেক জ্বিনকে শক্তি, দাপট খাটিয়ে বশীভূত করে রেখেছে, যে কোনো প্রয়োজনে জ্বিন চালান দেয়; এমনকি রূপজানকে বিয়েতে রাজি করানোর জন্যও জ্বিনকে ব্যবহার করা হবে বলে জঙ্গুরুল্লা আরশাদ মোল্লাকে জানায়। বগাদিয়া গ্রামের কোরবান আলীর পুত্রবধূ সবুরনের অপহৃত হওয়ার ঘটনায় লোকমানসে জ্বিন সম্পর্কিত ধারণার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোরবেলা নদীতে গোসল করতে গিয়ে সে গোরা সৈন্যদের কবলে পড়ে। এর পরদিন ফজল ফেরারী অবস্থায় গ্রামে ফিরে আসার পথে ঝোপের আড়ালে থেকে দেখে, দুজন সৈন্য সবুরনকে নদীর কোমরপানিতে ফেলে চলে গেলে সে তীরে গিয়ে বসে। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তার আচরণে দেখা যায় বিকারগ্রস্ততা। কারো সঙ্গে কথা না বলা, ঘোরের আবেশে মত্ত থাকা, স্বাভাবিক আচরণ ও কাজকর্ম না করা প্রভৃতি ঘটনা থেকে তার পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তাকে জ্বিন ধরেছে। সেকারণেই তাকে জ্বিন-পরীর দেশ কোহকাফে নিয়ে গিয়েছিল। কেননা তার পরনের শাড়িতে নাকি 'মন-মাতানো খোশবু।' 'সে নাকি জিন-পরীর দেশ †K¨nK¨d-এর খোশবু নহরে ডুব দিয়ে এসেছে।' (পৃ. ১৩৮)

২. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী চরাঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে প্রবাদ, ছড়া, লোকসঙ্গীত, রূপকথার অনুষঙ্গ, কিংবদন্তি প্রভৃতি।

২.১ প্রবাদ

চরের বাড়ি মাটির হাড়ি, আয়ু তার দিন চারি। (পৃ. ১৬)

পয়লা মুখের কথা, কাজ না হলে লাঠির গুতা। (পৃ. ২৬)

মা মরলে বাপ অয় তালুই। (পৃ. ৩২)

লাঠি যার মাডি তার। (পৃ. ৩৭)

যত কাড়ি সুতা, সব নেয় বামনের পৈতা। (পৃ. ৪৪)

পচা শামুকেও পা কাটে। (পৃ. ৫০)

পাপ খাতির করে না পাপের বাপকেও। (পৃ. ৬৬)

পাজির লগে পাইজ্যামি না করলে দুইন্যায় বাঁইচ্যা থাকন যায় না। (পৃ. ৭১)

বাপ বয়সে ঘোড়া না, লেজেতে লাগাম (পৃ. ৭৪)

মাইনষে কইতেই কয়, বাঙ্গালের মাইর, দুনিয়ার বাইর। (পৃ. ৭৭)

মাইনষে কয় না, উপকাইর‌্যারে বাঘে খায়। (পৃ. ৮১)

ধান বোনে হাইল্যা, প্যাট ভরে বাইল্যা। (পৃ. ৮৩)

মাইনষে কয় কথা মিছা না-শুইয়া রুই, বইস্যা কই, ক্যাদা ঘাইট্যা ভ্যাদা। (পৃ. ৮৬)

লাথির ঢেঁকি আগুনের টোকায় ওড়্ব না। (পৃ. ৯৪)

বউ আনো ঘর দেখে,

মেয়ে দাও বর দেখে। (পৃ. ১০০)

জানো না, বিষ দিয়া বিষ মারতে হয়? কাডা দিয়া কাডা খুলতে অয়? (পৃ. ১৭২)

মাইনষে কইতেই কয়-সাচ্চা গুড় আন্ধার রাইতেও মিডা। (পৃ. ১৭২)

গুলি খাওয়া বাঘ খাঁচায় ঢুকাতে না পারলেস্বস্তি নেই। (পৃ. ১৭৭)

২.২ ছড়া-- এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে চরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে জনপ্রিয় খেলা কাবাডির বিবরণ রয়েছে। এ খেলায় ব্যবহৃত ছড়াটি হলো-

হেঁই কপাটি তুলা ধোন,

মশা করে ভোন্ ভোন্

মাছির কপালে ফোঁটা,

মইষ মারি গোটা গোটা।' (পৃ. ৪৬)

হেঁই কপাটি কয় বাড়ি?'

গাবু খাইছ কয় বাড়ি?' (পৃ. ৫০)

২.৩ লোকসঙ্গীত–– এ উপন্যাসে মোট তেরটি লোকসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিয়ের গান, পিঠা বানানোর গান, ভাটিয়ালি গান, দেশাত্মবোধক গান প্রভৃতি। এসব গানে ফুটে উঠেছে নরনারীর প্রেমভাবনা, বিরহকাতরতা, স্রষ্টা বা দয়ালের সঙ্গে মিলিত হবার আকুতি, চরাঞ্চলের নির্মম জীবনবাস্তবতা, গার্হস্থ্য দিনযাপন ও উৎসবের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। গ্রামীণ চরাঞ্চলের জীবনবাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে পাঞ্জু শাহের রচিত এবং দোতারা বাজিয়ে স্বকণ্ঠে পরিবেশিত গানে––

লাঠির জোরে মাটিরে ভাই
    লাঠির জোরে মাটি,
লাঠালাঠি কাটাকাটি,
    আদালতে হাঁটাহাঁটি,
এই না হলে চরের মাটি
    হয় কবে খাঁটি...রে। (পৃ. ২৪)

ফজলের সঙ্গে জরিনার বিয়ে উপলক্ষে পালকি বাহকেরা যে গান গেয়েছিল–

আল্লা–হা ব-লো
জোরে–হে চ-লো,
বিয়া খাইয়া বল অইছে
জোরে–হে চ-লো,
ইনাম মিলব দশ টাকা
হুঁশে– হে চ-লো,
সামনে আছে কলই খেত
কোনা-হা কা-টো।
পায়ের তলে মান্দার কাঁটা
দেইখ্যা হাঁ- টো। (পৃ. ৬১)

পিঠা বানানোর সময় পরিবেশিত গানের উল্লেখ রয়েছে 'একুশ' পরিচ্ছেদে, যেখানে ফজলের ছোটবোন আমিনার কণ্ঠে এটি পরিবেশিত––

তাল গোলাগোল যেমুন তেমুন,

আঁইট্যা দআখলে ভয় করে,

তার চুল-দাড়িরে ভয় করে,

অ ভাইজান, আমি তাল খাইনা-ডরে।' ...

তাল গোলাগোল যেমুন তেমুন,

আঁইট্যা দ্যাখলে ভয় করে,

তার চুল-দাড়িরে ভয় করে,

অ বু'জান, আমি তাল খাইনা ডরে গো,

তাল খাইনা ডরে।

তালের আঁইট্যায় চুল-দাঁড়ি

খামচা দ্যাও আর দ্যাও বাড়ি

ডলা দিয়া বাইর করগো রস

অ বউ, বেতাইল্লারে এমন করো বশ গো,

এমনে করো বশ। ...

তালের গোলা বেতাল করে,

জ্বাল দিলে যে উতরে পড়ে,

অ বু'জান, হইল কি কারবার গো,

হইল কি কারবার।

তাল পড়লে উতরাইয়া,

পড়িস না গো চিত্‌তরাইয়া,

অ বউ, নিভু জ্বালে তালে তালে

নাড়া দে বারবার গো,

নাড়া দে বারবার। (পৃ. ১৫০)

জরিনার প্রতি ফজলের প্রেমভাবনার রূপায়ণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে দো-মাল্লাই নৌকায় বাজতে থাকা ভাটিয়ালি গান–

ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে,

কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে,

দেখা যায় যে ঘরখানি

সেথায় বধূ থাকে গো,

সেথায় বধূ থাকে।' (পৃ. ১৬২)

২.৪ রূপকথার অনুষঙ্গ

ফজলু রূপকথার বইয়ে পড়েছিল–রাজপুত্র আর রাজকন্যার পেছনে ধাওয়া করছে এক দৈত্য। তার গতিরোধ করার জন্য রাজকন্যা ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার মাথার চিরুনি। সেই চিরুনি থেকে সৃষ্টি হয় কাঁটার এক দুর্ভেদ্য জঙ্গল। (পৃ. ৬৬)

মাতব্বর পুরানো ঘাগু। সে জানে, এ সব কিছু নয়। চাকরিয়াদেও চাকরি বজায় রাখার ফন্দি আর কি। কিন্তু জেনেও সে বলে না এ কথা কাউকে। বললে শেষে হয়তো যেদিন সত্যি সত্যি বাঘ আসবে সেদিন রাখালকে বাঁচাবার জন্য আর এগিয়ে আসবে না কেউ। (পৃ. ৭৮)

সুযোগ নয়, সে এক মহাসুযোগ। এ যেন রূপকথার মোহরভরা কলসি। (পৃ. ১৯৯)

২.৫ কিংবদন্তি-- এ উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিসর এবং স্থানিক প্রেক্ষাপটে পদ্মা নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেকারণেই এর চরসংলগ্ন বাসিন্দাদের মধ্যে এ নদী সম্পর্কিত কিংবদন্তি প্রচলিত–

ডানদিকে দূরে ধূ ধূ দেখা যায় সেই খুনের চর। ... আগে এখানে নদী ছিল না। এখানে ছিল একটা খাল। লোকে বলতো ওটাকে রথখোলার খাল। চাঁদরায়-কেদার রায়দের রথটানা হতো ওখান দিয়ে। আগের দিনে পদ্মা ফরিদপুরের মাঝ দিয়ে বরিশালের কন্দর্পপুরের কাছে মেঘনায় মিশেছিল। এখন যেটা আড়িয়াল খাঁ সেটাই ছিল তখন আসল পদ্মা। ...আগে বাঙলার মাটিতে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা ছিল এক সাথে। ব্রহ্মপুত্র গতি বদলে পশ্চিম দিকে গিয়ে যমুনার সাথে মিশে। এই দুটি নদীর স্রোত গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলে যায়। তার পরেই রথখোলার খাল ভাঙতে ভাঙতে নদী হয়ে যায়। চাঁদ রায় কেদার রায়ের কীর্তি, রাজ রাজবল্লভের কীর্তি ধ্বংস করে। তাই পদ্মার আর এক নাম কীর্তিনাশা। (পৃ. ১১২-১১৩)

৩. লোকপ্রযুক্তি-- এ উপন্যাসে লোকসমাজে প্রাত্যহিক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোকে লোকপ্রযুক্তি হিসেবে অভিহিত করা চলে। গ্রামীণ লোকসমাজের বাসিন্দারা মূলত পূর্বপুরুষের পেশাকে ঐতিহ্যগতভাবেই গ্রহণ করে। সেকারণে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত এসব কৌশলকে আয়ত্ত করার প্রয়োজন তাদের জীবিকা অবলম্বনের সহায়ক। আবার, কখনো কখনো নিছক আগ্রহবশতই তারা বুদ্ধি খাটিয়ে নিজে থেকে কিছু উদ্ভাবন করে, যার মাধ্যমে কোনো প্রয়োজন মেটে। 'এক' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মাছ ধরার জন্য জেলেরা যে ঝাঁকি জাল ব্যবহার করে, ফজল এ সম্পর্কে সচেতন। মাছ ধরা তার নেশা হলেও একপর্যায়ে আর্থিক অনটনের কবল থেকে রেহাই পেতে সে একে পেশা হিসেবে গ্রহণে বাধ্য হয়। ঝাঁকি জাল কীভাবে তৈরি করা হয়, এ সম্পর্কিত বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটি কড়া পাক দেয়া সরু সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়। পানিতে ভিজে সুতা যেন পচে না যায়, সেজন্য এতে গাবের কষ লাগানো হয়। জালের নিচের দিকের সম্পূর্ণ ঘের জুড়ে রয়েছে 'ঘাইল' বা মাছ ঘায়েল করার ফাঁদ। এটি বানাতে ব্যবহৃত হয় লোহার কিছু কাঠি, যেগুলো ঘেরের সঙ্গে যুক্ত। কাঠিগুলো ওজনে ভারী বলেই জেলেদের পক্ষে এটিকে সজোরে ছুঁড়ে মারা সম্ভব হয়। কোনো মাছ জালে ধরা পড়লে 'ঘাইল' এর চাপের কারণে সেটি জাল ভেদ করে বের হতে পারে না।

চরে বসতি স্থাপনের জন্য বাসিন্দারা প্রথম পর্যায়ে অস্থায়ীভাবে যে ঘর গড়ে তোলে, এর নাম 'ভাওর ঘর'। যেহেতু জোয়ারের প্রবল স্রোতে চর পানিতে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাই তারা মাটি থেকে আধ থেকে এক বিঘত উঁচু করে এ ঘর বানায়। এর মূল অবলম্বন বা ভিত তৈরি হয় বাঁশের খুঁটির আশ্রয়ে। তাছাড়া কাশ (কাশফুল) ও চুইন্যা ঘাস এ ঘর তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এগুলোর গোড়া দিয়ে ঘরের বেড়া এবং আগা দিয়ে ঘরের ছাউনি বানানো হয়। ভাওর ঘরগুলোকে ঝুপড়িও বলা চলে। 'পানির সমতলের হাতখানেক ওপরে বাঁশের মাচান বেঁধে দেয়া হয়। যারা মাচান বাঁধতে পারেনি, তারা অন্য চর থেকে নৌকা বোঝাই করে নিয়ে এসেছে লটাঘাস। পানির

মধ্যে সে ঘাসের স্তূপ সাজিয়ে উঁচু করে নিয়েছে। এরই ওপর হয়েছে শোয়া-থাকার ব্যবস্থা। শরীরের ভারে পিষ্ট হয়ে ঘাস যখন দেবে যায় তখন পানি উঁকি দেয়। তাই কয়েকদিন পর পরেই আরো ঘাস বিছিয়ে উঁচু করে নিতে হয়।' (পৃ. ৩৮) 'সতের' পরিচ্ছেদে মাছ ধরার আরেক ধরনের ফাঁদের বিবরণ রয়েছে, যার স্থানীয় নাম 'ভ্যাশাল'। ফজল পদ্মা নদীতে নৌকা চালিয়ে যাওয়ার সময় দেখে, এর বামদিকের সোঁতা বা নদীর প্রবহমান অথচ অগভীর একটি শাখায় জনৈক জেলে 'ভ্যাশাল' পেতেছে। এক্ষেত্রে বাঁশের খুঁটি পুঁতে এর সঙ্গে আড়াআড়ি লম্বালম্বি কোনাকুনিভাবে বাঁশ বেঁধে প্রথমে সাঁকো তৈরি করা হয়। এরপর এর সঙ্গে জাল জুড়ে দেয়া হয়। সাঁকোর সাথে ঠেকিয়ে সেটির এক কোণে শরীরের ভার চাপিয়ে চাপ দিলে পানি থেকে মাছ নিয়ে জাল ওপরে উঠে আসে। ফজলের বর্ণনায় কুমির ধরার ফাঁদ তৈরি ও একে শিকারের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন রয়েছে–

> যেইহান দিয়া কুমির রউদ পোয়াইতে ওপরে উডে, সেইখানে তিস কাঁটাওলা বড় বড় অনেকগুলা গ্যারাফি বড়শি শন সুতার মোট্টা দড়িতে বাইন্দা লাইন কইর‍্যা পাততে অয়। দড়িগুলারে মাটির তল দিয়া দূরে উপরের দিগে নিয়া শক্ত খুঁড়ার লগে বাইন্দা রাখতে অয়। তারপর যখন কুমির রউদ পোয়াইতে চরের উপরে ওডে, তখন উলটাদিক তন দাবড় দিলে কুমির হড়হড় কইর‍্যা বড়শির উপর দিয়া দৌড় মারে পানির দিগে। ব্যস কুমিরের ঠ্যাঙ্গে, প্যাডে বড়শি গাঁইথ্যা যায়। আমি কুট্টিকালে দেখছি, বা'জান একবার ফান্দা পাতছিল। একটা বড় আর একটা বাচ্চা কুমির বড়শিতে গাঁথছিল। বড়ডার ঠ্যাংগে আর ছোডডার প্যাডে। (পৃ. ১৮৮)

৪. লোকখাদ্য–– এ উপন্যাসে চরাঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক আহার হিসেবে বিভিন্ন খাদ্যের উল্লেখ রয়েছে–

> ভোরের নাশতা চিড়ে-মুড়ি নিয়ে এতক্ষণে বসে গেছে সব বাড়ির ছেলে-মেয়েরা। (পৃ. ১৫)

> বেহানে গিয়া খাইছি কাউনের জাউ আর আন্তেশা পিডা। দুফরে পাঙাশ মাছ ভাজা, পাঙাশ মাছের সালুন, ডাইল। হেষে দুধ আর ক্যালা। (পৃ. ২৭)

> সবাই ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে ভাওর ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা করেছে। আলগা চুলোয় একবেলা রেঁধে তারা দুবেলঅ খায়। নিতান্ত সাদাসিধে খাওয়া। কোনো দিন জাউ আর পোড়া মরিচ, কোনো দিন ভাত আর জালে বা বড়শিতে ধরা মাছভাজা। আর বেশির ভাগ সময়েই ডালে-চালে খিচুড়ি। (পৃ. ৩৮)

> মোল্লাবাড়ির একমাত্র জামাই ফজল। শ্বশুরবাড়ির আদর-আপ্যায়নের মাত্রাটা তাই একটু বেশিই জুটত তার ভাগ্যে। তার আগমনে উৎসব শুরু হয়ে যেত মোল্লাবাড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠত–মুরগি জবাই করোরে, গুঁড়ি কোটরে, পিঠা বানাওরে! সে যে কত পদের পিঠা। কখনো বানাত পাটিসাপটা, বুলবুলি, ভাপা, কখনো বানাত ধুপি, চন্দ্রপুলি, চিতই, কখনো বা পাকোয়ান, শিরবিরন, বিবিখানা। চালের গুঁড়ি কুটে পিঠা বানাতে বানাতে রাতদুপুর হয়ে যেত। (পৃ. ৫৩)

> গাবুর একাব্বর খবরের সাথে নিয়ে আসে তিনটে ধামা ভরে খই আর সের কয়েক বাতাসা। (পৃ. ৭৮)

> গরম গরম খিচুড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভাজা ইলিশ মাছের খিদে-চিতানো গন্ধ এসে লাগছে নাকে। (পৃ. ১১৬)

> নতুন বইন পাইছি একজন। পথে খাওনের লেইগ্যা মুড়ি, নারকেলের লাড়ু আর ফজলি আম দিছিল। (পৃ. ১২৩)

> ফজল কাঁজির ভাত খুব শখ করে খায়। জরিনা তাই কাঁজি পেতে রেখেছে। পানিভরা মাটির হাঁড়িতে ফেলে রাখা হয় যে চাল তারই নাম কাঁজি। কাঁজির ভাত খেতে যে সব অনুপান উপকরণের দরকার তারও কিছু কিছু সে জোগাড় করে রেখেছে। লশকর বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছে মুঠো খানেক মেথি আর কালিজিনা। এগুলো খোলায় টেলে বাটা হবে। নদীতে গোসল করার সময় শাড়ির আঁচল দিয়ে ধরেছে ছোট ছোট মাছ–চেলা আর খরচান্দা। ... সেই চেলা আর খরচান্দা মাছ কয়টা শুঁটকি দিয়ে রেখেছে জরিনা। শুঁটকি মাছের ভরতা কাঁজির ভাতের এক বিশেষ পরিপূরক। ... পুঁই-চিংড়ির চচ্চড়ি

ফজলের খুব প্রিয়। খালাসবাড়িতে ধান ভেনে সেদ্ধ চালের বদলে আতপ চাল চেয়ে এনেছে জরিনা। এ চাল পাটায় বেটে আর কিছু না হোক কয়েকটা চিতই পিঠা বানিয়ে ফজলের সামনে দিতে পারবে সে। ঘরে গুড় আছে। এখন একটা নারকেল যোগাড় করতে হবে। (পৃ. ১২৫)

জরিনা রান্নাঘরে যায়। গত রাতের রান্না বেলেমাছের চচ্চড়ি গরম করে। হলুদ-লবণ দিয়ে সাঁতলানো আণ্ডালু চিংড়ি ভরতা করে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা ও সরষের তেল সহযোগে। তারপর একটা মেটে বাসনে পান্তা বাড়ে। (পৃ. ১৩৪)

একটা থালায় করে চিতই পিঠা, নারকেল কোরা ও ঝোলা গুড় নিয়ে আসে আমেনা। (পৃ. ১৪৯)

সে নড়িয়ার সুপ্রসিদ্ধ সন্দেশ কিনে নিয়ে এসেছে। (পৃ. ১৫৬)

৫. লোকক্রীড়া-- এ উপন্যাসে লোকক্রীড়া হিসেবে কাবাডি খেলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয়। শুধু তাই নয়, এ খেলার জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের মান-সম্মান এবং সামাজিক প্রতিপত্তিও নির্ধারিত হয়। 'ছয়' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, এরফান মোল্লার সঙ্গে তার দুই কোলশরিকের আলাপে জানা যায়, ফজল নৌকায় না ফিরে বরং কাবাডি খেলার আসরে যোগ দিয়েছে। এ খেলার তারিখ পূর্বনির্ধারিত ছিল। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় মাঝেরচর ও আসুলির বাসিন্দাদের মধ্যে। গত হাটবারে তাদের কথা কাটাকাটি হলে একপর্যায়ে তারা একে অন্যকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। দিঘিরপাড়ের গুড়ের আড়তদার হাতেম শিকদার তার পাশের ধানের আড়তদার আক্কেল হালদারকে একদিন কথা প্রসঙ্গে কটুক্তি করেছিল, তোমাগ চরে আবার খেলোয়াড় আছেনি! আছে সব' (পৃ. ৪৬)। এরই সূত্র ধরে বিবাদের একপর্যায়ে তারা নির্ধারণ করে, আগামী বুধবার দুই চরের বাসিন্দাদের মধ্যে কাবাডি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানেই নির্ধারিত হবে, কারা এ খেলায় শ্রেষ্ঠ। নির্ধারিত সময়ে উৎসুক দর্শকদের সমাবেশ ঘটে বড় ময়দানে। এমনকি উত্তেজিত জনতার মধ্যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার শঙ্কায় সেখানে পুলিশও মোতায়েন করা হয়। বড় ময়দানের মাঝে দাগ কেটে কাবাডি খেলার কোট তৈরি করা হয়। ষোল হাত দীর্ঘ ও দশ হাত প্রস্থের কোটটিকে মাঝখানে দাগ কেটে সমান দুভাগে বিভক্ত করা হয় দুদলের খেলোয়াড়দের অবস্থান গ্রহণের জন্য। কোটের চারপাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে এর সঙ্গে মোটা রশির ঘের বাঁধা হয়। এর বাইরে সারিবদ্ধভাবে দর্শকেরা আসন গ্রহণ করে। আসুলির খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিল দলনেতা বাদল, ওসমান, ফরমান, ভজহরি, আকলাস, কালীপদ ও শামসু। তারা নির্ধারিত সময়ে চরের খেলোয়াড়দের জন্য অপেক্ষায় অধীর হয়ে কোটের নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু তাদের দেখা না পাওয়ায় আসুলির দর্শক, সমর্থকরা রেফারির নিকট দাবি জানায়, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের জয়ী ঘোষণার জন্য। এহেন উৎকণ্ঠাজনক পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবেই চরের বিগত নামী খেলোয়াড় সোলেমান নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য চরের বাসিন্দাদের আহ্বান জানায়। তার আহবানে ফজল, কাদির, কোরবান, লখাই, মধু ও তালেব খেলায় অংশগ্রহণে সম্মত হলে তাদেরকে নিয়ে মাঝেরচরের সাতজনের দল গঠিত হয়। তাদের কাছে খেলোয়াড়ের পোশাক না থাকায় লুঙ্গিতে কাছা মেরেই তারা প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়। খেলা শুরু করার পূর্বে দুই দলের সদস্যরাই নিজেদের মধ্যে গোপনে পরিকল্পনা করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে। সোলেমান ঝানু খেলোয়াড় হিসেবে তার দলের সদস্যদের জানায়, 'তোমরা ওগ বড় বড় খেলোয়াড় দেইখ্যা ঘাবড়াইয়া যাইও না। খালি ঠ্যাকা দিয়া যাইবা। কোনো উপায়ে 'ড্র' রাখতে পারলেই আইজ ইজ্জত বাঁচে। তোমরা ধীরে-সুস্থিরে খেলবা। ওরা চেতলেও চেতবা না। আবার সুযোগ পাইলেও ছাড়বা না।' (পৃ. ৪৮)। প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে কীভাবে আয়ত্তে রাখা সম্ভব, সেই প্রসঙ্গে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে দারুণ সহায়ক ভুমিকা পালন করে, যা প্রতীয়মান হয় খেলার পরিণতিতে। খেলোয়াড়দের কোটে অবস্থান এবং খেলায় কার কী ভূমিকা পালন করতে হবে, সে প্রসঙ্গেও সে সবাইকে অবহিত করে। এ খেলার বিশেষ নিয়মকানুন যেমন 'কুলুপ' দেয়া, 'ডু' দেয়া, 'লেংড়ি' দেয়া প্রভৃতি সম্পর্কে লেখক কোনো ইঙ্গিত না দিলেও অনুমান করা যায়, কাবাডি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তিনি এভাবে এসব প্রসঙ্গকে লিখিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। আসুলির বাদল, ফরমান ও

আকলাসের 'ডু' এর দাপটে চরের খেলোয়াড়রা অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফরমানের আক্রমণে কোরবান আক্রান্ত হলেও একপর্যায়ে ভজহরি 'মরে' যাওয়ায় সে নতুন প্রাণ ফিরে খেলায় নামে। অন্যদিকে ফজল চেষ্টা করে যতটা সম্ভব সময় নষ্ট করতে। আকলাস চরের খেলোয়াড়দের তাড়িয়ে নেয়ার একপর্যায়ে সোলেমানকে ছুঁয়ে ফেলে । ফলে সে প্রাণ হারায়। চরের দুই প্রধান খেলোয়াড় মারা যাওয়ায় আসুলির সমর্থকরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কাদির বয়সে তরুণ বলে অন্যদের উপহাসের পাত্র হলেও একপর্যায়ে সে কৌশলে বিদ্যুৎগতিতে কালীপদের পায়ে 'লেংড়ি' মেরে আসে। এর ফলে তার দলের সোলেমান ও ফজল প্রাণ ফিরে পায়। চরের দল আবার পূর্ণ হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফরমানের আক্রমণে কাদির ও মধু 'মারা' পড়ে। এর কিছুক্ষণ পর তালেব 'ডু' দিতে গিয়ে ধরা পড়ে। এমতাবস্থায় খেলায় দশ মিনিটের বিরতি ঘোষিত হয়। এরপর অবশিষ্টাংশে আসুলির খেলোয়াড়রা চরের দলের মধ্যে ফজল বাদে সবাইকেই 'মেরে' ফেলে। খেলা শেষ হবার দুই মিনিট পূর্বে ফজল মাথা নুইয়ে কুলুপ দেয়ার ভান করলে প্রলোভনবশত তার মাথায় থাবা বসাতে বাদল এগিয়ে যায়। তখনই ক্ষিপ্রগতিতে ফজল এগিয়ে গিয়ে বাদলের কোমর পাকড়াও করে শূন্যে তুলে ফেলে। যেহেতু কোনো দলই এক 'পাট্টি' বানাতে পারেনি, তাই ড্র ঘোষণার মাধ্যমে খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে। এভাবে চরের বাসিন্দারা আসুলির পেশাদার খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার লড়াইয়ে নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করে।

৬. লোকশিল্প-- এ উপন্যাসে লোকশিল্পের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবে মুখোশের উল্লেখ লক্ষণীয়। 'তেইশ' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, জঙ্গুরুল্লা ও তার দলকে খুনের চর থেকে হটানোর জন্য ফজল সঙ্গীদের নিয়ে ভোজেশ্বরের হাটে আসে বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে। টিটু জনৈক মুখোশবিক্রেতার নিকট থেকে একটি মুখোশ কিনে মুখে পরিধান করে এবং সঙ্গীদের সামনে আকস্মিকভাবে লাফিয়ে ভয় পাইয়ে হুল্লোড় সৃষ্টি করে। এ ঘটনা থেকে ফজলের মাথায় প্রতিপক্ষকে হঠাতে মুখোশ ব্যবহারের বুদ্ধি খেলে যায়। সেকারণেই সে তখনই সঙ্গীদের নির্দেশ দেয় মুখোশবিক্রেতাকে খুঁজে বের করতে। এরপর সে তার নিকট হতে ভয়াল চেহারার দৈত্য-দানবের পঞ্চাশটা মুখোশ কেনে আড়াই টাকায়। সে যে কারণে মুখোশের প্রতি আগ্রহী হয়েছিল, তা হলো--

> মুখোশটা খুব কাজের জিনিস। হঠাৎ দেখলে ভয় পাওয়ার কথা। মুখোশ দেখে ভয় না পেলেও মুখোশের আড়ালের মানুষকে নিশ্চয়ই ভয় পাবে। চিনতে না পেরে মনে করবে ওস্তাদ লাঠিয়ালই মুখোশ পরেছে তাদের পরিচয় গোপন করার জন্য। মুখোশ না থাকলে বিপক্ষদল দেখবে পাকা লাঠিয়াল একজনও নেই। সব হাঙাল-বাঙাল আর চ্যাংড়ার দল। ওদের মনের জোর বেড়ে যাবে। তখন লড়াই জেতা মুশকিল হয়ে যেতে পারে। (পৃ. ১৬১)

এ উপন্যাসে সূচিশিল্পের স্বল্প উল্লেখ রয়েছে। 'তৃতীয়' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, রূপজান নূরুর কাছে ফজলের জন্য যে রুমাল উপহার পাঠায়, সেটিতে সাদা জমিনের এক কোণে সুঁই-সুতা দিয়ে ফুল ও পাতার নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর নিচে সেলাইয়ের ফোড়ে খোদাই করা ছিল 'ভুলনা আমায়'। (পৃ. ২৮)

৭. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে ঢাকা-বিক্রমপুর-মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলের প্রচলিত লোকভাষাকে কুশীলবদের সংলাপ রচনায় ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটির আদ্যন্ত পাত্রপাত্রীদের আবেগ, মনোভঙ্গি ও স্বভাব, বয়স ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ব্যহারের প্রবণতা লক্ষণীয়। পুরুষ চরিত্রগুলোর ধর্মীয় মানসিকতা ও সংস্কারের বহিঃপ্রকাশে বিশেষ দোয়া-দরুদ ও শব্দাংশ প্রযুক্ত হয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে গালিগালাজ-খিস্তি খেউড়ও এ ভাষায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে বক্তার মনের ক্রোধ-ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশের অনুষঙ্গে। নারীচরিত্রের স্বল্প উপস্থিতি সত্ত্বেও তাদের আলাপের বিশেষ ভঙ্গি এবং উচ্চারণ লেখকের সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।এ উপন্যাসের লোকভাষায় প্রযুক্ত শব্দরাশি ও বাগধারার দৃষ্টান্ত--

৭.১ শব্দভাণ্ডার

বিশেষণ– ফরসা, পোঁচ, দপদপ, ঝেড়ে, গোছগাছ, ঝাঁকি, পিছলে, ভরভর, তরতর, চটপট, এঁকেবেঁকে, খাটো, তেলতেলে, চকচক, গিলে, ভেঙেচুরে, ভাটিয়ে, চট্‌চট্‌, কোনাকুনি, টেনেটুনে, ঠোকর, খাটো, উড়াল, জুত, ডলে-মুচড়ে, চক্কর, তাণ্ডব, ঝাঁক প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– ধলপহর, ঢাল, ডুলা, কনুই মুঠো, জাল, ফাঁদ, কাদা, উজান, গামছা, আছর, দাঁড়, ঘোঁজা, আঁচল, ডিঙি, লটা, ক্ষেত, হাঁড়ি, বাঁক, গামছা, নিকারি, মালো, টোপ, খোরাক, উদর, গলুই, লালা, দোচালা, গেরস্ত, আটি, উড়কি, খেপ, খেলু, গিধড়, গ্যাণ্ডারি, গ্যারাফি, ঘুঁইট্টা, চুবানি প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– পোয়াতি>পোয়াত্যা, করা>করন, লাগবে>লাগব, ভার>ব্যাদান, এটুকু, এডুকু, আখ>গ্যাণ্ডারি, মোটা>মোডা, ছয়টা>ছডা, উঠিয়ে>উডাইয়া, ফেলি>ফালাই, গিয়ে>উজিয়ে, পেটি>পেডি, মানুষ>মাইনষে, এস>আইও, শুরু>বউনি, ভেনে>ভাইন্যা, আজ>আইজ, খাবার>খাওয়ন, কোথা থেকে> কইতন, এগুনো>আউগান, চোঙা>চুঙ্গা, রেখে>থুইয়া, নৌকা>নাও, মধ্যে>মাঝে, হয়ে>অইয়া প্রভৃতি।

৭.২ বাগধারা

বরুবিবির বুকের ভেতর কে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে শুরু করেছে। (পৃ. ২১)

খুনের মামলা। এ তো ছেলেখেলা নয় যে, চায় মন খেললাম, না চায় মন চললাম। (পৃ. ২৪)

আদালতে উল্ডা-পাল্ডা, আবোল-তাবোল সাক্ষী দিলেই মামলা টিশমিশ অইয়া যাইব। (পৃ. ২৪)

ওর দাদা-দাদির জন্য ওর গায়ে একটা ফুলের টোকা দেয়ার যো নেই। (পৃ. ২৫)

মাতব্বর বলে, ‘জুয়ান পোলা দশজনের লগে যাইব না, এইডা কেমুন কথা! মাইনষে হুনলে কইব কি? বাঘের ঘরে মেকুর পয়দা অইছে।’ (পৃ. ২৯)

বড় তিন ছেলেতো তারই মতো চোখ থাকতে অন্ধ। তারা ‘ক’ লিখতে কলম ভাঙে। (পৃ. ৩৬)

বউয়ের আচলের বাও যদি ছেলের গায়ে লাগে একবার, তবে কি আর উপায় আছে? লেখাপড়া একেবারে শিকেয় উঠে যাবে। (পৃ. ৬২)

আমার আক্কেলের ঠেলায় ওগ আক্কেল গুডুম। (পৃ. ৮৩)

আপনে আর কাডা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েন না। (পৃ. ৯৭)

সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠব না। (পৃ. ৯৯)

মাইনষে বুঝি এহন তৈয়ার লোটে চিড়া কোটতে চায়! (পৃ. ১০০)

ফজলের মাথায় যেন হঠাৎ বাজ পড়ে। (পৃ. ১৫৬)

আমরা খুদ খাইয়া পেট নষ্ট করতে যাইমু ক্যান? (পৃ. ১৭১)

কলে কলে চাবি দিয়া কল ঘূরাইতে অইব। (পৃ. ১৭৫)

ফজল মিয়া ওর মিরদিনা ভাইঙ্গ্যা দিছে। ঘোলাপানি খাওয়াইয়া ঠাণ্ডা করছে। (পৃ. ১৮৯)

এত হবিরে কওনের দরকার নাই। চান ওঠলে দ্যাখতেই পাইব। (পৃ. ১৯৭)

পদ্মাসংলগ্ন চরাঞ্চলের লোকজীবনের ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন ও সংগ্রামশীলতার ভাস্বর শিল্পরূপ আবু ইসহাকের cÙvi cwjØxc। নদী ও মানবজীবনের সমান্তরাল প্রবহমানতা সময়ের পরিক্রমায় নিরন্তর চলতে থাকে।। আবার প্রকৃতি ও মানবজীবনের আন্তঃসম্পর্ক সভ্যতার প্রারম্ভলগ্ন থেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেখানে অস্তিত্বরক্ষার অনিবার্য তাগিদে মানুষকে প্রকৃতির ওপর নির্ভরতাসাপেক্ষে কৌশলী হতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে ছন্দপতন ঘটে না। সময়ের নিয়ম মেনেই সেখানে অবিরাম চলতে থাকে ধ্বংস ও সৃষ্টির খেলা, যা মানুষের নিকট চির রহস্যই থেকে যায়। তবু পদ্মার রোষ ও খামখেয়ালকে অতিক্রম করে চরাঞ্চলের মানুষের বারবার জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হবার অদম্য লড়াকু মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ উপন্যাসটির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ। এরই সূত্রে তাদের ঐতিহ্যগত রূপরেখা লোকসংস্কৃতির আবহে এ উপন্যাসে বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। বাংলাদেশের নদীসংলগ্ন চরাঞ্চলের বাসিন্দাদের নিয়ে রচিত উপন্যাসসমূহের ধারায় এর বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ঔপন্যাসিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) সবিশেষ প্রসিদ্ধি রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের প্রকৃতি ও গ্রামীণ জনপদের বিশ্বস্ত চালচিত্রকে উপন্যাসের প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্বাচনে।[৭০] গল্প ও উপন্যাস রচনার অনুপ্রেরণা হিসেবে তিনি স্বীয় গ্রামীণ অভিজ্ঞতা ও আবাল্যলালিত মধুর স্মৃতিময় দিনযাপনের অজস্র অনুষঙ্গকে অবলম্বন করেছেন। কেননা, এখানকার প্রকৃতির বিশেষ ধরনের গড়ন, আদিম বিস্তার এবং অপরিবর্তনীয় ভঙ্গির পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিধারী স্থানীয় প্রান্তিক বাসিন্দাদের বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রণালি ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতি তিনি দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক প্রতিবেশ এবং বাবার ভূমিকা অনস্বীকার্য।[৭১] তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয় স্কুলজীবনেই, গল্প লেখার মাধ্যমে। বি.এ ক্লাসের ছাত্র হওয়ার পূর্বেই তিনি লিখেছেন স্বনামধন্য গল্প 'শাহের বানু'। গল্পটি প্রকাশিত হলে সেটি পড়ে পটুয়াখালীর তৎকালীন মুন্সেফ ও কবি-কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ^'wbK ¯vaxbZvর সম্পাদক ও বিখ্যাত গল্পকার সোমনাথ লাহিড়ী গল্পটির প্রশংসামূলক সমালোচনা লেখেন।[৭২] তাঁর আজীবনের সুহৃদ আবদুল মতিনের স্মৃতিচারণায় প্রকাশিত হয়েছে, অসহায়, বিপন্ন গ্রামীণ মেহনতি মানুষের প্রতি শামসুদ্‌দীনের মমত্বময়, সহানুভূতিশীল শিল্পীর অকৃত্রিম অনুরাগ, যা তাঁর লেখনীর অন্যতম প্রবণতা।[৭৩] এক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততাও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে গ্রামীণ বাংলার আটপৌরে মানুষদের অস্তিত্বসংগ্রাম ও প্রকৃতিনির্ভর জীবনের আখ্যানকে উপন্যাসে রূপদানে। বহুকাল প্রবাসে অবস্থান সত্ত্বেও স্বদেশের প্রতি দুর্বার টান তিনি বরাবর অনুভব করতেন। সেকারণেই তাঁর মননে, কল্পনায়, শিল্পানুধ্যানে বারবার গ্রামীণ বাংলার লোকসমাজের সাক্ষাৎ মেলে। সৈয়দ আলী আহসানের স্মৃতিচারণায় ফুটে উঠেছে তাঁর চেতনালোকে স্বদেশ, এর নৈসর্গিক পরিমণ্ডল ও অধিবাসীদের প্রতি একাত্মতাবোধ, যা দীর্ঘ প্রবাসজীবনেও তাঁর মনোলোকে অধিষ্ঠিত ছিল।[৭৪] সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে তিনি পরম মমতায় যে উপন্যাসটি

লিখেছিলেন স্বদেশের প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসার টানে, সেটি তাঁর অন্যতম সফল কীর্তি mg‘ evmi। বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় এর বিশিষ্টতা ইতোমধ্যেই স্বীকৃত।[৭৫] তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে Kvke‡bi Kb¨v, AvjgbM‡ii DcK_v Awkqvbv, mevB hv‡K Kij †nj¨v, KvÂbgvjv, g‡bi gZ VvB, hvi mv‡_ hvi, bevb এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত KvÂbMvg।

Kvke‡bi Kb¨v

শামসুদ্দীন আবুল কালামের Kvke‡bi Kb¨v (১৯৫৪)[৭৬] বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা ভাটি এলাকার প্রকৃতিসংলগ্ন জনমানুষের দুর্বার জীবনাভিপ্সা ও লোকজ সংস্কৃতির যৌথতায় গ্রন্থিত অসামান্য উপন্যাস। নদী, সাগর, চরাঞ্চল বেষ্টিত মেহনতি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নিপুণ চালচিত্র বয়ানে তদানীন্তন বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় এর বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য।[৭৭] লোকজ মানুষের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নিজস্ব রূপ ও রীতি, প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনপ্রবাহ আর তাদের চেতনালোকে বয়ে চলা সৃষ্টিশীলতার ধারাকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা এর শিল্পভাবনার গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-মেঘনা-যমুনার নানা স্রোত-উপস্রোত উজান থেকে বয়ে আসা দক্ষিণাঞ্চলে সময়ের প্রবহমানতায় সৃষ্টি করেছে নানা জনপদ, লোকালয়। প্রকৃতির অপার রহস্যময়তা তাদের জীবনে নিয়তির মতোই অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে। ঋতুর পরিক্রমায় এতদঞ্চলে কখনো নেমে আসে ভাঙন, প্রলয়, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহ তাণ্ডব, ভিটেমাটি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলে বিপর্যস্ত মানুষকে নতুন বসতের সন্ধানে চর-দ্বীপাঞ্চলে পুনরায় জীবনসংগ্রামে সচেষ্ট হতে হয়। আবার কখনো নদীই হয়ে ওঠে তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। এর বুকে জেগে ওঠা চরে ফসল বুনে, নদী থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জীবনপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। নদীমাত্রিক বাংলার কৃষিসংলগ্ন আবহমান সংস্কৃতি এতদঞ্চলের মানুষের আবেগ, চিন্তা-চেতনা, আচরণকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে। এর পরিচয় পাওয়া যায় তাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনে, পারস্পরিক আলাপচারিতায়, চালচলনে এমনকি জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন অনুষঙ্গেও। নিত্যদিনের জীবনসংগ্রামের অশেষ ক্লান্তি সত্ত্বেও লোকজসংস্কৃতির ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা সমষ্টিমানুষের অনুভবে নতুন মাত্রায় উন্নীত হয় পরস্পরের অংশগ্রহণে সম্পাদিত গৃহকর্মে, উৎসবে, পালা-পার্বণে, সাংস্কৃতিক নানা আয়োজনের বিচিত্র পরিমণ্ডলে। অর্থাৎ প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনচারিতা, লোকায়ত চেতনার অকৃত্রিম রূপায়ণ ও সহজ-সরল উপলব্ধি এতদঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে, তা বহুলাংশেই আদিম অরণ্যচারী মানুষের কৌমজীবনের লালিত আবহ ও নির্যাসেরই প্রতিধ্বনিবহ। নাগরিক সভ্যতা থেকে বহুদূরবর্তী প্রকৃতিনির্ভর প্রান্তিক লোকমানুষের চালচিত্র রূপায়ণে লেখকের আগ্রহ, শৈল্পিক মনোভঙ্গি, সর্বোপরি স্বদেশের প্রতি দুর্নিবার

অনুরাগের বিশ্বস্ত কথামালা এ উপন্যাস।[৭৮] এতে বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ লক্ষণীয়।

১. লোকবিশ্বাস–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে––

ক. ধীরে ধীরে ছবদার মাঝি আবারও জানাইল সৃষ্টিকর্তাই স্বয়ং হোসেনকে এমনকালে কাছে পাঠাইয়া থাকিবে। (পৃ. ৬৪)

খ. আমার জানাশোনা অনেক পোলা আছে, একটা ভালো সম্বন্ধের প্রস্তাব উঠাইতে পারতাম। জাফরের মা-এর মুখের ঔজ্জ্বল্যটা যেন একটু নিভিয়া গেল; পিছনের দিকে কাহারও সাড়া পাইয়া ধীরে ধীরে বলিল : তোমারে আল্লায় জুটাইয়া দিছে। দেখো, তুমি যা ভালো বোঝো। (পৃ. ১২৫)

গ. জাফরের মা তাড়া দিল : খালে আরও বড়ো বড়ো অনেক (মাছ) পাওয়া যায় ভাঁটার কালে। এক সময় আবারও বড়শি লইয়া বসলেই হইবে। তুই যা দেখি মেহের একটা পাঙ্খা লইয়া আয়। দুইজনেই যেন ঘামে আবারও নাইয়া উঠছে। ... হোসেন কাঁধের গামছায় মুখ মুছিয়া বলিল : এমন আমার সব সময়ই হয়। ... আমারও। মা-য় কইছে খাওনের কালে যার নাকমুখ এই রকম ঘামে সে খুব বউর আদর পায়। (পৃ. ৯৯)

‘ক’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ছবদার মাঝির সংলাপে হোসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশিত। কেননা, নদীতে কেরায়া নৌকা নিয়ে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে সে দিনের পর দিন অনাহারে, অর্ধাহারে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। তার আশেপাশে এমন কেউ ছিল না, যে তাকে সেবা করতে পারে। সেকারণেই আকস্মিকভাবে হোসেনকে কাছে পেয়ে সে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছিল। ‘খ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মৃত ছবদার মাঝির স্ত্রীর সঙ্গে মেহেরজানের পুনর্বিবাহের আলাপ প্রসঙ্গে হোসেনের উদ্যোগী ভূমিকা লক্ষণীয়। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ মেহেরজান বাপের বাড়িতেই থাকে। সে পুনরায় স্বামীর কাছে ফিরে যেতে নারাজ। হোসেন তার পুনর্বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার কথা মেহেরজানের মাকে জানালেও সে এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিল না। কেননা, মেয়ের জামাই হিসেবে সে মনেমনে হোসেনকেই পছন্দ করত। মুখে সরাসরি সেটি বলতে না পারায় বাধ্য হয়ে হোসেনের প্রস্তাবে সম্মতি দানে তার দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় এ সংলাপে প্রকাশিত। স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবারের অভিভাবক হিসেবে হোসেনের ভূমিকাকে সে একারণেই স্রষ্টার অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করে। স্মর্তব্য,এটি শাস্ত্রীয় বিশ্বাস নয়। বরং প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বা কোনো সংকট থেকে উত্তীর্ণ হতে লোকমানুষের আচরণে এ ধরনের প্রবণতা লক্ষণীয়। ‘গ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি সমাজে বিবাহিত নরনারীর প্রণয় সম্পর্কিত প্রসঙ্গের উল্লেখ লক্ষণীয়। যদিও এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রযোজ্য নয়। মায়ের কাছে শোনা কথাটি জাফরের মুখে আকস্মিকভাবে উচ্চারিত হলেও এর লক্ষ অবশ্যই হোসেন ও মেহেরজান, যারা পরস্পরের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়।

২. লোকসংস্কার––

২.১. নিয়তি বা অদৃষ্ট সংক্রান্ত–

ক. হোসেন পাড়ে নামিবার উদ্যোগ দেখাইল : চলেন, দেখন যাউক ভাগ্যে কী আছে! ঠিকই কইছেন, আশায় আশায় কেবল নৌকায় বসিয়া থাকলেই কেউই আর ডাকিয়া জিজ্ঞাস করবে না। ... আমি দেখি যার রিজিকের চিন্তা তারই করতে হয়! ... ছবদার খুব একটা উৎসাহ দেখাইল না : কী-ই বা করার আছে এমন কুহকে। অদৃষ্ট বুঝি লেখা আছে সেই জনম হইতে। ভাটায়-জোয়ারে বর্ষায়-খরায় এতটুকু এই ডিঙি এত এত টাল খাইয়া যায়, ভাগ্যে যা আছে তারে কে কেমনে খণ্ডায়। ... হোসেন একটু অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল : একটুকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল : এইটা কোনো কথা হইল মাঝি! এর মাইনি এই যে যা হইবে, আমার কোনো চেষ্টার কোনো ফল নাই? ... ছবদার মাঝি একটু ইতস্তত করিল; তারপর পাড়ে নামিতে বলিল : বুঝি না, কোনো দিন বোঝারও সাধ্য হয় নাই। বিদ্যাবুদ্ধি যারগো আছে, যারা লিখন পড়ন জানে, তারা কয় মনুষ্য বড়ো ক্ষুদ্দুর, উপরের হুকুম ছাড়া নাকি কিছুই হয় না, কোনো কিছু বদলাইবার কিছুমাত্র সাধ্য মানুষের

নাই। পুথিয়াল বলে, সেই একই সূর্যচন্দ্র নক্ষত্র পৃথিবী, তার তলে ঢেউ নাচে জনম অবধি। আমরা ঢেউ হইয়া পাড়ে উঠতে চাই মাটি খামচাইয়া, তবু সোতে ভাসিয়া যাই। ... হোসেন জোরের সঙ্গে মাথা দোলাইল : এই কথা পছন্দ হইল না মাঝি, আমি মানিয়া লইতেও পারি না। ...আমি এই ডেনার, এই মাথার উপর আস্থা রাখি। এমন কবিয়াল পুথিয়ালরা কেমন যেন আউলাইয়া দেয়। ... ছবদার মাঝিও নামিয়া আসিল : ... পথের দিশা পাই না। দাস-এর ভাগ্য মানিয়া লইছি বলিয়াই তো এখনও তক প্রাণে বাঁচিয়া আছি। (পৃ. ৫০)

খ. নতুন কী আর হয় আমাগো নাহান গরিব-গুর্বার সংসারে! এক জট খুলতে যাইয়া আরেক জটে বাঁধিয়া পড়ন কপালে লেখা আছে। ... যা হবার হইয়া গেছে। ভাগ্যের বিষয় কেউ আর কখনও খণ্ডাইতে পারে না। আমার কেবল আপশোশের কথা এইটাই যে মাইয়া মানুষ করলাম এত ছিদ্দত করিয়া, তবু তার বিয়া-শাদির বিষয়ে আমি যেন পর হইয়া রইলাম। ... মাইয়ার কাছে শুনি কত বড়ো হাড়ে-হারামজাদার ঘরে মাইয়ারে তুলিয়া দিছি। মাইয়া সেই যে বাপের বাড়ি বেড়াইতে আসার নাম করিয়া চলিয়া আসছে, আর ওই বাড়ির দিকমুখি হইতে চায় না। এই সঙ্কটে সকলেই বড়ো অশান্তিতে আছি। ... কপাল, সবই কপাল!– কেবলই আপশোশ করিতে শোনা গেল গঞ্জে আলীর কবিলাকে; (পৃ. ৫৫)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ছবদার মাঝির সঙ্গে হোসেনের আলাপের প্রতিপাদ্য নিয়তি বা অদৃষ্ট সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস, যার পক্ষে-বিপক্ষে তাদের অবস্থান লক্ষণীয়। ছবদার মাঝির অদৃষ্টবাদী মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে হোসেনের যুক্তিবাদী প্রত্যয় লক্ষণীয়। ছবদার দারিদ্র্যপীড়িত দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা এবং পুথিতে লিখিত নির্দেশনাকেই ধ্রুবসত্য বিবেচনা করে, যদিও হোসেন তাতে সম্মত নয়। সে মনে করে, মানুষ হিসেবে নিজের অবস্থান পরিবর্তনের দায় তারই, এজন্য বলিষ্ঠ মানসিকতাকে ধারণ করে বাহুবলে বলীয়ান হয়ে কাজে নিযুক্ত হতে হয়। সে ভাগ্য বা অদৃষ্টের লেখাকে স্বীকারে অসম্মত। মানুষ চেষ্টা করলে অনায়ত্ত কিছুকেও আয়ত্ত করতে পারে, যার দৃষ্টান্ত সে নিজের জীবনেই স্থাপন করেছে পারিবারিক বিপর্যয়ের পরও বসতবাড়ি-বাগান গড়ে তুলে ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করার অভিলাষে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শিকদারকে উদ্দেশ্য করে সখিনার মায়ের বিলাপের মূলে রয়েছে অদৃষ্টবাদ সংক্রান্ত লোকসংস্কার। কেননা, বিবাহিত সখিনার স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাপের বাড়িতে চলে আসার ঘটনায় তার বাবা-মায়ের ভোগান্তি বাড়ে। সখিনার মা মনে করে, তার কপালে এরকম পরিণতিই নির্ধারিত ছিল। তাই তাকে এভাবে উৎপীড়িত হতে হচ্ছে। বাঙালি গ্রামীণ সমাজে নিয়তি সংক্রান্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ইহলৌকিক যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনাকে সহনীয় করে নেয়ার মানসিকতা লক্ষণীয়। নিয়তি বা অদৃষ্টের ব্যাপারে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। যার জীবনে যে বাধা-বিপত্তি আসে, তা মেনে না নিয়ে উপায় নেই, এরূপ ধারণা নারীসমাজে বিস্তারের অন্তরালে পুরুষতন্ত্রের কৌশলী অভিপ্রায় সুস্পষ্ট।

২.২ নদীসংক্রান্ত লোকসংস্কার––

ক. এখনও গাঙে ভাসিয়া পড়িবার সময় এক আজলা জল মাথায় তুলিয়া সমীহ দেখায়, কোনো কিছু আহারের কালে কণামাত্রও আগে নিবেদন করে গাঙের উদ্দেশে (পৃ. ৬২)

খ. কবে কোন শৈশবকালে ... পিতামহ করমালীর সঙ্গে সেই মুলুক দেখিতে গিয়াছিল। দীর্ঘ যাত্রা, ভাটার টানে তর তর করিয়া নামিয়া যাইতে থাকিলেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এক সময়; যখন জাগিয়া উঠিল দেখে চতুর্দিকে কুয়াশা, কে যেন বলিয়াছিল কুহকের মেলা। নৌকা দুলিতেছিল। মাঝি-মাল্লা এবং অন্যান্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল দিক-দিশা ঠিক রাখিতে : বদর বদর বলে ভাই, কোনো ডর নাই। (পৃ. ১৮০)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নদীতীরবর্তী লোকসমাজে প্রচলিত লোকসংস্কারের মূলে রয়েছে এর ওপর তাদের প্রাত্যহিক নির্ভরশীলতার প্রসঙ্গ। কেননা, তাদের জীবনসংগ্রাম ও জীবিকা বিভিন্নভাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নদীর সঙ্গে মানবজীবনের নিবিড় অন্তরঙ্গতা এ ধরনের শ্রদ্ধা ও সমীহবোধের উদ্ভব ঘটায় লোকসমাজে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নদীকেন্দ্রিক মানুষের অবচেতনলোকে সন্নিহিত লোকসংস্কারের প্রচলনের অন্যতম কারণ হলো নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে বদর পীরের শরণাপন্ন হলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব, এরূপ ধারণা লোকসমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত। শিকদারের

বাল্যকালীন অভিজ্ঞতা অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়। নদীর বুকে কুয়াশায় চারপাশ ঢেকে যাওয়ায় আতঙ্কিত যাত্রীরা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে অনন্যোপায় হয়ে সেকারণেই বদর পীরের নাম স্মরণ করে নিজেদের মনোবল ধরে রাখতে উদ্যোগী হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে অনুসৃত এসব সংস্কার লোকসমাজে বিভিন্নভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২.৩ পীর সংক্রান্ত লোকসংস্কার--

> ক. নৌকার পর্দার উপর হইতে হাত সরাইয়া জোবেদা বহুক্ষণ অবধি নতমুখে বসিয়া রহিয়াছিল। হয়তো অনেক কিছুই বলিবার বা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই সম্ভব ছিল না। স্বামী তাহাকে কোনো পীর-সাহেবের দরগায় লইয়া যাইবার পথে কী উপলক্ষে উঠিয়া গিয়াছিল গঞ্জের ঘাটে, পিছনে শাশুড়ি কেবলই বকবক করিতেছিল। সে বেশ শক্তভাবেই শুনাইয়া দিতেছিল যে মেয়েমানুষ বাহিরের দিকে উঁকি-ঝুঁকি দেয়, তাহার সংসারে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী; আরও শুনাইতেছিল তাহাকে উপযুক্ত হেদায়াতের জন্য পীরসাহেবের কাছে সে আরও কী কী বলিবে। (পৃ. ৮৯)

> খ. দিন যায় মাস যায় একদিন শাশুড়ি-স্বামী অনেক পরামর্শের পর স্থির করিল তাহাকে হেদায়েতের জন্য কোথায় কোনো মুলুকে লইয়া যাইতে হইবে। জোবেদা কোনো আপত্তি উঠায় নাই। ... শাশুড়ি কেবলই শাসাইতেছিল কুলগুরু সেই পীর, তোর বাপে ও তার বাপেও তার কথা ঠেলিতে পারে না। (পৃ. ৯২)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে জোবেদার স্বামী ও শাশুড়ির প্রতি অবাধ্যতার প্রতিকার হিসেবে পীরের দরগায় নিয়ে বশীভূত করার সংস্কার লোকসমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত। কেননা, পীর-দরবেশদের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের আস্থা-বিশ্বাস সীমাহীন। তাই যে সমস্যার প্রতিকার নিজেদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা সম্পন্ন করতে সেকারণেই তারা পীরের দ্বারস্থ হয়। জোবেদার প্রতি তার শাশুড়ির কঠোর মনোভঙ্গিতে সন্নিহিত রয়েছে নিজের আধিপত্য প্রকাশের তাগিদ। সেকারণেই সে প্রচলিত লোকসংস্কারের সাহায্য নিয়ে অবাধ্য, উদ্ধত পুত্রবধূকে শায়েস্তার জন্য পীরের কাছে যায়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি পূর্বের লোকসংস্কারেরই সম্প্রসারণ, যেখানে পীরের প্রতি জোবেদার শাশুড়ির ভক্তি ও আনুগত্য জোরালোভাবে প্রকাশিত। বাঙালি সমাজে পুত্রবধূর সঙ্গে শাশুড়ির সম্পর্কে বিদ্যমান সংঘাতের মূলে রয়েছে সংসারের কর্তৃত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি নিত্যদিনের গৃহকর্মাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, সন্তান ধারণ ও স্বামীর প্রতি নতজানু থাকা প্রভৃতি। জোবেদা ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে নির্দ্বিধায় স্বামী ও শাশুড়ির অন্যায়-অযৌক্তিক আচরণ মেনে না নেয়ায় শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের শিকার হয়। তাই এর প্রতিক্রিয়ায় একপর্যায়ে জোবেদার অবাধ্যতা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে তার স্বামী-শাশুড়িকে পীরের দ্বারস্থ হবার লোকসংস্কারকে এভাবেই মান্য করতে দেখা যায়।

২.৪ প্রাত্যহিকতা সংক্রান্ত--

> ক. আমি যাই চাচি, এখনই বিদায় লইয়া যাই। ... জাফরের মা একটুকাল নীরব থাকিয়া বলিল : ছি বাজান, যাই কইতে নাই, বলো আসি। (পৃ. ১৪০)

> খ. মেহেরজান একটু ইতস্তত করিয়া বলিল : নিয়ত করিয়া নামছেন, এখন আর পিছন ফিরতে নাই। (পৃ. ১৪২)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রিয়জনকে বিদায় জানানোর বেদনা স্বজনদের শোকার্ত করে বলেই এর প্রতিকারার্থে পুনরায় আর সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। তাই 'যাই' শব্দে আরোপিত প্রিয়জনের সান্নিধ্য হারানোর কষ্টের পরিবর্তে 'আসি' শব্দের মাধ্যমে পুনরায় মিলিত হবার ব্যগ্রতা লক্ষণীয়। ছবদার মাঝির অসুস্থাবস্থায় তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল হোসেন। তার আন্তরিকতা ও ব্যবহারের ঔদার্যে বিমুগ্ধ মেহেরজান, তার ছোটভাই জাফর ও ছবদারের স্ত্রী হোসেনকে ভালোবেসে ফেলেছিল পরিবারের একজনের মতই। তাই তার বিদায় তাদের শোকার্ত করেছিল। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যক্তির জোরালো ইচ্ছার প্রতি গুরুত্বারোপের

প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। কেননা যে মুহূর্তে কেউ কাজটি শেষ করার সুদৃঢ় অবস্থান থেকে সরে যায়, তা আর পরিসমাপ্ত হয় না। হোসেনের প্রতি মেহেরজানের আচরণে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

৩. লোকাচার-- গ্রামীণ সমাজে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের সূত্রে একের সঙ্গে অন্যের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ফলে প্রাত্যহিক নানা প্রয়োজনে তারা যেমন খোঁজখবর করে, তেমনিভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দেয়া নেয়ার রীতিও গড়ে ওঠে। এ উপন্যাসেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। বাল্যসখী সখিনার প্রতি হোসেনের প্রেম পরবর্তীকালে পূর্ণতা পায়নি তার পিতা মুজফফরের কপট আচরণের কারণে। তবু সখিনা ও তার পরিবারের খোঁজখবর নিতে হোসেনের আন্তরিকতায় ঘাটতি নেই। সখিনার পিতা গঞ্জে আলীর সাংসারিক অবস্থা তেমন সঙ্গতিপন্ন নয়। সেকারণেই সুযোগ পেলে হোসেন তাকে সাহায্য করতে চায়। কখনো বা নিজের ধরা বাড়তি মাছগুলো দিয়ে, কখনো বা নিজের আগ্রহেই সখিনাদের বাড়িতে এসে তার বাবামায়ের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময়ের ঘটনায় তাদের সম্পর্কে বিদ্যমান আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অতিথিকে আপ্যায়নের রীতি হিসেবে সখিনা হোসেনকে পান এনে দিলে সে আলাপকালে তা গ্রহণ করে। একপর্যায়ে সখিনার মা তাকে দুপুরের খাবারের নিমন্ত্রণ জানালে হোসেন সৌজন্যবশত সে প্রস্তাব এড়িয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

> পথে গঞ্জে আলীর সঙ্গে দেখা। হোসেন খেয়ালই করে নাই। গঞ্জে আলীই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ছিল। ... হোসেন একটু বিস্মিত হইল তাহার আন্তিক-আহ্বান-এর পীড়াপীড়ি লক্ষ করিয়া : পাগল না কী, এই ভর দুপহরে এত কড়া রৌদ মাথায় লইয়া না খাইয়া যাবা এইটা কোনো কামের কথা! আসো, আসো-গঞ্জে আলী তাহার হাতের ঝুলান খালুই উঁচাইয়া দেখাইল: খোঁড়ল হাতাইয়া কত্ত বড় বড় কই মাছ পাইছি দেখো, খাইয়া-দাইয়া ধীরে সুস্থে যাইও। ... হোসেন একটু ইতস্তত করিল। গঞ্জে আলীর এইরকম সমাদর তাহার প্রত্যাশারও অতীত। ... গঞ্জে আলীও আর পীড়াপীড়ি করিল না ... (পৃ. ৩৪-৩৫)

৪. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে দক্ষিণাঞ্চলের লোকজীবনের রূপায়ণে লেখক সচেতনভাবে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানকে প্রযুক্ত করেছেন। এগুলো হলো লোককথা, উপকথা, পরানকথা, রূপকথা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি।

৪.১ লোককথা

> ওই যে কেচ্ছা আছে না একটা! বাপে মাইয়ার বিয়া দিবে, কিন্তু মাইয়া কিছুতেই সেই বিয়া বইবে না। বাপে কত চোখ রাঙায়, কোঁদে, কাঁদে, তবু মাইয়া অটল। একদিন তার কবিলা ফিসফিসাইয়া কয় কোন্ জোয়ানের দিকে মাইয়ার টান। বাপ শুনিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রয়, শেষে আপশোশ করিয়া কয়, হায়, হায়, আমার এমন মাইয়ার কপাল লেংড়া ময়জদ্দির দিকে ঠেলছে কেডায়? কেডায় আবার, কয় কবিলা, যার পয়দা তার হুকুমই ঠেলছে। বাপ আবারও হাঁ করিয়া চাইয়া রয়, কয় পয়দা করলাম আমি, এখন হুকুম দিতে আইলো কেডায়? কবিলা শাসন করিয়া থামাইয়া দেয়, যার কপালে যেদিন টান পড়ছে, তার পিছে নিশ্চয় সৃষ্টিকর্তার হুকুম আছে। বাপে কয়, আমি তাইলে কেবল চাইয়া চাইয়া দেখুম আমার মাইয়ার কপাল বাস্তবিকই ময়জদ্দির দিকে ঠেলছে? কিছুতেই তেমন হইবে না। (পৃ. ২৬)

উপকথা

> বয়সে যাহারা বড়ো তাহারা মাছের লালচে অংশটুকু শিশুদের দেখাইয়া বলে : 'এইটুকু কি জানো? গোটা মাছটার মধ্যে এই জাগাটুকের লাহান মজা অন্য কোনোখানে নাই। হরিণের গোস্ত তো খাও নাই, এই জাগাটুকু সেই হরিণের গোস্তর লাহান মজা। একদিন যামু এ সুন্দরবনের জঙ্গলে। হরিণও ধরিয়া আনমু। আসলে কী জানো? এই ইলিশে আর হরিণে আছিল যেমন দোস্তালি, তেমনি রেষারেষি। হরিণে এই জাগাটুকু নিজের গা থেকিয়া কাটিয়া দিছিল ইলিশের। কেন জানো? দোউড় হইয়াছিল দুইজনের মধ্যে। সাব্যস্ত হইছিল যে হারবে সে নিজের গা-এর একটু গোস্ত কাটিয়া অন্যরে দেবে। এমন যে হরিণ, সে-ও গেল ঠকিয়া। কী আর করে, চুক্তি যা হইছে তার তো আর খেলাপ করা চলে না। দিল কাটিয়া এই গোস্তটুক ইলিশের।' এই সব গাল-গল্প, কথা উপকথা সহজাত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে পল্লবিত। (পৃ. ১৯-২০)

পরানকথা

> জাফর আসিয়া বায়না ধরিল ... আপনে এখন একটা নতুন কেচ্ছা শুরু করেন ভাইজান। খুব বড়ো একটা পরান কথা ... হোসেনের আদপেই তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না। এই কয়েক সন্ধ্যা আগেও এমনই এক সন্ধ্যায় তাহাকে 'রূপভান কন্যা'র কাহিনি শুনাইয়াছে, ঘরের কেঁওয়ারের ওই ধারে বসিয়া চাচি এবং মেহেরজানও শুনিয়াছে। নিজেও কি সে সব জানিত। অন্য অন্য মাঝিদের মুখে মুখে শুনিয়া সে মনের মতো করিয়া সাজাইয়াছে, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছে শিকদার, সে যতই রূপকথার কিংবা পরান-কথার চরিত্র কিংবা ঘটনাগুলিকে অলীক অথবা অসম্ভব রকম মনোহরণ করিতে চাহিয়াছে, শিকদার ততই তাহাদের নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ঘটনার মধ্যে। (পৃ. ১১৭)

রূপকথার অনুষঙ্গ

> মন বসিত, যদি সে (হোসেন) পারিত আবার সেই শৈশব দিনের সব রকমের কল্পকথা অবাধে সখিনার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পাইত। ... সব ভয় তুচ্ছ করিয়া জঙ্গলের হোনকাইচ খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিছা মিছা রত্নের ভাণ্ডার সাজানো ... কোনখানে থাকে ব্রহ্মদৈত্য আর কোন্খানেই বা প্রলয়ঙ্কর আজদহা অজগর–এইসব তো এখনও মনে হয় মাত্র অল্প কিছুদিনের ঘটনা। (পৃ. ৩৪)
>
> মনে হইয়াছে কয়েকবার শিকদারের কথা, যে তাহাকে দুঃখহরণ রাজপুত্রের কাহিনি শুনাইয়াছে (পৃ. ৮৯)
>
> সে ... কখনও বা কোনো সওদাগর অথবা কোনো রাজপুত্রের কাহিনি শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। (পৃ. ৯১)
>
> তোমার বাড়ি ঘর বিষয়-সম্পত্তিরাজ-রাজাগো পুরীর লাহান ঝলমলাইয়া উঠবে। (পৃ. ১৫৬)
>
> কখনও কি ঝড়-ঝঞ্ঝার মতো কোনো দস্যু আসিয়া সবদিকের সব জীবের জীয়ন-কাঠি হাত করিয়া নিজ স্বার্থেই এমন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে? (পৃ. ১৬০)

৪.২ প্রবাদ

> কথায় বলে নিজের শোওয়ার নাই জাগা হাউস হইছে কবিলারে সাধা। (পৃ. ২৩)
>
> গাঙে কুমির, ডাঙায় বাঘ কবেই বা না আছিল এই মুলুকে? (পৃ. ৪৮)
>
> আমাগো যা অবস্থা তাতে নুন আনতেই পান্তা ফুরাইয়া যায়! (পৃ. ৪৮)
>
> ভাবের কথায় ভবি ভোলে না। (পৃ. ৫০)
>
> ঘর নাই তবু দুয়ার দিয়া শোয়! (পৃ. ৯৮)
>
> যা রটে তার কিছু বটে। (পৃ. ১১২)
>
> যদি ঝোপ বুঝিয়া কোপ দিতে চায় ... তা হইলে উপায়টা কী হইবে? (পৃ. ১৪৩)
>
> আমি তো দেখি কত আসল ঘরে মুষল নাই, বিচার নাই। (পৃ. ১৬২)

৪.৩ লোকসঙ্গীত-- এ উপন্যাসে ২৬টি পরিচ্ছেদের প্রতিটির প্রারম্ভেই একটি করে লোকগীতি [৭৯]রয়েছে। এসব লোকগীতি সংযুক্ত করে লেখক পরিচ্ছেদগুলোর কেন্দ্রীয় ভাবানুষঙ্গকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রেমাখ্যানের প্রস্তাবনা হিসেবে এ উপন্যাসে বিভিন্ন সঙ্গীতের সমান্তরালে লেখক বাংলা ভূ-ভাগের প্রতি তাঁর স্বদেশপ্রীতি, প্রকৃতি, নিসর্গলোক ও মানবজীবনের আন্তঃসম্পর্ককে অনুধাবনের প্রচেষ্টা, সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনে প্রেমের উপলব্ধি কীভাবে তাঁকে দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি আন্তরিক করে তোলে সৃষ্টিশীলতার অনুষঙ্গে, সেসব

প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মূল উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে। এ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সন্নিহিত লোকগীতির বক্তব্য হল, মনের মানুষ, অর্থাৎ যাকে প্রেমিক বা প্রেমিকা মন থেকে ভালোবাসে, শুধু তাকেই অকপটে ভালোবাসার কথা জানানো যায়। মনের মানুষকে চেনা সহজ নয়। অসৎ ব্যক্তিও প্রতারণার মাধ্যমে প্রেমিকের বা প্রেমিকার ভালোবাসাকে তছনচ করে দিতে পারে। উক্ত বক্তব্যের সমান্তরালে ২য় পরিচ্ছেদে লেখক উপন্যাসের দুই প্রধান কুশীলব হোসেন ও শিকদারের প্রেমময় উপলব্ধির ভাষ্যরূপ বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছেন। বিশেষত, হোসেন জীবনের নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেও সখিনার প্রতি প্রেমের উপলব্ধিতে মগ্ন, যা সে বন্ধুকে জানিয়েছে। শিকদার তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে। কেননা, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রেম সম্পর্কে সে বিরূপ মনোভাবাপন্ন। তবে হোসেন যে জীবনের অগ্রসরতার অন্যতম অবলম্বন হিসেবে প্রেমকেই অনুসরণ করতে সচেষ্ট, এ বিষয়টি ২য় পরিচ্ছেদের তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ। ৩য় পরিচ্ছেদের সূচনায় সংযুক্ত লোকগীতিতে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমিকের জন্য প্রতীক্ষা ও মিলনের আকুলতা প্রকাশিত। এ পরিচ্ছেদে হোসেনের প্রতি তার বাল্যকালের ক্রীড়াসঙ্গী ও প্রেমিকা সখিনার প্রেমের উপলব্ধি নির্দ্বিধায় প্রকাশিত। যদিও তাদের পিতাদের বিরোধের কারণে হোসেন-সখিনার প্রেম পরবর্তীকালে পূর্ণতা পায়নি। এ উপন্যাসে লেখক হোসেন ও শিকদারের প্রেমভাবনার রূপায়ণে, বিশেষভাবে শিকদারের কবিয়ালসত্তার উন্মোচনপ্রসঙ্গে বিভিন্ন লোকগীতি ব্যবহার করেছেন। এসবের অধিকাংশই পল্লীর নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা, মান-অভিমান, বিরহ-ব্যাকুলতাকে ভিত্তি করে রচিত। তবে এক্ষেত্রে লেখকের বিশিষ্টতা হলো, তিনি বাংলার জনজীবন-সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতকে সচেতনভাবে এ উপন্যাসে সংযুক্ত করেছেন। যেমন – তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিষয়ক বিভিন্ন অনুষঙ্গকে উপজীব্য করেছেন ৬, ১১, ১৬ প্রভৃতি পরিচ্ছেদভুক্ত লোকগীতিগুলোতে। এর পাশাপাশি বাউল সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়েছে ৮, ১৩ পরিচ্ছেদভুক্ত লোকগীতিদ্বয়ে। রূপকথাশ্রিত লোকগীতির দৃষ্টান্ত রয়েছে ২৪ সংখ্যক পরিচ্ছেদভুক্ত সঙ্গীতে। ^ggbwmsn MxwZKv-র 'মহুয়া' পালার ভাবানুষঙ্গের প্রয়োগ লক্ষণীয় ১৫ পরিচ্ছেদভুক্ত লোকগীতিতে। গাজির গানের আংশিক প্রয়োগ ১১ পরিচ্ছেদে রয়েছে। ১০, ১৪, ২১, ২২, ২৩, ২৫ প্রভৃতি পরিচ্ছেদেও বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ লোকগীতি ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন লোকগীতির খণ্ডাংশও এ উপন্যাসে পরিচ্ছেদভুক্ত––

লোকগীতি

বধুঁ হৃদয় যে আর মানে না বারণ

অঙ্গের যৌবন-জ্বালা না মানে শাসন।।

শয়নে কণ্টক ফোটে, জাগিয়া ব্যাকুল,

তোমারই পিরিতে বঁধু হইলাম রে আকুল

শাওনের মেঘের মতো পরান উতলায়

আমি কেমনে শাসন করি তায়।। ...

আমি জল আনতে যাই নদীর ঘাটে

তুমি পবন হইয়া ঢেউ দাও তাতে।

কলসি দূরে ভাসিয়া যায়

এখন কূল-কন্যার লাজ রাখা যে দায়।। (পৃ. ২৭)

বাউল সঙ্গীত

আমার তো নইরে আমি আমার না
কাছে কইরে আমি, আমার না
আমি তো নয়রে আমার, সকলি পর
আমার বলতে নাই এক জনা।
যদি আমি আমার হইতাম
কুপথে কি আর যাইতাম
দেখতাম আপন কল-কারখানা। ...
পরে পরে কুটুমভালি
পরের সঙ্গে দিন কাটালি,
শুধু কয় ফকির লালন
ভাবিলাম পরের ভাবনা। (পৃ. ৬৮)

কবিগান

ও মঙ্গলের মাও
আগুন জ্বালাও দেখি
মশা মারি বড়ো পোন পোন করে।

আহা, মাছের মধ্যে মাছরে
ইলশা সে না মাছ
ও তোর রুইরে পোঁছে কে
দেখ দেখ তিঁত খলিসা চান্দা ধুরাইনা
মোরগো সংসার রাখিয়াছে। (পৃ. ৭৯)

গাজির গান

আপনেরা সব ভদ্দরলোকের ছেইলা পেইলা,
ভদ্দরলোকের ঝি,
গাজি আইছে উদ্ধারণের বিষয় লইয়া

তারে বিদায় দেবেন কী? (পৃ. ৯২)

ˆggbwmsn MxwZKv-র অন্তর্গত ‘মহুয়া’ পালার অনুসরণে রচিত লোকগীতি –

ছাড়িয়া দে কলসি আমার
যায় বেলা হে নাগর
ছাড়িয়া দে কলসি আমার
যায় যে বেলা।
কেমন তোমার মাতা পিতা
কেমন তাদের হিয়া
তোমার মতো যুবা নারীর
কেন না দেয় বিয়া?

ভালো আমার মাতা-পিতা
ভালো তাদের হিয়া
তোমার মতো নাগর পাইলে
মোরে দিত বিয়া
এখন ছাড়িয়া দে কলসি আমার
যায় যে বেলা। (১১৬)

রূপকথাশ্রিত লোকগীতি

অরুণ-বরুণ কিরণমালা
রূপ ভোমরার ঘর।
শিশুর কালে দেখাইলা কোন্
অচিন সওদাগর
হাতে তাহার মোহন বাঁশি
মাথায় শোভন তাজ
রূপ-স্বরূপের মধ্যে দেখি
মনের মহারাজ,
আসিও তুমি যাইওরে তুমি

যেমন পরান চায়

প্রাণের কথা পুরান হইলে

আমার বিষম দায়

কাদা ছানিয়া গড়োরে কুমার

সাধের সংসার

তাহার সাথী প্রাণের সাথী

এই জনমও সার।। (পৃ. ১৭২)

গ্রাম্য কবিয়াল থেকে সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে লোকসমাজে স্বীকৃত কানু শিকদারের বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে কবিগানের আসরের সামগ্রিক ভাবাবহ, উৎসুক জনতার ভিড়ে কবিয়ালদের লোকগীতি পরিবেশনের মেজাজ ও ভঙ্গি, যা তার কবিসত্তার জাগৃতিতে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল--

> বয়স খুবই অল্প আছিল, ঘোরে পড়ছিলাম অন্য প্রকার ধ্যান-জ্ঞানের। সেই কালে ওই দূর সদর শহরের এক কবির আসরে তার গান শুনতে গেছিলাম। ... যাত্রাগানের লাহান সেই আসর। বাঁশ পুঁতিয়া, উপরে রঙিন শামিয়ানা টান টান করিয়া বাঁধা ... তার মধ্যখানে বিরাট একটা চৌকি দেখলাম মঞ্চের, একধারে বাদ্যযন্ত্র কোলে লইয়া বসা দোহারের দল, আর এক কবিকে দেখলাম মঞ্চের এই দিকে সেই দিকে বীরদর্পে পা ফেলিয়া তিনি যে গান গাইতেছিলেন কখনও কথায়, সুরে তা যেন ভুবন কাঁপাইয়া দিতে আছিল। তার মাথায় পাগড়ি, গায়ে জোব্বা, চৌখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। সব কথা তার বুঝিও নাই, শোনারও তেমন বড়ো অবসর ছিল না। তবে কয়েকটা চরণ এখন মনে আছে ‘সইবোনা মোরা এই অপমান’। আর একটা গীতের কথা ছিল : স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, স্বদেশ কারে কয়, এই যমুনা গঙ্গানদী তোদের ইহা হত যদি, পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?’ কী তেজ বীর্য সেই সব কথায় তখন তাদের নামও শুনছিলাম, তাগো ছোটো ছোটো কবিতা-পত্র গানের বইও বিক্রয় হইছে আশে-পাশে ... যাদের গান তিনি গাইলেন সেই মুকুন্দ দাশ, গোবিন্দ দাশদের দেখার বা শোনার কোনো সুযোগ হয় নাই সত্য, কিন্তু তার অন্য একখান গীতের রকম-সকম দেখিয়া যেন একেবারেই চমকাইয়া গেছিলাম। (পৃ. ১৫১)

৫. লোকপরিচ্ছদ-- গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত নারী ও পুরুষের সাজসজ্জা ও আভরণের উল্লেখ এ উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আভাসিত-

> ক. তাহাদের তিনপাড় দেওয়া নীল বসন দুরন্ত বাতাস বিস্রস্ত করিয়া দিতে চায়, ... তাহাদের গলায় হাঁসুলি, কাদামাখা পায়ে খাড়ু-মল, শীর্ণহাতে সেই বালা-কাঁকন যাহার দ্যুতি অভিরাম ... তাহাদের বসনের তিনটি রূপালি রেখাও যেন দেশ-প্রকৃতি হইতে অবিচ্ছিন্ন। (পৃ. ১৬)
>
> খ. গায়ের আঁচল মাথায় টানিয়া সে (সখিনা) দ্রুতপদে ঘরের হাতিনার দিকে আগাইয়া গেল। তাহার হাতের চুড়ি বাজিল, পায়ের মল-এর ধ্বনি যেন আরও মুখর হইয়া উঠিল। (পৃ. ৩২)
>
> গ. সকল কিছুর তদারকে ব্যস্ত মনসব সর্দার স্বয়ং। দেহে তাহার বাহারের সাজ, তেলমাখা চুলে টেরি কাটিয়া ফুলতোলা টুপি চাপাইয়াছে একধারে; হাতে মুখে, দাড়িতে, বগলের লাঠিতেও নানারকম রূপ-প্রসাধন করিয়া সে সকলেরই অতি দ্রষ্টব্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চোখে মাখা সুর্মার গুণে দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল (পৃ. ১৭৩)

৬. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্যের উল্লেখ লক্ষণীয়-

> ক. বউ-ঝিরা তাদের (স্বামীদের) ফেরার পথ চাহিয়া থাকে, মশলা বাটিয়া রাখে, তারপর পুরুষেরা ফিরিয়া আসিলে সেই রূপার মতো মাছগুলি নানাভাবে রাঁধিয়া ভাজিয়া খায়, মোটা চাউলের ভাতের সঙ্গে। (পৃ. ১৯)

খ. চালিতার কোন্‌টা যে কাঁচা আর কোনটা পাকা তাহা বুঝিয়া উঠিতে হিমশিম খাইয়া যাইত হোসেন। সখিনা সেই চালিতা এতখানি মরিচ আর এই এতখানি লবণ মাখাইয়া কচকচ না হয় চাকুমচুকুম করিয়া খাইত মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া। (পৃ. ২৮)

গ. এখনও তো তাহার স্বপ্ন মনে পড়ে শীতদিনের ভোরবেলায় সখিনা জিহ্বা বাহির করিয়া খেজুর গাছতলায় দাঁড়াইয়া থাকিত; উপরের গাছের মাথা হইতে এক ফোঁটা রস পাইলেও সে মহা হৈ হৈ করিয়া অসাধারণ তৃপ্তির ভান দেখাইত; একবার সেই রসের ফোঁটার সঙ্গে একদল মিষ্টিলোভী পিঁপড়া তাহাকে কী না ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একবার কাউফলের স্বাদে সে যে কেমন মুখ বিকৃত করিয়াছিল তাহা এখনও হোসেন স্পষ্ট মনে করিতে পারে। (পৃ.৩৪)

ঘ. মুড়িবাতাসার একটা ছোট পোঁটলা গামছায় বাঁধিয়া কোমরে জড়াইয়া লইয়াছিল হোসেন; ... মাঝি তবু বলিল : অনেক অনেক মাছ জুটছিল, রাঁধছিও ভালো করিয়া ... হোসেন ভাত-মাছ মাখিয়া আরও বলিল ... আপনার রান্নাটা বড়ো ভালো হইছে! ... মাঝিও খুশি হইল : ... এইটা জোটে তো সেটা জোটে না। এত তালাশ করলাম তবু কোনোখানেই কচুর লতি চোখে পড়ল না। পাশে সেইসব দিতে পারলে আরও মজা হইত। আমি কি রাঁধতে জানি। দায়ে ঠেকিয়া করতে শিখছি। (পৃ. ৪৮)

৭. লোকচিকিৎসা-- প্রাত্যহিক গৃহকর্মে হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে গ্রামীণ লোকসমাজে এর প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন ভেষজ চিকিৎসা প্রচলিত। এ উপন্যাসের একটি দৃশ্যে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লক্ষণীয়। মেহেরজান হাঁসের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত শামুক কেটে খাওয়ানোর সময়ে তার মায়ের আলাপ শুনে অবাক হয়ে যায়। কারণ, সে স্বামীর বিরূপ আচরণের কারণে সংসার ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে এসেছিল এবং পুনরায় সেখানে ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হোসেন তার স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে মেহেরজানকে পুনরায় অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে সচেষ্ট। মেহেরজান সেকারণেই তার মায়ের সঙ্গে হোসেনের এ বিষয়ক আলাপ শুনে আকস্মিকভাবে আনমনা অবস্থায় বটির ডগায় হাতের আঙুল কেটে ফেলে। রক্তপাত বন্ধ করতে মেহেরজান তার মাকে অনুরোধ করে কচুর ডাঁটা ও ন্যাকড়া এনে দিতে। কচুর ডাঁটার রস ক্ষতস্থানে লাগিয়ে ন্যাকড়া বেঁধে দিলে রক্তপাত সেরে যায়। কিছুক্ষণ পর জাফর কেরোসিন ও ন্যাকড়া এবং তার মা তাজা কচুর ডাঁটা ও পুষ্ট পানের পাতা আনে তার ক্ষতের ব্যথা ও রক্তপাত বন্ধের জন্য। 'হোসেন মেহেরজানকে অভয় দিয়া ক্ষতস্থানটি ধুইয়া দিল কেরোসিন তেলে; মুখে পান চিবাইয়া বাঁধিয়া দিল কচুর ডাঁটার বাকল দিয়া। মেহেরজানের চোখে জল আসিলেও, যন্ত্রণায় সমস্ত হাত বিবশ হইয়া যাইতে থাকিলেও উঠিয়া যাইতে পারিল না।' (পৃ. ১২৬)

৮. লোকউৎসব-- প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এতদঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবিকায় বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয় তাদের কায়িক শ্রমনির্ভর বিভিন্ন বৃত্তি নির্বাচনে ও পারস্পরিক সম্পৃক্ততায়, বংশপরম্পরায় বাহিত লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তিকে নিত্যদিনের সাংসারিক প্রয়োজনে অবলম্বনের আগ্রহে, বৈরী-বিপণ্ন পরিস্থিতিতে অস্তিত্বরক্ষার অন্তর্তাগিদে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার সুদৃঢ় মানসিকতায়। সেকারণেই জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও পরস্পরের অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ, যা তাদের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের অনুপ্রেরণা যোগায়। উপন্যাসের প্রারম্ভেই ইলিশ আহরণের জন্য জেলেদের রাতের অন্ধকারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ নদীপথে নৌযাত্রার বিবরণকে 'ইলিশ শিকার উৎসব' হিসেবে লেখক সম্বোধন করেছেন। অন্যদিকে, অষ্টম পরিচ্ছেদে দাদা করমালীর নিকট থেকে কিশোরবেলায় শ্রুত শিকদারের অন্তর্ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের কামদেবপুর, বৈশাখী, অভয়নীল, দেহলিদুয়ার, সুভিতপুর, নাচনমহল, রূপার ঝোর প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদের বৈশাখী মেলা, চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অংশগ্রহণের উজ্জীবনা। আবার জোবেদাকে ঘিরে শিকদারের প্রণয়স্মৃতিতে বারবার হানা দেয় মাটিসংলগ্ন মানুষের কৃষিজ ঐতিহ্য ও উৎসবময়তা–

হেমন্তে সোনার ধান ভরে নাই তাহারও উঠান, কেন না তাহার গৃহে সে নাই, যে-গৃহিণী তার ঝাড়িয়া তুষ উড়াইয়া বাছিয়া, সিদ্ধ করিয়া নবান্নের উৎসবকে সার্থক করিয়া তুলিবে, ওই উঠানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছড়াইয়া শুকাইয়া গোলা ভরিয়া রাখিবে, ভুবন ভরা এত শ্রীর মধ্যে তাহাদেরও একটি খণ্ডশ্রী উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। শীতে সেও তো পারিত গাছে উঠিয়া

পাটালিগুড়ের উপাদান সংগ্রহ করিতে, সন্ধ্যায় চুলাশালের পাশে বসিয়া সেই গুড়ের ভিয়ান দিতে দেখিয়া তাহারও বুক গর্বে-আনন্দে ভরিয়া উঠিতে পারিত। (পৃ. ১৫৮-১৫৯)

৯. লোকজ্ঞান-- গোষ্ঠীবদ্ধ লোকমানুষের যূথচারিতা ও সংহতির দৃষ্টান্ত হলো নিত্যদিনের বিবিধ প্রয়োজনে প্রকৃতি, নিসর্গ ও মানুষের নিবিড় আন্তসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা, যেখানে রয়েছে নির্ভরতা ও আন্তরিকতার গভীর মেলবন্ধন। প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারের অভিলাষ মানুষের আদিম প্রবণতা। এর রূপায়ণ সময়ের বিবর্তনধারায় ক্রমশ পরিবর্তিত হলেও মানুষের প্রকৃতিলগ্ন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিকদারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে–

> ঘন গাছপালায় ঘেরা ছোটোখাটো ঘর-গৃহস্থালী কতরকম আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়া আসিতেছিল যুগ যুগ ধরিয়া, কৃষি কাজের সুসমন্বিত কত ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল বংশ-পরম্পরায়, তাহার কার্য-কারণ খেয়াল করিয়াও শিকদার মনে করিয়াছে জীবন-সংগ্রামের রীতি-নীতিগুলির মধ্যেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, মৌল বিষয়গুলির প্রতি যথাযথ আনুগত্যের অভাব আরও দুর্গতির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।
>
> প্রতিটি বাড়িয়ালের ঘর-বাড়ি, খেত-খামার, গাছ-পালা, পুকুর-নালা খাল, বিন্যস্ত করিবার কালে একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ ও পূর্বপুরুষদের খেয়াল ও যত্ন করিয়াও শিকদার মুগ্ধ হইয়াছে, বিস্মিত হইয়াছে, এমনকী একটা গর্ববোধও জাগিয়া উঠিয়াছে বুকে। সামান্য গৃহস্থ-রমণীরাও জানিয়া আসিয়াছে কোন্খানে কোন্ সময় কোন্ গাছ লাগাইতে হয়, তাদের সহ-অবস্থানের সুফল-কুফল, পুকুরে হাঁস-পালনের সঙ্গে হেলঞ্চা-মালঞ্চা-কলমিশাক দিবারও কী সম্বন্ধ, কোন ফল-মূল লাগাইতে হয় গৃহবর্জনার ঠাঁই-এর কাছে, কোন্ সময় কোন্ কোন্ গাছের কলম বাঁধিয়া আরও উন্নততর ফল-ফলারির সৌভাগ্য রাখিয়া যাওয়া যায় পরবর্তী বংশধরদের জন্য, কোন লতা-পাতা-শাক-সবজি, ফুল-ফলের বাগান প্রতি গৃহে অত্যাবশ্যকীয়, সেই বোধ বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভাব তাহাকে বিমুগ্ধও করিয়াছে। (পৃ. ১৫৪-১৫৫)

১০. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে লেখকের বিবৃত ভাষা সাধুরীতির অনুসারী। তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ, বিশেষণ ও ক্রিয়ার ব্যবহার এতে অধিক লক্ষণীয়। ফলে প্রায়সই লেখকের দীর্ঘ বিবৃতিকে বক্তৃতা বলে মনে হয়, যা উপন্যাসের স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায়। তাছাড়া, বিশ শতকের প্রথমার্ধেও দক্ষিণ বঙ্গেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের বাসিন্দাদের মুখে নিত্যদিনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত সংলাপ হিসেবে এ উপন্যাসের ভাষা কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। যদিও তিনি তাদের পারস্পরিক আলাপে ক্ষেত্রবিশেষে সাধু ভাষার সঙ্গে যুক্ত করেছেন আঞ্চলিক কথ্য গদ্যরীতি, প্রবাদ ও লঘু বাগভঙ্গিকে। তবে কোনো কোনো দৃশ্যে সহজ-সরল মনোভঙ্গির অকপট প্রকাশের প্রয়োজনে এ ভাষায় প্রযুক্ত হয়েছে আবেগোচ্ছ্বাস ও গীতিময়তা, কৌতুক, ব্যঙ্গ-পরিহাস প্রভৃতি। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো–

> লোকজ শব্দ– ঠাঁই, নাও, মাঝি, বালা, ডিঙি, তাড়া, মোচা. খোলা, ক্ষেপ, চোটপাট. ঘাল, খাল, ঠাহর, বৈঠা, ঘাট, মুল্লুক, গলুই, আচুক্কা, ঠাঁটা, ঠুনকা, পিঠ, মুঠা, ছই, কেরায়া, জোয়ার, ভাটা, ডাঙা, খোঁটা, হালট, কেচকি, সাঁকো, ভিটা, পুঁটি, টেংরা, কেচকি, ফাটকি, ঢিলা, পড়শি, উদলা, আঁচড়, খোঁড়ল, শাওন, পরান, ভেঙ্গুর, হাতিনা, আদনা, কাজিয়া, মাচান, ছন প্রভৃতি।
>
> ক্রিয়া– ছেঁচিয়া, পিষিয়া, ধাইয়া, আছড়াইয়া, বোনে, কুটিয়া, খসিয়া, দুলাইয়া, লতাইয়া, কিলাইলে, খোঁচাইয়া, গুছাইয়া, মেলিয়া, মাতিয়া, বিলাইয়া, ধাঁধাইয়া, ঠকিয়া, দুলাইয়া, খাড়াইবার, ফসকাইয়া, লতাইয়া, কুটিয়া, বাটিয়া, জোগানো, খুবলাইয়া, ঠেলিয়া, খেদাইয়া, উসকাইলে, ভিড়াইল, ঝুলাইয়া, বিলাইয়া, ভিড়াইল, ফুটিয়া, পাকিয়া, টাটাইয়া, গুছাইয়া, লেপে, ভানে, খসিয়া, ফুলিয়া, ঠেলিয়া প্রভৃতি।
>
> বিশেষণ– তাতিয়া, মদমত্ত, বেপথু, দোস্তালি, ছটফট, ঢিলা, চাপাচাপি, তরতর, ফকিরালি, আছড়াইয়া, চোটপাট, জিয়ল, উড়াইয়া, আপছুছ, সিধা, দুনিয়াবি, ফিসফিসাইয়া, ফসকাইয়া, সিঁদুরে, ফিটফাট, ফাটকি, উদলা, সাফসুফা, টুটা-ফুটা হিমশিম, থুবড়াইয়া, উলটিয়া, ডাঙর, নেতাইয়া, উঁচাইয়া প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– দৌড়>দোউড়, ডাল>ডাইল, যাওয়া>যাওন, খুবলে>খাবলাইয়া, হঠাৎ>আচককা, কোথায়>কোচে, যাওয়া>যাওন, চোখ>চৌখ, পেয়েছিল>পাইছেলে, ভাবা>ভাবন, বৃত্তান্ত> বিত্তান্ত, রাখো>থোও, থাক>থাউক, শখ>হাউস, আমাদের>মোরগো, বুঝলে>বোঝলা, বসবে>বইবে, পাওয়া>পাওন, স্বপ্ন>স্বপন, রোদ>রৌদ, মিথ্যা>মিছা, দিক>দেউক, সৃষ্টি>পয়দা, পর্যন্ত> তক, বৃত্তান্ত>বিত্তান্ত, চাল>চাউল, ডাল>ডাউল, স্ত্রী>কবিলা, মতো>নাহান প্রভৃতি।

লোককবি কানু শিকদারের বৃত্তান্ত––

Kvke‡bi Kb¨v উপন্যাসে অবলম্বিত লোকজচেতনার রূপায়ণে লেখকের সবিশেষ আগ্রহ লক্ষণীয় কানু শিকদারের কবি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের বৃত্তান্তে। উপন্যাসে হোসেন ও শিকদারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ঘটনাস্রোতে দক্ষিণাঞ্চলের লোকজীবনের যে পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে, তাতে এ প্রসঙ্গটি বরাবরই লেখকের সচেতন অভিনিবেশ পেয়েছে। একজন স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য কিশোরের চেতনালোকে সংগুপ্ত লোকসংস্কৃতির প্রতি নিবিড় অনুরাগ বংশপরম্পরায় কীভাবে ক্রমবিকশিত হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় তার শিল্পিসত্তার উত্তরণ ঘটে গ্রাম্য কবিয়াল থেকে সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে, এটি এ উপন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ। পল্লীর হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, লোকমুখে প্রচলিত এসব লোকগীতি, কবিগানে প্রতিফলিত হয়েছে জনজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রণয়, মান-অভিমান, বিরহ, প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ, এমনকি নশ্বর ইহজীবন ও বিশ্বলোক, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক বিষয়ক লৌকিক ভাবনারাশি। স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের চিন্তা, আবেগ, বিশ্বাসের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লোকজমানসের ছাপ এসব লোকসঙ্গীতে অকৃত্রিমরূপে প্রতিফলিত। এতে প্রতীয়মান হয় এসবের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ অনুরাগ ও সমর্থন। দাদা করমালীর লোকসঙ্গীতের প্রতি দুর্বার আসক্তি শিকদারকে আজীবন অনুপ্রাণিত করেছে। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল গৃহস্থ করমালীর কবিগানের প্রতি আসক্তি তার নাতি কিশোর শিকদারের কবিয়ালসত্তার লালন ও বিকাশে প্রাথমিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। গৃহস্থালী কাজে করমালীর আগ্রহ কখনোই খুব বেশি ছিল না। বরং সুযোগ পেলেই সে ছড়া, ধাঁধা ও কবিগানের আসরে বসাতো। সেই সূত্রে, একবার এক গ্রাম্যকবিয়ালের দলকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যেখানে কিশোর শিকদার তাদের সঙ্গে দোহারকের ভূমিকা পালন করে। এভাবেই শুরু হয় কবিগানের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা। দলটি একপর্যায়ে অন্যত্র চলে গেলেও করমালী দোতারা বাজিয়ে লোকগীতি পরিবশন করত, যা শুনতে উৎসাহী গ্রামবাসী তার বাড়িতে ভিড় করত। শিকদার তার দাদার ও গ্রামাঞ্চলে মুখে মুখে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলো সংগ্রহের পাশাপাশি উক্ত কবিয়ালের দলের নিকট লোকসঙ্গীত মুখস্ত করা ও লেখার তালিম নিয়েছিল। অর্থাৎ কিশোর বয়স থেকেই দাদা-দাদীর পরিবারে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠায় তার পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল নিজের অন্তর্গত কবিয়ালসত্তাকে বিকশিত করার। কিন্তু আকস্মিকভাবে মহামারির সংক্রমণে সে দাদাকে হারায়, অন্য আত্মীয়দের বৈষয়িক স্বার্থপরতার কারণে তাকে বাধ্য হয়ে বাবা-মায়ের কাছে ফিরতে হয়। অথচ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরূপ ছিল। সম্ভবত মহামারিতে সে তাদের হারিয়েছিল। ফলে একপর্যায়ে প্রিয়জনহারা শিকদারকে কোনোমতে নিছক ভিটেবাড়িকে সম্বল করে দিনযাপনে বাধ্য হতে হয়। ব্যক্তিজীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এতকাল পর্যন্ত মানবজীবন ও সংসার সম্পর্কিত ভাবনা-ধ্যান-ধারণা তার মনোলোকে অনিকেতভাবনার জন্ম দিয়েছিল। এ বিশ্বের কর্মপ্রবাহে নিয়তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ যে বারবার বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, এরূপ ভাববাদী চিন্তা তাকে প্রভাবিত করেছিল। একারণেই সে কবিগানের চর্চায় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে চেয়েছিল। যদিও মনের ভেতর জমে ওঠা অস্ফুট ভাবরাশিকে যথোপযুক্ত ভাষায় সুরের প্রবাহে বিন্যস্ত করার সামর্থ্য তার মধ্যে তখনো গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া বাস্তব জীবনে লোকগীতের উপযোগিতাহীনতা তাকে কবিগানের প্রতি কিছুটা দ্বিধান্বিত করেছিল। কারণ পারিপার্শ্বিক বৈরী প্রতিবেশে ক্ষুন্নিবৃত্তির বন্দোবস্ত করা তার জন্য কঠিন হয়ে উঠছিল। সময়ের পরিক্রমায় সে জোবেদার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার গান শুনে জোবেদা যখন আবেগোচ্ছ্বাসিত প্রশংসা জানাত, তা শিকদারকে নতুন নতুন লোকগীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করত। কিন্তু একপর্যায়ে সহায়সম্বলহীন, রিক্ত শিকদারকে প্রত্যাখ্যান করে

পরিবারের সিদ্ধান্ত এবং নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সচেতনতাবশত জোবেদা ব্যবসায়ী আসগরউল্লাকে বিয়ে করে। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শোকাতুর শিকদার ক্রমশই সংসারবিমুখ হয়ে ওঠে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চিত বিয়োগান্ত ঘটনারাজির পাশাপাশি ব্যক্তিচিত্তে সঞ্জাত ব্যর্থপ্রণয়ের অশেষ হাহাকার তার মধ্যে উদ্ভব ঘটিয়েছিল জীবনবিমুখতার, নিজেকে সবকিছু থেকে সরিয়ে নেবার প্রবল পলায়নপর মনোভঙ্গি। সংসারজীবনের প্রতি প্রবল নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কবিয়াল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। গ্রামের মানুষও তাকে 'কবিয়াল' হিসেবেই সম্বোধন করত। যদিও সে যেসব প্রচলিত লোকগীতগুলো বিভিন্ন আসরে পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করছিল, সেগুলোতে তার ব্যক্তিহৃদয়ের সংবেদনশীলতা আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। কারণ, নিজের জীবনভাবনা ও অভিজ্ঞতাকে বাণীবদ্ধ করার সামর্থ্য তার তখনো ছিল না। জলসিড়ির ঘাটে দোকানদার লতিফ ও পড়ালেখা জানা শিক্ষিত ঘাট-মাস্টারের প্রশস্তি তাকে একারণেই অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। কেননা, এ পর্যায়ে শিকদার উপলব্ধি করছিল, অন্যের রচিত পদসমূহের কণ্ঠনিঃসৃত পরিবেশন শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করলেও এর সঙ্গে নিজের অন্তর্লোকে প্রবহমান আবেগ, উপলব্ধির মিলবন্ধন ঘটানো তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তার এ আত্মোপলব্ধি তীব্র হয়ে ওঠে, যখন ঘাট-মাস্টার তাকে 'কবি' হিসেবে নতুন অভিধায় অভিহিত করে তার সৃষ্টিশীলতার স্বীকৃতি জানায়।

> বড়ো ভালো লাগল তোমার গান কবি। সারা দিনমানের অনেক রকম তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া মনটারে বড়ো রাখন যায় না। তোমার সব গীত-গান শুনতে শুনতে অনেক কথা মনে উদয় হইল, কবি। ... জগৎ-সংসারে যে যা করে, সেই কর্মেই তার পরিচয়। তুমি জগৎ-জীবনের কথা গীতে-কবিতায় শোনাও বলিয়াই তো তোমারে কবি কইলাম। ... তোমার কথা শুনছি কিছু-কিছু, এখন এইরকম চিনতে পারিয়া খুশি হইলাম। কবি, তোমার অনেক গুণ। এমন গীত-গান, এমন ক্ষমতারে যে পেশা করো নাই, তার জন্যই মনে হয় তোমার জন্য যেন কবির কর্তব্যটাই নির্দিষ্ট হইয়া রইছে। ... অবসর আলস্যে না, কর্মে-ধর্মেও যখন তোমার গীত-গান মুখে মুখে গাওয়া হইবে, তখনই সার্থক হইবে তোমার 'কবি' নাম। দেখিও, তোমার গীত শোনার জন্য আমি, আমার মতো আরও বহু জন প্রথম সারিতে বসিয়া আছে। আগামীদিনের কর্ম কার্যের উপযুক্ত বল ভরসার জন্য কোনো দুঃখের রাত্রি পার হওন কিছু কঠিন হইবে না। কবিরাই তো যুগে যুগে মানুষের পথ দেখাইয়া আসছে। (পৃ. ৮৫- ৮৭)

তবু ভদ্রতা ও বিনয়বশত শিকদার তার তখনই অর্জনকে মেনে নিতে চায়নি। শিকদার অকপটেই স্বীকার করেছিল, সে যেসব লোকগীতি পরিবেশন করেছে জলসিড়ির ঘাটের সেই আসরে, তার কোনোটিই নিজস্ব রচনা নয়। অন্যদিকে, এ পর্যায়ে তার মনোলোকে দাদা করমালীর পরম দুঃখবাদ, দৈবনির্ভরতা, নিয়তিবাদী ভাবনাকে এড়িয়ে গিয়ে পারিপার্শ্বিক জনজীবন, জগৎ, সংসার সম্পর্কে আত্মসচেতনতা প্রবল হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে তার উপলব্ধি–

> কাব্য কী গীতকথা কী কখনও কোনো একক উপলব্ধি অথবা উচ্চারণ? স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই সব কথা ছন্দবদ্ধভাবে উৎসারিত হইয়া পড়ে। কষ্টকৃত গীত-কাব্যে সেইরকম প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যেন কখনওই সম্ভব হয় না ... হয়তো বা মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া সমস্ত গীত-কথা গাঙের মতোই চলিয়াছে। গাঙের মতো তাহারও কোনো স্থির রূপ নাই, থাকিতে নাই। তাহারও উপর শৈশব-কৈশোর ত্যাগ করিয়া জীবনের সব সত্যেও মুখোমুখি হইতে হইতে সমস্ত কাব্যকণা যেন খরা-রৌদ্রের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। (পৃ. ১১০-১১১)

মনসব সর্দার তাকে জানায়, পূর্ণিমায় বড়োমিঞার বাড়িতে তার ছোট ছেলের মুখে ভাতের অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। সেখানে দেশ-বিদেশের নানা অতিথি আসবে, জারী-সারির আসরের ব্যবস্থা হবে। সেখানে শিকদারকেও গান গাওয়ার প্রস্তাব সে দেয়। সেকারণে শিকদার এ উপলক্ষে অনেকদিন পর যখন নতুন গান লেখার চেষ্টা করে, তা পড়ে তার মনে হয়, এতে যেন বিলাপেরই প্রাধান্য পেয়েছে। একসময় সে উপলব্ধি করে, নিছক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম অথবা কবিখ্যাতি অর্জনের প্রলোভনে সে দাদার কাছ থেকে কবিয়ালবৃত্তি অনুসরণে আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। যেহেতু কবিগানের মাধ্যমে মানবজীবনের শাশ্বত মূল্যবোধ, জীবনভাবনা ও উপলব্ধিকেই প্রকাশ করা হয়, সেজন্য এ পর্যায়ে সে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ভাবনাকেই অবলম্বন করে পুনরায় লোকগীতি রচনায় লেখায় সচেষ্ট

হয়। এক্ষেত্রে নিজের অন্তর্লোকে সঞ্জাত নেতি-নাসিত, পলায়নপরতাকে অতিক্রম করে প্রবহমান মানবজীবনের স্রোতধারায় নিজেকে সংযুক্ত করতে সে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

> আর কেবল দুশ্চিন্তা লইয়া সময় কাটাইয়া দেওয়া নয়, শিকদারও নিজের জীবন বদলাইবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হইয়া উঠিয়াছিল। ...ইতমধ্যেই সে কেবল নতুন গীত-গান বাঁধার চেষ্টাই করে নাই, ... এতকাল পর্যন্ত শিকদার যে গীত-কথার জগতে বিচরণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল এই সব দুঃখের ক্রন্দনটাই মুখ্য, কোনো দুঃখ হরণ দুঃখ মোচন মন্ত্র নাই; নানারকম বাদ-বিবাদকে আশ্রয় করিয়া জগৎ জীবনের আসল সমস্যাগুলির সমাধানও আড়ালে পড়িয়া রহিয়াছে। ... শিকদারের কেবলই মনে হইতে লাগিল, গীত-গান, কাব্য-কর্ম, এমনকী সমস্ত আনন্দ ধর্মও যেন কোনো একক বস্তু নয়, একক সৃষ্টি নয়, অনেক মানুষ একসাথে হইয়া হয়তো সব দুঃখকেও অতিক্রম করিতে পারে। ... তাহার সমস্ত চিন্তা-চারিত্র্যের একটি মাত্র সরলার্থই সকলে করিয়া রাখিয়াছে , সে শত চেষ্টা করিলেও কাহারোই ধ্যার-ধারণা ভাঙিতে পারিবে না। একমাত্র উপায় নতুন ধরনের গীত-কথায় তাহাকে সাফল্যলাভ করিতে হইবে। আর তাহাও হয়তো কর্মের মধ্য দিয়া, সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়াই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। (পৃ. ১২৯-১৩১)

আকস্মিকভাবে স্বামীর গ্রহ থেকে পলাতক জোবেদা যখন তার নিকট প্রণয়লাভের আকুতি এবং আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঁচ বছরের ব্যর্থপ্রণয়ের তিক্ততাকে অস্বীকার করে নতুনভাবে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে, শিকদার তার অনুনয় প্রত্যাখ্যান করে। সে বরং তার ভাইয়ের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে জোবেদাকে সেখানে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কেননা, জোবেদার প্রতি তার অতীত প্রেম সময়ের ব্যবধানে এখন নিছকই ধূসর স্মৃতি। তবু জোবেদাই তার মনোলোকে নতুন ভাবনার উদয় ঘটায়, শিকদারের প্রতি তার প্রেম প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অপমানে। মানবজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, সংবেদনশীলতা ও মানবিক আবেদনকে যদি নিজের উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া না যায়, তবে কবি হিসেবে শিকদারের ব্যক্তিগত অনুভব ও আন্তরিকতা যে নিতান্তই অসার, এ বোধ জোবেদাই তার ভাবনায় উস্কে দিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত অন্যের নিকট থেকে শেখা ভাষায় মুখস্তবিদ্যাকে পুঁজি করে সে লোকগীতের আসরে যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করত, তাতে যে নিজের যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটেনি, শিকদার এ পর্যায়ে সেই উপলব্ধিতে স্থিত হয়েছিল। কেননা, লোকগীতিতে প্রকাশিত নর-নারীর প্রেমাকুতি, ভালোবাসার প্রগাঢ়তা সেসব গানে বাণীরূপ পেলেও শিকদার কখনোই তেমন উপলব্ধিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। এ পর্যায়ে তার আত্মঅনুসন্ধান ও নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় অনুধাবন করা যায়, সে প্রকৃতঅর্থেই কবি অর্থাৎ সৃষ্টিশীল ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে আত্মপ্রকাশে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে সচেষ্ট–

> শিকদারের কখনওই মনে হয় নাই কবি হইতে গিয়া তাহাকে এমন বিপুল সব প্রশ্নের সম্মুখনি হইতে হইবে, না কল্পনাতেও ছিল এই নিঃসঙ্গতা। জীবনের সবখানে গতিশীলতা রহিয়াছে ঠিকই, কিন্তু সে-ই ক্রমাগত বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল। জনতা যে ভাষায় তাহাদের ভাব-ভাবনা প্রকাশ করে শিকদার তা যথাযথ চয়ন করিয়াও দেখিয়াছে কোনোখানে অসঙ্গতি আসিয়া গিয়াছে, তাহার মৌল বিষয়, নানারকম পরম্পরায় এমন কোনো রূপ পরিগ্রহ করিতেছে যার জন্য সমস্ত কথা, কাব্য-কথকতাকে নতুন করিয়া সাজাইয়া লওয়া প্রয়োজন, প্রচলিত রীতি-নীতি এবং বাধা-বন্ধের বাহিরেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিবেদন উপস্থাপন অতি আবশ্যকীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। ... দেশে দেশে বাড়িতে বাড়িতে সকলের ফরমায়েশি গীত-গান শুনাইয়া ইনাম আনাম সাধুবাদ অবশ্যই জুটিয়াছে, কিন্তু কেবলই তাহার মনে হইয়াছে যে অন্যকে ফাঁকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ফাঁকি দিয়া চলিয়াছে, ... এখন সে নিজেকে এমন একটা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছিল যার মধ্যে কোনো কন্যার জন্য আকুলতা-ব্যাকুলতাই বড়ো কথা নয়, বরং মুখ্য হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত প্রায় সমস্ত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। (পৃ. ১৫৬)

জোবেদার প্রতি তার কিশোরবেলার দুরন্ত প্রেম অবশেষে বহুদিনের ব্যবধানে পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে চরিতার্থ হলেও জীবনের চলার পথে অচিরেই তাকে নতুনভাবে এগিয়ে যেতে হয়। কেননা, এতদিনে সে মানবজীবনের প্রকৃত মাহাত্মকে অন্তর্লোকে অনুধাবনের সুযোগ পায় প্রার্থিত মানুষটির নিবিড় সান্নিধ্যে। এভাবেই সে অনুপ্রাণিত হয় ব্যক্তিচিত্তের অনুভব ও ভাবনাকে ভিত্তি করে নতুন কবিগান রচনায়, আসরে উপস্থিত হয়ে জনসমক্ষে তা পরিবেশনের মাধ্যমে কবির প্রকৃত মর্যাদা ও স্বীকৃতি অর্জনে, যার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় এ উপন্যাসের গ্রামপ্রধানের

বাড়িতে আয়োজিত ভোজসভায়। নদীর বুকে জেগে ওঠা চরে নতুনভাবে জীবিকা ধারণের জন্য মনসব সর্দারের আয়োজনে শিকদারও সঙ্গী হতে চায়। কেননা, নিছক পদ রচনা আর আসরে পরিবেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থে দিন কাটাতে সে অনাগ্রহী। জোবেদাকে জীবনপথের সঙ্গী করে মেহনতি মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তবেই সে সুরের সাধনায় অবগাহনে সচেষ্ট। কিন্তু নিয়তির পরিহাস হিসেবেই যেন, জোবেদার স্বামী ও তার অনুচরদের আকস্মিকভাবে তাকে অপহররণের ঘটনায় শিকদারের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। সেকারণেই ব্যক্তিজীবনে কাম্য নারীকে সামাজিকভাবে আপন করে নেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সে কবি হিসেবেই জনসমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পে স্থিত হয়। এভাবেই এ উপন্যাসে শিকদার চরিত্রের মাধ্যমে লেখক একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তির নিছক গ্রাম্য কবিয়ালের পর্যায় থেকে যথার্থ কবি হয়ে ওঠার রূপরেখা নির্দেশ করেছেন।

লোকসমাজের অন্তর্গত মানুষের জীবনাচার, চিন্তাধারা, জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি, সামাজিক আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সম্মিলনে Kvke‡bi Kb¨v-য় ভাটি অঞ্চলের লোকজচেতনার রূপায়ণে লেখকের আন্তরিকতা অনস্বীকার্য। উপন্যাসটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে বিভিন্ন গ্রামীণ জনপদের বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৃত্তান্তে। পাশাপাশি লোকমানুষের সৃষ্টিশীলতা তথা লোকসংস্কৃতির বিশেষ কোনো উপাদানকে মনন ও মেধা দিয়ে যথাযোগ্য পরিশীলনের মাধ্যমে স্বীকৃতি অর্জনের প্রচেষ্টা উপন্যাসটিকে সফল শিল্পভাষ্যে উন্নীত করেছে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় দক্ষিণাঞ্চলের লোকজীবনের চালচিত্র রূপায়ণে এটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যবাহী উপন্যাস।

KvÂbgvjv

শামসুদ্দীন আবুল কালামের KvÂbgvjv (১৯৬০) বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রামীণ লোকমানুষের জীবনপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ভিত্তি করে রচিত উপন্যাস। আঙ্গিকগত বিবেচনায় তেমন উৎকর্ষমণ্ডিত না হলেও পূর্ব-বাংলার নদীসংলগ্ন ভ্রাম্যমান লোকগোষ্ঠীর চালচিত্র বয়ানে লেখকের আগ্রহ এ উপন্যাসের পরিস্ফুট। বেদেদের প্রকৃতিনির্ভর জীবিকানির্বাহরীতি, অস্তিত্বসংগ্রাম, লোকজ বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি মিলেমিশে তাদের সার্বিক জীবনচর্যায় সংযুক্ত করেছে বিশেষ আবহ, যা পূর্ববঙ্গীয় গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়েও স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। এ উপন্যাসে দুটি পৃথক প্রেমকাহিনীকে রূপায়ণে অবলম্বিত হয়েছে বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জীচনচিত্রকে রেখাচিত্রধর্মী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে এ উপন্যাসে দুটি প্রেমকাহিনী রূপায়িত হয়েছে। লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রেমাখ্যান যেভাবে গাথা ও পালাগানে রূপায়িত হয়, অনেকটা সেই আদর্শকে অনুসরণ করেই লেখক এ উপন্যাসে কাঞ্চন ও মালার প্রেমকাহিনীকে প্রতিপাদ্য করেছেন। এর সমান্তরালে রয়েছে মদন-চাঁপার প্রেমাখ্যান। বেদে সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমান জীবনের বিবরণ পদ্মাতীরবর্তী পলাশপুর গ্রাম থেকে শুরু হলেও পরবর্তীকালে ঘটনাসম্পৃক্ত নামহীন একাধিক গ্রাম ও সংলগ্ন স্থানসমূহে তা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ উপন্যাসে বাঙালি গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

১. লোকসংস্কার-- গ্রামীণ লোকসমাজে কোনো প্রয়োজন মেটাতে বা কোনো কাজে সফল হওয়ার জন্য বশীকরণ, গুণ করা, বাটি-চালান প্রভৃতি লোকসংস্কার পরিচিত। সেই সূত্রে গুণীন, বেদে, কবিরাজদের প্রতি গ্রামের নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসে প্রবল ভক্তি ও আস্থা সৃষ্টি হয়। অর্থের বিনিময়ে যে কোনো কাজে সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা এ ধরনের লোকসংস্কার টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে।

১.১. বশীকরণ-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বশীকরণ সম্পর্কিত একাধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ লক্ষণীয়। জনৈক গৃহবধু কালনাগিনীর কামড়ে মৃত্যুবরণ করলে মদন সেটিকে বন্দি করে হাঁড়িতে পোষে মন্ত্রপূতের

মাধ্যমে বশীকরণের প্রয়োজনে। এর অংশ হিসেবে সে মনসা পূজার আয়োজন শেষ হলে সেই রাতের শেষভাগে সেটিকে মন্ত্রে দীক্ষিত করে। তার উদ্দেশ্য ছিল অর্থের বিনিময়ে কারো প্রয়োজন মেটাতে কালনাগিনীকে দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। অনেকদিন ধরেই দুধ-কলা খাইয়ে সে কালনাগিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, যেন শিকারকে চেনামাত্রই সে সেটিকে ছোবল দিতে পারে। তোফেল এবং তারামিঞা জয়গুনকে আয়ত্তে রাখতে মদনের সাহায্য চেয়েছিল। তারামিঞা কাদের মল্লিকের সঙ্গে তার বিবাহিত স্ত্রী জয়গুনের তালাক দেয়ানোর পরিকল্পনা করে। কেননা জয়গুন ও সে পরকীয়া প্রণয়ে আসক্ত। অন্যদিকে, তোফেল কাদের মল্লিকের সম্পত্তি দখলের পায়তারা করে। সেকারণেই তারা জয়গুনের স্বামীকে হত্যার জন্য সাপের বিষ কিনতে মদনের দ্বারস্থ হলে সে তাদের পরামর্শ দেয় মন্ত্রপূত কালনাগিনীর দংশনে তাকে হত্যা করতে। কাঞ্চনকে প্রতিপক্ষ ভেবে মদন সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকত, যেন মালা তার সঙ্গে পালিয়ে না যায়। তবু একপর্যায়ে কাঞ্চন যখন মালাকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে সে বেদেকন্যা নয়, বরং গৃহস্থকন্যা, তখন তারা নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে বেদেবহর ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা জানতে পেরে মদন তাদের নিরস্ত্র করতে মন্ত্রসিদ্ধ কালনাগিনীকে ছেড়ে দেয়।

> মদনের মুখ চোখ হিংস্রভাবে জ্বলিতে লাগিল। ক্রুর হাসি হাসিয়া সে বলিতে লাগিল : সাবাস! এতদিন তোরে দুধ-কলা দিয়া পুষছি, আইজ তার কৃতজ্ঞতা দেখাবার পালা। এই দিনটার জন্য তোর চেকনাই বাড়াইয়াছি কালনাগিনী, তা মনে রাখিস ... কালনাগিনী হাঁড়ির মধ্যে ফনা তুলিয়া দুলিতে লাগিল। মদন তাহার সমস্ত চুল ধুলা মাখিয়া ঝাঁকড়া করিয়া লইল। তার পর একখানা ঔষধি গাছের আঁকাবাঁকা শিকড় লইয়া কালনাগিনীর মস্তকের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া বিড় বিড় করিয়া দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়িতে লাগিল। ... হাঁড়িতে আবার ঢাকনা চাপাইয়া মদন অন্ধকারের মধ্যে আগাইয়া গেল–অনেক দূরে যেন দুইটি ছায়ামূর্তির ছুটিয়া চলা চোখে পড়িল। মদন আর কালবিলম্ব না করিয়া কালনাগিনীকে ছাড়িয়া দিল, যা কালনাগিনী যা, দুইটারেই দংশিবি–তার পর তোর মুক্তি! ... কালনাগিনী মুহূর্ত মধ্যে জঙ্গলের মধ্য দিয়া ছুটিতে শুরু করিল। মদন সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল: সাবাস কালনাগিনী, সাবাস! (পৃ. ২১৬-২১৭)

১.২ জাদু-টোনা করা–– মন্ত্র পাঠপূর্বক কাউকে বশীভূত করার জন্য গুণীনের শরণাপন্ন হবার দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসেও লক্ষণীয়। বিশেষ মন্ত্র পড়ে সেটিকে তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করা হলে উদ্দেশ্য সফল হবে, এরূপ ধারণা লোকসমাজে বহুদিন ধরেই প্রচলিত। কালা ও ধলা দুজনই বেদে। তারা মন্ত্রসিদ্ধ গুণীন হিসেবে পরিচিত। সেকারণে গ্রামবাসী যখন তাদের দ্বারস্থ হয়, তারা সেসব প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট থাকে। সর্পরাজ বাসুকীর নিকট থেকে এ মন্ত্র পেতে তাদের শব-সাধনা করতে হয়েছে। এ মন্ত্রের অলৌকিক গুণ থাকায় মানুষ থেকে দৈত্য-দানব সকলেই বশীভূত হতে বাধ্য। তবে কালা-ধলা মদনের মতো কারো অনিষ্ট সাধনের জন্য এ কাজ করতে অসম্মত। তাছাড়া এ মন্ত্র নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য প্রয়োগ করলে ফল পাওয়া যায় না। গুরুর আদেশে এ মন্ত্র শুধু অন্যের প্রয়োজনেই ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। ধলা কারো পছন্দের মানুষকে সিদ্ধ মন্ত্রে বশীভূত করতে পাঁচ টাকা নিলেও কৌশলী কালা দুই টাকাতেই সেকাজ করতে সম্মত। শুধু কারো ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই নয়, কখনো কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কার্যোদ্ধারের জন্য কালা-ধলা মন্ত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন– অজগরের আক্রমণে কাঞ্চন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ডাক্তার দেখানো জরুরি হয়ে পড়ে। শহরের নামকরা ডাক্তারের বাড়িতে এসে ধরনা দিলেও অপেক্ষমান রোগীদের ফেলে সে কাঞ্চনের চিকিৎসার জন্য সম্মত হয় না। সেই পরিস্থিতিতে কালা ও ধলা বাধ্য হয় তাকে হুমকি দিতে–

> যে কয়েকজন রোগী বসিয়া ছিল, কালা তাহাদের দেখিয়া লইয়া কহিল: আমার রোগীর মত এদের কারোর অবস্থা তেমন কঠিন না। তোমাকে এখুনি যাইতে হইবে। ...ডাক্তার সে কথা যেন গায়ে মাখিল না, কহিল : তা হয় না। ... কালা চটিয়া গেল: দেখো ডাক্তার, খুব হয়। আমরা বাইদ্যা মানুষ, অনেক রকম মন্তর-তন্তর জানি। না যাও যদি, দিমু সাপ চালান করিয়া। দিমু? ... ডাক্তার একটু যেন ভড়কাইল। মনে মনে ভাবিল, বাবা, কি জানি, বেদেদের বিশ্বাস নাই। রোগীদের মধ্যেও একটু গুঞ্জন উঠিল। (পৃ. ১৫৭)

১.৩ বাটি-চালান–– গ্রামীণ সমাজে প্রতিপক্ষকে বশীভূত করতে অথবা চুরি, ডাকাতি সম্পর্কিত ঘটনার জেরে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে বাটি-চালানের দৃষ্টান্ত লোকসংস্কারভুক্ত। এ উপন্যাসে লক্ষণীয়, ডাক্তারের কাছে কালা ও ধলা যখন কাঞ্চনের চিকিৎসার জন্য আসে, তখন গফুর মিঞা সেখানে উপস্থিত ছিল। তার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটায় সে কালা-ধলার সাহায্য নিতে চেয়েছিল লুঙ্গিচোরকে খুঁজে বের করতে। কেননা, তারা গুণীন হিসেবে মন্ত্র, বাটি-চালান, সাপ-চালান প্রভৃতি কাজে পারদর্শী বলে প্রচারিত। বাটি-চালানের মাধ্যমে চোরকে চিহ্নিত করতে তারা সম্মত হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরো ব্যাপারটাই ছিল নিতান্ত প্রতারণা। মন্ত্র পড়ে, চোরকে খুঁজে বের করার অভিনয় হিসেবে নানা ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে গ্রামবাসীর সামনে কালা-ধলা গুণীনের ভূমিকা পালন করলেও এ ব্যাপারে তাদের আদৌ ধারণা ছিল না। ধলা গফুর মিঞার বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে এক হাতে একটি জামবাটি ধরে রেখেছিল। একপর্যায়ে সেটি ঘুরে উঠতেই উৎসুক জনতা উল্লসিত হয়ে ওঠে। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাদের কৌতূহল, উত্তেজনা এবং সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা। ধলার হাতে চাপা বাটি হঠাৎ একটি ঘরের দিকে ছুটে যায়, যে ঘরের বাসিন্দা তোমেজ। এ ঘটনায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং লুঙ্গি চুরির ঘটনা অস্বীকার করে। গফুরের ধারণা, বাটি-চালান যেহেতু সবার সামনেই ঘটেছে এবং বাটি তার দিকেই ছুটে এসেছে, কাজেই তোমেজই লুঙ্গি চুরি করেছে। সে যুক্তি দেখায়, তার লুঙ্গি চুরির ঘটনা দুই গুণীন কালা-ধলা আর তিনজন সাক্ষী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। তোমেজ যদি লুঙ্গি চুরি না করে, তবে সে কীভাবে জানল যে গফুরের লুঙ্গি চুরি হয়েছে? এর প্রত্যুত্তর দেয়া তোমেজের পক্ষে সম্ভব না হলেও সে তার ওপর আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে। অন্যদিকে, এ ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত কালা-ধলা নিছক হঠকারিতাবশত তোমেজের দিকে জামবাটি ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এর পরিণতি যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে, তা তারা আদৌ ভাবেনি। ফলে তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যখন গফুর ও তোমেজের বিবাদ চরমে ওঠে, তারা নিজেদের হঠকারিতার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়–

> ধলা গাঁ গাঁ করিয়া ইঙ্গিতে যেন কহিতে চাহিল: আগে যদি জানতাম তবে বাটি কি ঐ লোকটার দিকে ঘুরাইতাম! চোউখ রাখিস্ চম্পট দেবার পথে। শেষে আমাদের মাথাও দুই ফাঁক করিয়া না দেয়! ... কালা কহিল : পাঁচ-সাত টাকার একখান লুংগির জন্য খামোকা এতোগুলা মানুষের মাথা ফাঁক হইয়া যাওয়া কাজের কথা না মিঞা। আমরা চললাম। বাটি ঘোরা শেষ হয় নাই, এর আগেই এতো চিল্লাচিল্লি–তোমরাই চালান দেও। আমাগো দিয়া হইবে না। –(পৃ. ১৭২)

১.৪ পীর-ফকির-দরবেশ সম্পর্কিত–– পীর-ফকির-দরবেশদের প্রতি বিশ্বাস গ্রামীণ লোকসমাজে বরাবরই প্রবল। এ উপন্যাসে প্রসঙ্গটি স্বল্প পরিসরে উপস্থিত। কাঞ্চন মালার প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে কৌশলে ফকিরের বেশ ধারণ করে মঙ্গল সর্দারের সঙ্গে মেলায় সাক্ষাতের পরিকল্পনা করে। সে একাজে সফল হতে মুখে লম্বা সাদা দাড়ি, গায়ে লাল রঙের লম্বা জামা ও মাথায় লাল টুপি পরিধান করে। যেহেতু মদনের সঙ্গে মালার বিয়ের ব্যাপারে মঙ্গল সর্দার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাই কাঞ্চন আকস্মিকভাবে সে প্রসঙ্গে তাকে জানায়, 'ভাবনা কেন করো বেটা, দিয়ে দাও শাদী, আপনা বেটি তো না!– (পৃ. ২০৭)। তার কথা শুনে মঙ্গল হতবাক হয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলে কাঞ্চন নিজেকে 'খোদার বান্দা' হিসেবে অভিহিত করে। কেননা, মালা যে তার পালিত কন্যা, এ গোপন বৃত্তান্ত কারো জানার কথা নয়। এরপর সেখানে ময়না বিবি উপস্থিত হলে কাঞ্চন তাকে জানায়, মালা ময়না বিবির গর্ভস্থ সন্তান নয় এবং একথা তাদের মুখ থেকে স্বীকার করিয়ে নিতে চায়। কেননা, সে জানত, মালা তার আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধার নিরুদ্দেশ ছেলে ও পুত্রবধুর একমাত্র মেয়ে, যে কিনা শৈশবে এক ফকিরের আস্তানায় যাবার পথে হারিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে মঙ্গল মাঝি ও ময়না বিবি তাকে নদীর চরের একটি নৌকায় কুড়িয়ে পেয়ে নিজেদের মেয়ে হিসেবে প্রতিপালন করে। একপর্যায়ে তার কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তারা অচিরেই ছদ্মবেশী ফকির বা কাঞ্চনের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

১.৫ অন্যান্য–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকমানুষের প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের অন্যান্য দৃষ্টান্ত–

ক. বুড়ী পানসাজা বন্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল তাহার মুখের দিকে! তারপর একগাল হাসিয়া কহিল : কাঞ্চনও নাচগান করছে? ... হ–সক্কলেই তারিফ করতে আছে তার। তোমাগো জামাই নিজে দেখিয়া আইছে, তার কাছেই শোনলাম সব বিত্তান্ত!– ...'তোমাগো জামাই'র অর্থে এখানে করিম খাঁ। আলাপিত সহিত সম্পর্ক বিশেষে গ্রামের মেয়েরা স্বামীর নাম উচ্চারণ না করিয়া 'জামাই' 'ছেলে' বা 'ভাই' বলিয়া উল্লেখ করে। (পৃ. ৩৮)

খ. মানিকের নৌকা ছিল দূরে, সে সেইখান হইতে হাঁকিয়া কহিল : না সর্দার, কিছু বাকি নাই। এইবার রওয়ানা হওয়া যায়। ...তাইলে চলো, বদর, বদর, বলিয়া আল্লা- খোদার নাম লইয়া ছাড়িয়া দেও নৌকা।– (পৃ. ৬৫)

গ. বুড়ীর বাড়ির চালের উপর একটা কাক কা-কা করিয়া বিশ্রী ভাবে ডাকিতেছিল। ... বুড়ী ঘরের দাওয়ায় শুইয়া ছিল নীরবে; কাকের অমন ডাকাডাকি শুনিয়া তাহার মনটা কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় যেন ছাৎ করিয়া উঠিল; সে কাৎ হইয়া কাকটাকে তাড়াইবার জন্য বকাবকি করিয়া উঠিল : মর মর দূর হ!– ...হাতের কাছে লম্বা একটা ছিপ ছিল, সেটা দিয়া উঠানে শুকাইতে দেওয়া মরিচের নিকট হইতে পাখী পাখালি তাড়াইত; সেটাকেও সে কয়েক বার মাটিতে আছড়াইল–কিন্তু কিছুই হইল না। ... বুড়ী আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। মাদুরের ওপর উঠিয়া বসিল সে। মুখে-চোখে একটা অজানা অমঙ্গলের আশংকায় যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। খানিক পরে শিহরিয়া উঠিয়া অস্ফুট কণ্ঠে সে কহিল : হে আল্লাহ, তুমি কাঞ্চনকে দেখিও! (পৃ. ১৫২)

ঘ. বুড়ী দাওয়ার উপর বসিয়া লাঠিখানা পাশে রাখিল; আঁচলে মুখ মুছিয়া কহিল : কারে দিয়া খবর দেই? তাছাড়া ঘরেও আর মন টিকতে আছিল না। তাই ভাবলাম– ... বৈষ্ণবী একখানি মাদুর বিছাইয়া দিল: উঠিয়া বসো নানী, উঠিয়া বসো– বুড়ী উঠিল না : না, লাগবে না। এই ভালো বইছি, আর উঠতে পারমু না। ... এতো কষ্ট করিয়া আইলা, খবরটা কি কও তো নানী? ... কয়দিন ধরিয়া কাউয়াটা ডাকতে আছে ঘরের চালে। শুনিয়া শুনিয়া মনটা কাঁপিয়া ওঠে। খোদাতা'লা মানুষের পরাণে বাসনা কেন দিছে সরলা কইতে পারিস? (পৃ. ১৬৭)

ঙ. ঝোপের মধ্যে এখন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। ...চাঁপা হঠাৎ বলিয়া উঠিল : এই-ই যাঃ! ... কি হইল? ... একটা পেঁচা হঠাৎ বিশ্রী শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। ... চাঁপা গলায় হাত চাপিয়া রাখিয়া কহিল– বোধ করি গলার পুঁতির মালাটা খুলিয়া গেছে– সেই যে যেইটা তুমি আনিয়া দিছিলা। দেখো দিকি লাগাইয়া দিতে পারো কি না– ... কাঞ্চন তাড়াতাড়ি বাঁশী রাখিয়া তাহার আরো কাছে আগাইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্য হইতে পেঁচাটা আবার বিশ্রী সুরে ডাকিয়া উঠিল। ... মালা নৌকায় বসিয়াছিল। ...পেঁচার বিশ্রী ডাক শুনিয়া সেও চমকাইয়া উঠিল। (পৃ. ১৮০)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গ্রামীণ সমাজে পুরুষের প্রতি নারীর সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিনিষেধের রূপায়ণ লক্ষণীয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান বরাবরই পুরুষের আদেশ ও ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। সেখানে নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক কখনোই সমকক্ষতার নয়, বরং নির্ভরশীলতা ও অধীনতার। সেকারণে পরিবারের কর্তা হিসেবে পুরুষের চেয়ে পশ্চাৎপদ নারীর ওপর এ ধরনের নিষেধ আরোপের মাধ্যমে তাকে অবনমিত করার রীতি লক্ষণীয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নদীসংলগ্ন লোকসমাজে প্রচলিত লোকসংস্কার অনুসরণের রীতি বেদেদের আচরণেও লক্ষণীয়। কেননা, জলপথে যাতায়াতকালে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করেন বদর পীর, আর স্রষ্টার নাম স্মরণ করে যাত্রা শুরু করা শুভ, এরূপ ভাবনাসমূহ বহুকাল ধরেই প্রচলিত। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত কাকের ডাককে অমঙ্গল হিসেবে বহুকাল ধরেই লোকসমাজে মান্য করা হয়। কাঞ্চন ঘাসবনে প্রবেশকারী অজগর সাপটিকে ফাঁসে আটকে পরাস্থ করার জন্য লড়ছিল। ঠিক তখন পলাশপুর গ্রামে তাকে আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধার ঘরের চালে কাকের অবিশ্রান্ত চিৎকার তার মনোলোকে তীব্র উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, কাঞ্চন তার ওপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে বেদেদের দলে যোগ দেয়ায় সেই বৃদ্ধার তার প্রতি মমত্বগত শঙ্কা এ লোকসংস্কারের আশ্রয়ে প্রকাশিত। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতি পূর্বের উদ্ধৃতির অন্তর্গত বক্তব্যেরই সম্প্রসারণ, যেখানে বৃদ্ধা তার একাকিত্বকে অতিক্রম করতে সরলা বৈষ্ণবীর নিকট তার অন্তর্গত উদ্বেগ প্রকাশ করে। 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্যাঁচার ডাকের প্রতীকে ঘটে চলা কোনো ঘটনার অন্তরালে উপস্থিত অশুভ, বিপদ ও অমঙ্গলের আভাস সূচিত। কেননা গ্রামীণ লোকসমাজে এরূপ ধারণাই এ সম্পর্কে প্রচলিত। কাঞ্চনকে প্রলুব্ধ করতে চাঁপার প্রণয়াভিনয় যে মালা-কাঞ্চনের প্রেমের পরিণতি বা বিয়েতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, সেই ইঙ্গিত এ ঘটনায় প্রতিফলিত।

২. লোকসাহিত্য–– বেদে সম্প্রদায়ের পরিচর্যিত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন সৃষ্টিশীল শাখার পরিচয় এ উপন্যাসে অনুপস্থিত। কোনো কোনো ঘটনা ও সংলাপে চকিতে দুয়েকটি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হলেও তাতে এ সম্প্রদায়ের চেতনালোকের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে লোকবাদ্য ও লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে তাদের সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যেমন, মঙ্গল মাঝি বেদেদলের সর্দার হিসেবে যে বহর গড়ে তুলেছে, সেখানে নাচ-গান ও বাদ্যে পারদর্শী ব্যক্তিদের সমাদর রয়েছে। কেননা, এটিও তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অবলম্বন। পবন মাঝির বৃত্তান্তে ব্যাপারটি অনুধাবন করা যায়।

> ছইয়ের ভিতরে অন্ধ বাপ পবন মাঝি একটু আগেই তানপুরাটা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। এই পবন মাঝি আসলে বেদের দলের লোক নয়। নামটাও দেওয়া মঙ্গল মাঝির। বছর ছয়েক আগে মঙ্গল মাঝিই তাহাকে দলে জুটাইয়া লইয়াছে। সে ছিল আসলে এক গান-পাগলা ফকির কিসিমের মানুষ। গানের নেশায় সমর্পিত চিত্ত। অন্ধ হইয়া বেঘোরে পড়িয়াছিল। তখন (মেয়ে) চাঁপার নাচ দেখাইয়া গান শোনাইয়া সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। ... মঙ্গল মাঝিরও স্বার্থ ছিল অবশ্য। পবন মাঝির মেয়েকে ওস্তাদী গানের তালিম দিবার পরিকল্পনা ছিল তাহার। তাহার সেই ইচ্ছা সার্থকও হইয়াছে। তাহা ছাড়া চাঁপার নাচ-গান দলেরও দাম বাড়াইয়াছে বৈকি। ...পবন মাঝি ... খুব ভোরে উঠিয়া অভ্যাসমত তানপুরা হাতে লইয়া বসে। ... মেয়েকে-ছেলেকে সে যেন ঠিক মনমত করিয়া শিখাইতে পারে নাই, কিন্তু মালাকে ছাত্রীরূপে পাইয়া সে বড়ই খুশী। মালা যখন শিখিতে বসে, তাহার দেহের অসামর্থ্য তখন যেন তুচ্ছ হইয়া যায়। তাহার তালিম গ্রহণে মালার দ্রুততা এবং গলার সুর শুনিয়া সারা মুখ তাহার হাসি-খুশিতে ঝলমল করিয়া ওঠে। (পৃ.২-৩)

প্রিয়তম স্ত্রীকে হারিয়ে বিয়োগব্যথায় কাতর কালার কাতরতা প্রকাশিত নিচের লোকগীতিতে–

আরো মোর নওদারিটা মরিয়া

মোর সে হইছে হানি

আঁধার ঘরেতে শুইয়া থাকোত

পড়ে চোউক্ষের পানি

পড়ে টাপপাস কি টুপপুস করিয়া ... (পৃ. ৪৯)

ঢাকা শহর দেখার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে কালা ও ধলা যে সঙ্গীত পরিবেশন করে, তা শুনে মঙ্গল মাঝির দলের সদস্যদের সঙ্গে সিকু মাঝির দলের সদস্যরাও উল্লসিত হয়ে ওঠে–

দেখিয়া আইলাম ঢাকার শহর

সে বড় আজব জাগা ভাই

হেথায় লাখে লাখে দালান-কোঠা,

মানুষ গাড়ির সংখ্যা শুমার নাই।– ...

বাহান্ন হাজার তিপান্ন গলি

সে যেন ভাই গোলক ধাঁধার চাক

Dhaka University Institutional Repository

হদিশ যদি না রয় জানা, বুঝলা

দুই দণ্ডেই হইবে তোমার গোমর ফাঁক!! ...

কোথায় কল টিপলে পানি পড়ে

বোতাম ছুঁইলে বাতি।

সন্ধ্যাকালে বাইসকোপ দেখে

খাঞ্জা খানের নাতি।। ...

ঐ যে কইলাম লাখে লাখে দালান-কোঠা

মালিক যারা তার

তিন শো টাকা মায়না পায়, তবু দালান হাঁকায়

আহা, কেমন চমৎকার!!

এক জমিদার গিয়া আইছে আরেক জমিদার

কেহ বলে 'সাহেব' তাগো কেউ বা বলে সার!

তারা চলে মটর গাড়ী, পথের মালিক যেন তারাই

ঘাঁটতে পথে লাগে ডর, জানটারে না হারাই।।

আহা, আর যে পরীর নাহান মাইয়াগুলা

কেমন চিকন-চাকন গা

ধলা দেখিয়া উদাস হইল, কয় আমি

আর ফিরিয়া যামু না। (পৃ. ১২২-১২৩)

মঙ্গল সর্দারের দল থেকে বিতাড়িত হয়ে কাঞ্চন পলাশপুরে ফিরে আসার পথে অন্ধ ভিখারী কানু ও তার মেয়ে টুনির অবারিত সাহায্য ও সেবা পেয়েছিল। কানাই কাঞ্চনের বিড়ম্বিত জীবনের মর্মকথা জেনে তার অসুস্থতার প্রতিকারার্থে উদ্যোগী হয়েছিল। সে এ প্রসঙ্গে যে লোকগীত গেয়েছিল, তাতে নিহিত রয়েছে জীবনের চলার পথে মোহের দ্বারা বিভ্রান্ত হলে স্রষ্টার নাম স্মরণ করে তার প্রতি ভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে প্রতিকূলতা অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষা।–

ওরে মন মিছে তুই ভাবিস কেন অকারণ

সব ভাবনার ভাবুক যে জন, নে রে তুই তারই শরণ।

এ দুনিয়ায় যা হবার তা হবেই

ভাগ্য যে রে আপনি এসে করবে তোরে বরণ। (পৃ. ১৮৮)

গ্রামীণ সমাজে বাঁশের বাশিঁর মনোহর সুরের আবেদন বিশেষভাবে সমাদৃত। এ উপন্যাসে লক্ষণীয়, কাঞ্চন বাঁশের বাঁশি বাজাতে পারদর্শী। তার কণ্ঠে ধ্বনিত সুরের মূর্ছনা মালাকে আকুল করে বলেই রাতের অন্ধকারে সবাইকে এড়িয়ে সে কাঞ্চনের কাছে ছুটে আসে। কাঞ্চনের প্রতি তার বিমুগ্ধতা সৃষ্টিতে বাঁশির সুরের ভূমিকা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমানুষঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

> বাহিরে মালাও শুনিতেছিল সেই বাঁশির সুর। তাহারও চোখে ঘুম ছিল না। শুইয়া শুইয়া সে নানা ভাবনার ফাঁকে কাঞ্চনের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটিও নিজের অজ্ঞাতে ভাবিতে শুরু করিয়াছিল। এমন সময় কানে গেল সেই বাঁশির সুর। অনেকক্ষণ সে শুনিল। তাহার মনে হইল কে যেন মনের সমস্ত আকুলতা সেই বাঁশির সুরে ঢালিয়া দিয়াছে। এক অজ্ঞাত সহানুভূতিতে তাহার মনের ভিতরটাও গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। ... মালা উঠিয়া ঝোপের পাশে গেল। তারপর আরেকবার পিছন ফিরিয়া সকলের নিদ্রিত অবস্থাটা দেখিয়া লইয়া সেই বাঁশির সুর লক্ষ্য করিয়া আগাইয়া গেল। (পৃ. ৫৪-৫৫)

পবন মাঝিও তার বাঁশির সুরে বিমোহিত হয়। প্রথমদিন বাঁশিবাদকের সঙ্গে পরিচিত না হলেও এরপর আরেকদিন কাঞ্চনের পরিবেশিত বাঁশির সুরে আকৃষ্ট হয়ে সে তার সঙ্গে পরিচিত হয়। এরপর সে নিজেই যেচে কাঞ্চনকে প্রস্তাব দেয় ওস্তাদী সঙ্গীত শেখার জন্য।

বাঁশি শুধু লোকবাদ্য হিসেবেই গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত নয়। লোকখেলনা হিসেবেও বালকদের নিকট এর কদর রয়েছে। বাঁশির এক প্রান্তে বেলুন লাগিয়ে ফোলালে যে আওয়াজ সৃষ্টি হয়, তা বালকবালিকাদের আকৃষ্ট করে। এ উপন্যাসে লক্ষণীয়, কালা মধুকে মেলা থেকে এ খেলনা কিনে দিয়েছিল।

৩. লোক-উৎসব-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকজীবনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিচয় প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, যেখানে সমষ্টিমানুষের অংশগ্রহণে উৎসবমুখরতার রেশ প্রতিধ্বনিত। সাপের খেলা দেখার আসরে বেদেদের নৃত্য-গীত-বাদ্যের জমকালো উপস্থাপন, মনসাপূজার আয়োজন, পুঁথিপাঠের আসর প্রভৃতি অনুষ্ঠানে লোকজীবনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হয়।

৩.১ সাপের খেলা দেখানোর আসরে নৃত্য-গীত-বাদ্যের আয়োজন-- বেদেদের জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন পদ্ধতির অন্যতম হলো নৃত্য-গীত বাদ্যযোগে দর্শকদের মনোরঞ্জন। এ উপন্যাসের 'ছয়' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, পলাশপুর গ্রামের বড়মিঞার বাড়িতে মঙ্গল মাঝির বেদেদলকে সাপের খেলা দেখানোর নিমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই খেলা পরিসমাপ্ত হলে কাঞ্চন, মালা ও মদনের অংশগ্রহণে নৃত্য-গীত-বাদ্যের জলসা বসে। মদন মাদল গলায় ঝুলিয়ে বাজনা বাজাতে শুরু করামাত্র মালা সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘুঙুরের তালে, নাচের ঝঙ্কারে আসরে নতুন আবেশ সৃষ্টি করে। তার নৃত্যপটুতার পরিচয় পাওয়া মাত্রই দর্শকরা উল্লসিত হয়ে বাহবা জানায়। এরপর মদনের বাবরি চুলের ঝাঁকুনিতে মাদলের বোলের বিস্তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মালার উদ্দাম নৃত্য দর্শকদের তীব্র উত্তেজনা ও শিহরণযোগে নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তবে অচিরেই আসরের দৃশ্যপট বদলে যায় কাঞ্চনের উপস্থিতিতে। মালা বারবার তার চারপাশ ঘিরে নাচতে নাচতে একপর্যায়ে টেনে আসরের মাঝে নিয়ে তাকে ঘিরে উদ্দামভাবে নাচতে শুরু করে। ব্যাপারটা মদনের ভালো না লাগায় সে মাদল থামিয়ে দিতে গিয়েও মঙ্গল সর্দারের আদেশে তা বাজানো অব্যাহত রাখে। কাঞ্চন মালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচতে দ্বিধান্বিত হলেও দর্শকদের উৎসাহে অবশেষে সে এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। কবিগানের আসরে নাচের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অভিনন্দিত কাঞ্চন পুনরায় এ আসরেও সংবর্ধিত হয় দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়, এমনকি মঙ্গল সর্দারের দলেও স্থান করে নেয়।

> মালার পায়ে যে ছন্দ বাজে, কাঞ্চনের পায়ে বাজিয়া ওঠে তাহারও বেশি। মালা উদ্ভাবন করে নূতন ছন্দের, কাঞ্চন দিতে থাকে তাহার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর। দর্শকদের মধ্যে 'সাবাস' সাবাস ধ্বনি উত্থিত হয়। বড়মিঞা তাহার চেয়ারে নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

Dhaka University Institutional Repository

> মালা বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল। মঙ্গল মাঝিও খুশি মনে দেখিতেছিল। কালা-ধলাও কাঞ্চনের নাচ দেখিতে লাগিল একমনে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি লইয়া। ... অবশেষে এক সময় নাচ শেষ হইল।
>
> দর্শকেরা তারিফে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। (পৃ. ৩৪)

৩.২ মনসাপূজা--এ উপন্যাসের 'চব্বিশ' পরিচ্ছেদে মনসা পূজার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। তিনটি ছোট নদীর মোহনায় অবস্থিত তালতলী নামক গঞ্জে মঙ্গল সর্দারের বহর যখন ভেড়ে, সেখানে পূর্বপরিচিত সিকু বেদের দলের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা সম্ভবত হিন্দু বলেই মনসাপূজার আয়োজন করে, যাতে মঙ্গল সর্দার ও তার দলের সদস্যরাও অংশ নেয়। কাঞ্চনের নিকট ব্যাপারটি বিস্ময়কর বিবেচিত হয়েছিল।

> মনসা পূজায় মঙ্গল মাঝির আগ্রহ দেখিয়া সে একটু অবাকই হইয়াছিল। বেশ কয়েক দিন হইয়া গেল তাহার বেদেদের দলে। কিন্তু এখনও যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না উহাদের। ধর্মে উহারা মুসলমান, মঙ্গল মাঝিকে নামাজ পড়িতেও দেখে, আবার মনসা পূজাও করে নাকি! (পৃ. ১২২)

মনসা পূজা উপলক্ষে নাচ-গানের জলসা ও আমোদের ব্যবস্থা হয়। মঙ্গল মাঝি এ আয়োজনে অংশ নিতে কাঞ্চনকেও আহ্বান করে। মনসাপূজার ক্রিয়াকর্ম শেষ হবার পর গানের আসর বসে। সেখানে সিকু মাঝি মালাকে অনুরোধ করে গান শোনাতে। পবন মাঝিও সেই আসরে উপস্থিত হয়, তানপুরা বাজাতে। মালা সেই গানটি নৃত্যযোগে পরিবেশনের একপর্যায়ে কাঞ্চনও তাতে অংশগ্রহণ করে। তাদের সমবেত পরিবেশনায় গানের সুর, তাল ও আবেদন অচিরেই আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের বিমোহিত করে বলে তারা 'সাবাস' ধ্বনিতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। মালা ও কাঞ্চনের মধ্যে এক গোপন প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকে, সুরের পরীক্ষায় অন্যকে অতিক্রম করার জন্য। এর ফলে গানের আসরে চমক ও উত্তেজনাপূর্ণ আবহ সৃষ্টি হয় বলে শ্রোতারাও তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

> গান শেষ হইবার পর সিকু মাঝি কহিল : মাঝি, এইবার বুঝলাম, এতো নাম-যশ হইছে কেন তোমার দলের। রত্ন, বুঝলা নি, ঐ ছেলেটা, তোমার মাইয়া, রত্ন, বুঝলানি, খাঁটি রত্ন। আর ওস্তাদের কথা! ধন্য তার শিক্ষা, ধন্য!– ...সকলে সমস্বরে তাহার কথার প্রতিধ্বনি তুলিল। (পৃ. ১৩৬)

৩.৩ পুথিপাঠের আসর-- গ্রামীণ লোকসমাজে পুঁথিপাঠের প্রচলন বহুকাল ধরেই রয়েছে। এ উপন্যাসের 'নয়' পরিচ্ছেদে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ লক্ষণীয়। গ্রামে বেদেদের আগমন উপলক্ষে 'গাড়ুলী' পুথি পাঠের আয়োজন করা হয়। কাঞ্চন নিজেও সুর করে পুথি পাঠে অভ্যস্ত।

> ক. সেই বাড়িতে পুঁথি পড়ার আসর জমিয়াছে। কাঞ্চন দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া কিছুটা শুনিল। ... বাড়িটা মাজেদ মুন্সীর। খুবই পরিচিত তাহার। ইচ্ছা হইল একবার সে-ও গিয়া বসিয়া পড়ে। সম্ভবত, গ্রামে বেদেদের আগমনই তাহাদের আজ 'গাড়ুলীর' পুঁথি লইয়া বসিতে উৎসাহিত করিয়াছে। ... পুঁথি পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। তাহার পড়া-পুঁথি। যে পড়িতেছে, তাহার পড়া ভাল নয়। কাঞ্চন তাহার তুলনায় অনেক ভালো করিয়া পড়িতে পারিত। (পৃ. ৪৫)
>
> খ. পুঁথির আসরেও মন বসাইতে পারিল না কাঞ্চন। খানিক পড়ার পরেই আর ভালো লাগিল না। ... মাজেদ মুন্সীর ছেলে মোতালেব বলিল : তোমারে যেন একটু চঞ্চল মালুম হইতে আছে!– ... কাঞ্চন কহিল : আপনারা পড়েন কেউ, আমার ঠিক জুৎ লাগতে আছে না। ...তখন আরেক জন পড়িতে শুরু করিয়াছিল। (পৃ. ৫২)

৪. লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি-- এ উপন্যাসে বেদেদের জীবিকানির্বাহপদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিবিধ প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে, যাতে তাদের লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তিগত ধারণা প্রতিফলিত। বিশেষত সাপ ধরা ও সংগ্রহ, সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসা ও সাপের বিষ সংগ্রহ করা, সাপ প্রতিপালন ও পরিচর্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের ধারণা থেকে বিষয়গুলো অনুধাবন করা যায়। মদন কাঞ্চনের ওপর কালনাগিনীকে লেলিয়ে দিলে সেটি তাকে একপর্যায়ে দংশন

করে। মঙ্গল মাঝি এর চিকিৎসা করার পাশাপাশি কাঞ্চনকে অভয় দিয়ে যে অভিমত জানায়, তাতে নিহিত রয়েছে বেদেবৃত্তি সম্পর্কে দীর্ঘদিনে অর্জিত তার অভিজ্ঞতার নির্যাস–

> বাদ্যাদের এমন সাপের কামড় অনেক খাইতে হয়। দুইদিন পর তোমারও গা-সওয়া হইয়া যাইবে। তবে যে যত সাবধান আর পাকা, তার বিপদ তত কম। আসল কথা কি জানো, সাপের স্বভাব বুঝতে হয় আগে। এক এক সাপের এক এক রকম ব্যাভার। আবার সময়-বিশেষ তা-ও বদলায়। বয়স বিশেষও। সেই সব খতাইয়া বোঝা দরকার। আর সাপ ধরা বলো, বিষদাঁত ভাঙ্গা বলো, কি তারে লইয়া খেলাই বলো, সকলের উপরে রপ্ত করা দরকার কৌশল। যত কৌশলা হবা, চতুর হবা এ কাজে তত বেশী হইবে তোমার ওস্তাদী, বুঝলানি?– (পৃ. ৯)

কীভাবে বিষাক্ত সাপকে বশীভূত করতে হয়, এ উপন্যাসের 'সতেরো' পরিচ্ছেদে সেই বিবরণ রয়েছে।

> কালা তাড়াতাড়ি একখানা লাঠি জোগাড় করিয়া দিল তাহার হাতে। বাঁ হাতে সেই লাঠিখানা লইয়া মদন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সঙ্গে যেন কাল-নাগিনীর সঙ্গে খেলায় মাতিয়া উঠিল। ... লাঠিখানা কাল-নাগিনীর দিকে বাড়াইয়া দিলে সে যেন ক্রোধে গর্জিয়া সোজা হইয়া ওঠে, প্রায় আধ হাত পরিমাণ লেজের উপর ভর দিয়া সমস্ত শরীরটাই শূন্যে তুলিয়া দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ ছোবল মারে। এরকম বার কয়েক ছোবল দিবার পরে যখন সাপটা একটু শ্রান্ত হইয়া উঠিল, ... মদন ছোবল দেওয়া নাগিনীর মাথাটা লাঠি দিয়া মাটির সঙ্গে চাপিয়া ধরিল। ... আরেকটা লাঠি, আরেকটা– ...মানিক তৈয়ার ছিল লাঠি লইয়া, তাড়াতাড়ি মদনের হাতে দিল। ... সেই লাঠি দিয়া নাগিনীর লেজটা চাপিয়া ধরিল মদন' (পৃ. ৮২-৮৩)।

মদন কাল-নাগিনীকে পুষবে বলে এর বিষদাঁত ভাঙতে সম্মত ছিল না। কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটার শঙ্কাবশত মঙ্গল মাঝির আদেশে অবশেষে তাকে কালনাগিনীর বিষদাঁত ভাঙতে হয়–

> মদন যেন একটু ক্ষুণ্ন হইল, মুখ ফিরাইয়া কহিল : বেশ তাইলে একটা বর্তন পাতো নীচে। ... একটা মাটির বর্তন আনা হইল। ... নাগিনীর মাথাটা তাহার উপরে নিয়া মুখটাকে কৌশলের সঙ্গে হাঁ করাইল মদন, তারপর বাঁ হাতের লাঠির সঙ্গে এক ঘষায় বিষ দাঁত দুইটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ...সর্দার উঁকি দিয়া সাপের মুখটা ভালো করিয়া দেখিল, তারপর কহিল: এখনই ঐ দুধের বাটিতে চুবাইয়া ধর মাথাটা। ... একটা দুধের বাটি আনা হইয়াছিল আগে। গ্রামের সেই গুণীন কহিয়াছিল, তাহার মন্তরে সাপ খোপ হইতে বাহির হইয়া রোগিনীর বিষ শুষিয়া সেই দুধের বাটিতে উগরাইয়া দিবে। সেই বাটিতে নাগিনীর মুখটা চুবাইয়া বারবার নাড়িয়া, টিপিয়া দিল মদন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুধটা নীল হইয়া গেল। (পৃ. ৮৪)

অজগর সাপকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করার যে বিবরণ উপন্যাসের 'ত্রিশ' পরিচ্ছেদে রয়েছে, তাতে বেদেদের লোকপ্রযুক্তিগত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গল মাঝির কাছে পাশের গ্রামের জনৈক বাসিন্দা এসে খবর দেয়, মস্ত বড় এক অজগর গ্রামের বাসিন্দাদের হাঁস, মুরগি, ছাগল খেয়েছে। এরপর সেটি জঙ্গলে ঢুকলে গ্রামবাসী লেজা ও বল্লম নিয়ে সেটিকে তাড়া করে। এমতাবস্থায় সেটিকে ধরার জন্য মঙ্গল মাঝিকে খবর দেয়া হয়। যে ঘাসবনে সাপটি লুকিয়ে ছিল, সেখানে অচিরেই বেদেদলের লোকজন ও গ্রামবাসী সমবেত হয়। মঙ্গল মাঝি একটি লম্বা লাঠি নিয়ে ঘাসবনের ভেতর সাপটির অবস্থান লক্ষ করে। সেটিকে ঘিরে ফেলে মঙ্গল মাঝি কয়েকটা মরিচ পুড়িয়ে সাপটির দিকে ছুঁড়ে দেয়। এর ধোঁয়ায় ঘাসবনে সামান্য আলোড়ন উঠলেও সাপটা বাইরে আসেনি। মঙ্গল মাঝি ঘাসবনের একদিকের কাদায় ভরা ঢালু জমিতে লাঠি পিটিয়ে সেদিকে সাপটিকে বের করার চেষ্টা চালায়। লেজার আঘাতে সাপটি হত্যার পরিবর্তে মঙ্গল মাঝি সেটিকে জ্যান্ত ধরতে একটি মুরগি জোগাড়ের আহ্বান জানায়। একখণ্ড শক্ত মাটির সঙ্গে মুরগিটিকে বেঁধে লাঠি দিয়ে ঘাসবনের প্রান্তে সে সেটা ঠেলে দেয়। তারপর নীরবতার সঙ্গে ধৈর্যের পরীক্ষা চলে। একসময় মুরগিটি প্রাণভয়ে ভীত হলে মদন লাঠির মাথায় তারের ফাঁস পরায়। কাঞ্চন মঙ্গলের অনুমতি নিয়ে সাপটি ধরতে প্রস্তুত হয়। কেননা মদন বারবার তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, সে সাপটি ধরতে পারলে মালাকে পাবে, তার প্রতি মদনের আর দাবি থাকবে না। মঙ্গল কাঞ্চনকে জানায়, অজগরকে একা ধরা কারো পক্ষে অসম্ভব। সে যেন লাঠি আর ফাঁস নিয়ে প্রস্তুত থাকে, মুরগিটাকে ধরার জন্য সাপটি ছোবল দেবার পূর্বমুহূর্তে সেটির গলা আটকে ফেলার জন্য। তারপর সকলে মিলে সেটিকে প্রতিহত করবে। একটু পর সাপটি মুরগিটিকে গ্রাস করলেও কাঞ্চনের পক্ষে সেটি ফাঁসে আটকানোর সুযোগ হয়নি। অনতিবিলম্বে

সর্দারের পরামর্শে মানিক ও কালা লাঠি দিয়ে ঘাসবনে আঘাত করে সাপটিকে তাড়া করে। একপর্যায়ে কাঞ্চন সাপটির মাথা ফাঁসে আটকে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা সারা ঘাসবনে তোলপাড় তোলে। সেটির প্রচণ্ড টানে কাঞ্চনের দেহের সমস্ত পেশী ফুলে ওঠে। মদন তাকে বিভ্রান্ত করতে বল প্রয়োগের পরিবর্তে ঢিল দেয়ার কথা বললে সে সেভাবেই বাঁধন হালকা করে। এর ফলে কালা তাকে সতর্ক করার আগেই সাপের প্রচণ্ড টানে কাঞ্চন ঘাসবনের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কাঞ্চন একপর্যায়ে সাপটিকে ফাঁসে আটকে সর্দারকে অনুরোধ জানায় ফাঁসের দড়ি ধরে টেনে সেটিকে বের করার জন্য।

> কালা ইতিমধ্যে ধলার দেওয়া ফাঁসটা আটকাইয়া ফেলিল অজগরের গলায়। সে ফাঁসের সঙ্গে মোটা দড়ি। কালা-ধলা এবং জনতারও দুই একজন তাহা ধরিয়া সাপটাকে টানিয়া ধরিল। ফলে একটুক্ষণের মধ্যেই সাপটাকে ঘাসবনের বাহিরে টানিয়া আনা গেল। কাঞ্চনের দেহ হইতে সাপটা তখনও প্যাঁচ ছাড়ে নাই, সুতরাং সাপের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও বাহির হইয়া আসিল। মঙ্গল মাঝি একটা বল্লম লইয়া সুযোগ খুঁজিয়া সাপের লেজটা মাটির সঙ্গে গাঁথিয়া ফেলিল। (পৃ. ১৪৮)

৫. লোকচিকিৎসা-- বেদেদের জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা, কেউ অসুস্থ হলে বা পাগল হয়ে গেলে তাকে তুকতাক, গুণ বা মন্ত্র দিয়ে ঝেড়ে সুস্থ করে তোলা, কবিরাজের শরণাপন্ন হয়ে ভেষজ চিকিৎসা গ্রহণ প্রভৃতির উল্লেখ এ উপন্যাসের একাধিক দৃশ্যে লক্ষণীয়। 'সতেরো' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, গ্রামের এক গৃহবধু মুরগির খোপ থেকে ডিম বের করার সময় তার হাতে কালনাগিনী কামড়ায়। তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসে বেদেদের খবর দেয়। মঙ্গল মাঝি সেখানে পৌঁছে গৃহবধুকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে। ইতোমধ্যে তার সারা শরীর বিষের প্রভাবে নীলবর্ণ ধারণ করে, মাথার চুল উঠে যায়। এক গ্রাম্য গুণীন নানারকম তুকতাক করেও বিষ নামাতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ রোগীর ক্ষতস্থানের পাশে কোনো বাঁধন না দেয়ায় বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

> হে মা মনসা, হে রসুল, হে দেশ-বিদেশের পাঁচপীর–মান রাখিও আমার গুরুর।– ... ধুপ জ্বালাইয়া, মাথার চুলে ছাই মাখিয়া উলুন-ঝুলুন করিয়া একটা ছুরি পোড়াইয়া ক্ষত স্থানটা চিরিয়া দিল মঙ্গল মাঝি, লাগাল বিষ পাথর। করিল তাহার যাহা কিছু করার, যত তাহার বিদ্যা–কিন্তু ব্যর্থ হইল সব। ঘণ্টা তিনেক চেষ্টা করিয়াও রোগিনীর জ্ঞান ফিরিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সমস্ত শরীর তাহার হিম হইয়া গেল, হাতে ধরা মাত্র মাথার চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। (পৃ. ৮২)

এ উপন্যাসের 'চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, টিয়াবিবি চাঁপাকে পাগল বানানোর জন্য পিঠায় বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছিল। কেননা, চাঁপা তার ছেলেকে ভালোবাসলেও এতে টিয়া বিবি বা মদনের সমর্থন ছিল না। সে চাঁপার পরিবর্তে মালাকেই বরাবর পছন্দ করেছিল মদনের পুত্রবধু হিসেবে। মদন চাঁপাকে প্রলুব্ধ করে কাঞ্চনকে ফাঁদে ফেলে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গল সর্দারের দল থেকে বিতাড়িত করেছিল। সে বৃত্তান্ত চাঁপা মালাকে জানিয়ে দিলে এর প্রতিকারার্থে টিয়া বিবি তাকে পাগল বানাতে বিষমিশ্রিত পিঠা খাওয়ায়। একপর্যায়ে কালা ব্যাপারটি অনুধাবন করায় সে সেটির অবশিষ্টাংশ তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। কেননা, ইতোমধ্যেই চাঁপা অসংলগ্ন আচরণ করছিল। সে ঘোরের বশে টিয়া বিবিকে শাশুড়ি হিসেবে সম্বোধন করছিল। পিঠা খেয়ে একসময় সে নেশাগ্রস্তের মত প্রলাপ বকে–'শাশুড়ী আমারে পিঠা দিছে খাইতে–হি হি হি!' (পৃ. ২০২)। কালা তাকে সুস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। দুদিন পর বেদেবহর মহকুমা শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রাম্য হাটে আয়োজিত ছোট মেলার একপাশে বেদেরা আসর পাতে। কালা মেলায় এসে এক গ্রাম্য ওষুধ বিক্রেতার নিকট হতে নানা গাছ-গাছালি দিয়ে তৈরি করা ওষুধ কেনে, যা খেয়ে চাপা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়।

৬. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে–

> ক. আমি এই চাল কুমড়ার মোরব্বাটুক আনছিলাম কালাচাঁদের জন্য, তুমিও খাইও। ঝোলার মধ্যে হইতে একটা মোটা শিশি বাহির করিয়া বুড়ীর সম্মুখে রাখিল বৈষ্ণবী। বুড়ী তাকাইয়া দেখিল, তারপর হাত বাড়াইয়া কাছে নিল।

: কুলের আচার খাওয়াইছিলা তুমি, তার স্বাদ এখনো আমার মুখে লাগিয়া আছে। ঐ দেখো, এবার আমিও কুল শুখাইতে দিছি!– ...

বৈষ্ণবীর মুখেও হাসি ফুটিল : এ মোরব্বাও তুমি খাইও নানী, (পৃ. ১৯)

খ. কাঞ্চন ... পথের এক দোকান হইতে দুই পয়সার খই চাহিয়া লইয়াছিল, কোঁচড়ে রাখিয়া তাহা চিবাইতে চিবাইতেই সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। (পৃ. ৩৫)

গ. কি ভাগ্য আমার সকাল বেলা তোমার মুখ দেখলাম, দুটো চিড়া-মুড়ি খাইয়া যাও– ...বৈষ্ণবী তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে একটা বাটিতে করিয়া মুড়ি আর নাড়ু লইয়া আসিল। (পৃ. ৫৮)

ঘ. ময়না-বিবি পিঠা তৈয়ার করিতেছিল। মালাকে কয়েকবার সাহায্যের জন্য ডাকিল। ... একটা ঝুনা নারিকেল দেখাইয়া বলিল : ঐটা এট্টু কোড়াইয়া দে। (পৃ. ১২৬)

ঙ. দূর হইতে দেখা গেল মালা তাহার মাকে পেয়াজি' ভাজায় সাহায্য করিতেছে। (পৃ. ১৩৩)

চ. বৈষ্ণবী উঠিয়া গেল : কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এক বাটি পানি আর কয়েকটা নাড়ু আনিয়া রাখিল বুড়ীর সামনে (পৃ. ১৬৮)

হুঁকায় তামাক সেবনের রীতি গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত থাকলেও এ উপন্যাসে শুধু মঙ্গল মাঝিকেই এ অভ্যাসে আসক্ত হতে দেখা যায়––

মঙ্গল মাঝি আস্তানায় ফিরিয়া আসিয়া নানা টুকিটাকি কাজ করিয়াছে এতোক্ষণ; এইবার হুঁকাটা হাতে লইয়া ময়না বিবির কাছে আসিয়া বসিল। কলকিতে আগুন লইয়া কহিল : চাঁদপুরে কেনা তামাকটা এখনো বানানিয়া হয় নাই, ময়না, না? ... ময়না বিবি মৃদুকণ্ঠে কহিল : না। ... মঙ্গল মাঝি হুঁকায় টান দিতে যাইয়া কহিল : এ কয়দিনে বানানিয়া উচিত আছিলো। ... ময়না বিবি তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল : তা আছিলো। কিন্তু বানায় কেডা? ... আর কাউরে দিলে তো পারতা? ... কারে দিমু? যে যার লইয়া ব্যস্ত। আমি ছাড়া করবে কেডা আর? ... মঙ্গল মাঝি নীরবে হুঁকা টানিতে লাগিল। (পৃ. ৪৭)

৭. লোকপরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা–– বেদে নারীদের বিশেষ ধরনের সাজসজ্জা ও প্রসাধনাকলা তাদের জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। যেহেতু তারা নেচে-গেয়ে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে সচেষ্ট থাকে অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে, তাই মনোহর পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার প্রতি সচেতনতা তাদের পেশাদারিত্বেরই অংশ। অন্যদিকে, তাদেরকে প্রদত্ত উপহাররাশির মধ্যেও সাজসজ্জার বিভিন্ন উপকরণের উল্লেখ লক্ষণীয়। কালা-ধলা ঢাকা শহর থেকে বেদে দলের সদস্যদের জন্য যেসব উপহার কিনে নিয়েছিল, সেই তালিকাতেও এসব সামগ্রীর প্রাধান্য ছিল। এ উপন্যাসে মালা ও চাঁপার সাজসজ্জার বর্ণনায় বিষয়টি প্রকাশিত–

(চাঁপা) সবুজ শাড়িখানা সুঠাম দেহে জড়াইয়া খোঁপায় বুনোফুল গুঁজিয়া রাখিয়াছে। (পৃ. ২)

সাপের ঝাঁপি, চুরির সাজি লইয়া পাঁচ ছয়জন মেয়ে-পুরুষ চলিয়াছে কোথায়! মালাও রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে। সে-ও তাহাকে দেখিতে পাইল। ... কাঞ্চন আগে তাহাকে যেমন দেখিয়াছিল, এখন তাহা হইতেও মনোহর দেখাইতেছিল তাহাকে। সুঠাম দেহটিতে তিনটি কাজ করা লাল-পাড় বসানো একখানা উজ্জ্বল সবুজ রঙের শাড়ী পরিয়াছে পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া, গাঁয়েও একটি আঁটো সাঁটো লাল রঙের জামা। সেই রঙের মধ্যে গৌরবর্ণের দেহশ্রী যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া কাঁচা সোনার মত ঝলকাইতেছে। খোঁপা বাঁধিয়াছে একটি তেরছা করিয়া, তাহাতে লাল জবা গোঁজা। গলায় রূপার ভারী হাঁসুলী, হাতে কঙ্কন। শাড়ী পরিয়াছে ঈষৎ উঁচু করিয়া, পায়ের অনাবৃত অংশ যেন শঙ্খের মত সাদা, তাহাতে পরিয়াছে রূপার খাড়ু। বেশে, ঢঙে, রঙে. স্বাস্থ্যে এমন রূপসী বেদেনী থাকিতে পারে, এ যেন কাঞ্চনের কল্পনাতেও ছিল না। (পৃ. ২৬-২৭)

চাঁপা আগাইয়া গেল। পরনে হলদে ডোরা শাড়ী, কপালে লাল টীপ। সে আজ মনোহর রূপে সাজিয়াছে। কোথা হইতে বেল ফুল সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিয়া পরিয়াছে খোঁপায়। (পৃ. ১৭৯)

Dhaka University Institutional Repository

৮. লোকক্রীড়া–– এ উপন্যাসে লোকক্রীড়া হিসেবে ভেলকিবাজি বা জাদুর খেলা এবং সাপের খেলার উল্লেখ রয়েছে। পলাশপুর গ্রামের বড়মিঞার বাড়িতে মঙ্গল সর্দারের বেদেদলকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এসব খেলা দেখানোর জন্য। সেখানে কালা ও ধলা উপস্থিত হয়ে খেলা প্রদর্শনের শুরুতেই সমবেত দর্শকদের উদ্দেশ্যে সালাম জানিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। এরপর তারা যে ভঙ্গিতে আসরে উপস্থিত হয়, তা দেখে দর্শকদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় বাড়তে থাকে। তারা মূল খেলা পরিবেশনের পূর্বেই যেভাবে ভেলকিবাজ হিসেবে নিজেদের বৃত্তান্ত উপস্থাপন করে, তা তাদের প্রতি দর্শকদের মনোযোগও আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত গায়ের বর্ণ ও শ্রবণগত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে ধলার নামের গড়মিল এবং নিজের স্বভাবগত চপলতা সত্ত্বেও কালার নামকরণ সম্পর্কিত গালগল্প দর্শকদের আমোদিত করে––

> একজন দর্শক কহিল : এমন পাতিলের কালির মতো রঙের মানুষ যদি ‘ধলা’ হয় তাইলে তোমাগো কালা মিঞা না জানি কেমন। ... কালা একমুখ হাসিয়া কহিল : জ্বে, এই আমার মতো। আমার নাম কালা মিঞা। ... দর্শকদের বলিতে শোনা গেল : এ যে উল্টা ব্যাপার হে। ধলা মিঞা তো তোমারই নাম হওয়া উচিত ছিলো। ... কালা কহিল : জ্বে, আমিই আসলে ধলা ছিলাম। ওই যে এখন তারে দেখেন, একটা আস্ত শয়তান। এক নৌকায় থাকি আমরা। একদিন বিহানে উঠিয়া দেখি আমি কালা হইয়া গেছি। ব্যাটা আমার রঙ চুরি করিয়া ওর রঙ আমারে দিয়া গেছে। ... তাই হয় নাকি কখনো! ... কালা কহিল: হয় হয়। কইলাম না একটা আস্ত শয়তান ও, নানান রকম মন্তর জানে। ও কি কেবল নিজের রঙ চুরি করে! মন্তর দিয়া এর রঙ ওরে লাগায়, ওর রঙ তারে। তাও কি কেবল শরীলের! মনের রঙ লাগায় নানান মনে। ও লোক সহজ না। সে সব মন্তরের কথা জানতে চান যদি কেউ, খেলার শেষে আসবেন একলা একলা সব বলমু। এখন থাউক সে সব কথা। যা কইতেছিলাম– তা ভাবলাম রঙই যখন গেল তখন আর নাম রাখিয়া কি করি। নামটাও দিয়া দিলাম ওরে। এই হইল নামের কেচ্ছা। (পৃ. ৩০)

এরপর বড়মিঞার আদেশে বেদেরা সাপের খেলা দেখাতে শুরু করে। টিয়া বিবি সাপের ঝাঁপি খোলে। মঙ্গল সর্দারের ইঙ্গিতে চাঁপা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীআশ্রিত গান পরিবেশন করে। টিয়া বিবি ঝাঁপি থেকে নাগরাজ, দুধরাজ, শঙ্খচূড়, কেউটে, গোখরা সাপ প্রভৃতি বের করে ছেড়ে দেয়। দর্শকরা সাপ দেখে ভীত হলেও চাঁপার গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিয়া বিবি ধুয়া ধরে। মদন সাপের খেলায় টিয়া বিবিকে সাহায্য করে। টিয়া বিবির ঝাঁপি থেকে বের করা সাপগুলোকে সে দর্শকদের নিকট থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখে। একপর্যায়ে প্রকাণ্ড এক অজগরকে দেখে দর্শকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ উপন্যাসে ভেলকিবাজির উল্লেখ রয়েছে ‘পনেরো’ পরিচ্ছেদে। ভেলকিবাজ হিসেবে নিজেরে পারদর্শিতা দেখিয়ে কাঞ্চনকে আয়ত্তে আনতে কালা এ খেলায় অংশ নেয়।

> কালা বলিতেছিল : যাদুর খেলা জানো কিছু, যাদুর খেলা? ঐ যাকে শহরে কয় মেজিক। জানো কিছু? ... সে বিষয়ে একমাত্র লোক এই কালা! আমি যা জানি, তেমন আর কোনো বাদ্যার দলে পাবা না, বুঝলা? ... একটা টাকা নিশ্চয়ই আছে, দেখো না কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া ... এখন দেখো, আমার বাম হাতে তোমার নোট ডাইন হাতে আমার। আমি মন্তর দিয়া কয়েকটা জোর পাক দিমু, কিন্তু দুই হাত ছোঁয়ামু না, তাতে তোমার টাকা উড়িয়া যাইবে, আর আমার টাকা দুইটা হইয়া যাইবে। ... দুই হাতের মুঠায় দুইখানা নোট লইয়া এক হাতের উপর দিয়া আরেক হাত খুব দ্রুত পাকাইল কয়েকবার। ... কালা সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের মুঠ খুলিয়া দেখাইল। কাঞ্চনের নোট যে হাতে ছিল সে হাত ফাঁকা; অন্য হাতে ছিল কালার নোটখানা– সেখানা স্বাভাবিকই দুইখানাতে পরিণত হইয়াছে। কাঞ্চন যেন অবাক হইয়া গেল। (পৃ. ৬৯-৭০)

এরপর কাঞ্চন যখন তার টাকা ফেরত চায়, তখন কালা তা অস্বীকার করে জানায়, ‘তোমার টাকা তো যাদুতে উড়িয়া গেল, স্বচক্ষে দেখছো, এ তো আমার টাকা’ (পৃ. ৭১)। তখন কাঞ্চন তার নিকট থেকে দুটি নোট কেড়ে নিয়েই ভেলকিবাজি দেখায়। সে দুটি নোটের ভাঁজ খুলে এক হাতে নিয়ে মুঠো করে কুড়ি পর্যন্ত গুনতে গুনতেই সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। কালা হতবাক হয়ে যায় তার এ কাণ্ড দেখে। অবশেষে কাঞ্চন তাকে জব্দ করে কালার কানের ভেতর থেকে দুটো নোট বের করে নিজেরটা রেখে অন্যটা তাকে ফেরত দিয়ে।

৯. লোকভাষা–– এ উপন্যাসের কুশীলবরা পদ্মাতীরবর্তী গ্রামীণ লোকমানুষের অন্তর্গত ভ্রাম্যমান বেদে সম্প্রদায় হলেও তাদের অবলম্বিত লোকভাষা উপন্যাসটিতে অনুসৃত হয়নি। লেখকের বর্ণনায় সাধু গদ্যরীতির গতানুগতিক প্রয়োগ, তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার থাকলেও এর সঙ্গে পাত্রপাত্রীদের সংলাপে প্রযুক্ত আঞ্চলিক ও দেশজ কথ্য শব্দভাণ্ডারের যথাযথ সমাবেশ ঘটেনি। কেননা, সাধু গদ্যভঙ্গি তাদের সংলাপে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেছে। কখনো কখনো আঞ্চলিক ও লোকজ কথ্য শব্দের উল্লেখ সত্ত্বেও কোনো বিশেষ ভৌগোলিক সীমাভুক্ত লোকগোষ্ঠীর প্রচলিত ভাষার প্রভাব এতে পড়েনি। তবে কালা-ধলার সংলাপে প্রযুক্ত ব্যঙ্গ, হাস্য-কৌতুকের প্রয়োগ কোনো কোনো দৃশ্যে সরসতা ও মাধুর্য সঞ্চার করেছে। স্বল্পসংখ্যক বাগধারার ব্যবহার এ উপন্যাসে লোকভাষার প্রয়োগে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি।

প্রাকরণিক বিভিন্ন দুর্বলতা KvÂbgvjv উপন্যাসের আদ্যন্ত ছড়িয়ে থাকলেও বেদে সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অনুধাবনে এর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। তাদের জীবিকানির্বাহরীতি, অস্তিত্বসংগ্রাম ও ভ্রাম্যমান জীবনপ্রবাহের নানা দিক বাঙালি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবু নিজস্বতার বিবিধ সাক্ষরও তাদের চেতনালোকে সন্নিহিত ভাবনা-সংবেদনা, আবেগ ও সৃষ্টিশীলতায় প্রকাশিত হয়। গোষ্ঠীভুক্ত লোকমানুষের ঐক্যবদ্ধতা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সকলের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিকতা, প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনধারার অনুসরণ – আদিম কৌমবদ্ধ যাযাবর মানুষের উত্তরাধিকারকে তারা একালেও যে বহন করে চলেছে, এসব বৈশিষ্ট্য তারই সাক্ষ্যবহ। সেই বিবেচনায়, KvÂbgvjv বেদে লোকগোষ্ঠীর জীবনচিত্রণে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিভুক্ত উপন্যাসের ধারায় অবশ্যই প্রতিনিধিস্থানীয়।

RvqR½j

শামসুদ্দীন আবুল কালামের জায়জঙ্গল (১৯৭৮) উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগর-উপকূলবর্তী হিংস্র শ্বাপদসংকূল অরণ্যভূমি সুন্দরবন। নদীময় সমতল ভূমিনির্ভর জনজীবন ও লোকালয়ের প্রেক্ষাপটে তিনি ইতোপূর্বে একাধিক উপন্যাস লিখলেও এ উপন্যাসে তাঁর শিল্পদৃষ্টি একান্তই সভ্যতার আলোবঞ্চিত অরণ্যনির্ভর লোকগোষ্ঠীকে ঘিরে আবর্তিত। জীবনধারণের প্রয়োজনে, প্রিয়জনদের নিয়ে জীবিকানির্বাহের তাড়নায় তাদের প্রতিনিয়তই অবিরাম লড়াই চালিয়ে যেতে বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, মহামারী, খরা, লবণাক্ততা প্রভৃতি বৈরী ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে। পাশাপাশি এ অরণ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন হিংস্র জীবজন্তু, সরীসৃপ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব তো রয়েছেই। অস্তিত্বসংগ্রামে উত্তীর্ণ হবার লড়াইয়ে অনবরত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এ লোকগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনাখ্যান এ উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। আদিম অরণ্যময় প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজেদের আয়ত্তে আনার যে অদম্য অনুপ্রেরণা, তা এতদঞ্চলের লোকমানসে গড়ে তুলেছে বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস-সংস্কার, রীতিনীতি, সামাজিক অনুশাসন, আচার-অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ভাবনা প্রভৃতি, যা সার্বিকভাবে তাদের লোকজচেতনাকেই পরিস্ফুট করে। বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষা দক্ষিণাঞ্চলের অবারিত অরণ্য ও পলিমাটিসঞ্জাত উর্বর ভূমিতে বসতি গড়ে তোলা লোকগোষ্ঠীর অকৃত্রিম চালচিত্র এ উপন্যাসে যেভাবে ফুটে উঠেছে, এর নজির বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় বিরল। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান বিদ্যমান। এগুলো হলো লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, লোকচিকিৎসা, লোকপ্রযুক্তি ও লোকভাষা।

১. লোকসংস্কার–– এ উপন্যাসে সুন্দরবনের অরণ্যচারী লোকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের উল্লেখ লক্ষণীয়। যুগ যুগ ধরে প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনযাপনের ফলে তাদের মধ্যে নানা অলৌকিক, অতিলৌকিক

ধারণা গড়ে ওঠে। প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হলেও এর সুরাহা না হওয়ায় তারা নিজেরাই কখনো এসব ধারণা গড়ে তোলে, আবার কখনো কখনো লোকসমাজে প্রচলিত নানা ভাবনা, ধারণা তাদের প্রভাবিত করে। যেমন, জয়নাল শেখ ও তার স্ত্রী হালিমন ছয় বছরের দাম্পত্য জীবনে নিঃসন্তান বলে একটি সন্তান লাভের জন্য তারা বেদে, ওঝা, ফকিরের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে তুকতাক, তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রপড়া পানি, জড়িবুটি, শিককরবাকর, টোটকা প্রভৃতির দ্বারস্থ হয়। শুধু তারাই নয়, তাদের পরিচিত অনেকেই শত্রু বশীকরণ, মামলায় জেতা ও অন্যান্য বৈষয়িক প্রয়োজনেও এদের শরণাপন্ন হয়। বাস্তবে এর কোনোরূপ কার্যকারিতা যে নেই, তা প্রতীয়মান হয় জয়নাল শেখ ও হালিমনের জনৈক ভণ্ড ফকিরের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ঘটনায়। অন্যদিকে, জনৈক বেদেনি সন্তানসম্ভবা হালিমনকে দেখে অনুমানবশতই এ প্রসঙ্গ তাকে জানায়, যদিও সে এজন্য হাত দেখে ভাগ্য নির্ণয়ের উল্লেখ করে। হাতের রেখায় মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ থাকে, গ্রহরাজি মানুষের ভাগ্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, বাঙালি সমাজে প্রচলিত এরূপ লোকবিশ্বাসকে ভিত্তি করেই জনৈক বেদেনি হালিমন ও সাজুকে বশীভূত করতে সচেষ্ট হয়। সে পুরো ব্যাপারটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হালিমনের বাম হাতের তালুতে সন্নিহিত রেখাগুলো দেখে এবং জানায়, 'ভাগ্য-ভবিষ্যৎ পরীক্ষার জন্য ঐ বাম হাতটারই দরকার বেশি। ... ঘর-গৃহস্থালির কামে-কার্যে ডাইন হাতের রেখাগুলান যেন ক্ষয় হইয়া যায়। দেখেন, দুইটা হাতই মিলাইয়া। কোনো মিলই নাই' (পৃ. ৯৪)। এভাবেই সে হালিমন ও সাজুর আস্থা অর্জন করে। আবার ভয়ংকর শ্বাপদসংকুল অরণ্যে শিকার আহরণ করতে গিয়ে বা কোনো বুনো জন্তু বা সরীসৃপ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, এমনকি কোনো দুর্ঘটনায় অপঘাতে যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার আত্মা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। এরপর সে নিজের অপমৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সদা সচেষ্ট থাকে এবং সুযোগ পেলেই জঙ্গলে আগত মানুষকে কৌশলে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এ ধরনের লোকবিশ্বাসের উল্লেখও এ উপন্যাসে রয়েছে। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর অরণ্যে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর মধ্যে যে নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত, তারও মূলে উপর্যুক্ত লোকসংস্কারসমূহ সক্রিয়। পাশাপাশি এ উপন্যাসে পূর্বোল্লিখিত লোকসংস্কারসমূহের সঙ্গে এতদঞ্চলে প্রচলিত নানা লোকসংস্কারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষণীয়। বলাবাহুল্য, সমষ্টিমানসে প্রচলিত নানা লোকবিশ্বাসকে যখন প্রাত্যহিক জীবনের কল্যাণ–অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ বিবেচনা থেকে গণ্য করা হয়, তখন এসব লোকসংস্কার গড়ে ওঠার যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যায়। অরণ্যচারী লোকগোষ্ঠীসমূহের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম ও জীবিকার সঙ্গে সাগর, অরণ্য, জীবজন্তু, পশুপাখি, লতাপাতা সবকিছুরই অঙ্গাঙ্গী যোগসাজশ রয়েছে। সেকারণেই জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল, স্বস্তিকর অবস্থাকে স্থায়ী করার পাশাপাশি যাতে বিপদ, প্রতিকূলতা ও শঙ্কাকে দূরে রাখা যায়, তেমন তাগিদ থেকেই লোকগোষ্ঠীভুক্ত বাসিন্দারা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে। যেমন, সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্যময় স্থানে সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি বলেই একে প্রতিহত করতে হিন্দুদের মধ্যে মনসা দেবীর প্রতি ভক্তি ও পূজা-অর্চনার প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু একই মনস্তত্ত্ব তার প্রতিবেশী মুসলমান ব্যক্তির মধ্যেও যে সম্প্রসারিত হয়, এর উদাহরণ এ উপন্যাসেও লক্ষণীয়।

> এই যে মানুষ এইখানে নানান দেব-দেবীর আবিষ্কার করছে, তাগো খুশি রাখনের জন্য নানা রকম পূজা-উপঢৌকন দেয়, আমরা তা না মানিয়া বোধ হয় ঠিক করতে আছি না। এর ফলাফল ভালা হইবে না। ... তালেব একটুকাল চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর বলিল : অসভ্য জংলীগো সংস্কার-কুসংস্কার আমাগোও যে মানিয়া চলতে হইবে তেমন কোনো কথা নাই। আমরা মোছোলমানের জাত। ... আহা, আমি সে কথা তোলতে আছি না। আমার কথাটা হইলো যে আবহমান কাল ধরিয়া এইখাসে বসবাস কাজ-কামের খাতিরে যেইসব আচার-বিচার গড়িয়া উঠছে, তারে এক্কেবারে উপেক্ষা করিয়া যাওন ঠিক হয় না। যেমন ধরো মনসা দেবীর কথা। ... মোছোলমান হইয়া তার পূজা করণ লাগবে? ... মিকু তাড়াতাড়ি বলিযা উঠিল : তা কই না। কিন্তু মাচানের তলায় তাগো উদ্দেশে একভাণ্ড দুধ রাখিয়া দিয়া সন্তুষ্ট রাখন তো যায়! (পৃ. ৪১)

তেমনিভাবে দক্ষিণরায়ের পূজা প্রচলিত বাঘকে সন্তুষ্ট করতে, মনসাদেবীর পূজা সর্পকুলের উদ্দেশ্যে, ওলাবিবি ও শীতলাদেবীর পূজা করলে বসন্ত ও কলেরা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে, কুমিরব্রত কুমিরের আক্রমণ থেকে

রক্ষার জন্য বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। শুধু তাই নয়, ধর্মীয়ি ও লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের সমুদয় অনিষ্ট ও বিপদ, ক্ষয়ক্ষতির কারণ হিসেবে শয়তান, অশরীরী, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং এসবকে প্রতিহত করতে বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে ওঠা অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতিনীতিকে বহুযুগ ধরেই বংশপরম্পরায় পালনের প্রচেষ্টা আগ লোকসংস্কারেরই অংশ। এরই সঙ্গে যুক্ত হতে পারে একেক লোকগোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষের মধ্যে সংগোপনে পরিচর্যিত গুপ্ত বিদ্যা ও ধর্মীয় অনুশাসন চর্চার ঝোঁক, যার উদ্দেশ্য বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার এবং অন্যকে বশীভূত করার আকাঙ্ক্ষা। এজন্য পুরোহিত, ওঝা, ফকির, সন্ন্যাসীদের শরণাপন্ন হবার প্রবণতা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য নিতান্তই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, শক্তিধর হিসেবে পরিচিত এ শ্রেণির মানুষের সকল শর্ত পূর্ণ করা না হলে তাদের দেয়া হুমকি ও অভিশাপের পরিণতিতে জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে, এরূপ ভাবনা থেকেও সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য হয়। এসব আচরণ লোকসংস্কারেরই অংশ। ভর দুপুরবেলায় হালিমন যখন শান্ত মনে ঘরের কাজকর্ম সেরে আনমনে কাঁথা সেলাইয়ে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ করে বাড়ির চালে কাকের উৎকট চিৎকারে তার হাতে সুই ফুটে যায়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। ননদ সাজুকে সে বিষয়টি জানিয়ে বলে, বাড়ির বয়স্কদের নিকট থেকে সে শুনেছে, এরকম ঘটনা গৃহস্থের জন্য অকল্যাণকর। কোথাও বিপদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ ঘটনায়, এমনটাই হালিমনের ধারণা। কোনো যুক্তি দিয়ে এ ঘটনার সুষ্ঠ মীমাংসা সম্ভব নয়। শুধু ভরদুপুরকে ঘিরেই নয়, বরং ভোরবেলা ও সন্ধ্যালগ্নকে ঘিরেও নানা সংস্কার বাঙালি সমাজে প্রচলিত। লালু খাঁর জবানিতে এরূপ ঘটনার উল্লেখ লক্ষণীয়––

> লালু খাঁ হাঁক দিয়া থামাইল : সবুর, তালেব, সবুর। এই লগ্ন আর চাঁদ-হলকের সময় খুবই খারাপ। জন্তু-জানোয়ারেরা সব-সময় তার ভেদাভেদটা ঠাহর করতে পারে না। সেই ডাঙ্গার দেশে থাকতেই আমার বাপ এইরকম সময় বুনা শুওরের মুখে পড়ছিল। ... সেই ডাঙ্গার প্রায় এই জঙ্গলের মতোই আছিলো। আমার বাপজানের যেন সকল জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করার অভ্যাস হইয়া গেছিলো। একবার গেছে গাঙপাড়ে জাল দিয়া মাছ ধরতে। এইরকমই এক বিহান-কালে। গাঙের চরে জোয়ারের পানি। তার মধ্যে জালের ক্ষেপ দিয়া চলছে। এমন সময় কোথা থেকিয়া কুমির আসিয়া খপ করিয়া ধরলো ঠ্যাঙ কামড়াইয়া আর কিছু বুঝিয়া ওঠার আগেই দিলো গহীন পানির দিকে দৌড়। বাপজানের উপস্থিত বুদ্ধি আছিল সাংঘাতিক। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে দুই হাতের দুই আঙুল বসাইয়া দিলো কুমিরের দুই চৌখে। কুমির সঙ্গে সঙ্গে তারে ছাড়িয়া পলাইল। সেই কামড়ের ধকল লইয়া বুড়া সারাজীবনই খোড়া হইয়া আছিলো। (পৃ. ৬৮)

কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে দিব্যি দেয়া, পণ রক্ষা বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার প্রবণতা বাঙালি নারীসমাজে সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। এ উপন্যাসেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় হালিমান ও সাজুর আচরণে। প্রায় সমবয়সী এ দুই নারীর সম্পর্ক দুই সখীর মতোই অন্তরঙ্গ। ফলে হালিমন কখনো কখনো বিবাহযোগ্য সাজুর জন্য মিন্নত আলীকে নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা করলে সে মাঝেমধ্যেই ক্ষেপে ওঠে। তখন হালিমন তাকে দিব্যি দেয় পুনরায় সে এ ধরনের আচরণ করে সাজুকে বিব্রত করবে না। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সে দিব্যি ভুলে পুনরায় অনুরূপ আচরণ করলে তখন সাজু তাকে দিয়ে কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় বাধ্য হয়ে–

> হালিমন হাসিয়া উঠিল চাপাস্বরে : হইছে, হইছে! তা হইলে গায়গতরে কষ্ট দিয়া লাভ নাই। আয়, খাইতে আয়, ওঠ! ... সাজু তবুও গড়িমসি দেখাইল। ... হালিমনকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সাজুও ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। একটা প্রদীপের আলোর কাছে খাইতে বসিয়া সাজু চাপাস্বরে বলিল : কেবল একটা কড়ার দিতে হইবে ভাবী, ঐ মানুষটার বিষয় লইয়া তুমি আর আমারে খোঁচা দিবা না। ... বড়ো মাটির বাসনের ওপর ভাত বাড়িয়া দিতে দিতে হালিমন তাহার দিকে একবার দ্রুত দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিল : বেশ, বেশ, তাই হইবে! ... না, কড়ার দেও। কিরা করো। ... দিলাম। করলাম কিরা। তুই আর মুখটা অমন করিয়া থাকিস না। আমি কষ্ট পাই। (পৃ. ৭৯)

২. লোকসাহিত্য–– এ উপন্যাসে সুন্দরবনের লোকগোষ্ঠীর পরিচর্যিত লোকসাহিত্যের উপাদানসমূহের মধ্যে প্রবাদ ও লোককথার উল্লেখ লক্ষণীয়–

২.১ প্রবাদ

পায়ের তলায় মাটি, আর বৈঠার তলায় পানি না পাইলে আউগান যায় না। (পৃ. ২৫)

কথায় বলে যুদ্ধ করে রাজ-রাজড়া, প্রাণ হারায় নল খাগড়া। (পৃ. ৩৪)

সামনে যেটা সমূহ, সেইটাই সাচ্চা। (পৃ. ৩৯)

সাবধানের মাইর নাই। (পৃ. ৪১)

অভাবে স্বভাব যায় (পৃ. ৬২)

জীব দিছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। (পৃ. ৬৩)

যতো কাজ, ততো সাজ (পৃ. ৬৯)

যেমন দেশ, তেমন চলন আর তেমন তাগো বেশ ধরন। (পৃ. ১২১)

হাতি ঘোড়া গেল তল, এখন মশা বলে কতো জল। (পৃ. ১৩০)

২.২ লোককাহিনী-- বিভিন্ন লোককাহিনীও সুন্দরবনের লোকগোষ্ঠীসমূহের চিন্তায়, মনস্তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এসব কাহিনী যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে প্রচলিত এবং পারিপার্শ্বিক জীবনবাস্তবতা, নীতিশিক্ষা, হিতোপদেশ ও সাংসারিক অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে। সভ্যতার আলোবঞ্চিত নিরক্ষর বুনো স্বভাবের লোকগোষ্ঠী প্রাত্যহিক জীবনপ্রণালি, সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও বংশগত ঐতিহ্যকে কীভাবে আত্মস্থ করে, এসব লোককাহিনী অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেই বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অন্যের সমস্যার প্রতিকারের জন্য জনৈক মহৎহৃদয় ব্যক্তির সংসার ছেড়ে অরণ্যবাসী হওয়ার আখ্যানে ফুটে উঠেছে মানুষের আদিম যূথচারী স্বভাবের ইতিবৃত্ত, যেখানে প্রতিনিয়তই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সমষ্টিজীবনের প্রতি আগ্রহ লক্ষণীয়। অরণ্যবাসী সাধু সাংসারিক চাহিদা, প্রাত্যহিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে পারেনি বলেই তাকে সেখানে গিয়ে পুনরায় সংসারধর্মই পালন করতে হয়েছে। নিত্যদিনের জীবনপ্রবাহে নানা বাধা-বিপত্তি, চাহিদা, অনটন আর স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়েই মানুষকে অন্তর্লোকে সঞ্জাত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হয়, সবাইকে ছেড়ে একাকী জীবনযাপনের সাধনা যে আদৌ কোনো মহৎ উপলব্ধি জাগাতে পারে না, এমন নৈতিক শিক্ষা এ গল্পের প্রতিপাদ্য। রূপকথার কল্পলোকের বৃত্তান্ত তাদের ভাবনায়, আচরণে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, এর দৃষ্টান্ত নিচের গল্পটি। বাস্তব জীবনে শক্তিমত্ত, আধিপত্যশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠীর দ্বারা দিনের পর দিন নির্যাতিত, শোষিত হবার নির্মম অভিজ্ঞতাসূত্রে এ কাহিনী তাদের কাছে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয় রূপকথার দৈত্য-দানবের সঙ্গে ভাবসাদৃশ্যে–

> মিকু মনের কথাগুলি গুছাইয়া লইতে চেষ্টা করিল; তারপর তালেবের তাড়ায় বলিল : ছোটোকালে একটা কিস্সা শোনছিলাম। কোন দৈত্য না শয়তান না কী আমাগো–এই মানুষের পরাণ-পাখিটারে এক্কেবারে ক্ষুদ্দুর একটা রূপ দিয়া কোনখানে লুকাইয়া রাখছে। ...সেই যে পরাণ-পাখির কথা কইলাম, তা লুকাইয়া রাখছে দৈত্য-দানবরা। এখন তা ফিরাইয়া না পাইলে তো আর মানুষের শান্তি নাই! সেই থেকিয়া মানুষ কেবলই তার সন্ধানে এই ভুবনের উথালপাতাল করতে আছে। পাহাড়-পর্বতে, গাঙে-সমুদ্রে, জঙ্গলে-হাওরে মানুষ তন্নতন্ন করিয়া তার সন্ধান করতে আছে। যে-রাগ লইয়া মানুষ এইখানে গাছে কুড়াল মারে তা দেখিয়াও আমার মনে কয় সেই রাগটাও যেন ঐ দৈত্য-দানবগো ওপর : যে-জোর লইয়া লাঙলের হাল চাপিয়া ধরে, তা-ও যেন সেই তাগিদ লইয়াই। (পৃ. ৬১)

আবার শৈশবে মা ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে শোনা রূপকথাগুলোতে লুকিয়ে থাকে আদিম অরণ্যচারী মানুষের যথেচ্ছ কল্পনা ও অবচেতনলোকে সন্নিহিত সৌন্দর্যবোধের বিচ্ছুরণ, যা মনোমুগ্ধকর বিবরণে আশ্রিত রূপক ও প্রতীকের আড়ালে ভাষ্যরূপ পায়। জনমানবশূন্য নির্জন পাতালপুরীতে বেড়াতে গিয়ে সেখান

মণিমাণিক্যশোভিত রাজপ্রাসাদে অবস্থানরত রাজ-রানী, রাজপুত্র ও রাজকন্যা, অমাত্য, পাইক- পেয়াদা, প্রহরী, দাস-দাসীদের যাদুমন্ত্রে পাথরের মতো নিশ্চলভাবে কালক্ষেপণ লোকগোষ্ঠীর অভিযাত্রিক মনোভঙ্গি ও কৌতূহলী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি অতীতলোকের অজানা রহস্য উন্মোচনে আগ্রহ প্রকাশের ইঙ্গিতবহ।

৩. লোকচিকিৎসা-- এ উপন্যাসের একাধিক দৃশ্যে লোকচিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। যেহেতু সুন্দরবনের অরণ্যচারী মানুষেরা আধুনিক সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই প্রাত্যহিক জীবিকা নির্বাহ ও খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে তাদের অরণ্যের ওপরই নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের গাছপালা-লতা-গুল্ম সম্পর্কে ধারণা অর্জনের মাধ্যমে তারা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা, রোগ-বালাই বা জখম হওয়া, বন্য জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হলে এর প্রতিকার করে। বয়োবৃদ্ধ লালু খাঁ এ বিষয়ে অন্যদের শেখায়। বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের চাষাবাদ, সেগুলোর বীজ ও মূল সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং জরুরি প্রয়োজনে তা প্রয়োগের ব্যাপারে লোকজ্ঞানের উপযোগিতা যে অনস্বীকার্য, তা অনুধাবন করা যায় এ সংলাপে– 'দেহের কাটা জায়গায় কচুডালের রস দিলে কেমন করিয়া রক্তপাত বন্ধ, এমনকি ব্যথা পর্যন্ত দূর করা যায়, সর্দি-কাশি কী জ্বরে তুলসী কী নিমপাতার রস কী উপকার করে, আদা এবং কাঁচা হলুদের কী ব্যবহার, কোনটার সঙ্গে কী অনুপান মিশাইলে কী ফল হইবে তাহা সবই যেন লালু খাঁর নখ-দর্পণে ছিল' (পৃ. ৫৫)। এমনকি কেউ পেটব্যথায় আক্রান্ত হলে কোনো পথ্য গ্রহণ ছাড়াই সমুদ্র উপকূলবর্তী কাদা পেটে মেখে রোদে শুয়ে থাকলেও যে এর প্রতিকার সম্ভব, তা লালু খাঁর বক্তব্যে জানা যায়। মিন্নত আলী যখন অজ্ঞান অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে ছিল, তখন জোঁক তার সারা শরীরের রক্ত চুষে নিয়েছিল। এমতাবস্থায় লালু খাঁ সঙ্গীদের জানিয়েছিল তুঁতের মলম ও লবণ জোগাড় করার জন্য। জোঁকগুলো ছাড়াতে সে চিমটা ও খেজুরের কাঁটা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিল। মিন্নত আলীর শারীরিক জখম প্রতিকারের জন্য ক্ষতস্থানে বাটা মরিচ, লতিকচুর রস ও গাঁদাফুলের গাছ বেটে রস তৈরি করা হয়েছিল। তার মাথার ঘায়ে প্রথমে লতিকচু ও গাঁদাপাতার রস লাগিয়ে এরপর মরিচের বাটার পুরু প্রলেপ দেয়া হয়। এর ফলে প্রবল জ্বলুনিবশত মিন্নত আলীর জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরতে থাকে এবং নিয়মিত ভেষজ চিকিৎসার পরিণতিতে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে সাপের কামড়ে আহত ব্যক্তির চিকিৎসাপদ্ধতিও বিবৃত হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। একটি জাত শঙ্খচূড় লালু খাঁকে কামড়ে দিলে তার বাম হাতের কবজির ওপরে ক্ষতস্থানে ধীরে ধীরে আভাসিত হয় দুটি ছোট রক্তবিন্দুর মতো কালচে দাগ। জয়নাল শেখ দ্রুত কনুইয়ের ওপর মাথার গামছা খুলে কষে বাঁধন দেয়, যেন বিষ শরীরের উপরিভাগে ছড়াতে না পারে। লালু খাঁর শরীর বিষমুক্ত করতে একটি ধারালো দা আগুনে পুড়িয়ে ক্ষতস্থান চিরে দেয় জয়নাল। মিকু সেই জখম থেকে কালচে রক্ত মুখ দিয়ে শুষে ফেলে দেয়।

৪. লোকপ্রযুক্তি-- এ উপন্যাসে অরণ্যচারী বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অনুল্লেখিত হলেও তাদের পেশা ও জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন অনুষঙ্গ বিবৃত, যা থেকে তাদের মানসলোকে সঞ্জাত লোকপ্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাওয়ালীরা কীভাবে মৌমাছিদের বসতি তথা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে, এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। সাধারণত বড় গাছের উঁচু ডালে মৌমাছিরা মৌচাক গড়ে তোলে। সেগুলো মধুতে পরিপূর্ণ হলে ভারে অবনত হয়ে পড়ে। বাওয়ালীরা মৌচাক কাটার জন্য দিনের শেষবেলায় তালের ডোঙায় খাল-বিল পেরিয়ে সেই নিবিড় অরণ্যে হাজির হয়। তারা সারা শরীরে পুরু কাঁথা অথবা চটের আচ্ছাদন জড়িয়ে মশাল হাতে নিয়ে গাছ বেয়ে ওপরে ওঠে। নীরবে মৌচাকের কাছে গিয়ে মশালে আগুন ধরিয়ে মৌচাকের চারদিকে উড়ন্ত মৌমাছিদের তাড়িয়ে দেয়। মৌচাক কাটার পর তারা দড়ির সাহায্যে মাটির ওপর অপেক্ষারত সঙ্গীর হাতে সেটি সাবধানে নামিয়ে দেয়। মৌমাছির দল তাদের আক্রমণ করতে এলে তারা মশালের আগুন দিয়ে সেগুলোকে পুড়িয়ে আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং সেখান থেকে দ্রুত সরে যায়।

৫. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে লেখক সচেতনভাবেই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনসমাজে প্রচলিত লোকভাষা প্রয়োগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যে সচেতন ছিলেন, এর সাক্ষ্য রয়েছে উপন্যাসের পাঠকদের

উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভূমিকায়। কুশীলবদের মনস্তত্ত্ব, ভাবনা ও চারিত্রিক প্রবণতার আদলে গড়ে ওঠা ব্যক্তিক অবয়বকে পাঠকের নিকট বাস্তবের প্রতিমূর্তি হিসেবে আবেদন সঞ্চারের তাগিদে লেখক এ ধরনের নিরীক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন বলে ধারণা করা চলে। তবে এ ভাষায় প্রাত্যহিক আলাপের ভঙ্গিতে কথ্য রীতির পরিবর্তে সাধু রীতি অনুসৃত হওয়ায় কুশীলবদের আলাপের স্বতঃস্ফূর্ততা ও গতিময়তা কখনো কখনো বিঘ্নিত হয়।

৫.১ শব্দভাণ্ডার

ক্রিয়া– ফুঁড়িয়া, ফাঁপাইয়া, তাড়াইয়া, খেদাইয়া, চুকাইয়া, তলাইয়া, ছুটিয়া, বানাইয়া, ধমকাইয়া, শোওয়াইয়া, খাউক, ঘুচুক, হাঁপাইয়া, পাতিয়া, ডুবিয়া, টিপিয়া, ছেচড়াইয়া, ঠেলিয়া, লটকাইয়া, চুষিয়া, টানিয়া, ঢুকিয়া, ঢাকিয়া, খসান, মোচড়াইয়া, ধমকানি, বহাইয়া, দুলাইয়া, পুঁতিয়া, ছড়াইয়া, বুলাইয়া, বনিয়া, মাতিয়া, গিলাইতে প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– ঠাঁই, কাশ, শণ, ঝাড়, হোগলা, নলখাগড়া, জোঁক, গাঙ, মাঝিমাল্লা, ভাটি, ঘোলা, মাচান, ওঝা, চাপড়, তুকতাক, আছাড়, ঢোল, ডোঙা, গুঁড়ি, টান, ওত, ঠাঁট, গোঙানি, পাটি, তুঁত, মলম, ঘিলু, লতি, কচু, গাঁদা, পাটাতন, কোল, বোলতা, ভিমরুল, হাট, তাক, হোগলা, চাটাই, মুলিবাঁশ, খোরা, খোঁপ প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– চাপিয়ে> চাপাইয়া, শাসাত> শাসাইত, ছড়িয়ে> ছড়াইয়া, খাক> খাউক, বলবে> কইবে, পর্যন্ত>তক, করা>করণ, দেয়া>দেওন, সবার> সক্কলের, চাল> চাউলি, বোন> বোইন, বৃত্তান্ত>বিত্তান্ত, কুটতে>কোটতে প্রভৃতি।

৫.৪ বাগধারা

অন্যের মুখে ঝাল খাওনের দরকার হইবে না। (পৃ. ৪৫)

মনে কয় আমি তোমাদের চক্ষুশূল হইয়া আছি। (পৃ. ৪৫)

সে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে গিয়াছিল একজোড়া হাঁস কিনিয়া আনিয়া। (পৃ. ৫৪)

এইটা পরের হাঁড়ির খবর লওয়া না (পৃ. ৫৯)

তিলকে তাল করিয়া তোলার স্বভাব বলিয়াই না একটুকরে এত্তোবড়ো করিয়া দেখাই। (পৃ. ৬৪)

মানুষই সব সাফ-সুতার নাম করিয়া যেন নিজের পায় নিজেই কুড়াল মারছে। (পৃ. ৯০)

সাতে পাঁচে না থাকিয়া বাঁচিয়া থাকনটা সহজ না রে ভাই। (পৃ. ৯৭)

কে যে কোনখানে থাকিয়া কী উদ্দেশ্যে কলকাঠি ঘুরাইতে চাইতে আছে, সেইটা না বুঝিয়া এর সাত-পাঁচের মধ্যে যাওন ভালো না। (পৃ. ১০৪)

তাগো আর তাগো খয়ের খাঁগো হাত গুটাইয়া ভাগতেই হইবে একদিন। (পৃ. ১১৪)

বড় মানষের বড়ো বিষয়ের মধ্যে নাক গলাইয়া কাম নাই। (পৃ. ১২৩)

শ্াক দিয়া মাছ ঢাকিস না লো শাশুড়ির ঝি (পৃ. ১২৫)

এ বিষয়টার একটা এসপার-ওসপার করণই লাগবে। (পৃ. ১২৬)

আমি জানতাম না যে তোমাগো সক্কলেরই এমন গলার কাঁটা হইছি (পৃ. ১২৬)

সিধা আঙুলে ঘি উঠলো না বলিয়াই এই পথ ধরতে হইলো। (পৃ. ১২৮)

নিজের জোর যখন যথেষ্ট না, একমাত্র কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলন ছাড়া গতি নাই! (পৃ. ১২৮)

জলিল মিয়ার ফোঁপড়দালালির দিন শেষ হইয়া আসছে (পৃ. ১৩০)

সুন্দরবনের লোকগোষ্ঠীসমূহের অন্তর্গত মানুষের অস্তিত্বসংগ্রাম, তাদের জীবিকা ও সংস্কৃতির রূপায়ণে এ উপন্যাসটি স্বকীয়। সভ্যজগত থেকে বহুদূরবর্তী, শ্বাপদসংকুল আরণ্যক পরিমণ্ডলে প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেও মানুষ যে কর্মগুণে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে, তারা সেই অকপট বাস্তবতার প্রতিনিধি। প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের সঙ্গে ওঠাবসা, চালচলন, সামাজিক লেনদেন ও জীবিকা নির্বাহের সূত্র ধরে তারা যে ঐতিহ্যকে যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় লালন করে চলে, তাতে প্রতিবিম্বিত হয় এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ। সুন্দরবনের অরণ্যময় প্রকৃতি ও তৎসংলগ্ন বঙ্গোপসাগর তাদের জীবন ও জীবিকাকে অলঙ্ঘনীয়ভাবে প্রভাবিত করলেও প্রিয়জনদের নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বেঁচে থাকার অবিরাম অনুপ্রেরণা তারা চেতনালোকে ধারণ করে, গড়ে তোলে নিজস্ব ধরনের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সেদিক থেকে উপন্যাসটির বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য।

mg‘ evmi

mg‘evmi (১৯৮৬) উপন্যাসে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরসংলগ্ন মানুষের জীবনসংগ্রাম মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে রূপায়িত। লোকজ জনগোষ্ঠীর জীবিকানির্বাহরীতি, তাদের দিনযাপনের চালচিত্র এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের রূপরেখাগত যে পরিচয় তাঁর পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলোতে বিধৃত, এর ধারাবাহিক সম্প্রসারণ এ উপন্যাসে স্বকীয় মাত্রায় উত্তীর্ণ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবারিত ও অনিবার্য যোগাযোগ সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই স্বীকৃত। বেঁচে থাকার অহর্নিশ তাগিদে একে নিজের বশীভূত করার প্রয়োজন আদিকাল থেকে মানুষ শুধু উপলব্ধিই করেনি, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এর অবারিত ভাণ্ডারকে ব্যবহার করেছে মৌলিক চাহিদাগুলো নিবৃত্তির প্রয়োজনেও। তবে প্রকৃতির ব্যাখ্যাতীত, রহস্যময় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। সেকারণেই একসময় যার ভূমিকাকে বন্ধুসুলভ, উপকারীজনের মতো আপন মনে হয়, তার ঔদাসীন্য, রূঢ়তা ও খামখেয়ালিপনার তাণ্ডবেই আবার মানবজীবন তছনছ হয়ে যায়। বিশেষত, সমুদ্রসংলগ্ন বিভিন্ন ক্ষুদ্র লোকগোষ্ঠী, যারা নদীতীরে ফসল ফলায়, জলে মাছ আহরণ করে, মাথা গোঁজার প্রয়োজনে সমুদ্রের মাঝে জমে ওঠা পলিসঞ্চিত চরে আশ্রয় খোঁজে, জীবনধারণের প্রয়োজনে পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্গম এলাকায় বসতি গড়ে তোলে, তাদেরকেই বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও সামুদ্রিক তাণ্ডবের কবলে ভিটেমাটি ছেড়ে অজানা গন্তব্যের পথে বারবার পাড়ি দিতে হয়। এ ভাঙাগড়ার খেলা সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে। তবু, জীবনসংগ্রামে অকুতোভয় মানুষেরা যে বারবার প্রকৃতির কোপানলে বিধ্বস্ত হয়েও পুনরায় উদ্যমী হয়ে ওঠে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে, এ থেকেই প্রতীয়মান হয় তাদের অনন্ত জীবনতৃষ্ণা, যে কোনো প্রতিকূলতাকে অতিক্রমের দুর্বার জীবনাভিপ্সা। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পটভূমিতে কুশীলবদের জীবনযুদ্ধের বৃত্তান্ত এতে উপস্থাপিত। নদী-সমুদ্রবর্তী মোহনা ও চরাঞ্চলসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকগোষ্ঠীগুলোর সামাজিক জীবনে আচরিত ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও বহমান সংস্কৃতির বৃত্তান্ত এ উপন্যাসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপায়িত হয়েছে। এ উপন্যাসের বিশেষ প্রবণতা হলো বিভিন্ন লোকজ উপাদানের ব্যবহার।

১. লোকবিশ্বাস-- এ উপন্যাসে নদীতীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের আচরণে বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন, কামদেবপুরের গোষ্ঠীপতি সখানাথ কুমিরের প্রতি বরাবর শ্রদ্ধাশীল। কেননা, তার পুণ্যা মাসী নদীতে্ান করতে গিয়ে কুমিরের কামড়ে আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। তাই কুমিরকে বশীভূত করার তাগিদে সে নিজের গোষ্ঠীতে শুধু কুমিরব্রতের প্রচলন ঘটিয়েই পরিতৃপ্ত হয়নি। পাশাপাশি নিজের পরিবারের সদস্যদেরও এ বিশ্বাসে আস্থা পোষণে উদ্বুদ্ধ করে যে, কুমিরকে পরিতৃপ্ত করা হলে একদিকে সে যেমন জলপথে মাছ ধরার সময় তাদের আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে, অন্যদিকে তাকে খাবার দেয়া হলে সেটি লেজের আঘাতে বড় বড় মাছগুলোকে জেলেদের জালের দিকে তাড়িয়ে সেবে। নাতি রতনকে নিয়ে নৌযাত্রার একপর্যায়ে বালকের কৌতূহলী বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সখানাথের ভাবনা কুমিরের প্রতি তার বিশ্বাস আদিম গোত্রভুক্ত মানুষের টোটেম সম্পর্কিত ধারণাকেই স্মরণ করায়। সখানাথের ধারণা, তার নৌকার সঙ্গে পাহারা দিয়ে একটি কুমির চলেছে, যে তাদের নৌকাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এছাড়া দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের সময় সে নদীতে কিছু খাবার ফেলে। বালক রতনের ধারণা, মাছ সেসব খাবার খেয়ে ফেলবে। কিন্তু সখানাথের ধারণা, গাঙ বা নদী সকল জলজ জীবের আশ্রয়, মায়েরই প্রতিরূপ। তাই নিজের আহার গ্রহণের পূর্বে গাঙকে কিছু খাবার দিলে দেবতারা তুষ্ট হয়ে তাকে বর দেন। সে ধনে, মানে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে তাদের কল্যাণে– 'দেব-দেবীর মানুষের মতো ক্ষিধা নাই। সবাই যখন একটা দুইটা করিয়া দেয় তখন তাদের আহারেরও কোনো অভাব থাকে না। যে দেয়না তার অমঙ্গল হয়। আর তারা এত চায়না যে সব তাদের দিয়া কেউ উপাস থাকুক। ... দেবতারা খুশি হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাদের গোগ্রাস খাইতে দেখেছে কেউ কখনো? তারাই খুশি হইয়া কতরকম আশীর্বাদ করিয়া ফিরাইয়া দেয়' (পৃ. ১৮)। সুজাত আলী সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা নতুর চর 'ক্ষীরসায়র'-য়ে নৌকায় চড়ে যাবার একপর্যায়ে দুপুরে আহারকালে নদীতে কিছু খাদ্য ছুঁড়ে দেয়। হাল ধরে থাকা মাঝি এর কারণ জানতে চাইলে সুজাত আলী বলে, ছোটবেলায় মা তাকে এমনটি করতে শিখিয়েছিল। শুধু নিজে খেলেই হয় না, যে গাঙ বা নদীর ওপর মানুষ বিভিন্নভাবে নির্ভর করে, তাকেও কিছু দিতে হয়। সেকারণেই কিছুক্ষণ পর নদীর বুকে ভেসে ওঠা একটি শুশুককে দেখে সে একদলা ভাত ও একটি ভাজা মাছ ছুঁড়ে দেয়। এ সংস্কার যে নদী-সমুদ্রে মাছ আহরণকারী জেলে ও যাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত তা আরো প্রতীয়মান হয় সেই নামহীন মাঝির সংলাপে। কারণ সে এরূপ আচরণ ইতঃপূর্বে তার নৌকায় চড়া জেলে ও যাত্রীদের করতে দেখেছে। তেমনিভাবে, নদী-সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা সর্বদাই সতর্ক থাকে, যেন কোনো কারণে এর প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা প্রকাশিত না হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বী সখানাথ-শ্রীহরির ধারণা, নদী বা গাঙ হল মা গঙ্গা। আশ্রিত সকল জলজ প্রাণীর প্রতি তার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। সুজাত আলীরা নতুন চরে যাত্রাকালে পথে তাদের সঙ্গে সখানাথের দলের সাক্ষাৎ ঘটে। 'সখানাথের ইঙ্গিতে শ্রীহরি বেশ কতকগুলি মাছ তুলিয়া দিল সুজাত আলীদের নৌকায় : শুভ হউক তোমাগো যাত্রা। কেবল খেয়াল রাখিও, মা বসুন্ধরার কোলের সন্তান, কোনো অযত্ন রাখিও না। তার মতি-গতির স্বভাব বোঝা ভার বলিয়া খুশি রাখা শক্ত। কিন্তু একবার কাবিল যদি হইতে পারো দেখবা কালে ঐশ্বর্যে ভরিয়া দিবে' (পৃ. ১৯১)।

২. লোকসংস্কার-- এ উপন্যাসে বিভিন্ন ক্ষুদ্র গ্রামীণ লোকগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে প্রজননভাবনা, সন্তানধারণ, বংশবিস্তার সংক্রান্ত বিভিন্ন লোকসংস্কার প্রচলিত, যার উদ্দেশ্য সদস্যবৃদ্ধির পরিণতিতে দলীয় সঙ্ঘবদ্ধতাকে সুদৃঢ় করে তোলা। কেননা, প্রকৃতিনির্ভর জীবনসংগ্রামে ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে কোনো কাজে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতি মেনে নর-নারীর বিয়ের পরিণতিতে পরিবার গড়ে তোলার মাধ্যমে উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। ফলে, নরনারীর যৌনসম্পর্ক স্থাপন এবং সন্তানধারণসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রাচীন লোকসংস্কারের উল্লেখ এ উপন্যাসের কুশীলবদের মনস্তত্ত্বে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ যেমন উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রকে পুরুষের প্রমত্ততা, বীরত্ব, দুর্ধর্ষতা এবং নদীর ধীর, শান্ত, প্রবহমান রূপকে নারীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় তাদের মিলনকে প্রাণীকূলের সৃষ্টি ও বংশবিস্তারসংক্রান্ত ভাবনার সঙ্গে কল্পনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রকৃতির দুর্বোধ্য-রহস্যময়

বিভিন্ন রূপকে লক্ষ করে আদিম মানুষের চিন্তায় বিভিন্ন কিংবদন্তি-লোককাহিনী দিনে দিনে পল্লবিত হয়েছে। এ উপন্যাসে নামহীন অথচ বারবার 'গাঙ' হিসেবে উল্লিখিত নদীটির সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থল বা মোহনায় অনুষ্ঠিত মেলার উল্লেখ লক্ষণীয়। লেখক জানিয়েছেন, 'গাঙ ধাইয়া যায় ভাটির টানে আসঙ্গ আকুলা কুমারীর মত, জোয়ারের ভর করিয়া সমুদ্রে উঠিয়া আসে পুরুষবেশে' (পৃ. ৪৫)। এটিই এ উপন্যাসে এতৎসংশ্লিষ্ট লোকভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। সখানাথের দলের দুই মাঝি গিরীশ ও গৌতম রাতের অন্ধকারে মাছ আহরণকালে যে আলাপে লিপ্ত হয়, তাতে বিষয়টি স্পষ্ট। এতে ফুটে উঠেছে লোকমানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের রূপরেখা। গিরীশ জানায়, 'গাঙ্গ এইখানে পৌঁছাইয়া খুলিয়া মেলিয়া দিচ্ছে নিজেকে, আর এই সাগর হইল তাহার পুরুষ। না হয় একবার সাগর মেলাটা ঘুরিয়া আর সব ক্রিয়াকাণ্ড দেখতে তোর আর কেউরে কিছু জিগাইতেও হইবে না। ... এই গাঙ্গ না হয় নামিয়া আসছে ঐ উপরের সাগর মঠের শিবলিঙ্গ হইতে, কিন্তু মদন দেবতার ঠাঁই যে এই রাজ্যে হইবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই' (পৃ. ১৯-২০)। নিঃসন্তান কমলা মামীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার অভিপ্রায়ে সমুদ্রমেলায় নৌকা নিয়ে তার সঙ্গী হিসেবে সেখানে ভ্রমণের মাধ্যমে সে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। গিরীশের নিকট থেকে তার সঙ্গী দেবনাথ ও শ্রীহরি অনুরূপ বৃত্তান্ত শোনে। দেবনাথের কল্পনায় সমগ্র বিষয়টি এভাবে মূর্তময় হয়ে ওঠে –'এই গাঙ্গ না কী বাস্তবিকই কুমারী মাইয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে রজঃস্বলা হইয়া সে যখন সাগরের সঙ্গে ইয়া মাইনি লীলায় মাতে তখনই এই মোহনার চতুর্দিক তাগো অঙ্গ নিশ্বাসে ভরিয়া ওঠে' (পৃ. ৭০)। প্রচলিত লোকবিশ্বাস হলো, সাগরমেলার জল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। তাই এখানে এসে গোসল করলে বন্ধ্যা নারীও গর্ভবতী হওয়ার সামর্থ্য রাখে, দুর্বল ব্যক্তিও পৌরুষের অধিকারী হয়, এমনকি সব রোগ-ব্যাধি সেরে যায়। সেকারণেই সেখানে বহু দূর থেকেও অজস্র মানুষের সমাগম ঘটে। নরনারীর যথেচ্ছ মিলনের পরিণতিতে প্রজনন সন্তানধারণের অভীপ্সাই এসব সংস্কার, আচার-আচরণে অকপটে প্রকাশিত হয়। সেকারণেই দীর্ঘদিন করিমনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ নিঃসন্তান সিকুও অভিপ্রায়র ব্যক্ত করে সাগরমেলায় যাওয়ার জন্য। কালিশূরীর সাগরমেলা সংলগ্ন আরো কিছু লোকসংস্কারের উল্লেখ থেকে অনুধাবন করা যায় এতদঞ্চলের জনমানসের স্বরূপ। দাপুটে লাঠিয়াল ইউসুফ সুজা জনৈক বেদে নারীর সঙ্গে আলাপে লিপ্ত হয়ে জানায়, তার গলায় পরিধানরত তাবিজটি অলৌকিক গুণসম্পন্ন. যা তাকে উপহার দিয়েছিল মুজফফর মিঞা। এটি সঙ্গে থাকলে নাকি কোনো অমঙ্গলজনক ঘটনা ঘটতে পারে না। বেদেনী প্রত্যুত্তরে গলায় পরিধানরত মাদুলীগুলো তাকে দেখিয়ে জানিয়েছিল, সেগুলো সাগর মেলা থেকে কেনা। যেহেতু বিষাক্ত সাপ নিয়ে তাকে খেলা দেখাতে হয়, তাই সে এসব মাদুলী সঙ্গে রাখে। এগুলোর গুণে 'জল-ডাঙ্গার কোনো আপদই কাছেও আসতে পারে না' (পৃ. ৪৯)। ফকির-সন্ন্যাসী, পীর-দরবেশের দৈবীশক্তি, ক্ষমতার প্রতি লোকমানুষের ভক্তি ও আনুগত্য লক্ষণীয়। এ উপন্যাসেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সিকু জনৈক ফকিরের দেয়া একটি আঁকাবাঁকা লতার লাঠি সুজাত আলীকে দিয়েছিল নতুন চরের বন কেটে বসতি স্থাপনকালে। কেননা, সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা চরের নির্জন অরণ্যে বিভিন্ন হিংস্র, বিষাক্ত জীবজন্তু ও সরীসৃপের বসতি রয়েছে। 'বিশেষ দ্রব্যগুণ'সম্পন্ন সেই লাঠি সঙ্গে থাকলে সুজাত আলী প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবে, এমনটিই সিকুর বক্তব্যের প্রতিপাদ্য। তেমনিভাবে, সুজাত আলীর মালিকানাধীন চর ক্ষীরসায়র যখন সমুদ্রের প্রবল জোয়ারে তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়, সেই বিপন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের সাধ্যে কুলানোর মত সকল প্রচেষ্টাই সে এবং তার সঙ্গীরা অব্যাহত রেখেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় একপর্যায়ে বসুয়া বয়াতি সুজাত আরীকে জানায়, 'ঐ সাগর-মেলার কাছাকাছি পীরের একটা দরগা আছে। এমন সব বিপদের কালে মানুষ সেইখানে যায়, নানারকম মানত দেয়। ... আপনার নিজেরই যাওন লাগে' (পৃ. ৩২৭)। এমতাবস্থায় কালিশুরীর পীরের দরগায় মানতের জন্য সুজাত আলী করিমনের গৃহপালিত ছাগলটি চায়। যদিও এর ফলে ক্ষীরসায়র সমুদ্রগর্ভে বিলীন হওয়ার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পায়নি, তবু এর বাসিন্দারা উক্ত লোকসংস্কারের প্রতি আস্থা পোষণ করে আসন্ন সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি নিজেদের মনোবল ও সংহতি অটুট রাখতে সচেষ্ট হয়েছে।

নারীর প্রতি বিভিন্ন সংস্কারও লোকসমাজে প্রচলিত, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে গার্হস্থ্য মঙ্গল ও পরিজনের সুস্থ-স্বাভাবিক-নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশা। যেমন, পুরুষ বা গৃহকর্তা ঘরের বাইরে গিয়ে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ করার সময় নারী যদি পিছুটানবশত বা তার ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে আকুল হয় বা চোখের জল ফেলে, মন খারাপ করে, তবে সংসারের অকল্যাণ হয়, কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে বলে লোকসমাজে প্রচলিত। সেকারণেই ক্ষীরসায়রে নতুন আবাস গড়ে তোলার জন্য সুজাত আলীর যাত্রাকালে তার স্ত্রী সোনাকে করিমন পরিহাসছলে সান্ত্বনা দেয়, 'তোর চৌখ ছলছল করতে আছে ক্যান? এমন কতোবার গেল-আইলো। তামাম বছর কেবল খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া কোলের ভেড়ুয়া বানাইয়া রাখলে কক্ষণো কোনো পুরুষ মানুষের মঙ্গল হয় না' (পৃ. ১৮৮)। অন্যদিকে, যে নারী গৃহসম্পৃক্ত কাজকর্মে মনোযোগী, তার সংসারে দারিদ্র্য কখনো হানা দিতে পারে না, এরূপ সংস্কারও লোকসমাজে প্রচলিত। চান্দুর সঙ্গে আলাপকালে সুজাত আলী জানায় 'ঘরে সজাগ মাইয়াছেইলা থাকা সংসারের ভাগ্যের লক্ষণ' (পৃ. ১৭০)। তেমনিভাবে নতুন চরে বসত গড়ার জন্য সুজাত আলীকে বিদায় দিতে গিয়ে করিমন জানিয়েছিল, 'যার থাকে খোলা দৃষ্টি, তারে ছোঁয় না অনাসৃষ্টি। (পৃ. ২০৪) কৃষিকর্মের সঙ্গে নরনারীর মিলন এবং প্রজনন সম্পর্কিত সংস্কার অত্যন্ত প্রাচীন। নারীকে ক্ষেত এবং সমর্থ পুরুষকে কৃষকের প্রতিরূপকে তাদের মিলনে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব তথা ফসলের প্রাচুর্য কৃষিজীবী সভ্যতার বহুলপ্রচলিত রীতি। সেখানে কোনো পুরুষ বা নারীর বন্ধ্যাত্বকে সেক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতা তথা ভবিষ্যতপ্রজন্মের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে লোকসমাজে বিবেচনা করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রবাদ হলো, 'ক্ষেত পোয়াতি বৌ পোয়াতি সর্ব করে পুরুষ জাতি' (পৃ. ২৮০)। কাজেই কৃষিকর্মে বন্ধ্যা নারীর উপস্থিতি অনাকাঙ্ক্ষিত বিবেচিত। সেকারণেই নতুন চরে বসতি গড়ে তোলার পর সুজাত আলী করিমন-সিকুকেও সেখানে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করবে বলে আলাপকালে তার স্ত্রী সোনা জানায়। কিন্তু এ প্রস্তাবে করিমন রাজি হয়নি। কেননা, ক্ষেতের নতুন ফসল কাটার সময় করিমন সেখানে থাকলে কোনো বিপদাপদ বা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে তার আশঙ্কা। সে সোনাকে জানায়, তোর এত বুদ্ধি এইটুকু বুঝস না : ক্যান? বাজা মাইয়া-মানুষ চাষ-আবাদের ধারে-কাছেও রাখতে নাই' (পৃ. ২৩১)। এ ধরনের সংস্কার লোকসমাজভুক্ত বাসিন্দাদের মনস্তত্ত্বে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে করে, এর প্রতিফলন ঘটে তাদের আলাপে, ব্যবহারে।

৩. লোকাচার–– এ উপন্যাসে লোকাচারের কিছু উল্লেখ লক্ষণীয়। এসব আচার বিশেষভাবেই ধর্মীয় ভাবনা এবং গোষ্ঠীবদ্ধ ক্ষুদ্র লোকগোষ্ঠীবিশেষের স্বাতন্ত্র্যসূচক। কেননা, সকল লোকসমাজেই এসবের প্রচলন ও উপযোগিতা স্বীকৃত নয়। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন বা চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার তাগিদে এসব লৌকিক ধর্মাচারের উদ্ভব ও সম্প্রচার ঘটে। এছাড়া ধর্ম এবং পেশাগত স্বকীয়তাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। লেখক এতদঞ্চলের লোকসমাজে বিভিন্ন লোকাচার গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে জানিয়েছেন–

> এই গাঙ্গ বা গঙ্গাকে তাহারা যে যাহার চিত্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তি এবং ধ্যান-ধারণা মত দিয়াছে নানা নাম, ডাকিয়া লইতে চাহিয়াছে নিজেদের সঙ্গোপন অন্তঃপুরে, কখনও-বা তাহার বহিয়া চলা পথের পাশেই সাধের সংসার দেখাইতে চাহিয়াছে। একদিকে তাহার কৃপাদৃষ্টির আগ্রহ, অন্যদিকে সমীহ, দুইয়েরই সংমিশ্রণে জন্মলাভ করিয়াছে নানা ধরনের আচার-বিচার অনুষ্ঠান। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জগৎজীবন স্রষ্টার রূপ যেমন বিভিন্ন, কেউ সন্তুষ্ট আকারে, কেউ মগ্ন নিরাকারে, সেই একইভাবে জীবজগৎকে লইয়া নিজ নিজ প্রয়োজন এবং ধ্যানানুসারে নানা রকম সংস্কার ও পার্বণ জন্মলাভ করিয়াছে কখনও গোপন উপাসনার মত কখনও বা আনন্দ মুখর উৎসবে। খণ্ড খণ্ড সমতল অঞ্চলে তাহার একটা মূল রূপ না থাকিলেও, নদীমাতৃক ভুবনে তাদের প্রকৃতি নির্ভর জীবন-যাপন কখনও বিধি ব্যবস্থার আকর্ষণের দিকে খুব ঝুঁকিয়া পড়াকে অমঙ্গল স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছে। (পৃ. ১১)

সেকারণেই কামদেবপুরের ধীবরপল্লীপ্রধান সখানাথের পারিবারিক সংকট তথা তার পুন্যা মাসীর বাড়িসংলগ্ন খাড়িতে্লানকালে কুমিরের কামড়ে আজীবনের মত পঙ্গু হয়ে যাবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে উদ্ভুত কুমিরব্রত

ক্ষমতাধর জোতদার ও মুসলমান লোকগোষ্ঠীসমূহের দলপতি মুজফফর মিঞার নিকট কখনোই অনুসরণীয় নয়। বরং সে যে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের দেহব্যবসায় প্ররোচিত করে এবং সাগরমেলায় বেবাজিয়া সম্প্রদায়ের আয়োজিত অনুষ্ঠানে নাচ-গানের আসর বসিয়ে তাদের ক্রয়বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করে, এর আড়ালেও সক্রিয় রয়েছে বিভিন্ন প্রাচীন লোকাচার।

যেহেতু কুমিরব্রতের অন্তরালে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও সামাজিক লোকাচারের পরিচয় এ উপন্যাসে বিবৃত। সখানাথের ঢেউটিনের চাল দেয়া কাঠ ও মুলিবাঁশের দেয়াল দেয়া ঘরের প্রাঙ্গণে কুমিরব্রতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শুধু ছোট ছেলেমেয়েসহ নারীরাই অংশগ্রহণ করে না, বয়স্ক পুরুষেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। সমগ্র অনুষ্টানের দেখাশোনার ভার সখানাথ নিজেই পালন করে। বাঁশ এবং খড়-মাটি দিয়ে একটি কুমিরের প্রতিমা এমনভাবে গড়া হয়, যা দেখে যে কারো মনে হতে পাওে, সেটি শরবণ বেঙে গাঙের গর্ত থেকে তখনই যেন উঠে এসেছে। অন্যান্য ধর্মীয় দেবদেবীর মত তার মাহাত্ম্য স্বীকার করে যুবকেরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে প্রতিমাটি বানায়। এরপর কিশোরীরা যথাসাধ্য আয়োজনে মনের মাধুরী মিশিয়ে এর সাজসজ্জার পর্ব শেষ করে। শুধু কারিগররাই এ কাজ সম্পন্ন করার সময় সেখানে উপস্থিত থাকে। পূজার আয়োজন শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত তারা ব্যতীত আর কেউ কুমিরটি দেখার সুযোগ পায় না। অবশেষে এর সাজ সম্পন্ন হলে নির্দিষ্ট দিনে আলপনা শোভিত পূজামণ্ডপে গৃহবধূরা শাঁখ বাজিয়ে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। ইচ্ছাপূরণের জন্যও একেকজন নিজেদের সাধ্যমত বিভিন্ন বস্তু এর প্রতি উৎসর্গ করে। লেখক জানিয়েছেন–

> যাহার যত সাধের জিনিস, এমন কি কয়েক জোড়া মোরগ-মুরগি ও একটি ছাগলও সেই উপলক্ষ্যে উৎসর্গ করা নিয়ম। ... এক সময় মেয়েরা কুমিরের বিরাট হাঁ করা মুখের কাছে মাটিতে গলবস্ত্রভাবে বসিয়া মৃদু স্বরে গান ধরে। সে-গানের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র একটা প্রার্থনা : যে যাহা পারিয়াছি সব আনিয়া দিলাম তোমাকে। তোমাকেও জীবনের নিয়ামক বলিয়া প্রণাম করি। তুমি এই ভোগ গ্রহণ করিয়া খুশি হও। আশা করি তুমি আমাদের স্বামীপুত্রের কল্যাণ দেখিবে। যেন তোমার লাঙ্গুল নাড়াইয়া বড় বড় মাছগুলিকেও তাহাদের জালের মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার। ... ভোগপ্রসাদ শেষ হইয়া গেলে পুরুষেরা সেই মূর্তি কাঁধে তুলিয়া লইয়া গাঙ্গে নামাইয়া দেয়। নানারকম শুভধ্বনি এবং বাদ্য-বাজনা-গীতের মধ্যে স্রোতের টানে সেই মূর্তি অদৃশ্য হইয়া যাইবামাত্র সকলে আর কালবিলম্ব না করিয়া গাঙ্গের ভাটায় ভাসিয়া পড়ে তাহাদের দীর্ঘ ডিঙ্গির উপর পাল খুলিয়া। ... এমন আচার নিত্যদিনের জীবনধর্মের অংশ। (পৃ. ১৪)

৪. লোকসাহিত্য–– এ উপন্যাসে লোকসমাজের সৃষ্টিশীলতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রবাদ, ছড়া, লোককাহিনী, কিংবদন্তি, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয়। এসব সাহিত্যে বিধৃত হয়েছে তাদের প্রকৃতিনির্ভর প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ।

৪.১ ছড়া–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত কোনো ছড়ার উল্লেখ নেই। কিন্তু করিমনের স্বভাবে ছন্দমিল বজায় রেখে সুমধুর ছড়া আবৃত্তি করার প্রবণতা লক্ষণীয়। গ্রাম্য অশিক্ষিত নারীর মনোলোকে সহজাত ছন্দের বিচিত্র বিন্যাসে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গকে ছড়ার আদলে উপস্থাপনের সামর্থ্য তার সৃজনশীলতারই বহিঃপ্রকাশ–

> গেলা যখন হাসি মুখে, এখন আনধার দেখি দুখে। বসো বসো খাও না খাও মুখে ঘষো। (পৃ. ৬৫)

> কাঁটা দিয়া কাঁটা, বাড়ি গিয়া দিব মরিচ বাটা। (পৃ. ৮৮)

> গল্প না, গুজব না, না অকর্ম্মাগো রটনা। এই জিহ্বা খসিয়া পড়বে যদি সত্য না হয় ঘটনা। (পৃ. ৮৮)

> আরে পাও পড়েনা আসল পথে, এদিক দেখি কোথায় যাইতে? বেশ কয়দিন তোমার দেখা নাই, কেমন আছো সুজাত ভাই। (পৃ. ১১৪)

সই, একটা মনের কথা কই? (পৃ. ১৪৭)

সুজাতভাই কেমন যেন ছন্নছাড়া দিশাহারা, মনে কয় পাগল পারা। ... একলা একলা তার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়, তোমারে তার ঘরে তুলিয়া দিতে মনে কয়। (পৃ. ১৪৭)

৪.২ প্রবাদ

যেদিকে সুযোগ সেইদিকে যোগ। (পৃ. ২৪)

যে জালিয়া পাড়ায় মজে, সে আপনা থুইয়া অন্যে ভজে। (পৃ. ২৮)

গু খায় সব মাছে, নাম পড়ে পাঙাশের। (পৃ. ২৯)

ভাঁটির দেশে কোনো নিয়ম নাই। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির। (পৃ. ৪১)

এই ভুবনে জোর যার মুল্লুক তার। (পৃ. ৪১)

জাতে উঠলে তবে না ভাত। (পৃ. ৭৬)

যাগো আমল ঘরেই মুষল নাই, ঐখানে কেবল বান্দন ছাড়া গতি নাই। (পৃ. ৯৯)

নাই মামার চাইয়া কানা মামাও ভালো। (পৃ. ১০১)

যার যা খাছলত। কেউ খায় সরায়, আবার কেউ বা ধরায়। (পৃ. ১২৮)

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। (পৃ. ১৩৯)

জীবন দিছে যিনি, আহার জোগায় তিনি। (পৃ. ১৫৭)

সব পুরুষের এক বাই, হাসতে দেখলেও কারণ চাই (পৃ. ১৫৮)

যার বিয়া তার মত নাই, পাড়াপড়শীর চৌখে ঘুম নাই। (পৃ. ১৮০)

যার যুদ্ধ তার, এইই হইলো জগৎ সংসার। (পৃ. ১৮৮)

ডররে ডরাইলেই সে পাইয়া বসে। (পৃ. ১৯৭)

যার থাকে খোলা দৃষ্টি, তারে ছোঁয় না অনাসৃষ্টি (পৃ. ২০৪)

একমাঘে শীত যায় না। (পৃ. ২৬৫)

যেমন নাচুনিয়া বুড়ী, তার উপরে ঢোলের বাড়ি (পৃ. ২৭৪)

কপাল যেন সঙ্গে সঙ্গে চলতে আছে যেইখানেই যাই। (পৃ. ৩১৫)

থাকুক যার যেমন স্বভাব। ভাত ছড়াইলে কাউয়ার অভাব? (পৃ. ৩১৯)

ছোটর মুখ, দেবের মুখ। (পৃ. ৩৩৫)

৪.৩ লোকসঙ্গীত-- এ উপন্যাসে বসুয়া বয়াতির মাধ্যমে লেখক গ্রাম্য লোককবি বা কবিয়ালের স্বভাবজাত গায়কসত্তাকে উন্মোচিত করেছেন। লক্ষণীয়, ভবঘুরে স্বভাবের মানুষটির সংসারে পরিজন বলতে কেউ নেই। বিয়ে করে সে সংসারী হয়নি। তার পারিবারিক পরিচয় উপন্যাসে অনুপস্থিত। মনের খেয়ালে গান গাওয়া ছিল তার

নেশা। ধীরে ধীরে লোকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হওয়ায় সে গ্রাম ছেড়ে শহরেও গান গাইতে যেত। বিশেষত ছাদ পেটানোর কাজের পাশাপাশি গান গাইতে সে পারদর্শী ছিল। কিন্তু বাঁধাধরা নিয়মে কাজ করতে গিয়ে সে আনন্দ হারিয়ে ফেলায় একপর্যায়ে সেই কাজ ছেড়ে দেয়। সে হাটে মাঠে ঘাটে দোঁতারা নিয়ে ঘোরে এবং খেয়ালখুশি মত গান গায়। সুজাত আলীর ক্ষীরসায়র চরে মুনীষের কাজের জন্য নুরু তাকে প্রস্তাব দিলে সে এতে সম্মতি জানায়। কেননা, লোকবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বাদ্যযোগে সঙ্গীতের আবেদন সম্পর্কে নুরু ও তার সঙ্গীরা অবহিত। এ উপন্যাসে তার কণ্ঠে সাতটি লোকগীতির অংশবিশেষ পরিবেশিত হয়েছে। এসবের উপজীব্য হলো নরনারীর ইন্দ্রিয়ঘন সম্পর্ক, প্রেম-ভালোবাসা ও বিরহকাতরতা; অশেষ পরিশ্রম সত্ত্বেও ইহলৌকিক জীবনের মুহূর্তগুলো উপভোগের আনন্দ, নতুন চরের বাসিন্দাদের জীবনসংগ্রামের বৃত্তান্ত প্রভৃতি। কৃষিজ সভ্যতার বিভিন্ন অনুষঙ্গ তথা চাষের জমি প্রস্তুত করা, বীজ বপণ, চারা রোপণ, ফসল বেড়ে উঠলে কেটে ঘরে তোলা এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ উৎসব-আয়োজন তথা চৈত্র সংক্রান্তি, পালা-পার্বণ, অন্নপ্রাশন এমনকি বিয়ের মত সামাজিক উৎসব প্রভৃতিতে গীত পরিবেশনের জন্য সে বরাবর আকুল থাকত। তার পরিবেশিত কিছু লোকসঙ্গীতের নমুনা–

ক. বন্ধুরে দেখছি আমি ঢাকার শহর

দেখছি দিল্লী কইলকাত্তা

এই ভুবনের রূপের বাহার

সব করিয়াছে লাপাত্তা।

এতো আসমান মাথার উপর

আরও এই ছলছলাইয়া পানি

মাটির বাকি বিয়ার টোপর

আসছে রাজা সাজাও তাহার রাণী। (পৃ. ২৪৩)

খ. রাইত কালা জাইত কালা

কালা সমুদ্দুরের ঢেউ

উপরে আছে আলোর মালা

দেখছো চাইয়া কেউ!

ওরে আমার ভাই বেরাদর চাচা

না হয় দেখো জোনাক পোকের খেলা

বাঁচিয়া আছি এই কথাটাই সাঁচা

বাঁচিয়া থাকুক রঙ্গ-রসের মেলা–(পৃ. ২৪৫)

গ. ঐ উপর থেকিয়া দেখছে মেলিয়া সর্ব শক্তিমান

কেমন ছিদ্দত কেমন হিম্মত করতাছে ইনসান।

খাঁটি মাটি উদলা গা’ করছে ইসাহাক

গনু মিঞা শামু মিঞা আরও বদু শ্যাখ

আসছে জুটি লাঙল মুঠি সুজাত মিঞা ভাই

লওগো কন্যা লও জননী আইন্যাছি জামাই। (পৃ. ২৫৩)

৪.৪ কিংবদন্তি

দেবনাথ বলিতে লাগিল : এই যে গাঙ্গে সবই আসলে দেবলোকের কন্যা। সেই দেবলোক যে কেমন কেউই কখনো দেখে নাই। বুড়াবুড়ীরা কয় শোনো না যারা তা দেখতে যায় কেউই আর ফিরিয়া আসে না। সে নিচ্চয় এমন কোনো মুলুক হইবে যা হয় খুবই সোন্দর না হয় ভয়ঙ্কর এক রাজ্য। আসলে সেইদিকেই না কি স্বর্গ নরক একই সাথে। ... দেবনাথ ... আবারও তাহার কেচ্ছা শুরু করিল : হ, এই গাঙ্গের কথা। সে কয় এই গাঙ্গ না কী বাস্তবিকই কুমারী মাইয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে রজঃস্বলা হইয়া সে যখন সাগরের সঙ্গে ইয়া মাইনি লীলায় মাতে তখনই এই মোহনার চতুর্দিকে তাগো অঙ্গ নিশ্বাসে ভরিয়া ওঠে। (পৃ. ৬৯)

৪.৫ লোককথা

চান্দু একটু রাগ দেখাইল : ...সেই গল্পটা কইছি তোমারে, ঐ যে কেবল একটা বিড়ালরে খোঁচাইতো? নিত্য ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া পোষা বিড়ালটারে খোঁচাইয়া মজায় হা হা করিয়া হাসতো একটা লোক। একদিন সেই নরম শরম বিড়ালটা আর কোন পরিত্রাণ না পাইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়লো সেই লোকটার টুপির উপর একেবারে এই খানে–গলায় হাত দিয়া দেখাইল চান্দু : মরণ কামড়, আর সেই এক কামড়েই শেষ (পৃ. ৪৪)

৫. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ লক্ষণীয়--

তুমি নিজেই তো তার মূলার মতো দাঁতগুলার মধ্যে কয়েকগণ্ডা নারকেল নাড়ু ঠেলিয়া দিলা। (পৃ. ১৬)

সখানাথও রতনকে শান্ত করিতে চাহিল : দাদু, সে মিঠাই দশহরা না হয় চৈত সংক্রান্তির সময় ছাড়া পাওয়া যায়না। (পৃ. ২৭)

করিমনের ... আঁচল ভরা ফলমূল, হাতের মুঠায়ও জলকচু-ঢেঁকির শাক। (পৃ. ১১৪)

আমরা অনর্থক এই কচুর লতিগুলান এমন সাধ করিয়া রাঁধিলাম। (পৃ. ১৮৪)

পোড়া মিঠা আলু পছন্দ করে সুজাত আলী, আর সিকুর পছন্দ তাহার কচি পাতা দিয়া কলাপাতায় মোড়া কুচোমাছের মজা। (পৃ. ২৩৮)

ঢাকনাটা উঠাইয়া সুজাত আলী দেখিল মধ্যে রকমারিপিঠা–কোনওটা ফুল, কোনওটা ফল, মাছ, পাখি না হয় নিছক নকশা। (পৃ. ২৫৬)

মুড়ি-বাতাসার পোঁটলাটা খুলিয়া কিছু মুখে দিতে দিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল কুমার-পাড়ার ভাঙ্গা পাড়ের উপর (পৃ. ২৬৮)

করিমন কোটড়ের মধ্য হইতে কয়েকটা কামরাঙ্গা সুজাত আলীর দিকে বাড়াইয়া দিল : নেও, এই কয়টা সোনা বৌরে দিও। আরো কইও কচুর লতি আর রাঙ্গা শাকের জোগাড় করছি। (পৃ. ২৬৩)

রাঙ্গা শাক দিয়া রাঙ্গা মোটা আউশ, মনে পড়ে ছোট্ট কালের হাউশ? (পৃ. ২৬৩)

মোটা চাউলের ভাত, তাহার উপর মশলা দিয়া রাঁধা হাঁসের আণ্ডা। আর একটা বাসনে করিমন কিছু পেঁয়াজ মরিচ দিয়া মাখা আলুভর্তা লইয়া আসিল। (পৃ. ৩০৫)

টকটকে লাল পেঁপে ভর্তি একটা বাসন করিমন নামাইয়া দিল সুজাত আলীর সামনে (পৃ. ৩২৮)

৬. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে নরনারীর পরিধেয় পোশাক ও সাজসজ্জার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে:

পাড় ভাঙ্গিয়া যে মেয়েটি বেসাতির ঝাঁকা মাথায় লইয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল তাহার পরণে ডোরাকাটা নীল শাড়ি, গৌর পায়ে রূপার মল, হাতভরা কাঁচের চুড়িগুলি (পৃ. ৪৭)

বেদেনী একরকম অনন্যোপায় হইয়া নামাইল তাহার মাথার সাজি। উপরের ঢাকনা খুলিয়া রাগ করিয়াই দেখাইতে শুরু করিল মেয়েদের কেশ তৈল, সুগন্ধি সাবান, খোঁপা সাজাইবার কাঁকই কাটা, পাটের সুতায় বাঁধা কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা, পায়ের আলতা। প্রতিটি জিনিস নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার বাজিতে লাগিল তাহার হাতের চুড়ি, রুপার কঙ্কণ। (পৃ. ৪৯)

ইউসুফ হাতের বাজু, গলায় ঝুলান চৌকা রূপার মাদুলীর দিকে ইঙ্গিত করিল।

বেদেনী হাসিয়া ফেলিল : এই মুলুকের পুরুষেরাও গয়না পরে জানি নাই। আগে টের পাইলে কিছু হাঁসুলী-খাড়ুও লইয়া আসতাম। (পৃ. ৫০)

মেয়ে মানুষের শরীর, জড়াইয়া লেপটাইয়া থাকা কাপড়ের তলা হইতে ঈষৎ আলতামাখা মলপরা একটা পা নড়িবার চেষ্টা করিতেছে (পৃ. ১২৪)

খুঁজিয়া পাতিয়া নারিকেলের তৈল আর কাঁকই লইয়া সাজাইয়া বসিল করিমন (পৃ. ২৮০)

এইবার চুলের কাটা-ফিতাটা আসলে হয়। ...ডাঙ্গায় মধু বাড়ইর ঝুমকী দেওয়া নানারকম তাগা লইয়া আসতো। কালা সুতার তাগা, মাথায় রাঙা রাঙা ফুল, তাও সুতার (পৃ. ২৮২)

কাছাকাছি বাতির আলোয় (সোনার) নাকফুলের পাথরটা চিকমিক করিতেছিল। সম্ভবত করিমনই যত্ন করিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়াছে। (পৃ. ৩১২)

৭. লোকচিকিৎসা-- এ উপন্যাসে লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। ক্ষীরসায়র চর দখল করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের সরকির আঘাতে সুহাত আলীর বাম বাহুমূল মারাত্মক জখম হলে এর প্রতিকারার্থে মতলব সর্দারের পরামর্শে ক্ষতস্থানে একদলা বাটা মরিচ মেখে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। পাশাপাশি 'মতলব সর্দারের কানের পাশের জখমটা তেমন গুরুতর কিছু নয়, তবু কিছু সঙ্গে আনা রস-কষ দিয়া তাহার মাথায়ও একটা পট্টি বাঁধিয়া দিল কালু গাজী' (পৃ. ৮৪)। সুজাত আলীর স্মৃতিচারণায় ভেসে ওঠে বাল্যসঙ্গী করিমনের সঙ্গে জঙ্গলে বেতফল কুড়াতে গিয়ে ময়না-কাটার আঘাতে পায়ের গোড়ালি জখম হওয়ার বৃত্তান্ত। তখন ব্যথার উপশমের জন্য তাকে শুইয়ে কচুর পাতার রস, খেজুর কাঁটা ও বেতের কাটাভরা ছড়া দিয়ে করিমন সেটি বের করে বাড়ি নিয়ে মরিচবাটা দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিল। ঝড়ের কবলে বিধ্বস্ত সোনাকে নৌকা থেকে উদ্ধারের একপর্যায়ে সুজাত আলীর আহত বাহুমূলে পুনরায় রক্তপাত ঘটলে সে কচুর ডাটার রস দিয়ে সেই স্থানে প্রলেপ দেয়। নতুন চরে বসতি স্থাপনের একপর্যায়ে কুমিরের কামড়ে তার পা জখম হলে ' প্রথমে সমুদ্রের জলে ভাল করিয়া ধুইয়া কিছু কচুপাতার রস ছড়াইয়া দিল ক্ষতস্থানগুলির উপর, তারপর বাটা মরিচের কয়েক থাবা তাহার উপর বসাইয়া আবারও কচুপাতায় ঢাকিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল সুজাত আলী।' (পৃ. ১৯৬)

৮. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে লেখক সচেতনভাবেই দক্ষিণাঞ্চলের লোকভাষা ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটির প্রারম্ভে তিনি জানিয়েছেন, 'আঞ্চলিক সাদৃশ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রাচীন গদ্যরীতি ব্যবহৃত'। উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ বর্ণনা এবং বিভিন্ন দৃশ্য, কুশীলবদের জীবনভাবনা ও এতদঞ্চলের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল নির্দেশে লেখকের বিবৃতি যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর ভাবদ্যোতক, তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদবহুল সাধুরীতির গদ্যাশ্রয়ী। অন্যদিকে পাত্রপাত্রীর

আলাপের ভাষা সাধুরীতির অনুসারী হলেও দেশজ ও কথ্য শব্দরাশির সঙ্গে স্থানীয় উপভাষা, অলংকারাশ্রিত বাক্যরাশি, বাগধারা, প্রবাদ ও বিশেষ দেহভঙ্গিমা, মেয়েলি আলাপের অনুসরণে গঠিত, যা সাবলীল এবং গতিময় ভঙ্গিতে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সমান্তরালে তাদের ভাবনা ও মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে সহায়তা করে। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত লোকভাষার উপাদান হিসেবে কুশীলবদের সংলাপাশ্রিত শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

৮.১ শব্দভাণ্ডার

বিশেষণ– চপল, চড়াই-উতরাই, হামাগুড়ি, ঝটপট, জব্বর, মিঠা, চড়বড়, ফাঁপড়, ফিসফাস, রঙচঙ, ঝিম, খলবল, ভণ্ডুল, খামাখা, ইনাইয়া বিনাইয়া, বিড়বিড়, ঝাটাপিটা, মিটিমিটি, কালুয়া- ভেতুয়া প্রভৃতি।

ক্রিয়া– চিবায়, বেচিয়া, তলাইয়া, ঠেলিয়া, খিচাইয়া, নুইয়া, ছিটাইয়া, ছাড়াইয়া, ভাসিয়া, খাটাইয়া, চাপিয়া, মেলিয়া, লুকাইয়া, দুলিতেছে, ঢালিতে, ঝুঁকিয়া, ডুবাইয়া, চুমড়াইয়া, বুলাইয়া, মাতিয়া, ঘষিয়া, রইছে, মজে, ভজে, ডিঙাইয়া, ফুঁপাইয়া, ফসকাইয়া, উচাইয়া প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– ভেক, খাকারি, ঠাঁই, ঠ্যাং, শরবন, থাক, পিড়া, গাঙ, ঢেলা, গদা, হাট, গলুই, ডিঙি, নাড়ু, দাঁড়, টান, ক্ষেপ, হাঁক, পাটাতন, হুঁকা, দোল, বউয়া, বগল, খুড়া, বিড়ি, ছই, গলুই, ছাতি, বাটি, ঘাড়, হাই, লাগ, ভোল, খাতক, গড়গড়া, চৌকি, চটি, গীত, পেল্লায় প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– ফুটলে>ফোটলে, ক্ষমা>ক্ষ্যামা, ছুটলে>ছোটলে, ভোরবেলা>বিহান, ডানা>ডেনা, কে>কেডা, উপোস>উপাস, নিক>লউক, জিজ্ঞাসা করতে>জিগাইতে, দিক>দেউক, প্রথম>পরথম, থাক>থাউক, ঝামেলা>বিতং, ওদের>উয়াগো, যাওয়া>যাওন, এগিয়ে>আউগাইয়া, গুলি>গুলান, থেকে>থেকিয়া, এলোমেলো>আউলাইয়া, চিৎকার>চিক্কুর প্রভৃতি।

৮.২ বাগধারা

আরে আরে, মাঝি ভাই যে। হঠাৎ এইদিকে কী মনে করিয়া? আইজ কী তা হইলে পূর্বের সুরুয পশ্চিমে উঠলো? (পৃ. ২৪)

স্বয়ং পীর সাহেব আসছে আমার গরিবখানায়, কোথায় কলাটা-মূলাটা হইয়া আসবি না। সে সব তো ছাড়, ইনাইয়া বিনাইয়া বদনসীবের গীত গাইতে আসছে। (পৃ. ২৪)

ওই সবে নাক গলাইয়া আমাগো কোনো ফয়দা নাই। (পৃ. ২৭)

ঐসব ভাবের কথায় ভবি ভোলবে না। (পৃ. ৩৩)

তোমাগো বয়স অল্প, কথায় কথায় গা গরম করো (পৃ. ৩৫)

ঐসব কথা আর ধোপে টেকে না (পৃ. ৩৬)

কত মানুষের চোখে ধূলা দিয়া তাহারা সেই ভাবে দক্ষিণের এই বিপজ্জনক অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিয়া ছিল তাহা কেহ কখনও জানে নাই। (পৃ. ৩৯)

তোমাগো কী আগুনে পুড়িয়া মরার জন্য পিঁপড়ার মতো ডেনা গজাইছে। (পৃ. ৪৩)

গা গরম করিও না চান্দু, অতো দূরও আমাগো যাইতে হইবে না। (পৃ. ৪৪)

বাঁশ মারিয়া দিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যায়। (পৃ. ৮০)

চাইরদিকে একটু খেয়াল রাখিও। কোলের বোয়াল ফসকাইয়া না যায়। (পৃ. ৮৭)

অসময়ের ঝড়ে অকস্মাৎ নৌকাডুবি তাহার পক্ষে হইল শাপে বর। (পৃ. ১৪৭)

একনজরে এক জাগায় পাড়া দিয়া খাড়া দেখলে অন্য কেউও আর ধারে কাছে আউগায় না। (পৃ. ২৮৫)

মনে কয় মিঠা কথায় চিড়া ভিজবে না। (পৃ. ২৮৭)

বঙ্গোপসাগরসংলগ্ন 'ভাঁটির মুলুকে'র লোকজীবনচিত্র এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে লেখকের এতদঞ্চলসম্পৃক্ত অভিজ্ঞতা ও শিল্পভাবনার সমবায়ে। অবিরাম ভাঙা-গড়ার ঘূর্ণাবর্তে প্রকৃতির প্রতি অবিচল আস্থা এবং বিধ্বস্ততার যৌথ দোলাচলেই প্রজন্মান্তরে সম্প্রসারিত হয় তাদের সংগ্রামশীল জীবনাখ্যান। প্রকৃতির ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠার বাধ্যবাধকতা এখানকার বাসিন্দাদের দিনযাপন, জীবিকা, সামাজিক বিন্যাস ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অনিবার্যভাবেই প্রভাব বিস্তার করে। আবার একে নিজেদের আয়ত্তে রাখার তাগিদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা যেসব রীতি-নীতি, অভ্যাস, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারস্থ হয়, তা থেকেই প্রতীয়মান হয় তাদের ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। সেই বিবেচনায়, mg' ewmi এদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লোকজীবনচর্যার প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শহীদুল্লা কায়সার

আদর্শিক অবস্থানে রাজনীতিসম্পৃক্ততা [৮০] পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে অবলম্বন এবং সৃজনশীলতার প্রকাশের তাগিদে সাহিত্যচর্চা– এ তিনটি বিষয়কে মিলিয়েই[৮১] সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশিত। স্মতর্ব্য, এর কোনোটিই অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরিপূরক। উপন্যাস, গল্প, রম্যরচনা, নাটক, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, পুস্তক-সমালোচনা, ডায়েরি প্রভৃতি লেখার মধ্য দিয়ে তিনি মেধা ও শিল্পভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। পিতার পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যপ্রীতি এবং মায়ের স্নেহপরায়ণতার প্রভাব উত্তরকালে শহীদুল্লা কায়সারের জীবনে যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল তাঁর জীবন ও কর্মসাধনায় সে পরিচয় বিধৃত। মাত্র চুয়াল্লিশ বছরের স্বল্পকালীন জীবনে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত থাকতে পারেননি। 'শহীদুল্লা কায়সার বলতেন : আইয়ুব খান আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। তাই আমি সাহিত্যিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি।"[৮২] এ-মন্তব্যের অন্তরালে কৌতুক থাকলেও নির্মম বাস্তবতাকে অস্বীকারের উপায় নেই। কারাগারের নিভৃত কক্ষে নিজের ভাবনাকে প্রকাশের অন্তর্তাগিদই যে তাঁকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করত, সেটিও তাঁর সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কেননা, তিনি পেশা, রাজনীতি ও সংস্কৃতি জগতে যেভাবে দিনদিন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাতে সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়ে উঠত কিনা তাতে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন শোষিত মানুষের মুক্তির সমর্থক। জীবন-দর্শনের দিক থেকে ছিলেন তিনি সাম্যবাদী। মানুষে মানুষে কোনো রকম ভেদাভেদে যেমন তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, তেমনি সকল মানুষের সমানাধিকারের নীতিতেও ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। জীবনাদর্শের বাস্তবায়নের সংগ্রামে তিনি ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা, অক্লান্ত কর্মী। এই বিশ্বাসের জন্য আত্মগোপন অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে, অন্য দিকে কারান্তরালে কেটেছে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের আটটি বছর। দেশ ও সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে ছিল তাঁর নির্মোহ দৃষ্টি। তিনি জানতেন, কেবল তাত্ত্বিক মতাদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা দেশের মুক্তি আসে না, এজন্য প্রয়োজন অবিচলিত আস্থা ও নিরন্তর সংগ্রাম। তাই রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় কর্মীর, নিরলস ত্যাগ ও তিতিক্ষার। কিন্তু মতাদর্শের তত্ত্বগত উপলব্ধির মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন জীবনবাদী শিল্পী, একজন

সৃষ্টিশীল মানুষ। শহীদুল্লা কায়সার তাঁর জীবনযাপনের মধ্যে মানবিক সত্তাকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন। তাই একদিকে যেমন তিনি ছিলেন আপসহীন রাজনৈতিক কর্মী, অন্যদিকে ছিলেন জীবনের রূপকার এক তন্ময় শিল্পী। তাঁর কাছে সাহিত্যচর্চা পারিপার্শ্বিক জনসমাজ ও দেশের কাঙ্ক্ষিত রূপটিকে যথাসম্ভব সামগ্রিকভাবে রূপায়িত করারই নামান্তর, যা পাঠ করে পাঠকের আত্মজিজ্ঞাসা জেগে ওঠে, অন্তরে লালিত বোধ উজ্জীবিত হয়। তাই প্রবল ভাবাবেগের বশে লিখে ফেলা নিজের লেখাকেও তিনি অকপটে প্রত্যাখ্যান করে নতুনভাবে উদ্যমী হয়ে, পূর্ন প্রস্তুতি নিয়েই সারেং বৌ উপন্যাস লিখতে বসেন।[৮৩] তাঁর উপন্যামে পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমান সমাজজীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি এই সমাজের মনোজগতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সেই জীবন অকস্মাৎ থেমে যাওয়ায় শহীদুল্লা কায়সারের সাহিত্যকর্ম পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই পাকিস্তান আমলের ছ'টি সেরা সাহিত্য পুরস্কার তিনি অর্জন করেছিলেন। এরমধ্যে একটি ১৯৬২ সালে আদমজি পুরস্তার এবং ১৯৬৯ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার তিনি লাভ করেন। পরে প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৮৩ সালে একুশে পদক এবং ১৯৯৮ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার তিনি লাভ করেন। [৮৪] KòPov †gN, w'M‡šÍ d‡ji Av¸b, mv‡is †eŠ, Km‡gi Kvbv, msk߆K, P›'fv‡bi Kb¨v, K‡e †cvnv‡e wefveix প্রভৃতি তাঁর লিখিত উপন্যাস।

mv‡is †eŠ

শহীদুল্লা কায়সারের mv‡is †eŠ [৮৫](১৯৬২) পূর্ব-পাকিস্তানের এক গ্রামীণ নারীর অস্তিত্বসংগ্রাম ও সামূহিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নারীত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত হওয়ার বিশ্বস্ত শিল্পরূপ। নদী ও সাগরসংলগ্ন খেটে খাওয়া মানুষের জীবনধারার আভাস সত্ত্বেও নবিতুন-কদম সারেংয়ের সাংসারিক চালচিত্র ও দাম্পত্যসম্পর্কের বিন্যাস এর উপজীব্য। তবে, বাঙালি মুসলমান লোকসমাজে প্রচলিত বিবিধ বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার, মূল্যবোধ ও সামাজিক অনুশাসন, প্রাত্যহিক জীবনে অবলম্বিত ভাষাকে ঘিরে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কয়াল নদীসংলগ্ন বামনছাড়ি গ্রামে প্রচলিত, এর সংক্ষিপ্ত অথচ পরিশীলিত রূপায়ণ উপন্যাসটিতে শিল্পরূপ পেয়েছে[৮৬]। নবিতুনের প্রাত্যহিক দিনযাপনের বর্ণনায়, গ্রামের সুবিধাবাদী-নারীলোলুপ কুচক্রী মহলের বিরুদ্ধে নারীত্মের মহিমা অটুট রাখার লড়াইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে এ গ্রামের বাসিন্দাদের চেতনালোকে সন্নিহিত লোকজভাবনার স্বরূপ। কদম সারেংয়ের নাবিক জীবন[৮৭] নবিতুনকে সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক বলয়ে নিঃসঙ্গ করে তুললেও অপরিসীম জীবনস্পৃহা আর সন্তানের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ তার চরিত্রের অনন্যসাধারণ প্রবণতা। সেকারণেই অস্তিত্বসংগ্রামের পথে সমুদয় বাধাকে অতিক্রম সত্ত্বেও প্রিয় মানুষটির দ্বারা লাঞ্ছিত হবার মর্মদাহ তাকে জীবনবিমুখ করেনি। নিত্যদিনের গৃহকর্মে, উদরপূর্তির দায়ে, সাংসারিক প্রয়োজন সম্পন্ন করার আয়োজনে নবিতুনের মনোলোকে সন্নিহিত আবেগ, সংবেদনা, ভাবনারাশির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পারিপার্শ্বিক লোকজীবনের নানা উপাদান। কেননা, কোনো মানুষই পরিবার-সমাজ বহির্ভূত স্বয়ম্ভূ জীবনের অধিকারী নয়। পাশাপাশি, গোষ্ঠীজীবনের উন্মীলন যখন প্রকৃতির বৈরিতায় ত্বরান্বিত হবার উপক্রম, তখন মনোলোকে সঞ্জাত লোকজভাবনাকে[৮৮] আশ্রয় করেই তারা বলীয়ান হয়ে ওঠে অস্তিত্বরক্ষার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়।

১. লোকসংস্কার-- বামনছাড়ির গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন ধরনের লোকসংস্কার প্রচলিত। এসব লোকসংস্কারে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত বিভিন্ন বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আদেশ-নিষেধ, শুভ কামনা, সর্বোপরি পারস্পরিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় রূপ–

১.১ দিব্যি দেয়া

> হ্যাঁ গো, তুমি ওদের থেকে দূরে দূরে থাক তো? ওরা কিন্তু জাদু জানে, অনেক মন্তর জানে। ... হুঁ, ছোট করে বলে আবারও মুচকি হাসে কদম। ... কদমের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝি সংশয়মুক্ত হয় নবিতুন। কেন যেন মনে হয় নবিতুনের, সব সময়ই মনে হয়, লোকটার মুখ দেখেই ও বুঝে নিতে পারে লোকটার মনের কথা, আসল কথা। তবু বলল নবিতুন, খোদার কসম? ... খোদার কসম। কসম খেয়ে রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেল কদম। (পৃ. ১৭)[৮৯]

এ উদ্ধৃতিতে নবিতুন ও কদম সারেংয়ের পারস্পরিক সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে সমুদ্রপাড়ের মেমদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা, যার মূলে রয়েছে তাদের জীবনাভিজ্ঞতাগত স্বাতন্ত্র্য। মেমদের প্রতি নবিতুনের ধারণা তাকে স্বামী সম্পর্কে যে সন্দিহান করে তোলে, এর মূলে রয়েছে লোকসমাজে প্রচলিত গালগল্প ও কাহিনীর প্রভাব। স্বামী মেমের প্রতি আসক্ত, এরূপ ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিতেই নবিতুন একপর্যায়ে তাকে স্রষ্টার নামে দিব্যি করিয়ে নেয়, যা লোকসংস্কারেরই অংশ। একদিকে প্রতিজ্ঞা আদায়কারীর স্বস্তিবোধ, বিপরীতে প্রতিজ্ঞাকারীর করণীয় সম্পর্কিত সতর্কতা এ লোকসংস্কারের মূলে সক্রিয়। এভাবেই নবিতুন স্বামীর ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে ওঠে।

খ. আশীর্বাদ/মঙ্গল কামনা

> ক. চৌধুরী বাড়ির কামটা দাসীর কাম। কিন্তু, কাম-কাজ সেরে নিজের ভাতটা লয়ে বাড়ি ফিরতে পারে নবিতুন। রাত্রে বাড়িতেই থাকে ও। দাসীগিরির সাথে এটুকুই তফাৎ। এই তফাৎটুকুই যেন নবিতুনের মান-ইজ্জত আর আব্রুর নিশ্চিত দলিল। ... গুঁজাবুড়ি আর পেটের জ্বালায় চারদিকে যখন অন্ধকার দেখছিল নবিতুন ঠিক সেই সময়ই চৌধুরী বাড়ির কামটা পেয়ে গেছিল নবিতুন। তাই আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দোয়া মাগে নবিতুন, আল্লা যেন চৌধুরীদের বেহেশত নসিব করে। (পৃ. ৫৮)
>
> খ. ফুরুৎ ফুরুৎ পানি টানছে আক্কি আর নবিতুন দেখছে গুঁজাবুড়িকে। ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রশান্তি গুঁজাবুড়ির মুখে। এক মুঠো পান্তা খেয়েই এত তৃপ্তি গুঁজাবুড়ির? ... আল্লা তোর হায়াত দারাজ করুক, ইজ্জতে হরমতে রাখুক। গুঁজাবুড়ির প্রার্থনায় কি আন্তরিকতার সুর? তা নইলে সে সুর এমন স্পর্শ করে কেন নবিতুনকে? নবিতুনের মনে পড়ল বাপজানের মৃত্যুর পর এমন অন্তর নিংড়ানো দরদে কেউ তো কোন দিন দোয়া মাংগেনি নবিতুনের জন্য? আবারও তাজ্জব হয় নবিতুন। ... সেসব কথা কিছুই বলল না গুঁজাবুড়ি। আর একবার আল্লার দরবারে নবিতুনের দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা জানিয়ে লাঠিটা হাতে তুলে নিল। (পৃ. ৬৭)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নবিতুনের মনোতুষ্টির অন্তরালে রয়েছে তার প্রবঞ্চিত জীবনের হাহাকার। কেননা, কদম সারেংয়ের স্ত্রী হিসেবে যে নারী ছিল নিজ গৃহের কর্ত্রী, যাকে কখনো অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়নি মেয়েকে নিয়ে ভরণপোষণে, তাকেই একপর্যায়ে দাসীবৃত্তিতে বাধ্য হতে হয় উদরপূর্তির নির্মমতায়। কদম সারেংয়ের অনিশ্চিত প্রবাস জীবন নবিতুনকে বাধ্য করেছিল চৌধুরীবাড়িতে পরিচারিকার কাজ নিতে। যদিও আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবার একাধিক প্রলোভন ও সুযোগ তার ছিল, তবু সে নারীত্বের অবমাননার পথে যায়নি। চৌধুরীবাড়ির ঝিগিরি তাকে ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্ত করেছিল। শুধু তাই নয়, রাতের বেলা চৌধুরীবাড়ির পরিবর্তে নিজগৃহে থাকবার বন্দোবস্ত তার আত্মমর্যাদা রক্ষার সুযোগও দিয়েছিল। তাই সে তাদের মঙ্গল প্রত্যাশায় স্রষ্টার নিকট অনুগ্রহপ্রকাশে সচেষ্ট ছিল। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নবিতুনের প্রতি গুঁজাবুড়ির আশীর্বচনে রয়েছে তার মনোলোকে সন্নিহিত শুভচিন্তা, কল্যাণকামী জীবনদৃষ্টি ও কৃতজ্ঞতাবোধ। উপন্যাসের প্রারম্ভ পর্যায়ে লুন্দর শেখের দূতী হিসেবে নবিতুনকে প্রলুব্ধ করতে তার যে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালিত, এর ঠিক বিপরীত অবস্থানে গুঁজাবুড়ির আত্মপ্রকাশের দৃষ্টান্ত উক্ত উদ্ধৃতি। কেননা, তার ঘোষিত বিবিধ প্রলোভনকে উপেক্ষা করে নবিতুন মেয়েকে নিয়ে কোনোমতে দিন পার করছিল। একপর্যায়ে গ্রামবাসী, এমনকি নবিতুনের দ্বারাও ধিকৃত এ অসহায় নারী তারই শরণাপন্ন হয় ক্ষুধার তাড়নায়। কেননা, লুন্দর শেখের অনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে সে সমর্থ হয়নি। নবিতুনের প্রতি তার অশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশিত হয়েছে স্রষ্টার নিকট তার কল্যাণ কামনায়, যদিও গুঁজাবুড়ি আজীবন অসৎ পথে থেকেছে। তার পরিবর্তিত মানসিকতার আত্মপ্রকাশে স্রষ্টার প্রতি আস্থাস্থাপনের ধর্মীয় লোকভাবনাই সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

১.৩ বিবিধ

ক. বয়সের চাপে আর ব্যারামের দাপটে লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলে সগির মা। তাই সগির মা ওকে কেউ বলে না আজকাল, বলে গুঁজাবুড়ি। গুঁজাবুড়ি কুটনী বুড়ি, গুঁজাবুড়ি পুবপাড়ার লুন্দরশেখের কুটনী মাগী, গুঁজাবুড়ি নবিতুনের নয়ন জ্বালা, গায়ের জ্বালা, গলার বিষ। ... গুঁজাবুড়ির ওই শকুনি মুখ দেখলে আর ওই শয়তানি কথা শুনলে না- মেজাজ থাকে ঠিক, না-মন লাগে কামে। ... গুঁজাবুড়ি, তুই কুটনী, তুই শয়তান, দূর হ দূর হ তুই। ... মনে-মনে হাসে গুঁজাবুড়ি। ... বলে–বিবির সুখে থাকবিরে নবিতুন। বিবির সুখে থাকবি। বৌদের বড় মহব্বত করে লুন্দর শেখ। ... মুখে তোর পোকা পড়ুক। জিব তোর খসে পড়ুক। ... সগির মা হাসে মনে-মনে। বলে– তা তুই যদি খুশি মুখ কর নবিতুন। আমার তো দিল পোড়ে তোর লাগি। তোর 'শরীলে' যে ঢল ঢল জোয়ানকির জোয়ার। এ ঢল যে 'বিরথাই' যায় নবিতুন! ... আহ্ কুটনী বুড়ি! বের হ। বের হ তুই। মেয়ে খাগী ছেলে খাগী খসম খাগী। ... তোর মুখ দেখলে পাপ। তোর কথা শুনলে পাপ। ... নিজের মনেই গজগজ করে নবিতুন। ওই শয়তানি বুড়ি শুধু সকাল নয় গোটা দিনটাই বুঝি মাটি করে দিয়ে গেল ওর। (পৃ. ১১-১২)

খ. দু'বছরের জায়গায় তিনটি বছর কেটে গেল, না একটা খবর, না একখানা চিঠি। এমন তো হয়নি কখনো? ... তবে? কি এক আশঙ্কায় ধুক করে ওঠে নবিতুনের বুকের ভেতরটা। অসুখ-বিসুখ বা তার চেয়েও মারাত্মক কিছু? আল্লায় না করুক, অমন আশঙ্কা মনের ভেতর ঠাঁই দেয় না নবিতুন। ... হঠাৎ সেই মেয়েখাগী ছেলেখাগী খসমখাগী গুঁজাবুড়ির শয়তানি মুখটা ভেসে ওঠে নবিতুনের চোখের সমুখে। কানের কাছে যেন কিলবিলিয়ে ওঠে সেই শয়তানি মুখটা–সারেং আসবে নারে, আসবে না, বিদেশের সোয়াদ যে পায়, সে কখনো দেশে ফেরে না। ... গুঁজাবুড়ি ছাড়াও আরো লোকের মুখে শুনেছে নবিতুন, বেগানা লোকদের জন্য বিদেশের পথে নাকি শুধু ফাঁদ আর ফাঁদ। সে ফাঁদে আটকা পড়ে এ দেশের জাহাজি। ফাঁদের মায়ায় ভুলে যায় দেশের কথা। শাদি করে। ঘর করে বিদেশিনীর। ধীরে ধীরে বিদেশিনীর জাদুতে মন যায় বদলে। মন থেকে মুছে যায় আপন দেশের ফেলে আসা 'আবাগী' বৌটির স্মৃতি। ... নবিতুনের জানামতে এমন ঘটনা যে একেবারে নেই তা তো নয়! এই বামনছাড়ি গ্রামের মিজি বাড়ির ছেলে রইসুদ্দি, সেই যে গেল জাহাজের সুকানি হয়ে আর ফেরেনি। নবিতুন শুনেছে অনেক সাগর পেরিয়ে বহুত দূরে নাকি সাদা সাহেবদের দেশ। সেই সাদা সাহেবদের দেশে থাকে মেম নামের জাদুকরিরা। সে এক মেম নামের জাদুকরির ফাঁদে বন্দি হয়েছে রইসুদ্দি। ...লোকে বলে, বামনছড়ির গাঙ পার থেকে শুরু হয়েছে কদুর খিল, তারপর যে পিয়ালগাছা, সেসব গ্রামে নাকি এমন ঘটনা 'আকসার' ঘটছে। ... কিন্তু কদম সারেং, নবিতুনের সারেং কি সেই জাতের মানুষ? না, কেউ কসম খেয়ে বললেও বিশ্বাস করবে না নবিতুন। মেম মায়াবিনীর ফাঁদে পা দেবে তেমন মানুষই নয় কদম সারেং। (পৃ. ১৬)

গ. বাপের কাছে রইসুদ্দির চিঠি এসেছে, টাকা এসেছে। সেই সাথে এসেছে ওর মেম জাদুকরির 'ফুটু'। ... ফটো দেখে তো তাজ্জব নবিতুন। ... ওমা এই ফু-টু। ডাইনী না বেবুশ্যে গো? দেখ না কেমন ছিনালী হাসি, তা আবার মরদটার কাঁধে হাত রেখে কি ঢলাঢলি। ... মা গো কি বেশরম বেহায়া বেলাজ। শরমে বুঝি মরে যায় নবিতুন, তবু উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখে ফটোটা। উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখে বুঝি ঘিনঘিন করে নবিতুনের গাটা। নাক কুঁচকায়, চোখ উলটায়। ... ওমা! সাহেব দেশের মেম ডাইনীগুলো ন্যাংটা থাকে নাকি গো! মাথায় নেই ঘোমটা, গায়ে নেই কাপড়। অর্ধেকটা ঊরু খোলা। ছিঃ ছিঃ! রইসুদ্দি শেষে এমন ছিনালীর খপ্পরে পড়েছে! ... নবিতুন তখনো বলে চলেছে, ওরে বাবা! এদিক নেই আবার সেদিক আছে। বেবুশ্যের মতো ন্যাংটা, ওদিকে পায়ে 'জোতা', 'জোতা'র সাথে ফের মোজা। ইস, ছিনালের কতো ঠাম! তারপর ঘেন্নার সাথে ফটোটা ফেরত দিয়েছিল নবিতুন। ... তবে কি হাসমতির কথাটা ঠিক? কদম, কোরবান, শরবতির ভাই, একই জাহাজেই তো ঘুরছে ওরা। তখন কি ওদের মতো কদম সারেংও ডাইনীগুলোর সাথে গা ঢলাঢলি করেছে? ... না না, নবিতুনের সারেং অমন লোকই নয়। কদমের দিকে চোখ করে বলে নবিতুন, না গো না ওরা ভালো না। ... ওরা খারাপ। অমন বেহায়া, বেবুশ্যার মতো ন্যাংটা আর অমন ছিনালী ঢং-ওরা খারাপ। (পৃ. ১৫-১৭)

ঘ. বাপের মতো মুখ পেয়েছে আক্কি। সে মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে নবিতুন। ... সেই নাক, সেই চোখ, এমন কি চিবুকের সেই কুঞ্জনটুকুও। লোকে বলে যে মেয়ে পায় বাপের গড়ন সে নাকি লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী। আহা, তাই যেন হয় আক্কি। পুতেঝিয়ে ঘরে খামারে লক্ষ্মীবতী হোক আক্কি। ... নবিতুন পেয়েছে মায়ের শ্রী, মায়ের মুখ। এই শ্রী, এই মুখটাই বুঝি কাল হলো তার। লুন্দর শেখের বদনজর, গ্রামের যত গুণ্ডা সাণ্ডার কুই, রাত বিরেতের উপদ্রব, সবই ওই ঢক নকশার শরীর আর কালো মুখের শ্রীটার জন্য। ... আক্ষেপ হয় নবিতুনের, খেদ জাগে। যদি পেত বাপের ঢক, গায়ে বা

মুখে কোথাও একটু খানি বাপজানের নমুনা, তবে বুঝি এত দুর্দশায় পড়ত না নবিতুন। ভাগ্যবতী হতো নবিতুন, সুখের ঘরে হেসে খেলে জনম কাটত। (পৃ. ৫৭)

ঙ. বলে চলত নবিতুন, ক্ষেতখামার গেরস্তের লক্ষ্মী। ক্ষেতি নেই খোন্দ নেই, সে কেমন গেরস্ত গো? ... এবার উত্তর না দিয়ে থাকতে পারত না কদম। কদম বলত, আমি যা রোজগার করে আনি গেরস্তিতে যে তার অর্ধেকও পাবি না নবিতুন! ... তখখুনি জবাব দিত নবিতুন।– থাক রোজগার। গেরস্তি কর। গেরস্তিতে আয়। গেরস্তিতে লক্ষ্মী। (পৃ. ৭৬)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গুঁজাবুড়ির প্রতি নবিতুনের বিরূপ মনোভঙ্গি অভিশাপ উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কেননা, নবিতুনের আর্থিক দৈন্য, সাংসারিক অনটন ও গ্রামে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে গুঁজাবুড়ি তাকে লম্পট লুন্দর শেখের প্রতি প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল। গ্রামীণ বাঙালি লোকসমাজে গৃহবধূর প্রতি নির্দেশিত আচরণ ও অনুশাসনকে নবিতুন সযত্নে ধারণ করতে সচেষ্ট। তাই স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের প্রতি সে অনাগ্রহী। গুঁজাবুড়ির খল, শঠ স্বভাব সম্পর্কে অবহিত বলেই নবিতুন তাকে বাড়ি থেকে বিতাড়নে সচেষ্ট। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে স্বামী কদমের প্রতি নবিতুনের ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতা প্রকাশিত হয়েছে তাকে হারাবার আশঙ্কায়। গুঁজাবুড়ির মিথ্যা হুমকি তাকে বিভ্রান্ত করলেও শেষ পর্যন্ত সে স্বামীর প্রতি আস্থাশীল বলেই নিজের মনোলোকে সঞ্জাত ভীতিবোধকে অতিক্রমে সচেষ্ট হয়। নবিতুনের ভাবনায় স্বামীকে হারাবার শঙ্কা সৃষ্টির মূলে ভূমিকা পালন করেছে বাঙালি সমাজে প্রচলিত লোকসংস্কার। বিশেষত, নিরক্ষর গ্রামীণ সমাজে সমুদ্রের অপর পারের দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন কাল্পনিক ধারণা প্রচলি। 'সাদা সাহেবদের দেশ' ও 'মেম' সংক্রান্ত কাহিনী এসব ধারণার ভিত্তিমূলে সক্রিয়। বিশেষত, সাহেবদের স্ত্রী মেমরা জাদুকরি। তাদের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে জাদুবলে কদম সারেঙের মত এদেশী জাহাজীদের বশীভূত করার, এরূপ ধারণা নবিতুনের মনোলোকে সঞ্চারে এসব কল্পকাহিনীর ভূমিকাই প্রধান। গুঁজাবুড়ির হুমকি ও লোকমুখে শ্রুত কাহিনী নবিতুনের শঙ্কাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কেননা দীর্ঘ তিন বছর ধরে নিরুদ্দেশ কদম সারেংয়ের কোনো খোঁজ পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নবিতুনের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত মনোভঙ্গির সমান্তরালে রয়েছে পাশ্চাত্যের বা সমুদ্র পেরুনো ভিনদেশের নারীদের দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রতিতুলনার প্রচেষ্টা। বাঙালি নারীর লালিত সংস্কার, মূল্যবোধ ও আচরণের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক মেমসাহেবের ভাবাবহ নবিতুনকে শুধু বিক্ষুব্ধই করেনি, একইসঙ্গে বাঙালি লোকসমাজে নারী সম্পর্কিত সমুদয় নেতিবাচক ভাবমূর্তি আরোপেও উদ্বুদ্ধ করেছে। 'ডাইনী' 'বেবুশ্যে' 'ছিনালী' প্রভৃতি সম্ভাষণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। বাঙালি লোকসমাজে নারীর ভূমিকা বরাবর স্বামীর অনুগত, বাধ্য, নির্ভরশীল অবস্থানে নির্ধারিত। সেখানে সে স্বামীর সমকক্ষ নয়। অন্যদিকে ছবিতে দেখা মেমসাহেবের পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গি ও সংকোচহীন অভিব্যক্তি নবিতুনের নিকট অগ্রহণযোগ্য। কেননা সে যে সমাজের বাসিন্দা এবং যে মূল্যবোধের অনুসারী, সেখানে নারীর এরূপ প্রতিমূর্তি উস্কানি, কপটতা ও প্রলোভনেরই নামান্তর। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি লোকসমাজে প্রচণিত সংস্কারের প্রতি নবিতুনের আস্থা স্থাপনের সমান্তরালে রয়েছে তার বিড়ম্বিত জীবনের বৃত্তান্ত। মেয়ে দেখতে বাপের মত হলে তাকে লক্ষ্মী বা ভাগ্যবতী হিসেবে বিবেচনার রীতি স্বীকৃত। সেকারণে মেয়ে আক্কির সঙ্গে স্বামী কদম সারেংয়ের দৈহিক সাদৃশ্য নবিতুনকে পুলকিত করলেও একপর্যায়ে তারই সঙ্গে প্রতিতুলনায় সে নিজের কথা ভেবে হীনম্মন্যতায় ভোগে। কেননা, নবিতুনের অসামান্য রূপ ও যৌবনদীপ্ত সৌন্দর্য পদে পদে তাকে বিভিন্নভাবে বিড়ম্বিত করে। গ্রামের কামলোলুপ পুরুষদের উগ্রতা ও প্রলোভনে অতিষ্ঠ নবিতুন এ হেনস্তার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে পিতার সঙ্গে তার অবয়বগত ভিন্নতাকে। যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা নবিতুনকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে এবং নারীত্বের অবমাননার সুযোগ সৃষ্টি করে, তা অনুধাবনের সুযোগ ও সামর্থ্য নবিতুনের নেই। সেকারণেই লোকসংস্কারে আস্থাশীল নবিতুন এভাবেই তার নিগ্রহের হিসাব মেলাতে সচেষ্ট হয়। 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নবিতুনের সঙ্গে কদম সারেংয়ের পারস্পরিক সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে দুই বিপ্রতীপ সংস্কৃতির টানাপোড়েন। আবহমানকাল থেকেই বাঙালি সমাজে কৃষিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি পক্ষপাত লক্ষণীয়। গৃহ, পরিবার, সংসারের মমত্বময় বন্ধনের সঙ্গে কৃষিকর্মের নিবিড় সম্পৃক্ততাকে নবিতুন উপলব্ধি করতে সচেষ্ট। কেননা, জীবিকার

তাড়নায় স্বামীর জাহাজী জীবনে বিদ্যমান অনিশ্চয়তা, দূরত্ববোধ ও আশঙ্কা তাকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করে। জমিতে কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে যে স্বস্তি ও পারিবারিক সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা বিদ্যমান, এর প্রতি নবিতুনের পক্ষপাত প্রকাশিত হয়েছে উক্ত লোকসংস্কারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে।

২. লোকাচার–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত লোকাচারসমূহের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত একাধিক লোকাচারের উল্লেখ লক্ষণীয়। মুসলমান সমাজে নুহ নবীর ইসলামী লোকপুরাণের পাশাপাশি বাতাস, ঝড়, বিদ্যুৎ, বান, জলোচ্ছ্বাস সংক্রান্ত নানা বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত। এসব লোকজ উপাদানে সন্নিহিত ভাবনা থেকে বামনছাড়ির গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন– উপন্যাসের '১৩' পরিচ্ছেদে সমুদ্রের রুদ্রমূর্তি ধারণ ও ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়ার তাণ্ডব মিলে যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তাতে গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। টানা দুদিনের একটানা বর্ষণ, গরম হাওয়ার তাণ্ডব আর মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঘনঘটা পরিস্থিতিকে যখন অশান্ত করে তুলেছিল, ঠিক তখন আকস্মিকভাবে সামুদ্রিক বান ছুটে আসার আওয়াজ তাদের বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল, প্রাণরক্ষার দায়ে। সেই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ কামিজদ্দির পরামর্শের ওপর সবাই ভরসা করেছিল। কেননা, সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হয়ে সে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল। গ্রামবাসীকে নিজ নিজ ঘরে গিয়ে স্রষ্টার অনুকম্পালাভের জন্য দোয়া পাঠ করা, ছেলে কোরবানকে যত জোরে সম্ভব আজান দেয়ার আহ্বান লোকমানসে সন্নিহিত ধর্মভাবনায় আস্থা স্থাপনেরই দৃষ্টান্ত, যার উদ্দেশ্য অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা। আক্কির আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লোকজচেতনায় সঞ্চারিত অসাম্প্রদায়িক ভাবনা। সনাতন ধর্মের অনুসারীদের পবন ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে পিঁড়ি ছুঁড়ে, ছড়া কেটে শান্ত করার প্রাচীন লোকাচারকে অনুসরণের ঘটনায় বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। যদিও এতে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেনি, তবু এসব আচরণের মাধ্যমে গ্রামীণ লোকসমাজে অনুসৃত লোকাচারের পরিচয় মেলে। কামিজদ্দি ছেলেকে পুনরায় আজান দেয়ার আহ্বান জানায়। কেননা, এ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস হলো 'আজান হলো শয়তানের যম। আজানের এক একটি শব্দ যতদূর পৌঁছবে তার ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারবে না শয়তান' (পৃ. ১১৪)। এরপর ছেলের ওপর ভরসার পরিবর্তে সে নিজেই আজান দেয়। বহুদূর থেকে ভেসে আসা সামুদ্রিক বানের আওয়াজে ভীত গ্রামবাসীকে কামিজদ্দির বিশেষ দোয়া পাঠের নির্দেশ, বজ্রের অবিরাম হুঙ্কারকে 'শয়তানের তীর আগুনের তীর' (পৃ. ১১৪) হিসেবে বিবেচনা করে সেদিকে দৃষ্টিপাতের নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি প্রসঙ্গ থেকে গ্রামবাসীর সমষ্টিচেতনায় সংগুপ্ত লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে, উপন্যাসের '৭' সংখ্যক পরিচ্ছেদে পালপাড়ার মাঘমণ্ডলের ব্রত উদ্‌যাপনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লক্ষণীয়–

> আমের ডালপালা ভেঙে ঘর বানিয়েছে ওরা। ঘরের সুমুখে লেপে মুছে সুন্দর করে উঠোন বানিয়েছে। উঠোনে মাটি গোলা আর রঙ মিশিয়ে নানা ছবি এঁকেছে ওরা। কোনটা সূর্য, কোনটা চাঁদ, কোনটা তারা। উঠোনের এক পাশে মাটি তুলে তুলে উনুন বানাচ্ছে ওরা। সেখানে বুঝি 'জোলাভাতি' রান্না হবে ওদের। ... মাঘমণ্ডলের ব্রত হয়েছিল পালবাড়িতে। তারই অনুকরণে আক্কি আর ওর সখীরা ছবি আঁকা উঠোনে খেলছে, নাচছে, গান করছে, ছড়া কাটছে। (পৃ. ৬৬)

৩. লোকসাহিত্য–– এ উপন্যাসে বামনছাড়ির লোকসমাজে প্রচলিত ইসলামী লোকপুরাণ রূপকথা, লোকগীতি ও ছড়ার উল্লেখ লক্ষণীয়।

৩.১ কিংবদন্তি

> হজরত নুহের কথা বলেছি না তোদের? সেই নু-সাল্লামের জামানায় পাপে ভরে গেল দুনিয়া। গোনাহ, গোমরাহ হাজারো পাপে ভরে আছে মানুষের মন। মানুষ ভুলে গেছে খোদাওয়ানতালার কথা, নেক কথা, নেক কাজ, নেক চিন্তা সব। নু-সাল্লাম ওদের ডেকে বললেন, হে মানুষ! তোমরা নেকির পথে ফিরে আস, পাপের রাস্তা ছেড়ে নেক কথা নেক চিন্তার পথে আস। আমি বলছি, খোদাওয়ানতালা সহ্য করবেন না এত পাপ। আসমান থেকে পানি ঢেলে তামাম দুনিয়া ডুবিয়ে দেবেন তিনি। সব পাপ, সব গোনাহগার বান্দা ভেসে যাবে। তোমরা সাবধান হও ... নু-সাল্লামের কথা শুনে মানুষ হাসল। ঠাট্টা

> করল। তবু আল্লাহ পয়গম্বর নু-সাল্লাম সাবধান করেন ওদের। ওরা শুধু ঠাট্টা করে। ... দিন যায়। মাস যায়। নু-সাল্লাম হুঁশিয়ার করে চলেন ওদের। ওরা হেসে উড়িয়ে দেয় তার কথা। ... শেষে এলো সেই দিন, সেই গজবের দিন। আকাশ ফেটে পানি পড়তে লাগল। মাটি ফুঁড়ে পানি উঠতে লাগল। নু-সাল্লাম বানিয়ে রেখেছিলেন মস্ত বড় এক জাহাজ। নিজের পরিবার আর নেকবক্তদের নিয়ে তিনি গিয়ে উঠলেন এই জাহাজে। মানুষদের ডেকে বললেন তিনি, এখনো সময় আছে, উঠে এসো জাহাজে। ওরা ঠাট্টা করে বলল, তুমি থাক তোমার জাহাজে। পানির তোড়ে কতক্ষণ টিকবে ওই জাহাজ। আমরা চললাম পাহাড়ে। বানের পানি তো আর পাহাড়কে ছাপিয়ে যেতে পারবে না? ... এদিকে পানি উঠছে তো উঠছেই তার আর ক্ষান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ার পশু-পক্ষী দুনিয়ার যত প্রাণী রয়েছে সবই একজোড়া একজোড়া করে আপন জাহাজে তুলে নিলেন নু-সাল্লাম। পানির উপরে ভেসে ভেসে চলল তার জাহাজ। ... ওদিকে সেই পাপী আর মূর্খের দল। পাহাড়ে উঠেও ওরা রক্ষা পেল না। দেখতে দেখতে ডুবে গেল তামাম দুনিয়া। সেই পাহাড়ও। উঠতে উঠতে পানি আসমান ছুঁল। পাপ আর পাপী সবাই ডুবে মরল। বাঁচল শুধু নু-সাল্লাম আর তাঁর জাহাজের নেকবক্ত ছোট্ট দলটি। সেই এক গর্কি হয়েছিল বটে। ... এই কিসসাও নতুন নয়। সারেং বাড়ির ছেলেমেয়ে, এই বামনছাড়ি, কদুরখিল মাদারটেকের ছেলেমেয়েরা ভুমিষ্ঠ হয়েই শুনে আসছে এ কাহিনী। (পৃ. ১১৮)

নুহ নবীর কিংবদন্তি বামনছাড়ির লোকসমাজে প্রচলিত, কেননা, এতে নিহিত অভিজ্ঞতা তাদের নিত্যদিনের জীবনসংগ্রাম-সংশ্লিষ্ট। বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট থেকে ছেলেমেয়েরা এ কিংবদন্তি শুনতে শুনতেই বেড়ে ওঠে। একদিকে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুসরণ ও স্রষ্টার প্রতি আস্থা স্থাপন, অন্যদিকে প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে জীবনপ্রবাহের নাটকীয় পরিবর্তনের অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ অনস্বীকার্য বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা এ কিংবদন্তিকে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

৩.২ রূপকথার অনুষঙ্গ

> ক. ভেবে দেখরে নবিতুন, আমার কথাটা ভেবে দেখ। পালঙ্কে বসে পায়ের উপর পা তুলে খাবি, থুবি, হুকুম চালাবি। হুঁ করবি অমনি হাঁ করে ছুটে আসবে এক গণ্ডা দাসীবান্দী। হাত টিপবে, পা টিপবে বান্দী। চুল আঁচড়াবে, গোসল করাবে বান্দী। এরি নাম না ঘর করা। (পৃ. ১০)
>
> খ. এত এত বান্দী, এত এত ধনদৌলত লুন্দরশেখের। মস্তবড় বালাখানা শেখবাড়ির। নবিতুন হবে সে বালাখানার রাণী। নবিতুনের পায়ে গড়াগড়ি খাবে সোনা-চান্দি দাসীবান্দী আর খোদ লুন্দর শেখ। (পৃ. ৬৫)
>
> গ. পাঁচ বৌ লুন্দর শেখের। পাঁচ বৌর মাঝে তুই হবি রানী, রানীর সুখে থাকবি। (পৃ. ১২)
>
> ঘ. সহসা পূব-দক্ষিণ কোণ থেকে ছুটে এলো কতগুলো মেঘ। কালো কালো বিরাটকায় দৈত্যের মতো মেঘ! (পৃ. ১১৪)
>
> ঙ. দৈত্যের মতো কালো কালো মেঘগুলো সরে গেল পশ্চিম দিকে। কিন্তু ফর্সা হলো না আকাশ। ... শোঁ ওঁ ওঁ শোঁ ওঁ ওঁ। এবার আওয়াজ নয়। শব্দ নয়। লক্ষ দৈত্যদানব যেন ক্রুদ্ধ গর্জনে হুংকার ছেড়ে ছুটে আসছে। (পৃ. ১১৫)

'ক', 'খ', 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিত্রয়ে নবিতুনের প্রতি গুঁজাবুড়ির কুচক্রী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশে রূপকথার নেপথ্য ভূমিকা লক্ষণীয়। লুন্দর শেখের স্ত্রী হলে নবিতুনের অবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন ঘটবে, তার জীবনের সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটবে, রানীর মত অতুলনীয় ঐশ্বর্যময় জীবন সে যাপন করবে, গুঁজাবুড়ির এসব প্রলোভনের মূলে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত রূপকথার প্রভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, কদম সারেমের স্ত্রী, আক্কির জননী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি লুন্দর শেখের কামাসক্তিকে চরিতার্থ করতে গুঁজাবুড়ির যে ভূমিকা পালন, তাতেও রূপকথার খল চরিত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। 'ঘ' ও 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিদ্বয়ে রূপকথার অতিকায়, কুৎসিতদর্শন ভয়ংকর চরিত্র দৈত্য-দানবের সঙ্গে মেঘের প্রতিতুলনায় লোকমানসে এতৎসংশ্লিষ্ট বিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটেছে। বিরূপ আবহাওয়ার প্রভাবে আকাশে ভাসমান মেঘের সঙ্গে দৈত্যদানবের সাদৃশ্য কল্পনা লোকজীবনে রূপকথার প্রভাবকে স্মরণ করায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ লোকগীতি

হিরামতি হিরামতি

আমি যামু সুধারাম কন্যামতি।

হিরামতি হিরামতি

তোমার লইগা আনমু কি,

পুঁতির মালা পইরবে কি?

পুঁতির মালা কালা সুতায় লাল

পুঁতির মালা ধলা সুতায় নীল?

পুঁতির মালা গলার চিক

পুঁতির মালা গুলবদনি ঝিলিক।

হিরামতি হিরামতি

বড় গাংগে নাও ভাসিয়ে

গহিন জলে ডুবাল দিয়ে

আমি যামু সুধারাম কন্যামতি। (পৃ. ১৮-১৯)

এ লোকগীতিতে প্রকাশিত হয়েছে সুন্দরী নারীর প্রতি প্রেমিকপুরুষের অভিযাত্রিক মানসিকতা, তাকে খুশি করতে দূরদেশে গিয়ে উপহার আনতে বিবিধ বাধা অতিক্রমের দুঃসাহস, সর্বোপরি তার প্রতি বিমুগ্ধতার অকপট উচ্চারণ। নবিতুনের প্রতি কদম সারেংয়ের হার্দ্যিক প্রণয় এ লোকগীতিতে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে লোকগীতের প্রেমিকের সমান্তরাল ভূমিকাই প্রতিপালিত। কেননা, নবিতুনকে বিয়ের পর সারেংয়ের পেশায় থেকে সে দেশ-বিদেশের নানা স্থান ও বন্দর ঘুরে বিভিন্ন উপহার নিয়ে আসত। লোকগীতি ও বাস্তব জীবনের সাদৃশ্য অনুধাবনে লোকমানসে সঞ্চারিত উপাদানসমূহের প্রাসঙ্গিকতা তাই অনস্বীকার্য।

৩.৪ ছড়া–– এ উপন্যাসে মোট তিনটি ছড়া প্রযুক্ত হয়েছে। কদম সারেং ও নবীতুনের মেয়ে আক্কি এসব ছড়া কাটে।

ক. কলই খেতে নাইকো ফুল

গৌরীর মাথায় দীগ্‌গল চুল।

দীগ্‌গল চুলে মারল বাড়ি

ফুল ফুইটাছে সারি সারি। (পৃ. ৬৬)

খ. আম পাকে জাম পাকে

মামা বাড়ির বেতুন পাকে। ...

আম ভালো জাম ভাল

তেঁতুল বড় টক

বাপের বাড়ি হাত গেল পিঠ গেল

মামা বাড়ির পিঠায় বড় ঢক।

ঝুক ঝুক ঝুকুর ঝুক। (পৃ. ১০১)

গ. আইঠ্যা কলার চাউনি

ভেরনের খাম,

পবন ঠাকুর বইসো বইসো। (পৃ. ১১৩)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত ছড়াটি মাঘ মণ্ডলের ব্রতকেন্দ্রিক। গ্রামের প্রতিবেশী পালবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে আক্‌কি এটি আবৃত্তি করে। মাঘমণ্ডলের ব্রতের অংশ হিসেবে সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে সে এ ছড়া কাটে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত ছড়াটি শিশুতোষ, মামাবাড়ি সম্পর্কে বালক-বালিকাদের মনে যে আগ্রহ ও চাঞ্চল্য বিদ্যমান, তা এতে প্রকাশিত। 'গ' সংখ্যক ছড়াটি সম্ভবত ঝড় থামানোর মন্ত্র হিসেবে গ্রামীণসমাজে প্রচলিত, আক্‌কি যেটি আবৃত্তি করেছিল প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে ভীত হয়ে।

৪. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত পরিচ্ছদ ও প্রসাধনকলার বিভিন্ন উল্লেখ লক্ষণীয়। মূলত নবিতুন, কদম ও আক্‌কির পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জাসংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গ থেকে এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়–

ক. একদিন ফিরে আসত লোকটি। রঙিন শাড়ি, ফুলের তেল, গন্ধ সাবান আরো কত কি নিয়ে আসত নবিতুনের জন্য। (পৃ. ১৫)

খ. গায়ে তার গেঞ্জি, পরনে হলদে সবুজ খোপ আঁকা তবন। মাথায় টেরি। (পৃ. ১৮)

গ. কালো রঙ শালতি কাঠের থামের মতো শক্ত বলবান দুটো বাহু, সাদা গেঞ্জি আর সেই হলদে-সবুজ খোপ-আঁকা তবন। আজ বুঝি সুরতে আরো চটক লাগিয়েছেন মিঞা। টেরি তার বড় চকচকে আজ। গলায় লাল ডুমা, জড়িয়ে ঘুরিয়ে পিঠ প্যাঁচিয়ে গলার সাথে সুন্দর করে বেঁধেছে ডুমাখানা। লাল ডুমায় বেশ মানিয়েছে ওকে। (পৃ. ২০)

ঘ. মজল সারেংয়ের ব্যাটা ... নবিতুনের কোলের উপর দুটো পুঁতির মালা ছুড়ে দিয়ে বলল, গেছিলাম শহরে। তোর জন্য দুটো মালা আনলাম। ... পদ গাইতে গাইতে যেমনটি বলেছিল মজল সারেংয়ের ব্যাটা, 'কালো সুতায় লাল, ধলা সুতায় নীল', ঠিক তেমনি রঙ মিলিয়ে এনেছে পুঁতির মালা। (পৃ. ২০)

ঙ. মেয়ে আক্‌কির সাধ একটা নতুন শাড়ি পরবে ও। মায়ের তালি দেয়া পুরনো শাড়ি আর ভালো লাগে না ওর। (পৃ. ৫৮)

চ. বেড়ার ফুটো দিয়ে নবিতুন যেন দেখল, এসেছে ওর সারেং। দেখল কত রঙ বেরঙের জিনিস সারেংয়ের হাতে। শাড়ি জামা চিরুনি চুলের কাঁটা খোঁপার ফুল–সবই নবিতুনের জন্য। আর কত কত সুন্দর বস্তু আক্‌কির জন্য। (পৃ. ৬৩)

ছ. এই জালখানি শেষ হলেই নগদ চারটি টাকা জমবে নবিতুনের হাতে। সেই টাকা দিয়ে আক্‌কিকে একটা শাড়ি কিনে দেবে ও। যুগিদের বাড়িতে গিয়ে একটা রংদার শাড়ির নমুনাও দেখে এসেছে নবিতুন। ... খুশিতে বুকটা ভরে যায় নবিতুনের। এ্যাদ্দিন পর একখানা নতুন শাড়ির মুখ দেখবে মেয়েটি। নিজের কথা ভাবে না নবিতুন। (পৃ. ৬৪)

জ. ঘরে ঢুকে সারেংয়ের আনা নতুন আরশিটার সুমুখে দাঁড়িয়েছে নবিতুন। বাস তেলের বোতল খুলে হাতে নিয়েছে একটুখানি তেল। দু'হাতের তালুতে মেখে নিয়েছে তেলটা। একটি ফোঁটাও যাতে না পড়ে যায়, তাড়াতাড়ি তেলমাখা হাতের দুটো তালু বিছিয়ে দিয়েছে মাথা ভর্তি চুলের ওপর। আস্তে আস্তে চুলগুলো পাট করে খোঁপা বেঁধেছে। (পৃ. ৮৭)

ঝ. তেলের ভুরভুর সুবাসটা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। বুঝি তার চেয়েও বেশি সুবাস নবিতুনের মনের ভেতর। সুগন্ধে ভরে যায় ওর মনটা। কেমন ফুলে ফুলে নিঃশ্বাস টানে ওর বুকটা। কাংগইটাকে নাকের কাছে এনে গন্ধ টানে নবিতুন। সুগন্ধমাখা হাত জোড়া অনেকক্ষণ ধরে রাখে নাকের ওপর। ... তারপর কাংগইটাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। টেনে নেয় পাউডারের কৌটোটা। ওই 'পাউটারে' একই সুবাস, তেলটার চেয়ে একটু বেশি উগ্র। চালের গুঁড়ির মতো মিহিন গন্ধভরা 'পাউটার' কয়েক চিমটে হাতে তুলে নেয় নবিতুন। আস্তে-আস্তে ঘষে ঘষে গালে মাখে। এভাবেই নাকি মাখতে হয়, কদম ওকে দেখিয়ে দিয়েছে। 'পাউটার' মাখা শেষ হলে কৌটোটা বন্ধ করে রেখে দেয় টিনের তোরংয়ে (পৃ. ৮৮)

ঞ. অজানাতেই ওর হাতটা চলে যায় তোরংয়ের দিকে। তোরং থেকে তুলে আনে একটা কাচের কৌটা। ঢাকনাটা খুলে মুখের কাছে এনে গন্ধটা শোঁকে নবিতুন। চমৎকার গন্ধ। বাস তেল আর 'পাউটারের' চেয়ে চমৎকার। কৌটোটার ভেতর ধবধবে সাদা তরল মতো কি যেন, ছাই নামটাও মনে থাকে না নবিতুনের। বড় ঠাণ্ডা জিনিস। নখের আগায় সামান্য একটু তুলে নিয়ে কি ভেবে কৌটোটা বন্ধ করে তোরংয়ে রেখে দেয় নবিতুন। ... সেই বিয়ের সময় প্রথম যখন এনে দিয়েছিল কদম ... কেমন ভেজা ভেজা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। গালের চামড়ায় পাতলা কাইয়ের মতো লেগে থাকে। (পৃ. ৮৮)

ট. তাই তো বলি রূপ আজ এত খোলতাই কেন? এ কোন দেশের নকশা গো নবিতুন বুয়া। এতক্ষণে বুঝি নবিতুনের শাড়িটার ওপর দৃষ্টি পড়েছে শরবতির। কলে বোনা পাতলা সবুজ জমিনের ওপর ময়ূর আঁকা ছবি। শরবতি আঁচলটাকে একেবারে চোখের কাছে এনে গভীর মনোযোগে দেখে ময়ূরের ছবি। ... টুককির মা আঁচলটা একবার ধরেই রেখে দেয়। বলে, ওমা! একি শাড়ি গো! পাড় নেই? ... আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে শরবতিই জবাব দেয় সন্দেহবাদী টুক্‌কির মার। বলে, বেপারী বাড়ির বাইরে তো আর যাও না। ভালো মানুষের বৌরা সব পাড় ছাড়া শাড়ি পড়ে আজকাল। সে খবর রাখ? চৌধুরী বাড়ির ছোট বৌর ছাপা শাড়িগুলো দেখেছ? ... জাতি চলে কুটুর কুটুর। আর টুনটুন বাজে নবিতুনের হাতের চুড়ি। কবজি থেকে কুনুই অবধি ভরা নবিতুনের হাত। কত রঙের কত কিসিমের চুড়ি। বেলোয়ারি চুড়ি। প্লাস্টিকের চুড়ি। আর ওদের মাঝে রাণীর মতো দু'গাছি রুলি। ... ওরা দেখে, কোরবানের বৌ আর শরবতির হাতেও বেলোয়ারি চুড়ি। নবিতুন দিয়েছে ওদের! (পৃ. ৯১-৯২)

'ক', 'খ', 'গ' উদ্ধৃতিত্রয়ে জাহাজী জীবন শুরু করার পূর্বে কদম সারেংয়ের গ্রামে বাসকালীন পোশাক-পরিচ্ছদসংক্রান্ত ধারণা পাওয়া যায়। 'ঙ', 'ছ' সংখ্যক উদ্ধতিদ্বয়ে বালিকা থেকে কিশোরীতে উন্নীত আক্‌কির আচরণে বাঙালি নারীর ঐতিহ্যগত পছন্দের প্রতি আগ্রহ লক্ষণীয়। বাঙালি গ্রামীণ সমাজে শাড়ি শুধু নারীর লজ্জানিবারণের আভরণ নয়, সেইসঙে তার প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থারও ইঙ্গিতবহ। শাড়ি পড়ার জন্য আক্‌কির আকুলতা প্রকৃতপক্ষে তার আবেগাপ্লুত মনোভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ। সেকারণেই মা হিসেবে নবিতুন তার এ শখ পূর্ণ করতে সচেষ্ট। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নবিতুনের প্রতি আসক্ত কদম সারেংয়ের প্রেমভাবনা ব্যক্ত হয়েছে লাল-নীলরঙা পুঁতির মালা উপহার দেয়ার ঘটনায়। তার অকপট প্রেমাবেগের স্ফুরণ এ উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত। 'চ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে তিন বছর ধরে প্রবাসী সারেংয়ের জন্য নবিতুনের প্রতীক্ষা স্বপ্নদৃশ্যে বিভিন্ন উপহার নিয়ে তার বাড়িতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষায় মূর্তময় হয়েছে। কেননা, ইতঃপূর্বে সারেং প্রবাস থেকে বাড়ি ফেরার সময় এসব সামগ্রী নিয়ে আসত তার শখ পুরণের জন্য। 'জ', 'ঝ', 'ঞ' উদ্ধৃতিত্রয়েও জাহাজী কদম সারেংয়ের আনা বিভিন্ন প্রসাধনসামগ্রী দিয়ে নবিতুনের সাজসজ্জার সাধ মেটানোর আকুলতা প্রকাশিত। এসব সামগ্রী ব্যবহারে নবিতুন অনভ্যস্ত হলেও স্বামীর পরামর্শ জেনে সে প্রসাধনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। 'ট' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নবিতুনের সাজসজ্জার প্রতি প্রতিবেশীদের ঈর্ষান্বিত মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয় প্রবাসী স্বামীর এনে দেয়া শাড়ি ও চুরির মনোরম সৌন্দর্যছটায়। দীঘদিন পর স্বামীকে পেয়ে নবিতুন খুশি হলেও কদম সারেংয়ের উপহৃত শাড়ি ও চুরি পরিধান করে সে যে আহ্লাদে পুলকিত হয়ে ওঠে, তা প্রতিবেশীদের নজরও কেড়েছিল।

৫. লোকজ্ঞান-- স্বল্প পরিসরে হলেও এ উপন্যাসে লোকজ্ঞানের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। প্রকৃতিনির্ভর মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকা নদী-সমুদ্রের বিভিন্ন অবস্থা, আবহাওয়া, জলবায়ু, ঋতুর বিবর্তন, তাপমাত্রা, বাতাসের প্রবাহ, উষ্ণতা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। লোকমানসে এসব প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে একই ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহ তাদের চেতনালোকে বিশেষ ধারণার উদ্ভব ঘটায়–

> ক. চোখ কুঁচকে দ্রুত ফেঁপে ওঠা মেঘগুলোকে দেখল শরবতির দাদু কামিজদ্দি বুড়ো। দেখল ওদের গায়ের রঙ, ওদের চেহারা আর স্বভাব। দেখে নিয়ে বলল, না। মেঘের নমুনা বড় ভালো দেখাচ্ছে না। বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির সাথে ঝড়ও আসবে। ... এমন সময় হাওয়া এলো। গরম হাওয়া। সে কি গরম, যেন ঝলসে দিয়ে গেল ওদের। ... কামিজ বুড়ো হাতখানা বাড়িয়ে বাতাসের গায়ে ধরে রাখল কিছুক্ষণ। বাতাসটা কেমন গরম, শুকনো কি ভিজা গরম, তা যেন বুঝতে চেষ্টাও করছে ও। তারপর আকাশটাকে আর একবার জরিপ করে বলল কামিজ বুড়ো–নারে, আজ যাস নারে কদম। আলামত বড় ভালো ঠেকছে না। কামিজ বুড়োর কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিল সবাই। ওদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই ওরা জানে গরম হাওয়া অলক্ষ্মীর পূর্বলক্ষণ। গরম হাওয়া চড়ে ঝড় আসে, গরম হাওয়ায় বান ডাকে। ... বান্দার জন্য খোদাওয়ানতলার মেহেরবানির কি শেষ আছে? সব বিপদের আগেই মানুষকে সাবধান করে দেন তিনি। বলতে বলতে সেই পরম করুণাময়ের প্রতি কি এক কৃতজ্ঞতায় কোমল হয়ে আসে কামিজ বুড়োর গলিত মুখখানি। ... বান আসবে এতে কোন সন্দেহ নাই। সাবধান থেকো তোমরা। রাতে কেউ ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। বাড়ির দিকে পা বাড়াল কামিজ বুড়ো। চলতে চলতে কদমের দিকে ফিরে বলল, আজ আর যাওয়া হয় না তোমার। ... কামিজ বুড়ো বাড়ির মুরুব্বি। তার কথা গওর করতে হয়। (পৃ. ১১০)

> খ. কি এক উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছে কদম। ... ওর কাঁধগুলো আর বাহুজোড়া ফুলে উঠেছে। লুঙ্গিটাকে খাটো করে কোমরের সাথে শক্ত করে গিট বেঁধেছে ও। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও, এই মেয়েরা! ভয়ে ঘুপছি মেরে বসে থাকলে বাঁচবি তোরা? দেখছিস না দুনিয়ার আলামত? শক্ত করে গিঁট দিয়ে শাড়ি বাঁধ কোমরে। খবরদার। উলটোমুখী সাঁতার কাটবি না। হাত-পা ছুঁড়বি না। পানির সাথে লড়তে যাবি না। শুধু ভেসে থাকবি। মুখটাকে ভাসিয়ে রাখবি পানির ওপর। (পৃ. ১২৮)

‘ক’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বৃদ্ধ কামিজদ্দির প্রকৃতিসংলগ্ন অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশিত। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা সম্পর্কে দীর্ঘ জীবনের চলার পথে তার অর্জিত অভিজ্ঞতা বামনছাড়ির গ্রামবাসীকে দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করে। উপন্যাসের শেষভাগে আসন্ন ঝড় ও বানের তাণ্ডবে তারা যখন সন্ত্রস্ত, তখন তার নির্দেশনা তাদের অবলম্বন হয়ে ওঠে। কদম সারেং আট মাস দেশে অবস্থানের পর পুনরায় যেদিন প্রবাসের পথে যাত্রা করতে উদ্যত, সেই দুর্যোগকালে কামিজদ্দির সতর্কবাণী তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাড়ি ফিরে যেতে। বয়স্ক মানুষের উপদেশ, বাণী ও নির্দেশনাকে মান্য করা লোকমানসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উক্ত উদ্ধৃতিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে। ‘খ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বানের স্রোতে ভেসে চলা নারীদের প্রতি কদম সারেংয়ের প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রমের নির্দেশনা লক্ষণীয়। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে জাহাজী জীবনে অভ্যস্ত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-সাগর-বন্দর পাড়ি দেয়া কদম সারেং ষোলো বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতাবশত আসন্ন সংকট মোকাবেলায় নিজের প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সহায়তায় এগিয়ে যায়। পরস্পরের প্রতি ঐক্যবদ্ধতা ও সহমর্মিতার অকুণ্ঠ আহ্বান লোকসমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা এ দৃষ্টান্তে রূপায়িত।

৬. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্যের উল্লেখ লক্ষণীয়। নবিতুনের মতো প্রান্তিক নারীর প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের চালচিত্র অনুধাবনে তার আহারের তালিকায় দৃষ্টিপাত অনাবশ্যক নয়। গ্রামীণ ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রিয়জনকে নিয়ে কালেভদ্রে পিঠা ও ভালো খাবারের আয়োজন করা গেলেও প্রায়শই তার ক্ষুন্নিবৃত্তির অবলম্বন হয়ে ওঠে পান্তা, শুকনা মরিচ ও লবণ। কখনো সেটিও জোটাতে না পারলে বিলের শাপলা পুড়িয়ে মা-মেয়েকে ক্ষুধা মেটাতে হয়। কোনো কোনো সময় খাবারের বন্দোবস্ত না হলে অনাহারেই তারা দিনাতিপাত করে।

ক. শাড়ি বাঁচিয়ে যতটুকু নামা যায় ততটুকু পানিতে নামল নবিতুন। টেনে টেনে তুলল শাপলা। দুহাতের দুটো মুঠি ভরিয়ে উঠে এলো। একখানি কচি শাপলা কচর কচর করে চিবিয়ে তৃপ্তিভরে খেল ও। সারা দিন দানাপানি কিচ্ছু পড়েনি পেটে। সকালবেলা হাঁড়ি মালসা ঝেড়ে-ঝুড়ে মুঠ দেড়েক তুষ ভরা খুদ খুঁজে পেয়েছিল নবিতুন। সেই খুদ দিয়ে জাউ রেঁধেছিল। জাউটা আক্কিই খেয়েছে। ... চুলো ধরিয়ে একটু নূন মেখে শাপলাগুলো সেদ্ধ করে নিল নবিতুন। কোরবানের বৌ'র কাছ থেকে চেয়ে আনল দুটো শুকনো মরিচ। মরিচ দুটো পুড়িয়ে গুঁড়ো করল। গুঁড়োগুলো মেখে নিল শাপলার সাতে। মায়ে-ঝিয়ে ভাগ করে খেল। (পৃ. ২৩)

খ. চৌধুরীগিন্নীর কৃপণ হাতে মেপে দেয়া দু'মালা চাল। দুটি পেট ভরে না ওতে। তবু কোন কোন দিন ও থেকেই দু'এক মুঠ ভাত হাঁড়িভর্তি পানিতে রেখে দেয় নবিতুন। ভাতের চেয়েও বড় কথা, এক মুঠ রাতভর ভিজে যে এক হাঁড়ি আমনি হয়, ওতে নুন মিশিয়ে পোড়া মরিচ ডলে স্বাদ জাগে অপূর্ব। ওই এক হাঁড়ি আমনি গিলে মা-বেটির পেট যায় ভরে। ক্ষিদেটাকে অনায়াসেই দুপুর অবধি ঠেলে রাখা যায়। (পৃ. ৬৫)

গ. টিন খুলে দু'মুঠ মুড়ি বের করল মন্তু সারেং। সেই বাংলাদেশের মুড়ি, সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে মন্তু সারেং। দেশের কথাটা যখন খুব বেশি মনে পড়ে কেবলমাত্র তখনই বুঝি ঢাকনা খুলে এক আধমুঠ মুড়ি বের করে নেয়, দাঁতের নিচে কুড়ুম কুড়ুম চিবিয়ে চলে মুড়িগুলো। মুড়ি আর চায়ের মগটা কদমের দিকে বাড়িয়ে দেয় মন্তু সারেং। (পৃ. ৮৪)

ঘ. এমনি সময় মনে পড়ে যায় গত বিকেলে ভিজিয়ে রাখা রস পিঠেগুলোর কথা। হাঁড়ির ঢাকনিটা খুলে পিঠাগুলো দেখে নেয় নবিতুন। টিপে টেপে দেখে। না, রসে ভিজে, রস খেয়ে ফুলে উঠেছে, নরম আর টসটসে হয়ে আছে পিঠেগুলো। নবিতুনের আঙুলের সামান্য চাপ খেয়েই দু'ফাঁক হয়ে গেছে একটা পিঠা। ভারি খুশি লাগে নবিতুনের। রসে ভেজা এই চিতই পিঠা খুব ভালবাসে কদম। (পৃ. ৮৮)

ঙ. ইচা মাছ? মাত্র দুটো ইচা মাছ দিয়ে করবি কি? শুধায় কদম। আর ওর নজরে পড়ে কুলোর উপর ছড়ানো এক গুচ্ছ ঢেঁকিশাক। ... নবিতুনের খুব পছন্দ ঢেঁকিশাক। কদমেরও। তবে রান্নাটা হতে হবে ইচা মাছ দিয়ে। (পৃ. ৯০)

চ. ঢেঁকিশাকগুলো কোটা হয়ে গেছে নবিতুনের। এবার কাঁঠালের বিচির খোসা ছাড়ায়। ছাড়ায়ে বিচিগুলো জাঁতিতে ফেলে কুটুর কুটুর কেটে চলে নবিতুন। ... কুচি কুচি করে বিচিগুলো কাটা সারা হয়ে গেল। হাঁড়িতে পানি ভরে কুচিগুলো ভিজিয়ে রাখল নবিতুন। কদমের প্রিয় হইল্যা মাছের শুটকি দিয়ে কাঁঠালের বিচি রান্না রাতের জন্য করবে নবিতুন। কুচিগুলোকে তাই ভিজিয়ে রাখতে হবে দিনভর। তবেই রান্নার পর দাঁতের তলায় পড়ে গলে যাবে মোমের মতো। স্বাদ হবে মনের মতোন। (পৃ. ৯১-৯২)

এ উপন্যাসে গুঁজা বুড়ির পানের প্রতি আসক্তি লক্ষণীয়। স্বভাবগত চতুরতা ও মুখভঙ্গির সঙ্গে তার পান খাওয়ার অভ্যাস যে মানানসই, তা একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে বিবৃত–

পানের পিকটা অদ্ভুত কৌশলে গালের ভেতর ধরে রেখে বলে চলে গুঁজাবুড়ি। কি এক ধূর্ত চোখে চেয়ে থাকে নবিতুনের দিকে। তারপর ঢক করে গিলে ফেলে পানের রসটা। চর্বিত পানের অবশিষ্টটুকু দাঁতের মাড়ি আর চামড়ার ফাঁকে রেখে দেয় সুপুরির মতো গোটা পাকিয়ে। ফুলিয়ে তোলে নিচের গালটা। (পৃ. ১০)

৭. লোকভাষা–– এ উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি হিসেবে বামনছাড়ি গ্রামের ভৌগোলিক পরিসীমাগত কোনো উল্লেখ না করলেও লেখক জানিয়েছেন, সাগরসংলগ্ন কয়াল নদীর মাঝখানে এর অবস্থান, যেটি প্রকৃতপক্ষে জলঘেরা ভূখণ্ড। সাগরের মোহনায় অবস্থিত এর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোও একই ধরনের প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার শর্তবন্দি। লেখক এসব গ্রামীণ লোকালয়সমূহের অনুসৃত ভাষাকে এ উপন্যাসের বর্ণনায়, কখনো কখনো চরিত্রের সংলাপে আংশিকভাবে কিছু শব্দযোগে ব্যবহার করলেও কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপভাষাগত প্রভাব উপন্যাসে অনুপস্থিত। ফলে কুশীলবদের ভাষিক পরিমণ্ডলে বিধৃত স্থানিকতা ও নিজস্ব আঞ্চলিক আবহ, পূর্বসূরীদের ভাষিক ঐতিহ্য ও উচ্চারণগত প্রবণতাসমূহ এ উপন্যাসের সংলাপে সংযোজিত হয়নি। এ ঘাটতি পূরণের জন্য লেখক অবলম্বন করেছেন শিক্ষিত নাগরিক জীবনে প্রচলিত প্রমিত বাংলা কথ্যরীতিকে, যা বহুলাংশেই উপন্যাসের ভাষিক ভাবমণ্ডল ও পাত্রপাত্রীদের মনোবাস্তবতাকে বিঘ্নিত করে। কেননা,

নাগরিক জীবন থেকে দূরবর্তী, প্রকৃতিসংলগ্ন গ্রামীণ লোকালয়ের পটভূমিতে অশিক্ষিত নিরক্ষর খেটে খাওয়া মানুষদের মুখে এ ধরনের সংলাপ মানানসই হয়নি। তবে, কৃত্রিমতার অনুসারী হলেও, এ উপন্যাসের লোকভাষায় যে গতিময়তা ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে লেখক সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন বর্ণনায় ও তথ্যযোগে বিভিন্ন লোকজ শব্দযোগে, [৯০] তা অনস্বীকার্য–

শব্দভাণ্ডার

বিশেষণ– ঝিকিমিকি, চিকচিকে, বুড়িয়ে, ফ্যাকাসে, জোয়ানকি, সোয়াদ, শয়তানি, আঁকাড়া, ছিটেভিটে, কুঁজো, কুটনি, বাঁকা, ছলকে, ঝলকে, উছলে, উথালি-পাতালি, রসাল, হিমশিম, আবিতি, ঠমক, ছ্যাৎ, কিলবিলিয়ে, ছিনালী, ঢলাঢলি, ঘিনঘিন, খপ্পরে, মুচকি, ফিসফিসিয়ে কচলে, গুঁজা, বেঁকিয়ে, ত্যাদড়, কঁকিয়ে, থমথমিয়ে, খেঁকিয়ে প্রভৃতি।

ক্রিয়া– চড়ে, ভাসিয়ে, ঝাঁট, ধোঁয়া, পাকল, থুবি, টিপবে, আঁচড়াবে, ফুলিয়ে, ডিংগিয়ে, ঝাড়ে, পোড়ে, পস্তাবি, ঝাড়তে, বেঁকিয়ে, ছুঁড়ে, চড়বে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, ভরে, ঝাঁকিয়ে, চিবোতে, কুঁচকায়, উল্টায়, ঠুসিয়ে, কাড়ব, ভানি, ঘেঁষেনি, টুসিয়ে প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– ডাঙা, পাড়, গোয়াল, হাল, বলদ, গাই, গীত, ডিংগি, সারেং, হিস্যা, পুব, ঢেঁকি, আদার, দাওয়া, বরই, ব্যারাম, পিক, পান, মাড়ি, কোল, পিঠ, গোটা, কোরা, আড়ি, গালি, খাগী, বেওয়া, ঢল, চাল, কুলো, তুষ, কুড়ো, মালসা, কাঁখে, বুয়া, বেড়া, মাচাং, রসুই, খোয়াড়, খোলা, খই, খাড়ু, আড়া, গাইল, কোষ, কোরা, নেড়া, ধপাস, ক্যাক, উঠোন, খুদ, কিল, মালা, দাওয়া, কুড়ি, মড়ক, নোঙর, ঢং, থুতনি, পাত প্রভৃতি।

অনুকার অব্যয়–

থই থই, ঠুকঠুক, দুমদুম, মুছতে মুছতে, থপথপ, সুড় সুড়, ঢল ঢল, ঠনঠনিয়ে, গজগজ, কলকল, ঢলাঢলি, মচ মচ, গরগর, টিপটিপ, টেনেটুনে, খচ খচ, কচর কচর, ঝেড়ে ঝুড়ে, জড়সড়, ঠুকে ঠুকে, হাতড়ে হাতড়ে, ধপধপ প্রভৃতি।

পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ প্রান্তিক নারীর অস্তিত্বসংগ্রাম ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার অনবদ্য শিল্পপ্রয়াস শহীদুল্লা কায়সারের m‡is †eŠ। ব্যক্তিক ও সামজিক জীবনে বারবার বিভিন্নভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি লড়াই করার অদম্য প্রেরণা নবিতুনের মনোবাস্তবতার কেন্দ্রীয় অভিমুখ। সেক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অভিঘাত তাকে প্রভাবিত করলেও লোকজচেতনার মূল সুর তথা ইহলৌকিক জীবনের প্রতি দুর্বার আগ্রহ তাকে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা যোগায়। এ উপন্যাসে বিধৃত লোকজ উপাদানসমূহের প্রভাব গ্রামীণ জনসমাজের বিশিষ্টতাকেই রূপায়িত করে। সেই বিবেচনায়, m‡is †eŠ বাংলাদেশের লোকজীবনে সন্নিহিত আবহ ও পরিচয়ের প্রতিনিধিত্বকারী উপন্যাস।

mskßK

শহীদুল্লা কায়সারের mskßK (১৯৬৫) মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত এর রাজনৈতিক বীক্ষা, পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ লোকজীবনের অনাড়ম্বর অথচ অনায়াস চালচিত্র উপস্থাপনে লেখকের বিস্ময়কর শিল্পসংযম ও ব্যক্তিক জীবনাদর্শের মিথস্ক্রিয়ানৈপুণ্যে। এ রচনায় প্রবলভাবে মূর্তময় হয়ে আছে লেখকের রাজনৈতিক আদর্শ ও স্বদেশপ্রেম, যা তদানীন্তন পাক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের মেহনতি মানুষের প্রতিবাদী অবস্থানকেই জোরালোকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করে। উপন্যাসটির পটভূমিতে রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অনুষঙ্গবাহী লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ, যার পরিণতিতে কৃষকশ্রেণিকে অধিকারবঞ্চিত হতে হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, পিতৃপুরুষের ভিটেবাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে পাড়ি জমাতে হয় প্রিয়জনের হাত ধরে। বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের ব্যাপ্তিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা, চোরাবাজারি, মজুতদারি, কৃত্রিম সংকট, নারীহরণ, লুটতরাজ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বামপন্থী রাজনীতি, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনার ঘনঘটায় কলরোলমুখরিত এ উপন্যাসের স্থানিক পরিসর ফেনীর অজপাড়াগাঁ থেকে আসাম, রেঙ্গুন, মহানগর কলকাতা ও ঢাকায় সম্প্রসারিত। উনসত্তর পরিচ্ছেদের বিশালায়তন এ উপন্যাসের প্রথম তেত্রিশ পরিচ্ছেদ এবং চৌষট্টি থেকে ঊনসত্তর পরিচ্ছেদে রয়েছে ফেনীর বাকুলিয়া ও তালতলি গ্রামের লোকসমাজের বৃত্তান্ত। অবশিষ্টাংশে এসেছে দুই মহানগর কলকাতা ও ঢাকার বাসিন্দাদের কর্মযজ্ঞের নানা প্রসঙ্গ, নগরায়ণের প্রভাবে মানবিক মূল্যবোধের অপচয়, পুঁজিবাদের যথেচ্ছ বিস্তার ও ভোগবাদী মানসিকতার পরিণতিতে জনজীবনের সামূহিক বিপন্নতার ভাষ্যরূপ। এ উপন্যাসে তালতলি ও বাকুলিয়া গ্রামদ্বয়ের অন্তর্গত লোকসমাজের বাসিন্দারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পেশায় কৃষক, জেলে, তাঁতি ও যুগী। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে, পরস্পরের সঙ্গে আলাপে, ওঠাবসায়, নানা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে, পারিবারিক আয়োজনে প্রতীয়মান হয় তাদের অবলম্বিত লোকসাংস্কৃতিক পরিচয়ের স্বরূপ।

১. লোকসংস্কার-- গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে রূপায়িত। এসব সংস্কারের প্রতি তাদের যেমন অবাধ নির্ভরতা ও ঐতিহ্যগত অনুকরণের অভ্যাস বিদ্যমান। তাই প্রাত্যহিক জীবনের নানা সংকট থেকে উত্তরণের তাগিদে তারা অবলীলায় এসব সংস্কারের দ্বারস্থ হয়। ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক আদেশ-নিষেধ, অনুশাসন, শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন এসব সংস্কারে প্রতিফলিত হয়।

১.১ নারীর মূল্যায়ন (লক্ষ্মী/অলক্ষ্মী প্রসঙ্গ) সংক্রান্ত--

> ক. আম্মা এসে দেখেন অঘোরে ঘুমুচ্ছে রাবু আর আরিফা। এই আরিফা, এই রাবেয়া! কি যে অলক্ষ্মী হয়েছিস তোরা। দেখ তো দালানের ছায়াটা উঠোনের শেষ মাথায়, বেলা আসর ধরে ধরে। এখনো ঘুমুচ্ছিস তোরা? ওঠ, ওঠ। (পৃ. ২৬)

> খ. আম্বরি লক্ষ্মী। ওইটুকুন তো ডাঙা। সেই ডাঙা থেকেও গতরের খাটনি দিয়ে কত কিছু আদায় করে নেয় আম্বরি। পাটি পাতা হাটে পাঠায়। আসন বানায়, পাটি বোনে বঠ্নি বানায়। তালতলির হাটে এসব জিনিসের দাম আছে। ... আম্বরির যত্নে গাছের একটি সুপুরিও নষ্ট হয় না। ... পান ও ছেড়ে দিয়েছে, সুপুরি বেচার আয়টাও বাড়বে, পান কেনার ফজুল খরচটাও কমবে। ... প্রথম প্রথম জোয়ানকি বয়সের দেদার খাটুনি ঢেলে খাই খরচা চালিয়েও কিছু টাকা জমাতে পেরেছিল লেকু। ... লক্ষ্মীমন্ত আম্বরির হাতে না থাকলে জমতো না সেই টাকা। ... ঘরটা পড়ে গেছিল সেই গেল বছরের আগের বছর যে তুফান হলো সেই তুফানে। লেকু তো অন্ধকার দেখেছিল চোখে, আম্বরি ওর পায়ের খাড়ু আর কোমরের রুপোর শিকলিটা খুলে বলেছিল বসে বসে ঝিমোলে তো আর চলবে না। যাও এগুলো রামদয়াল খুড়োর কাছে বন্ধক দিয়ে নিয়ে আস যা পাও। তাই করেছিল লেকু। ঘর তুলেছিল। ... আম্বরি লেকুর লক্ষ্মী। আম্বরি ওর খোদার নেয়ামত। (পৃ. ৩৬)

‘ক’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রাবু ও আরিফার প্রতি সৈয়দগিন্নীর স্নেহময় ভৎর্সনার আড়ালে সক্রিয় রয়েছে.লোকসংস্কার। নারীকে বিবিধ অনুশাসনে অভ্যস্ত করার শিক্ষা যে পরিবার থেকে শুরু হয়, এ দৃষ্টান্তে তা প্রতীয়মান। অবেলায় ঘুমানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা এ দৃষ্টান্তে লক্ষণীয়, যা প্রকাশিত হয় ঘুমন্ত রাবু ও আরিফার প্রতি সৈয়দ গিন্নীর ভৎর্সনায় ‘অলক্ষ্মী’ –সূচক নেতিবাচক অভিধা আরোপে। ‘খ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সংসারের প্রতি সচেতন, গৃহকর্মে মনোযোগী ও আন্তরিক স্ত্রী আম্বরির প্রতি লেকুর মনোভাবনায় বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীর ‘পয়মন্ত’, ‘কল্যাণী’, ‘লক্ষ্মী’, ‘ভাগ্যবতী’ প্রভৃতি গুণের সমন্বিত আবহ সক্রিয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব আরোপিত পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনায়, সন্তান প্রতিপালনে, সাংসারিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে তদারকিতে, সর্বোপরি স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার বাধ্যবাধকতায়। বদমেজাজী লেকু প্রায়শই অভাবের তাড়নায়, অন্যদের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ক্ষোভ মেটাতে আম্বরির ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করত। অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীর প্রতি তার এ অকপট মনোভঙ্গিতে প্রকাশিত হয় সংসারের প্রতি সেই নারীর আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতার বৃত্তান্ত, যদিও তা বহুলাংশেই পুরুষতন্ত্রের নির্দেশেরই কাঙ্ক্ষিত প্রতিফলন।

১.২ দিব্যি দেয়া বা কিরা কাটা--

> ক. রাবুর আঁচলের তলায় খুব করে হেসে দেয় মালু। এটা ওর বরাবরের কৌশল। ... আঁচলের ভেতর থেকে ওর কানটি খুঁজে নিয়ে টেনে ধরে রাবু বলে সত্যি জল্লাদ হবি তুই। মাকে এমন করে খামচায়। কষ্ট পায় না মা? ... মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে যায় রাবু। দৌড়ে যায় উঠোনের দিকে। ফিরে আসে এক মুটো মাটি নিয়ে। মাটিটা মালুর হাতে দিয়ে বলে এই মাটি ছুঁয়ে বল আর কখনো খামচাবি না খালাকে, নইলে আমিই পিটিয়ে তোর হাডডি-মাংস একসার করব।
>
> আর কখনো খামচাবো না, মাটি ছুঁয়ে বলতে গিয়ে এবার কেন যেন কাঁদো-কাঁদো মালুর স্বরটা। (পৃ. ২২)

> খ. নগ্ন লালসা আর কদর্য কামনার নিষ্ঠুর শিকার হুরমতি। ঈর্ষা লোভ হিংসার বিষচক্রে রূপবতী যৌবনের সর্বনাশ আগুনে বিষিয়ে দগ্ধে পুড়ে দিন কাটে হুরমতির। ছোট বেলায় মা হারিয়েছে। বাপ তার কোন কালেই ছিল না। মমতার ছোঁয়া কদাচিৎ পেয়েছে জীবনে। তাই স্নেহের পরশটি ওকে অভিভূত করে। হুরমতির তপ্ত কপোল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামে। হুরমতি। চল, আমাদের বাড়ি থাকবি যদ্দিন ভালো না হচ্ছিস। (পৃ. ২৯)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মায়ের প্রতি মালুর আচরণে প্রকাশিত হয়েছে খামখেয়ালী বালকের অবাধ দুরন্তপনা। সৈয়দ বাড়িতে আশ্রিত হলেও এ পরিবারের মেয়ে রাবুর কাছে মায়ের ভালোবাসা, বড়বোনের মমতা ও স্নেহ পাওয়ায় মালু বরাবরই তার বাধ্য। অন্যদিকে মালুর দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ মা ছেলেকে শাসন করতে গেলে সে এর প্রতিকারার্থে তাকে আঁচড়ে, খামচে সরে যেতে চায়। সেকারণেই রাবু মালুকে শাসনের প্রয়োজনে তাকে মাটি স্পর্শ করিয়ে দিব্যি দেয়ায়। কেননা, এর ফলে মালু পুনরায় মায়ের সঙ্গে এরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে এর ফল ভালো হয় না, এ সংস্কারের অন্তরালে অনুরূপ ভাবনাই লোকসমাজে সক্রিয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সামাজিক অনাচারের নির্মম শিকার হুরমতির প্রতি রাবুর সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে মমত্ববোধ ও সহানুভূতি। হুরমতি ক্ষমতাশালীদের দ্বারা উৎপীড়িত হলেও এর প্রতিকারের সামর্থ্য তার নেই। সেকারণেই প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় সে যখন নিজ ঘরে ফেরে গ্রামসমাজ থেকে 'একঘরে' ঘোষিত হয়ে, মালুর নিকট থেকে খবর পেয়ে রাবু তাকে দেখতে আসে। তার প্রতি রাবুর ভালোবাসা নিখাদ হলেও হুরমতি সৈয়দ বাড়িতে যেতে সম্মত হয়নি। রাবুকে সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলার সুযোগ বা অবস্থা হুরমতির ছিল না। অন্যদিকে শিশুবয়সে মাকে হারিয়ে হুরমতির কাছে রাবু বড় হয়েছিল। তাই তার বিপৎকালে সাহায্যের জন্য রাবু স্রষ্টার নামে কসম খেয়ে এ অনুরোধ করেছিল, যেন হুরমতি তার কথা মেনে নেয়।

১.৩ অভিশাপ

> ক. কানের নিচে হাতের তালু রেখে ভালো করে শুনে নিল মালু হ্যাঁ আম্বরির গলাই বটে। কেন যেন ক্রুদ্ধ হয়েছে আর কার উদ্দেশ্যে কহর দিয়ে চলেছে অনর্গল : নিজের মেয়ের গোশত খা, পোলার গোশত খা, মেয়ের হাডডি চিবিয়ে খা, দাঁ ভাং ... আমার খাসি তো নয়, খেয়েছিস নিজের মাইয়া, নিজের পোলা ... যে খেয়েছে আমার খাসি মুখের জিহ্বা, গায়ের গোশ্ত তার খসে খসে পড়বে। নির্বংশ হবে সে। সাতকুলে কেউ থাকবে না। মরলে কবর দেয়ার লোক থাকবে না। মরা লাশ শিয়ালে কুত্তায় টেনে টেনে খাবে। ... সারা রাত ঘুমুতে পারেনি আম্বরি। রাতভর শুধু এপাশ ওপাশ করেছে আর খাসিটার শোকে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ছেড়েছে। আর গোটা পয়লা প্রহর ধরে শুধু অভিসম্পাত ছুড়ে গেছে কোন হারামখোর চোর বাটপারের উদ্দেশ্যে। সকালে উঠেই রমজানদের বাড়ির সীমানাটায় দাঁড়িয়ে সেই অভিশাপগুলোকে আরও চোখো আর স্পষ্ট করে শুনিয়ে চলেছিল। (পৃ. ৪৮-৪৯)

> খ. কুসংস্কারের বালাই রাখে না ফেলু মিঞা। ঝট করে বউয়ের গলার মফ চেইনটা খুলে নিয়েছিল। আর খপ করে হাত দুটো ধরে চুরিগুলো টেনে বের করেছিল। সেই সাথে বিবি হালিমার হাতের একটুখানি চামড়াও হয়তো উঠে এসেছিল। অভিসম্পাত দিয়েছিল হালিমা : কুষ্ঠ হবে কুষ্ঠ হবে ওই হাতে। খোদার কহর পড়বে, লানত পড়বে। ... ফেলু মিঞার মনে হয়েছিল কুলবধূর অভিসম্পাতে দালানের ইটগুলোও বুঝি সত্যি কেঁপে উঠল। মনে হয়েছিল যে হাতটার চুড়ি কয়টা ধরে ছিল ফেলু মিঞা চুড়িসুদ্ধ সেই হাতখানি বুঝি তখখুনি খসে পড়বে। এমন সাংঘাতিক কহর দিল বৌটি? তাও মাত্র কয়েক ভরি সোনার জন্য? অভিসম্পাতকে বড় ভয় ফেলু মিঞার। ... তা ছাড়া আর একটা ভয় এত ব্যস্ততা আর চিন্তার মাঝেও ধুকপুক করছে ওর মনের ভেতর। বিছে হার, বাজুবন্ধ, নোলক আর গলার নারকেল ফুলগুলোর খবর তো এখনো হালিমার অজানা। ... যখন জেনে যাবে হালিমা আরও কি কঠিন অভিশাপ দেবে সে কে জানে! ... সংস্কার বা কুসংস্কার কোনটাকেই তেমন আমলে আনে না ফেলু মিঞা। তবু স্ত্রী হালিমার অভিশাপকে এত ভয় কেন ওর? এ প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না ফেলু মিঞা। (পৃ. ৯১)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আম্বরির ক্রুদ্ধ অভিশাপের অন্তরালে রয়েছে অনিষ্টকারীর প্রতি তার প্রতিশোধস্পৃহা। যে তার পালিত খাসীটি আত্মসাৎ করেছে, তার সন্ধান আম্বরির অজানা। হুরমতিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেকুর ওপর প্রতিশোধ নিতে রমজান একদিন ফেলু মিঞার বাগানে ঘাস খাওয়ায় ব্যস্ত খাসীটিকে দেখে সেটিকে গামছায় বেঁধে এনে জবাই করে। সেটির অর্ধেক মাংসে উদরপূর্তির পাশাপাশি অবশিষ্ট

মাংস সে হাটে পাঠায় বিক্রয়ের জন্য। অন্যদিকে, দুঃসময়ের সম্বল বলে হারানো খাসীর শোকে সারারাত অজ্ঞাতনামা চোরের প্রতি আম্বরির অভিশাপ বর্ষণের পর একপর্যায়ে রমজানকে ঘিরে তার সন্দেহ স্থির বিশ্বাসে উন্নীত হয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে স্ত্রীর অভিশাপে সন্ত্রস্ত ফেলু মিঞার মনোলোকে ভীতিবোধের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। জোরপূর্বক হালিমার পরিধানকৃত গহনা খুলে নেয়ার অপরাধজনিত গ্লানি তাকে বিচলিত করেছিল। রামদয়ালের মালিকানাধীন তিন ও চৌদ্দ নম্বর তালুক কিনে পূর্বপুরুষের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায় ফেলুমিঞাকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। অন্য উপায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে সে অবশেষে স্ত্রীর গহনাকেই অভীপ্সা পূর্তির শেষ অবলম্বন করে তুলেছিল। অন্যদিকে, গায়ের গহনা গৃহবধূ ও গৃহের লক্ষ্মী, এরূপ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে হালিমা যখন ফেলুমিঞার মিনতি ও হুকুম অগ্রাহ্য করেও ব্যর্থ হয়েছিল, তখন স্বামীকে অভিসম্পাত দেওয়া ব্যতীত তার গত্যন্তর ছিল না। অভিশাপ দেয়ার মধ্য দিয়ে সে স্বামীর অন্যায় কৃতকর্মের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, যা মূলত গ্রামীণ লোকসংস্কারকে আত্মীকরণেরই দৃষ্টান্ত।

১.৪ জ্বিন-ভূত ও অশরীরী সংক্রান্ত

> ক. জোহরের সময় গাছে চড়তে নেই। শনি ধরবে। মালু এবং রাবুকে বাধা দেয়ার জন্য আরিফা রীতিমতো টানাহ্যাঁচড়া শুরু করেছিল।
>
> মিথ্যে কথা। কতদিন চড়লাম। ওর নিষেধটাকে একটুও গ্রাহ্য না করে রাবু শাড়ির আঁচলটা আঁট করে নিয়েছিল কোমরের চারপাশে।
>
> এই শোন। ... মালুকে চড়িয়ে দে না গাছে। ও পেড়ে নিচে ফেলুক। আমরা আঁচল বিছিয়ে ধরি।
>
> মালুকে যদি শনিতে ধরে? (পৃ. ২৬)

> খ. নিরুত্তর থাকে রাবু। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে বড় আপা। বড় আপা তোর মাথার উপর সাপ! ভয়ে- আতঙ্কে কোন দিকে ছুটবে দিশে পায় না আরিফা। ... শাড়ির প্যাচটা একটু আলগা করে বুকে থুতু ছিটোতে ছিটোতে উঠে দাঁড়ায় আরিফা। (পৃ. ২৭)

> গ. ওদের বাড়ির পেছনটায় সেই ডোবার মতো ছোট পুকুরটার ঘাটে বসে আছে রাসু। ... একটা মোটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল রাসু। রাসুর সামনে গিয়েই চুপ করে পড়ল ঢিলটা। কয়েক ছিটা পানি উড়ে পড়ল রাসুর গায়ে। চমকে উঠে, বুকে আর আশপাশে থুথু ছিটায় রাসু। ... কোথাও কিচ্ছু নেই তবে কি ভূতের ঢিল? ভূত নাকি এমনি করে ঢিল ছোঁড়ে। রাসু তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলটা টেনে দেয় মাথার উপর। (পৃ. ৫০)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গ্রামীণ সমাজে অশরীরী সম্পৃক্ত লোকসংস্কারের প্রভাব লক্ষণীয়। ভর দুপুরবেলা গাছে চড়লে, একা থাকলে ভূত-প্রেতের নজর পড়ে, শনি ধরে, এরূপ ধারণা প্রচলিত। মান্দার বাড়ির রসালো 'ভূতি' জামের প্রলোভনে রাবু ও মালু গাছ থেকে সেগুলো পাড়তে চাইলে আরিফা তাদের থামাতে শনির ভয় দেখায়। ষোড়শী আরিফা বয়সগত লাজুকতা ও অন্যেরা দেখলে খারাপ ভাববে প্রভৃতি কারণে রাবুর সঙ্গে জামগাছে উঠতে দ্বিধান্বিত ছিল। তাই রাবুকে থামাতে সে মালুকে গাছে চড়ার প্রস্তাব দিলে রাবু তার কথা ও শনি সংক্রান্ত আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কোনোকারণে ভয় পেলে বুকে থুতু ছেটানোর লোকসংস্কারের প্রয়োগ আরিফার আচরণে লক্ষণীয়। নিতান্তই তামাসা করতে রাবু তাকে সাপের ভয় দেখালে অপ্রস্তুত আরিফা হুড়মুড় করে গাছ থেকে পড়ে যায়, এরপর ভয় থামাতে বুকে থুঁতু দেয়। এর পেছনে কোনো যুক্তি কার্যকর না হলেও এরূপ সংস্কার বহুকাল থেকেই বাঙালি লোকসমাজে বিদ্যমান। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গ্রামীণ সমাজে ভূত সংক্রান্ত সংস্কারের রূপায়ণ লক্ষণীয় বালিকা রাসুর ভাবনায়। মাছ ধরতে গিয়ে আকস্মিকভাবে পুকুরে ঢিল পড়ার ঘটনায় সে চমকে ওঠে। যদিও মালু আড়ালে থেকে ঢিল মেরেছিল, ভীত রাসু চারপাশে ভালোভাবে লক্ষ না করায়

তাকে দেখতে পায়নি। বুকে থুতু ছিটিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দেয়ার ঘটনায় প্রতীয়মান, বাঙালি গ্রামীণ নারীর আচরিত সংস্কারকে সে নিজের অজান্তেই গ্রহণ করেছে এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

১.৫ বিবিধ

ক. ছয় মাস আগেও এ-রকম ছিল না অবস্থাটা। সারা গ্রাম চষে বেড়াত ওরা দু'বোন। গাছে চড়ত, ফল পাড়ত, সাঁতার কাটত বাইরে বাড়ির বড় পুকুরটায়। সে সব বন্ধ হয়েছে। আরিফার আম্মা, রাবুর জেঠি আম্মা, তিনি একদিন ফজরের নামাজ শেষে জায়নামাজটায় বসে বসেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা।

শোনো আরিফা। শোনো রাবেয়া। তোমাদের চুল বাঁধতে হবে টেনে খোঁপা করে। এলোচুলে শয়তান ভর করে। ঘোমটা রাখতে হবে মাথায়, বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না, এমনকি বাবরি বাড়ির বা কাছারি ঘরেও না। কথা বলতে হবে আস্তে-আস্তে বাড়ির পুরুষরাও যেন শুনতে না পায়। চেঁচানোটা হলো অসভ্যতা, ছোটলোকরাই চেঁচায়। পর পুরুষদের সুমুখে বের হবে না, বাড়ির চাকরদের সুমুখেও না। (পৃ. ২৩)

খ. লেকুর চটা মেজাজটা আরো চটে গেল মাঝ উঠোনে ঝাঁটাটা হ্যাঁ করে রয়েছে ওর আসার পথের দিকে। ... কতদিন বলেছে আম্বরিকে, ঝাঁটাটা যেখানে সেখানে ফেলে রাখবি না, আসতে যেতে চোখে পড়লে আমার মেজাজটা বিগড়ে যায়। তবু আম্বরি যেন ইচ্ছে করেই ঝাঁটাটা হয় উঠোনে নয় তো দাওয়ায় ফেলে রাখবে, লেকুর চোখে পড়বেই। ... হাতের নাগালে আসতে না আসতেই শক্ত হাতে ওর চুলের মুঠিটা ধরে নেয় লেকু। ... সপাং সপাং ঝাঁটার বাড়ি চালিয়ে যায় ওর পিঠে উন্মাদের মতো। ... তকদিরটাকেই দোষী করে আম্বরি। তকদিরটাই এমনি, নইলে সেই যাচ্ছিল মিঞাবাড়ির দিকে জুমার পর যে কাণ্ডটা ঘটবে সেটা দেখতে। কিন্তু ঘরের বাইরে পা দিয়েই মনটা খুঁত খুঁত করে শুকনো আম পাতায় ভরে গেছে উঠোনটা। পোড়া মন ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটাকে উঠোনে ফেলেই দৌড় দিয়েছিল টেগুল বাড়ির দিকে। ... পোড়া কপাল, যে কপালে লেখা আছে খসমের হাতের মার, পায়ের লাথি, নইলে কি আর মনে থাকত না? কপালের ওপর সব ভার চাপিয়ে দিয়ে যেন একটু হালকা হয় আম্বরি (পৃ. ৩৪-৩৫)

গ. ওরা যেন এ দুনিয়ার মানুষ নয়, জিন-পরীর দেশের মানুষ। ফেরেশতাদের সাথেও নিশ্চয় ভাব আছে ওদের। সেই ফেরেশতাদের কাছেই বুঝি জাদু শিখেছে ওরা। জাদু না জানলে অমন করে মাতিয়ে যেতে পারত তালতলির মেলাটা? আর মালুকে তো সে জাদু একেবারেই বশ করেছে। সেই নেচে নেচে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গাওয়া, সেই স্বর, সেই সুর, সেই মুখ; ... ঘুমের মাঝেও ওদের দেখছে মালু। এই তো, এটাকেই তো বলে জাদু করা। ওদের ভেতর জাদু আছে, কথাটা প্রথম শুনেছিল ভটাচয্যিদের ছেলে মাখনের কাছে। তারপর নিজের চোখেই তো দেখেছে মালু, একটা নয়, দুটো নয়, রীতিমতো গোছা গোছা তাবিজ ওদের বাজুতে বাঁধা। কি যে সাধ জাগে মালুর, এমন একটা তাবিজ কি সংগ্রহ করতে পারে না ও? (পৃ. ১১৭)

ঘ. কামিজটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ায় রমজান। আর সেই মুহূর্তেই একটি টিকটিকি টুপ করে লাফিয়ে পড়ে ওর খালি কাঁধটায়। ত্রস্তে ওর গাঁ বেয়ে নেমে যায়। কোত্থেকে একটা ইঁদুর এসে ধাওয়া করে টিকটিকিটাকে।

হেসে দেয় কালু। বলে, আপনি তোয়াঙ্গর হবেন।

তোয়াঙ্গর, মানে ধনী। টাকাপয়সা, ধনদৌলতের মালিক?

কাঁধে টিকটিকি পড়লে তোয়াঙ্গর হয় না কি রে? আবারও শুধাল রমজান।

হয়। ডান কাঁধে। ওই যে রামদয়ালের বাপ। সেই অল্প বয়সে যখন স্কুলে যেত, তখন তারও ডান কাঁধে টিকটিকি পড়েছিল। সেই অল্প বয়সে যখন স্কুল ছেড়ে ব্যবসায় নামল দত্ত। আর এখন?

হ্যাঁ। এখনকার কথা কে না জানে। কিন্তু সত্যি কি তাই হবে? তোয়াঙ্গর হবে রমজান? কথাটা ভাবতেও অদ্ভুত সুখ পায় রমজান। খুশির চোটে ওর বুকের ভেতরটা যেন লাফিয়ে ওঠে। এ কী কথা শোনাল কালু! এ যে ওর মনের কথা। কতদিন খতিব সাহেবের তসবি গোনার মতো মনে-মনে ও এই কথাটাই জপে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ যেন সন্দেহ জাগে রমজানের মনে, বলে, আমি তো শুনেছি টিকটিকি মাথায় পড়লে রাজা হয়, কাঁধে পড়লে কি হয় সে কথা তো শুনিনি? ওই একই কথা। কাঁধ আর মাথার তফাত কতটুকু। বলেই ঘর ছেড়ে অন্ধকারে নেবে পড়ে কালু। ... তার ওপর আজ টিকটিকি পড়ল ডান কাঁধে? না, কালুর কথাটা মিথ্যে হতে পারে না। সমস্ত আলামতই তো রমজানের পক্ষে। (পৃ. ১৬৭)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর প্রতি সামাজিক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত লোকসংস্কারসমূহের উল্লেখ লক্ষণীয়। সৈয়দ বাড়ির মেয়ে হিসেবে চতুর্দশী রাবু ও ষোড়শী আরিফার স্বাধীন, অবারিত জীবনের পথে বয়স বেড়ে যাওয়ায় ক্রমশ বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি হয়। নারী তার সম্ভ্রম বজায় রাখতে পরুপুরুষের সামনে যথাসম্ভব সচেতন থাকে, আচরণের ব্যাপারেও সংযমী হয়। এরই অংশ হিসেবে সাজসজ্জা, পরিচ্ছদের ব্যাপারে সে বরাবর সতর্ক মনোভঙ্গি পোষণ করে। এ সংস্কারকেই রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, ধর্মীয় বিধি আরোপের মাধ্যমে পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে। কেননা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বিচরণক্ষেত্র বরাবর পরিবারের গণ্ডিতে আবদ্ধ। পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে বাইরের জগতে অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা ও মানুষ হিসেবে মূল্যায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যই পর্দাপ্রথাকে পুরুষতন্ত্র গুরুত্ব দেয়। পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য সকলেই পরপুরুষ, সুতরাং তাদের সামনে যাওয়া যাবে না, মাথায় ঘোমটা টেনে অন্যের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখতে হবে, জোরে কথা বলা যাবে না, ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না প্রভৃতি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে নারীকে বাধ্য করা হয়। সৈয়দ পরিবারেও অনুরূপ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব সৈয়দ গিন্নীর ওপর ন্যস্ত, যে রাবু ও আরিফাকে এসব সংস্কারে অভ্যস্ত করে তুলতে সচেষ্ট। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে স্বামীর দ্বারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অজুহাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হওয়ার বাধ্যবাধকতাকে কপাল বা নিয়তির লিখন হিসেবে আম্বরির মেনে নেয়ার অনস্বীকার্য বাস্তবতায় প্রতীয়মান হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রান্তিকতার স্বরূপ। গৃহকর্মের সমুদয় বোঝা সামলেও অতি তুচ্ছ কারণে আম্বরি লেকুর প্রহার থেকে রক্ষা না পেয়ে অবশেষে এ পরিস্থিতিকে যে নিয়তি হিসেবে বিবেচনা করে, এর মূলে সক্রিয় পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য নিশ্চিত করতে নারীকে অবনমিত রাখার কৌশলী অভীপ্সা। গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকায় অসচেতনতাবশত ঝাঁটাটি উঠানের মাঝে ফেলে রাখার দোহাই দিয়ে যে পুরুষ বিবাহিত স্ত্রীকে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে নিজের বঞ্চনা, উৎপীড়নকে নিয়তি হিসেবে না মেনে আম্বরির যে অন্য উপায় নেই, সেই রূঢ় বাস্তবতাই এ উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত। এভাবেই নিয়তি, কপাল, বিধির দোহাই দিয়ে পুরুষতন্ত্র নারীকে বরাবর নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সচেষ্ট থাকে। যুগ যুগ ধরে এ সংস্কার এভাবেই লোকসমাজে প্রচলিত হয়ে এসেছে। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বালক মালুর বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে তাবিজ সংক্রান্ত গ্রামীণ লোকসংস্কারের প্রতি আসক্তি, যার উন্মোচন ঘটে তালতলির মেলায় আগত লোকসঙ্গীতশিল্পীদের সাঙ্গীতিক প্রতিভা দর্শনে। মালুর অন্তর্লোকে সঙ্গীতের প্রতি দুর্বার আগ্রহ থাকায় তালতলির মেলায় আয়োজিত সঙ্গীতের আসর তাকে এতটা আকৃষ্ট করে। তার বালক মনে এ ধারণাই গড়ে উঠেছিল, যেহেতু গায়কদের বাজুতে তাবিজ বাধা রয়েছে, তাই সেগুলোর জাদুকরী শক্তি রয়েছে। জাদু সম্পর্কে লোকসমাজে প্রচলিত ধারণা মালুকে এরূপ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই পরবর্তীকালে তালতলির মেলায় আগত গায়কদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেও ভবিষ্যতে এ পেশাকেই অবলম্বনে সচেষ্ট হয়। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে শঠ, কৌশলী ও ধুরন্ধর রমজানের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতভাবনাকে বাস্তবায়নের অভীপ্সা প্রকাশিত হয়েছে গ্রামীণ লোকসমাজে টিকটিকি সংক্রান্ত সংস্কারের অনুষঙ্গে। জোতদার ফেলু মিঞার অন্যতম সহযোগী এবং যাবতীয় কুকর্মের হোতা রমজান নিজের আখের গোছাতে বরাবরই সচেষ্ট। এক্ষেত্রে মনিবকে প্রতারণা করতেও সে দ্বিধাহীন। ইলেকশনের জন্য নির্বাচনকারীদের নিকট থেকে টাকা আদায়ের ধান্ধা, কসিরের ভিটেবাড়ি পাঁচ বছরের জন্য বিনা খাজনায় ব্যবহারের সুযোগ, দয়ালচাঁদের নিকট থেকে তিন নম্বর তালুক ফেলুমিঞাকে কিনিয়ে দেয়ার বিনিময়ে মোটা অঙ্কের কমিশন লাভ, সৈয়দবাড়ির সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব পাওয়া প্রভৃতি উপায়ে সে প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়। সেকারণেই একদিন আকস্মিকভাবে তার ডান কাঁধে টিকটিকি পড়ায় কালু জানায়, সে অচিরেই তোয়াঙ্গর বা প্রচুর অর্থের মালিক হতে চলেছে। গ্রামীণ লোকসংস্কার অনুযায়ী, টিকটিকি কারো মাথায় পড়লে রাজা হয়, আর ডান কাঁধে পড়লে ধনদৌলতের মালিক হয়। সেকারণেই

রমজানের ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে আকস্মিকভাবে কালুর কথিত ধারণার সমন্বয় ঘটায় গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত লোকসংস্কারের প্রতি রমজানের আস্থা স্থাপানের দৃষ্টান্তই প্রতীয়মান হয়।

২. লোকাচার-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ জনসমাজে প্রচলিত লোকাচারের তেমন উল্লেখযোগ্য বিবরণ নেই। ব্যতিক্রম হিসেবে রমজানের মায়ের সৎকারের প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পরিসরে বিবৃত। একমাত্র সন্তান রমজান, তার স্ত্রী ও দুই নাতির সঙ্গে সেই বৃদ্ধা দীর্ঘদিন বসবাস করছিল। একপর্যায়ে রমজান রামদয়ালের বাড়ি দখল করে বিশাল বালাখানা বানিয়ে পরিবার স্থানান্তর করলেও তার মা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শ্বশুরের ভিটেবাড়িতে স্বামীর তোলা ছনের ঘর ছেড়ে যেতে সম্মত হয়নি। নিঃসঙ্গ এ নারী নামাজ-রোজা প্রভৃতি ধর্মীয় আচারে নিমগ্ন থেকেই বার্ধক্যের দিনগুলো অতিক্রম করত। বসন্তে ভুগে সে মৃত্যুবরণ করলে রমজান তাকে কবরস্থ করার দায়িত্বপালনে অসম্মতি জানায়। অবশেষে মানবিকতার খাতিরে তাকে সমাধিস্থ করার দায়িত্ব নেয় লেকু, রাবু, হুরমতি, জাহেদ, মালু, সেকান্দর মাস্টার ও বাকুলিয়ার অন্য বাসিন্দারা। এ বিবরণে প্রকাশিত হয়েছে মৃত নারীকে সৎকারের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, যা ধর্মীয় বিধানকে মান্য করেও এ বিষয়ক লৌকিক রীতির অনুসরণে সচেষ্ট–

> কাফনের ছোট একটা টুকরোকে ফিতের মতো সরু সরু করে ছিঁড়ে নেয় জাহেদ। ... ঘড়া নিয়ে চৌবাচ্চার দিকে চলে গেল মালু। পানিতে ভরে দিল মৃতার চৌকির পাশে রাখা মটকাটা। ... ব্যস, ওতেই চলবে। বাইরে গিয়ে বস তুই। আমি না ডাকলে এদিকে আসবি না। সাবান আর কর্পূরের মোড়কটা খুলতে খুলতে বলল রাবু। ... বাইরে এসে কবেকার পড়ে থাকা ভাঙা এক চৌকির পায়ার ওপর বসল মালু। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সবকিছুই যেন স্পষ্ট দেখছে ও। দেখছে ধীরে ধীরে মুরদার আবরণটা সরে গেল। কোমরের কাছে কোনো রকমে জড়িয়ে থাকা শাড়ির টুকরোটাও খুলে ফেলল রাবু। তারপর আস্তে-আস্তে বদনা বদনা পানি ঢালল মৃতার শরীরে। ... প্রথমে সাবান ঘষে মাথার চুলগুলো পরিষ্কার করল। পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিল পানিটা। তারপর চিরুনি চালিয়ে পাট করে দিল শণের মতো ধূসর দড়ি পাকানো চুলের গোছাগুলো। ... কুঁচকে যাওয়া শরীরটাকে আস্তে-আস্তে সাবান মেখে ধুয়ে দিল রাবু। গভীর যত্ন আর মমতায় ন্যাকড়া চেপে চেপে পুঁজ আর পানিটা শুকিয়ে নিল। একটা ধোয়া শাড়ি দিয়ে দেহটাকে ঢেকে দিল আবার। ডাকল মালুকে। ... মসজিদের মুরদা ফরাশের খাটিয়াটা দাওয়ায় তুলে রেখে গেছে জাহেদ আর ফজর আলী। ... কাফনের একপ্রস্থ কাপড় খাটিয়ার ওপর বিছিয়ে দিল রাবু। তারপর দু'জনে ধরাধরি করে মুরদাকে উঠিয়ে নিল চৌকি থেকে। ... মৃতার গায়ে আতর মাখাল রাবু। আতর ভেজা তুলো গুঁজে দিল ওর কানে। ... কাফনের কাপড়ে কর্পূর পানি ছিটিয়ে দিল। সাথে একটু গোলাপ নির্যাস। ... কবর খুঁড়ে এসে গেছে ফজর আলী জাহেদ সেকান্দর। মৃতার খাটিয়াটা কাঁধে তুলে নিল ওরা। ... গোরের কোলে শেষ বিছানায় বুড়িকে শুইয়ে দিল ওরা। ঝুরঝুরে মাটি ঢেলে ঢেলে দিল কাফনটা। ... ঢিপির মতো উঁচু হয়ে গেল কবরটা। ছয়টি হাত সযত্নে চারপাশের মাটিটা ঢালু করে নামিয়ে দিল কবরের চারটি পাড়। কবরের পিঠটাকে গম্বুজের মতো সামান্য উঁচিয়ে মাটির ঢেলাগুলো ভেঙে ভেঙে সমান করে দিল ওরা। তারপর কবরটার উপর পুঁতে দিল ছোট একটি 'মেন্দি' গাছের ডাল। ... দাফন সেরে গোসল করল ওরা। (পৃ. ৩৭৯-৩৮২)

৩. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে বাকুলিয়া ও তালতলি গ্রামদ্বয়ে প্রচলিত লোকসাহিত্যের উপাদান হিসেবে ছড়া, প্রবাদ, লোককাহিনী, কিংবদন্তি ও লোকসঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটেছে –

৩.১ ছড়া-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ বালক-বালিকাদের মুখে প্রচলিত ছড়ার স্বল্পোল্লেখ লক্ষণীয়। মালু সিকান্দর মাস্টারের বোন রাসুকে ঘাটে পলো নিয়ে মাছ ধরতে দেখে। রাসু পরনের শাড়িটা বেশ আঁটোসাঁটোভাবে পড়ে, আঁচলটাকে পেঁচিয়ে কোমরে শক্ত গিঁট দেয়। তাকে দেখে মালুর মনে পড়ে তালতলির জেলে পাড়ার জালুনদের কথা। কেননা, মাছ ধরার সময় তারাও এভাবে পেঁচিয়ে শাড়ি পরে। মালু রাসুকে দেখে ছন্দ মিলিয়ে ছড়া বানায়–

ও জালুনী

ঠেলা জালে যাই বি?

বড় গাঙ্গে না ই বি?

সেই সাত পানির তলে

ঘাই মারে বোয়ালে,

জাল যে গেছে ঠেইক্যা

ডুব মারবি এইক্যা?

ও জালুনী

সাত নাইয়ের ঠাঁই

সেই গাঙ্গে যাই,

জাল আনমু হেঁইচকা

মাছ তুলমু ছেঁইক্যা,

বিহান বাজার ধরমু

নুন মরিচ কিনমু

ঘরে আবার ফিরমু। (পৃ. ১৪০)

এর জবাবে মালুকে উদ্দেশ্য করে রাসু ছড়া কাটে–

মালু বয়াতি! মালু বয়াতি!

যাও কই?

উধমপুর।

রান্ধ কি?

কইতরের ঠ্যাং।

খাও কি?

কচুর শাক! ...

ইস, মুরোদ নাই দুই আনা

বউ চায় সেয়ানা? (পৃ. ১৪৫)

৩.২ প্রবাদ

এক বাজারে দুই ভাও, এটা কোন দেশী কথা। (পৃ, ১৮)

কথায় বলে, বাপ যদি হয় আলেম ছেলে হয় জালেম। (পৃ. ২২)

কথায় বলে, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু। (পৃ. ৩০)

কত ধানে কত চাল সে আমারও জানা আছে। (পৃ. ৭৮)

লঘু পাপে গুরু দণ্ডের মতো অন্যায়টিকে ওরা কেউ রাখতে পারল না, না সেকান্দর, না লেকু কসির মিলে গ্রামের যে মানুষ, তারা। (পৃ. ৮২)

শেষ পর্যন্ত গাছে তুলে মইটা কি কেড়েই নেবে ফেলু মিঞা? (পৃ. ১২৬)

ওহে মাস্টার, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতছ তুমি। (পৃ. ১৩২)

খোদার হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না। (পৃ. ১৭৬)

কথায় বলে সাতদিন চোরের, একদিন গেরস্তের। (পৃ. ১৯৪)

আলেমের ঘরেই জালেমের পরদাস সেই প্রবাদ বচনটির উদ্ধৃতি দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মা (পৃ. ২১৮)

কথায় বলে বসতে দিলে শুতে চায় (পৃ. ২১৯)

আদার বনে খাটাশ বাঘ। (পৃ. ৩৩২)

৩.৩ লোককাহিনী-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কিচ্ছাকাহিনী, লোককথার উল্লেখ রয়েছে। বিশেষত, ধর্মীয় ও নৈতিক-সামাজিক শিক্ষার অন্যতম বাহন হিসেবে এসব কাহিনী যে লোকমানসে বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তা প্রতীয়মান হয় শ্রোতাদের বিমুগ্ধভাবে শোনার আগ্রহে। সৈয়দগিন্নী বারান্দায় পাটি পেতে গল্পের আসর বসান। তিনি 'পীর পয়গম্বরের কিস্‌সা' শোনান। মালু, রাবু, আরিফা, হুরমতি, আম্বরি, সেকান্দর, সেকান্দরের মা, ট্যাণ্ডলদের স্ত্রী এ আসরে সমবেত হয়। বড়রা মাথায় কাপড় টেনে এবং পান চিবুতে চিবুতে রূপকথার ভঙ্গিতে পরিবেশিত এ কাহিনী শোনে--

মস্ত বড় ধনী। অগুনতি তাঁর রায়ত প্রজা। কত যে লয়লস্কর। ঘোড়া-শালে ঘোড়া, হাতি-শালে হাতি। কাচারিবাড়ি, কোঠাবাড়ি, তেতলা দালান। ধন দৌলতের শেষ নেই তাঁর। ... এত ধন দৌলত নিয়েও কিন্তু সুখ নেই তার। জীবনের একমাত্র সাধ তাঁর আল্লাকে দেখবেন। তাই দিনে দিনে এবাদত যায় বেড়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকেন সেজদায়। রাতে এশার নামাজ সেরে তাহাজ্জত পড়েন সেই রাত অবধি। ...সোবে সাদেকের সময় যিকির করেন, ফজরের নামাজ সারেন। তারপর কোরান তেলাওয়াত করেন সেই বেলা অবধি। এ ভাবেই দিন যায়। মাস যায়। বছর গিয়ে আবার ঘুরে আসে। ... গায়ে যেন কাঁটা বিধল সাধক পুরুষের। চমকে উঠলেন তিনি। ... বুঝলেন এ হচ্ছে খোদারই গায়েবী আওয়াজ। ডাকলেন ছেলেদের, বললেন, বাবারা, তোমাদের বিষয় সম্পত্তি তোমরাই বুঝে নাও, আমি চললাম খোদার রাহে। ... দিন যায়, মাস যায়, খাবার গিয়েছে ফুরিয়ে। পথে পথে চেয়ে মেঙ্গে খান। না পেলে উপোস দেন। ... সম্পূর্ণ রিক্ত, সর্বলোভ সর্ববিলাস মুক্ত কামিল পুরুষ তিনি। ... জিব্রাইলের কথাটা ফুরোতে না ফুরোতেই কোত্থেকে যেন কোটি তারা আর লক্ষ চাঁদ নেমে এল পৃথিবীর বুকে, আলোয় আলোয় ভরে গেল পৃথিবী। অপূর্ব সে আলো, সেই আলোর ছটায় উদ্ভাসিত দিকদিগন্ত। সাধককে ঘিরে যেন লক্ষ আলোক শিখার নাচন। ঝলসে গেল সাধকের চোখ। বেঁহুশ তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ...অসম্ভবও সম্ভব হয় যদি থাকে নিষ্ঠা, সুদৃঢ় মনোবল আর ত্যাগের স্পৃহা। (পৃ. ৯৯-১০৩)

সৈয়দ বাড়িতে নাচগানের জলসার আসরে 'প্রাচীন কিসসার বয়ান অথবা যাত্রার ঢঙে অভিনয়'-এর প্রতিপাদ্য ছিল 'লায়লী মজনু। ইয়ুসুফ জোলেখা। লখিন্দর বেহুলা সবারই জানা কিস্‌সা' (পৃ. ১৭৯)। এর পাশাপাশি 'লম্বা কাহিনী ধরেছে মধু গায়েন। তুর পাহাড়ে মুসা নবির জ্যোতি দর্শনের সেই অতি প্রাচীন কাহিনী' (পৃ. ১৭৯)। অন্যদিকে ফেলু মিঞার কল্পনায় মিঞাবাড়ির সমৃদ্ধি ও আভিজাত্যময় প্রতিচ্ছবি গড়ে ওঠে রূপকথার কল্পকাহিনীর অবয়বে–

একটি ছবি নয়, অসংখ্য ছবি–তারা জীবন্ত হয়ে ওর চোখের সুমুখে চলে বেড়াচ্ছে। নহবতখানায় শানাইওয়ালা বাঁশিওয়ালা ঘুঙুরওয়ালা। কি এক লালিত রাগিণীর মূর্ছনায় ধিমি ধিমি সুরের জাল বিস্তার করে চলেছে ওরা। হাতিশালায় হাতি।

ঘোড়াশালায় ঘোড়া। মেজবানখানায় মেহমানের ভিড়। লোক-লস্করে গমগম করছে মিঞা বাড়ি। কত কণ্ঠ কত হাসি। হাসি হাসি মুখ প্রজাদের, মিঞার অনুগ্রহ পেয়ে তারা হাত তুলে দোয়া করছে, আল্লার দরবারে দীর্ঘায়ু কামনা করছে ফেলু মিঞার। আহা সে দিন কখনো আসবে না? এই তো ছবি মিঞা বাড়ির। (পৃ. ৬৪)

৩.৪ কিংবদন্তি–– বাকুলিয়ার পত্তন বা গড়ে ওঠার শত বছর প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত একাধিক কিংবদন্তি গ্রামবাসীর মধ্যে বংশপরম্পরায় প্রচারিত–

> ক. কেউ বলে সৈয়দদেরই পূর্বপুরুষ এ অঞ্চলে এসেছিল ইসলাম প্রচারে। এখন যে মিঞা বাড়ি সে বাড়িতে ছিল এক বিত্তশালী হিন্দু পরিবার। গৌরবর্ণ দিব্যকান্তি তরুণ এক মুজতাহিদ। তার প্রচারে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বাড়ির কর্তা। তরুণ সাধককে সাদর আমন্ত্রণে ডেকে এনেছিলেন বৈঠকখানায়। গোটা পরিবার ইসলাম কবুল করেছিলেন। তারপর কোন এক শুভলগ্নে বাড়ির কর্তা আপন কন্যাকে সমর্পণ করেছিলেন সুদর্শন পিরের খেদমতে। যাযাবর মুজতাহিদ আটক পড়েছিল দুটি পেলব বাহুর বন্ধনে। সেই বছরই তৈরি হয়েছিল মিঞা বাড়ির ওই মসজিদ আর গ্রামের অপর প্রান্তে পত্তন হয়েছিল সৈয়দ বাড়ির। (পৃ. ৪১)

> খ. অন্যরা বলে আর এক কাহিনী। একদা অঞ্চলটি ছিল বিরানা। বসতি ছিল অনেক দূরে উত্তরে। সেই উত্তরের নমো কুঁয়োররা উঁচু জাত ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বসতি ছেড়েছিল। মুসলমান হয়ে চলে এসেছিল এই বিরানা অঞ্চলে, পত্তন করেছিল বাকুলিয়ার। এ নাকি বল্লাল সেনেরও আগের কথা। (পৃ. ৪১)

তবে বাকুলিয়ার বাসিন্দারা এ গ্রামের পত্তন সম্পর্কিত লিখিত ইতিহাস বা কিংবদন্তির চেয়ে বেশি আগ্রহী বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে রচিত কাহিনীর প্রতি। এ গ্রামের সবচেয়ে পুরাতন সাক্ষী হিসেবে তারা শত বছরের পুরাতন মসজিদটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মসজিদের নির্মাণকাল হিসেবে এর প্রবেশপথেই আরবি-বাংলা সনের পাশাপাশি ইংরেজিতে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের উল্লেখ রয়েছে। তবে গ্রামের মিঞা পরিবারের অভিমত হল, এ মসজিদের পত্তন নাকি আরো দুইশত বা তিনশত বছর পূর্বে ঘটেছে। তখন নাকি মসজিদটি কাঁচা ছিল। তবে এসব কিংবদন্তি যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, তা হলো মিঞা ও সৈয়দ পরিবারের আধিপত্যকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব। লেখক জানিয়েছেন–

> মিঞারা আজ কোমর ভাঙা সিংহ, হয়তো গুরুত্ব আছে তাদের এই বাকুলিয়ার সমাজে কিন্তু শক্তি নেই, রোয়াব নেই। শুধু আছে হতবিত্ত খানদানির খেদ আর হায় আফসোস, অক্ষমের ক্রোধ। আগ্রহ না থাকলেও কিংবদন্তির আড়ালে লুকানো কোন সত্য যখন ঝিলিক মেরে ওঠে তখন উৎকর্ণ হয়, কৌতূহলি জটলা পাকায় বাকুলিয়ার মানুষ। ওই মসজিদেরই পয়লা কাতারের পয়লা কি দোসরা আসনটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপারটা ঘটেছিল। সেও বছর ত্রিশ আগের কথা। মরহুম বড় মিঞার তখন শেষ সময়। (পৃ. ৪২)

এ ঘটনার পরিণতিতে দুই পরিবারের বংশগরিমা ও আভিজাত্যকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার মীমাংসা ঘটেছিল মিয়া পরিবারের কন্যার সৈয়দ পরিবারের বধূ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের ঘটনায়। এরপর থেকে বংশপরম্পরায় সে বন্ধন আরো জোরালো হয়ে চলেছে। লেখক জানিয়েছেন, ‘মজলিশের সুমুখে আজও যখন জটলা বসে বাকুলিয়ার বুড়োরা সে বহসের গল্প শোনায়, কত রং ফলিয়ে আরবি-ফার্সি-উর্দু কিতাবগুলোর বিচিত্রবর্ণনা জুড়ে।’ (পৃ. ৪৩)

৩.৫ লোকসঙ্গীত–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের উল্লেখ রয়েছে। মূলত উপন্যাসের নায়ক মালুর গ্রাম্য বয়াতি থেকে সভ্যজগতের শিক্ষিত সমাজে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের বৃত্তান্ত রূপায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব সঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটেছে। পাশাপাশি, লোকমানসে যুগ যুগ ধরে পরম মততায় পরিচর্যিত ও রক্ষিত এসব গানের চিরন্তন আবেদন যে বাঙালি লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সে প্রসঙ্গও এর মধ্য দিয়ে ভাষ্যরূপ পেয়েছে। গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত লোকগীতি, যাত্রাগান, পালা, পুথির কেচ্ছাকাহিনী, ধর্মীয় বৃত্তান্ত, বিয়ের মেয়েলি গীত, ভাটিয়ালি গান, মুর্শিদী ও মাইজভাণ্ডারী গান, কবিগান, প্রভৃতির

মধ্য দিয়ে গ্রামীণ লোকজীবনে প্রবহমান সংস্কৃতি ও লোকজচেতনার রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে উল্লেখিত বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্ত–

লোকগীতি

ক. রঙ্গম রঙ্গিলারে ...

রঙ্গম রঙ্গিলার সনে

রঙ্গে দিছ মন,

সেইমত দেওয়ানা হইয়া

রইল কতজন রে ... (পৃ. ১২০)

খ. শোনরে আশেকগণ

প্রেমেরই বিধান–

প্রেম বিনা বেহেশতো নসিব

না হয় মন।

প্রেমের মরা জলে ডুবে না।

যে না জানে প্রেমের মরমো

তার সনে প্রেম কইরো না

আহা প্রেমের মরা জলে ডুবে না।

চণ্ডীদাশ আর রজকিনী

তারা যে প্রেমের শিরোমণি–গো

আরে বারো বছর বাইলো বড়শি

তবু আদার গিলে না,

আহা এমন প্রেমিক কয়জনা

প্রেমের মরা জলে ডুবে না। (পৃ. ১৪১)

মাইজভাণ্ডারি গান–

ভাণ্ডারিতে আজবি কারবার

ওহো কী চমৎকার।

সাজাইল মারফতের তরী

দেখবি যদি আয়

চড়বি যদি আয়–আহা মাইজ ভাণ্ডার,

ওহো কী চমৎকার।

ভাণ্ডারিতে আজবি কারবার।

ওহে হিন্দু-মুসলমান

তোরা দেশে দশে এক প্রাণ

তোরা ভক্তি কর আওলিয়ার চরণ

ওহে চিন্তা ভবে নাই আর

ওহো কী চমৎকার, ভাণ্ডারিতে আজবি কারবার। (পৃ. ১৪৮-১৪৯)

৪. লোকপ্রথা–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত গোষ্ঠীবদ্ধতার দৃষ্টান্ত রয়েছে শুরুতেই, যা বাকুলিয়ার লোকমানসে সন্নিহিত লোকরীতির প্রতি সমীহা ও শ্রদ্ধাবোধের পাশাপাশি সামাজিক অনুশাসনের স্বরূপকেও উপস্থাপন করে। পতিতা হুরমতিকে কেন্দ্র করে জুম্মার নামাজের পর মিঞাবাড়ির কাছারির সামনের মাঠে যে মজলিশ বসে, তাতে নেতৃত্ব দেয় মিঞাবাড়ির ফেলুমিঞা, যে 'গাঁও মজলিশের কর্তা'। তার সঙ্গে অন্য মাতবররাও উপস্থিত ছিল। হুরমতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে জারজ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে। যদিও স্বয়ং ফেলুমিঞা, তার অন্যতম সহযোগী রমজান এমনকি গ্রামের ও 'সাবডিভিশন' শহরের যে কেউই অর্থের বিনিময়ে তার দেহ ভোগ করত, তবু তার গর্ভস্থ সন্তানের দায় গ্রহণে সকলেই ছিল অস্বীকৃত। হুরমতির বিচার ত্বরান্বিত করতে রমজানের উদ্যোগই নেপথ্যে উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছিল। কেননা, স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে হুরমতিকে বিয়ে করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তবে, তাকে কঠোর শাস্তি দানে ফেলু মিঞার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম কারণ ছিল, অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সে গ্রাম-পঞ্চায়েতের আয়োজিত মজলিশে আসতে অসম্মতি জানানোর পাশাপাশি এ বিচারব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছিল। সেকারণে ফেলু মিঞার পেয়াদা কালু তাকে চুলোর মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে হাজির করে। হুরমতির বিদ্রোহী মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছিল পরপুরুষের সামনে ঘোমটা মাথায় না দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনায়। ফেলু মিঞা ও রমজানের অকথ্য গালাগাল, মাথায় ঘোমটা টানার নির্দেশ এমনকি খতিবের শাস্ত্রীয় বয়ানে উল্লেখিত কঠোর শাস্তির বিধান, কোনো কিছুই তাকে ভীত করতে পারেনি। ব্যাভিচারের অভিযোগে হুরমতিকে দণ্ডিত করে এর যথোপযুক্ত শাস্তি হিসেবে খতিব ঘোষণা করেছিল বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করার শাস্ত্রীয় বিধান। একপর্যায়ে 'এই আউরত পয়লা গোনাহ্ করেছে' (পৃ. ১৬) এ দোহাই দিয়ে খতিব তাকে পাঁচ দোররা মারার আদেশ দেয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত পছন্দ না হওয়ায় ফেলু মিঞা তাকে ছেঁকা দেয়ার পাশাপাশি গ্রামে 'একঘরে' করার দণ্ড ঘোষণা করে। অন্য কেউ এ আদেশ লঙ্ঘন করলে তাকেও একঘরে করার পাশাপাশি লোকসমাজ থেকে নির্বাসনের হুমকি দেয়া হয়। এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তবু এসব সিদ্ধান্ত হুরমতিকে সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। কেননা, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে পেশাকে সে গ্রহণ করেছে, এর পরিণতি নিয়ে সে চিন্তিত ছিল না। কিন্তু গ্রামীণ লোকসমাজে ক্ষমতাশালী, সুবিধাবাদী ব্যক্তি-গোষ্ঠী যে স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করতে পারে, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে। লেকুর প্রতিবাদের সূত্র ধরে সেকান্দর মাস্টার হুরমতির গর্ভজাত জারজ সন্তানের জন্মদাতা হিসেবে রমজানের নাম উল্লেখ করে তার শাস্তি দাবি করলেও ফেলু মিঞার কৌশলে সে প্রসঙ্গ আড়ালেই থেকে যায়। সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতি অঙ্কিত তামার একটি পয়সা গনগনে কয়লার আগুনে পুড়িয়ে চিমটা দিয়ে ধরে

হুরমতির কপালে কলঙ্কতিলক এঁটে দেয়া হয়। কিন্তু হুরমতি এ অমানুষিক যন্ত্রণাকে নীরবে সহ্য করায় এ বিষয়টিও মাতবরদের নিকট তার উদ্যত আচরণ হিসেবে বিবেচিত হয়–

> কলি। কলি ঘোর কলি। আল্লার দুনিয়া কি আর আছে? এখন ঘরে-ঘরে, মানুষের মনে-মনে শয়তানের বসতি। ... নইলে গাঁ ভর লোকের সামনে এত ঘটা করে হাত চেপে ধরে কপালের এক পয়সা পরিমাণ চামড়া পুড়িয়ে দেয়া হলো অথচ একটু 'আহ' শব্দ করল না মেয়েটি? তেমন যে পশু ছাগল, কোরবানির সময় কেমন করে দেখনি? ... হ্যাঁ হ্যাঁ কলিকাল ছাড়া আর কি! সমাজ মানে না, বিচার মানে না, শাসনকে ভ্রূকুটি করে ছোটলোকের জাত। আসকারা পেয়ে ব্যাটারা মাথায় চড়েছে, গায়ে ব্যাটাদের চর্বি জমেছে। যেন জনান্তিকেই কথাগুলো বলে গেল ফেলু মিঞা। (পৃ. ২০)

৫. লোক-উৎসব–– এ উপন্যাসে লোক-উৎসব মেলার উল্লেখ রয়েছে। তালতলির হাটে অজস্র মানুষের সমাবেশ ঘটায় সেখানে বিভিন্ন সময়ে মেলার আয়োজন করা হয়। এরকম এক মেলাতে উপস্থিত কবিগানের দলের সাক্ষাত লাভের ঘটনা উপন্যাসের নায়ক মালুর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যবাহী ঘটনা, যা তার সঙ্গীতশিল্পীসত্তার উদ্বোধনে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছিল। মেলায় বিভিন্ন সামগ্রীর কেনাবেচা হলেও গ্রামবাসীর নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল কবিগানের আসর, রাধাকৃষ্ণের পালা ও যাত্রা। বিশেষত, যাত্রায় পুরুষেরা নারী সেজে অভিনয় করে বলে এর প্রতি বালক মালুর অপার বিমুগ্ধতা সৃষ্টি হয়। সেকারণেই সে রাসুকেও যাত্রা দেখাতে সচেষ্ট ছিল। মালু চেষ্টা করেছিল যাত্রাদলের তাঁবুতে ঢুকে কুশীলবদের সাজসজ্জা ও পোশাকপরিচ্ছদ দেখতে। কেননা, সে ভট্টাচার্যদের বাড়ির বাদলের কাছে শুনেছিল, 'রুপোর জাজিম, সোনার পোশাক, হীরের তাজ, ঝিলিক দেওয়া রামের তরবারি, আরো কত কিছু আছে ওখানে' (পৃ. ৭০)। কিন্তু সে ইতঃপূর্বে তেমন কিছুই দেখেনি। একপর্যায়ে যাত্রাদলে 'সুগ্রীব' চরিত্রে অভিনয়কারীর সঙ্গে আলাপকালে সে তার মনে জাগ্রত কৌতূহল নিবৃত্তির সুযোগ পায়––

> মানুষের মতো গলাটা দরাজ করে হাসে সুগ্রীব, বলে–চলো, দেখাই তোমারে 'রামের কারখানা। সঙ্গের আর একটা তাঁবুতে নিয়ে আসে সুগ্রীব। কাগজের মুকুট, টিনের তলোয়ার আর কিছু জরি আঁকা পোশাক এদিকে ওদিকে ছড়ানো। কিন্তু ওসবে মালুর কৌতূহল উবে গেছে। সুগ্রীবই ওকে মুগ্ধ করেছে। ... আমার বাড়ি বিন্ধ্য পর্বতের ওপারে, কিস্কিন্ধ্যার রাজপরিবারে আমার জন্ম। কথাগুলো বলতে বলতে বাইসেপটা ফুলিয়ে তোলে সুগ্রীব। ... রামটা তো আস্ত ছাগল। শুধু তীর ছুঁড়ে কি লড়াই জেতা যায়? বিজয়ের জন্য চাই বুদ্ধি, কৌশল। সে বুদ্ধি সে কৌশল এই সুগ্রীবের। (পৃ. ৭১)

রিহার্সালের ডাক পড়ায় সুগ্রীব চলে যাওয়ার পূর্বে মালুকে প্রস্তাব দেয় যাত্রায় অভিনয়ের। এভাবেই বালক মালুর কল্পলোকে সঞ্চারিত রামায়ণের ভুবন বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মিলনে নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়। তার চেতনালোকে শিল্পের প্রতি বিমুগ্ধতার স্ফুরণও ক্রমশ ঘটে চলে। পড়ালেখায় আগ্রহ হারালেও তালতলির মেলার প্রতি তার আগ্রহ দিনদিন বাড়ছিল। তাই সে কখনো কখনো হুরমতিকে নিয়ে সেখানে যায়। তার অন্তর্লোকে সঙ্গীতের প্রতি যে বিমুগ্ধতা সংগুপ্ত ছিল, এর স্ফুরণও ঘটে তালতলির মেলায়। কেননা, গ্রামের বিভিন্ন আসরে পরিবেশিত লোকগীতি, রাখালের গান, বিয়ের আসরের মেয়েলী গীতের সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও তালতলির মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে আগত গণি বয়াতির গান, সুলতানপুরের মধু গায়েন, উদবাজপুরের গফুর কবিয়াল, চাটখিলের রতুন বড়ুয়া প্রমুখ কবিয়ালদের কণ্ঠে শ্রুত গান ও পরিবেশনার ভঙ্গি তাকে বিস্ময়াভিভূত করে। সেকারণেই সুগ্রীবের অভিনীত যাত্রার ঘোর দুদিন পর কেটে গেলেও মালু নিজের অজান্তেই কবিয়ালদের গানের অনুসরণে আনমনে গান গাইতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে––

> ওদের ঢংটা নকল করে মালু। ওদের গানগুলো গায়, যখন লোক থাকে ধারে পাশে তখন মনে মনে। যখন থাকে না কেউ তখন দিব্যি গলা ছেড়ে। ... শুধু ওর গান গাইতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছে করে ওদের মতো নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে অনেক লোকের সুমুখে গাইবে সে। আহা, ওদের মতো করে কবে গাইতে পারবে মালু? (পৃ. ১১৭)

মালুর সঙ্গীতপ্রীতি অচিরেই রাসু ও জাহেদের নিকট প্রকাশিত হয়। সে রাসুকে 'রঙ্গমিবুয়া'র গান শোনায়। রাসুর কণ্ঠে 'বয়াতি' সম্ভাষণ মালুকে বিমোহিত করে। অন্যদিকে জাহেদের উৎসাহে সে গণি বয়াতির পরিবেশিত প্রেমের

গান ‘প্রেমের মরা জলে ডুবে না’ পরিবেশন করে। তার গান শুনে রাবু ও জাহেদের আবেগায়িত হোচ্ছাস মালুকে অনুপ্রাণিত করে। একপর্যায়ে জাহেদের পরামর্শে মালু দেশাত্মবোধক গানে দীক্ষিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সে দূর-দূরান্তের হাটে-বাজারে উপস্থিত হয়ে সমবেত জনতার ভিড়ে সেসব সঙ্গীত পরিবেশন করে। রাবুর বিয়ের পর সৈয়দবাড়িতে গানের আসরে মালু বাকুলিয়ার ইতিহাসকে নিয়ে স্বরচিত যে গান পরিবেশন করে, তাতে প্রতীয়মান হয় সঙ্গীতের প্রতি তার আন্তরিক আগ্রহ। কিন্তু সৈয়দ পরিবার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলে এ পর্যায়ে আকস্মিকভাবে গণি বয়াতির সঙ্গে সাক্ষাৎ তার শিল্পীসত্তার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ‘লাঙল-কোট’ থেকে আসা বায়নায় অংশগ্রহণের জন্য গণি তাকে প্রস্তাব দিলে সে তখনই এতে সম্মতি দেয়। সেই দলের সদস্য হিসেবে লোকসমাজে প্রচলিত নানা কিচ্ছাকাহিনীকে নিজের মত করে সাজিয়ে সেসব নতুন গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মালু নিজেকে কবিয়াল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবে অতিক্রান্ত হয় তিন বছর। একপর্যায়ে পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে গণি বয়াতির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত সৃষ্টি হলে মালু দল ছেড়ে গ্রামে চলে আসে। এখানে পূর্বপরিচিত তালতলির রানুর খুড়ো রামদয়ালের দোকানের কর্মচারী হিসেবে জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি তার খুড়তুতো দাদা ও সঙ্গীতশিল্পী অশোকের নিকট মালু হারমোনিয়াম শেখার সুযোগ পায়। শুধু তাই নয়, গণি বয়াতির কাছে শেখা স্বল্পসংখ্যক পালা ও লোকগান শিখলেও অশোকের নিকট হতে সে সঙ্গীতের নানা রাগরাগিনী ও কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত হয়। সারেগামার পাঠ শেষে ‘তবলা সারেঙ্গী সেতার এসরাজ, একে-একে যন্ত্রগুলো ওকে চিনিয়ে দেয় অশোক’ (পৃ. ১৯২)। অশোকের পরামর্শে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার অন্তর্তাগিদে সে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসে। অশোকের গানের ভক্ত রাকীবুদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে বেতারে অডিশন দিলেও সে উত্তীর্ণ হয়নি। তবু সে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হাল ছাড়ে না। কেননা, পল্লীগীতির সম্রাট রাকীবুদ্দিন সাহেব তার কণ্ঠে পরিবেশিত তালতলির প্রচলিত গান শুনে বিস্ময়বিমুগ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন--

> আহা, এ-যে আমার গ্রামবাংলার মিঠে সুর গো। গাও গাও। আর একটি গাও। কলকাতা শহরে বসে অমন খাঁটি আর মিঠে সুর কি মাথা কুটলেও পাওয়া যায়? ... সেই যে প্রশংসা, সে তো শুধু মামুলি দুটো উৎসাহ-বচন ছিল না? সে ছিল এক স্বীকৃতি, মালুর শিল্পীজন্মের এক মহাসনদ। ... সে ছিল বুঝি পরিপূর্ণ এক শিল্পী সত্তার উন্মেষলগ্ন। সে সত্তা জন্ম দিল একটি চেতনার, শিল্পীর গুণাবলির নিজস্ব এক মূল্য-উপলব্ধির। (পৃ. ২২৭-২২৮)

যুদ্ধবিধ্বস্ত কলকাতা মহানগরে বাইশ বছরের যুবক মালুর জীবনসংগ্রামের তাগিদে নানা বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলেও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে সকলের স্বীকৃতি অর্জনের পথে সে কোনো বাধাকেই মেনে নেয়নি। তাই পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা বেতারের কর্মকর্তা হিসেবে কাজের সুযোগ এবং বিভিন্ন সঙ্গীতায়োজনে তার গান শুনতে আসা শ্রোতাদের বাহবা ও আবেগোচ্ছ্বাস, তার নিকট গান শিখতে আগ্রহীদের অনুরোধ প্রভৃতি ঘটনায় প্রতীয়মান হয় বাকুলিয়ার কিশোর বয়তি আবদুল মালেকের সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের ইতিবৃত্ত। এভাবেই তালতলির মেলা হয়ে উঠেছিল মালুর গ্রাম্য কবিয়াল বা বয়াতি থেকে অভিজাত সমাজে প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পাশাপাশি, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মালু যখন বাকুলিযায় ফিরে আসে, তার স্মৃতিচারণায় জেগে ওঠা শৈশব-কৈশোরের দুরন্তপনাভরা দিনগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় সময়ের অভিঘাতে তালতলির মেলার বিধ্বস্ততার প্রসঙ্গ--

> পুকুরের উত্তর পাড় ধরে বড় মাঠ। পুকুরের পাড়ে আর ওই মাঠে মেলা বসত দোলের সময়, চৈত্র সংক্রান্তিতে। ছোট বেলায় জাহেদের সাথে রাবু আরিফা মিলে কতবার এই মেলায় এসেছে। কত কিছু কিনত ওরা। রাবু আরিফা পর্দা নেয়ার পর মালু একাই আসত ওদের ফরমাশ নিয়ে। তারপর এই মেলা থেকেই তো বিভাকে একটা মাটির নটরাজ কিনে দিয়েছিল মালু। ... এখন আর মেলা বসে না এখানে। যারা মেলা বসাতো তারা নেই। পুকুরের পাড়গুলো কে বা কারা কেটে ফেলেছে, ক্ষেত বানিয়েছে। (পৃ. ৩৬৭-৩৬৮)

৬. লোকজ্ঞান–– ভূমিনির্ভরতা গ্রামীণ লোকসমাজের জীবিকানির্বাহ ও খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সেকারণেই প্রাচীনকাল থেকে কৃষির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। জমিতে ফসল বোনার সময় নির্ধারণ, জমির প্রকৃতি বুঝে ফসল বোনার ভাবনা, স্থানীয় আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত ধারণা গ্রহণ, বাতাসের গতি, প্রাকৃতিক বৈরিতা, ঋতুর পরিক্রমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা অর্জনের জন্য কৃষকরা সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে আহরিত অভিজ্ঞতা ও ধারণা। বাকুলিয়া-তালতলির কৃষকসমাজ সম্পর্কেও এ অভিমত প্রাসঙ্গিক। কেননা, যেহেতু তারা ভূমির ওপর নির্ভরশীল এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রি করেই পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তির বন্দোবস্ত করতে হয়, তাই প্রকৃতির বিচিত্র রূপের পালাবদল অনুধাবন তাদের জীবিকা নির্বাহেরই অংশ। শিক্ষার অভাবে যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুধাবনে সমর্থ না হলেও প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তাদের জীবনসংগ্রাম সম্পৃক্ত বলেই সহজাত অনুমানের দ্বারস্থ হয়ে তারা প্রায়শই কোনো ব্যাপারে বিশেষ ধারণা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। এর সঙ্গে লোকঐতিহ্য ও বংশপরম্পরাগত অভিজ্ঞতা মিলেমিশে তাদের চেতনালোককে পরিপুষ্ট করে তোলে––

> ক. গ্রামের কিষান-কিষানী। শিক্ষার আলোকে দৃষ্টি ওদের প্রখর হয়নি, জ্ঞানের চর্চায় বুদ্ধি ওদের শাণিত হয়নি। সে অভাবটি পূরণ করার জন্যই হয়তো ওদের রয়েছে সরল বুদ্ধির একটি সহজাত অনুভব ক্ষমতা যা দিয়ে ওরা আঁচ করে সম্ভাব্য বিপদ, আবহাওয়ার গতি। কুকুরের যেমন ঘ্রাণশক্তি, মাটি শুঁকে শুঁকে খুঁজে নেয় অনেক দুরের শিকার, বিড়ালের যেমন দৃষ্টি, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে, তেমনি কৃষকদের এই সহজাত অনুভব ক্ষমতা। হাওয়ার গতিতে ওরা বুঝে নেয় আসন্ন দুর্যোগের সংকেত, আকাশের চেহারায় ওরা খুঁজে পায় খরার চিহ্ন, চারা গাছটির রঙ দেখে ওরা করে ফসলের ভবিষ্যদ্বাণী। সব ক্ষেত্রেই ওদের এই বিচার শক্তি হয়তো অভ্রান্ত নয়। কিন্তু অনেক পুরুষে সঞ্জাত অভিজ্ঞতা দিয়েই ওরা বুঝেছে ওদের এই সহজ-সরল প্রবৃত্তির ইঙ্গিত মোটামুটি সঠিক পথেই চালিয়ে নেয় ওদের। (পৃ. ৪৯)

> খ. খাঁ খাঁ করছে মাঠ। এখানে-সেখানে পোড়া সবুজের মর্মন্তুদ কান্না। এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল সেই ফাল্গুনের শেষাশেষি। যাদের তাড়াহুড়ো তারা তখুনি জলদি দুটো চাষ দিয়ে ধান ছিটিয়েছিল। কিন্তু অন্যরা জানে প্রথম বৃষ্টিতে একটা চাষ দিয়ে মাটির বাঁধুনি দাও খুলে, পরের বৃষ্টিতে পানি খেয়ে মাটি যখন ভুর ভুর করবে তখন ছিটোবে ধান, ফসল পাবে দ্বিগুণ। তাই অপেক্ষা করে আছে ওরা। (পৃ. ১৫৪)

৭. লোকখাদ্য–– এ উপন্যাসে লোকখাদ্যের যেসব উল্লেখ রয়েছে––

> মান্দার বাড়ির ‘ভুতি’ জামের তুলনা হয় না, যেমন মিষ্টি রস তেমনি পুরু মাংস, ভেতরে দানা এক রকম নাই বললেই চলে। রাবু আপা বলল, ওই জাম খেতে হবে এবং গাছে বসেই। (পৃ. ২৫)

> আম্বরি ... ভাতের সাথে কচুর লতিটা ঢেঁকিশাকটার ব্যবস্থা করে। মাছও ধরতে জানে আম্বরি। ফুরসত পেলেই ওই ডোবাটায় নতুবা সৈয়দদের মজা দিঘিতে প্যাঁক হাতড়িয়ে মাছ তুলে আনে। (পৃ. ৩৫)

> (মালু) প্যান্টের পকেট থেকে সকালে নাশতার পিঠেগুলো বের করে। একটি ভুনির হাতে গুঁজে দেয়। (পৃ. ৫০)

> শানকি ভর্তি খই আর সন্দেশ এনে দেয় রানু। (পৃ. ৬৮)

> খোলায় চাল ভাজছে আম্বরি। ... খোলাটা উপুড় করে নামিয়ে নিল ‘করই’। তারপর এক চিমটে লবণ মিশিযে দু’মুঠ বাউলা ছেড়ে দিল খোলার উপর। (পৃ. ৭৬)

> পশ্চিমের পাড়টা কচুর জঙ্গলে ভরে গেছে। সেখানে লতি তুলছে রাসু। (পৃ. ১৪৫)

৮. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন–– তালতলি ও বাকুলিয়ার গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত নারী-পুরুষের পোশাক ও প্রসাধনের কিছু উল্লেখ এ উপন্যাসে রয়েছে––

আম্বরি ওর পায়ের খাড়ু আর কোমরের রুপোর শিকলিটা খুলে বলেছিল বসে বসে ঝিমোলে তো আর চলবে না। (পৃ. ৩৬)

দু'বাজুর বন্ধনে ডুবে যাওয়া মাথাটাকে তুলে আবার এদিক-ওদিক তাকায় লেকু। (পৃ. ৩৬)

সব বিপদের ভরসা আম্বরি, সেই পথ দেখাল। গলার হাঁসুলি আর এক জোড়া চুড়ি ওর হাতে দিয়ে বলল, তুফানের বছর যে কথা বলেছিল সেই একই কথা (পৃ. ৩৯)

হালিমার বিছে হারটা আর এক জোড়া বাজুবন্ধ, এতে হাজার খানিক টাকা হয়ে যাবে। (পৃ. ৬৫)

অদ্ভুত মিষ্টি কাঁঠালিচাঁপার গন্ধটি, ওই দত্তদের মেয়ে রামদয়ালের ভাইঝি রানুদি, তার চুলেও এমনি একটি সুবাস। এই কাঁঠালিচাঁপা বেটেই বুঝি তেল বানায় রানু আর সেই তেল চুলে মাখে (পৃ. ৬৭)

রাবু নাকি নোলক পরেছে (পৃ. ৬৮)

ঘরে ফিরে পিরানটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এলো সিকান্দর। (পৃ. ১০৭)

রাসুর খোঁপায় এক জোড়া কদম ফুল। কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো কেমন উদাসীন আলসেমিতে পড়ে থাকা খোঁপার দু'ধারে ঝুলে রয়েছে ফুলগুলো। (পৃ. ১৪৬)

মাথায় ওর রঙিন গামছা। পিরানের উপর প্যাঁচিয়ে আর একটি গামছায় কোমরটাকে বেশ শক্ত আর চিকন করেবেঁধে নিয়েছে মালু। (পৃ. ১৭৯-১৮০)

ঠোঁটে রঙ লেপেছে হুরমতি। কাউফলের কোয়ার মতো রসমেদুর টুকটুকে লাল ঠোঁট। চোখের নিচে গালের টোলে হাল্কা পোঁচের গোলাপি আভা। নিটোল দেহের উদ্ধত ভাঁজে সিল্কের পাতলা শাড়ির বাঁধনটা যেন নিলাজ আমন্ত্রণ। কাঁধের কিনার ঘেঁষে পিঠ ছুঁয়ে আঁচলটা ওর নেমে এসেছে মাটি অবধি। আঁচলের লতাপাতা আঁকা প্রান্তটা লুটোচ্ছে ধুলোয়। জুতো পরেছে হুরমতি। গোড়ালি তার এক বিঘতেরও উঁচু। ... সব মিলিয়ে বাকুলিয়ার হুরমতি সুন্দরী আজ বিশ্বের অপরূপা। (পৃ. ২১৪)

৯. লোকভাষা-- এ উপন্যাসের লোকভাষা প্রয়োগে লেখকের সমাজসচেতনতা ও প্রান্তবাসী লোকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। তবে, ফেনীর পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত হলেও এতদঞ্চলের স্থানিক ভাষাভঙ্গির প্রয়োগ কুশীলবদের সংলাপে ঘটেনি। এ উপন্যাসের লোকভাষা প্রয়োগে বিশেষ সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয় শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব চরিত্রের সংলাপেই প্রমিত চলিত বাংলা কথ্যরীতির প্রয়োগে। তবে এ ঘাটতি পূর্ণ করতে লেখক মনোযোগী হয়েছেন পূর্ববঙ্গের বহুলপ্রচলিত অনাড়ম্বর দেশজ কথ্য শব্দভাণ্ডারের প্রতি, যা লোকসমাজের কথোপকথনে হরহামেশাই অনুসৃত হয়। এরই অংশ হিসেবে কুশীলবদের সংলাপে যুক্ত হয়েছে অজস্র বাগধারা, অলংকাররাশি, নারী-পুরুষভেদে আলাপের বিশেষ ধরন ও দেহভঙ্গিমা, ইশারা ও সংকেতের আশ্রয়ে কোনো অভিপ্রায় বাস্তবায়নের উপযোগী ধ্বনি। এ উপন্যাসে বিভিন্ন দৃশ্য ও পরিস্থিতি বর্ণনায় এবং কুশীলবদের চেতনালোকের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উপস্থাপনে লেখকের ভাষা প্রমিত চলিত কথ্য গদ্যরীতির অনুসারী। পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও কুশীলবদের ভূমিকা, দৃশ্যের প্রাসঙ্গিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে এ ভাষা কখনো সংস্কৃত ভাষাশ্রিত গুরুগাম্ভীর্য ধারণ করলেও এর প্রয়োগ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সহজ-সরল কথ্য গদ্যরীতির উপযোগী লঘু ভঙ্গিমাকেও আত্মস্থ করে। সেকারণেই দীর্ঘ উপন্যাস পাঠেও পাঠকের ক্লান্তি অপসৃত হয় বর্ণনার গতিময়তা ও চরিত্রসমূহকে দৃশ্যানুযায়ী অবলোকনের সামর্থ্যগুণে।

৯.১ শব্দভাণ্ডার

দেশজ শব্দ– ঘোমটা, গাঁ, দেমাক, রোখ, ছিলা, মুঠো, গোছা, আগা, ঠ্যাং, পিক, জাবর, খাঁদ, ছড়া, গোটা, ছিপ, ছেকা, ঢেলে, চেলা, হলকা, উনুন, ভাণ্ড, ভাঁটা, ধামাচাপা, জাঁতা, থুঁতনি, ঠাঁই, ছিলকে, টিকোল, মুঠো, আঁচড়, টানাহ্যাঁচড়া, খুঁট, ছুট, কিল, থাপ্পড়, ঢিল, কঞ্চি, ঝুঁটি, আঁচল, উঠোন, কোঁদল, ঝেড়ে, আল, দাওয়া, পাঁক, ছনবন, হাট, হুড়মুড়ি, প্যাচ,

কামলা, চাষা, জ্যাঠা, ধুয়ো, থোক, ধর্ণা, টোকা, পাঁটা, পাত, নুলো, ফাঁস, ফুটি, আল, উদলা, থেঁতলে, ছেঁকা, ঝাঁটা, খুদ, ব্যামো, গুম, টোপ, কেচকি প্রভৃতি।

বিশেষণ– খিঁচিয়ে, রোখ, তেরছা, ছেঁটে, পুঁতে, বোজা, ডুবে, চিবানো, ছেঁড়া, সেঁটে, পেঁচিয়ে, চকচকিয়ে, তোয়াজ, পাকিয়ে, গনগনে, পোড়া, নড়বড়ে, পষ্টাপষ্টি, কুঁচকে, ছটফটিয়ে, তাঁতাল, ঝাঁঝরা, ছটফট, ঢলে, টিপে, টপকে, টসটসে, টপাটপ, চওড়া, টানাহ্যাচড়া, ঝলসানো, তেড়ে, ছারখার, চটপটে, ঝুলে, হাড়গিলগিলে, রোগাপটকা, ধিমিয়ে, হাডডিসার, খরখরে, পিটপিট, আলগোছে, ষণ্ডা, চটা, পলকা, উপুড়, তেড়িবেড়ি, বিগড়ে প্রভৃতি।

ক্রিয়া– হেলছে, ছিটিয়ে, গেলবার, বুলিয়ে, টিলিয়ে, ফুঁড়ে, চিল্লিয়ে, চড়েছে, ফসকাচ্ছে, খামচে, ডুবাবি, ফুলিয়ে, চাপিয়ে, খিঁচিয়ে, ঠাউরেছিস, চড়লে, ফেলুক, বিছিয়ে, সেঁচা, টিপে, ছিটোতে, চিল্লিয়ে, পুঁতেছিলেন, ভাগিয়ে, চুষে, পুরছে, পেঁচিয়ে, ছিলতে, গিলবি, হাতড়িয়ে, ফোটায়, বিয়োলে, ফিকির, ঝিমোলে প্রভৃতি।

শব্দদ্বৈত– থুক থুক, হেঁচড়ে হেঁচড়ে, ঠেলে ঠেলে, টিলিয়ে টিলিয়ে, গোঁৎ গোঁৎ, ড্যাং ড্যাং, টন টন, ছোপ ছোপ, দুলে দুলে, ঘেঁটে ঘেঁটে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে, ছিটোতে ছিটোতে, চিবুতে চিবুতে, হিড় হিড়, সপাং সপাং, হিস সিং হিস সিং, কাঁড়ি কাঁড়ি, সুড় সুড়, খুঁত খুঁত, খেটে খেটে, গোবদা গোবদা, তলেতলে, গজর গজর, চড় চড়, ঠনঠন, দুমদুম, হাউ হাউ, খট খট, গমগম, ক্যাট ক্যাট, খাঁক খাঁক, ঝপ ঝপ প্রভৃতি।

৯.২ বাগধারা-- গ্রামীণ লোকজীবনের প্রাত্যহিক কথোপকথনে বিভিন্ন বাগধারার ব্যবহার লক্ষণীয়। এর উপস্থিতিতে কথোপকথনে যেমন গতিময়তা সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে বক্তব্যেও নতুনত্বের সঞ্চার ঘটে। এ উপন্যাসে অজস্র বাগধারার প্রয়োগ কুশীলবদের মনোভঙ্গি ও ভাবনাকে প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে–

কানে-কানে চালু কথা, আগাগোড়া ব্যাপারটার পেছনে কাজ করেছে রমজানের পাকা হাত। (পৃ. ১৫)

তুই বুঝেছিস ঘোড়ার ডিম, ঝোপের আড়াল থেকেই বলে আরিফা। (পৃ. ২৪)

নিয়ম ভাঙে ওরা। ধুলো দেয় আম্মার চোখে। মালু ওদের ডান হাত, বাঁ হাত (পৃ. ২৬)

আসতই আর এক পা, তা হলে বাছাধনকে মক্কা দেখিয়ে ছেড়ে দিত রমজান। (পৃ. ৩০)

মিঞা যদি খোশদিলে থাকেন তাকে দিয়েই (রমজান) না হয় বিসমিল্লা পড়াবে। (পৃ. ৩১)

রমজান কেমন করে ভাত মারবে লেকুর? (পৃ. ৩৭)

এলাহি কাণ্ড হতে চলেছে তালতলি, মহাধুমধাম, রাসু কি দেখতে যাবে না? (পৃ. ৫০)

শেষ বয়সে কি যে ভিমরতি ধরেছিল আব্বাজানের (পৃ. ৫৭)

উপরে ফেলু মিঞা নিচে ওরা, মাঝখানের স্তরে রমজানকে বিশেষ মর্যাদা দিতে যেন আঁতে ঘা লাগে ছোটলোকগুলোর। (পৃ. ৭৭)

যা ঘটেছে এবং যা ঘটেনি সব মিলিয়ে রঙ চড়াল রমজান। তিলকে করল তাল। (পৃ. ৭৮)

ওই যে সেকান্দর মিনিমুখো, চুপচাপ থাকে ও, আসলে কিন্তু শয়তানের আলি খুঁটা। (পৃ. ৭৮)

লেখাপড়ার কথায় আবার খিঁচিয়ে ওঠে ফেলু মিঞা; ঝাঁটা মার লেখাপড়ার কপালে। (পৃ. ৯৩)

এ কি মগের মুল্লুক নাকি? (পৃ. ১১৩)

(মালু) দেখতে কেমন 'শাল্টি গাবুর' হয়ে চলেছে অথচ লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। (পৃ. ১২০)

এলাহি কাণ্ড কাছারি বাড়ির ময়দানে। (পৃ. ১৪৭)

রমজানের বৈঠকখানায় বসে এমনি সব কথার পিঠে কথা ভেঙে চলেছে ওরা। (পৃ. ১৬৩)

মেজো মিঞার দফা তো রফা করে দিয়ে গেছে তার ভগ্নীপতি। (পৃ. ১৬৫)

ভাগ্যের শিকা একটার পর একটা ছিঁড়ছে আর ওর করায়ত্ত হতে চলেছে। (পৃ. ১৬৮)

কেন যে মৌলবিগুলো অমন আদাজল খেয়ে লেগেছে লীগের বিরুদ্ধে বুঝি না আমি। (পৃ. ১৭৪)

কেমন যেন ভোজবাজির মতো ঘটে গেল একটার পর একটা ঘটনা। (পৃ. ১৭৬)

ফুলচন্দন পড়ুক লোকের মুখে। (পৃ. ১৭৬)

খেতে বসে তেলে বেগুনে হলো যতীন বাবু। (পৃ. ২১৯)

আমার খেয়ে ওসব ভূতের বেগার চলবে না। (পৃ. ২৪৭)

আমরা তো চোখে ঠুঁলি এঁটেছি। (পৃ. ২৬৭)

ওরা কথার খই ফুটিয়ে চলে। (পৃ. ২৬৯)

প্রশ্ন শুনে তেলেবেগুনে হলেন সৈয়দ সাহেব। (পৃ. ৩১৩)

বুঝি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যায় ওর সাহস ভরা বুকটা। (পৃ. ৩৩৩)

মূর্খ হয়ে কতদিন আর ফোঁপর দালালি করবে? (পৃ. ৩৪২)

দেখছেন না, কেমন গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি আমরা? (পৃ. ৩৪৪)

তুমিও কি মাস্টারজির মতো মনে মনে কারো চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডি চটকাচ্ছো নাকি? (পৃ. ৩৮৪)

থাম তো ছোকরা। তোকে নাক গলাতে বলছে কে! (পৃ. ৩৮৬)

এসব তো এ্যাদ্দিনে গা-সওয়া হয়ে যাওয়া উচিত তোমার। (পৃ. ৩৮৮)

শহীদুল্লা কায়সারের রাজনৈতিক মতাদর্শ mskßK উপন্যাসে ভাষ্যরূপ পেয়েছে বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের উত্তাল ভারতবর্ষের অস্থিরতা ও বিভঙ্গতার পটভূমিতে। ফেনীর বাকুলিয়া ও তালতলি গ্রামদ্বয়ের পরিসরে এ উপন্যাসের লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যে লেখকের শিল্পভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ পেয়েছে, তা উপর্যুক্ত আলোচনার উপজীব্য। ভূমিনির্ভর গ্রামীণ লোকমানুষের জীবনসংগ্রাম ও অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালনী বিবিধ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সমন্বিত অভিঘাতে পর্যুদস্ত হলেও তাদের চেতনালোকে সন্নিহিত লোকজভাবনার প্রতিফলন যে প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহে বরাবর সক্রিয় থাকে, সেই সত্যের রূপায়ণ এ উপন্যাসের আদ্যন্ত লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ

জহির রায়হান

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে জহির রায়হানের (১৯৩৫-১৯৭২) বিশিষ্ট পরিচয় রয়েছে প্রগতিশীল, মানবতাবাদী ঔপন্যাসিক এবং সংস্কৃতিবান, সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কথাশিল্পী শহীদুল্লা কায়সারের অনুজ হিসেবে তিনিও দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চিন্তায়, কর্মে, ব্যক্তিজীবনে।[৯১] চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসেবে তাঁর দুর্দান্ত মেধা ও প্রতিভার যে স্বাক্ষর পাওয়া যায়, তা তাঁর লেখনীতেও স্বকীয় মাত্রায় উদ্ভাসিত। ছাত্র অবস্থাতেই বামপন্থী আদর্শে আস্থাবশত রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাতেও যুক্ত হন। তিনি ছিলেন জাত সাহিত্যিক। এর প্রমাণ মিলেছিল কৈশোরেই। ১৯৪৯ সালে কলকাতার 'নতুন সাহিত্য' নামক পত্রিকায় তাঁর 'ওদের জানিয়ে দাও' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়। তবে পঞ্চাশের দশকেই ছাত্র অবস্থায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (বাংলা ১৩৬২) সচেতন পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একপর্যায়ে গল্পকার হিসেবে তাঁর পরিচয় আলাদাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পরিণতিতে কারাগারে বন্দি হলেও এ অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলা সাহিত্যে তিনিই এতদ্বিষয়ক প্রথম উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' লেখেন। পূর্ব-বাংলার সমাজবাস্তবতার বিশ্বস্ত কথক হিসেবে তাঁর উপন্যাসগুলোতে রূপায়িত হয়েছে আইয়ুবী শাসনের বিভিন্ন বিলুপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা, সা্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক অবরুদ্ধতার ভয়াবহতা, বাঙালিদের ওপর সামরিক বাহিনী ও তার দোসরদেও বিবিধ অত্যাচার-নিপীড়নের বৃত্তান্ত। এরই ধারাবাহিকতায় সামাজিক বিভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিণতিতে সুবিধাবাদীদের শঠতার চালচিত্রের সমান্তরালে শোষিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অসহায় গণমানুষের সঙ্গে শেণিবিভক্ত মধ্যবিত্তভুক্তরাও সমকালীন বাস্তবোচিত পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসসমূহ হলো-- †kl we‡K‡ji †g‡q, Zòv, eid Mjv b'x, nvRvi eQi a‡i, Avi KZ w'b, K‡qKwU gZ¨ প্রভৃতি।

nvRvi eQi a‡i

জহির রায়হানের nvRvi eQi a‡i (১৯৬৪) আবহমান গ্রামীণ সমাজের সংহত শিল্পভাষ্য।[৯২]এতে বাংলার লোকসংস্কৃতিকে জনজীবনের প্রাত্যহিকতার অনুষঙ্গে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি হিসেবে পরীর দিঘি সংলগ্ন নামহীন গ্রামটির বাসিন্দাদের ঘিরে এর ঘটনাস্রোত বিস্তৃত। শিকদার পরিবারের এ গ্রামে প্রতিষ্ঠা এবং বংশপরম্পরায় তাদের দিনযাপনের বৃত্তান্ত উপস্থাপনে লেখক বাঙালি লোকসমাজের বিশিষ্ট রূপটিকেই মূর্তময় করেছেন।[৯৩] নেপথ্য চরিত্রে হিসেবে গ্রামবাসীর স্বল্পোল্লেখ সত্ত্বেও উক্ত পরিবারের চালচিত্র নির্দেশে লেখকের অভিনিবেশ সর্বাধিক। একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্গত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ওঠাবসা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, জীবিকা নির্বাহের প্রণালি মিলেমিশে তাদের চেতনালোকের যে সার্বিক অবয়ব এ উপন্যাসে ফুটে ওঠে, তা বাঙালি জাতির হাজার বছরের চলমান ঐতিহ্যেরই স্মারক। উপন্যাসটির ঘটনাপ্রবাহে গ্রামীণ লোকজীবনের যে পরিচয় উদ্ভাসিত, সেখানে নেই রাজনৈতিক টানাপোড়েন বা সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ। বরং একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি আনুগত্য, পুথিপাঠের আসর, কিংবদন্তি, লোককাহিনী, লোকগীতি ও অন্যান্য ধর্মীয়-সামাজিক প্রসঙ্গ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি লোকমানুষের উৎসাহ ও সমর্থনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের পটভূমিতে এ উপন্যাসের কালপ্রবাহ আবর্তিত বলে ধারণা করা যায়। গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধ্যান–ধারণা ও কর্মকাণ্ড তাদের মনোলোকে যে ছাপ ফেলে, তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়। এতে সন্নিহিত থাকে পূর্বসূরীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, জীবন সম্পর্কিত বিশেষ ভাবনা ও অভিজ্ঞতা। লোকজীবনের যে রূপ এ উপন্যাসে প্রতিফলিত, এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য ও নির্ভরতার বিষয়টিও। লক্ষণীয়, এ উপন্যাসের সব চরিত্রই মুসলমান। হিন্দু বা অন্য ধর্মভুক্ত বাসিন্দাদের সামান্য উল্লেখও এতে অনুপস্থিত। ফলে, গ্রামীণ মুসলমান সমাজের নিজস্ব চালচিত্র রূপায়ণে লেখকের আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে বাঙালি লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারকে অবলম্বন করেই। কেননা, এর প্রভাব তাদের ব্যক্তিমনস্তত্ত্ব ও সামষ্টিক চেতনালোককে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। এ উপন্যাসে বিধৃত বাঙালি

লোকজীবনসংশ্লিষ্ট লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকসাহিত্য, লোকপ্রথা, লোকোৎসব, লোকসমাবেশ, লোকখাদ্য, লোকপরিচ্ছদ ও প্রসাধন, লোকভাষা প্রভৃতি উপাদানসমূহ উপস্থিত।

১. লোকবিশ্বাস–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবিধ ধর্মীয় লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বিশ্বাসের ব্যাপ্তি লোকসংস্কার ও লোকাচারের সঙ্গেও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। সেকারণে আমরা এ পর্যায়ে স্বল্পসংখ্যক দৃষ্টান্ত নির্বাচন করেছি, যেখানে শুধু গ্রামীণ লোকবিশ্বাসসমূহের রূপায়ণ ঘটেছে–

> ক. এককালে এ জমিটা সুরত আলীর ছিল। সরেস জমি। প্রায় মণ-সাতেক ধান ফলতো তখন। ধানের ভারে গাছগুলো সব নুয়ে পড়ে থাকতো মাটিতে। ... আহা জমিডার কি অবস্থা কইরছে দেখছ? লাঙল ঠেলতে ঠেলতে সুরত আলী বললো, জমির লাইগা ওগো আধ-পয়সার দরদ নাই। দরদ নাই দেইখাই তো জমিনও ফাঁকি দিবার লাগছে। ... জমির খেদমত করন লাগে। বুঝলা মন্তু মিয়া, জমির খেদমত করন লাগে। যত খেদমত কইরবা তত ধান দিব তোমারে। (পৃ. ৫১)

> খ. ধান ফেলা শেষ হলে, রশীদ ডাকলো। অ ভাইজান।
>
> মকবুল মুখ না তুলেই জবাব দিলো, কী কও না।
>
> ধান তো ফালায়া দিলাম আল্লার নাম নিয়া।
>
> দাও, দাও ফালায়া দাও। এহন যত তাড়াতাড়ি ফালাইবা তত লাভ। (পৃ. ৫১)

‘ক’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কৃষিজ সংস্কৃতির প্রতি সুরতের অনুরাগ প্রকাশিত জমির অতীত ও বর্তমান অবস্থার প্রতিতুলনায়। জমিতে শ্রম দিলে, এর যত্ন নিলে রোপিত ফসলের পরিমাণ বাড়ে, অন্যথায় তা কমে যায়, এটি নিতান্তই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। তবে এর সঙ্গে সুরত যে জমির পরিচর্যাকারীর মনোভঙ্গিকে সংযুক্ত করে, এর অন্তরালে সক্রিয় রয়েছে গ্রামীণ কৃষিজ লোকবিশ্বাস। জমির মালিকানা বদলে গেলেও এর প্রতি সুরতের গভীর মমত্ববোধই তাকে এরূপ উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে। ‘খ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রশীদ ও মকবুলের পারস্পরিক আলাপে জমিতে ফসল বোনা সংক্রান্ত ধর্মীয় লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষণীয়। স্রষ্টার নাম স্মরণ করে ফসল বুনলে বেশি ফলন হবে, এরূপ ভাবনা গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. লোকসংস্কার–– এ উপন্যাসে বিবিধ লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। এসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে লোকসমাজভুক্ত মানুষের অভ্যাস, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন ও ব্যক্তিমনস্তত্ত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত–

২.১ ধর্মীয় লোকসংস্কার

> গনু মোল্লা বলল, সব খোদার ইচ্ছা। মাইয়ার কপালে যদি সুখ থাকে তাইলে যেইহানে বিয়া দিবা সেইহানেই সুখে থাকবো। বড় বেশি বাছবিচার কইরোনা। ... মকবুল সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলো, হ্যাঁ, তাতো ঠিক কথা। (পৃ. ২৫)

এ উদ্ধৃতিতে স্রষ্টার প্রতি লোকসমাজের নিরঙ্কুশ ভক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গনু মোল্লার সংলাপে। কেননা জন্ম, মৃত্যু, বিয়ের মত মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলোতে স্রষ্টার প্রতি নির্ভরতা লোকসমাজের বিশেষ প্রবণতা। পরিস্থিতিগত বাধ্যবাধকতা যে লোকমানুষকে দৈবী শক্তি ও নিয়তি সংক্রান্ত ধারণাকে অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে, এটি তারই দৃষ্টান্ত। নিজের কাজের পরিণতিকে ফল হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির প্রতি নতজানু মানসিকতা লোকসমাজে প্রচলিত নানা ধর্মীয় আচরণ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধে বিভিন্নভাবে যে প্রতিফলিত, এটি তারই দৃষ্টান্ত।

২.২ অভিশাপ

ক. এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠলো টুনি। ... এত শিগ্রী উঠতো না সে, বুড়ো মকবুলের ধমক খেয়ে শুয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে করলো না। মনে মনে বুড়োকে একহাজার একশো অভিশাপ দিলো। ... রান্নাঘর থেকে চিৎকার করছে বুড়ো মকবুল। কাল রাতে যে ধানগুলো ভানা হয়নি সেগুলো ভানতে হবে এখন। ... তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে বুড়োর মৃত্যু কামনা করতে করতে ঘাট থেকে উঠে গেলো টুনি। (পৃ. ১৫-১৬)

খ. একবাটি বার্লি হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো টুনি। আসতে দেখে গনু মোল্লা চুপ মেরে গেলো। ... টুনির উপরে আক্রোশ পড়েছে সবার। সবাই বুঝতে পেরেছে, এই যে-সব কাণ্ড ঘটে গেছে এর জন্যে টুনিই দায়ী। ... উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেকে কথা বললো। ওর নাম ধরে অনেক গালাগাল আর অভিশাপ দিলো বাড়ির ছেলেমেয়েরা। (পৃ. ৫৭)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মকবুলের প্রতি টুনির বিরূপ মনোভঙ্গি প্রকাশের অবলম্বন হয়ে উঠেছে অভিশাপ। টুনির স্বভাবে বিদ্যমান চাঞ্চল্য, উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ বিভিন্ন ঘটনায় প্রকাশিত হলেও বৃদ্ধ স্বামী মকবুলের নিকট তার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের চেয়ে গৃহকর্ম করিয়ে নেয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। বাপের বয়সী স্বামীকে মান্য করতে নিতান্ত বাধ্য হলেও টুনি যে তার প্রতি বিতৃষ্ণ, তাকে অভিশাপ দেয়া ও মৃত্যু কামনার ঘটনাদ্বয়ে বিষয়টি প্রকাশিত। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে টুনির প্রতি শিকদার বাড়ির ছেলেমেয়েদের অভিশাপ প্রদানের নেপথ্যে রয়েছে তার হঠকারী আচরণ। মকবুলের ছোট স্ত্রী হিসেবে সে পারিবারিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে যেভাবে পারিবারিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়েকে বিঘ্নিত করার মাধ্যমে, এর পরিণতি পরিবারের কারো জন্যই মঙ্গলজনক হয়নি। মূলত তার উস্কানিতেই মকবুল বড় স্ত্রী আমেনা ও মেজ স্ত্রী ফাতেমাকে তালাক দেয় এবং নিজেই আম্বিয়াকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

২.৩ দিব্যি দেয়া

ক. ওদের কথা শুনে খেপে ওঠে আবুল। কপালে একমুঠো ধুঁলো ছুঁইয়ে সহসা একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে সে, এই তৌবা করলাম, বিয়াশাদি আর করমু না। খোদা, আমারে আর বিয়ার মুখ দেখাইও না। খোদা, আমার শত্রুরা আরামে থাহুক। (পৃ. ১৪)

খ. মাঝি-বাড়ি যাও নাই তো? ... মন্তু ঘাড় নাড়লো, না, ক্যান কী অইছে? ... টুনি বললো, ওলাবিবি আইছে ওইহানে। বলতে গিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেল ওর। ... মন্তুর দু-চোখে বিস্ময়। বললো, কার কাছ থাইকা শুনছ? ... ও-কথার কোনো জবাব না দিয়ে টুনি আবার বললো, শোনো, ওই বাড়ির দিকে গেলে কিন্তুক আমার মাথা খাও। (পৃ. ৪৬)

২.৪ ভয় সংক্রান্ত

ক. টুনি বলে, বারে আমার বুঝি ডর-ভয় কিছু নাই। যদি সাপে কামড়ায়?

সাপের কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ একটা আঁধি সাপ ফোঁস করে উঠে সরে যায় সামনে থেকে। আঁতকে উঠে দু-হাত পিছিয়ে আসে মন্তু। ভয় কেটে গেলে থু-থু করে বুকের মধ্যে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দেয় সে। পেছনে টুনির দিকে তাকিয়ে বলে, বুকে থুক দাও তাইলে কিচ্ছু অইবো না। (পৃ. ১২)

খ. ঘুম ভাঙলো কখন সে ঠিক বলতে পারবে না। রাতের গভীর অন্ধকারে সে শুধু অনুভব করলো একটা হাত তার চুলগুলো নিয়ে খেলছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলো মন্তু। ... গনু মোল্লার কাছ থেকে নেয়া তাবিজটা বাহুতে বাঁধা আছে কিনা দেখলো। তারপর কে যেন চাপাস্বরে ওকে ডাকলো, এই। (পৃ. ৩১)

গ. কাঁথাটা ভালোভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে করিম শেখ কাঁপা গলায় বললো, আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচমু না। ... আহা অমন কথা কয় না মিয়া। অমন কথা কয় না। পরক্ষণে ওকে বাধা দিয়ে মন্তু বললো, মরণের কথা চিন্তা কইরতেই নাই, আয়ু কইমা যায়। (পৃ. ২৭)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মন্তুর আচরণে ভীতিবোধজনিত লোকসংস্কারের অংশ হিসেবে বুকে থুতু ছেটানোর ঘটনা লক্ষণীয়। সাপের প্রসঙ্গে টুনির উদ্বেগ অচিরেই চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠায় অপ্রস্তুত মন্তু নিজের অজান্তেই এরূপ আচরণ করেছিল। শুধু তাই নয়, টুনির ভীতি কাটাতে সে তাকেও অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছিল, যদিও এর অন্তরালে কোনো যুক্তি সক্রিয় নয়। লোকসমাজে প্রচলিত নানা আচরণ ও বিশ্বাসকে এভাবেই যুগযুগ ধরে অনুসরণের প্রবণতা মানুষের মনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রাতের অন্ধকারে শয়নকক্ষে গোপনে টুনির উপস্থিত হয়ে মন্তুকে ভালোবাসার আবেগায়িত রূপ প্রকাশিত হয়েছে ভীতিকর অনুষঙ্গে। কেননা, মন্তু টুনির এরূপ আচরণের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিল না। ভূত-প্রেত বা অশরীরী সংক্রান্ত ভাবনা মন্তুর মনোলোকে সক্রিয় ছিল বলেই সে বাহুতে বাধা তাবিজের স্পর্শ পেয়ে দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নিতে সচেষ্ট হয় এবং অচিরেই আগন্তুককে টুনি হিসেবে চিনতে পারে। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে অসুস্থ করিম শেখের মৃত্যুসংক্রান্ত ভীতিবোধ প্রকাশিত হয়েছে মন্তুর সঙ্গে আলাপে। মৃত্যু মানবজীবনের অন্তিম পরিণতি হলেও কেউ একে সহজে মেনে নিতে চায় না। ইহলোকে প্রিয়জনের সান্নিধ্য ছেড়ে আজীবনের জন্য অচেনা গন্তব্যে যাত্রা করতে হবে, ভাবলে মানুষ ভীতিবোধে আক্রান্ত হয়। করিম শেখও নিজের অসুস্থতাকে মৃত্যুলোকে যাত্রার ইঙ্গিত হিসেবে ভেবেছিল। অন্যদিকে, মন্তুর সংলাপে প্রতীয়মান হয়, মৃত্যুবিষয়ক চিন্তা মানুষকে ক্রমশই বিচলিত করে। এর ফলে সে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানসিকভাবে একাকী বোধ করতে পারে। ফলে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

২.৫ ওলাবিবি বা কলেরা সংক্রান্ত

গ্রামে কলেরা দেখা দিলে গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। 'নয়' পরিচ্ছেদে মকবুলের সংলাপ থেকে জানা যায়, মাঝিবাড়ির তিনজন এতে আক্রান্ত হয়েছে। পথে আসার সময় আম্বিয়ার নিকট থেকে সে এ খবর পায়। মকবুল বাড়ির সবাইকে পরামর্শ দেয় একসঙ্গে থাকতে এবং এর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য দোয়া-দরুদ পড়তে। ফকিরের মায়ের ধারণা, যে বাড়িতে একবার এর প্রাদুর্ভাব ঘটে, সেই বাড়ির সবাইকে মেরে তবেই ওলাবিবি শান্ত হয়। গ্রামবাসীর মধ্যে ওলাবিবি সংক্রান্ত ভীতিবোধ এতটাই প্রবল যে, আম্বিয়ার বাবা নন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাব শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে আসার পথে মন্তুর সঙ্গে দেখা হলে আলাপকালে জানতে পারে, সেখানে ওলাবিবি এসেছে। ফলে সে প্রাণ বাঁচাতে কুটুমবাড়ি না গিয়েই পড়িমরি করে ছোটে এবং মন্তুকে অনুরোধ করে তার আগমনের বৃত্তান্ত গোপন রাখতে। কলেরার সংক্রমণে আম্বিয়ার বাবা নন্তু শেখ ও তার ছোট ভাই জমির শেখ মারা যায়। জমির তার ছেলেমেয়েদের ভিটেবাটি থেকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়, 'বুড়োরা মারা গেলেও ছেলেমেয়েরা যাতে বাঁচে। নইলে বাপ-দাদার ভিটার ওপরে বাতি দেবার কেউ থাকবে না' (পৃ. ৪৭)। লোকসংস্কারের প্রতি গ্রামীণ মানুষের ভক্তির নিদর্শন হিসেবে এ দৃষ্টান্তকেও বিবেচনা করা চলে। নিজের পরিবার ও বংশের প্রতি মানুষের চিরায়ত আকুতিই লোকসমাজে এ সংস্কারের উদ্ভব ঘটিয়েছে। ওলাবিবি সম্পর্কে গ্রামের মানুষের মধ্যে আরো নানা সংস্কার প্রচলিত। যেমন– মন্তু মাঝিবাড়িতে গেছে, জেনে মকবুল রেগে যায়। কারণ ওলাবিবি তাকে ভর করে অন্যদেরও কব্জা করতে পারে বলে তারা শঙ্কিত। সুরত আলী তার ওপর রেগে জানায়, 'বাড়ির কারো যদি এহন কিছু অয় তাইলে কুড়াইল মাইরা কল্লা ফালায়া দিমু তোর' (পৃ. ৪৯)। কিন্তু ফকিরের মা একথা মানে না। তার মতে, 'যার মউত আল্লায় যেইদিন লেইখা রাখছে সেই দিন অইবো। কেউ আটকাবার পারবো না।' (পৃ. ৪৯)। জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে– মানবজীবনের এ তিন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত, অন্য কেউ তা লঙ্ঘন করতে অসমর্থ– এরূপ সংস্কারও লোকসমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত।

> ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ফাতেমা জানালো, গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে একটা খোঁড়া কুকুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। ... বড় ভালা দেখছ বউ। বড় ভালা দেখছ। ফকিরের মা পরক্ষণে বললো, ওই খোঁড়া কুত্তা খোঁড়া মোরগ আর গরুর সুরত ধইরাই তো আহে ওলা বিবি। এক গেরাম থাইকা অন্য গেরামে যায়। বলে

> সমর্থনের জন্য সবার দিকে একনজর তাকালো সে। ... মকবুল জানালো, শুধু তাই নয়। মাঝে মাঝে খোঁড়া কাক, শিয়াল, কিম্বা খোঁড়া মানুষের রূপ নিয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করেন ওলা বিবি। ... হ্যাঁ মিয়ারা। বুড়ো মকবুল সবাইকে সাবধান করে দিলো। খোঁড়া কিছুরে বাড়ির ধারে-কাছে আইতে দিয়ো না তোমরা। অচেনা কোনো খোঁড়া মানুষও না। দেখলেই ওইগুলারে তাড়ায়ে খাল পার কইরা দিও। ... সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। (পৃ. ৪৯)

পরদিন সকালে খবর পাওয়া যায়, আম্বিয়ার ভাই করিম শেখও কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। কবিরাজ তার চিকিৎসা করেও ব্যর্থ হওয়ায় গনু মোল্লাকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করানো হয়। এতেও প্রতিকার ঘটেনি করিম শেখের। গ্রামের আট-দশজন মানুষ কলেরার সংক্রমণে মৃত্যুবরণ করে। গ্রামবাসী মসজিদে সিন্নি বিতরণ ও বাড়ি বাড়ি মিলাদ পড়িয়ে তবেই স্বস্তি পায়। এসব সংস্কার তাদের প্রাত্যহিক জীবনে স্বস্তির বার্তবহ হয়ে ওঠে। এভাবেই লোকসংস্কারের উপযোগিতা জনজীবনে সৃষ্টি হয়।

২.৬ ভূতে পাওয়া

গ্রামীণ লোকসমাজে ভূত সম্পর্কিত নানা বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত। এ উপন্যাসেও এর রূপায়ণ ঘটেছে 'চার' পরিচ্ছেদে। মজু ব্যাপারীর মেজ মেয়ে সখিনাকে ভূতে ধরেছে, কাজীবাড়ির বৃদ্ধা এ খবর জনসমক্ষে প্রচার করে। ভূত তাড়াবার জন্য তাকে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে আসা হয়। সে ভোরবেলা পরীর দিঘির পাশে শুকনো ডালপাতা কুড়াতে গিয়েছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও সখিনা বাড়িতে ফিরে আসেনি। তাই মেয়ের খোঁজ পেতে তার মা অস্থির হয়ে উঠেছিল। মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিল কাজীবাড়ির থুরথুরে বৃদ্ধা। লম্বা তেঁতুলগাছের মগডালে উঠে দুই পা ছড়িয়ে সে টেনে টেনে গান গাইছিল। বৃদ্ধা হতবাক হয়ে তার অসংলগ্ন আচরণের কারণ জানতে চাইলে মেয়েটি উন্মাদের মত একটানা হেসেই চলে। এ খবর শোনামাত্রই মেয়েটির বাবা তাকে নেমে আসার আহ্বান জানায়। কেননা, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের এরূপ আচরণের জন্য তাকে গ্রামের মানুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হবে। বাবাকে দেখে মেয়েটি গাছ থেকে নামবার পরিবর্তে থুতু ছিটিয়ে জানায়, সে বাড়ি ফিরে না গিয়ে গাছেই বসে থাকবে। তার এ কাণ্ড দেখে গ্রামের লোকজন জড় হলে অবশেষে মেয়েটিকে গাছ থেকে নামিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মেয়েটির চাচা তকু ব্যাপারী সে কাজে এগিয়ে গেলে সখিনা খেপে যায়। এরপর সে দিঘির জলে ঝাঁপ দেয়। সখিনাকে দিঘির পাড়ে এনে মাথায় পানি দিলে একপর্যায়ে তার জ্ঞান ফিরে আসে। এরপর থেকে সে অন্যদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। তাকে সুস্থ করতে আনা হয় গনু মোল্লার কাছে।

> ব্যাপারীর ভাইয়ের কাছ থেকে সবকিছু শুনল মন্তু। গনু মোল্লার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা সাদা কাপড়কে সরষে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে সেই কাপড়টাকে সখিনার নাকের ওপরে গনু মোল্লা ধরছে আর চিৎকার করে বলছে, কোনহান থাইকা আইছস শিগগির কইরা ক–নইলে কিন্তুক ছাড়মু না আমি। ক' শিগগির। (পৃ. ২৩)

সখিনার পরবর্তী বৃত্তান্ত উপন্যাসে বিবৃত না হলেও গ্রামীণ সমাজে কোনো কারণে কারো মানসিক ভারসাম্যহীনতা বা অসংলগ্ন আচরণকে যে ভূতে ধরা হিসেবে বিবেচনার সংস্কার বহুল প্রচলিত, এ দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

২.৭ বিবিধ

> ক. বুড়ো ছমির মিয়া বললো, দাঁড়ায় তামাশা দেখতাছ ক্যান মিয়ারা, একজন উইঠ্যা যাও না উপরে।
>
> কে উঠবে, কে উঠবে না–তাই নিয়ে বচসা হলো কিছুক্ষণ। কারণ যে কেউতো আর উঠতে পারে না। এমন একজনকে উপরে উঠতে হবে, মেয়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার অধিকার আছে যার। অবশেষে ঠিক হলো– তকু ব্যাপারীই উঠবে উপরে। মেয়ের আপন চাচা হয় সে। সুতরাং অধিকারের প্রশ্ন আসে না। (পৃ. ২২)

খ. দ্বিতীয় কবরটা আসকর ফকিরের। পেটে পিলে হয়েছিলো। প্রায় রক্তবমি করতো। বুড়োরা বলত, শত্রুপক্ষ কেউ নিশ্চয়ই তাবিজ করেছে, নইলে অমন হবে কেন। (পৃ. ৪০)

গ. ফকিরের মা বললো, আমি কিন্তু একটা কথা কইয়া দিলাম বউ। এই মাইয়া একেবারে অলুক্ষুইনা। যেই ঘরে যাইবো সব পুড়াইয়া ছাই কইরা দিবো।

সালেহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ঠিক কইছ চাচী।

কথাটা বলতে গিয়ে আমেনা আর ফাতেমার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। আম্বিয়ার জন্যেই তো ওদের তালাক দিয়েছে বুড়ো মকবুল। নিজেও মরেছে মরণ-রোগে। (পৃ. ৬০)

ঘ. একহাটু পানি থেকে নীরবে একগলা পানিতে নেমে গেলো মন্তু। টুনি ততক্ষণে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

জমির মুন্সীর হাতের টর্চটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলো পুকুরের এপার থেকে ওপারে। মনে মনে বারবার খোদাকে ডাকছিলো মন্তু, খোদা তুমিই সব। ... তারপর থেকে আরো সাবধান হয়ে গেছে মন্তু। গনু মোল্লার কাছ থেকে তিনআনা পয়সা খরচ করে একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে সে। রাতে-বিরাতে গাঁয়ের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ানো, বিপদ-আপদ কখন কী ঘটে কিছু তো বলা যায় না। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া ভালো। সগন শেখের পুকুরপাড়ে এসে, বাজুর ওপর বাঁধা তাবিজটাকে আজ একবার ভালো করে দেখে নিলো মন্তু। (পৃ. ১১)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর প্রতি লোকসমাজে অনুসৃত সংস্কারের পরিচয় প্রকাশিত। মজু ব্যাপারীর প্রাপ্তবয়স্ক মেজ মেয়ে সখিনা মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থায় একদিন অসংলগ্ন আচরণ করে। সে পরীর দিঘিরর পাড়ে শুকনো লতাপাতা কুড়াতে গিয়ে খেয়ালের বশে তেঁতুল গাছে চড়ে পা দুলিয়ে গান গাইতে থাকলে অচিরেই কাজীবাড়ির বৃদ্ধার মাধ্যমে প্রচারিত হয় যে সখিনাকে ভূতে ধরেছে। তখন তাকে গাছ থেকে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হলে কে এ দায়িত্ব পালন করবে, তা নিয়ে গ্রামবাসী আলাপের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসে। কেননা, প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে যে কেউ স্পর্শ করার অনুমতি পায় না। এটি ইসলামী রীতি ও গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত অনুশাসনের পরিপন্থী। সেকারণে তার চাচা তকু ব্যাপারী এ দায়িত্ব পালন করে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত লোকসংস্কারের রূপায়ণ ঘটেছে আসকর ফকিরের অসুস্থাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায়। যদিও সে প্লীহায় আক্রান্ত হয়ে রক্তবমি করত, তবু গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিরা বিষয়টিকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করেছিল। তাদের অভিমত ছিল, কেউ তার ক্ষতি সাধনের জন্য বাণ মেরে বা অন্য কোনোভাবে বশীকরণ করায় সে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। আধুনিক শিক্ষার অপ্রতুলতা, বিজ্ঞানভাবনার অভাব ও নিরক্ষরতা লোকসমাজে এধরনের নঞর্থক সংস্কারের প্রচলন ও প্রসারে ভূমিকা পালন করে। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর প্রতি রক্ষণশীল সংস্কারের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। পুরুষতন্ত্রের প্ররোচনায় নারী সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক অভিধা সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত, যার নেপথ্যে সক্রিয় রয়েছে সংকীর্ণমনস্ক, নেতিবাচক মনোভঙ্গি। 'অপয়া', 'অলক্ষী' প্রভৃতি বিশেষণের মাধ্যমে নারীকে বিভিন্নভাবে অবদমনের প্রচেষ্টা লোকসমাজে কার্যকর থাকে। প্রায়শই এসব অভিধাকে বাস্তবায়নে পুরুষতন্ত্র নারীর বিরুদ্ধে নারীকেই উস্কে দেয়। উক্ত উদ্ধৃতিতে এর নিপুণ রূপায়ণ লক্ষণীয়। আম্বিয়ার সঙ্গে মন্তুর বিয়ের ব্যাপারে শিকদার পরিবার প্রথমে আগ্রহী হলেও একপর্যায়ে টুনির প্ররোচনায় মকবুল এ বিয়েতে বিরোধিতা করে এবং নিজেই আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চায়। আম্বিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত কি না, তা না ভেবেই মকবুল তাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত আমেনা ও ফাতেমাকে জানায়। আবুল আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চাইলেও মকবুলের অসম্মতি জ্ঞাপনের ফলে সে প্রস্তাবও বিফল হয়।। একপর্যায়ে রাগের মাথায় মকবুল আমেনা ও ফাতেমাকে তালাক দিলে আবুল তার মাথায় পিঁড়ি ছুঁড়ে মারে। কিছুদিন পর আম্বিয়া মকবুলকে বিয়ের ব্যাপারে অসম্মতি জানায়। অবশেষে পূর্বের অসুস্থতা ও আবুল কর্তৃক প্রাপ্ত আঘাতের পরিণতিতে মকবুল মৃত্যুবরণ করলে এসব ঘটনার জের আম্বিয়ার ওপর চাপানো হয়। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মন্তুর আচরণে তাবিজ সংক্রান্ত লোকসংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে। গ্রামীণ সমাজে যে কোনো

বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা অতিক্রমের জন্য মৌলবি, ফকিরদের নিকট থেকে দোয়া-দরুদ পড়া তাবিজ-মাদুলি কিনে দেহে ধারণের রীতি বহুযুগ ধরে প্রচলিত। মন্ত্রপূত বা দোয়াপড়া তাবিজ-কবচের অলৌকিক শক্তির নিকট সকল অশুভশক্তি ও বালা-মুসিবত পরাভূত হতে বাধ্য, এরূপ ধারণা লোকসমাজে বহুদিন ধরে প্রচলিত। মন্তুর আচরণেও এর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

৩. লোকাচার -- এ উপন্যাসে কুটুম বা আত্মীয়তা সম্পর্কিত বিভিন্ন উল্লেখ রয়েছে--

> ক. নবীনগরের ছোট খালে এসে নাওয়ের নোঙর ফেললো মন্তু। ... নৌকা থেকে নামবার আগে মুখ-হাতটা ভালো করে ধুয়ে নিলো মন্তু। পুরনো লুঙিটা পালটে নিয়ে নতুন লুঙিটা পরলো, ফতুয়াটা খুলে জামাটা গায়ে দিলো সে। তারপর খদ্দরের চাঁদরটা কাঁধে ফেলে, পুরনো ছাতাটা বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে নৌকা থেকে নেমে এলো মন্তু। ... কিছুদূর এসে পকেট থেকে টুপিটা বের করলো।... আসবার সময় বুড়ো মকবুল বারবার করে বলে দিয়েছে, কুটুমবাড়িতে গিয়ে যেন মন্তু এমন কিছু না করে যার ফলে বাড়ির বদনাম হতে পারে। ... টুনিদের বাড়ির সামনে এসে যার সঙ্গে মন্তুর প্রথম দেখা হলো সে টুনির চাচা মোতালেব শিকদার। ... মন্তু এগিয়ে এসে পা ধরে সালাম করলো ওর। ... রসুইঘর থেকে টুনির মা বেরিয়ে এলো বাইরে। মন্তু সালাম করলো তাকে। ... মা বললো, কইরে টুনি। মিয়ারে একখানা জলচকি আইনা দে, বউক। ... মিয়ার অজুর পানি দে।... টুনি এসে একঘটি পানি রাখলো ওর সামনে, আর একজোড়া খড়ম। বললো, হাতমুখ ধুইয়া নাও। ... মন্তু মুখ-হাত ধুয়ে নিলে ওর দিকে একটা গামছা বাড়িয়ে দিয়ে টুনি বললো, চলো ভেতরে চলো, বাইরে শীত পড়তাছে। (পৃ. ৩০)
>
> খ. পরদিন যাওয়া হলো না মন্তুর। ... টুনির মা বললো, কুটুমবাড়ি আইয়ে নিজের ইচ্ছায়, আর যায় পরের ইচ্ছায়। ইচ্ছা করলেই তো আর যাইতে পারবা না মিয়া। যহন যাইতে দিমু তহন যাইবা। ... অগত্যা থেকে যাওয়া হলো। (পৃ. ৩৩)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মন্তু তার চাচাতো ভাবী টুনির পিতৃগৃহে গমনকালে করণীয় বিভিন্ন আচরণ যেমন টুনির চাচাকে দেখে পা ছুঁয়ে সালাম করা, এরপর তার মাকেও সম্মান জানানো, এর পাশাপাশি তাকে যত্ন করতে টুনির প্রতি তার মায়ের আদেশ, টুনির সেসব নির্দেশ মান্য করা প্রভৃতি ঘটনায় প্রতীয়মান হয় কুটুম সম্পর্কিত গ্রামীণ লোকাচারের স্বরূপ। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি পূর্বের উদ্ধৃতিরই সম্প্রসারণ। টুনিকে নিয়ে নির্ধারিত সময়ে বাড়ি ফেরার জন্য মন্তুর ব্যস্ততাকে তার মা উপেক্ষা করে। কেননা, কুটুম স্বজনের বাড়িতে এলে সে নিজের ইচ্ছায় বাড়ি যেতে পারে না। তাকে স্বজনের ইচ্ছামাফিক বাড়ি যেতে হয়। এরূপ লোকাচার গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত। সেকারণেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন্তুকে টুনির পিতৃগৃহে অতিরিক্ত চারদিন থেকে যেতে হয়। এ উপন্যাসের 'সাত' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মন্তু ও টুনি যখন নবীনগর গ্রাম থেকে নিজেদের গ্রামে ফেরার পথে শান্তির হাটে যাত্রাবিরতি করে, তখন তাদের আকস্মিকভাবে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। হাটে সার্কাস দেখতে গিয়ে বহুমানুষের ভিড়ে অপ্রস্তুত টুনি ঘোমটা টানে। একপর্যায়ে তাদের দেখে চায়ের দোকানদার মনোয়ার হাজী ভুল ধারণা করে। সে ভাবে, যেহেতু মন্তু টুনিকে নিয়ে সার্কাস দেখতে এসেছে, তাই তারা বিবাহিত। মন্তু বিয়ে করেছে, অথচ তাকে দাওয়াত দেয়নি, এরূপ ধারণাবশত সে আক্ষেপ প্রকাশ করে। বিব্রত মন্তু তাকে প্রকৃত ঘটনা বলতে পারেনি সংকোচের কারণে। তন্মধ্যে মনোয়ার হাজী যখন তার কাছে হাটে আসার কারণ জানতে চায়, সে হঠাৎ বলে বসে যে টুনির জন্য চুরি কিনতে হাটে এসেছে। ফলে মনোয়ারের ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। সেকারণেই নবদম্পতি হিসেবে তাদেরকে আপ্যায়ন ও তার বাড়িতে রাত কাটাতে সে দাওয়াত দেয়। মন্তু এতে আপত্তি করলে মনোয়ার জানায়--

> থাকার কোনো অসুবিধা হবে না ওদের। বাড়িতে ঘর আছে অনেকগুলি, তারই একটিতে সুন্দর করে বিছানা পেতে দেবে। তাতে যদি মন্তুর আপত্তি থাকে, তাহলে আরও একটা ভালো বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মনোয়ার হাজী। সার্কাস-পার্টির ওখানে হোটেল উঠেছে কয়েকটা। এক-একটা ঘর একটাকায় একরাতের জন্য ভাড়া দেয় ওরা। সেখানেও ইচ্ছে করলে থাকতে পারে মন্তু। ... ক্ষণকাল পর মন্তু বললো, আরেকদিন আইসা আপনাগো বাড়ি মেহমান হমু। আজকা যাই। ...

> ওরা আমন্ত্রণ রক্ষা না-করার জন্যে কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করলো মনোয়ার হাজী। অবশেষে বললো, আরেকদিন কিন্তুক আইবা মিয়া। আর হ্যাঁ, ভাবী সাহেবেরে সঙ্গে নিয়া আইবা কিন্তুক। (পৃ. ৩৭)

চৈত্র মাসে মেয়ে হীরনকে দেখতে মকবুল তার শ্বশুরবাড়িতে যায়। যাবার সময় সে একটি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে এককুড়ি ডিম সঙ্গে নিয়ে যায়। কেননা, শূন্য হাতে বেয়াই বাড়ি গেলে তারা লজ্জা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, পথে বামনবাড়ির হাট থেকে সে চারআনার বাতাসাও কেনে, বাড়ির বাচ্চাদের জন্য।

৪. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান বিন্যস্ত হয়েছে, যেগুলোতে গ্রামীণ লোকসমাজের সৃষ্টিশীলতা ও সাংস্কৃতিক ভাবনার প্রতিফলন সুচারুভাবে প্রকাশিত--

৪.১ কিংবদন্তি-- এ উপন্যাসে পরীর দিঘিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কিংবদন্তিতে প্রকাশিত হয়েছে নামহীন গ্রামটি পত্তনের বৃত্তান্ত। বলাবাহুল্য, এর মধ্য দিয়ে এতদঞ্চলের সামাজিক ইতিহাসের সমান্তরালে বাসিন্দাদের অনুসৃত লোকজচেতনার ইঙ্গিতও ফুটে ওঠে। কাল্পনিক ও অতিলৌকিক কাহিনীকে বাস্তবতুল্য মর্যাদা দেয়ার প্রচেষ্টা এ কিংবদন্তিতে লক্ষণীয়, যা তাদের মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

> এ দীঘি এককালে এখানে ছিলো না। ... আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োদের প্রশ্ন করলে তারা মুখে-মুখে বলে দেয় এ দীঘির ইতিহাস। কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে। কেউ শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা জেনেছে তার দাদার কাছ থেকে। আর তার দাদা শুনেছে তারও দাদার কাছ থেকে। ... সে অনেক বছর আগে। ... তখন গ্রাম ছিলো না। সড়ক ছিলো না। কিছুই ছিলো না এখানে। শুধু মাঠ, মাঠ আর মাঠ। সীমাহীন প্রান্তর। ... বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে পরীরা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে। ওরা নাচতো গাইতো খেলতো। ... লালপরী, নীলপরী আর সবুজপরী। পরীদের অনেকের নামও জানা আছে এ গাঁয়ের লোকের। পুঁথিতে লেখা আছে সব। ... একদিন হঠাৎ পরীদের খেয়াল হলো, একটা দীঘি কাটবে। যার পানিতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতে পারবে ওরা। ... যেই চিন্তা, সেই কাজ। ... আকাশ থেকে খন্তা কোদাল আর মাটি ফেলবার ঝুড়ি নিয়ে এলো ওরা। ... বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। ... রূপোলি জোছনার স্নিগ্ধ আলোয় ভরে ছিলো এই সীমাহীন প্রান্তর। দক্ষিণের মৃদু বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিলো পরীদের হাসির শব্দে। ... কথায় গানে আর কাজে। ... রাত ভোর হবার আগে দীঘি কাটা হয়ে গেলো। ...পাতাল থেকে কলকল শব্দে পানি উঠে ভরে গেলো দীঘি। ... সেই দীঘি। ... তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম। এক নয়, অনেক। (পৃ. ৬)

৪.২ লোককথা

> ক. ওলা বিবি, বসন্ত বিবি আর যক্ষ্মা বিবি–ওরা ছিলো তিন বোন। তিন বোন একপ্রাণ। যেখানে যেতো একসঙ্গে যেতো ওরা। কাউকে ফেলে কেউ বেরুতো না বাইরে। ... একদিন যখন খুব সুন্দর করে সেজেগুজে ওরা রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো তখন হঠাৎ হজরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের। রঙিন শাড়ি পরে বেরুলে কী হবে, ওদের চিনতে একমুহূর্তেও বিলম্ব হলো না হজরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন–এর একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষ্মা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কাইন্ড কইরা বসলেন তিনি। খপ কইরা না ওলা বিবির একখান হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেলো ওলা বিবির। (পৃ. ৪৯)

> খ. বাড়ির বাচ্চাদের উঠোনে বসিয়ে কিচ্ছা বলছে ফকিরের মা। চাঁদ সওদাগরের কিচ্ছা। একমনে হা করে শুনছে সবাই। (পৃ. ৫৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ইসলামী বীরপুরুষ হযরত আলীর সঙ্গে সনাতন ধর্মের লোকদেবী ওলাবিবির সাক্ষাত এবং আ বিষয়ক বৃত্তান্ত নিঃসন্দেহে লোকমানুষের কল্পনাকে ভিত্তি কওে গড়ে উঠেছে। প্রতিবেশী বা পরিচিত হিন্দু-মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে একত্রে ওঠাবসা, আলাপ, লেনদেন ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের মাধ্যমে এভাবে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন কাহিনী। হিন্দু সমাজে 'ওলাইচণ্ডী' হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। রোগ-ব্যধির প্রকোপ সৃষ্টির কারণ এবং এর প্রতিকারের সঙ্গে হজরত আলী ও ওলাই বিবির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে বৃত্তান্ত গড়ে তোলার মূলে রয়েছে তাদের এ বিষয়ক উদ্বেগ ও রোগের প্রকোপজনিত সংকট।

৪.৩ পুথিসাহিত্য-- এ উপন্যাসে পুঁথিসাহিত্যের[৯৪] বিভিন্ন উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায়, গ্রামীণ লোকসমাজে এর আবেদন ও প্রভাব যথেষ্ট ছিল। পুঁথিতে বর্ণিত নানা কিচ্ছা-কাহিনী, কল্পকথাকে যেভাবে সুরে সুরে পরিবেশন করা হত বিশেষ ছন্দযোগে, তা চিত্তবিনোদনের গুণে লোকমানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত। নানা ধর্মীয় ও সামাজিক, পারিবারিক মূল্যবোধ ও শিক্ষাকে পারিপার্শ্বিক জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে অবিশ্বাস্য, মনোহর ও কাল্পনিক কাহিনীযোগে পরিবেশনের সামর্থ্যগুণে পুঁথিসাহিত্যের প্রসার ঘটেছিল বাঙালি মুসলমান লোকসমাজে। এ উপন্যাসের তিন পরিচ্ছেদে পুথিপাঠের আসরের আয়োজন, এতে সমবেত শ্রোতা ও পুথিপাঠকের উপস্থাপনভঙ্গি মন্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হয়েছে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর সন্ধ্যা নেমে এলে নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরগুলোর ছায়াঘেরা উঠানে বসে গ্রামবাসী পুথিপাঠ শোনে। বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই সুরত আলীর সুর করে পুথি পড়ার আওয়াজ মন্তুর কানে আসে। শিকদার বাড়ির উঠোনে পুঁথি পাঠের আসরের আয়োজন করা হয়। সেখানে সবাই মাটির চাটাই বিছিয়ে বসে। আসরের মাঝে একটি প্রদীপের আলোয় বসে সুরত পুঁথি পাঠ করে। আসরে মেয়েরা উপস্থিত থাকলেও তাদের বসার স্থান পুরুষদের চেয়ে খানিকটা দূরে নির্দিষ্ট। বিশেষত কমবয়সী মেয়েদের বসার জায়গা হল ওপরের বারান্দা। বুড়ো মকবুল সুরত আলীর পুঁথিপাঠের প্রশংসা করে। কেননা সে গ্রামের সেরা পুথিপাঠক। সুরত গাজী কালু,কমলা সুন্দরী ও ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি পাঠ করে শোনায়। পাঠ শেষ হলে শ্রোতাদের মনে কমলা ও ভেলুয়ার জন্য হাহাকার জাগে তাদের বিয়োগান্ত পরিণতিতে। পুঁথিতে বিবৃত কাহিনী ও ঘটনা, চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত শিক্ষা ও জীবন সংক্রান্ত নানা চিন্তা তাদের প্রভাবিত করে। কেননা তারা এর সঙ্গে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনকে মেলাতে সমর্থ হয়। একারণেই গ্রামীণ লোকসমাজে চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এদের প্রচলন ঘটে, বংশপরম্পরায় চর্চা অব্যাহত থাকে। ফকিরের মা কমলার পরিণতিকে ‘খোদার ইচ্ছা’ হিসেবে মেনে নেয়। কারণ, নারীর জীবনে যে পরিণতিই আসুক না কেন, তা মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতাই পুরুষতন্ত্রের অভীপ্স। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন পালায়, গানে কাহিনীতে এসব ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

ক. কইন্যা দেইখা গাজী মিয়ার চমক ভাঙিলো।

কইন্যার রূপেতে গাজী বেহুশ হইল। (পৃ. ১৮)

খ. শুন শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।

ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন ॥

কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান

দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ ॥

আকাশে চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।

দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূপের পরী ॥ ...

হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিল কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাকঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেলো তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সঙ্গে। ... বড় সুখে দিন কাটছিল ওদের। ... একবছর পরে একটা দুধের মতো মেয়ে জন্ম নিলো ওদের। ... আট বেহারার পালকি চড়ে একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লালপরী নীলপরী আর সবুজ পরীর দীঘির পাড় দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলো কমলা। দীঘির স্বচ্ছ পানি দেখে বড় লোভ হল কমলার। পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে আঁচল ভরে পানি খেলো সে। তারপর যখন উঠতে যাবে, দেখলো চুলের মতো সরু কী যেন একটা কড়ে আঙুলের গোড়ায় আটকে রয়েছে। হাত দিয়ে ছাড়াতে গেলো। পারলো না কমলা। যত টানে তত লম্বা হয় সে চুল। তার একপ্রান্ত পানির ভেতরে, অন্যপ্রান্ত কড়ে আঙুলের সঙ্গে গিঁটআঁটা। ছাড়াতেও পারে না কমলা, এগুতেও পারে না। ... চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেলো। ... কেউ কিছু করতে পারলো না। ইস্পাতে তৈরি কুড়োল দিয়েও কাটা গেল না চুলটা। তিনমাস তিনদিন চলে গেলো।

তারপরে এক রাতে স্বপ্নে দেখিলো সুন্দরী।

দীঘির পানিতে আছে এক রাজপুরী ॥

সেইখানে আছে এক রাজপুত্র সুন্দর।

আশেক হইয়াছে তার কমলার উপর ॥

কমলারে পাইতে চায় আপন করিয়া।

কমলার লাইগা তার কাঁন্দিছে হিয়া ॥

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে গেলো কমলার। কাঁদলো সবাই। বাবা, মা। স্বামী সবাই। ... দীঘির পানি থেকে চুলে টান পড়লো এতদিনে। ... ধীরেধীরে দীঘির পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কমলা সুন্দরী।

হীন মোয়াজ্জেমে কহেরে শুন সর্বজন।

কমলা সুন্দরীর কিচ্ছা হইল সমাপন ॥

ভুল চুক হইলে মোরে লইবেন ক্ষেমিয়া।

দোয়া করিবেন মোরে অধীর জানিয়া ॥ (পৃ. ১৮-১৯)

'নয়' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, টুনির প্রেমে আসক্ত মন্তু তাকে পাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। চাচাতো ভাবীর সঙ্গে তার প্রেম এতটাই প্রগাঢ় যে, সে কখনো কখনো অসংলগ্ন ভাবনায় লিপ্ত হয়। শান্তির হাটে মনোয়ার হাজী তাদেরকে নবদম্পতি ভেবে ভুল বুঝলেও সেদিনের অভিজ্ঞতা তাকে টুনির প্রতি আসক্তি বাড়িয়ে তোলে। তাই সে কখনো কখনো তাকে নিয়ে অচেনা কোনো স্থানে গিয়ে সংসার রচনার কথা ভাবে। তার এ ভাবনা প্রকাশিত হয় পুঁথিসাহিত্যের পরীবানুরর বৃত্তান্তের অনুপ্রেরণায়–

ঘর নাই বাড়ি নাই দেখিতে জবর

পরীবানুর আসিক লইল তাহারি উপর। (পৃ. ৫০)

কুলাটিয়া গ্রামের এক গৃহস্থের বউ পরীবানু। স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হতো না। অষ্টপ্রহর ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। ঘর ছেড়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে নীরবে বসে থাকতো সে। আর সেখান থেকে দেখতো একটি রাখাল ছেলেকে। দূরে একটা বটগাছের নিচে বসে একমনে বাঁশি বাজাতো সে। এমনি চোখের দেখায় প্রেম হয়ে গেলো।। ... তারপর।

তারপর একদিন সময় বুঝিয়া।

দুইজনে পালায়া গেল চোখে ধুলা দিয়া। (পৃ. ৫০)

মন্তুরও তাই মনে হলো। টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে, বহুদূরে, দূরের কোনো গ্রামে কিম্বা শহরে। শান্তির হাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে, তা হলে মনোয়ার হাজী নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মন্তু। যে-কোনো দোকানে হাজীকে দিয়ে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবে সে। (পৃ. ৫০)

এ উপন্যাসের শেষাংশে লক্ষণীয়, মন্তু যখন আম্বিয়াকে বিয়ে করে এক সন্তানের জনক ও শিকদার বাড়ির কর্তা, তখন একদিন হাট থেকে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরে দেখে, সুরত আলীর বড় ছেলেও বাবার মত চমৎকার ভঙ্গিতে সুরেলা কণ্ঠে ঢুলে ঢুলে আসর জমিয়ে পুঁথি পাঠ করে বাড়ির উঠানে। তাকে দেখে দূর থেকে মন্তুর মনে হয়, সুরত আলীই বুঝি পুঁথি পাঠ করছে–

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন।

ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন। ...

কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।

দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।

আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী

দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূপের পরী। (পৃ. ৬৪)

এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়ে চলে। মানবজীবনের শাশ্বত মূল্যবোধ ও চিরন্তন আকুতির নির্যাস যে পুঁথির আসরে উপবিষ্ট শ্রোতাদের সামনে গায়কের পরিবেশনাগুণে বিশেষ আখ্যানের আশ্রয়ে মূর্তময় হয়ে ওঠে, এটি তারই দৃষ্টান্ত। লোকসমাজের চিত্তবিনোদন এবং সৃষ্টিশীলতার দৃষ্টান্ত হিসেবে এ উপন্যাসে প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উন্নীত।

৪.৪ লোকগীতি

ক. স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুধের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে। (পৃ. ৬)

খ. ভাটুইরে না দিও শাড়ি,

ভাটুই-যাবে বাপের বাড়ি।

সর্ব লক্ষণ কাম চিক্কণ,

পঞ্চ রঙের ভাটুইরে॥ (পৃ,২০)

গ. আশা ছিলো মনে মনে, প্রেম করিমু তোমার সনে।

তোমায় নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে ॥ (পৃ. ২৪)

ঘ. এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।

মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে। (পৃ. ৪৮)

ঙ. যা ছিলো সব হারাইলাম হায় পোড়া কপাল দোষে।

ও খোদা,

আমার কপাল এমন তুমি কইরলা কোন রোষে। (পৃ. ৫২)

এসব গানের ব্যবহার লোকমানুষের আবেগ, সংবেদনা, কল্পনা এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ সংশ্লিষ্ট। 'ক' ও 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আম্বিয়ার মনোলোকে জাগ্রত প্রেমের অনুভব প্রকাশিত। এক্ষেত্রে প্রথমটিতে রূপকথার অনুষঙ্গে এবং দ্বিতীয়টিতে বিয়ের অনুষঙ্গে মন্তুর প্রতি তার অনুরাগ ভাষ্যরূপ পেয়েছে। 'গ' সংখ্যক

উদ্ধৃতিতে সমবয়সী এবং সম্পর্কে ভাবী টুনির প্রতি মন্তুর প্রেমানুভব ফুটে উঠেছে। পারিবারিক সম্পর্কগত বিধি এবং সামাজিক অনুশাসন যে ব্যক্তিহৃদয়ে জাগ্রত অনুভবের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, মন্তুর কণ্ঠে পরিবেশিত এ গান এর দৃষ্টান্ত। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গ্রামের বাসিন্দা বৃদ্ধ নন্তু শেখের পরিবেশিত গানের মূল সুর নশ্বও পৃথিবী ছেড়ে মৃত্যুলোকের যাত্রার বাধ্যবাধকতাগত শোকগ্রস্ততা। সে স্বেচ্ছায় গ্রামের মৃত বাসিন্দাদের বছরের পর বছর কবর দেয়ার কাজটি স্বেচ্ছায় করে। অথচ একদিন তাকেই যখন কবরে শায়িত হতে হয়, তখন এ স্মৃতি মন্তুকে বেদনাভারে জর্জরিত করে। 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত গানটি পরিবেশিত হয়েছে সুরত আলীর কণ্ঠে। পরিবারের প্রিয়জনের মধ্যে সংঘটিত বিবাদের পরিণতিতে অতীতের সুখস্মৃতি স্মরণ করে সে মন্তুর কাছে যে বিলাপ করে, তা ব্যক্তিমানুষের নিয়তিবাদী জীবনভাবনাসংশ্লিষ্ট।

৫. লোকপ্রথা-- লোকসমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রথা প্রচলিত, যার মূলে রয়েছে সমষ্টিগত মানুষের সংহতির প্রসঙ্গ। কেননা, ব্যক্তির অস্তিত্ব লোকসমাজে বরাবরই গৌণ। উৎপাদনপ্রক্রিয়া, জীবিকানির্বাহরীতি, অস্তিত্বসংগ্রামের প্রয়োজনে আদিম অরণ্যচারী মানুষের যূথবদ্ধভাবে দিনযাপনের ধারণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিবার ও সমাজ। এ উপন্যাসেও এর সাক্ষ্য লক্ষণীয়। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, একাধিক স্ত্রীকে নিয়ে সংসার যাপন, তালাক দেয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটানো, পরিবারভুক্ত সকলের গৃহকর্তার আদেশ-নির্দেশের প্রতি সমীহবোধ ও সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রবণতা লোকমানুষের গোষ্ঠীভাবনার প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক। এ উপন্যাসেও এসব দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। এ উপন্যাসের বিভিন্ন দৃশ্যে বহুবিবাহের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। 'এক' পরিচ্ছেদে শিকদারবাড়ির কর্তা বৃদ্ধ কাশেম শিকদার ও তার নিঃসন্তান স্ত্রী ছমিরন বিবি প্রবল বন্যায় বসতবাড়ি হারিয়ে কুলাউড়া গ্রাম ছেড়ে নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল সহায়সম্বল নিয়ে। একপর্যায়ে তারা পরীর দিঘি সংলগ্ন এ গ্রামে আসে। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে করিম শিকদার জমি কিনে বিরাট ভিটাবাড়ি ও ফলের বাগান গড়ে তোলে, পুকুর কাটায়। কিন্তু উত্তরাধিকার না থাকলে কে এসব সম্পত্তি ভোগ করবে, ভেবে ছমিরন বিবি স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করার আহ্বান জানায়। একপর্যায়ে সে নিজেই করিম শিকদারকে নতুন জামাতার সাজে সাজিয়ে নববধূর সঙ্গে বিয়ে দেয়। এরপর অন্তরে লালিত তীব্র কষ্ট ও বেদনা থেকে মুক্তি পেতে বিষাক্ত ধুতরা ফুল খেয়ে আত্মহত্যা করে। সেই শিকদার পরিবারের সন্তান মকবুলের প্রথম স্ত্রী আমেনার ঘরে কন্যা হীরনের জন্ম হলেও সে পুনরায় ফাতেমা এবং অবশেষে নিতান্ত কিশোরী টুনিকে বিয়ে করে। তিন স্ত্রীকে বিয়ে করার নেপথ্যে তার উদ্দেশ্য ছিল, তাদের দিয়ে যাবতীয় গৃহকর্ম করিয়ে নেয়া। শুধু তাই নয়, জমিতে চাষের কাজ, ধান ভানা ও অন্যান্য কাজেও সে তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখে। যেহেতু চার টাকা দেনমোহর দিয়ে সে একেক স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, তাই তাদের ওপর তার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত– এরূপ কর্তত্বময় মনোভঙ্গি তার সংলাপ ও আচরণে স্পষ্ট। বলাবাহুল্য, এ পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা লোকসমাজে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। শিকদার পরিবারের আরেক সদস্য আবুলের আচরণেও বিষয়টি স্পষ্ট। 'দুই' পরিচ্ছেদে আবুলের সাংসারিক বৃত্তান্ত উপস্থাপিত। স্বভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বদরাগী ও হিংস্র আবুল প্রথম স্ত্রী আয়েশা ও দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যার পরও ক্ষান্ত হয়নি। সে তৃতীয় স্ত্রী হালিমাকেও পরকীয়া প্রণয়ে জড়িত থাকার অহেতুক অভিযোগে পিটিয়ে মেরে ফেলে। গ্রামসমাজে নারীর ওপর এ ধরনের পাশবিক নির্যাতনের কোনো প্রতিকার হয় না। কেননা, রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুরুষের কর্তৃত্ব ও বাহুবল বরাবর উদ্যত। গ্রামীণ নারীর বিপন্নতা সৃষ্টিতে পরিবার ও সমাজের পটভূমিতে পুরুষতন্ত্রের স্বার্থসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও যে কোনোভাবে আধিপত্য বজায় রাখার সংকীর্ণ মানসিকতাই সক্রিয়। ফলে, এর কোনো প্রতিকার লোকসমাজে নেই। কেননা, সেখানে পুরুষের নির্দেশই নারীর জন্য আরোপিত বিধান। তাই লোকনিন্দার ভয় থাকলেও তা অগ্রাহ্য করার সুযোগও যথেষ্ট থাকায় আবুল চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে আম্বিয়াকে বিয়ের আগ্রহ মকবুলকে জানিয়েছিল। মকবুলও বৈষয়িক সম্পত্তি ও গৃহকর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনে আম্বিয়াকে বিয়ে করতে সচেষ্ট ছিল। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বহুবিবাহের রীতি সম্পর্কে লোকসমাজের ধারণাগত পরিচয় পাওয়া যায়। হীরনের বিয়েকে

কেন্দ্র করে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের পারস্পরিক আলাপ, যৌতুকপ্রথা, আপ্যায়ন প্রভৃতি প্রসঙ্গও এ উপন্যাসে বিবৃত। এক্ষেত্রে গৃহকর্তার সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের আলাপচারিতার ভিত্তিতে সমন্বতভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের রীতি অনুসৃত। শিকদারদের একান্নবর্তী পরিবারে 'মোট আট ঘর লোকের বাস' (পৃ.৭)। তাদের উপস্থিতিতে হীরনের বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

> বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখলো, বুড়ো মকবুলের ঘরের সামনে একটা ছোটখাটো জটলা বসেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করছে মকবুল। বাড়ির সবার চেয়ে বয়সে বড় সে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সকলকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না বুড়ো। অন্য সবার বেলায়ও তাই। মকবুলকে জিজ্ঞেস না করে বাড়ির কেউ কোনোদিন কোনো কাজকারবার করে না। সুরত আলীর সঙ্গে হয়তো রশীদের মনোমালিন্য আছে। আবুলকে হয়তো মকবুল দু-চোখে দেখতে পারে না। গনু মোল্লাকে হয়তো দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার অভিশাপ দেয় ফকিরের মা। কিন্তু, বাড়ির মান-সম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোনো কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। তখন সবাই এক। একসঙ্গে বসে পরামর্শ করবে ওরা। মন্তুকে আসতে দেখে ওর দিকে একখানা পিঁড়ি বাড়িয়ে দিলো সালেহা (পৃ. ২৪)

গোষ্ঠীজীবনের সামষ্টিকতার উদ্ভব সম্ভবত একান্নবর্তী পরিবার থেকে, যেখানে সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষের অভিমতের ওপর অন্যদের আস্থা প্রকাশিত। সকলের অভিমত জানা, শোনা, প্রয়োজনে বিবেচনার রীতি লোকসমাজের বৈশিষ্ট্য। এ উপন্যাসেও লক্ষণীয়, মকবুলের মেয়ে হীরনের বিয়ের জন্য টুনির বাবার বাড়ির গ্রাম নবীনগর থেকে প্রস্তাব দেয় জুলু শেখের ছেলে কদম শেখ। সহায়-সম্বলের অধিকারী, খাস গৃহস্থ ঘরের সন্তান কদমের প্রথম স্ত্রী মাস তিনেক পূর্বে মৃত্যুবরণ করায় সে পুনরায় বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। আমেনা এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে মকবুলকে অনুরোধ জানায়। আলাপকালে রশীদের স্ত্রী সালেহা মন্তুর বিয়ের কথা তুললে মকবুল ও আমেনা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিমত জানায়। ফাতেমা মন্তুর স্ত্রী হিসেবে তার খালাতো বোন রসুন ও আবুল তার মামাতো বোন পরীর কথা বললেও অবশেষে মাঝিবাড়ির আম্বিয়ার নাম প্রস্তাব করে আমেনা। কেননা, সে গৃহকর্মে পটু, সংসারের বিপুল কাজের বোঝা সামলাতেও সমর্থ। কিন্তু তার প্রস্তাব বিবেচনায় আসে না দুটো কারণে। প্রথমত, তার পারিবারিক মর্যাদা অপেক্ষাকৃত হীনতর। তার বাবা নন্তু শেখ গোরখোদক হিসেবে গ্রামে পরিচিত। অন্যদিকে তার বংশে হাঁপানি রয়েছে। ফলে মন্তু আম্বিয়াকে বিয়ে করলে হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করে মকবুল। গ্রামীণ এ লোকসংস্কারের অন্তরালে কোনো যুক্তি বা কার্যকারণ সক্রিয় নয়। বরং এক্ষেত্রে অহেতুক ভীতিবোধ ও গোঁড়ামিই দায়ী। এ প্রসঙ্গে সেদিনের আলাপ অসমাপ্তই থেমে যায়। এর কয়েকদিন পর হীরনের বিয়ের ফর্দের জন্য সবার অভিমত জানতে মকবুল সবাইকে রাতে দ্রুত ফিরতে নির্দেশ দেয়। তাছাড়া বরপক্ষের মেহমানদের ভালোভাবে আপ্যায়নের বন্দোবস্তের ব্যাপারেও সে আলাপ করতে চায়। নতুবা তারা শিকদার বাড়ির বদনাম করবে বলে সে শঙ্কা প্রকাশ করে। বরপক্ষে হিসেবে রাতে যখন কদমের মামা, চাচা ও আরো দু-তিনজন হাজির হয়, মকবুলের বাড়ির বাইরের ঘরে ফরাশ পেতে তাদের বসানো হয়। গনু মোল্লা, আবুল, রশীদ, সুরত আলী ও মকবুলও এতে উপস্থিত ছিল। অতিথিদের প্রথমে ভোজন করানো হয়। একপর্যায়ে এ ব্যাপারে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। কেননা, বরপক্ষ থেকে চারজনের আসবার কথা মকবুল জানানোর ফলে তারা সেভাবেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের ফর্দ নিয়ে আলাপকালে তারা আটজন উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় বাড়তি মানুষের আহারের বন্দোবস্ত করতে আমেনাকে হিমশিম খেতে হয়। ফাতেমা এ অবস্থায় মকবুলকে জানায়, 'যান যা আছে তা দিয়া একবার খাওয়ান। আমরা নাহয় পরে খামু।' (পৃ. ২৮)। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এভাবে সকলের এগিয়ে আসা লোকসমাজের গুরুত্বপূর্ণ রীতি।

বিয়ের পাশাপাশি গ্রামীণ লোকসমাজে বিবাহবিচ্ছেদের রীতি হিসেবে তালাকের একাধিক উল্লেখ এ উপন্যাসে বিবৃত। যেমন– মন্তু একপর্যায়ে চাচাতো ভাই মকবুলের ছোট স্ত্রী টুনির প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ভাবে, 'গ্রামের কত লোক তাদের বউকে তালাক দেয়। বুড়ো মকবুল কেন তালাক দেয় না টুনিকে?' (পৃ. ৪৯)। মকবুল আম্বিয়াকে মন্তুর স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করলে রশীদ এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়। কেননা, লোকসংস্কারবশত সে অন্যদেও বলে,

তাকে বিয়ে করলে পরিবারের অন্যদেরও হাঁপানি হবে। বলে 'মাইয়ার হাঁপানি, শেষে বাড়ির সকলের হাঁপানি অইবো।' মকবুল অভিমত দেয়, তাকে বিয়ে করে বৈষয়িক সম্পত্তিগুলো লিখে নিতে। হাঁপানি থাকলে এরপর তাকে তালাক দিলেই চলবে। তবে তালাককে কেন্দ্র করে মকবুলের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। আম্বিয়াকে মন্তুর সঙ্গে বিয়ে দিতে টুনির আপত্তি ছিল। কেননা, সে মন্তুকে ভালোবাসত। তাই শিকদার পরিবারের সকলে যখন এ বিয়েতে একমত হয়, তখন এর বিরুদ্ধে গিয়ে সে মকবুলকে প্রলুব্ধ করে আম্বিয়াকে বিয়ের জন্য। এর ফলে আম্বিয়ার বসতবাড়ি, ক্ষেত, নৌকা সবকিছুই মকবুল পাবে। পাশাপাশি তাকে দিয়ে সংসারের পরিশ্রমের কাজগুলোও করিয়ে নেয়া যাবে। টুনির এরূপ বৈষয়িক ভাবনায় প্ররোচিত হয়ে মকবুল এ ভাবনাকে পরিবারের সকলের কাছে জানায়। কিন্তু এ ঘটনা যে শিকদার পরিবারের জন্য লোকনিন্দা ও অপমান বয়ে আনবে, তা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও একপর্যায়ে তার দুই স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজন হাল ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে টুনি তাকে বোঝায়, 'বাড়ির কেউ চায় না ও আম্বিয়াকে বিয়ে করুক। বিয়ে করলে একদিনে অনেকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বুড়ো মকবুল। বাড়ির কেউ সেটা সহ্য করতে পারছে না।' (পৃ. ৫৫)। বড় স্ত্রী আমেনা ও মেজ স্ত্রী ফাতেমার শত অনুনয় সত্ত্বেও মকবুল আম্বিয়াকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে স্থির থাকে। তারা নানাভাবে এর প্রতিবাদ করায় একপর্যায়ে সে রেগে গিয়ে সকলের সামনে প্রবল রাগে কাঁপতে কাঁপতে দুই স্ত্রীকেই তালাক দিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলে। আমেনা ও ফাতেমা এর প্রতিবাদ করতে পারেনি। কেননা, স্বামী তালাক দিলে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, এমন ভ্রান্তিকর ভাবনা গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত। তাই পরদিন আমেনা ও ফাতেমা বাপের বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হয়। গনু মোল্লা মকবুলকে জানায়, সে যেন দুই স্ত্রীকে আবার নিয়ে আসে। কেননা, 'রাগের মাথায় তালাক দিলে তো আর তালাক অয় না।' (পৃ. ৫৭)

৬. লোকোৎসব-- এ উপন্যাসের 'আট' পরিচ্ছেদে হীরনের বিয়ের অনুষ্ঠানের বর্ণনার মাধ্যমে লেখক বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিয়ের জমকালো উৎসবময়তার বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন। তার বিয়ের জন্য ভোজের আয়োজনে মকবুল সাড়ে আট টাকা দিয়ে একটি ছাগল, চিকন চাল ও আধসের ঘি কিনে আনে বাজার থেকে। বরপক্ষের লোকদের আপ্যায়নের জন্য আমেনা মিয়া-বাড়ি থেকে চিনেমাটির কয়েকটি পেয়ালা ও বরতন ধার করে নিয়ে আসে। কেননা, মাটির বাসনে খেতে দিলে তারা হয়ত ফিরে গিয়ে কনেপক্ষের নিন্দা করবে। হীরনের বিয়ের কাজে অসুস্থ মকবুল তেমনভাবে অংশ নিতে না পারলেও তার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। বিয়ের কনে হীরন রসুইঘরে বসে তাকে ঘিরে অন্যদের কর্মব্যস্ততা লক্ষ করছিল। রাতে প্রতিবেশীরা আসে মকবুলের বাড়িতে, বিয়ের আসরকে জমজমাট করে তুলতে। বড় বড় চাটাই বিছিয়ে তাদের বসতে দেয়া হয়। তারপর সকলে সমবেতভাবে বিয়ের গীত পরিবেশন করে--

> মেহেদি তোমরা লাগো কোন কাজে।
>
> আমরা লাগি দুলহা কইন্যার সাজে ॥ (পৃ. ৪১)

বিয়ের ধান ভানার দায়িত্ব নিয়েছিল আম্বিয়া। সেও ঢেঁকিতে উঠে গান ধরে। সন্ধ্যে থেকেই সে ও টুনি ধান ভানার কাজ করছিল। সঙ্গে চলছিল প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গীত পরিবেশনের আগ্রহ-

> ভাটুইয়ে না দিয়ো কলা
>
> ভাটুইর হইবে লম্বা গলা।
>
> সব লইক্ষণ কাম চিক্কণ পঞ্চ রঙের ভাটুইরে। (পৃ. ৪১)

হীরনকে আসরের মাঝে বসিয়ে তার হাতে মেহেদি লাগিয়ে দেয় মেয়েরা। তাকে দেখে সুরতের ছেলেমেয়ে কুদ্দুস, পুটি, বিন্তিও হাতে মেহেদি দিতে আবদার জানায়। হঠাৎ ফকিরের মা আঁচল দুলিয়ে, কোমর ঘুরিয়ে গান গাইতে গাইতে নাচতে শুরু করে--

কই গেলা সুরতের বিবি আমার কথা শোন।

আবের পাঙ্খা হাতে করি আউলাইয়া বাতাস কর।

ফুলের পাখা হাতে নিয়া জোরে বাতাস কর। (পৃ. ৪১)

তার নাচ দেখে সকলেই উল্লসিত হয়ে ওঠে। ধান ভানা বন্ধ করে এতে টুনি ও আম্বিয়াও অংশ নেয়। এসময় ফকিরের মা আম্বিয়াকে দলের মাঝে নিয়ে গিয়ে গান করে--

কেমন তোমার মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।

তোমার মতো কাঞ্চন পাইলে এখন করি বিয়া। (পৃ. ৪১)

প্রত্যুত্তরে আম্বিয়া জানায়--

কেমন ওরে মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া

তোমার মতো কাঞ্চন পাইলে এখন করি বিয়া। (পৃ. ৪১)

প্রায় সারারাত ধরে তারা নাচ, গান, হৈ-হুল্লোড়, হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান পালন করে। মকবুল ও মন্তু ব্যতীত অন্যরা হীরনের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যায়।

৭. লোকক্রীড়া-- এ উপন্যাসে বিবৃত গ্রামীণ লোকসমাবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শান্তির হাটের প্রসঙ্গ। হাটে আগত মানুষদের আনন্দদানের জন্য কখনো কখনো সার্কাসপার্টিও হাজির হয়। এটি এতদঞ্চলের মানুষের বিনোদনের অন্যতম উৎস। তখন দোকানদারদের বিক্রি বেড়ে যায়। তাছাড়া নদীর পাড়ের ভরাট স্থানে কয়েকটা দোচালা ঘর তুলে নিয়ে অনেকেই হোটেল খুলে বসে, আগত মানুষের খাবারদাবার ও বিশ্রামের প্রয়োজনে। মন্তু এ হাটে করিম শেখের সঙ্গে এসেছিল। করিম শেখের সূত্রেই মনোয়ার হাজীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। উপন্যাসের 'সাত' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মন্তু টুনিকে বাপের বাড়ি থেকে আনার পথে শান্তির হাটে নৌকা ভেড়ায়। কেননা জোয়ার ছেড়ে ভাটা নামলে তখন তাদের পুনরায় যাত্রা করতে হবে। তখন বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। টুনি হাটের কথা মন্তুর নিকট থেকে শুনে কাচের চুড়ি কেনার বায়না করে। মন্তু শান্তির হাট সংলগ্ন তীরে নৌকা বাঁধে। হাটে ব্যান্ডপার্টির আওয়াজ ও বহু মানুষের সমাগমে চারদিক কোলাহলমুখর ছিল। এক স্থানে রঙিন কাপড়ের তাঁবু স্থাপন করা হয়। তাবুর ভেতর সার্কাসের একটি দল খেলার আয়োজন করে। তারা বাঘের খেলা, মানুষের খেলাসহ অন্যান্য খেলা দেখায়। টুনি সার্কাসের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলে মন্তু তাকে নিয়ে হাটে যায় খেলা দেখাতে।

> তাঁবুর সামনে বড় বড় দুটো হ্যাজাক জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। একপাশে একদল লোক ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে।... তাঁবুর দরজার ওপরে একটা মাচায় চড়ে দুটি মেয়ে ঘুরেঘুরে নাচছে। সারা গায়ে, মুখে নানা রকমের রঙ মেখেছে ওরা। ... দরজায় দাঁড়ানো লোকটার কাছ থেকে তিনআনা দামের দু-খানা টিকেট কাটলো মন্তু। ভেতরে ঢুকে দেখে ছেলে বুড়ো মেয়েতে তিলধারণের জায়গা নেই। ... কিছুক্ষণের মধ্যে সার্কাস শুরু হয়ে গেল। ... প্রথমে একটা মেয়ে দুটো লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা একখানা দড়ির উপর দিয়ে নির্বিকারভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে হেঁটে চলে গেলো। ... দর্শকেরা হাতে তালি দিয়ে উঠলো জোরে। ... তারপর এলো বিকটাকার লোক। হাতের মুঠোর উপরে তিনটে মানুষকে তুলে নিয়ে চরকির

মতো ঘোরাতে লাগল সে। ... সবাই একসঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠলো। ... এরপর খুব জোরে ব্যাণ্ড বাজলো কিছুক্ষণ। ...তারপরেই এলো বাঘ। এসেই একটি হুঙ্কার ছাড়লো সে। (পৃ. ৩৬)

৮. লোকখাদ্য-- গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত কিছু খাদ্যের উল্লেখ এ উপন্যাসে লক্ষণীয়--

ক. শেওলা আর বাদাবন ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে নাচে অগুনতি শাপলা ফুল।

ভোর হতে আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা ছুটে আসে এখানে। একবুক পানিতে নেমে শাপলা তোলে তারা। ... বাজারে দর আছে শাপলার। এক আঁটি চার পয়সা করে। (পৃ. ৫)

খ. হাতের ভেজা শাড়িটার পানি নিংড়াতে নিংড়াতে আম্বিয়া বললো, মন্তু ভাই হুট কইরা চইলা যাইও না। পিঠা বানাইছি খাইয়া যাইও। ... মন্তুকে একটা পিঁড়িতে বসতে দিয়ে ওর সামনে একবাসন পিঠা এগিয়ে দিলো আম্বিয়া। ... কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো বাসনটা শূন্য করে দিলো মন্তু। (পৃ. ২৬-২৭)

গ. মন্তুর মনে হলো ও স্বপ্ন দেখছে।

একটু পরে একহাতে রসের হাঁড়িটা নিয়ে অন্যহাতে গাছ বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো টুনি। কলসির মধ্যে রসটা ঢেলে হাঁড়িটা রেখে আসার জন্য আবার উপরে যাচ্ছিলো টুনি। ... অনেকগুলো খেজুরগাছ থেকে রস নামিয়ে কলসি ভর্তি করলো ওরা। ... টুনি আবার বললো, তোমার নায়ে চলো।

মন্তু অবাক হলো, নায়ে গিয়া কি করবা?

টুনি নির্লিপ্ত গলায় বললো, সিন্নি রান্দুম। (পৃ. ৩৩)

ঘ. একটু পরে একটা পুঁটুলি বের করে কিছু চিঁড়া আর একটুকরো খেজুরের গুড় বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলো টুনি। বললো, বেলা অইয়া গেছে খাইয়া নাও। বলে আবার চুপ করে গেলো সে। (পৃ. ৩৪)

ঙ. একবাটি তেঁতুল-মরিচ মেখে এনে মন্তুর সামনে বসলো টুনি। অল্প একটু তেঁতুল মুখে পুরে দিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে টুনি শুধালো, খাইবা? (পৃ. ৪৪)

গ্রামীণ লোকসমাজে হুঁকায় ধূমপানের রীতি পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত। এ উপন্যাসের বিভিন্ন দৃশ্যে লক্ষণীয়, কখনো নিছক সময় কাটাতে, কখনো ক্ষেতে বা অন্য পরিশ্রমের কাজে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নেয়ার ছলে হুঁকায় তামাক দিয়ে ধূমপান করা মন্তু, মকবুল, করিম শেখ, আবুল, রশীদ, সুরত আলী সকলেরই পছন্দের অভ্যাস।

ক. ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে আবুল। তারপর কলকেটা সালেহার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, চুলায় আগুন আছে? একটুখানি আগুন দাও। ... এই দিই, বলে কলকেটা হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলো সালেহা। (পৃ. ১৫)

খ. কলকেতে পান সাজিয়ে এনে হুঁকোটা মন্তুর দিকে বাড়িয়ে দিলো আম্বিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করলো, পান খাইবা? মন্তু হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে বললো, না থাউক। আপন মনে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো সে। (পৃ. ১৭)

গ. করিম শেখ হুঁকোটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে, নাও মিয়া তামুক খাও। ... হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নেয় মন্তু। গুড়ুক গুড়ুক টান মারে হুঁকোতে। তারপর আবার গান ধরে, আশা ছিলো মনে মনে। (পৃ. ২৪)

ঘ. ছইয়ের সঙ্গে ঝোলানো হুঁকো আর কল্কেটা নামিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিল মন্তু। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে এসে গলুয়ের উপর আরাম করে বসে তামাক টানতে লাগলো। (পৃ. ৩৯)

ঙ. গরুগুলোকে থামিয়ে তামাক খাওয়ার জন্য আলের ধারে এসে বসল সে (সুরত)। বলল, মন্তু মিয়া আহো, তামুক খাইয়া লও। ... তামাকের গন্ধ পেয়ে মকবুল আর রশীদ ওরাও ক্ষেত ছেড়ে উঠে এলো। জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে

বুড়ো মকবুলের দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিলো সুরত। ... প্রথমে একনিশ্বাসে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো মকবুল। ... রশীদ আর সুরত একবার হুঁকোর দিকে তাকালো। কিছু বললো না। ওদের নজর এখন হুঁকোর দিকে। (পৃ. ৫২)

৯. লোকপরিচ্ছদ ও প্রসাধন-- গ্রামীণ নরনারীর পরিচ্ছদ ও প্রসাধনের স্বল্পোল্লেখ এ উপন্যাসে রয়েছে--

ক. মাচাঙের উপর থেকে আধ-ময়লা ফতুয়াটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে-দিতে মন্তু ভাবলো ... (পৃ. ১৬)

গ. দিনের বেলা ঈষৎ গরম। শেষরাতে প্রচণ্ড শীতে হাড়কাঁপুনি শুরু হয়। কাঁথার নিচেও দেহটা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। ... আজকাল ভোর হবার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে যায় মন্তু। সোয়া দু-টাকা দিয়ে কেনা খদ্দরের চাদরটা গায়ে-মাথায় মুড়িয়ে নিয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাঝি বাড়ির দিকে ছুটে সে। (পৃ. ২৫-২৬)

ঘ. বরের চাচা ইদন শেখ বললো, অলঙ্কারপত্র বেশি দিবার পারমু না মিয়া। হাতের দুইজোড়া চুরি আর কানের দুইডা ঝুমকা। ... গলার আর কমরেরডা দিবো কে? সুরত আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওইগুলাও দিতে অইবো আপনাগোরে। ... পায়েরটারে বাদ দিয়া দিলা ক্যান অ্যা? আবুল জোরের সঙ্গে বললো, পায়ের একজোড়া মলও দেওন লাগবো। (পৃ. ২৮)

ঙ. আজও মন্তুর জন্য অপেক্ষা করছিলো আম্বিয়া। চুলে তেল দিয়ে সুন্দর করে চুলটা আঁচড়েছে সে। সিঁথি কেটেছে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল টুকটুকে করে তুলেছে। (পৃ. ৫৮)

১০. লোকভাষা-- এ উপন্যাসের লোকভাষা ব্যবহারে ঔপন্যাসিকের সংহত ও সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় কুশীলবদের উচ্চারিত সংলাপে, যেখানে তাদের মনোভাবনা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দেশজ শব্দ ও আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি, বিশেষ ধরনের দেহভঙ্গি (বডি ল্যাংগুয়েজ), মেয়েলি ধরনের সংলাপের বিশেষ ধরনকে মূর্তময় করে তোলা, বাগধারা ও অলংকারসমূহের সমাবেশ, স্থান-কাল বিবেচনায় কুশীলবদের সামাজিক ও শ্রেণি অবস্থান অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ভাষা ব্যবহারের অনুপম দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে লেখকের বর্ণনা ও তথ্যনির্দেশের ভাষা প্রমিত বাংলা গদ্যরীতির অনুসারী। সংক্ষিপ্ত অথচ গতিময় বাক্যসমূহের সংযোজনায় যে বিবরণ উপন্যাসে ভাষ্যরূপ পায়, তাতে বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা ও মনোহারিত্ব সুচারুভাবে প্রকাশিত। এ উপন্যাসে আশ্রিত শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা থেকে বাসিন্দাদেও ভাষিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

১০.১ শব্দভাণ্ডার

লোকজ শব্দরাশি– জলা, শেওলা, বাদাবন, গাঁ, হৈ-হুল্লোড়, ধল-পহর, আঁটি, ডাঙা, পাখি, দিঘি, ডুব, খন্তা, ঝুড়ি, ঢেঁকি, পিদিম, চাটাই, লোক, বাঁশ, উঁকি, ঘাই, তল্পিতল্পা, ঝাঁক, দাওয়া, ছাতি, ভেলা, ফলা, কলসি, ঢিপি, কাঁধ, ঘাম, ভেলা, হাল, মাচাঙ, টুকরি, বাজু প্রভৃতি।

বিশেষণ– এঁকেবেঁকে, দুলিয়ে, লিকলিকে, আঁটসাঁট, নুয়ে, তাড়া, হ্যাংলা, ছিপছিপে, উঠেপড়ে, উপোস, ঝলসানো, হাঁপিয়ে, ফুলো, ভিজা, ঘুটঘুটে, আঁতকে প্রভৃতি।

ক্রিয়া– মাড়িয়ে, মাইরা, ফালাইবো, মইরা, উইড়া, চইলা, যামু, ছিটিয়ে, ভানে, চড়লে, খেঁচে, খাটাইছস, মোড়ানো, জমে, মাড়ায়, ঢেলে, ঝালানো, লেপেপুছে, ঠেকল, ঠেলে, করছস, ফালাইছস, চাপলো, আইসো, ফোঁপাচ্ছে প্রভৃতি।

শব্দদ্বৈত– কলকল, ধপাস ধপাস, গমগম, খিলখিল, খাঁজে খাঁজে, দরদর, কুটকুট, ঢুলুঢুলু, চপচপ, গজগজ, পিটপিট প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– প্রহর>পহর, যাব>যামু, কেন>ক্যান, চলে>চইলা, বলে>বইলা, ভানছে>বাইনতাছে, একটা>একডা, তৃষ্ণা>তেষ্টা, বিঘা>বিঘে, মাগনা>মুফতে, থেকে>থাইকা, সোহাগ>সোয়াগ, ভুলে>ভুইলা, থেকে>থাইকা, উঠে>উইঠা, প্রভৃতি।

১০.২ বাগধারা--

গনু মোল্লা নির্ভেজাল মানুষ। কারো সাতেও থাকে না, পাঁচেও না। (পৃ. ৮)

সেদিন থেকে আবুলের সাতে-পাঁচে আর কেউ নেই ওরা। (পৃ. ১৪)

মেয়ের কথা শুনে চোখ উল্টে গেলো মজু ব্যাপারীর। (পৃ. ২২)

উঠোনের এককোণে দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবলো মন্তু। (পৃ. ৪৬)

বুড়ার কি ভীমরতি অইছে নাকি? (পৃ. ৫৪)

জহির রায়হানের n\Rvi eQi a‡i বিশ শতকের প্রথমার্ধের গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান লোকসমাজের অনুপম কথামালা। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত পরিমণ্ডল তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা ও চেতনালোককে যে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে চলে, এর বিবিধ দৃষ্টান্ত এতে ভাষ্যরূপ পেয়েছে। তবে, তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো, অস্তিত্বসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে চলার অদম্য অনুপ্রেরণা হিসেবে তারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে বারবার আঁকড়ে ধরে। কেননা এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবহমানকালের, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে চলে। গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান লোকসমাজের চালচিত্র অনুসন্ধান করতে হলে এ উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

দশম পরিচ্ছেদ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) প্রভাব বিস্তারী লেখনীর সঙ্গে শুধু সংবেদনশীল, পরিশ্রমী পাঠকেরই যোগাযোগ গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। তিনি গতানুগতিক, গড়পড়তা বিষয়কে একেবারেই এড়িয়ে চলেন।[৯৫] তাঁর লেখার বিষয় হিসেবে গৃহীত হয় বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়, স্বাজাত্যবোধ, সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই, ইতিহাসের বাঁক-পরিবর্তনকারী ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ ও এর সমন্বিত অভিঘাত, লোকজীবন, মধ্যবিত্ত সমাজের কঠোর সমালোচনা ও এর প্রতারক স্বভাবের নগ্ন উন্মোচন, মানবমনস্তত্ত্বের গহীন, বিসর্পিল গোলকধাঁধাসদৃশ অন্তর্দেশকে আবিষ্কার প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গ। পাঁচটি গ্রন্থভুক্ত ও কিছু অগ্রন্থিত গল্প, দুটি উপন্যাস আর একটি প্রবন্ধগ্রন্থ– এসব রচনার মধ্য দিয়েই তিনি লেখনীকে অসামান্য অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। ‘স্বদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কার-প্রত্যাশা-প্রত্যাখ্যানকে আত্তীকৃত করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মানবমুখীন সাহিত্যসাধনা স্বীয় যোগ্যতায় অর্জন করেছে এক অতুলনীয় মহিমা। তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন স্বদেশ-সকাল-স্বসমাজের প্রতি, অবিচল নিষ্ঠায় পূরণ করেছেন শিল্পের দায়। তাঁর সামাজিক ও শৈল্পিক অঙ্গীকারে ছিল প্রত্যক্ষ রাজনীতির বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ফলে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে এদেশের মাটি ও মানুষের পূর্ণায়ত জীবনচর্যা। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায়ͺাত তাঁর চিত্তলোক কখনোই তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত হয়নি’।[৯৬] শিল্পবোধ ও সাহিত্যভাবনার পাশাপাশি রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি সবকিছুই তাঁর শিল্পীচেতনায় পল্লিত হয়ে নতুন রূপে উন্নীত হয়েছে। আট বছর বয়সে গল্প ‘খালেক ও তার মাতা’ লিখে সাহিত্যচর্চায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। তবে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ষাটের দশকের শুরুতে লেখা গল্প ‘অতন্দ্র’ mgKvj পত্রিকায় [৯৭] এবং ‘স্বগত মৃত্যুর পটভূমি’ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত mv¤cÖwZK avivi Mí শীর্ষক

গ্রন্থে (১৯৬৪) 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' অন্তর্গত হয়।[৯৮] তিনি এ সময় থেকেই উপন্যাস লিখতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চিলেকোঠায়' ˆ'wbK msev'-এর সাহিত্য পাতায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হচ্ছিল। সরকার পরিবর্তনের পর পত্রিকাটি এর প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (১৯৭৬)। ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে 'চিলেকোঠার সেপাই' নামে উক্ত উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে mvßvwnK †iveevi-এ ছাপা হয়, যা ১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে শেষ হয়। এটি গ্রন্থাকারে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস †Lvqvebvgv ধারাবাহিকভাবে ˆ'wbK RbKÉ-তে ১৯৯৪ সালে ছাপা শুরু হয়। তবে ১৯৯৫ সালে এটির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং 'প্রফুল্ল কুমার সরকার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার' পায়। প্রথম উপন্যাস wP‡j‡KvVvi †mcvB (১৯৮৬)- য়ে তিনি 'গভীর জীবনবোধ, তীব্র সমাজমনস্কতা এবং রচনাদক্ষতার শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ... ১৯৬৯ সালে ... আইয়ুবশাহি উৎখাত করে, সামরিক শাসনের শৃঙ্খল ছিঁড়ে মুক্ত স্বাধীন দেশ গঠনের জন্যসর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে নিম্নবিত্তের সবাই সেই বিদ্রোহে সাড়া দিয়েছিলো। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিসর্বস্বতায় আকণ্ঠ টইটুম্বুর মানুষ এই আন্দোলনের ধাক্কায় কী ভাবে টলোমলো করে এবং নিজের কোটর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাকে কীভাবে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার পোশাক ছাড়তে হয় এই উপন্যাসে লেখক তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসন শোষণের করালগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে পূর্বপাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে– একটি মুক্তিকামী জাতির জীবনের উত্তাল চরমপর্ব এই উপন্যাসে বিধৃত।'[৯৯] অন্যদিকে †Lvqvebvgv প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের আধারে বাঙলার নিম্নবিত্ত গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অব্যক্ত কথকতা। এ 'উপন্যাসের বিষয়ভাবনায় রয়েছে চারের দশকের রাজনৈতিক ... তরঙ্গাঘাতে গ্রামজীবনের আবর্তন, শ্রেণী সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, সামাজিক ক্ষেত্রে পার্টির অনুপ্রবেশ, ইসলামিয় আবেগ ও হিন্দুবিদ্বেষের মনোমেনিক বিস্ফোরণ, শ্রেণীমাৎস্যন্যায়ের মতো অসংখ্য বিষয়ের জটিল গ্রন্থি। অভাব-অনটন ও শোষণ-বঞ্চনা, লোকবিশ্বাস আর স্বপ্নের পাঁকে ডুবে থাকা মানুষের ঘোরগ্রস্ত জীবনে, উপন্যাসের বাস্তবতায় প্রবেশের জন্য ইলিয়াস একটি অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডল রচনা করেছেন ... বিজ্ঞান ও কলা, ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্ব, মনন ও সৃজনের ধ্রুপদী সংশ্লেষণেই নির্মিত হয়েছে 'খোয়াবনামা'।[১০০] ইলিয়াসের গদ্যভাষা বলিষ্ঠ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা-প্রবাদ-ছড়া-শোলোক গান-কবিতা এবং তার সঙ্গে লোকজীবনের অনুষঙ্গ, বাচনভঙ্গি, অঙ্গসঞ্চালন ইত্যাদি সবকিছু মিলেমিশে তৈরি হয়েছে খোয়াবনামার সম্মোহনী গদ্যভাষা।' মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে মহাশ্বেতা দেবীর কাছে লেখা এক চিটিতে তিনি নিজের ভবিষ্যতের উপন্যাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখেছিলেন–– 'আমি অবশ্য থাকতে চাই ১৯৭১-এর যুদ্ধের মধ্যে। ... মাস দুয়েক পর বগুড়া যাবো, তখন মহাস্থানে গিয়ে দেখব কতটা হাঁটা যায়।'[১০১] তাঁর এ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ আসেনি। দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বাঁক-বদলকারী দুই ক্রান্তিকালপর্বের পটভূমিতে রচিত মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাধর্মী দুটি উপন্যাসেই তিনি প্রবলভাবে উপস্থিত আছেন।

†Lvqvebvgv

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) মহাকাব্যিক উপন্যাস †Lvqvebvgv[102] (১৯৯৬) বিশ শতকের চল্লিশের দশকের ব্যাপ্তিতে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত বগুড়ার গ্রামীণ লোকসমাজের কথামালা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, লাহোর প্রস্তাব প্রসঙ্গ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, তেভাগা আন্দোলন, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সংকট প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনার ঘনঘটা এতদঞ্চলের গ্রামীণ জনজীবনে যে ভয়াবহ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, এরই অসামান্য শৈল্পিক ভাষ্যরূপ এ উপন্যাস। তবে লোকজচেতনার স্বরূপ উপস্থাপনে তিনি এতে ঘটনার স্রোতধারাকে বর্তমান থেকে ক্রমশ অতীতের দিকে ধাবিত করেন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বৃত্তান্ত সন্নিবেশে।[১০৩] পাশাপাশি বগুড়ার যমুনা নদী সংলগ্ন গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অন্তর্গত [১০৪] লোকালয়ের বেষ্টনী পেরিয়ে ভৌগোলিক পরিধি সম্প্রসারিত হয় ঢাকা ও কলকাতায়। ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির সূত্রে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মর্মান্তিক প্রতিবেদন এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলেও এর কেন্দ্রীয় বলয় জুড়ে রয়েছে[105] উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের চালচিত্র। মাদারি [১০৬] ফকির মজনু শাহ ও তার শিষ্য মুনসি বয়তুল্লা শাহের[১০৭] ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ লোকালয়ের বাসিন্দাদের চেতনালোকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। [108] এর সাক্ষ্য রয়েছে তাদের অনুসৃত লোকবিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ, লোকসঙ্গীত, গল্প-কিংবদন্তি, লোকভাষা প্রভৃতিতে। কৃষক, জেলে, মাঝি, কলু, মুচি, জোলা, কামার, কুমার প্রভৃতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারার এমন নির্লিপ্ত, অকপট ও বিশ্বস্ত ভাষ্যরূপ [109] বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় নিঃসন্দেহে বিরল। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান যথা লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, লোকোৎসব, লোকখাদ্য, লোকভাষা প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় প্রযুক্ত হয়েছে।

১. লোকবিশ্বাস–– এ উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত বিবিধ লোকবিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটেছে। এসব বিশ্বাস তাদের চিন্তাচেতনা, ধর্মীয়-পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। গ্রামের অক্ষরজ্ঞানহীন লোকসমাজের বাসিন্দাদের নিত্যদিনের বিভিন্ন অভ্যাস, আচার-আচরণ, পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাববিনিময় সবকিছুই এর অন্তর্গত। এসব বিশ্বাস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে পূর্বপুরুষের অনুসৃত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিসেবে স্বীকৃত। এ উপন্যাসে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয়ের অধিবাসীদের মানসলোকে এ ধরনের বিচিত্র লোকবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। এসবের অনেকগুলোই বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত। এক্ষেত্রে কিছু লোকবিশ্বাসের ভিত্তি হলো ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা ও কিংবদন্তি-সম্পৃক্ত চরিত্রসমূহের প্রতি অলৌকিক-অতিলৌকিক গুণ ও শক্তি সম্পর্কিত ধারণা আরোপ। বলাবাহুল্য, জাতিগত ও ধর্মীয়-সামাজিক পরিচয়ের প্রতি বিমুগ্ধতা লোকসমাজে এ ধরনের বিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ উপন্যাসে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিংবদন্তি আদ্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে কুশীলবদের গোষ্ঠীচেতনায়। সেকারণেই কাৎলাহার বিল, যমুনা নদী, করতোয়া নদী, বাঙাল নদী, মানাস নদী, মোষের দিঘি প্রভৃতি ভৌগোলিক স্থান ও আঞ্চলিক পরিসরের সঙ্গে উক্ত কিংবদন্তির অতি সামান্য এমনকি কখনো কখনো কোনো ধরনের সম্পর্কহীন অনুষঙ্গও লোকবিশ্বাসের সূত্রে বিভিন্ন ভাষ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফকির মজনু শাহের অনুচর মুনসি বয়তুল্লা শাহের ইংরেজ সেনানায়ক টেলরের বন্ধুকের গুলিতে নিহত হবার বৃত্তান্তের সঙ্গে ইতিহাসের সংযোগ অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মৃত্যুকেন্দ্রিক ঘটনাকে ঘিরে কিংবদন্তির যে ভুবন এ উপন্যাসে বিবৃত, এর মূলে রয়েছে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অনুষঙ্গ এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা লোকবিশ্বাস, যা উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। এরূপ লোকবিশ্বাস হলো, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন না হলে এবং অপঘাতে মৃত্যু হলে সে অশরীরী, জ্বিন বা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। উপন্যাসে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বয়তুল্লা শাহের অপমৃত্যুর বৃত্তান্তকে। পরবর্তী পর্যায়ে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে অবস্থিত পাকুড়গাছে তার অধিষ্ঠান, এ বিল শাসন এবং বিলসংলগ্ন চারপাশের লোকালয়ের মানুষসহ জল-স্থলের সকল পশুপাখির ওপর তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিস্তার প্রভৃতি প্রসঙ্গ কিংবদন্তির আকারে দিনের পর দিন পল্লবিত হয়েছে, যার মূলে রয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অকুতোভয় বীর মুনসি বয়তুল্লা শাহের প্রতি তাদের অনুরাগ ও সমর্থন। এক্ষেত্রে তার সম্পর্কিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাস গ্রামে প্রচলিত থাকার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে তাদের রচিত বিভিন্ন লোকসঙ্গীত ও কিংবদন্তি। একারণে লোককবি চেরাগ আলি এবং তার সহযোগী তমিজের বাপের প্রতিও গ্রামবাসীর সমীহ, দৈব নির্ভরতা গড়ে ওঠে মূলত লোকবিশ্বাসের প্রতি আগ্রহবশত। কেননা, প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য লোকমানুষ যে কোনো উপায়কেই অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে মুনসির কিংবদন্তিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত রচনাকারী চেরাগ আলি এবং তার মৃত্যুর পর তার অনুচর তমিজের বাপের প্রতিও তাদের বিশ্বাস স্থাপনের কারণ এটিই। তবে তমিজের বাপের স্বভাবে সন্নিহিত স্বল্পবাকপ্রীতি, বৈষয়িক ব্যাপারে ঔদাসীন্য, আত্মভোলা স্বভাব এবং মনোবিকার তথা ঘুমের মধ্যে রাতের বেলা গ্রামের পথে-প্রান্তরে, বিলের ধারে হেঁটে চলাকে অতিপ্রাকৃত শক্তি হিসেবে গ্রামবাসীর বিবেচনাই এসব লোকবিশ্বাস গড়ে তুলেছে। কুলসুম স্বামী সম্পর্কে ভাবে, "ঘুমন্ত মানুষ কথা বলে মুনসির সাথে, না হলে জিন পরীর সাথে, মাসুম বাচ্চাদের আলাপ হয় ফেরেশতাদের সাথে। আগুনের জীবদের সাথে তমিজের বাপের কি যোগাযোগ হয় না? দাদা বলতো, 'মানুষটাক আবোর ঠেকলে কী হয়, জাহেল মাঝির বেটা হলে কী হয়, অর মদ্যে বাতেনি এলেম থাকবার পারে রে! মানুষটার মদ্যে আগুন জ্বলে!' "[110] (পৃ. ৩৪২)। তমিজের বাপ স্বভাবে উদাসীন হলেও যে কাজে সে হাত দেয়, সেই কাজেই সাফল্য নিশ্চিত, এমনটিও গ্রামবাসীর ধারণা। অবশ্য এটি ক্রমশই যে সমষ্টিমানুষের বিশ্বাসে উন্নীত, এর বিবিধ দৃষ্টান্ত উপন্যাসে রয়েছে। কাৎলাহার বিলে বা বাঙাল-মানাস-যমুনা নদীতে জাল ফেললেই তার জালে বিরাটাকৃতির রুই, এমনকি এক মণ-সোয়া মণ ওজনের বাঘাড় মাছ ওঠে। সে একাই ধানী জমিতে তিনজন কামলার কাজ করে। সেকারণেই গ্রামবাসীর বদ্ধমূল বিশ্বাস, তার ওপর মুনসির বিশেষ নজর রয়েছে। নতুবা এমনটি কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কুলসুম ভাবে, 'তমিজের বাপ তো যি সি মানুষ লয় বাপু!- ঘুমের মধ্যে সে কার ডাকে বাইরে চলে যায়, কতোদূর

যায়, কেউ জানে না। তমিজের বাপকে নিয়ে মানুষ কতো কথাই না বলে! এমনিতে টোপ পাড়লে কী হবে, কামে গেলে তার জুড়ি নাই। ... তমিজের বাপের শক্তি আসে পাকুড়গাছ থেকে। কতো মানুষ তাকে নিয়ে কতো কথা কয়' (পৃ. ৩৪৭)। ইতিহাসের পাতায় ভর করে অতীতদিনের বৃত্তান্ত তমিজের বাপের মনোলোকে পরাবাস্তব আবহযোগে যেভাবে মূর্তময় হয়ে ওঠে, তাতে অনুধাবন করা যায়, গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের চেতনালোকে মুনসি সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রভাব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত--

> মণ্ডল যদি পাকুড়গাছ পর্যন্ত লাঙল চালায় তো কী হবে? সবটাই মণ্ডলের দখলে গেলে মুনসির পোষা গজার মাছগুলো হয়তো নতুন ওঠা মাটির তলায় কেঁচো হয়ে কিলবিল করবে। না-কি সেগুলোকে ভেড়ার আকার দিতে না পেরে মুনসি তাদের লোহার আংটা করে গড়িয়ে নিয়ে গেঁথে রাখবে নিজের গলার শেকলে? অতো সোজা লয়!–চেরাগ আলি বলে গেছে, চেরাগ আলির রুহে ভর করে মুনসিই জানিয়ে গেছে, গজারগুলোকে কেউ উৎপাত করলে এই দুনিয়ার ভাত তার চিরকালের জন্য উঠে যাবে। ... কিন্তু ফকির নাই, মুনসির হুকুম আসবে কার মুখ দিয়ে? ... জোতদারদের সঙ্গে লাঠালাঠি করা বর্গাচাষাদের রক্তে পিছলা জমির আল পেরোতে পেরোতে মুনসির গান কমজোর হয়ে গড়িয়ে পড়ে কাৎলাহার বিলে। বিলের পানিতে হাবুডুবু খেয়ে উঠে এই গিরিরডাঙায় আসতে আসতে গান ঝাপসা হয়ে পড়ে। বৃষ্টিভেজা তারার আলোয় তমিজের বাপের বাড়ির খুলিতে তার ছায়া পড়ে। এই ছায়া ছায়া আলোয় ঐ গান এসেছে কার গলায় সওয়ারি হয়ে? ভালো করে খেয়াল করলে ছায়াটিকে পাকুড়তলার সাদা ঘোড়া বলে ঠাহর করা যায়। সারা অঙ্গে তার দুষমনের তীর বেঁধা, সওয়ারি নেওয়ার জন্য অস্থির সাদা ঘোড়ার গায়ের তীরের ডগাগুলো তিরতির করে কাঁপে। অতো অতো তীরের মধ্যে মুনসি বসবে কোথায় তা ভালো করে বুঝতে না বুঝতে ঘোড়া ছুটতে শুরু করে। (পৃ. ৩৮৭)

অন্যদিকে, মৃতব্যক্তি মৃত্যুবরণের পরও তার প্রিয়জনের নিকট আসে, এ ধরনের বিশ্বাসও গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত। এ উপন্যাসের '২২' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, চেরাগ আলি ফকির মৃত্যুবরণ করলেও সে যে কখনো কখনো তার নাতি কুলসুম এবং নাতজামাই তমিজের বাপের ওপর ভর করে, এ ধরনের লোকবিশ্বাস বৈকুণ্ঠের সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে। হুরমতুল্লার বড় মেয়ে ফুলজানের জামাই এবং লোককবি কেরামত আলির সঙ্গে জীবদ্দশায় চেরাগ আলি ফকিরের পরিচয় ঘটেছিল খিয়ার এলাকায় তথা নাটোর ও এ সংলগ্ন স্থানে। সেদিকে তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব দিনদিন ছড়িয়ে পড়ছিল। কেরামত আলি চেরাগ আলির সঙ্গীত রচনার ধরন এবং এর বিষয়বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিল। সঙ্গীতের প্রতি চেরাগ আলির আন্তরিকতা সম্পর্কে তার ধারণা সে সময়েই গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে সে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসে এবং বৈকুণ্ঠের মাধ্যমে চেরাগ আলির নাতি কুলসুম ও নাতজামাই তমিজের বাপের সঙ্গে পরিচিত হয়। কুলসুম তার দাদার কাছ থেকে শোনা 'মাদারি ফকির' বিষয়ক গানগুলো শুনে শুনে মুখস্ত করেছিল এবং একমনে সুর করে গাইত। একদিন সে যখন তাদের সামনে এ গান পরিবেশন করে, তাদের বিশ্বাস জাগে, কুলসুমের ওপর চেরাগ আলিই ভর করেছে--

> বটতলায় বৈকুণ্ঠের সঙ্গে চিড়াগুড় খেতে খেতেও কেরামতের ভয় কাটে না। আস্তে আস্তে বলে, 'ফকির মনে হয় কাল নাতনির ওপর আসর করিছিলো।' সে নিশ্চিত, কুলসুম কিছুতেই ওই গলায় গাইতে পারে না। চেরাগ আলির গলা মোটা এবং একটু রুখা, মাঝে মাঝে কর্কশও বটে। ... কুলসুমের গলা তো রীতিমতো মিষ্টি, তার পক্ষে কি 'গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়' গাইবার সময় শ্রোতাকে ওইভাবে ধমক দেওয়া সম্ভব–চেরাগ আলি নির্ঘাত কাল ভর করেছিলো কুলসুমের ওপর। ... কিন্তু কেরামতের ধারণা নস্যাৎ করে দেয় বৈকুণ্ঠ, একটু রাগ করেই সে বলে, 'ইগলান কী কথা কও? আসর করবি কিসক? মাচার উপরে ফকিরেক হামরা দেখনু না? ফকির না আসলে দোতারা বাজালো কেটা? ... হামার চোখ এখনো লষ্ট হয় নাই, বুঝলা? ... হামি বলে লিজের চোখে দেখনু, মাচার উপরে খ্যাতা মুড়ি দিয়া বস্যা মাথা ঝুঁকায়া ঝুঁকায়া ফকির গান করিচ্ছে। (পৃ. ৪৮৬-৪৮৭)

পাকুড় গাছ মুনসির আরশ, এমন বিশ্বাস গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দাদের মধ্যে বহুদিন ধরে প্রচলিত। কিন্তু শরাফত মণ্ডলের বড় ছেলে আবদুল আজিজ কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানের গাছপালা কেটে ফেলায় সেটিও সবার অগোচরে কাটা পড়ে। সেকারণেই সেখানে উপস্থিত হয়ে তমিজের বাপ পাকুড় গাছের দেখা না পেলে এ ঘটনা জানাজানি হয়। ফলে গ্রামবাসীর মনে এ বিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, মুনসির ক্রোধ তাদের ওপর অচিরেই

বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হবে। শুধু অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামবাসীই নয়, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, শহরে চাকরিজীবী আবদুল আজিজও তার পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য এ ঘটনাকে দায়ী করে–– 'আবদুল আজিজও এসে বড়ো উদ্বিগ্ন হয়। মুনসির আসন যদি তারা কেটে থাকে তো সেটা ভালো কথা নয়। তার বেটা মরল আর বছর, এ বছর তার সম্বন্ধী হলো খুন। খঞ্জনদিঘির পীরসাহেবের হিসাব মতো আহসান যদি কলকাতায় কোনো ঘরে বন্দি হয়ে থাকে তো এই মুনসির বদদোয়াতেই এখন মারা পড়বে হামিদার স্বপ্নে দেখা সেই সিঁদুর মাখা খাঁড়ার ঘায়ে। হামিদা আজকাল যা শুরু করেছে, এই পাকুড়গাছ সরে যাওয়ার কারণেই সে আবার বদ্ধ উন্মাদ হয়ে না পড়ে' (পৃ. ৫৭৪)।

এ উপন্যাসে লোকবিশ্বাসের ভিন্নতর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কুলসুমের মনস্তত্ত্বে। তার মনোবিকৃতির মূলে রয়েছে মৃত ব্যক্তির জীবিত প্রিয়জনের ওপর ভর করে ফিরে আসা সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস। বৃদ্ধ স্বামী তমিজের বাপের প্রতি তার প্রণয়সিক্ত ভালোবাসার প্রকাশ দাম্পত্যজীবনে পরিলক্ষিত হয়নি। তবু যুবতী এ নারী তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। কিশোরী বয়সে তার সঙ্গে তমিজের বাপের বিয়ে হয়। সন্তানহীন কুলসুমের সাংসারিক হালচাল ছিল গ্রামের সাধারণ আর দশটি পরিবারের গৃহবধূর মতোই। আকস্মিকভাবে কাৎলাহার বিলসংলগ্ন চোরাবালিতে গভীর রাতের অন্ধকারে পড়ে গিয়ে তমিজের বাপ মৃত্যুবরণ করে। এরপর থেকে কুলসুমের মনোলোকে তমিজের বাপ নতুনরূপে আবির্ভূত হয় তার কল্পনায়, অলীক প্রত্যক্ষণে। পুরো ব্যাপারটিই তার মনোবিকারগ্রস্ততা তথা সিজোফ্রেনিয়ার নির্দেশক। তমিজের বাপের মৃত্যুর পরপর কুলসুম তমিজের মধ্যে তার বাপকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল। কিন্তু একপর্যায়ে তমিজের আকস্মিক পিতৃবিয়োগজনিত ঘোর কেটে গেলে তাকে কুলসুম জানায়, তার স্বপ্নে তমিজের বাপ প্রায়ই আসে। অচিরেই কুলসুমের মানসিক অবস্থার আরো অবনতি হলে সে তমিজকে জানায়, তমিজের বাপ প্রতি রাতেই তার ঘরে আসে। তমিজ কুলসুমের অন্ধকার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তার আলাপ শুনে একপর্যায়ে ভীত হয়। অশরীরীরা আলো সহ্য করতে পারে না, অন্ধকার তাদের পছন্দ, এ লোকবিশ্বাসেরই রূপায়ণ ঘটেছে উক্ত ঘটনায়। অবশেষে কালাম মাঝি এবং কেরামত, উভয়েই কুলসুমের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করলেও তমিজের বাপের উপস্থিতি সম্পর্কিত কুলসুমের বয়ান তাদেরকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এর জের ধরে কালাম মাঝি কুলসুমকে হত্যার দায়ে কেরামত আলিকে ফাঁসায়। এছাড়াও এ উপন্যাসের '৪' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, তমিজের বাপ সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় ছেলের ডাকে চমকে যায়। কেননা, আগের সন্ধ্যায় মাঝিপাড়ার কিশোর বুলুর মৃত্যুর পর সে তাকে কবর দেয়ার কাজে গোরস্তানে ব্যস্ত ছিল। এরপর প্রবল ক্লান্তিবশত বাড়ি ফিরেই তমিজের বাপ ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সে বাড়ি ফেরার পথে গোরস্তানের খেজুর গাছের ডাল সঙ্গে আনে। কারণ, 'গোরস্তানের খেজুর ডালের গুণ অনেক, এটা সঙ্গে থাকলে রাত্রে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না, এর শক্তি আগুন ও লোহার পরেই। রাতে কাৎলাহার বিলের সিথানে পাকুড়তলায় যাবার সময় এটা সঙ্গে রাখা ভালো' (পৃ. ৩৬২)। লোকবিশ্বাস যে ব্যক্তির মনোলোকে বিশেষ ভূমিকা রাখে, তা প্রতীয়মান হয় নিচের দৃষ্টান্তে––

> টাউনের কালীবাড়ির জবাফুল ধোয়া মায়ের পাদোদক ভক্তি করে খেতে পারলে মরা মানুষও লাফ দিয়ে ওঠে। ফুলজানের বেটার কিছু হলো না। হবে কী করে?– সব নষ্ট করলো ওই শালা কলুর বেটা গফুর। গোলাবাড়ি হাটে একদিন হুরমতুলাকে সে শুনিয়ে দিয়েছে, 'মাঝির বেটা তোমার বেটির পয়সা আর ফেরত দিছে! আবার হিন্দুর ঠাকুরের পানি লিয়া আসিছে? আরে, হিন্দুর ঠাকুর, তাঁই মোসলমানের বালামুসিবত আসার করবি কিসক?' এটা শুনে ফুলজানের মনটা বিষিয়ে উঠেছে, পাদোদকে তার আর ভক্তি রইলো না। বেটার ব্যারাম সারে কী করে? (পৃ. ৪১৪)

কোনো ব্যক্তি কাজে সাফল্য অর্জন করলে ধরে নেয়া হয় দৈবী শক্তি তার প্রতি সহায় ছিল। এরূপ বিশ্বাস বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে বহুল প্রচলিত। '১৩' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মাঝির ছেলে হয়েও তমিজ শরাফত মণ্ডলের বর্গাচাষের ধানী জমিতে কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে সমর্থ হলে তা দেখে "আলের ওপর দাঁড়িয়ে শমশের পরামাণিক সেদিন আর চোখ ফেরাতে পারে না। খুশিতে সে ডগমগ, 'মাঝির বেটা, তুই কী করিছু রে? তোর হাতের বরকত আছে বাপু' " (পৃ. ৪১৩)। এছাড়া, নতুন ধান ঘরে তোলার পর তা গুড়ো করে যত দ্রুত সম্ভব পিঠা ও অন্যান্য খাবার তৈরি করে পাড়া-প্রতিবেশী, স্বজনদের পরিবেশন করার লোকবিশ্বাসও গ্রামীণ সমাজে

প্রচলিত। তাই '২০' পরিচ্ছেদে তমিজ নিজের ভাগের ধান ঘরে আনলে তা দেখামাত্রই উল্লসিত কুলসুম জানায়, 'কালাম চাচার ঢেঁকিত যাই। আজই তোমাগোরে পিঠা খাওয়ামু। ধান ঘরত তুল্যাই পিঠা খির না হলে ওই ধান বরকত দিবি না গো।' (পৃ. ৪৬৯)

২. লোকসংস্কার-- গ্রামীণ লোকমনস্তত্ত্ব অনুধাবনে লেখকের পারদর্শিতার দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসের আদ্যন্ত লক্ষণীয়। লোকসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের আচরণ, চালচলন ও ব্যবহারের যে স্বকীয় পরিচয় অকপটে ফুটে ওঠে, তা থেকে তাদের সমষ্টিচেতনার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের অভ্যাস, জীবনধারণের বিশিষ্ট রীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতির ওপর লোকসংস্কারের প্রভাব অনস্বীকার্য। এমনকি তাদের ভাষিক পরিমণ্ডলেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বপ্ন[১১১] সম্পর্কে গ্রামীণ লোকসমাজের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এ উপন্যাসে দীর্ঘ পরিসরে ভাষ্যরূপ পেয়েছে। উপন্যাসের নামকরণের সঙ্গে এর রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা, যদিও তা বহুলাংশেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গসংলগ্ন, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার বাসিন্দাদের ধর্মীয় পরিচয় ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা। নিঃসন্দেহে এ উপন্যাসে লোকসংস্কারের বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যে স্বপ্ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জোরালো ভূমিকা রেখেছে। চিন্তাচেতনায় পশ্চাৎপদ, দৈবনির্ভর, প্রকৃতিসংলগ্ন লোকগোষ্ঠীর বাসিন্দাদের নিকট স্বপ্ন ব্যাখ্যাতীত এমন এক প্রসঙ্গ, যাকে কোনোভাবেই এড়িয়ে চলা যায় না। বরং তারা স্বপ্নে যা দেখে, এর সঙ্গে নিজেদের জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনাকে যুক্ত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নের অর্থ যেহেতু রহস্যাবৃত, ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, রূপক ও প্রতীকী অর্থ আরোপের মাধ্যমে এর বোধগম্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তাই প্রায়শই লোকমানুষের নিকট এটি হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তার বিষয়। একারণেই ব্যক্তির মনোলোকে সন্নিহিত আবেগ, সংবেদনা, কামনা-বাসনা, ভয়, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, কোনো দুঃসহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি, শারীরিক যন্ত্রণা বা অসুস্থতা এবং বাস্তব জীবনে নিত্যদিন ঘটে চলা অজস্র ঘটনা ও এর প্রতিক্রিয়া মিলেমিশে ব্যক্তির অবচেতনলোকে যে ছাপ ফেলে, সেটির মর্মার্থ অনুধাবন জটিল হয়ে পড়ে। এ উপন্যাসে স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে চেরাগ আলির অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা এমনকি তার নিজ গ্রাম মাদারিপাড়া ও যমুনার তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে আস্থা অটুট। ফকিরালির অংশ হিসেবেই চেরাগ আলি অর্থের বিনিময়ে স্বপ্ন দর্শনকারীর নিকট এর বোধগম্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। এ কাজে সে অনুসরণ করে জরাজীর্ণ একটি খোয়াবনামাকে, যার প্রতি গ্রামবাসীর অসীম কৌতূহল এবং অতিপ্রাকৃতিক শক্তিজনিত বিশ্বাস রয়েছে। কেরামত আলির দৃষ্টিকোণ থেকে এ খোয়াবনামার বিবরণ উপন্যাসের '৩১' পরিচ্ছেদে বিবৃত--

> বইয়ের পাতা উল্টায় আর কেরামত আলি দেখে, কোনোকানে কোনো শোলোকই নাই। খাকি রঙের কাগজে বইয়ের মলাট সেলাই করা, সেখানে কার কাঁচা হাতের লেখা, 'খাবনামা ফালনামা ও তাবির।' ... এটার ভেতরে ছাপা কোনো পাতা নাই। অর্ধেকের বেশি পাতা জুড়ে চৌকোণা চৌকোণা দাগ, সেইসব বর্গক্ষেত্রও আবার করা হয়েছে ছোটো ছোটো ঘরে। একেকটি ঘরে একেকটি আরবি অক্ষর। নাপাক শরীরে আরবি লেখা ছুঁয়ে ফেলায় কেরামতের একটু একটু ভয় করে, কিন্তু এখন অজু করতে গেলে বইটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। সে আস্তে আস্তে পাতা ওল্টায়, জীর্ণ পাতা, ধরতে হয় সাবধানে, একটু এদিক ওদিক হলেই পাতা ছিঁড়ে যাবে। এরপর গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে নানারকমের খোয়াবের বিবরণ। কোন খোয়াব দেখলে কী হতে পারে, এর ফলাফল কী, খোয়াবের তাবির–সব বুঝিয়ে বলা। (পৃ. ৫৪৯)

গ্রামবাসী স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন দেখে চেরাগ আলির নিকট এর অর্থ জানতে ও পরামর্শের জন্য এলে সে সেই বিবরণ শুনতে শুনতে খোয়াবনামার পাতা উল্টে মাটিতে অজস্র রেখা কেটে এর ব্যাখ্যা দেয়ার পাশাপাশি করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিত। আবার অর্থসংকটে পড়লে দোতারা নিয়ে সে গোলাবাড়ির হাটে গান পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নানা রঙের তালিমারা ঝোলা থেকে খোয়াবনামা বের করে তাদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তা ব্যাখ্যা করত। বাজারের প্রচলিত খোয়াবনামার ইঙ্গিতের সঙ্গে তার ব্যাখ্যার কোনো মিল ছিল না। স্বপ্ন দর্শনকারী কখন

স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্নে কী দেখেছে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আনুষঙ্গিক তথ্যাদি কিছুটা জেনে বা না জেনেই সে অভিমত জানাত--

> খোয়াবে খারাপ কিছু দেখলেই চেরাগ আলির কাছে ছুটে এসেছে মানুষ, 'ও ফকির, কও তো, পাছারাতে দেখলাম, হামাগোরে কুয়ার পানি ক্যামা গরম ঠেকিছে। বালটি দিয়া তুল্যা গাও ধোমো, পিঠোত পানি ঢালিচ্ছি, তামান পিঠ বলে পুড়্যা গেলো রে। এই খাবের মাজেজা কী, কও তো বাপু।' ঝোলা থেকে একমাত্র বইটা বার করে চেরাগ আলি আস্তে আস্তে পাতা ওলটাতো। প্রতিটি পৃষ্ঠা ওলটাবার সঙ্গে জিভে আঙুল ছুঁয়ে বলতো, 'স্বপন তুমি কখন দেখিছো কও তো বাপু।' ঠিক লগ্নটি বলতে বলতে স্বপন-দেখা মানুষটা আমতা আমতা করলে তাকে করা হতো পরবর্তী প্রশ্ন, 'পাছারাতোত তুমি শুছিলা কোন কাত হয়া?' পাশে বই রেখে বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই ঘরের সামনে ছোটো উঠানে কাঠি দিয়ে চৌকো চৌকো দাগ দিতে দিতে সে একরকম প্রশ্ন করেই যেত এবং পঁচিশটা প্রশ্ন করে তার অর্ধেকেরও জবাব না পেয়েও স্বপ্নের মাজেজা বলে দিতো। (পৃ. ৩৫৩)

বছরের অন্য সময় এ পেশায় চেরাগ আলির অর্থসংকট কিছুটা লাঘব হলেও বর্ষাকালে তাকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, এ সময়ে ছাপরা ঘরের বাইরে গিয়ে ফকিরালি চালানো সম্ভব নয়। আবার অভাবের কারণে ভাদ্র মাসে আউশ ধান কাটার পূর্ব পর্যন্ত গ্রামবাসী ভিক্ষা দিতে চায় না। অনটনের দিনে মানুষ স্বপ্নের অর্থ জানতে তার কাছে আসে না। তবে নতুন ধান ঘরে ঘরে উঠলে এ পরিস্থিতি বদলে যায়। সে যে নিতান্তই জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বিপদগ্রস্ত, সংকটাপন্ন ব্যক্তির দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়, তা তার নাতনি কুলসুম বেশ ভালোই জানত। এমনকি, এক পর্যায়ে কেরামতও বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। তবে সে ভাবত, মুনসির অনুচর হিসেবে চেরাগ আলি অতিপ্রাকৃত শক্তির গুণে মানুষের ভূত-ভবিষ্যত গণনা করতে সমর্থ। চেরাগ আলি বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল। যেমন-- কাজলের স্বপ্ন দেখলে ছেলেমেয়ে বাপমায়ের আশা পূর্ণ করে (পৃ. ৩৪২)। কুয়ার পানি স্বপ্নে গরম অবস্থায় থাকলে নাকি তার ভাগ্যে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। 'খোয়াবে কেউ একটা গোরু দেখলো, গরুটা মোটাতাজা হলে তার মানে এক রকম, আবার রোগা হলে মানে অন্য রকম। গোরু জবাই হতে দেখলে তাবির পাল্টে যাবে। স্বপ্নে কাউকে কুকুর তাড়া করেছিলো শুনে চেরাগ আলি হাসতো, লোকটার শত্রু জব্দ হবে। আবার শুধু কুকুর দেখা মানে কঠিন বিপদের আলামত' (পৃ. ৩৮৮)। যমুনা নদীর প্রবল ভাঙনের তোড়ে মাদারিপাড়া যখন নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম, এক রাতে চেরাগ আলির জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলে সামাদ ফকির ভোররাতের স্বপ্নে যমুনার ঘোলা পানিতে নিজের ডুবে যাবার স্বপ্ন দেখে। চেরাগ আলি এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাকে জানায়, পানিতে ডুবে যাবার স্বপ্ন দেখার অর্থ খুব খারাপ। এ স্বপ্ন রোগের ইশারা নির্দেশক। এমনকি স্বপ্নদর্শনকারীর অন্যান্য বিপদ, কারাবাস ঘটবারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বৈকুণ্ঠ চেরাগ আলিকে গভীর রাতে দেখা স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানায়। সে সকাল দশটা-এগারোটার দিকে মশারির ভেতরে বা বাইরে বসা অবস্থায় খই খাওয়ার ঘটনা বললে চেরাগ আলি ধৈর্যসহকারে তা শুনে জানায়--

> খৈ খাবার স্বপ্নে বৈকুণ্ঠের ধনদৌলত রোজগারের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো, একই স্বপ্নে মশারির ভেতর ঢুকে বৈকুণ্ঠ তার বিনাশ তো ঘটিয়েছেই, এমন কি বেশ সংকটেই পড়েছে। ... মশারির স্বপ্ন আসলে কবরের ইশারা,-কথাটা বলতে বাধো বাধো ঠেকছিল চেরাগ আলির। এটা সে সরাসরি জানায় কেবল তমিজের বাপকে, তাও তিন দিন পর গোলাবাড়ি হাটে। ওখানেই বৈকুণ্ঠকে ডেকে ফকির শুধু বললো, 'বৈকুণ্ঠ তোর খোয়াবের মাজেজা ভালো লয় রে! পাঁচ আনা পয়সা মুনসির নামে মানত দেওয়া লাগবি।' (পৃ. ৩৯০-৩৯১)

চেরাগ আলির খোয়াব বা স্বপ্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা তার নাতনি কুলসুম ও নাতজামাই তমিজের বাপকেও প্রভাবিত করেছিল। তারাও চেরাগ আলির মৃত্যুর পর কখনো কখনো এ কাজ করত, নগদ অর্থের বিনিময়ে। বৈকুণ্ঠ তমিজের বাপের কাছে ইদুঁরের ধান খাওয়ার স্বপ্ন দেখার কথা জানালে কুলসুম তা শুনে প্রত্যুত্তরে বলেছিল--

> ইন্দুরে খাইলো ধান বড়ো কুফা বাত।

জানিয়া রাখিও বান্দার কমিলো হায়াৎ ॥ (পৃ. ৫৬১)

তবে এ উপন্যাসে ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনকেন্দ্রিক মনোজটিলতার পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে শরাফত মণ্ডলের বড় ছেলে আবদুল আজিজের স্ত্রী হামিদার মাধ্যমে। তার একমাত্র ছেলে হুমায়ুন দুই দিন ধরে প্রবল জ্বরে ভুগলে রাত জেগে হামিদা তার সেবা করতে করতে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর সে স্বপ্নে লোবানের গন্ধ পায়। স্বাভাবিকভাবেই ছেলের মৃত্যুর আশঙ্কায় সে ভীত হলে তার সামনে সাদা ধবধবে কাপড়পড়া, গলায় শেকলজড়ানো ঘোলাটে লাল চোখের অধিকারী কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একজন মানুষ হাজির হয়। হামিদার ধারণা হয়, সে আগন্তুককে ইতঃপূর্বে কোথাও দেখেছে। খসখসে কণ্ঠে সে হামিদাকে বলে, ‘আর কদ্দিন? বেটাকে এখন আরাম দে, আরাম দে!’ (পৃ. ৪৩৬)। হামিদার নাকে লোবানের গন্ধ তীব্রতর হতে থাকলে হঠাৎ লোকটির দিকে তাকিয়ে সে বুঝে ওঠে, তার পরনে কাফনের কাপড় জড়ানো, যেটিতে মাটি লেগে রয়েছে। তখন আকস্মিকভাবেই হারিকেন নিভে গেলে লোকটি গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে অন্তর্হিত হয়। সেই মুহূর্তে হামিদার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। পরদিন তার নিকট থেকে এ বৃত্তান্ত শুনে শরাফত মণ্ডলের ছোট স্ত্রী ধারণা করে, চেরাগ আলিই নিরুদ্দেশ অবস্থায় এভাবে হামিদার স্বপ্নে দেখা দিয়ে হুমায়ুনকে মৃত্যুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানতে আবদুল আজিজ তমিজের বাপের দ্বারস্থ হলেও সে এ ব্যাপারে গরজ দেখায়নি। ফলে কুলসুমকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে হয়। সে হামিদার কাছে গিয়ে তার পূর্বরাতে দেখা স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে এবং চেরাগ আলি পরিবেশিত গানের সঙ্গে নিজের পরিবেশিত গান মিলিয়ে এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হলেও হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটায় এর প্রতিকার সম্ভব হয় না। তবে হুমায়ুনের চল্লিশার দিন গ্রামবাসীর আহারের আয়োজনে তমিজের বাপকে দাওয়াত খেতে দেখে হামিদা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায় এবং তার স্বামী ও মাকে জানায়, সে-ই নাকি হুমায়ুনের মৃত্যুর পূর্বরাতে হামিদার স্বপ্নে হাজির হয়ে তার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তমিজের বাপ সম্পর্কে গ্রামবাসীর ভাবনায় অতিপ্রাকৃত শক্তি, তার পূর্বপুরুষ তথা দাদা বাঘাড় মাঝির কেরামতির পাশাপাশি ভীতিবোধও এসব ঘটনায় পল্লবিত হতে থাকে। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন শরাফত মণ্ডল ও আবদুল আজিজ বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যাকালে নির্জন গোরস্তানসংলগ্ন বাঁশঝাড়ে তমিজের বাপকে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ‘তমিজের বাপ কি আসলেই তমিজের বাপ? লোকটা কে?–ভয়ে আবদুল আজিজ থরথর করে কাঁপে’ (পৃ. ৪৪৬)।

হামিদার স্বপ্নদর্শনকেন্দ্রিক জটিলতা ছেলে হুমায়ুনের মৃত্যুর পর নতুন মাত্রা পায় কলকাতায় ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তার বড়ভাই আহসানের হিন্দু উগ্রপন্থীদের ছুরির আঘাতে নিহত হওয়ার ঘটনায়। আবদুল আজিজ এ ঘটনার সময় তার সঙ্গে থাকলেও কিছুই করতে পারেনি। কেননা, প্রাণের ভয়ে তখন চারপাশের বিক্ষুব্ধ পরিবেশে সকলেই বিপন্ন অবস্থায় ছুটছিল নিজেকে বাঁচাতে। সে বাড়ি পৌঁছেই তমিজের বাপকে খবর পাঠায় আহসানের মৃত্যু সম্পর্কে হামিদার অবিশ্বাসের প্রতিকার করতে। কেননা, তার ধারণা, আহসান মারা যায়নি। ‘হিন্দুরা তাকে হয়তো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, কিংবা সে পালাতে গিয়ে আটকা পড়েছে কোথাও’ (পৃ. ৫৬৩)। এমতাবস্থায় তমিজের বাপকে দিয়ে আহসানের ভবিষ্যত গণনার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু তমিজের বাপ নিতান্তই খামখেয়ালিবশত এ প্রস্তাবে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে হামিদা জানায়, ‘কয়েকদিন ধরে বাড়ির পশ্চিমদিকে খালি কাক ডাকে, খালি কাক ডাকে। তখনই তার মনে হয়েছে, কোথাও কী সর্বনাশ হচ্ছে। কিন্তু মিয়াভায়ের কথাটা তার একবারো মনে হয় নি। তবে তার মিয়াভাই নামাজরোজা করা মানুষ, সে অপঘাতে কখনোই মরতে পারে না। ... তমিজের বাপ তো দুনিয়ার আর আখেরাতের অনেক কথা জানে। সে কি একটু গোনাগাথা করে মিয়াভাইয়ের এখনকার অবস্থাটা বলে দিতে পারে না?’ (পৃ. ৫৬৪)। তমিজের বাপ অমাবস্যার পূর্বে এ ব্যাপারে কিছু বলতে আপত্তি জানায়। কেননা, অমাবস্যার রাতে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়তলায় মুনসির দেখা পাওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়ে। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে আবদুল আজিজ একপর্যায়ে খঞ্জনদিঘির ফকিরের দ্বারস্থ হয়ে শোনে, আহসান মারা যায়নি। দক্ষিণের (কলকাতার) কোনো বড় শহরে ছোটো গলির একটি ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। এর ফলে হামিদার মধ্যে এ বিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, আহসান জীবিত রয়েছে। তার মনোবিকারও এসব ঘটনার সূত্রেই বাড়তে থাকে। এর

দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পরবর্তী পনের দিনে অন্তত একবার করে হলেও এ দুঃস্বপ্ন দেখার ঘটনায়-- 'মোটাসোটা কয়েকটা টিকিওয়ালা লোক খালি গায়ে খাটো ধুতি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আহসানকে ঘিরে, তাদের সর্দারের কপালে লাল চন্দন লাগানো, হাতে সিঁদুর লাগানো খাঁড়া। খাঁড়াটা ঝুলছে আহসানের মাথার ওপরে, তার কোপ নিচে পড়তে শুরু করতেই, আহসানের গলায় কি মাথায় ঘা পড়ার আগেই হামিদার ঘুম ভেঙে যায়' (পৃ. ৫৬৮)। সে এরপর অসংলগ্নভাবে চিৎকার ও কান্নাকাটি করতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে সে দুঃস্বপ্নে আহসানের মুখের সঙ্গে হুমায়ুনের মুখের মিল আবিষ্কার করে এবং সিদ্ধান্তে স্থিত হয়, 'মামা ভাগ্নে এক সঙ্গে, এমন কি একই শরীরে থাকলে সিঁদুরমাখা খাড়াটা হয়তো ঠেকাতে পারবে' (পৃ. ৫৬৯)। জাগ্রত অবস্থায় মৃত ছেলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে কখনো বাড়ির সকলের চোখের আড়াল হয়ে গোরস্থানে যাবার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে তার ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। খেয়ালের বশে কখনো কখনো শীতের সন্ধ্যাতেও বহুক্ষণ ধরে সে গোসল করে। রাতের খাবার না খেয়েই হামিদা শুয়ে পড়ে, ঘুমের ভেতর ভাই আর মৃত ছেলের খোঁজ জানতে। হামিদার অপ্রকৃতিস্থ আচরণ দিনদিন বেড়ে যাওয়ায় বাড়ির মানুষ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রামে এসব ঘটনা কানকথা, রটনার মাধ্যমে কদর্য রূপে পরিবেশিত হয় মানুষের মুখে মুখে। এ উপন্যাসের '৪৫' পরিচ্ছেদে হামিদাকে শেষবারের মতো উপস্থিত হতে দেখা যায় সম্পূর্ণ উন্মাদ রূপে। দেশবিভাগের পর আবদুল আজিজ কলকাতায় নতুন বাড়ি কিনলে সেখানে অবস্থানরত হামিদা মৃত ছেলে ও ভাইয়ের শোকে মেহমানদের সামনে অসংলগ্ন আচরণ করে। এভাবেই এ উপন্যাসে হামিদার মনোবিকৃতিতে স্বপ্ন সম্পর্কিত বৃত্তান্তকে অবলম্বন করা হয়েছে। তবে, তমিজের বাপ বা চেরাগ আলি সম্পর্কিত হামিদার বিভিন্ন স্বপ্ন দেখার ভিত্তিভূমি নিঃসন্দেহে মুনসি বয়তুল্লা শাহ সম্পর্কিত কিংবদন্তি। লোকমুখে বহুদিন ধরে প্রচলিত এসব কাহিনীর সঙ্গে চেরাগ আলি ও তমিজের বাপের সম্পর্কিত নানা ঘটনা ও বৃত্তান্ত মিলেমিশে হামিদার মনোলোকে যে বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল, এরই ধারাবাহিকতায় সে ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহের রূপায়ণে লেখক বিশেষ কৌশলে লোকমানসে সন্নিহিত স্বপ্ন সম্পর্কিত বিবিধ লোকসংস্কারকে গ্রন্থিত করেছেন।

নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক পরিচয় যে আর্থ-সামাজিক গ্রামীণ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র ভূমিকা পালনে তাদের উদ্বুদ্ধ করে, এর দৃষ্টান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে লোকসংস্কারের জোরালো ভূমিকা অনস্বীকার্য। উপন্যাসের '২' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, তমিজের বাপের সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্ত্রী কুলসুমের বয়সের বিশাল ব্যবধান রয়েছে। কুলসুম তার সৎছেলে তমিজেরই বয়সী। দাম্পত্যজীবনে তমিজের বাপের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার পরিচয় সমগ্র উপন্যাসেই অনুপস্থিত। নিছক আশ্রয় লাভ এবং ভরণপোষণের প্রয়োজনেই সম্ভবত, সে এ বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। তমিজের বাপের কুলসুমকে 'তুই' সম্বোধন, কোনো কারণে রেগে গেলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শারীরিক প্রহার প্রভৃতি এদেশের গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার অতি পরিচিত রূপ। অন্যদিকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখনো যদি তমিজের বাপের দেহে ঘুমের ঘোরে বা কোনো কাজে ব্যস্ত থাকায় অমনোযোগিতাবশত কুলসুমের পা লাগে, তখন লোকসংস্কারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্র নারীকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট থাকে। এ দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয় কুলসুমের প্রতি তমিজের বাপের রূঢ় আচরণে। নারী-পুরুষের আন্তঃসম্পর্কে বিদ্যমান অপরতাবোধ[১১২] এ ধরনের লোকসংস্কারকে বহুকাল ধরেই সমাজে টিকিয়ে রেখেছে। তমিজের বাপ ঘরের ভেতরের সংকীর্ণ মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমায়। ফলে মাচা থেকে নামতে গিয়ে কুলসুম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, 'ওই হাড়গিলা শরীরে তিল পরিমাণ জায়গাতেও তার পা ঠেকে তো সর্বনাশ, বুড়া একটা হুলুস্থুল কাণ্ড করে বসবে।' (পৃ. ৩৪৩) এরপর তার স্মৃতিচারণায় ভাষ্যরূপ পায় বিয়ের দুই বছর পর এক সন্ধ্যারাতে তমিজের বাপকে ভাত দিতে গিয়ে কুলসুমের নাজেহাল হওয়ার বৃত্তান্ত। ট্যাংরা মাছ দিয়ে গোগ্রাসে ভাত খেতে ব্যস্ত তমিজের বাপ কুলসুমের কাছে একটি পেঁয়াজ চায়। কুলসুম সেটি এনে তাকে দিতে উপুড় হলে তমিজের বাপের ডান হাতের কনুইয়ে তার বাম পা লাগে। সানকি থেকে সামান্য ভাত ছলকে মেঝেতে পড়লে সে তখনই কুলসুমকে প্রহার করতে থাকে। তমিজ তার বাপকে মদদ দিতে শুরু করে ভৎর্সনার পালা, 'বাজানের ভাতের থালিত তুমি

পাও দেও? ইটা কেমন কথা গো? মুখের রন্ন তুমি পাও দিয়া ঠেলো? নক্ষীর কপালেত তুমি নাথি মারো? কেমন মেয়ামানুষ গো তুমি?' (পৃ. ৩৪৩-৩৪৪)। স্বামী ও সৎছেলের দ্বারা লাঞ্ছিত কুলসুম জেদের বশে রাতে ভাত না খেয়েই বিছানায় শুলে তমিজের বাপ তাকে জানায়, 'মেয়ামানুষ, তার এতো কোদ্দ ভালো লয়, ভালো লয়। আজ পাছাবেলা থ্যাকা খলবল, খালি খলবল। নাফপাড়া মেয়ামানুষের কপালেত দুঙ্কু থাকে, সংসার ছারেখারে যায়' (পৃ. ৩৪৪)।

গ্রামীণ লোকসমাজে জ্বিন সংক্রান্ত লোকসংস্কার বহুল প্রচারিত। এ উপন্যাসে মুনসি বয়তুল্লা শাহের অপঘাতে মৃত্যুর পর জ্বিন হয়ে কাৎলাহার বিল সংলগ্ন পাকুড়গাছে অধিষ্ঠানের কিংবদন্তির মূলেও এ লোকবিশ্বাস ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গত, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত লোকবিশ্বাস যখন সমষ্টিমানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পরিণাম নির্দেশ করে, তখন এটি লোকসংস্কার হিসেবে বিবেচিত হয়। মুনসির জ্বিন হয়ে কারো ওপর নজর দেয়া বা কারো কোনো ক্ষতি হলে এজন্য মুনসিকেই দায়ী করার মানসিকতা গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার লোকসমাজে বিদ্যমান, যা উক্ত সংস্কারের প্রভাবজাত। গোরস্তানের শিরীষ গাছ, পিতরাজ গাছ, শ্যাওড়া গাছে জ্বিন-ভূত বাস করে, এরূপ লোকসংস্কারও গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচলিত। তাই মাদারিপাড়ার বাসিন্দা চেরাগ আলির স্মৃতিচারণায় এ ভৌতিক অনুষঙ্গ আতঙ্ক ছড়াত–– 'পুরনো আমলের গোরস্থান। একটা মস্ত শিরীষ গাছ, কয়েকটা পিতরাজের গাছ আর দুটো শ্যাওড়া গাছ। জিন আর ভূতের আস্তানা। ফকিরগুষ্টির কেউ মরলে গোর দেওয়া হতো ওখানেই; কিন্তু দাফন সেরেই জ্যান্ত মানুষগুলো তড়িঘড়ি করে ঘরে ফিরতো। পরে গোর জিয়ারত করতে যাবার সাহসও কারো হয় নি' (পৃ. ৩৫৪)। এমনকি সেখানে থাকতে সে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে হাঁটেনি। কারণ, লোকসমাজের রটনা হলো, বাঁশঝাড় জ্বিন-ভূত-অশরীরীর আসন। সে যমুনার করালগ্রাসে বসতবাড়ি হারিয়ে অবশেষে গিরিরডাঙা গ্রামের কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ে আশ্রয় পায়। তার নাতনি কুলসুম বাঁশঝাড়কে ভয় পেলেও আশ্রয়গ্রহণের তাগিদে তাকে সাহস যোগাতে চেরাগ আলি জানায়, 'এই জায়গার বরকত দেখিছিস?' হামাগোরে পরদাদারা এটি অ্যাসা আস্তানা লিছিলো। জ্ঞাতিগুষ্টির কতোজন এটি চোখ মুঞ্জিছে, তানাগোরে রুহ এখনো এটিই ঘোরাঘুরি করে রে বুবু, এই জায়গা জি সি জায়গা লয়' (পৃ. ৩৫৭)। '১২' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, কাদেরের মতো শিক্ষিত, সচেতন যুবকও এ সংক্রান্ত সংস্কারের প্রভাবে আচ্ছন্ন। শরাফত মণ্ডলের রায়ত হুরমতুল্লার নাতি তথা ফুলজানের অসুস্থ ছেলে ডাক্তারের কাছে যায় কালাজ্বরের চিকিৎসার জন্য। সেখানে তাকে দেখে কাদের চমকে ওঠে। তার মনোলোকেও যে গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ভৌতিক লোকসংস্কারের প্রভাব কার্যকর, তা প্রকাশিত হয়েছে স্বগতোক্তিতে– 'শিশুটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে কাদেরের গা শিরশির করে। অনেকদিনের কালাজ্বর ও আজকের প্রবল জ্বরে সে পেয়েছে একটা ভূতের চেহারা। কে জানে তার ওপর কারো আসর ঠাসর পড়লো কি-না। মোষের দিঘিতে কোদালের কোপ পড়েছে, মহাদেব কি আর কোনো দেও তার মুখে ছাই ছিটিয়ে দিলো নাকি? না-কি কাৎলাহারের খানদানি বাসিন্দা চোখ দিলো তার ওপর? এখন এই ভূতের চিকিৎসা করার অনুরোধ সে ডাক্তারবাবুকে করে কোন আক্কেলে?' (পৃ. ৪১১)

অভিশাপ দেয়ার দৃষ্টান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। যদিও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে লোকমানসে সংশয় থেকেই যায়, তবু কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিপন্নতার জন্য দায়ী ব্যক্তির অনিষ্টকামনায় অভিশাপ উচ্চারণ করে। এ উপন্যাসের '২৭' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, শরাফত মণ্ডল কাৎলাহার বিল থেকে বাঘাড় মাছ চুরির অপবাদে তমিজের বাপকে খড়মপেটা করার পাশাপাশি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। কারণ, জমিদারকে খাজনা দিয়ে সে বিলের স্বত্ব গ্রহণ করেছিল। অথচ তমিজের বাপ এ মাছ ধরেছিল মানাস নদী থেকে। স্বভাবে হাবাগোবা ধরনের এবং কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ তমিজের বাপ এর প্রতিবাদ করতে পারেনি। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে অসুস্থ অবস্থায় সে বাড়ি ফিরলে কুলসুম এ বৃত্তান্ত জেনে শরাফত মণ্ডলকে অভিশাপ দেয়– " 'এই সাদাসিদা আবোর মানুষটাকও বলে খড়ম দিয়া মারে? বুড়া শকুন, মণ্ডলের হাতপাও খস্যা খস্যা পড়বি, বুড়া শকুন কুঠ হয়া মরবি, তামাম গাওত তর কুঠ হবি।' শরাফত মণ্ডলের হাতপা জুড়ে কুষ্ঠ ছড়িয়ে ফেলার জন্য অনির্দিষ্ট ও অপরিচিত

কর্তৃপক্ষের কাছে সে বেশ কয়েকবার আবেদন জানায়। শেষে কুষ্ঠের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ মণ্ডলের শাস্তির জন্য যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় কোনো অপঘাতে সে তার আশু মরণ দাবি করে, 'তেরাত্তির যাবি না, তোমরা শোনো, এক রাতও লাগবি না, বুড়া আজই মরবি। তার কিসের জোতজমি, তার কিসের বিল, বুড়ার মাথাত ঠাঠা পড়বি। ঠাঠা পড়বি!'" (পৃ. ৫২৩)। নজর লাগা বা খারাপ দৃষ্টি সংক্রান্ত লোকসংস্কারের উল্লেখ রয়েছে কুলসুমের সংলাপে। '১৩' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, তমিজ হুরমতুল্লার জমিতে বর্গাচাষে ব্যস্ত বলে নিজের জমির পাকা ধান কেটে তোলার সময় করে উঠতে পারে না। কুলসুম এ ব্যাপারে তাড়া দিলে হঠাৎ তার খেয়াল হয়, সে সেদিন একবারও নিজের জমির ধান দেখতে যায়নি। হয়ত তার বহুকষ্টে ফলানো ধানের ওপর কেউ নজর দিয়েছে বলেই তমিজের এ বিষয়ে খেয়াল ছিল না, সে এমনটি ভাবে। পাশাপাশি এমন ভাবনাও তার মনে জাগে, নিজের ধানক্ষেতের ওপর বুঝি তারই নজর পড়েছে! সেকারণেই সে কুলসুমের কথা শুনে বিচলিত হয়।

গ্রামীণ লোকসমাজে বশীকরণ, তুকতাক প্রভৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। কেননা, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এর প্রতি আস্থা, নির্ভরতা বহুকাল ধরেই স্বীকৃত। তমিজ খিয়ার এলাকায় (যেখানে চাষাবাদের জন্য কৃত্রিম সেচব্যবস্থা প্রচলিত/ নাটোর ও তৎসংলগ্ন এলাকা) গিয়েছিল ক্ষেতমজুরের কাজ করে বাড়তি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে। সে বাড়ি ফিরলে তার সৎমা কুলসুম জানায়, খিয়ার এলাকার মানুষ ঘোর স্বার্থসচেতন। তারা নাকি ক্ষেতের কাজ, ঘর-গৃহস্থালির জন্য জোয়ান মজুরকে পেলে তাকে বশে আনতে পরিবারের মেয়েদের লেলিয়ে দেয়। সেসব মেয়েরা নাকি ডাইনি স্বভাবের। তারা ছলাকলা করে, মন্ত্রপড়া ধূলা ঝেড়ে ক্ষেতমজুরদের বশে এনে বিয়ের পর সেখানেই সংসার গড়ে তোলে। ফলে সেসব মজুররা নিজের দেশ ও পরিবারের কথা ভুলে আজীবন সেখানেই কাটায়। বলাবাহুল্য, কুলসুমের অভিমত তমিজের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি। এ দৃষ্টান্ত থেকে তার মনোলোকে সন্নিহিত লোকসংস্কারের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতার অসাড়ত্বই প্রতিপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে কুলসুমের অনুমান এতটাই বদ্ধমূল হয় যে, সে অতীতদিনের স্মৃতিচারণে বিভোর হয়ে যায়। তমিজ খিয়ার এলাকায় গিয়েছিল কৃষিকাজ করে উপার্জনের জন্য। কুলসুম চেয়েছিল তমিজ হুরমতুল্লার জমির আউশ ধান কাটার কাজ করুক। কিন্তু সে এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এমতাবস্থায় এক বৃষ্টিমুখর বিকেলে একাকী অবস্থায় কুলসুম অনুমান করে, তমিজ হয়ত কোনো বর্গাচাষীর স্ত্রী বা তার মেয়ের দেয়া চালভাজা বা কাঁঠালের বিচি ভাজা খাচ্ছে। কিন্তু তারা বিনা স্বার্থে নিশ্চয়ই তমিজকে এত সমাদর করছে না। এর বিনিময়ে তারা নির্ঘাত তমিজকে দিয়ে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে সুতা বাঁধিয়ে জাল তৈরি করিয়ে নিচ্ছে। 'এই সময়ে একটি টিকটিকির ঠিকঠিক আওয়াজ কুলসুমের অনুমানের যাথার্থ নিশ্চিত করে' (পৃ. ৩৪৮)। টিকটিকি সংক্রান্ত এ ধরনের সংস্কারের প্রভাবও যে লোকমানসে সক্রিয় থাকে, এটি তার দৃষ্টান্ত।

এ উপন্যাসে ধর্মীয় লোকসংস্কার হিসেবে ফকিরান্তি বা ফকির খাওয়ানোর দৃষ্টান্তও লক্ষণীয়। মাদারিপাড়ার মাদারি ফকির হিসেবে কুলসুমের দাদা চেরাগ আলির পূর্বপুরুষেরা এ কাজের মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করত। যমুনা তীরবর্তী মাদারিপাড়ার খাল পেরিয়ে চন্দনদহ, শিমুলতলা, গোঁসাইবাড়ি, ভবানীহাট, দরগাতলা প্রভৃতি স্থানে সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়িতে খতনা, কুলখানি, জেয়াফত, আকিকা, চেহলাম, মানত প্রভৃতি আয়োজনে ফকিরদের খাওয়ানোর রীতি বিশেষ গুরুত্বসহকারে প্রচলিত। মৃত ব্যক্তির কল্যাণ কামনায়, এমনকি তাকে স্বপ্ন দেখলে এর ব্যাখ্যা জানতে ফকিরদের শরণাপন্ন হবার রীতি লোকসমাজে প্রচলিত। জীবনধারণের তাগিদে চেরাগ আলি যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলত, মানুষের আবেগ ও সংস্কারগ্রস্ততাকে পুঁজি করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত, কুলসুম তা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবনে সমর্থ ছিল।

৩. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দাদের মধ্যে কিংবদন্তি[113] ও লোকসঙ্গীতের[১১৪] ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৩.১ কিংবদন্তি-- এ উপন্যাসের লোকসমাজের মৌখিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে কিংবদন্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বগুড়ার কাৎলাহার বিলসংলগ্ন গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয় ও এর পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামে এসব কিংবদন্তি কয়েক প্রজন্মের বাসিন্দাদের মুখে মুখে প্রচলিত। এসবের মধ্যে প্রধান হলো ইংরেজ সেনাদলের সেনাপতি টেলরের সঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ও ফকির মজনু শাহের প্রতিনিধি মুনসি বয়তুল্লা শাহের বন্ধুকের গুলিতে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে অপঘাতে মৃত্যুর বৃত্তান্ত। এ কিংবদন্তি আরো বিস্তৃত হয়েছে মোষের দিঘির পত্তনসংলগ্ন কিংবদন্তির সঙ্গে, যার যোগসূত্র রয়েছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ভবানী পাঠক ও মজনু শাহের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ঘটনার।[১১৫] এছাড়া যমুনা নদীকেন্দ্রিক একটি স্থানীয় কিংবদন্তিও এতদঞ্চলে প্রচলিত। কেননা, এ নদীর ভাঙনের করালগ্রাসে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই হারায় চাষের জমি, জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন, এমনকি পরিবার-পরিজন ও পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত মাথা গোঁজার ভিটেবাড়িটুকু। উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তসমূহের সঙ্গে এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকসাহিত্য প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছে সময়ের ধারাবাহিকতায়, যা তাদের গোষ্ঠীচেতনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি তাদের নিত্যদিনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, জীবিকানির্বাহরীতি, পারস্পরিক লেনদেন ও ওঠাবসা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি গড়ে তুলতে এসব কিংবদন্তির এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানসমূহের জোরালো ভূমিকা লক্ষণীয়। যেমন, উপন্যাসের '১' পরিচ্ছেদে মুনসি বয়তুল্লা শাহের অপমৃত্যুজনিত কিংবদন্তি উপস্থাপিত হয়েছে প্রান্তিক জেলে ও ভাগচাষী তমিজের বাপের দৃষ্টিকোণ থেকে, যে পূর্বপুরুষের স্মৃতিসংলগ্ন এ ঘটনাকে রীতিমত মান্য করে। আবার উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্র যেমন তমিজের বাপের দাদাশ্বশুর ও লোককবি চেরাগ আলি, তমিজ, ফুলজান, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি চরিত্রের স্মৃতিচারণায়ও এ কিংবদন্তি টুকরো টুকরোভাবে উপস্থিত। এসব সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলোর সমন্বয় ঘটালে তবেই সমগ্র কিংবদন্তিটি এবং এর অন্তর্গত লোক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব। তমিজের বাপ কাৎলাহার বিলের উত্তরসিথানের পাকুড়গাছের তলায় পৌঁছলে তার মনোলোকে ভেসে ওঠে বয়তুল্লা শাহের কিংবদন্তি--

> অনেকদিন আগে, তখন তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, তার বাপেরও জন্ম হয়নি, তার দাদা বাঘাড় মাঝিরই তখনো দুনিয়ায় আসতে ঢের দেরি, বাঘাড় মাঝির দাদার বাপ না-কি দাদারই জন্ম হয়েছে কি হয় নি, হলেও বন-কেটে বসত করা বাড়ির নতুন মাটি ফেলা ভিটায় কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, ঐসব দিনের এক বিকালবেলা মজনু শাহের বেশুমার ফকিরের সঙ্গে মহাস্থান কেল্লায় যাবার জন্য করতোয়ার দিকে ছোটার সময় মুনসি বয়তুল্লা শাহ গোরা সেপাইদের সর্দার টেলরের বন্ধুকের গুলিতে মরে পড়ে গিয়েছিলো ঘোড়া থেকে। বন্ধুকের গুলিতে ফুটো গলা তার আর পুরোট হলো না। মরার পর সেই গলায় জড়ানো শেকল আর ছাইভস্মমাখা গতর নিয়ে মাছের নকশা আঁকা লোহার পান্টি হাতে সে উঠে বসলো কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের মাথায়। সেই তখন থেকে দিনের বেলা রোদের মধ্যে রোদ হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে সারা বিলটা জুড়ে। আর রাতভর বিল শাসন করে ওই পাকুড়গাছের ওপর থেকেই। তাকে যদি এক নজর দেখা যায়–এই আশায় তমিজের বাপ হাত নাড়াতে নাড়াতে আসমানের মেঘ খেদায়। (পৃ. ৩৩৩)

প্রায় অনুরূপ বৃত্তান্ত উপন্যাসের '৫৯' পরিচ্ছেদে তমিজের বাপের পুত্রবধূ ফুলজানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত, যে কিনা 'লোকে'-র মুখে বহুকাল ধরে প্রচলিত বয়তুল্লা শাহ সম্পর্কিত কিংবদন্তি আনমনে স্মরণ করে তার শিশুকন্যা সখিনার জেদি মনোভঙ্গির কার্যকারণ অনুধাবনে। কেননা, তার শ্বশুরের বংশের পূর্বপুরুষেরাও একরোখা স্বভাবের ছিল, যারা করতোয়াসংলগ্ন শ্বাপদসংকুল বন কেটে বসবাসের জন্য সমতল ভূমির পত্তন করে ভিটেবাড়ি গড়ে তুলেছিল। মুনসি বয়তুল্লা শাহের কিংবদন্তির অবশিষ্ট অংশও '১' পরিচ্ছেদে তমিজের বাপের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত। মজনু শাহের অনুসারী হাজার হাজার ফকিরদের সঙ্গে করতোয়া নদীর দিকে এগিয়ে আসার সময় ইংরেজ সেনাপ্রধান টেলরের গুলি খেয়ে সে সাদা ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে মারা যায়। ঘোড়াটির সর্বাঙ্গ তীরে বিদ্ধ হলেও সেটি যে কোথায় চলে যায়, এর খোঁজ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইংরেজ সৈন্যদের ভয়ে কাদার ওপর

তিনদিন ধরে পতিত বয়তুল্লা শাহের আগুনে পোড়া মৃতদেহ দাফন করার সাহস কেউ করেনি। এরপর থেকেই লোকমুখে এ গল্প প্রচারিত হয়, মুনসি 'গুলিতে ফাঁক করা গলা নিয়ে সোজা চড়ে বসলো পাকুড়গাছের মাথায়। মুনসি সেই থেকে আগুনের জীব। তার গোটা শরীর, তার লম্বা দাঁড়ি, তার কালো পাগড়ি, তার বুকের শেকল, তার হাতের পান্টি সবই এখন আগুনে জ্বলে' (পৃ. ৩৩৭)। এভাবেই তাকে জ্বিনরূপে কল্পনা করে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দারা। এ কিংবদন্তির অন্তর্গত লোকবিশ্বাস তাদের চেতনালোকে ক্রমশ লোকসংস্কারে রূপান্তরিত হয়। যেমন–– উপন্যাসের '১' পরিচ্ছেদে তমিজের বাপ মৃত বয়তুল্লা শাহকে 'মানুষ' ভেবে পরমুহূর্তেই ভীত হয়। তার ধারণা, এর ফলে সে মুনসির কোপানলে পড়ে বিভিন্ন দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে। এর কারণ হিসেবে সে ইতঃপূর্বে সংঘটিত একটি পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে। লোকমুখে প্রচারিত, কারো ওপর মুনসির আছর হলে তার বিপদ ঘটবেই, এমনকি সারা জীবনে আর এর প্রতিকার সম্ভব নয়। তমিজের জন্মের পূর্বে তার মা আট মাসের গর্ভাবস্থায় একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীর ধারণা, যেহেতু তমিজের বাপ দিন-রাত খেয়ালখুশিমতো পাকুড়তলায় যায় এবং পাক-নাপাক ভেদাভেদ উপেক্ষা করে চলে, সেকারণেই তার প্রতি মুনসির নজর পড়ায় তার স্ত্রী এ মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের লোকসংস্কার মুনসির কিংবদন্তিকে ঘিরে কয়েক প্রজন্ম ধরে পল্লবিত হয়েছে। মুনসি সম্পর্কিত দুই গ্রামের বাসিন্দাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা উপন্যাসের একাধিক পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে কখনো তমিজের, কখনো বা তার বাপের দৃষ্টিকোণে, সর্বত্রই পরাবাস্তব বিবরণযোগে। সেখানে সমগ্র কাৎলাহার বিল, এর অন্তর্গত সকল জলজ প্রাণী, বন ও বাঁশঝাড়ের পাখিকুল, সর্বোপরি গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দাদের ওপরও তার একচ্ছত্র আধিপত্য সময়ের বিবর্তনে প্রতিষ্ঠিত।

এ উপন্যাসের কিংবদন্তির সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে লোকসঙ্গীত। বিশেষত, তমিজের বাপের দাদাশ্বশুর লোককবি চেরাগ আলির মুখে মুখে রচিত বিভিন্ন সঙ্গীতের প্রতিপাদ্য হলো বয়তুল্লা শাহের মৃত্যু ও মৃত্যুত্তর বিভিন্ন অলৌকিক-অতিলৌকিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, যা যুগ যুগ ধরে গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। যমুনার করালগ্রাসে ভিটেবাড়ি হারানোর পর নিজের গ্রাম ছেড়ে এতিম নাতনি কুলসুমকে নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে চেরাগ আলি হাজির হয় গোলাবাড়ির হাটে। সেখানে দোতারা বাজিয়ে গান পরিবেশন করে উপার্জনের চেষ্টা চালানোর একপর্যায়ে জনৈক শ্রোতার সঙ্গে তার আলাপ ঘটে। সেই লোকটি তাকে জানায়, সে ইতঃপূর্বে পোড়াদহের মেলায় মুনসি বয়তুল্লা শাহের মৃত্যু বিষয়ক এ ধরনের সঙ্গীত শুনেছিল। এর জবাবে চেরাগ আলি বলে, 'পোড়াদহের মেলাত হামাগোরে যমুনা পারের মানুষ আগে কতো আসিছে। পোড়াদহ, বাগবাড়ি নুনগোলা, জোড়গাছা, আবার ওদিকে ধরো চন্দনদহ, কড়িতলা, রয়াদহ, কুতুবপুর–ব্যামাক মেলার মধ্যে হামাগোরে ফকিরগুষ্টির মানুষ কতো আসিছে। গান তো করিছে তারাই' (পৃ. ৫০৮)। উত্তরবঙ্গের যমুনা নদীসংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে কিংবদন্তি হিসেবে পল্লবিত মুনসির আখ্যানকে ঘিরে যেসব সঙ্গীত লোকমুখে প্রচলিত ছিল, মুখস্ত থাকায় চেরাগ আলি সেগুলো শ্রোতাদের গেয়ে শোনায়। অন্যদিকে, তমিজের বাপের এ কিংবদন্তির প্রতি গভীর আস্থা পোষণের পাশাপাশি মানসিক বিকারগ্রস্ততা তথা রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের পথে হাঁটার প্রবণতা গ্রামবাসীর মধ্যে সৃষ্টি করে নতুন জল্পনা। তাদের ধারণা, চেরাগ আলি গানের মাধ্যমে মুনসির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সমর্থ। তার মৃত্যুর পর তমিজের বাপ একই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। সে অনেকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো দিনরাত বিচার না করে যখন খুশি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং মুনসিকে দেখার জন্যই কাৎলাহার বিলের উত্তরদিকের পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। সেকারণেই তমিজের বাপ মুনসির দয়ায় বিশেষ শক্তির অধিকারী, সে মানুষের বিপদের সমাধান দিতে পারে এবং ভবিষ্যত গণনায় পারদর্শী, এসব লোকবিশ্বাস তাদের মধ্যে দিনদিন গড়ে ওঠে। লেখক জানিয়েছেন, 'তমিজের বাপের সঙ্গে চেরাগ আলির মাধ্যমে পাকুড়গাছের (মুনসির) সরাসরি যোগাযোগের কথা গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা, গোলাবাড়ি, পালপাড়া, রানীরপাড়া, পারানিরপাড়া, এমন কি সাবগ্রাম ছাইহাটার সব মানুষ জানে' (পৃ. ৫৫৩)। মুনসির প্রতিনিধি হিসেবে চেরাগ আলি

ফকির ও তার শিষ্য তমিজের বাপ এভাবেই বিবিধ কিংবদন্তির আলোকে গ্রামের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক ভাবনা ও আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

এ উপন্যাসে মোষের দিঘির পত্তনকে ভিত্তি করে দুটি ভিন্ন কিংবদন্তি প্রচারিত। এক্ষেত্রে প্রথমটি বিবৃত হয়েছে কলকাতাবাসী জমিদারের অধীনস্থ নায়েবের মাধ্যমে; যেটির বিপরীত ভাষ্য গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের মধ্যে বহুদিন ধরে প্রচলিত। এর সঙ্গে ফকির মজনু শাহ ও তার অনুসারীদের সঙ্গে ভবানী পাঠক ও তার শিষ্যদের সমন্বিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বৃত্তান্ত একইসূত্রে গ্রন্থিত। বৈকুণ্ঠ কেরামত আলির সঙ্গে আলাপকালে জানায় 'ভবানী পাঠকের কাছে মজনু বার্তা পাঠালো। কী? না– তোমার আছে আলি, হামার আছে কালি; তোমার তাকত আলির হাতত আর হামার শক্তি আছে মা কালির কাছে;– ঠিক কি-না?– হামরা একত্তর হই। আলি আর কালি একত্তর হলে কোম্পানি এক ঘড়ি খাড়া হয়া থাকবার পারে?–তা হলে বোঝো। তখন দুইজনের মানুষ আর আলাদা থাকলো না। মুনসি তখন ভবানী সন্ন্যাসীর হুকুম শুনবি না কিসক?' (পৃ. ৪৮৮)। প্রথম কিংবদন্তিটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত নয়। শুধু জমিদারের নায়েবই এ সম্পর্কে অবহিত। ধারণা করা চলে, নায়েব কোনোভাবেই চায় না, মোষের দিঘিতে নমশূদ্রসহ 'জাত-বেজাতের' মানুষের স্পর্শ পড়ুক। সেকারণেই সে দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্তের সঙ্গে এ কাল্পনিক কাহিনী যুক্ত করে গ্রামবাসীকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট। সে বৈকুণ্ঠ গিরি ও শরাফত মণ্ডলের সঙ্গে আলাপকালে জানায়, 'ত্রিশুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মহাদেব নিজের হাতে মোষের দিঘি খুঁড়েছেন এক রাতের মধ্যে। তাও আবার মা দুর্গার আবদারে' (পৃ. ৩৯৮)। দেবী দুর্গার মন্দির নাটোরের জমিদারির অন্তর্গত ভবানীপুরে। সে এ কিংবদন্তির সঙ্গে যুক্ত করে দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্তকে। সেই আয়োজনের একপর্যায়ে দুর্গা মৃত্যুবরণ করলে মহাদেব ক্রোধান্ধ হয়ে সেটি নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে থাকে। 'তো নারায়ণ দেখলেন, মায়ের দেহে পচন ধরলে ধরিত্রীর বায়ু বিষাক্ত হয়ে যাবে। তিনি তার চক্র দিয়ে মায়ের পবিত্র দেহ টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বময়। নানা স্থানে পড়লো দেহের নানা অংশ' (পৃ. ৫৫১)। দুর্গার বাম কান করতোয়া সংলগ্ন ভবানীপুরে পতিত হলে সেখানেই তার নামে মন্দির গড়ে ওঠে। তবে দ্বিতীয় কিংবদন্তিটি দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ফকির মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক একত্রিত হলেও শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়। ভবানী পাঠক এ দিঘির পাড়ে ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে নিহত হয়। বৈকুণ্ঠ জানায়, 'মুনসি আছিলো ভবানী পাঠকের সেনাপতি। গান শোনো নাই, ভবানী নামিল রণে, পাঠান সেনাপতি সনে', এই সেনাপতিটা কও তো কেটা?' ... পাকুড়গাছের মুনসি হলো ওই সেনাপতি। মজনু শাহের লিজের মানুষ আছিলো তাঁই। এখনো কালীপূজার আত্রে ভবানী পাঠকের আদেশে মুনসি কাৎরা ভাসায়া দেয় বিলের মধ্যে, ওই কাৎরার মধ্যে কালা পাঠা বলি দিবার পারো তো তোমার সর্ব পাপ মোচন হবি। আরে এই খপর তো এটিকার ক্যাচলা ছোলও জানে' (পৃ. ৪৮৭-৪৮৮)। শরাফত মণ্ডল ছেলেবেলায় শুনেছিল, ইংরেজ সৈন্যদের হত্যার পর হাতের খাঁড়াটি ধোয়ার জন্য ভবানী পাঠক এ দিঘি কেটেছিল। এ দিঘির পাশেই নাকি সে নিহত হয়। বৈকুণ্ঠ কেরামত আলির সঙ্গে আলাপকালে জানায়, ভবানী পাঠক ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইকালে কামানের গোলার আঘাতে মানাস নদীর তীরে মৃত্যুবরণ করে। এ প্রসঙ্গে শরাফত মণ্ডল জানায়, এসব কিংবদন্তি সম্পর্কে এ এলাকার সকলেই পরিচিত––

> আষাঢ়ের অমবস্যায় রাত্রি আড়াই প্রহরে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে, পাকুড়গাছ থেকে অল্প তফাতে পানিতে একটা কাৎরা ভেসে ওঠে। কাৎরা মানে বলি দেওয়ার জন্যে জোড়া কাঠ। ... ওই কাৎরা ভেসে উঠলে সেখানে জোড়া পাঁঠা বলি দিলে শত্রুবিনাশ হয়, বিলের দুই ধারে রোগবালাই থাকে না। তা এখন আর কেউ বলি টলি দেয় না, তাই কাৎরাও বুঝি রাগ করে আর ভেসে ওঠে না।– বলি দেবে কোত্থেকে? বলির পাঁঠা তো কিনে আনলে চলবে না। সেই রাতে মুনসির পোষা গজারের সবগুলি ভেড়ার আকার পায় না, এক জোড়া গজার মাছকে মুনসি সেই রাতে ভাসিয়ে দেয় সাদা পাঁঠার শরীরে। কবে কয়শো বছর আগে কোন সন্ন্যাসী এদিকে এসেছিলো, মানাস নদীর তীরে লড়াই করতে করতে কোম্পানির গোরা সেপাইদের সে নাকি নিজের হাতে বলি দিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী মারা পড়ে সেপাইদের হাতেই। তা মরে গিয়ে লোকটা বছরের একটা দিন এখানে আসে, বিল থেকে কাৎরা তুলে নিয়ে মুনসির দেওয়া পাঁঠা বলি দিয়ে সে ঠাঁই নেয়

> পোড়াদহ মাঠের বটতলায় সন্ন্যাসীর থানে। যাবার আগে বলি দেওয়ার খাঁড়াটা সে ধুয়ে নেয় মোষের দিঘিতে। ওই রাতে মানুষজন এদিকে আসে না, আসা নিষেধ। কিন্তু পরদিন মোষের দিঘির মাঝখানে গোলাপি রঙের পানি ভাসতে থাকে। (পৃ.৪০১)

এ উপন্যাসে যমুনা নদী, মানাস, বাঙাল প্রভৃতি নদীর পাশাপাশি কাৎলাহার বিল গড়ে ওঠা সম্পর্কিত কিংবদন্তির উল্লেখ রয়েছে। চেরাগ আলি ও তার নাতনি কুলসুমের পারস্পরিক আলাপে এ কিংবদন্তি উপন্যাসে সংযুক্ত হয়েছে। মাদারিপাড়ার বাসিন্দা চেরাগ আলি যমুনা নদীর প্রবল ভাঙনে সর্বস্ব হারায়। সে গল্পের ভঙ্গিতে কুলসুমকে জানায়, তার পরদাদার আমলে যমুনা ছিল একটি খাল।[১১৬] ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইকালে ফকিররা নাকি ঘোড়ায় চড়েই এটি পারাপার করত। অবশেষে এ লড়াইয়ে ইংরেজরা জয়ী হবার পঞ্চাশ-ষাট বছর পর ফকিরদের জনৈক সর্দার পীরের অভিশাপে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হলে সেই খালটিই নদীতে পরিণত হয়। এ কিংবদন্তি বিষয়ক অন্য আরেকটি আখ্যান বিবৃত হয়েছে তমিজের বয়ানে। সে তার মায়ের নিকট থেকে এ কিংবদন্তি শুনেছিল। তমিজের বংশের প্রথম পূর্বপুরুষ সোভান ধুমা ও তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কাৎলাহার বিলসংলগ্ন বন সাফ করে বসতি গড়ার প্রসঙ্গে সে এ স্মৃতিচারণ করে। 'সোভান ধুমার নাতি না তার নাতির বেটার আমলে একবার আসামে না রংপুরে না-কি দিল্লিতেই হবে, না বার্মায়– কোথায় ভূমিকম্প হলে কোথাকার বড় গাঙের পানি সব এসে পড়লো পুবের যমুনায়' (পৃ. ৩৭১)। যমুনা তখন ছিল একটি সরু খাল। আকস্মিক ভূমিকম্পে সেটি প্রবল স্রোতে প্লাবিত হলে চারপাশের জায়গাজমি-বসতভিটা পানিতে ডুবে যায়। এরই স্রোত বাঙাল নদীতে এসে পড়ে এবং পরবর্তীকালে বাঙালি নদী থেকেই কাৎলাহার বিলের মতো একটি জলা বিরাট আকৃতি ধারণ করে। একপর্যায়ে সেই বিল বাঙালের স্রোত সামলাতে না পেরে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙাকেও ভাসিয়ে নিলে 'মুনসির আর সহ্য হলো না, পাকুড়গাছ থেকে সে তার জোড়া পা পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ গজ বাড়িয়ে বিলের দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ে মারলো এক লাথি। সেখানে ... বানের পানি গলগল করে ঢুকে পড়লো পাড়-ভাঙা বিলের ভেতর। বাঙালি নদীর স্রোত দুটো ধারায় এসে পাকুড়গাছে কদমবুসি করে গাছের দুই ধার দিয়ে এসে মিশলো বিলের পানিতে।' (পৃ. ৩৭২)

৩.২ লোকসঙ্গীত-- এ উপন্যাসে চল্লিশটি লোকসঙ্গীত বিবৃত, যেগুলো এক চরণ থেকে সর্বোচ্চ আঠারো চরণ বিন্যস্ত। কিছু কিছু চরণ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এসব সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে মূলত চেরাগ আলি ও কেরামত আলির কণ্ঠে। লক্ষণীয়, এ উপন্যাসে লোকসঙ্গীতের ভাষা আদ্যন্ত সাধুরীতির এবং অন্ত্যমিলবিশিষ্ট, কখনো বা ত্রিপদীর কাঠামোতে বিন্যস্ত। গ্রামীণ জনসমাবেশে 'শোলোক' হিসেবে ধীরকণ্ঠে পরিবেশিত গানগুলোতে প্রতিপাদ্য হিসেবে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিভিন্ন কিংবদন্তি, গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গালগল্প সমন্বিত অলৌকিক-অতিলৌকিক প্রসঙ্গ বিবৃত। পাশাপাশি এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার বিভিন্ন অনুষঙ্গ, সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ যেমন তেভাগা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের বিরোধ প্রভৃতিও এসব গানের আধার হিসেবে উপস্থাপিত। বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের প্রান্তিক লোকসমাজে এসব গানের প্রভাব ব্যাপক। সেকারণেই লোককবিদের প্রতি তাদের আস্থা এবং নির্ভরতা সংশয়াতীত। কুলসুমের দাদা চেরাগ আলির মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা ও পরিবেশনের সামর্থ্য তাকে গ্রামবাসীর নিকট উন্নীত করে দৈবী শক্তিসম্পন্ন মানুষে। তাছাড়া এতদঞ্চলে বহুকাল ধরে প্রচলিত পূর্বসূরীদের পরিবেশিত গানগুলো মুখস্ত রাখার ফলেও তার জীবিকা নির্বাহে এটি বিশেষ সহযোগী মাধ্যম হয়ে ওঠে। দোতারার সুরে কিছুটা কর্কশ কণ্ঠে গুনগুন করে সে যখন গান পরিবেশন করে, সমাবেশে উপস্থিত শ্রোতাদের চারপাশে আকস্মিকভাবেই ঘোরময় আচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে চেরাগ আলির পরিবেশিত গানের মাধ্যমে লব্ধ চিত্তবিনোদন তাদের উজ্জীবিত করে। অন্যদিকে, তার শিষ্য কেরামত আলি নিজেই গান রচনা ও পরিবেশনে অভ্যস্ত। সেকারণে তার প্রতি মানুষের তেমন আগ্রহ নেই। তবে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার বাসিন্দাদের ইসলামী মূল্যবোধে ঐক্যবদ্ধ করতে ক্ষমতাশালী জোতদার শরাফত মণ্ডলের ছোট ছেলে আবদুল কাদের ও তার দলের নেতা ঈসমাইলের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীন পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষা, মুসলিম লীগ-কংগ্রেসের

দ্বৈরথ প্রভৃতি প্রসঙ্গ তার গানে উপজীব্য হয়, যা এতদঞ্চলের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ গিরি, যে সন্ন্যাসী বংশের সন্তান হিসেবে পূর্বসূরীদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দুঃসাহসে বলীয়ান, তার কণ্ঠে পরিবেশিত হয় ভবানী পাঠকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিজ্ঞাপক কীর্তন সঙ্গীত। লক্ষণীয়, এতদঞ্চলের লোকমানুষের জীবনবাস্তবতাকে রূপায়ণের প্রয়োজনে লেখক সচেতনভাবেই অবলম্বন করেছেন মধ্যযুগে রচিত পুথিসাহিত্যের ভাষাকে, যা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহকালীন ভাবাবহকে পাঠকের চেতনালোকে জাগিয়ে তোলে।[১১৭] তাদের কণ্ঠে পরিবেশিত দুটি সঙ্গীত দৃষ্টান্ত হিসেবে নিচে যথাক্রমে বিবৃত হলো--

ক.

গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়।

গলা ঝাঁঝরা কোম্পানির কামানের গোলায় ॥

নিন্দের সোয়ারি ফকির ধীরে দাঁড় বায়।

বাবরি চুলের ছইখানি ওপরে চেরাগদানি

চেরাগে আতশ নাই নাও ডুবে যায়।

দেহ জখম কোম্পানির কামানের গোলায়।

গোল করিও না সাগরেদ ফকিরে ঘুমায় ॥

রৌদ্রে ফাটে ঝাঁঝরা গলা তামাম নদীর পানি ঘোলা

আজলা ভরা পানি তাহার পিয়াস না মিটায়।

নিন্দের সোয়ারি ফকির ধীরে দাঁড় বায়।

গোল করিও না বান্দা ফকিরে ঘুমায় ॥ (পৃ. ৪৮৫)

খ.

ভবানী নামিল রণে পাঠান সেনাপতি সনে

গোরা কাটো আদেশে হুঙ্কারে।

ভবানীর কণ্ঠধ্বনি মৃগরাজধ্বনি জিনি

গর্জনে শার্দুলে লজ্জিত। ...

গিরিগণে নামে জলে যতনে লইল কোলে

কৃষ্ণ কোলে যেন শত রাই।

পাষাণে হৃদয় বান্ধো কান্দো গিরিগণে কান্দো

Dhaka University Institutional Repository

ভবানী পাঠক ভবে নাই। (পৃ. ৩৬৮-৩৬৯)

৪. লোকোৎসব-- এ উপন্যাসে লোকউৎসব হিসেবে মেলার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পোড়াদহের মেলা।[১১৮] তবে পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বাগবাড়িতে নিশানের মেলা, দক্ষিণে এলাঙ্গির মেলা, রয়াদহের ফকিরের মেলা প্রভৃতি বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া 'করতোয়ার পশ্চিমে চৈত্র পর্যন্ত তো সপ্তাহে সপ্তাহে কোথাও না কোথাও মেলা একটা লেগেই থাকে' (পৃ. ৫২০)। নিশানের মেলায় কর্মকারেরা বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষিকাজের সরঞ্জামাদি আনে। যেমন লাঙলের ফলা, কোদাল, কুড়াল বঁটি প্রভৃতি। ফসল ফলানোর প্রয়োজনে মূলত চাষীরা এসব কেনে। করতোয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এ মেলা বসে। তবে পোড়াদহের মেলা উত্তরাঞ্চলের প্রধান মেলা, যেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে। কথিত রয়েছে, ভবানী পাঠক এ মেলার প্রবর্তক। একারণে এ মেলায় সন্ন্যাসীরাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করায় এর অন্য নাম সন্ন্যাসী মেলা। উপন্যাসের '২২' পরিচ্ছেদে বৈকুণ্ঠ কেরামতকে জানায়, 'এই যে পোড়াদহের মেলা, এই মেলা প্রথম চালু করে ভবানী পাঠক, আহা বড় সখের মেলা তার। দেহ রাখার পর তিনি প্রস্থান করেছেন কৈলাসে, কিন্তু বছরকার একটি দিন তাঁকে এখানে দেখা যায়। কে দেখে? ... সন্ন্যাসী জাতের মানুষ যদি শুদ্ধ বস্ত্রে, শুদ্ধ চিত্তে মেলার আগের দিনে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে তালগাছের তলায় দাঁড়ায় তো খাওয়া পরার অভাব হবে না, লোকালয়ে সবার সম্মান সে পাবে এবং পরজন্মে কি পাবে না পাবে তা আর নাই বললো! সেটা জানে শুধু ঠাকুর' (পৃ. ৪৮৭)। উক্ত লোকবিশ্বাসের সঙ্গে লোকপ্রথার বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও এ মেলাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সেটি হল নাইয়র প্রথা। গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামের বাসিন্দাদের শ্বশুরবাড়িতে মেয়ে-মেয়েজামাইকে এবং তাদের আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি মেলায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এ মেলাকে ভিত্তি করে স্থানীয় লোকগোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। তমিজকে ফুলজান জানায়, তার বড় মামা এসে ফুলজানের বাবা-মা, ছোট দুই বোনকে নাইয়রে নিয়ে গেছে। এ মেলা উপলক্ষে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী কেনাবেচা হয়। হুরমতুল্লা 'মেলায় বেচবে বলে কাল তেলিহারা হাট থেকে কেশুরের বিচি আর মুলার বিচি কিনে এনেছে। নবিতন গোটা বিশেক পাটের শিকা বুনে রেখেছে, খুব নকশা করা শিকা। দাম মনে হয় ভালোই উঠবে। অন্তত ভদ্দরলোকেরা তো পছন্দ করবেই। ... কামালপুর, আওলাকান্দি আর আমতলি থেকে ছুতাররা গোরুর গাড়ি করে কাঠের খাট, পালং, তক্তপোষ, আলনা, বেঞ্চি আর পিঁড়ি, জলচৌকি এসব আনতে শুরু করেছে' (পৃ. ৫০৩)। অন্যদিকে তমিজের বাপ একটি বড় আকৃতির বাঘাড় মাছ ধরে মেলায় বিক্রির ব্যাপারে ভাবছিল। এ মেলা উপলক্ষে শ্বশুরবাড়িতে আগত জামাইদের যথাসম্ভব সমাদর করা হয় নতুন পোশাক উপহার দিয়ে, ভালো খাবারের আয়োজন করে এবং মেলা উপলক্ষে হাতখরচ দিয়ে। দশরথ কর্মকারের মেয়ে-জামাইয়ের প্রতি বিরূপতার বিশেষ কারণ, সে অসৎ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। তাছাড়া নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে তার আগ্রহ প্রবল। হুরমতুল্লার সঙ্গে মেলায় দেখা হলে তাদের পারস্পরিক আলাপে বিষয়টি ফুটে ওঠে– 'সারা বছর কোনো যোগাযোগ রাখে না, ... আবার দেখো সন্ন্যাসীর মেলা লাগার তিন দিন আগে এসে হাজির একেবারে গুষ্টিশুদ্ধ। বোন বোনাইকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। জামাইকে ধুতি দাও, তার বোনাইকে ধুতি দাও, মেয়েদের শাড়ি দাও। হ্যান দাও ত্যান দাও। দুই সন্ধ্যা মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াও, পিঠা বানাও, পায়েস করো। আবার মেলার দিন জামাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে নগদ সাতটা টাকা। যুধিষ্ঠির দেখে এসেছে, জামাইবাবু তার বসে গেছে জুয়ার আসরে' (পৃ. ৫২০-৫২১)। এ মেলা উপলক্ষে সার্কাসের দল আসে, যা দেখতে দর্শকরা ভিড় জমায়। এমনকি, দেহব্যবসা ও জুয়ার আসরের বন্দোবস্তও সেখানে থাকে। মেলায় বিভিন্ন খাদ্য বিক্রি হয়। তমিজ 'শালপাতার ঠোঙায় জিলাপি, কদমা, বেগুনি, পেঁয়াজি, বিভিন্ন ধরনের তেলে-ভাজা খলুইতে বড়ো মাছের ভাগা প্রভৃতি কিনে নিয়ে আসে।

সন্ন্যাসীর মেলাকে ঘিরে বৈকুণ্ঠের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। '২৪' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, বৈকুণ্ঠ ভবানী সন্ন্যাসীকে একবার দেখার জন্য মাঝরাতে হাজির হয় মোষের দিঘির উঁচু পাড়ের তালতলায়। সেখানে একঠাঁয় দাঁড়িয়ে সে নজর রাখছিল পাকুড়তলার পশ্চিম সন্ন্যাসীদের ভিটার ওপর। তার ধারণা, 'মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরের পর বারবেলায় ভবানী ঠাকুর এসে আসন গ্রহণ করবে পোড়াদহ মাঠের বটতলায় তার বিগ্রহের মধ্যে। তখন থেকে সন্ন্যাসীর পূজা। রাত্রি দুই প্রহর কাল পর্যন্ত সন্ন্যাসী পূজার ভোগ নেবে, তারপর কৈলাসধামে প্রত্যাবর্তন কালে মোষের দিঘির পাশ দিয়ে গিয়ে পাকুড়গাছের দিকে কয়েক পলক নজর দিয়ে ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে পৌঁছে যাবে নিজের ভিটার ওপর। সূর্যঠাকুর পুব আকাশ জুড়ে সিঁদুরের ছোপ লাগানো শুরু করবে আর সন্ন্যাসীও মিলিয়ে যাবে আলোর মধ্যে আলো হয়ে। নিজের শিষ্যসঙ্গীদের বংশধর, অন্তত দশনামীদের কাউকে না দেখলে ঠাকুর কষ্ট পাবে জেনেই তো বৈকুণ্ঠ তার ঠাকুরদার সৎ ভাইদের ছেলেদের প্রতারণা মেনে নিয়ে বিঘা বিঘা জোতজমি জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইদের ভোগ করতে দিয়ে নিজে পড়ে রয়েছে এখানে। এই রাতে কি তার ঘুমিয়ে থাকলে চলে?' (পৃ. ৫০৩)। এভাবেই পোড়াদহের মেলাকে ভিত্তি করে এতদঞ্চলের লোকসমাজের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিচয় উন্মোচিত হয়।

৫. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে--

> বুড়া যদি শাপলার ডাঁটা কয়টা তুলে আনতো! তাহলে কী হতো! তাহলে বেশি করে মরিচ দিয়ে, রসুনের কয়টা কোয়া কুচিয়ে ফেলে কুলসুম কি সুন্দর চচ্চড়ি রেঁধে ফেলে। একটু চচ্চড়ি হলে পোড়া মরিচ কয়টা ডলে নিয়ে তমিজের বাপ তিন সানকি ভাত সেঁটে ফেলতে পারে একাই। ... কাল সকালে কয়েকটা শাঁক আলু পেটে জামিন দিয়েছিলো কুলসুম। (পৃ. ৩৪০)

> ট্যাংরা মাছ দিয়ে গোগ্রাসে ভাত খেতে খেতে তমিজের বাপ একটা পেঁয়াজ চাইলো। ...ছলকে-পড়া ডালের সঙ্গে ভাতের কয়েকটা দানা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ট্যাংরা মাছের চচ্চড়ির মাছের কণা কি বেগুনের কুচি কি পোড়া মরিচের কামড়ানো টুকরা সব যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গিয়েছিলো সানকির ভেতরেই। (পৃ. ৩৪৩)

> দুপুরবেলা ভাত ও আলু দিয়ে পাক-করা বোয়াল মাছের ঘাঁটি সালুন এবং সকাল থেকে দুপুর ও দুপুরে ভাত খাবার পর থেকে রাতে খাবার আগে পর্যন্ত দুই দফায় মুড়ি, বাতাসা ও খাগড়াই খেয়ে বাড়ি ফিরে তমিজের বাপ টইটুম্বুর পেটে হাত বুলাতে বুলাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। (পৃ. ৩৬৬)

> জিভে তামাকের গন্ধ-মাখা একটু-আগে-গেলা ভাত, খেসারির ডাল, বেশি মরিচ দিয়ে রাঁধা খলসে মাছ-বেগুনের চচ্চড়ির স্বাদ একটু খানি পেয়েই তমিজের গায়ে বল আসে। (পৃ. ৩৮৫)

> বাপটা তো কিপটের একশেষ, জমির আলে কুলগাছতলায় সানকি ভরা পান্তা মরিচ দিয়ে ডলে খেতে খেতে মুখের কথাটাও বলে না, ক্যা গো, খাওয়া দাওয়া হছে? আর এ কঞ্জুসের বেটি গুড়ের ফুটানি মারে। (পৃ. ৩৯৩)

> হুরমতুল্লার বড়ো বেটির সবই ভালো। সুযোগ পেলেই তমিজের হাতে পোড়া আলুটা, চালের আটার রুটিটা কিংবা ঠাণ্ডা একটা ভাপা পিঠা গুঁজে দেয়। (পৃ. ৪১৪)

> বুটের ডাল অনেক দিন খাওয়া হয় না। কুলসুম চিতই পিঠা করলে বুটের ডাল দিয়ে খাওয়া যাবে। (পৃ. ৪৭১)

> তমিজ মেলায় ফুর্তি করে ফিরলো এত রাতে। ... শালপাতার ঠোঙা করে জিলেপি এনেছে, কদমা এনেছে, বেগুনি পেঁয়াজি, কতোরকমের তেলে-ভাজা। (পৃ. ৫১৯)

'বেনবেলা পান্তা খানু মরিচপোড়া দিয়া, না আঁইটা কলাও বুঝি আছিলো।' ... মুড়ি খেতে খেতে আর কথা বলতে বলতে গলা কাঠ হয়ে এলে বৈকুণ্ঠ কুলসুমকে ডাকে, এ কুলসুম, তোর হাতের আমটা দে।' (পৃ. ৩৮৯)

৬. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে লেখক বগুড়ার লোকভাষাকে ব্যবহার করেছেন পাত্রপাত্রীদের সংলাপ নির্মাণে। স্থানীয় ও দেশজ শব্দের ব্যবহার এতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু আমাদের গবেষণাভুক্ত অন্যান্য ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে–আলংকারিক বাক্য এবং বাগধারার প্রয়োগের মাধ্যমে চরিত্রসমূহের প্রবণতা ও মনস্তত্ত্বকে পরিস্ফুট করে তোলা, এ উপন্যাসে লেখক সচেতনভাবেই সে উদ্দেশ্য সাধনে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। তিনি পাত্রপাত্রীর বিভিন্ন ধরনের সংলাপের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাদের অঙ্গভঙ্গি ও বাক্য উচ্চারণের বিশেষ ধরনকে। এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট দৃশ্যের পটভূমিতে সংঘটিত ঘটনাটি পাঠকের মনোলোকে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া চরিত্রসমূহের ধারাবাহিক সংলাপ বিনিময়ের রীতিকেও তিনি এ উপন্যাসে জোরালোভাবে মান্য করতে চাননি। বরং কোনো ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীদের ভূমিকা, তাদের মনোভঙ্গি ও ভাবনাকে তিনি নিজেই বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সচ্ছন্দ বোধ করেন। এ উপন্যাসে লোকভাষায় প্রযুক্ত শব্দভাণ্ডার নিচে উপস্থাপিত হলো--

শব্দভাণ্ডার

বিশেষণ-- চুপসে, টুকটুকে, ছেঁড়া, কুচকুচে, উপুড়, হামাগুড়ি, জিরিয়ে, ছিনাল, ঝালাই, ঠুনকো, পুরোট, ভাঙাচোরা, গোটানো, ঠেস, ফোলা, উড়াল, খটখটে, নুয়ে, হাবুডুবু, তোলপাড়, দোমড়ানো, ছটফট, ছেঁড়াখোরা, ভাঙানিয়া, নেতানো, দগদগ, আঁশটে, সোঁদা, কুচকে, পানসে, ঝাপটা, রোগাপটকা, কালোকিষ্টি, টইটুম্বুর, হাড়গিলা ইত্যাদি।

ক্রিয়া-- ছোবল, খেদায়, ঝেড়ে, হাঁকডাক, খসে, ঠেকলে, বেঁধা, ঠেলে, খুবলে, শোঁকা, রেঁধে, ঘেঁটে, জিরিয়ে, জুটবে, ঠেকিয়ে, তোতলায়, খাটে, ঝিমাতে, গোটাতে, ভুলকি, বিয়ালে, নেয়ে, জুটেছিলো, চ্যাচালে, কাটিছে ইত্যাদি।

অনুকার অব্যয়-- তিরতির, ছপছপ, ছমছম, পটপট, শিরশির, ভোঁ ভোঁ, চনচন, খরখরে, ফ্যালফ্যাল, গুজুরগাজুর, ফুসুরফাসুর, চপচপ, ঝাঁ ঝাঁ, চকচক, ঝমঝম, গনগন, হনহন, খরখর, ঠুকেঠুকে, গুনগুন, চিনচিন, গরগর, টুনটুন ইত্যাদি।

দেশজ শব্দ-- গতর, পোয়াতি, পোলা, গোলা, পান্টি, বিল, সিথান, মেলা, ভাঁটা, চাষা, কলু, খাল, গাদা, ভেরেণ্ডা, ঝোপ, চ্যাংড়াপ্যাংড়া, মই, ছোলপোল, ডাঙা, পুব, বেড়জাল, ওম, বৈঠা, ডোরা, খোসা, চুলকানি, ভিটা, খোঁচা, কপাট, হাট, বড়শি, ঘাট, শ্যাওড়া, মাচা, চচ্চড়ি, সানকি, উনান, শাক, সরা, উস্কে, কিল, প্যাঁচাল, খিয়ার, হাঁচড়েপাঁচড়ে, মালসা, ঠাহর, চিৎপটাং ইত্যাদি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি-- ঢঙ>অঙ, কাজ>কামোত, ল্যাম্প>ল্যাম্পো, কেমন করে>ক্যাংকা কর‍্যা, লাফ>নাফ, গল্প>গপ্পো, ঠেকছে>ঠেকিচ্ছে, ঘুমাস>নিন্দ পাড়িস, কেন>কিসক, কোথায়>কোটে, থেকে>থ্যাকা, কেমন>ক্যামা, ভোররাতে>পাছারাতোত, গর্ভ>গভভো, দুঃখে>দুক্কে, সকাল>বেনবেলা, কেন>কিসক, দেখছে>দেখিচ্ছি, রান্না>পাকশাক, রাত্র>আত্র, ওখানে>ওটি ইত্যাদি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এ উপন্যাসে চল্লিশের দশকের পটভূমিতে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার গ্রামীণ লোকজীবনের চালচিত্র বিস্তৃত পরিসরে রূপায়িত হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক অভিঘাত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রের কায়েম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের সমান্তরালে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভাবপরিমণ্ডলসঞ্জাত উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ লোকগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও বহমান সংস্কৃতির পরিচয় এতে নিবিড়ভাবে উপস্থাপিত। লেখকের নৈর্ব্যক্তিক ও ভাবাবেগশূন্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ লোকমানুষের সমষ্টিচেতনাকে যথাসম্ভব বাস্তবানুগভাবে ভাষ্যরূপদানে সক্রিয়।

এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বীক্ষার সঙ্গে শৈল্পিক বোধের যথাযথ সমন্বয় ঘটেছে বলেই বাংলাদেশের লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতিনির্ভর উপন্যাসের ধারায় †Lvqvebvgv ধ্রুপদী মর্যাদায় আসীন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আহমদ ছফা

বাংলাদেশের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) স্বকীয় পরিচিতি রয়েছে। বুদ্ধিজীবী হিসেবেও তাঁর চিন্তা ও লেখা তাৎপর্যপূর্ণ।[১১৯] মেধা ও প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিজীবনের ছন্দপতন তাঁকে জীবদ্দশায় তাড়িত করেছে। একজন সব্যসাচী লেখকের মতোই সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অঙ্গন তথা রেখেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ, সঙ্গীত রচনা, শিশুতোষ রচনা, ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাসগ্রন্থ সব ধরনের লেখনীতেই তিনি সৃষ্টিকুশলতার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই রামচন্দ্রকে নিয়ে পদ্য রচনার মাধ্যমে তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত ঘটে। কথাশিল্পী শাহেদ আলী সম্পাদিত ছোটদের পত্রিকা ‘সবুজ পাতা’-য় তিনি নিয়মিত লিখতেন। সোলেমান পয়গম্বরের কাহিনী নিয়ে লেখা ‘অপূর্ব বিচার’ নামক গল্পটি অধ্যক্ষ মিন্নত আলী সম্পাদিত অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত হয়। এ-প্রসঙ্গে আহমদ ছফা লিখেছেন, ‘শাহেদ ভাই ওই লেখাটি ছেপে আমার জীবনের গতিপথ বেঁধে দিয়েছিলেন।’ [১২০] তাঁর লিখিত উপন্যাসগুলো হলো mh Zwg mv_x, I¼vi, AjvZPµ, Awj †Kbvb, giYwejvm, A‡aK bvix A‡aK Ckix, c®ú, eÿ I wen½civY এবং Mvfx eËvšÍ। তাঁর উপন্যাসে সমাজ-রাজনীতি-ধর্ম-দর্শন- প্রেম-প্রশাসন এবং সামগ্রিক জীবনবীপ্সা সম্পর্কে

গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম উপন্যাস সূর্য তুমি সাথী-তে গণমানুষের শ্রমক্লিষ্ট চালচিত্র রূপায়ণে তিনি যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন. বাংলা সাহিত্যে তা বিরল ঘটনাই বটে। ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে ভিত্তি করে প্রায় আবেশশূন্য ভাষায় তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পাশাপাশি নারী-পুরুষ এবং শোষক-শোষিতের যুগ্ম-বৈপরীত্যমূলক সম্পর্কের যে আখ্যান এতে তুলে ধরেছেন, তা শিল্পগুণান্বিত এবং একই সঙ্গে বাস্তবোচিত[১২১] প্রশাসন, মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়িত রূপ, প্রশাসনকাঠামো ও শিক্ষাব্যবস্থা, সম্পর্কে আহমদ ছফার সচেতন ও দূরদর্শী পর্যবেক্ষণ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, তাঁর লেখনী সেই সাক্ষ্য দেয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক সংকট এবং মুক্তবুদ্ধির আবহে রচিত, সমকালীন বিভিন্ন প্রসঙ্গ এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান পরিচ্ছন্নভাবে বিভিন্ন লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বহুমাত্রিকতাগুণে তাঁর উপন্যাসগুলো পাঠকের চিন্তায় নবতর অনুরণন ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

mh Zwg mv_x

আহমদ ছফার প্রথম উপন্যাস[১২২] mh Zwg mv_x (১৯৬৭) বিশ শতকের চল্লিশের দশকের চট্টগ্রামের গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। এ উপন্যাসে মার্কসীয় ভাবনার প্রত্যক্ষ প্রভাব লেখকের শিল্পীমানসে যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বসংগ্রামের রূপায়ণে তা প্রতীয়মান হয়। লোকসমাজের অন্তর্গত খেটে খাওয়া মানুষগুলোর প্রাত্যহিক জীবনচিত্রণে[১২৩] প্রতিফলিত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পৃক্ততার পরিচয়। এসব উপাদান তাদের নিত্যদিনের আচরণে, পারস্পরিক আচরণে , ওঠাবসা ও লেনদেনে, সর্বোপরি সামাজিক পরিমণ্ডলেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।[১২৪] প্রকৃতপক্ষে, ভূমিসংলগ্ন জীবিকা ধারণের পাশাপাশি অরণ্যের প্রতি নির্ভরতা তাদের সামষ্টিক চেতনালোকে এতৎসংলগ্ন বিবিধ লোকবিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে। এসবই লোক গোষ্ঠীভুক্ত বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অংশ, যা থেকে তাদের কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন ভাবা চলে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও নির্ভরতা রূঢ়-বাস্তব বৈরী প্রতিবেশে সংকটকালীন মুহূর্তেও হয়ে ওঠে তাদের পরম নির্ভরস্থল। সেকারণেই ক্ষমতাবান, আধিপত্যকামী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বতকারী জোতদার, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বার, অর্থলোলুপ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট মানুষগুলোকে নিত্যদিনের অজস্র টানাপোড়েনের মধ্যেও লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাতে দেখা যায়। গ্রামীণ

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকাঠামোর ভাঙনের পরিণতিতে এই মানুষগুলোকে অস্তিত্বরক্ষার তাড়নায় শহরের কলকারখানার শ্রমিকের পেশা অবলম্বনে বাধ্য হতে হয়। তবু সমগ্র উপন্যাসেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে লোকসমাজভুক্ত মেহনতি মানুষের লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও নির্ভরতার পরিচয়।

১. লোকসংস্কার–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত রয়েছে––

> ক. বুড়ো-বুড়ীরা বৈশাখের শেষের দিকে সূর্যের হলুদ শিখায় কেয়ামতের নমুনা দেখতে পেলো। এবার আর তার নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারে না। খোদার দরবারে মোনাজাত করে। ... একশো মোল্লা মৌলানা দিয়ে ধু ধু করা বিলে খতম পড়ানো হলো। খতম পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাছুরকে দুধ খেতে দিলো না গেরস্ত। বুকের শিশুকে স্তন্য দিলো না জননী। আগে খতম শেষ হোক, আসমানে মেঘ উঠুক। ... কিন্তু বৃষ্টি হলো না। বৃষ্টির আগমনী গান গেয়ে পাড়া পাড়া চাঁদা তুলে বেড়ালো জোয়ান-বুড়ো : .. শির্নী-সালাত অনেক করা হলো। কিন্তু বৃষ্টি নামলো না। (পৃ. ২০)

> খ. দলাদলা মানুষ মরছে। ... কাজী পাড়া এবং ফকির পাড়ার সকলে একযোগে ফয়েজ মস্তান জহির মৌলবীকে নিয়োগ করেছে। ছাগল জবাই করে শিরনি দিয়েছে। কোরআনের আয়াত পড়ে পাড়া বন্ধ করেছে। মাটির সরায় সুরা লিখে গাছে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে, যাতে করে ওলাওঠা পাড়ার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে। দিনেরাতে শোনা যায় আজানের ধ্বনি। জীবনে যারা নামাজ পড়ে নি-ওলাউঠার ডরে তাদের মাথায়ও টুপী উঠেছে। রাতের বেলায় ফয়েজ মস্তান আর জহির মৌলবী জেগে থেকে সমস্ত পাড়াময় ঘুরে বেড়ায়। মাইজ ভাণ্ডারের কোন কামেল পীর নাকি স্বপ্নে দেখেছে দুনিয়ার মানুষের গুনাতে দুনিয়া ভরে গেছে। সে জন্য আল্লাহ্ বান্দার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে কলেরা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি সাতবোন পাঠিয়ে গজব নাজেল করছে। ওরা সুন্দরী মেয়েলোকের বেশ ধরে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবে। যে পাড়ায় আল্লাহ্র কালামের কোনো নিষেধের গণ্ডী থাকবে না, ভেতর দিয়ে গুড়হুড় করে ঢুকে পড়বে। হেঁটে গেলেই শুরু হবে রোগ। তারপর মৃত্যু ... কান্নাকাটি ইত্যাদি। এরই নাম আসমানী মুসিবত। এই আসমানী মুসিবতেরও আসানী আছে আল্লাহর কালামে। একবার জহির মৌলবী নাকি জোয়ারা গ্রামে রাতের অন্ধকারে এক বোনের মাথার লম্বা চুল জারুল গাছের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে খড়ম দিয়ে ছেঁচতে ছেঁচতে মুচলেকা আদায় করেছিলো। আল্লাহর হুকম নেই, নয়তো ধরে রেখে দিতো। (পৃ. ৫৫)

> গ. ওদিকের আম গাছে একটা ভূতুম ভূতুরে স্বরে ডাকছে। হাসিম সুফিয়ার মুখ চেপে ধরে। অলক্ষুণে কথা বলতে দেয় না। ভূতুমটা অলক্ষুণে ডাক ডাকছে। না, না মরতে দিতে পারে না সে সুফিয়াকে। মা-বাপ ভাই-বন্ধু কেউ নেই-আছে সুফিয়া, মায়ের মতো স্নেহে তাকে আগলে আছে। সে যদি মারা যায় কার কাছে যাবে হাসিম? ... সন্তান প্রসব করতে গিয়ে এমন অনেকেই তো মারা যায়। (পৃ. ৬১)

ক’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে ভূমিনির্ভর লোকমানুষের স্রষ্টার প্রতি উদাত্ত আহবান। বরগুইনির কৃষকসমাজ যেহেতু জমি চাষ করে ফসল ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, তাই বৃষ্টির ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে স্রষ্টার কাছে দুহাত তুলে মোনাজাতের মাধ্যমে মিনতি জানিয়েই তারা ক্ষান্ত হয় না। তাকে তুষ্ট করতে তারা মৌলবিদের দিয়ে কোরান তেলাওয়াতের পাশাপাশি মসজিদে শিরনি মানতের আয়োজন করে। স্রষ্টাকে খুশি করতে পারলে তবেই বৃষ্টি নামবে, ক্ষেতে ফসল ফলবে, প্রতিদিনের জীবন স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাবে পরিবারের স্বজনদের নিয়ে, এরূপ আশাবাদেরই পরিণতিতে তারা এ ধরনের আয়োজনে উদ্যোগী হয়। ‘খ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে অক্ষরজ্ঞানশূন্য গ্রামীণ লোকসমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে ধর্মীয় বিধি-বিধানের দোহাই দিয়ে লোকসমাজে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে অনীহা সৃষ্টি, অন্যদিকে বিবিধ ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের মাধ্যমে মৌলবি সম্প্রদায়ের আখের গুছিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। স্বপ্ন সম্পর্কিত মুখরোচক গালগল্প গ্রামীণ মানুষের মধ্যে ভীতিবোধ জাগ্রত করে। তাই রোগ-বালাইয়ের সংক্রমণকে আসমানী গজব হিসেবে বিবেচনা এবং এর প্রতিকারার্থে মৌলবিদের নির্দেশ মেনে চলার অন্তরালে গ্রামবাসীর মনোলোকে লোকসংস্কারের প্রভাব অনস্বীকার্য। ‘গ’ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হরেয়ছে ভূতুম পেঁচার ডাক সম্পর্কিত লোকসংস্কারের প্রতি হাসিম ও সুফিয়ার ভীতিসূচক মনোভঙ্গি। বাঙালি গ্রামীণ সমাজে রাতের বেলায় এ পাখির ডাক অমঙ্গলজনক,

বিপদের ইঙ্গিতবগ হিসেবে পরিচিত। সুফিয়া সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে, এমন আশঙ্কায় হাসিম উৎকণ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত এরূপ আশঙ্কাই প্রতিফলিত হয়, সুফিয়ার ক্ষেত্রে।

২. লোকসাহিত্য-- বরগুইনি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লোকসঙ্গীত, প্রবাদ ও কিংবদন্তি।

২.১ লোকসঙ্গীত-- এ উপন্যাসে মোট আটটি লোকসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে ছয়টি দুই চরণের এবং দুইটি চার চরণের। বরগুইনি গ্রামের লোকসমাজে প্রচলিত এসব লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু মূলত স্রষ্টার বন্দনামূলক, বৃষ্টির আগমনী বার্তার আকাঙ্ক্ষাসূচক, দুর্ভিক্ষের পরিণতিতে জনজীবনের দুর্ভোগ, ব্যক্তিচিত্তের আকুলতা, প্রিয় মানুষটিকে বিদায়ের কালে বিরহাতুর নারীর বেদনা, লোককবি হাসন রাজার বাউল ভাবনা প্রভৃতি বিষয়কে ভিত্তি করে রচিত। কিছু দৃষ্টান্ত--

ক. কালা মেঘা ধলা মেঘা তারা সোদর ভাই

এক লাচা ঝড় (বৃষ্টি) দে ভিজি পুড়ি যাই। (পৃ. ২০)

খ. দেশ মরি গেল দুর্ভিক্ষের আগুনে

তবু দেশের মানুষ জাগিল না কেনে (পৃ. ২০)

গ. মাটির পিঞ্জরের মাঝে বন্দী হৈয়া রে

কান্দে হাসান রাজার মন মনিয়ারে।

পিঞ্জরের ভিতরে ময়না ছট্‌ফট ছট্‌ফট করে

মজবুত পিঞ্জর ময়না ভাঙ্গিতে না পারে। (পৃ. ৯৯)

খ সংখ্যক গানটি সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত হলেও এ উপন্যাসে চট্টগ্রামের বরগুইনি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যেও প্রচলিত। অর্থাৎ লোকসাহিত্য যে নিজস্ব সামাজিক পরিসর অতিক্রম কওে বৃহত্তর সমাজেও স্বীকৃত অর্জন কওে, তা এ ঘটনায় প্রতিফলিত। লোককবি হাসন রাজার রচিত গানগুলো লোকগোষ্ঠীর গণ্ডি অতিক্রম করে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ গানের বাণী, সুর, ছন্দ ও ভাবাবহ যে লোকসমাজের গণ্ডি পেরিয়ে একালের আধুনিক শ্রোতাদেরও আন্দোলিত করে, তা অনুধাবন করা চলে।

২.২ প্রবাদ-- গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদ এ উপন্যাসের কুশীলবদের সংলাপে প্রযুক্ত হয়েছে--

যদি বৃষ্টি আগনত

মানুষ যায় মাগনত

(অগ্রহায়ণে যদি বৃষ্টি হয়, মানুষ ভিক্ষে করতে বেরোয়।) (পৃ. ৯)

টেঁয়ায় টেঁয়া বিয়ায়। (পৃ. ১৬)

হাত-পাঁচ গুণ্যা চাষ ন গরে ব্যান্যা। (পৃ. ২১)

মেয়েমানুষের মনের গতি কি বোঝা যায়? কথায় বলে বারো হাত কাপড় পড়েও ন্যাংটা থাকে। (পৃ. ২৫)

পরের ধন হরণে গতি নাই মরণে (পৃ. ৩২)

বৈদ্যের পুত নিজের জমিনের ধান বেচি মাইনসে টেঁয়া কামায়। পরের জমিনের ধানদি ছোয়াব কামায়। (পৃ. ৩২)

মেডি আর বেডি তার, জোর আছে যার। (পৃ. ৩৩)

বিধির হুকুম ত কেউ খণ্ডাইতে ন পারে। (পৃ. ৬২)

তেল্যা মাথায় তেল। আতেল্যা মাথা শুকাই গেল। (পৃ. ৬৩)

পূর্ণিমায় চোরেরা যত ঝগড়া. যতো মারামারি করুক না কেন. অমাবস্যার জোতে সকলে একজাত। মহিষের শিং হানতে সোজা। (পৃ. ৬৪)

শামুকের পেটে ভাত রেঁধে খেলেও আড়াই দিনে প্রচার হয়ে যায়। (পৃ. ৬৮)

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। (পৃ. ৭০)

ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে। (পৃ. ৭০)

যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ান হয়, সে সর্ষেতেই ভূত। (পৃ. ৮৬)

২.৩ কিংবদন্তি-- কৃষিকাজের জন্য বৃষ্টির আবশ্যকতাহেতু এর প্রতি গ্রামবাসীর নির্ভরতা প্রকাশিত হয়েছে গাজীকালু ও চম্পাবতীর প্রণয়মূলক কিংবদন্তিতে। লোকসমাজে প্রচলিত এ কিংবদন্তি অনুযায়ী পীর কুলের মধ্যমণি, গাজীকালু ও চম্পাবতীর বিয়ে হয়েছে বৈশাখের সতেরো তারিখে। এরপর সে নববিবাহিত স্ত্রী চম্পাবতীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেন। তাদের স্বাগতম জানাতে আকাশে জমে ওঠা কালো মেঘের দল গুরুগম্ভীর আওয়াজে যেন ঢোল বাজায়, বিজলির আলোতে চারদিক ঝলমল করে ওঠে। সেই উৎসবে বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া সিংহের মতো দুর্বার হুংকারে ভুবনকে মাতিয়ে তোলে। সকলেই জানে, গাজীকালু চম্পাবতীকে বিয়ে করতে চলেছে। অসামান্য রূপবতী চম্পাবতীর চাঁপা-বরণ গায়ের রঙ দেখে গাজীকালুর মায়ের মনে ঈর্ষা প্রবল হয়ে ওঠায় তার প্ররোচণায় এ বিয়ে ভেঙে যায়। মায়ের আদেশে চম্পাবতীকে বিয়ে না করেই গাজীকালু ফিরে যায়। এভাবে অপমানিত চম্পাবতী প্রবল বেদনায় আক্রান্ত হয়ে কাঁদতে থাকে। তার হৃদয়ের বেদনাই চোখের জল হয়ে আকাশের বুকে মেঘ হয়ে জমে, একসময় বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। লোকবিশ্বাস, একমাত্র কেয়ামতের দিন তাদের বিয়ে হবে। তার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে গাজীকালু ও চম্পাবতীর বিচ্ছেদজনিত সম্পর্ক, যার পরিণতিতে বছর বছর বৃষ্টিপাত হবে, ফসল ফলবে এবং মানবজীবন ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। একমাত্র কেয়ামতের দিন গাজী পীর রাজার কন্যা চম্পাবতীকে বিয়ে করতে পারবে, এরূপ লোকবিশ্বাসও এ কিংবদন্তির অন্তর্গত। প্রকৃতি ও মানবপ্রেমের আন্তঃসম্পর্ক এ কিংবদন্তিতে এভাবেই রূপায়িত।

৩. লোকচিকিৎসা-- গ্রামীণ লোকসমাজে রোগবালাই, ক্ষত-জখমের আঘাত থেকে প্রতিকারের জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা প্রচলিত। এসব মূলত পূর্বসূরীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান ও কৌশল, যা তাদের সাহায্য করে আকস্মিকভাবে কোনো প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করতে। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে অরণ্যের ওপর লোকসমাজের নির্ভরশীলতা বহুকাল ধরেই প্রচলিত। এ উপন্যাসের ‘দুই’ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, হাসিম বন থেকে বাঁশ কেটে দ্রুত বাড়ি ফেরার সময় চড়াই বেয়ে নামতে গিয়ে হাত দেড়েক লম্বা কাটা বাঁশের চোখা একটি ফালি তার পায়ের তলা দিয়ে সেঁধিয়ে পাতার ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে ক্ষতস্থান বেয়ে গড়িয়ে নামা রক্তস্রোত থামাতে সে সেই স্থানটি দ্রুত বেঁধে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় কোমরের গামছা দিয়ে। এক্ষেত্রে সে প্রথমে দু’হাতে শরীরের সমগ্র শক্তি জড়ো করে হেচঁকা টানে বেঁধে

যাওয়া ফালিটি বের করে নিয়ে আসে। তারপর কিছু লতাপাতার রস চিপে গামছাতে কষে ক্ষতস্থান বেঁধে নেয়। সে বাড়ি ফিরে এলে তার স্ত্রী সুফিয়া সাবধানে পায়ের পট্টিটি বদলে দেয়। সে এরপর সেখানে গাছ-গাছড়ার পাতা, মূল, শেকড় পিষে ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগায়। হাসিমের পায়ের ক্ষতস্থানে সে বাটা টোটকা ওষুধের প্রলেপ এবং মানকচু পাতা গরম করে সেঁক দেয়। 'ছয়' পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব সংক্রান্ত ঘরোয়া চিকিৎসাপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হাসিমের সন্তানসম্ভবা স্ত্রী সুফিয়ার প্রসবব্যথা উঠলে জোহরা তাকে সহায়তায় এগিয়ে আসে। সে দ্রুত একটি দড়ি টানিয়ে সুফিয়ার পা দুটি সেটির ওপর তুলে দেয়, যাতে নবজাতকের পক্ষে মার্তগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া সহজ হয়। হাসিমকে জোহরা পরামর্শ দেয় মুন্সীপাড়ার করিম বকসুর মাকে ডেকে আনতে। কেননা সে ধাত্রী হিসেবে অভিজ্ঞ। সে এসে প্রয়োজনীয় কাজ করতে শুরু করে। ইতোমধ্যেই বাড়িতে সমাগত প্রতিবেশী নারীদের একজনের পরামর্শে সে জহির মৌলবির বাড়িতে যায় খালাসী পানি পড়ার আনতে। কোরআন তেলাওয়াত করে ফু দেয়া এ পানি পান করলে প্রসূতির ব্যথা কমবে, এরূপ লোকবিশ্বাস অনুযায়ী তা ছড়িয়ে দেয় হয় সুফিয়ার দেহে। এর পাশাপাশি দোয়া লেখা তাবিজও বেঁধে দেয়া হয় একই উদ্দেশ্যে। প্রতিবেশী নারীদের একজন জানায়, বাচ্চা প্রসব হওয়ার আগ পর্যন্ত মায়ের মাথার চুল একটি পাত্রে ভিজিয়ে রাখলে তবেই সুফিয়ার সন্তান প্রসবজনিত ব্যথার উপশম ঘটত। সেকারণে জোহরা তার নির্দেশ মান্য করে। একপর্যায়ে সুফিয়ার ছেলে ভুমিষ্ঠ হলে করিম বকসুর মা ধারালো বাঁশের ফালি দিয়ে নাড়ী কেটে দেয়।

৪. লোকখাদ্য-- বরগুইনি গ্রামে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ এ উপন্যাসে লক্ষণীয়--

> (হাসিম) সেই কবে সাতসকালে দু'টো পানিভাত খেয়ে বেরিয়েছে। (পৃ. ১১)
>
> সুফিয়ার হাতে তৈরি আমের আচারের ক্বাজী আর সুটকীর ভর্তা অমৃতের মতো লাগে। (পৃ. ৫৯)
>
> সালুনের ভাত খাওয়ার পর দৈয়ের ভাত নিয়েছে পাতে মেহমানেরা। ধোপাছড়ী থেকে আগে বায়না দিয়ে মহিষের দৈ আনিয়েছে। (পৃ. ৬৬)

৫. লোকভাষা-- এ উপন্যাসের ভাষারীতি সম্পর্কে লেখকের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু কুশীলবরা চট্টগ্রামের বরগুইনি ও সাতবাড়িয়া গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দা, তাই তাদের আলাপের অবলম্বন হয়ে উঠেছে এতদঞ্চলের প্রচলিত লোকভাষা। লেখক চট্টগ্রামের ভাষাগত দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই পাঠকের বোধগম্যতার প্রয়োজনে উপভাষাশ্রিত প্রতিটি সংলাপের পাশে বন্ধনীতে উল্লেখ করেছেন সেটির পরিমার্জিত চলিত গদ্যরীতি আশ্রিত বাক্যরাশি। এ উপন্যাসে প্রযুক্ত লোকভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শব্দভাণ্ডার ও বাগধারায় প্রতিফলিত হয়।

৫.১ শব্দভাণ্ডার

> বিশেষণ– ঝিকঝিকিয়ে, লকলকে, খাড়া, থমথমে, গুমোট, হেঁচকা, রাঙিয়ে, ভুলিয়ে, মিইয়ে, তামাটে, গলানো, ঝিকিমিকি, ফোলা, এলিয়ে, বুঁজে, ছ্যাকা, পিছল, ঘাঁট, আঁজলা, টেরছা, ঝলসে, চওড়া, লিকলিকে, ঢেঙা, ফুটি-ফাটা, খিটিমিটি, মিনমিনে, আচমকা, ছমছম, ভাংচি, ভিজিয়ে, ঝিলিক, ফুটো ইত্যাদি।
>
> ক্রিয়া– ডলতে, চিপে, ঝেড়ে, ধোয়া, মেলে, ঝেড়ে, চুরমার, ছুঁড়ে, টেলে, দাপাদাপি, ধড়ফড়ানো, খুঁচিয়ে, নেড়েচেড়ে. বাজায়, জ্বালায়, ভেঙে, পুড়ি, বয়ে, বেড়ায়, সেঁধিয়ে, সটকে, বেঁধে, চিপে, কষে, কঁকায়, পিষে, ভুলিয়ে ইত্যাদি।
>
> দেশজ শব্দ– গাই, ঢোড়া, খরা, খোল, লাকড়ি, গিঁট, ঝুপ, মই, ডুলা, জাল, খেপ, সড়াত, ধনুক, ডাঙা, খাবি, বিল, ভাকি, উঠোন, ঝাঁপ, ছেঁদা, ছাই, চুলো, ছিটকা, চাল, ফালি, বাটালি, বিয়ায়, বোবা, তালি, বিছুটি, টিপ্পনী, হাঁপর, ভিটা, গ্যাঁট, খাঁক, ঢোলক, বিজলি, বাছুর, লাঙ্গল, জোয়াল, ছুরি, ফলা, আল, বেনে, প্যাঁক, থাবা, সেঁক, শন, ঢোল, ভাটি, টোটকা ইত্যাদি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– আসে>আগনত, ভাগ্য>ভাগ্যি, পাকা>পাক্কা, চক্র>চক্কর, রাতে>রাতিয়া, কেন>কিল্লাই, চলে>চলি, টাকা>টেয়া, করতে>গইরত, কে>কনে, দুনিয়া>দুইন্যা, গেছে>গেইয়ে, আজ>আজুয়া, ছেলে>পোয়া, ডাকাত>ডাহাইত, কাল থেকে> কাইলধুন, খুঁত>খুতা, বানিয়েছে> বানাইয়ে, জন্য> লাই, গাওয়ার>গাওনের, গ্রাম>গেরাম, ধুয়ে>ধুই, বেদেনি>বাদ্যানী, অবিবাহিত>অবিয়াত্যা ইত্যাদি।

অনুকার অব্যয়– গনগনে, টুংটাং, চিঁহি, শরশর, কুঁক ঝমঝম, খচখচ, ঝরঝর, শোঁ শোঁ, গুনগুন, মিহিমিহি, তিরতির, লকলকে, খচ খচ, ধু ধু, টনটন ইত্যাদি।

শব্দদ্বৈত– ধিকিধিকি, ধুকে ধুকে, ডলতে ডলতে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, ফালি ফালি, চিপে চিপে, ছলছল, টিপে টিপে, দুরু দুরু, বড়ো বড়ো, নেড়ে নেড়ে, ছমছম, সাঙ্গা পাঙ্গো, ঘুরে ঘুরে, দলা দলা, থিক থিকে ইত্যাদি।

৫.২ বাগধারা

শাশুড়ীর বিছানায় জামাইকে শুইয়ে যে-লোক ঠাঁট বজায় রাখে সে কাজী সাহেব (পৃ. ২৩)
আনন্দে খলু মাতব্বর বগল বাজাচ্ছে। (পৃ. ২৫)
আঁই কি কনদিন কেউর কেচা আইলত পারা দিই-না পনা (পাকা) ধানেত মই দিই? (পৃ. ৩১)
এ কথা বুড়ো জানে-হাড়ে হাড়ে জানে। (পৃ. ৩১)
রমজু কিন্তু উচিত দামে জাহেদ বকসুর কাছেই ভিটে বেচে খাল কেটে কুমীর এনে দিলো। (পৃ. ৩৭)
চারদিকে নতুন পরিবেশ। দেখেশুনে চন্দ্রকান্তের চোখ তো চড়কগাছ। (পৃ. ৫২)
ম্যাও ধরবে কে? (পৃ. ৭০)

এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিশ শতকের চল্লিশের দশকের পটভূমিতে গ্রামীণ জনজীবনের ভাঙন ও ভূমিনির্ভর মানুষের গ্রাম চেড়ে শহরের অভিমুখে যাত্রার নির্মম বাস্তবতাকে রূপায়িত করা হয়েছে। এরই সূত্র ধরে বরগুইনি ও সাতবাড়িয়া গ্রামদ্বয়ের বাসিন্দাদের লোকজচেতনার সংক্ষিপ্ত প্রতিফলন এতে বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, লোকসংস্কৃতি এসব মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই প্রাত্যহিক জীবনে তারা একে অবলম্বন করে সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠে। একারণেই এ উপন্যাসে লোকসাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হরিপদ দত্ত

মার্কসীয় রাজনৈতিক বীক্ষাকে অবলম্বন করে আশির দশকের শক্তিমান কথাশিল্পী[১২৫] হরিপদ দত্তের (১৯৪৭) সাহিত্যাঙ্গনে পথযাত্রা শুরু হয়। কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিকোণ বা শিল্প রচনার আবেগ-উদ্দীপনাতাড়িত হয়ে তিনি লেখনী চালিত করেননি।[১২৬] বরং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে আত্মত্যাগী-দুর্জয় মনোভঙ্গি তিনি গণমানুষের সমষ্টিচেতনায় লক্ষ্য করেছেন, তা সময়ের অগ্রসরতায় কীভাবে ক্রমশ কলুষিত ও অবক্ষয়ী রূপ ধারণ করে, তা অনুধাবনে তিনি বরাবর সচেষ্ট। [১২৭] বাংলার গ্রামীণ সমাজের সামূহিক বিপর্যয় ও ভঙ্গুর অবস্থার স্বরূপ নির্দেশে তিনি পক্ষপাতশূন্য, ভাবাবেগমুক্ত। গল্প লেখার মাধ্যমে তিনি অন্তর্লালিত রাজনৈতিক আদর্শ[১২৮] ও মূল্যবোধের রূপায়ণে আগ্রহী হলেও একপর্যায়ে উপন্যাসকেই তিনি অভীষ্ট বক্তব্য গ্রন্থনার শিল্পরূপ হিসেবে নির্বাচন করেন। m‡hi Nv‡Y †div (১৯৮৫) এবং †Rvqvj fvOvi cvjv (১৯৮৫) গল্পগ্রন্থ দুটি দিয়ে গল্পকার হিসেবে পাঠকসমাজে আবির্ভূত হলেও এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত আয়তনের উপন্যাস ঈশানে অগ্নিদাহ ও অন্ধকূপে জন্মোৎসব দিয়ে নিজের স্বকীয় অবস্থানকে সুচিহ্নিত করেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ শতকের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সামগ্রিক রূপটি গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরতে তাঁর যে প্রয়াস, তা তাঁর

লেখকজীবনের প্রথম পর্যায়ের মৌল প্রবণতা। কিন্তু একজন পরিশ্রমী, অনুধ্যানী, নিরীক্ষাপ্রবণ কথাসাহিত্যিকের ব্যাপক পঠনগত মনন, শিল্পীমানসে সন্নিহিত নবতর বোধ ও সংবেদনার প্রতিফলন [১২৯] তাঁর লেখনীতে বিধৃত হয়েছে একুশ শতকে লিখিত উপন্যাসগুলোতে। এ পর্যায়ে তিনি পূর্বতর ধারা থেকে সরে এসে বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় ও তার রূপরূপান্তরের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে সচেষ্ট। এক্ষেত্রে তাঁর লেখনী নিরীক্ষাপ্রবণ, আত্মজিজ্ঞাসু, পরিশ্রমনিষ্ঠ, সামগ্রিক বোধের পুঞ্জীভূত রূপকে শিল্পভাষ্যে বিন্যস করে। গ্রামীণ পরিমণ্ডলের আদ্যোপান্তকে লেখার প্রতিপাদ্য করতে তিনি ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করেন লোকমানুষের নিত্যদিনের পরিশ্রমক্লিষ্ট জীবনযাত্রা, বিশ্বাস-সংস্কার ও পারিবারিক মূল্যবোধ, লোকপুরাণের ভুবন[১৩০] ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অনুরাগ, ধর্মীয় ঐতিহ্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িত চেতনাকে [১৩১] গতানুগতিক, প্রচলিত, সংলাপাশ্রিত, বর্ণনাধর্মী রচনার প্রতি তাঁর রয়েছে প্রবল বিরাগ। রাজনৈতিক বীক্ষা, ব্যক্তিক মনন আর প্রত্যাশিত জীবনাভিপ্সার সমন্বয় ঘটায় তাঁর লেখনীতে ইতহাস, অতীত ও বর্তমানের পরিসরে সৃষ্টি হয় বৃহত্তর বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল, যা পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে উপন্যাসে বিধৃত বক্তব্যকে অনুধাবনে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো Ckv‡b AwMœ`vn, AÜK‡c R‡bœvrme, iæ× ‘qv‡i nvZ, ‘wweo Mvg, ARMi, wcZnZ¨vi ivZ, AwMwe›‘, wP¤K cvnv‡oi RvZK, Rb¥ Rb¥vš—‡ii প্রভৃতি।

ঈশানে অগ্নিদাহ

হরিপদ দত্তের সাহিত্যকর্মে রাজনৈতিক বীক্ষা বরাবর তাৎপর্যবহ মাত্রায় উন্নীত হয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতায়। মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বকে ভিত্তি করে তিনি গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক রূপরেখাকে লেখনীর প্রতিপাদ্য করে তোলেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধের পটভূমিতে তদানীন্তন বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার রূপায়ণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের করালগ্রাসে বিপন্ন মুসলমান কৃষকসমাজের সামূহিক বিপন্নতার চালচিত্র তাঁর শিল্পীমানসে বরাবর সক্রিয় ছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস Ckv‡b AwMœ`vn [১৩২] (১৯৮৬)-তে একদিকে ভূমিচাষী, ক্ষেতমজুর, কামলা ও রায়তেরা, অন্যদিকে জোতদার, ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও গ্রামের মাতবর-- মোটাদাগে এ দুই শ্রেণির সংঘাতপূর্ণ সম্পর্কের বিন্যাস ভাষ্যরূপ পেয়েছে। বংশানুক্রমে পূর্বপুরুষের পেশায় নিয়োজিত কৃষকসমাজের খেয়ে পড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার ন্যূনতম আকুতি কর্তৃত্বপরায়ণ মহাজনশ্রেণির নিকট যে তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, এর মূলে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক শক্তিকে নিজেদের স্বার্থে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগের সামর্থ্য। কিন্তু অস্তিত্বসংগ্রামে হার না মানা অকুতোভয় মানুষেরাও যে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সফল হয়, এর রূপায়ণই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় ভাবসত্য। কোনো নির্দিষ্ট নামের উল্লেখ না থাকলেও নরসিংদির যে গ্রামটিকে লেখক এর ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু

হিসেবে নির্বাচন করেছেন, প্রকারান্তরে তা সমগ্র বাংলাদেশেরই রূপক। এ গ্রামের লোকসমাজভুক্ত মুসলমান বাসিন্দাদের জীবনাচার, অভ্যাস, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ভাষাভঙ্গি, সাংস্কৃতিক চেতনা প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লোকমানসের বিশ্বস্ত ভাষ্যরূপ লেখকের সংযমী অথচ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে নিপুণ শিল্পভাষ্যে উন্নীত হয়েছে। এ উপন্যাসের বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকজ উপাদানের সন্ধান মেলে।

১. লোকবিশ্বাস–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে। গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের ভাবনার স্বরূপ অনুধাবনে এসবের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 'এক' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সাপের মুখের গ্রাসে পরিণত ব্যাঙের ছটফটানি শুনে আবদুল্লা একসময় ভয় পায়। কারণ ধানক্ষেতে সাপের উপদ্রব রয়েছে। ঢোরা সাপের কামড় বিষাক্ত না হলেও গোখরার দংশনে যে কেউই স্বল্পসময়ে মৃত্যুবরণে বাধ্য। তাছাড়া পুরুষ গোখরা কামড়ালে রোগীকে আর রক্ষা করা যায় না, এমন বিশ্বাস লোকসমাজে প্রবল। সেকারণেই দুদিন আগে একটি শঙ্খিনী সাপের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা স্মরণ করে সে নিজের কপালের বরাত দেয়। তার ধারণা, নেহাত কপালের জোরেই সেটি গোখরা সাপ না হয়ে শঙ্খিনী ছিল এবং তাকে না কামড়ে তার হারিকেনটিকে ছোবল দিয়েছিল। আবদুল্লাহ ব্যাঙ ধরতে গিয়ে আউশের খামার পেরিয়ে রজব আলী মোড়লের বাড়িসংলগ্ন বাঁশবনে আসে। সেখানে দিনভর বাঁশের মাথায় ঝুলতে থাকা বাদুরের ঝাঁককে সে জ্বিন ভাবে । কেননা, লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, বাদুর হলো জ্বিনের জাত। আর গ্রামে যেহেতু পরহেজগার মানুষ নেই, তাই বাদুরও গ্রাম ছেড়ে এই বাঁশবনে লুকিয়ে থাকে। 'এগার' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, আবদুল্লার পিতা জমির আলী জমির ধান কাটার সময় জমির আলী মৃত একটি কচ্ছপের খোলস পেয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। গ্রামবাসীর মধ্যে এ সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস হলো, এটি গোয়ালঘরে রাখলে পালিত গরুর রোগবালাই, বিপদাপদ হবে না। সাপ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস হলো, কামিনী ফুলের মোহময় গন্ধে সাপ সম্মোহিত হয় এবং গাছের গোড়ায় আসে। 'বার' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, আবদুল্লার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে সাবিহার দেখা হলে তারা আলাপ করতে করতে দুলু তরফদারের ডেরার কাছে চলে আসে। সেখানে বেড়ে ওঠা কামিনী গাছে ফোটা ফুলের সুগন্ধে সাবিহা আহ্লাদিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আবদুল্লার কাছ থেকে সাপ সম্পর্কিত বিশ্বাসের কথা শুনেই সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

২. লোকসংস্কার–– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো লোকমানুষের স্বপ্ন-প্রত্যাশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের স্মারক। ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে ছাপিয়ে সমষ্টিমানুষের কাছে এসবের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো, এতে নিহিত থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও ধারণা। প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেউ রক্ষা না করলে তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয়া প্রাচীন লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত। 'চার' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, রজব আলী মোড়ল নিজের জমি রক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী রাস্তা কেটে দিলে জমে থাকা পানিতে আবদুল্লার ক্ষেতের ধান তলিয়ে নষ্ট হয়। এর প্রতিকার হিসেবে আগামী মৌসুমে ধান ফলানোর সময় পানির পাম্প দিয়ে ক্ষেতে পানি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি মোড়ল দিয়েছিল। এর খরচ আবদুল্লার পরিশোধ করার কথা ছিল ফসল তোলার পর। কিন্তু মোড়ল সেই প্রতিশ্রুতি না রাখায় আবদুল্লা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কুতুবউদ্দিন উত্থাপন করে বদদোয়ার প্রসঙ্গ––

> 'নুহ নবীর জামানার হেই ওয়াদা কি আইজ মোড়লের মনে আছে?' ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে কুতুবউদ্দিনের মুখ। বিড়িটা এগিয়ে দেয় আবদুল্লার হাতে, 'ক্ষতগুলা অহন খালি চায় পানি। পানি না পাইলে জমিনের একটা বদদোয়া আছে না? খোদার কাছে কবুল অইবনা বদদোয়া? বেশী ভালা অইব মোড়লের?' (পৃ. ২৫)

অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় 'দশ' পরিচ্ছেদে। মেম্বারের ছেলে হেলালের কাছে নিজেদের ধানী জমিটুকু বিক্রি করতে রাজি না হলে সে লোকজনকে দিয়ে আবদুল্লার জমির ধান কেটেই ক্ষান্ত হয় না। বরং জাল দলিল দেখিয়ে

আদালতে মিথ্যা মামলা করে হেলাল সেই জমি নিজের নামে লিখিয়ে নেয়। এর ফলে জমির আলীর চরম বিপদে পড়তে হয় স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। তার স্ত্রী ফুলবিবি এর প্রতিকারে ব্যর্থ হয়ে হেলাল ও তার বাপের নামে অভিশাপ উচ্চারণ করে, 'খানে দজ্জালের বিচার করব না খোদায়? আমার চুক্কের পানি মিছা অইব? কবুল অইবই খোদার ঘরে। পোক পইড়া মরব মোড়লের গোষ্ঠী!' (পৃ. ৫৬)। যদিও তার অভিশাপে হেলালের বৈষয়িক বা সাংসারিক অবস্থায় কোনোরূপ দুর্বিপাক সৃষ্টি হয়নি, তবু এভাবেই সে তার ও পরিবারের ওপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিকারার্থে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়।

জ্বিন সম্পর্কিত লোকসংস্কারের উল্লেখও এ উপন্যাসে রয়েছে। খালি পেটে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পানি পান করায় আবদুল্লার পেট ব্যথায় মোচড়ালে এজন্য ফুলবিবি তাকে তিরস্কার করে। তার মতে, জমির আলী বয়স্ক মানুষ। উপরন্তু সে আবদুল্লার বাপ। তাই ছেলে বাপের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করায় খোদা নারাজ হয়ে তাকে এভাবে শাস্তি দিচ্ছে। কিন্তু জমির আলী এ কথা অগ্রাহ্য করে। তার মতে, আবদুল্লা সাঁঝবেলায় অর্থাৎ ভর সন্ধ্যায় খেতে বসেছে। এসময় নাকি জ্বিনরা খায়। সেকারণেই জ্বিনদের নজর লেগে তার পেট ব্যথা করছে বলে জমির আলী জানায়। 'যুক্তিটা মেনে নেয় ফুলবিবি। পানের উল্টো পিঠে তেল মেখে নাভিতে ডলে দিতে দিতে বিড়বিড় করে, 'নিয়ম মানবনা পোলায়, বালা-মছিবত অইবনা ক্যা? হাইনজ্যা বেলা বুঝি ভাত খায় ইনসানে? জ্বিন পেত্নীর খানির সময় খানা খাইলে হারাম অয়না?' (পৃ. ২৮-২৯)। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে নেই। তাহলে সেই ব্যক্তি অসুখে ভোগে। তাছাড়া নারীর চুল রাতের বেলায় খোলা রাখলে তার ওপর জ্বিন ভর করে। সেই জ্বিন তাড়াতে হাতের কাছে লোহা রাখতে হয়। এসব লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত রয়েছে উপন্যাসের 'আট' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হেলাল ও সাবিহার দাম্পত্য আলাপে--

> ঘরে ঢুকে মেজে পড়ে থাকা নিজের ছায়ার দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকে সাবিহা। বিছানা থেকে হেলাল বলে, 'কি অইল? নিজের ছায়া দ্যাখলে বিমার অয় জাননা?' ... যেন সম্বিৎ ফিরে পায় সাবিহা। বড় কষ্টে নিজের ভেতর গোপন করে নিঃশ্বাস। ফিরে আসে বিছানায়। একটানে সাবিহার খোপা ভেঙে ফেলে হেলাল। ... 'আরে এ্যাইডা করলা কি?' প্রতিবাদ করে সাবিহা, 'বৌ-ব্যাটির চুল রাইতের বেলা খোলা রাখলে জ্বিনের আছর অয়না?' ... হেলাল হাসে। সাবিহার একটা হাত তুলে নেয় নিজের হাতে, 'এ্যাইত দ্যাহি লোহার চুড়ি। ক্যামনে ধরব জ্বিনে?' (পৃ. ৪৭)

'এগার' পরিচ্ছেদে গ্রামীণ লোকসমাজে কৃষি সংক্রান্ত কিছু লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত উল্লেখিত। যেমন– জমিতে উর্বরাশক্তি ও ফসলের ফলন বাড়াতে শবেবরাতের রাতে জমির আলে মোম ও আগরবাতি জ্বেলে দেয়ার রীতি প্রচলিত বলে জানা যায় আবদুল্লার স্বগতোক্তিতে। এ ধরনের ভাবনা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হবার পর থেকে লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টম শতক থেকে এদেশে আরবীয় বণিকরা আসতে শুরু করে চট্টগ্রামে। পরবর্তী কয়েক শতক ধরে পীর-দরবেশ, আউলিয়া ও ফকিররা আরব-ইরানের ইসলামী মূল্যবোধ, সুফিবাদ প্রভৃতি প্রচার করতে থাকে। অন্যদিকে, আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা ভূভাগে খেলাফতি ও শরিয়তি আন্দোলনসমূহের প্রবল প্রভাব লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের আচরণে সনাতনী লোকসংস্কারের পাশাপাশি ইসলামী ভারধারার প্রতিফলনও ঘটতে থাকে। এ উপন্যাসে উল্লেখিত লোকসংস্কারে ইসলামী শাস্ত্রবিধি অনুপস্থিত হলেও লৌকিক সংস্কার সক্রিয় থেকেছে । জমির ফসলের প্রতি কোনো লোভী, শঠ ব্যক্তির দৃষ্টি পড়লে তা এড়াতে গরুর মাথার খোল লাঠির মাথায় গেঁথে ক্ষেতের মাঝামাঝি পুঁতে রাখার নিয়ম ছিল, ধানের থোর ধরার সময়। তাছাড়া কচিধানের ছড়ায় মুখ লাগালে সেগুলো নষ্ট হয় বলে লোকসংস্কার প্রচলিত।

৩. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে নরসিংদির গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত ছড়া, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ, রূপকথা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয়, শুধু সৃষ্টিশীলতার দৃষ্টান্ত হিসেবেই নয়, বরং প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের সঙ্গে আলাপচারিতায়ও এসবের ভূমিকা রয়েছে।

৩.১ ছড়া-- এ উপন্যাসে দুটি ছড়া পূর্ণাঙ্গভাবে এবং পাঁচটি ছড়ার অংশবিশেষ (দুই চরণ) উল্লেখিত। মূলত গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসব ছড়ায় ফুটে উঠেছে। এসব ছড়ায় অবলীলায় প্রকাশিত হয়েছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তামাক-পান-সুপারি খাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, বয়োসন্ধিকালে নর-নারীর আচরণ ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত, বিয়ে ও সংসার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ। উত্থাপিত। 'ক' সংখ্যক ছড়াটি উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে আবদুল্লাহর স্মৃতিচারণে, যেটি সে ছেলেবেলায় আবৃত্তি করত তার বাবাকে নিয়ে পরিহাস বা ক্ষ্যাপানোর জন্য। 'খ' সংখ্যক ছড়ার মূল অনুষঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পান-তামাক-সুপারী খাওয়াকে ঘিওে আবর্তিত। ফুলবিবির স্মৃতিচারণায় এ ছড়াটি উপন্যাসে বিবৃত। ছেলে আবদুল্লাহর প্রেম সম্পর্কিত গুজব শুনে তার পিতা-মাতার উদ্বেগের সূত্রে 'গ' সংখ্যক ছড়া উপস্থাপিত। 'ঘ' ও 'ঙ' সংখ্যক ছড়া দুটি গ্রাম্য বালকবালিকাদের মুখে আবৃত্ত, সাবিহার বিয়ের অনুষঙ্গে। অন্যান্য ছড়াগুলোও গ্রামের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা-সংশ্লিষ্ট বিধায় উপন্যাসে গ্রন্থিত।

ক. চাপিলা চোপিলা

ঘন ঘন মাছিলা

নলের ডাবা নলের বাঁশি

নল থাইক্যা একাদশী

নলের আগায় ডোরা সাপ

ফাল দিয়া উঠলো বুইড়া বাপ

বুইড়া বাপে তামুক খায়

হগল ঘরে ধোঁয়া যায়। (পৃ. ১০)

খ. এক পয়সার আনলাম গুয়া নয়টা

খাইতে খাইতে রইল গুয়া একটা

যে নিল চিড়-চিড়, হে নিল মুঠের মুঠ

গুয়ার বাটায় লাগল মগের লুট। (পৃ. ১৬)

গ. পোলার উঠে দাড়ি

ঘুরে বাড়ি বাড়ি।

ঝিয়ের উঠে তন (স্তন)

মা'য় না পায় মন। (পৃ. ১৭)

ঘ. কাউয়ায় কলকলায়রে গাছের গোটা খাইয়া

ঢুপি (ঘুঘু) বইসা রইছে পানের বাটা লইয়া।

আইজকা ঢুপির ল্যাটা প্যাটা

কাইলকা ঢুপির বিয়া।

ঢুপিরে যে নিতে আইব

সোয়ানয় কড়ি দিয়া। (পৃ. ২২)

ঙ. বা'জানের হাউড়ীর শাঙ্গা,

ঢোল আনল ভাঙ্গা।

ঢোলে করে ঠ্যাট-ঠ্যাট,

বা'জানের হাউড়ীর ঘইট্যা প্যাট। (পৃ. ২২)

চ. কৈ অইল হাইছার বাড়ি/কৈ আমি ডাক পাড়ি।' (পৃ. ১০)

ছ. ডরাইলেই ডরে পায়/ গাছে উঠলে মধু খায়। (পৃ. ১৪)

জ. আমি করি ঝি ঝি, ঝিয়ে করে লাঙ-লাঙ! (পৃ. ২১)

ঝ. যে না বুঝে টিপের ভাও/ তার লগে না টিপটিবাও।' (পৃ. ২৭)

ঞ. যার লাইগ্যা আওতা বেড়া/সে-ই আইসা দুয়ারে খাড়া। (পৃ. ৪৩)

৩.২ প্রবাদ-- গ্রামীণ সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, লোকমানুষের বহুকালের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা, ভাবনা যেহেতু তাদের উচ্চারিত ভাষায় বহুলাংশেই ফুটে ওঠে, তাই প্রবাদের সাবলীল ও হরহামেশা প্রয়োগ তাদের আচরণে লক্ষণীয়--

লাভের গুড় ত ওড়লা পিঁপড়ায় খায়। (পৃ. ১০)

কানারে পথ দ্যাখাইলে যা, ঠ্যাং দ্যাখাইলেও তা।' (পৃ. ২৮)

যেই দিক থাইক্যা বিষ্টি আইয়ে হেই দিকে মাথাল না ধইরা উপায় আছে? (পৃ. ২৮)

ধানের গোলায় যার জোর নাই, গতর মনেও জোর তার উনা। (পৃ. ২৯)

আপনা পোলা লাঙ্গলের গাদাও ভালা (পৃ. ৪৩)

যেই জাতের বিষ সেই জাতের ওঝা ছাড়া কাম অয়নি? (পৃ. ৪৪)

যেমুন দামড়া তেমুন দড়ি ছাড়া চলে? (পৃ. ৪৫)

চালুনি কয় ঝাঁজররে, তুই বড় ছেদা-ছেদা (পৃ. ৪৬)

নিজের পাছায় সাত বোঝা গু/ পরেরে কয় পাছা ধো (পৃ. ৪৬)

পুরুষে লড়লে-চড়লে বাপের ভিটা বাড়ে, হুইয়া বইয়া থাকলে বাপের ভিটা মরে। (পৃ. ৪৭)

লকপকা বাড়ন্ত কুমড়ার ডগা অল্প বাতাসেই ভাইঙ্গা যায় (পৃ. ৫০)

ভাই-ভাই, আপনা ভাই, পর-পর, পরের থাইক্যাও পর। (পৃ. ৫১)

কানা আর বয়রার কি দুশমন আছেরে? (পৃ. ৫৬)

মোটে মায় রান্ধেনা তন্তা আর পান্তা (পৃ. ৫৭)

লোকে কয়, খেটে মরে একজন, বসে বসে লাভের হিসেব করে আর একজন। হ্যাঁ, কাপড় ভিজেনা যার/ বোয়াল মাছটা তার (পৃ. ৬৪)

জোঁকের বাচ্চা জোঁকই হয়। (পৃ. ৭০)

ছায়ারে পাও দ্যাহাইলে, ছায়ায়ও পাও দ্যাহায় (পৃ. ৭১)

উচিত কতায় মানুষ বেজার, তাতা ভাতে বিলাই বেজার (পৃ. ৭১)

যেই দ্যাশে বিচার নাই, হেই দ্যাশে হাকিম অইতে অয় নিজেগর (পৃ. ৭১)

ঘরের বিবি আর পালের গরুতে যার উজান নাই তকদির-নসিব জবর মন্দ তার। যার নাই পালে গরু হেয় অইল দুনিয়ার হরু (অভাগা)। (পৃ. ৭৫)

কালাছাগল, ধলাছাগল, চামড়া ছোলাইলে বেবাকেরই গোশতের রং এক (পৃ. ৭৯)

জান বাঁচান ফরজ (পৃ. ৮২)

৩.৩ রূপকথার অনুষঙ্গ–– এ উপন্যাসে রূপকথার জ্বিন, রাক্ষস প্রভৃতি ক্ষমতাধর, খল চরিত্রের সাদৃশ্যে রূপক হিসেবে গ্রামের মোড়ল, ইউনিয়র পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও মেম্বাবের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কেননা, সাধারণ মেহনতি মানুষ পরিজন নিয়ে দুবেলা দুমুঠো ভাত খাওয়ার সামর্থ্যও একপর্যায়ে হারিয়ে ফেলে কর্তৃত্বশালী শোষকগোষ্ঠীর নিষ্পেষণে। মেম্বারের ছেলে হেলাল আবদুল্লাহ ও কুতুবউদ্দিনের জমি ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করার জন্য যেভাবে প্রশাসনকে নিজের কব্জায় এনেছিল, তার সঙ্গে রূপকথার মটকির অলৌকিক শক্তিতধর জ্বিনের প্রতিতুলনা মানানসই। অন্যদিকে ছেলেবেলায় মায়ের কাছে শোনা রূপকথার রাজপুত্রের মতোই দুঃসাহসী আবদুল্লাহ শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশী ভ্রমরের আড়ালে অশুভ শক্তির প্রতিনিধি রাক্ষসরূপী হেলালের মৃত্যু নিশ্চিত করে ধারালো সড়কির আঘাতে। রূপকথার রূপকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লোকমানসে তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করে।

আসছে ... আসছে, তার হাতে তামাম প্রভুত্ব আসছে। হ্যাঁ, মটকির ভেতর থেকে ধোঁয়ার সাথে বেরিয়ে আসছে পরাক্রমশালী জ্বিন। (পৃ. ৪৯)

মনেপড়ে আরো কত কি। কিসসা শোনাত মা তাকে। কিসসার মাঝে ছিল কত গান। আজো কি মা মনে রেখেছে সে সব? সেই গানগুলো? গান গেয়ে মা বলতো কেমন করে সেই আদমখোর রাক্ষসটাকে খতম করেছিল রাজার ছেলে। দীঘির অতলে নাকি কৌটায় ভোমর হয়ে লুকিয়েছিল রাক্ষসটার রুহু। রাজার ছেলে ভোমরটাকে খুন করতেই ছটফট করে মরে গেল রাক্ষস। ... হ্যাঁ। সেই রাক্ষস! ভাবতে ভাবতে বিছানায় গড়াগড়ি খায় আবদুল্লা। মোড়ল বাড়ির আদমখোর রাক্ষস। কোথায় কোন দীঘিতে তার পরান ভোমর লুকিয়ে? রাজার ছেলের মত পারবেনা কি সে তার ঠ্যাঙ ভাঙতে? রুই মাছের পেটীর মতন তেল-তলা সরস ক্ষেতটা কেড়ে নিল যে রাক্ষস, তার কলজেটা না ছেঁড়ার আগে নাগাদ আসান কই? (পৃ. ৬২)

৩.৪ লোকসঙ্গীত–– এ উপন্যাসে ছয়টি লোকসঙ্গীতের উল্লেখ রয়েছে। এসব গানের উপজীব্য হিসেবে বয়স্ক মানুষের হুকায় ধুমপান, নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রণয়, বিরহভাবনা, গৃহস্থালী প্রসঙ্গসমূহ লক্ষণীয়। যেমন–

ক. ডাবা আমার জান

চৌদ্দ গোষ্ঠীর পরান,

জারের রাইতে কচমা বিবিজান,

ডাবা আমার জান। (পৃ. ১৫)

খ. মাইয়া মাইনষের পিরীতিরে ভাই কচু পাতার পানি

বাতাস লাগলে পিরীত পইড়া যায় কখন জানি।

উরাত দ্যাহাইয়া মাইয়ায় যৈবন নিল কাইড়া

দুশমনের ঘর করে দোস্তের বুকটা ফাইড়া।

জিন্দিগিতে বিশ্বাস না কইর তাওে ভাই

দশহাত কাপড় ছাড়া যার শরম বান্ধার উপায় নাই। (পৃ. ২৪)

গ. সেই জাতেরে বিশ্বাস না কইর ভাই

যেই জাতের খতনা নাই।

খতনা ছাড়া মাইয়ার জাতেরে কোন শালায় বিশ্বাস করে?

ভুইল্যা যা। জিদ রাখ মনে।

পুরুষ ব্যাটা জিদে অয় বাদশা

মাইয়া-ছাইলা অয় বেশ্যা। মুরুব্বীগর কতা, জবর খাঁটি কতারে!' (পৃ. ২৫)

ঘ. ক্যামনে হইলি এত নিদয়া পরান বন্ধুরে

তোর লাগিয়া আসমানের তারা মরে কাইন্দা

ওরে নিদয়া বন্ধুরে ...। (পৃ. ৪৬)

ঙ. এক পয়সার তেল

ক্যামনে ক্যামনে ফুরাইয়া গেল।

এই ঘরে বাতি, হেই ঘরে বাতি।

বাতি দিয়া বাড়লাম ছালুন-পাতি।

লাগাইলাম তেল সোয়ামীর পায়ে আর কাঁচা মোছে

আর কি বিয়াইব তেল বিবির ছিড়া শাড়ির কোঁচে? (পৃ. ৫৯)

চ. জাড় খেদাইতে আগুনের লাইগ্যা আইল বুড়ী

চিতলপিঠা দ্যাইখ্যা বুড়ী করে জাড়িজুড়ি।

তিনগণ্ডা পিঠা খাইলাম খেজুর গুড় দিয়া

মজায় মজায় খাও পিঠা কেঁথা মুড়ি দিয়া। (পৃ. ৬১)

ঙ, চ সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত গানদুটি প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী জমির আলী ও ফুলবিবির মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত ছড়া। আলাপের সূত্র ধরে এ ধরনের ছড়া কাটার রীতি লোকসমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যাতে তাদের সৃষ্টিশীলতার পরিচয় প্রকাশিত।

নরসিংদির গ্রামীণ লোকসমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হুকায় তামাক সেবনের অভ্যাস প্রচলিত। বিশেষত, বৃষ্টিমুখর রাতে ভিজে শরীরে তামাকের ধোয়ায় চাঙ্গা হতে এর ব্যবহার পুরুষদের মধ্যে লক্ষণীয়। তবে নারীরাও যে অন্যদের আড়ালে হুকা গ্রহণে স্বচ্ছন্দ, তা প্রতীয়মান হয় ফুলবিবির আচরণে। এ উপন্যাসে হুকায় তামাকযোগে ধুমপানের একাধিক উল্লেখ রয়েছে--

> ক. ডেরায় ঢুকে কুপি থেকে আগুন তুলে হ্যারিকেন জ্বালায় আবদুল্লা। পাশে বসে ডাবা টানছে আর ঝুল ঝুলে চোখে ছেলেকে দেখছে জমির আলী। ... জমির আলী ডাবা থেকে মুখ তোলে, ... মাথা ঝাঁকায় জমির আলী। কাশে। খুক্ খুক্ কাশে। তামাক পোড়া ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে ডেরা। ... মাদক গন্ধ নেশা চাপিয়ে দেয় ফুলবিবির। ওর কিনা অভ্যাস তামাকের। (পৃ. ৯)

> খ. 'নে, টান দে আম্মা,' বিড়িটা মায়ের হাতে তুলে দেয় আবদুল্লা, 'তরত আবার কাশের বিমার। ছাড়াইতে পারসনা বিড়ি খাওয়া?' ... 'কাশিটার লাইগ্যা বিড়ি খাইয়া আছান পাই? মরার কাশি!' দু'হাতের চার আঙুলে চেপে বিড়িটা ধরে মুখে গুঁজে নেয় পুলবিবি। টান দিতেই কাশি ওঠে খুক খুক। দম বন্ধ করে কাশি থামাতে চায় বুড়ী, 'কি জাতের বিড়ি যে বার অইল আইজ কাইল টাইন্যা মজা নাই। পাতার বিড়ির লাহান মজা আছেনি কাগজের বিড়ির?' ... 'নে, এত্ত মজা-ফজা খুজিসনা,' মনের ভার হালকা করতে মায়ের সাথে ঠাট্টা জমাতে চায় আবদুল্লা, 'চোখা সুন্দর নাক দিয়া করস কি? আগে দ্যাখ ছ্যাদা আছেনি, বাতাস বার অয়নি।' ... ফোকলা মুখে হাসে বুড়ী। বিড়ি টানে চোখ বুঁজে চুপচাপ। আবদুল্লা মায়ের বিড়ি টানার কায়দা দেখে। হাতে যে বিড়ি আছে দেখার জো আছে কি? যেন কত সাবধান। দেখে ফেললো না তো কেউ? কি শরম! (পৃ. ৬০)

৪. লোকভাষা-- নরসিংদির লোকভাষার প্রয়োগ এ উপন্যাসের কুশীলবদের আচার-ব্যবহার, চালচলন, মনোভঙ্গি ও চিন্তার ধরনকে অনায়াসেই বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। লেখকের সচেতনতা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নারী ও পুরুষের বাগভঙ্গি, আলাপের রীতি ও প্রসঙ্গ যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী স্বতন্ত্র, তা উপন্যাসের ভাষিক পরিমণ্ডল থেকে অনুধাবন করা চলে। পুরুষের অসহিষ্ণু, বিক্ষুব্ধ, রাগী মনোভাব যেখানে খিস্তি খেউড়,গালিগালাজ ও দেহভঙ্গিমার অকপটে প্রকাশিত হয়, সেখানে নারীর বিরক্তি ও বিরূপতা প্রায়শই অনুচ্চারিত থেকে যায়। তবে, মেয়েলি ভঙ্গিতে আলাপের বিশেষ ভঙ্গি এবং ধরন তাদের সংলাপে পরিস্ফুট। শব্দভাণ্ডার ও বাগধারার প্রয়োগ থেকে তাদের ভাষিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৪.১ শব্দভাণ্ডার

> বিশেষণ– ঘুটঘুট্টি, সটান, মেটে, কিরবিল, হাঁপ, ছেয়ে, বুঁজে, জোরসে, ফাল, মোটকা, প্যাঁচিয়ে, দমকা, আগলে, দলা, ঢাউস, ফালাফালি, জবর, হুজ্জতে, বিগরে, চটাক, আঁকড়ে, ঝটকা, মোলায়েম, তেলতেলা, লাগোয়া, লটকে, বিতিকিচ্ছি, লবেজান, ঝাঁপিয়ে, ট্যালকা, চিৎপটাং, গুঁজে, ঝুপ, আছাড়, কাচুমাচু, চুটিয়ে, খিঁচিয়ে, ফ্যালফ্যালে, লকপকা, আইঢাই প্রভৃতি।

> দ্বিরুক্ত পদ– ঝুল ঝুলে, খুক্ খুক্, বিড় বিড়, টিম টিম, চেপে চেপে, ঘোঁত ঘোঁত, ঠাসতে ঠাসতে, থোকা থোকা, টুক টুক, ঝপাঝপ, থৈ থৈ, গুন গুন, চিবোতে চিবোতে, ছলাৎ ছলাৎ, ছপাছপ, পত পত, ঠাসতে ঠাসতে, ফরফরিয়ে, ঘোঁত ঘোঁত, পত্ পত্, চটা চট, ঝলমল, ছপাছপ, খরখরিয়ে, ঝরঝরে প্রভৃতি।

> দেশজ শব্দ– দাওয়া, ছাঁট, গাই, ভাঁড়, ডেরা, ডাবা, পাকঘর, ব্যাঙ, ঘাড়, বেবাক, গতর, খিচুনি, নল, আগা, ডোরা, হগল, সলতে, গুড়, চট, পলো, মাথাল, কেঁচো, বাতি, ডঙ, ঠেলা, আল, চটাক, ওঝা, বাতি, ধুক, টানাহেঁচড়া, পয়দা, চিমনি, ছা, গতর প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– দেখলি>দ্যাখলি, থেকে>থাইক্যা, বুড়া>বুইড়া, উঠে>উইঠা, আজ>আইজ, পোকা>পোক, হয়>অয়, বেড়ে>বাইড়া, বৃষ্টি>বিষ্টি, নাচ>নাচন, ছেড়ে>ছাইড়া, ঢুকেছে>হান্দাইছে, এনেছিস>আনছস, দেখি>দ্যাহি, লেজ>ন্যাজ, কাড়া>কাড়ন, দেশ> দ্যাশ, দেখ>দ্যাহো, ছেড়ে> ছাইড়্যা, দে>দ্যা, শীত>জার, জবাই>জবো, সোহাগী>সোহাইগ্যা প্রভৃতি।

৪.২ বাগধারা

কারো মুখে রা নেই। (পৃ. ১৭)

সেয়ানে সেয়ানে লড়াই কাকে আর বলে। (পৃ. ২০)

মোড়ল চাচা পানি না দিলে ক্ষেতের ত দফা রফা। (পৃ. ২৫)

মার্কসীয় রাজনৈতিক বীক্ষার রূপায়ণ এ উপন্যাসটির শিল্পভাবনার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলেও বিশ শতকের প্রথমার্ধের কালপরিসরে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামীণ লোকজীবনের রূপরেখা নির্দেশ এর অন্বিষ্ট। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ী মানসিকতাকে আশ্রয় করে ক্রমস্ফীত মহাজনশ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত, নির্যাতিত ভূমিহীন রায়তদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে দিনবদলের অঙ্গীকার লেখকের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করে। নরসিংদির গ্রামীণ সমাজভুক্ত মানুষের সাংস্কৃতিক চালচিত্র এবং চেতনালোকের স্বরূপ অনুধাবনে উপন্যাসে বর্ণিত লোকজ উপাদানসমূহের গুরুত্ব প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদায় উন্নীত। সেদিক থেকে বলা চলে, রাজনৈতিক আদর্শ এবং লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সন্নিবেশ ঘটায় এ জনগোষ্ঠীর স্বাজাত্যবোধ ও ঐতিহ্যিক পরিচয় নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর।

AÜK‡c R‡b¥rme

হরিপদ দত্তের (১৯৪৭) AÜK‡c R‡b¥rme (১৯৮৭) উপন্যাসে বিশ শতকের আশির দশকের পটভূমিতে নরসিংদির গ্রামীণ লোকজীবনের চালচিত্র ভাষ্যরূপ পেয়েছে। মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বের রূপায়ণ এ উপন্যাসের শিল্পভাবনার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে গ্রামীণ জনপদসমূহের প্রতিনিধি হিসেবেই যেন, লেখক নরসিংদির অতসীপাড়ার ভৌগোলিক পরিসীমায় গ্রন্থিত করেছেন এ উপন্যাসের কুশীলবদের, যারা পরিচয়ে মুসলমান কৃষক। নিজের যৎসামান্য জমি থাকলেও তাতে সারা বছরের খোরাকির বন্দোবস্ত না হওয়ায় জোতদারদের জমিতে ভাগে বর্গাচাষই তাদেও দিনযাপনের অবলম্বন। ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যোগসাজশে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে নরসিংদীর উপজেলা শহর ঘোড়াশালের সম্পৃক্ততা স্থাপিত হওয়ায় গ্রামীণ জীবনেও অনিবার্যভাবেই এর অভিঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে, নগরায়ণের পার্শ্বিক প্রভাব অতসীপাড়াতেও পরিলক্ষিত হয়। তবে এ উপন্যাসে লেখক বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এখানকার বাসিন্দাদের লোকজচেতনার স্বরূপ উন্মোচনে। কেননা, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামীণ জীবনসংলগ্ন বিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কে প্রচলিত বিবিধ অনুশাসন প্রভৃতি। শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ, চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা, বিভিন্ন প্রয়োজনে রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ তাদের চেতনালোকে গতিময়তা সৃষ্টি করলেও পূর্বসূরীদের অনুসৃত ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক আবহ এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের চেতনালোকে বরাবর সক্রিয়। কেননা এর সঙ্গে মিশে রয়েছে তাদের একান্ত উপলব্ধি, মানসিক নির্ভরতা। জীবনের নির্মম বাস্তবতার টানাপোড়েনে নিত্যনতুন সংকটের মুখোমুখি হলে তারা অকপটে আশ্রয় খুঁজে নেয় নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। এ উপন্যাসে অতসীপাড়ার গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকজ উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

১. লোকবিশ্বাস-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিশ্বাসের রূপায়ণ লক্ষণীয়। গ্রামের অশিক্ষিত, আধুনিক, বিজ্ঞানচেতনাশূন্য সংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসে বহুযুগ ধরে প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্বাস গড়ে তোলে। 'এক' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, শালদো বিলের সাঁকোর পাশে বসে বিড়ি টানতে টানতে রাত নেমে এলে রুবীনার জন্য অপেক্ষারত হাসান শীতের রাতে কাঁচা সড়ক ধরে পশ্চিম দিকে হাঁটতে থাকে। তার বিশ্বাস, পশ্চিম দিকে হাঁটা শুভ। কেননা সেটি নামাজের দিক। এদিকেই কাবা শরীফ অবস্থিত। তার বাবা কিয়ামত আলীও এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে। গরুকে দিয়ে লাঙল টানাবার জোয়াল বানাতে সে যে কোনো বাঁশ নেয় না। সে পশ্চিম দিকে হেঁলে পড়া্ বাঁশ নেয়। তার মতে, পশ্চিম দিকে কেবলা শরীফ। তাই এদিকে যে বাঁশ নুয়ে পড়ে, সেটিতে রহমত রয়েছে। সেই বাঁশ দিয়ে তৈরি জোয়ালে জমি চাষ করানো হলে ফসল বেশি ফলবে। এ ধরনের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে ইসলাম ধর্মের লৌকিক রূপ অনুসরণের প্রবণতা। ইসলামী শাস্ত্র অনুযায়ী মুসলমানরা তাদের পবিত্র মসজিদ কাবা শরীফকে স্মরণ করে সেসিকে সেজদা করে, যা মক্কা নগরীর পশ্চিমে অবস্থিত। পশ্চিম দিকের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ পুণ্যময় বিবেচিত। অথচ সেদিকে গাছের হেলে পড়াকেও এ ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা লোকসমাজে লক্ষণীয়, যা তাদের সমীহবোধ ও সম্মানসূচক মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। 'দুই' পরিচ্ছেদে কিয়ামত আলীর স্মৃতিচারণায় অলৌকিক বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়, যা বিশেষভাবেই জাদু সম্পর্কিত ধারণাসংক্রান্ত। কিয়ামত আলীর পিতা একদিন মাঠের শেষপ্রান্তে বেড়ে ওঠা তালগাছটির গোড়ায় মাটি কোপাতে কোপাতে একটি পাথরখণ্ড পায়। সে বহুদিন যত্ন করে সেটিকে নিজের বাড়িতে রেখেছিল। আন্তরিক শ্রদ্ধাবশত সেটির সামনে সে আগরবাতি ও মোম জ্বালিয়ে দিত। তার মনে বিশ্বাস জন্মেছিল, কোনো পীর-ফকিরের কুদরতি শক্তিসম্পন্ন ছিল পাথরটি। হয়ত সেটি জীবন্ত। সেকারণে সে গ্রামের মৌলবির নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাকে সতর্ক করা হয়– 'পাথর পূজা কুফুরী কাম। এই গোনাহের মাপ নাই। দূর কইরা দেও এইটা!' (পৃ. ২৫)। এর দুদিন পর পাথরটি কোনোভাবে হারিয়ে যাওয়ায় কিরামত আলীর বাপ ধারণা করে, তার নিজের বা গ্রামবাসীর কোনো অন্যায় বা পাপকাজের জন্য সেটি তার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এরপর সেবছর ভয়াবহ আকালে গ্রামবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেলে বৃদ্ধ ধারণা করে, পাথরটি চলে যাওয়াতেই তাদের এভাবে কষ্ট পেতে হচ্ছে। সেই ঘটনা স্মরণ করে কিয়ামত আলী এখনো পাথরটির জন্য আক্ষেপ জানায়। কেননা, তার বিশ্বাস, সেই পাথরটি ফিরে এলে তাদের জীবনের চলমান সংকটগুলো দূরে সরে যাবে।

খাওয়ার সময় অন্যদিকে মনোযোগ দিতে নেই। স্রষ্টার রহমত হিসেবে ঠিকমতো না খেলে খাবারের বরকত নষ্ট হয়। এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে 'তিন' পরিচ্ছেদে। বড় ছেলে মতলিব বদমেজাজী, একগুঁয়ে স্বভাবের। বাইরে কাজ শেষে বাড়ি ফিরে খাবার সময় স্ত্রী মরণীর সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি হলে তার মা পরানবিবি তাকে শান্ত করতে চায়। মায়ের কথায় সে বিবাদ বন্ধ করলেও হঠাৎ ভাত খেতে গিয়ে গলায় খাবার আটকে গেলে সে অস্বস্তিতে পড়ে। এ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস হলো, যখন কেউ খাবার গ্রহণরত ব্যক্তির নাম নেয় বা স্মরণ করে, তখন তার গলায় খাবার আটকে যায়। একারণে পরানবিবি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে পানি খেতে পরামর্শ দেয়। সে পুত্রবধূকেও মৃদু ভর্ৎসনা করে স্বামীর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হবার জন্য। কেননা, নারীর জন্য প্রচলিত পারিবারিক অনুশাসন হলো গৃহকর্তার মর্জি অনুযায়ী চলতে হবে। তার মতের বিরোধিতা সংসারের জন্য অকল্যাণকর। বিশেষ কোনো পশু-পাখির উপস্থিতিকে গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে অশুভ-অমঙ্গলজনক বিবেচনা লোকসমাজে প্রচলিত প্রাচীন বিশ্বাস। বিশেষ করে, শকুনের মতো শিকারী পাখি, যেটি পশুর মৃতদেহ ও আবর্জনা খেয়ে বাঁচে, সেটির উপস্থিতিকে আসন্ন বিপদের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। 'চার' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, বাড়ির কাছের আমগাছে একপাল শকুনকে বসে থাকতে দেখে হাসান আতঙ্কিত হয়। তার শঙ্কা জাগে, গৃহপালিত গরুগুলোর হয়ত কোনো ক্ষতি হবে! তার আশঙ্কা পরদিনই বাস্তবে পরিণত হয়। কেননা, প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে বাজ পড়ে তাদের গোয়ালঘরে আগুন লাগলে লাল রঙের দামড়া গরুটি পুড়ে মরে। সেই মৃত গরুর উচ্ছিষ্ট খেতে শকুনেরা পালে পালে ভিড় করে। এ ঘটনার পর হাসান ও কিয়ামত আলীকে বাধ্য হতে হয় আনোয়ার মাস্টারের পরামর্শে চড়া সুদে ব্যাংক

থেকে ঋণ নিয়ে জমিতে চাষাবাদের জন্য আরেকটি গরু কিনতে। এভাবেই তাদের ভবিষ্যত বিভিন্ন চক্রান্তে শৃঙ্খলিত হয়।

নবজাতক শিশুকে নিয়ে পরিবারের অভিভাবকদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত রয়েছে 'পাঁচ' পরিচ্ছেদে। মরণীর প্রথম বাচ্চা আঁতুড়ঘরে মৃত্যুবরণ করে। তাই এরপর দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর পরপরই তার দাদী পরাণবিবি আঁতুড়ঘরেই তার কান ফুটো করে দেয়। পরানবিবির ধারণা হলো এর ফলে নবজাতকের ওপর জ্বিন-পরীর নজর পড়বে না। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই বৃদ্ধা নাতির নাম রাখে ফেরেশতার নামে –মানকির। নাতির মঙ্গল কামনা এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য ফেরেশতার নামে তার নামকরণের অন্তরালে এ বিশ্বাসই সক্রিয়।

২. লোকসংস্কার-- গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিবিধ লোকসংস্কারের প্রভাব এ উপন্যাসের কুশীলবদের মনোলোকে সক্রিয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা এসব সংস্কারকে যেমন মান্য করে, তেমনিভাবে নিজেদের কোনো সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের তাগিদে কখনো সচেতনভাবে, কখনো অবচেতনে এর দ্বারস্থ হয়। 'সাত' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, অতসীপাড়া গ্রামের মেয়ে রুবীনা শহরের গার্মেন্টসে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। অফিসের বড় আপা তাকে দেহব্যবসায় যেভাবে প্ররোচিত করে, এর সমান্তরালে তার মনোলোকে জেগে ওঠে ছেলেবেলায় দেখা এক বেদের জাদুকরী কর্মকাণ্ড বা তুকতাক। অন্যকে বশীভূত করে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাবশত তুকতাকের শরণাপন্ন হবার রীতি গ্রামীণ সমাজে বহুল প্রচলিত। সেই বেদের হাতে ছিল এমন এক পাখির হাড় যার বাস সাত আকাশের ওপর। গোরস্তানে ঘুরে বেড়ানো জ্বিনের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। শুধু অমাবস্যার গভীর অন্ধকার রাতে সেই পাখি গোরস্তানে আসত। গোরস্তানের জ্বিনের সঙ্গে লড়াই করে তবেই সেই পাখিকে ধরা সম্ভব ছিল। কিন্তু শুধু সেই পাখির হাড় দিয়েই জাদু করা যায় না। 'সাথে থাকতে হয় ফাঁসির মড়ার দড়ি আর তার কবরে বিছানো বাঁশের এক খণ্ড শলাকা। সে হাড়, সে দড়ি আর বাঁশের শলাকাকে যা বলা যাবে তা-ই করবে। সে করেই তো বেদে লোকটা এক টাকার একটা নোট রুবীনার চোখের সামনে বানিয়েছিল দশ টাকা' (পৃ. ৫৫)। এভাবেই রুবীনা সেই জাদুকর বেদের সঙ্গে তার অফিসের মহিলা বসের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল। অর্থাৎ, তার জীবনবাস্তবতায় যে ঘটনাটি অসম্ভব ও অকল্পনীয়, সেটিকেই সে যখন চোখের সামনে রূপায়িত হতে দেখে, তখন এর অন্তরালে জাদু, বশীকরণ, তুকতাকের প্রতি আস্থা পোষণ করে।

জ্বিন-ভূত, অশরীরীর প্রতি সংস্কার লোকমানুষের আচরণকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। 'আট' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, বন্ধ্যাত্বকরণের এক পর্যায়ে অসতকর্তাবশত মরণী ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হলে তার জ্বর আসে। এর পরদিন খিঁচুনি উঠলে তার অসুস্থতা বাড়তে থাকে। তার শাশুড়ি পরানবিবির ধারণা, পুত্রবধূকে জ্বিন ভর করেছে। কারণ. ভর সন্ধ্যাবেলায় মোল্লাবাড়ির তেতুলগাছের তলা দিয়ে স্বামীর সঙ্গে হেঁটে সে বাড়ি ফিরেছিল। জ্বিনের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে এবাদত মৌলবির পড়া পানি ছিটিয়েও তাকে বাঁচানো যায় নি। তার করুণ মৃত্যুতে পরানবিবি এ ধারণা পোষণ করে, 'রুহুডা কাইড়া নিল জ্বিনে!' (পৃ. ৬২)। জ্বিন সংক্রান্ত সংস্কার পরানবিবিকে ক্রমেই আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। সেকারণেই তার আচরণে দেখা যায় অলীক প্রত্যক্ষণ (হ্যালুসিনেসন), যা প্রবল হলে যে কেউ সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। মরণীর মৃত্যুর পরের রাতে ডেরার ভেতর কুপি জ্বেলে ঘুমিয়ে থাকা পরানবিবির ঘুম হঠাৎ ভেঙে যায় মেটে পোকার একটানা ডাকে। দমকা বাতাসের ধাক্কায় গাছের পাতার খসে পড়ার শব্দে সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কেননা, তার মনে সন্দেহ জাগে, উঠান থেকে কে যেন তাকে ডাকে। ভয়ে স্বামীর ঘুম ভাঙিয়ে সে জানায়, পুত্রবধূ মরণী নাকি তাকে ডেকেছে উঠান থেকে। কিরামত আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সুরা পড়ে ঘুমিয়ে পড়তে বললেও বৃদ্ধার ভয় কাটে না। 'বুড়ির ভয়ার্ত চোখ ঝাঁপিয়ে পড়ে ডেরার খোলা জানলায়। ... ফের ফিসফিস করে পরানবিবি, 'ঐ যে দ্যাহেন, খিড়কির বাইরে মতলিবের বৌ পানির কলস কাঙ্খে খাড়াইয়া রইছে। দ্যাহেন, ক্যামুন কটমটাইয়া চাইয়া রইছে।' (পৃ. ৬৩-৬৪)। কিরামত আলী প্রায় মূর্ছাগ্রস্ত পরানবিবিকে ধমকায়

স্রষ্টার নাম স্মরণের জন্য। কিন্তু এতে পরানবিবির স্বস্তি ফেরে না। সে পুত্রবধূর প্রেতাত্মা দেখার ঘটনাকে কোনোভাবেই বিস্মৃত হতে পারে না। 'পনের' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, হাসান রুটি খেতে শুরু করলে পরানবিবি তাকে পরামর্শ দেয় প্রথম রুটিটি ছিঁড়ে নাকে শুঁকে কিছুটা অংশ ফেলে দিতে। তা নইলে জ্বিনের নজর লেগে সে অসুখে ভুগতে পারে। কিন্তু হাসান তার কথা অগ্রাহ্য করলেও পরানবিবি স্বস্তি পায় না। ভীত চোখে সে রান্নাঘরসংলগ্ন বরই গাছটির দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন সেখানে বসে রয়েছে কোনো জ্বিন। পরানবিবির ধারণা, জ্বিনকে তাড়ানোর সাধ্য মানুষের নেই। 'বছর বছর সারের মিলে আর পাটের মিলে মানুষ মরে ক্যান জানস? কতজনের কত কবর আছিল ময়ালে। কবরের উপর অইছে মিল। খোদায় জানে কোন পীর-ফকিরের কবর আছিল কিনা। জ্বিনরা পীরের লস্কর, জানস না?' (পৃ. ১১১-১১২)। এভাবেই পরানবিবির মনোলোকে অশরীরী, জ্বিন সংক্রান্ত বিশ্বাসরাশি মিলে মিশে তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তোলে। শুদু পরানবিবি নয়, কিরামত আলী এবং অতসীপাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষই এ সংক্রান্ত বিশ্বাস-সংস্কার মেনে চলে। 'একুশ' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, জ্বিনের কর্মকাণ্ড এবং একে শায়েস্তা করার প্রসঙ্গে অতসীপাড়ার বাসিন্দাদের বিশ্বস-সংস্কারের পরিচয় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। একদিন ভর দুপুরবেলায় গ্রামের নির্জন মাঠে জান্নাত আলীর জোয়ান বলদের ঘাড় মটকে দেয়ার জন্য জ্বিনকেই গ্রামবাসী দায়ী করে। এ খবর অতি দ্রুত মুখে মুখে প্রচারিত হলে একপর্যায়ে নদীর ওপারের বাসিন্দা পাগলা ফকির সেখানে হাজির হয়। অতসীপাড়ার বাসিন্দাদেন ধারণা, পাগলা ফকির জ্বিন পোষে। তার সঙ্গে থাকে দেড়হাত আকৃতির একটি লাঠি, যেটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে তাদের ধারণা। গ্রামবাসী পাগলা ফকিরের রহস্যময় আচরণের পাশাপাশি প্রচলিত রটনা, কাহিনী শুনে তার প্রতি শুধু ভর্তিই নয়, জ্বিন তাড়ানোর ওঝা হিসেবে তার প্রতি অনুগতও বটে। দৈবাৎ গ্রামবাসী কারো আচরণে বা কথায় ক্ষিপ্ত হলে সে নিজের পোষা জ্বিনদের তার ওপর ভর করায়, এরূপ ধারণাও প্রচলিত--

> পাগলা ফকিরের মুঠোর কুদরতি লাঠিটা ঘুরতে থাকে, যেন কোন অদৃশ্য শয়তানের সাথে লড়ছে সে। মুখে দুর্বোধ্য শব্দ তুলে হঠাৎ মরা গরুটার শিং ধরে শক্ত একটা ঝাঁকুনি। গম্ভীর স্বরে মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে বলতে থাকে কেমন করে জ্বিন এসে গরুটার ঘাড় মটকে দিয়েছে। ... নীরব সম্মোহিত মানুষগুলোর দৃষ্টি এক লহমায় মাঠের শেষ প্রান্তে ছুড়ে মারে পাগলা ফকির। সেখানে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি গরু। পাগলা ফকির এমনি ভঙ্গীতে লম্বা একটা দৌড় দেয়, গরুটা রশি টেনে আর্তনাদে লাফিয়ে ওঠে। রশিটা চেপে ধরে পাগলা ফকির চোখজোড়া কপালে টেনে লম্বা দমে কাঁকে, 'ঐ যে জ্বিনটারে চাক্ষুস দেখতাছে গরুটা। কিন্তু আদমের চক্ষু জ্বিনের দেখা পাইব কই?' ... মানুষগুলো নির্বোধ গরুটার মতই বোবা। খলবল চোখে চারপাশে ওরা তালাশ করছে অদৃশ্য জ্বিন। (পৃ. ১৫৫-১৫৬)

৩. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে অতসীপাড়ার বাসিন্দাদের সৃষ্টিশীলতার উল্লেখ্যযোগ্য নিদর্শন হিসেবে লোককাহিনী, কিংবদন্তি, প্রবাদ, ছড়া, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয়।

৩.১ লোককাহিনী-- এ উপন্যাসে পাঁচটি লোককাহিনী এবং একটি উপকথা ব্যবহৃত হয়েছে। লোকমানসে সন্নিহিত বিভিন্ন অলৌকিক-অতিলৌকিক ঘটনার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহলের বহিঃপ্রকাশ এসব কাহিনীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের উল্লেখও এসব কাহিনীতে লক্ষণীয়। লোকসমাজের খেটে-খাওয়া বাসিন্দাদের নিত্যদিনের চালচিত্রের সঙ্গে তাদের চিত্তবিনোদনের উপযোগী বিভিন্ন মনোরঞ্জক, কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশে তা পরিবেশিত হয়। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত এসব কাহিনীগুলো কুটুম পাখি বিষয়ক, হাঁড়িয়া পুতপুত পাখি, ঘুঘু পাখি, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও চৈতার বৌ বিষয়ক। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক রীতিনীতি ও অনুশাসন, নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উপস্থিত বলে এসব লোককাহিনীতে এতদঞ্চলের গ্রামীণ লোকসমাজের ইতিবৃত্তও ফুটে ওঠে। উপন্যাসের প্রারম্ভভাগে জানা যায়, হাসান ছেলেবেলায় তার মা পরানবিবির নিকট থেকে মেটেঘুঘুর কাহিনী শুনেছিল। 'মেটেঘুঘু যে মাটিতে বসে তার তলায় নাকি লুকিয়ে থাকে গুপ্তধন। মেটেঘুঘু তো যক্ষের জাত। গুপ্তধন পাহারার অছিলায় পয়দা ওদের দুনিয়ায়।' (পৃ. ২০)। দ্বিতীয় লোককাহিনীটি দরিদ্র ভাগচাষী কিয়ামত আলীর স্মৃতিচারণায় বিবৃত। তার আর্থিক দৈন্য ও

সাংসারিক অনটন দিনদিন বৃদ্ধি পায় গ্রামের মাতবর ও মেম্বারদের দৌরাত্ম্যে। তার সামান্য ধানী জমিতে ফলানো ফসলের পুরোটাই সে নিজের আয়ত্তে রাখতে অসমর্থ। কেননা, ফসল উৎপাদনের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে তাকে সারাবছরই অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। এমতাবস্থায় বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যত্ন ও সমাদর করতে না পারার আক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে প্রতিপত্তিশালীদের প্রতি তার পুঞ্জীভূত ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। এরই সমান্তরালে তার ভাবনায় আকস্মিকভাবে জেগে ওঠে কুটুম পাখি বিষয়ক লোককাহিনী। এক দুপুরে ক্ষেতে যাবার পথে আমবাগানের ডালে বসা কুটুম পাখির ডাক শুনে সে প্রথমে ক্ষেপে ওঠে। কেননা লোকবিশ্বাস হলো কুটুম পাখির ডাক যে শোনে, তার বাড়িতে কুটুম আসে। বলাই বাহুল্য, এ ভাবনার সমান্তরালে সক্রিয় রয়েছে বাঙালিদের অতিথিপরায়ণতার ঐতিহ্য। কিন্তু এটিও ঠিক, দরিদ্র পরিবারে কুটুমের আগমন নিছক বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করে। এ লোককাহিনীতে যে বিষয়টি প্রতিপাদ্য, তা হলো, কুটুম বাড়িতে এলে তাকে যথাসম্ভব সমাদর করতে হয়। এটি শুধু পারিবারিক মূল্যবোধেরই পরিচায়ক নয়, বরং ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার সঙ্গেও জড়িত। এ লোককাহিনীতে বিবৃত হয়েছে, জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে ভরদুপুরে কুটুম এলেও দৈন্যবশত সে প্রতিবেশীদের নিকট থেকে চাল ধার করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কেউই এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে না। তার স্ত্রী দুপুরের রান্নার জন্য মসলা বেটে রান্নাঘরে বসে প্রতীক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার অবসান ঘটে না। ফলে কুটুমের কাছে বিব্রত হয়ে সে মনের দুঃখে বাটা মসলা গায়ে মেখে কালো হাঁড়িতে মুখ লুকিয়ে কুটুম পাখি হয়ে গাছের ডালে বসে অবিরাম কুটুমকে ডাকে। এ কাহিনীতে দরিদ্র গৃহস্থের অনটনের বৃত্তান্তের সমান্তরালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের ইঙ্গিতও রয়েছে। কুটুমকে ঘরে বসানো, হাতমুখ ধোয়ার পানি দেয়া, নিজ হাতে রান্না করে খাইয়ে সমাদর করা বাঙালির পারিবারিক ঐতিহ্য। আর এ দায়িত্ব নারীর ওপর আরোপিত। কিন্তু তার পক্ষে সংসার ছেড়ে উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে স্বামীর উপার্জনের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হয়। এমতাবস্থায় স্বামীর দায়িত্ব পালনে অপারগতার দায়ভার যে স্ত্রীর ওপর আরোপিত হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই গৃহবধূ এ পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য। সেকারণেই কুটুমকে যত্ন করতে না পারার দায়ে সে পাখিতে রূপান্তরিত হয়। এ লোককাহিনীতে নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও ইঙ্গিতে প্রকাশিত। সেই গৃহবধূর পুনরায় মানুষরূপে প্রত্যাবর্তনের জন্য কিয়ামত আলীর যে আকুতি, তাতেই প্রতীয়মান, লোকমানুষের চেতনালোকে এ কাহিনীর আবেদন কতটা প্রাসঙ্গিক বিবেচিত।

নৈতিক শিক্ষা ও সংযমের মাধ্যমে ক্রোধকে বশীভূত করতে না পারলে যে হঠকারিতার সম্মুখীন হয়ে মহা বিপদগ্রস্ত হতে হয়, পাশাপাশি ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের বিবেচনাবোধ যে দিশা হারায়, এমন বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে হাঁড়িয়া পুতপুত পাখির বৃত্তান্তে। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর মানুষের বংশপরম্পরায় চাষাবাদের ওপর নির্ভরতা এ লোককাহিনীর প্রেক্ষাপটে উপস্থিত। কিয়ামত আলী নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়ে যখন বিশ্রাম নিতে দুপুরে আহার নিয়ে বসে হিজল গাছের তলে, পাশের ঝোপে লাফালাপি করতে থাকা একটি হাঁড়িয়া পুত-পুত পাখিকে দেখে তার এ লোককাহিনী মনে পড়ে। কেননা সে নিজেও ছেলে হাসানকে নিয়ে সেই চাষীর মতো জমি চাষ করছিল। লোককাহিনীতে বিবৃত, সেই চাষী তার ছয় বছরের বালক ছেলেকে বলেছিল, 'চান্দাড়ের রইদ যখন ঘরে হান্দাইব, ক্ষেতের পাড়ে ভাত লইয়া যাইস, দেরি য্যান অয়না!' (পৃ. ৩৫)। কিন্তু চাষীর স্ত্রীর সাংসারিক কাজের চাপে স্বামীর জন্য ভাত রান্না করে ছেলেকে দিয়ে পাঠাতে দেরি হয়। এদিকে ক্ষুধায় অস্থির চাষী খাবার আনতে ছেলের দেরি হওয়ায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তাকে হাতের পাঁচন দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। অবশেষে যখন তার হুশ হয়, কৃতকর্মের অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে 'আপন সন্তানের তাজা রক্ত সারা গায়ে মাখে কিষাণ। ভাতের হাঁড়ি ভাঙে নিজের মাথায়। মরা সন্তান কোলে তুলে জঙ্গলে পালায় কিষাণ পাখি হয়ে। হারানো ছেলের শোকে বাঁশ-বনে ডাকে রক্তমাখা রঙের পাখি, 'পুত! পুত! পুত!' (পৃ. ৩৬)। কিয়ামত আলীর স্মৃতিচারণায় এ গল্পে এভাবেই বর্তমান আর অতীত মিলেমিশে তার চেতনালোকে লোককাহিনীর শিক্ষা ও নৈতিক বোধকে জাগিয়ে তোলে।

ঘুঘু পাখির লোককাহিনী বিবৃত হয়েছে রুবীনার স্মৃতিচারিতায়, যে বাবা ও সৎমায়ের সংসারে প্রতিপালিত। সৎমা আম্বিয়াবিবি তাকে নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করে। কিন্তু তবু নিজের মায়ের স্থানে রুবীনা তাকে একান্ত আপন করে নিতে পারে না। কারণ, গর্ভধারিণীকে হারানোর বেদনা তার মন থেকে বিলীন হয়নি। এরই সমান্তরালে রুবীনা এ লোককাহিনীর ভুবনে নিমগ্ন হয়। এতে রয়েছে গ্রামীণ বাংলার বহুবিবাহপ্রথার বিরূপ প্রতিক্রিয়া তথা সতীনের প্রতি বিমুখতা। সেকারণেই সতীনের অবর্তমানে তার দশ বছরের মেয়েকে চাষীবৌয়ের দুচোখের কাঁটা মনে হয়। সে তাকে দিয়ে সংসারের কাজ করায়, তাকে অনাহারে রাখে। বেলা চলে গেলেও তাকে খেতে দেয় না। লক্ষ্মীর পরব উপলক্ষে চাষীবৌ সতিনঝিকে দিয়ে তিল কুটিয়ে নেয়। কিন্তু মা হারা মেয়েটি ক্ষুধার জ্বালা সইতে অক্ষম। তাই সারাদিন ধরে অনাহারী এ কাজ করতে গিয়ে মায়ের কথা ভেবে সে যখন চোখের জলে বুক ভাসায়, এর ফলে তিল পরিমাণে কমে যায় জলে ভিজে। একারণে তিল চুরির অভিযোগে চাষীবৌ তাকে প্রহার করে। একপর্যায়ে সৎমার প্রহারে মেয়েটি মরে গেলে স্বামীর ভয়ে সে তাকে গোবরের স্তূপে পুঁতে রাখে। চাষী মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে মেয়ের খোঁজ করলে সে মিথ্যা বলে। একদিন গোঁবরগাদায় কলাগাছে জন্মানো পরিপক্ব কলার কাঁদি কাটতে গিয়ে সে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে। কেননা, কলাগাছরূপী মেয়েটি তখন তাকে সব জানায়। এমনকি তার স্ত্রীও এ ঘটনা স্বীকারে বাধ্য হয়। ফলে চাষী তার স্ত্রীকে হত্যা করলে সে ঘুঘু পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে কলাগাছের ডালে বসে ডাকতে থাকে। এ কাহিনীতে বাঙালি সমাজের বিভিন্ন চিত্র ইঙ্গিতবহ হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিপীড়ন যেমন এতে বিবৃত, তেমনিভাবে বহুবিবাহের প্রতিক্রিয়াবশত সতীনের প্রতি বিরূপতাও পরিলক্ষিত হয় সতীনঝির প্রতি চাষীর স্ত্রীর নির্দয় আচরণে। লক্ষণীয়, বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে লক্ষ্মী অর্থ, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি ও উর্বরতার প্রতীক। আর তাকে খুশি করতেই এ পূজার আয়োজন। ফলে তিলের নাড়ু বানাতে তিল কুটে রাখার প্রসঙ্গকে ভিত্তি করে এ লোককাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে, যার সঙ্গে তদানীন্তন সামাজিক বাস্তবতা ও পারিবারিক বৃত্তান্তের নিবিড় সংযোগ লক্ষণীয়। 'ভানতে হবে ধান। চাল ছাড়া কি উনুন জ্বলে? আসছে লক্ষ্মীর পরব। বানাতে হবে তিলের নাড়ু। দেবীকে খুশি না করলে ক্ষেতে ফলবে কি ধান?' (পৃ. ৭৭)। স্পষ্টতই এ লোকসংস্কার ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামীণ কৃষি সমাজে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত, যা এ লোককাহিনীতে পেয়েছে নতুন মাত্রা। ধর্মীয় পরিচয়ে রুবীনা মুসলমান হলেও লোকমুখে শ্রুত এ কাহিনী তাকেও প্রভাবিত করে। এটি লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ঝিঁঝিঁ পোকা সংক্রান্ত লোককথার মুখ্য চরিত্র এক হতভাগ্য শাশুড়ির সঙ্গে পরানবিবি নিজের মিল খুঁজে পায়। কেননা, সাংসারিক অনটন আর প্রতিকূলতার পাকচক্রে সে দিশেহারা। জামাই ষষ্ঠীতে মেয়ে জামাইকে নতুন কাপড় উপহার দেয়ার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু বিষয়টি নিছক সৌজন্য বা আন্তরিকতাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রসঙ্গ। আর্থিক অনটনের কারণে সেই নারী নিজের অপারগতা স্বীকার করলেও অভিমানী জামাইয়ের ক্রোধ থেকে তার নিস্কৃতি মেলে না। বরং সে তার স্ত্রীকে মায়ের কাছে পাঠানো দূরের কথা, অকারণে মারধর করে। মা হয়ে এ খবর শুনে সেই নারী ব্যথিত হলেও এর প্রতিকারের সামর্থ্য তার নেই। তবু আশায় আশায় ভর করে সে ষষ্ঠী পেরিয়ে অম্বুবাচীতে জামাইকে নতুন কাপড় দেবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সঙ্গতির অভাবে তা পূরণে আবারো ব্যর্থ হয়। এ অসামর্থ্যের জেরে সেই অসহায় নারী অবশেষে মনোপীড়ায় ভুগে মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তী জন্মে সে তাই ঝিঁঝিঁ পোকা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। 'ফাগুণ মাস এলেই ঝিঁঝিঁ পোকারা গাছের ডালে বসে জোলাদের মত কাপড় বোনে তাঁতে। ঝিন্...ঝিন্... ঝিন্...ঝিনো...ও...ও...ও...। জ্যৈষ্ঠে জামাই-ষষ্ঠীব্রত সামনে রেখে আষাঢ়ের অম্বুবাচি তিথি অবধি ঝিঁঝিঁ পোকা কাপড় বোনে জামাইয়ের জন্য। এবং সে রাতেই ঘটে ওদের মৃত্যু। তাই অম্বুবাচির পর আর ডাক শোনা যায় না ঝিঁঝিঁর' (পৃ. ১১৫)। এ লোককাহিনীতে জন্মান্তরবাদের ধারণাও কৌশলে রূপায়িত হয়েছে। একজন্মের অভাব ও অনটন দরিদ্র মানুষকে প্ররোচিত করে পরবর্তী জন্মে প্রতিকারে। জামাইকে নতুন কাপড় দিতে না পারার অক্ষমতাহেতু সেই নারী আরেক জন্মে ঝিঁঝিঁ পোকা হয়ে জন্ম নেয়। অম্বুবাচীর দিনে মেয়েজামাইকে নতুন পোশাক

উপহার দেয়ার রীতি নিছক পারিবারিক আনন্দ ও সম্প্রীতির বার্তাই বহন করে না। বরং এটি যে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক আত্মকেন্দ্রিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবেও ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিবেচিত হয়, এ কাহিনীতে সেই প্রসঙ্গও রয়েছে।

এ উপন্যাসে চৈতার বৌ-য়ের লোককাহিনী বিবৃত হয়েছে পরানবিবির স্মৃতিচারণায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহুদিনের পালিত গরুটি মেম্বারের কাছে বিক্রির বাধ্যবাধকতায় তার মনোলোকে যে গ্লানিবোধ জেগে ওঠে, এরই সমান্তরালে লোককাহিনীটি উপন্যাসে বিবৃত। গ্রামে কাজ না থাকায় প্রচণ্ড অনটনে চৈতা তার স্ত্রী ও কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশুর আহারের বন্দোবস্ত করতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় নিজের আহারের তাড়নায় চৈতার বৌ তার শিশু সন্তানকে অন্যের কাছে বিক্রি করে এ ভাবনাবশত যে, 'থাকুক পরের ঘরে। বেঁচে তো থাকবে? তাছাড়া সে টাকায় কিনবে চাল। পেট পুরে খাবে ভাত' (পৃ. ১৩১)। কিন্তু তার এ সাধ পূর্ণ হয়নি। কারণ সম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধানে ছেলেকে নিয়ে পথে নামলেও একপর্যায়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর শিশু মৃত্যুবরণ করে। তখন চৈতার বৌ মৃত ছেলেকেই হাটে বেচে দেয়, ঘুমিয়ে আছে, এ মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে। ভিনদেশী সওদাগর রূপার টাকা দিয়ে তার ছেলেকে কিনে নেয়। প্রাপ্য টাকায় চাল কিনে বাড়ি ফেরার পথে মিথ্যা বলার পাপবোধে আক্রান্ত হয়ে চৈতার বৌ দম আটকে মারা যায়। নৈতিকতা এবং স্খলনের যে সমীকরণকে এ লোককাহিনীতে সমান্তরাভাবে উপজীব্য করা হয়েছে, তা সমাজ আরোপিত মূল্যবোধ ও অনুশাসনেরই ইঙ্গিতবহ। ব্যক্তির কাজের পরিণতি তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়, সেটিও চৈতার বৌ-য়ের রূপায়ণে বিবৃত। পরানবিবি সেকারণেই তার সঙ্গে নিজের অপারগতা ও অসহায়ত্বগত সাদৃশ্য অনুধাবনপূর্বক এ লোককাহিনী স্মরণ করে।

৩.২ কিংবদন্তি-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত তিনটি কিংবদন্তির উল্লেখ রয়েছে। শালদো বিল সংক্রান্ত কিংবদন্তিটি আঞ্চলিক। ঘোড়াশালের দক্ষিণ দিকের ঘাগড়ার খালের সঙ্গে শীতলক্ষ্যা মিলে গিয়েছিল। আবার অন্যদিক থেকে কালিবানারও শীতলক্ষ্যার সঙ্গে মিশে যায়। লোকমুখে প্রচলিত, কালিবানার শীতলক্ষ্যার প্রেমে পড়েছিল। শীতলক্ষ্যার এতে সম্মতি না থাকলেও সে এ সম্পর্ক মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের মিলনে শালদো গাঙের জন্ম হয়, যা ধীরে ধীরে পানি কমে বিলে পরিণত হয়। এ বিলে কুমিরের আবির্ভাব সম্পর্কে আরেকটি কিংবদন্তি লোকমুখে প্রচলিত। বলাবাহুল্য, এর অন্তরালে সক্রিয় রয়েছে সামাজিক অনুশাসন, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং নারী-পুরুষের আন্তঃসম্পর্কের গড়নগত প্রভাব। অতসীপাড়ার কৈবর্ত বৌ শালদো গাঙে্লান করতে গেলে আকস্মিকভাবে তখন তার ভাশুর মাছ ধরতে জাল নিয়ে সেখানে আসে। এমতাবস্থায় নগ্ন সেই নারীর পক্ষে ্লান সেরে উঠে আসা সম্ভব হয়নি। বরং বিব্রত কৈবর্ত বৌ লজ্জায় পানিতে ডুব দিয়ে সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে শ্বাসরোধ হয়ে সে মারা যায়। এ পর্যন্ত ঘটনাটি সামাজিক বাস্তবতার ইঙ্গিত বহন করলেও এর সঙ্গে লোকমুখে কাহিনীর আকারে যুক্ত হয় কুমিরের প্রসঙ্গ। কৈবর্ত বৌ নাকি মৃত্যুর পর কুমিরে পরিণত হয়। এভাবেই কুমিরের সঙ্গে মানুষের শত্রুতার সূত্রপাত ঘটে।

দ্বিতীয় কিংবদন্তিটি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তৃত জঙ্গলের মাঝে পতিত একটি ভাঙা কূয়াকে নিয়ে পল্লবিত, যার সঙ্গে ইতিহাসেরও যোগসূত্র রয়েছে। এতেও লোকমানুষের মুখে প্রচলিত বিভিন্ন অলৌকিক-অতিলৌকিক ঘটনারই প্রাধান্য লক্ষণীয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনামলে প্রজাদের পানীয় জলের অভাব মোচনের জন্য জনৈক জমিদার শানবাঁধানো এ কুয়া খনন করিয়েছিল। লোকমুখে প্রচলিত গল্প হলো, সেটি নাকি পাতাল পর্যন্ত গভীর। তাই অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও এতে পানি না ওঠায় প্রজাদের দুর্ভোগ থেকেই যায়। অবশেষে এক রাতে সেই জমিদার স্বপ্নাদিষ্ট হয়, কোনো এক মায়ের একমাত্র ছেলেকে কুয়ায় উৎসর্গ করলে তবেই সমস্যার সমাধান হবে। অবশেষে জমিদারের আদেশে এক কাকবন্ধ্যা নারীর ছেলেকে ধরে এনে গোসল করিয়ে নতুন কাপড়ে সাজিয়ে কুয়ার পাশে দাঁড় করানো হয়। অচিরেই পাতাল থেকে এক সোনার শেকল উঠে এসে ছেলেটির কোমরে পেঁচিয়ে পাতালে নেমে যায়। এরপর থেকে সেই কুয়া নাকি পানিতে পূর্ণ হয়। কিন্তু গ্রামবাসী সেই কুয়া থেকে পানি উত্তোলন করতে

পারেনি। কেননা, সেটি বহুকাল ধরেই পরিত্যক্ত। 'অতসীপাড়ার মানুষ একে বলে দোজখের কূয়ো। রাত গভীরে আজো নাকি সেই ছেলে কাঁদে ডুকরে-ডুকরে। কাঠ কুড়োতে গিয়ে কে নাকি কবে দেখেছিল, শেকল-পরা এক ফুটফুটে শিশু কূয়োর পাড়ে বসে কাঁদছে আর হাত তুলে ডাকছে কাছে। ... অতসীপাড়ার মানুষ-জনের ধারণা কূয়োটার গভীরতা মাপা যাবে না কোনকালে। এ বুঝি দোজখের কূয়ো। আশি বছর ক্রমাগত ছুটতে থাকা ছুঁড়ে মারা পাথরও এর তলার হদিস পাবে না। দেও-দানব, জ্বিন-পরীর আস্তানা এ কূয়ো' (পৃ. ৩২-৩৩)। মূল ঘটনার সঙ্গে জনজীবনের কোনো সংকট বা প্রসঙ্গ যুক্ত থাকে বলেই এসব কিংবদন্তি লোকমুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রচারিত হয়। হাসান তার বাবা কিয়ামত আলীর কাছ থেকে এ কিংবদন্তি শুনেছিল। কিয়ামত আলী এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। সে কোথা থেকে এ কিংবদন্তি শুনেছে, তা উপন্যাসে অনুল্লেখিত। তবে অনুমান করা যায়, সম্ভবত পূর্ববর্তী প্রজন্মেও নিকট থেকে শ্রুত এ কিংবদন্তি শুধু হাসানের পরিবারে নয়, বরং সমগ্র গ্রামেই এখনো প্রচলিত। এটিই মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, যেখানে কিংবদন্তির মূল কাহিনীর রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং দীর্ঘকাল ধরে লোকসমাজে প্রচলিত থাকায় ধীরে ধীরে এর সঙ্গে অন্য কোনো ঘটনা বা কাহিনী যুক্ত হয়ে প্রজন্মান্তরে পরিবেশিত হতে থাকে। বাস্তব জীবনের সংকট বা প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের অভীপ্সার সঙ্গে লোকসমাজে প্রচলিত অতিলৌকিক-অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে এভাবেই এসব কিংবদন্তি কালিক রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে। তৃতীয় কিংবদন্তিটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিন্যস্ত। এতে উপজীব্য হয়েছে জনৈক সাধুবাবার প্রতি লোকসমাজের ভক্তির প্রসঙ্গ, যার মূলে রয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সংকট বা সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তার শরণাপন্ন হবার প্রচেষ্টা। এ ধরনের কিংবদন্তির ক্ষেত্রে যেটি সাধারণত লক্ষণীয়, তা হলো, অচেনা অপরিচিত এক সাধু বা সন্ন্যাসীর কোনো লোকালয়ে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়ে নিজের দৈবী বা অতিলৌকিক শক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের মনোযোগ ও আনুগত্য লাভের প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছিল। জনৈক সাধু পারুলিয়া গাঁয়ে এলে বাউল কবি দ্বিজদাসের পূর্বপুরুষেরা তার জন্য আশ্রম-কুটির বানিয়ে দিয়েছিল। ভক্তরা প্রতিদিন সেখানে হাজির হত। কিন্তু গ্রামের কোথোও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটায় তা জেনে সেই সাধু এক রাতে সবাইকে রেখে অদৃশ্য হয়ে যায়। 'কে নাকি দেখেছিল লালসালু পরা বাবাজী কাঠের খড়ম পায়ে পাখির ডানার মত দু'হাত উঁচিয়ে উঠে যায় আসমানে' (পৃ. ৪৫)। এ ধরনের অমীমাংসিত, রহস্যময় ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত ঘটনার মর্ম অনুধাবন অক্ষরজ্ঞানহীন নিয়তিতাড়িত সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমে অনুধাবন সম্ভব না হলেও অতিপ্রাকৃত, নাটকীয়, চমকপ্রদ ঘটনা শোনার অভিজ্ঞতাবশত তা বংশপরম্পরায় লোকসমাজে প্রচারিত হয়।

৩.৩ প্রবাদ

যায় দিন আর ফেরে না। (পৃ. ১০)

দুই দিনের মৌলবী না গামছারে কয় আচকান। (পৃ. ১৪)

নিষ্ফলা গাছের পাতার ভার, নিষ্কর্মা মরদের কথার বাহার। (পৃ. ২১)

কইতে কয়, দোকান অইল কামারের, ছবক দেই কারে পাক-কোরানের? (পৃ. ২১)

আক্কেল দোষে খাইলাম মাটি, বাপে-পোলায় কামলা খাঁটি। (পৃ. ২১)

গং নাই তার ঢং আছে, ভিতর বাড়ি নাই, উঠানে খেমটা নাচে। (পৃ. ২২)

চিলে কান নিল কি না নিল খোঁজ না কইরা চিলের পাছে দৌড় (পৃ. ৩০)

গাই-বাছুর যদি থাহে ভাও, জঙ্গলে দোহাইতে ক্যান ডরাও? (পৃ. ৩০)

কে বোঝে কার কথা? লাঙ্গল যায় কোন দিকে, বলদেও টান কোন দিকে! (পৃ. ৩১)

যেমুন মাটি তেমুন চাপ। (পৃ. ৩৪)

মাটির বুইঝা লাঙ্গল, লাঙ্গল বুইঝা বলদ, বলদ বুইঝা হালুয়া (পৃ. ৩৫)

ভাত ছিটোলে এ দেশে কাকের অভাব? (পৃ. ৩৬)

যত্ত মুশকিল তত্ত আছান। (পৃ. ৪৯)

কানা, খোড়া, ভেংগুড়, তিন শালার এক ল্যাংগুড়! (পৃ. ৫১)

জাতের জাত ঈমানের ঘোড়া, আপনা ঘরের জাউ থোড়া। (পৃ. ৫২)

কথায় আছে মরা পুত্রের শোক ঘর নেয়, খোয়া যাওয়া টাকার শোক তো কূল পায় না। (পৃ. ৫৮)

ঘরে জ্বলে না বাতি, চাঁন খায়ের নাতি। (পৃ. ৬১)

যে দ্যাশে যে ভাও, শুকনা গাঙ্গে নাও বাও। (পৃ. ৭০)

যেমুন হউর বাড়ি, তেমুন ওজু করি। (পৃ. ৭২)

ন্যাংটোর আবার কাপড় ছেঁড়ার ডর? (পৃ. ৯২)

দায়ে নাই ধার, আছাড়ির বাহার (পৃ. ৯৫)

পচা গুগলিতেও পায়ের তলা কাটে। (পৃ. ৯৫)

ইতর মরে চিতরে, খাসি মরে তেলে। (পৃ. ৯৯)

হুমকিতে তালগাছের ছাল পড়ে না। (পৃ. ৯৯)

যত্ত মুশকিল তত্ত আসান। (পৃ. ১০০)

সোনা বাইন্যার শতেক ঘা, ওস্তাদ কামারের এক ঘা! (পৃ. ১০০)

কইতে কয়, নাচে পাছে দশ ভাই, যার ঝি তার জামাই। (পৃ. ১২২)

পরের পুত, যম দূত (পৃ. ১১৪)

বিপদ-বিপাকে পড়লে দূর্বাখেতেও জান নেয় বাঘে, জঙ্গল লাগে কি? (পৃ. ১৩০)

আপনা হাউড়ী সালঅম না পায়, চাচী হাউড়ী ঠ্যাং বাড়ায়। (পৃ. ১৩৬)

অতি পণ্ডিতের ছিড়া কিতাব, অতি ছিনালের বড় নেকাব। (পৃ. ১৩৬)

বিপদের সময় খাল হয় দরিয়া। কেঁচো হয় সাপ। এক ফালের রাস্তা হয় দশ দিনের পথ। (পৃ. ১৪৬)

ঠেকলে বান্দির পায়েও পড়তে হয় লুটিয়ে। (পৃ. ১৪৬)

৩.৪ ছড়া–– এ উপন্যাসে অতসীপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ছড়ার উল্লেখ রয়েছে। এসব ছড়া বিভিন্ন বয়সী মানুষের মধ্যে প্রচলিত। বালক-বালিকা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত এগুলো আবৃত্তি করে। প্রাত্যহিক

জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই ছড়া কাটা তাদের হাস্যরসিকতা ও পরিহাসপ্রিয়তারই দৃষ্টান্ত। এসব ছড়ার বিষয়বস্তুও প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গসম্পৃক্ত।

ক. হাজার ট্যাকার চুলে সিতা

লাখ টাকার রঙিন ফিতা

মাছ ধরে ছেমড়ি হাজার কুড়ি

প্যাকে নাশ হইল তার নীল চুড়ি। (পৃ. ১৪)

খ. কান্ধে লাঙ্গল সামনে আমন মাঠ

কিষাণ চ্যাংড়ার বাবরির কি ঠাঁট। (পৃ. ১৪)

গ. লাঙ্গল তাটিয়া করবি চাষ

ক্ষেতে ছড়াইবি গোবর ফাস

বৌ আনবি দুধাল মায়ের ঝি

ছাওয়ালের দুধের চিন্তা কি?' (পৃ. ৩৫)

ঘ. শুটকি মাছে বেগুন মিশে

শৈল মাছে পানি-লাউ

ইচা মাছে ডাঁটা মিশে

মজা কইরা খাও। ...

ছালুন মজা ঝালে-ঝোলে

বিবি মজা গোল গালে। (পৃ. ৪০)

ঙ. কানা, কানা সুইচের মাথা কানা

সুইচ হারাইতে সোহাগীর মা'র মানা।

সুইচ গেল আন্ধাইর গাঁও

আয়রে সূইচ দিমু ঠাণ্ডা বাও। (পৃ. ৭৩)

চ. আগায় ধইরনা গো বাবা

আগায় করে থরথর।

গোড়ায় ধইরনা গো মা

গোড়ায় করে থরথর।

পিন্দনের শাড়ির লাইগা

Dhaka University Institutional Repository

সতিন-ঝি কি ছাড়ল ঘর? (পৃ. ৭৮)

ছ. ঐ ছেমড়িরে ধর

চুলার ভিতরে ভর।

চুলা ভাংলো পুঁটি মাছে

ছেমড়ীরে লইয়া চল কাজীর কাছে। (পৃ. ৮০)

জ. অভাগিনী মাগো পিন্দা ছিঁড়া শাড়ি

এরা পোলা কোলে লইয়া ঘুরে বাড়িবাড়ি।

এরা পোলা কয়না কথা দেয়না চিকন হাসি

তিন কড়ি দাম তার কিনল পরবাসী...। (পৃ. ১৩১)

উপন্যাসের 'এক' পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত 'ক' সংখ্যক ছড়াটি রুবীনার সংলাপে প্রযুক্ত। প্রেমিক হাসান আলাপের একপর্যায়ে তার সাজসজ্জা লক্ষ করে এ ছড়াটি আবৃত্তি করে। তবে রুবীনার প্রগলভতাও এর ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হয়। হাসানকে 'চ্যাংড়া' সম্বোধন করে মাছ ধরা বিষয়ক যে ছড়া সে কাটে, এতে প্রকাশিত হয়েছে চতুরতা ও কৌতুক। 'গ' সংখ্যক ছড়ায় ছেলেকে উদ্দেশ্য করে পরিবেশিত কিয়ামত আলীর ছড়ায় কৃষিজীবনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি গুণবতী নারী চেনার ইঙ্গিত রয়েছে। 'ঘ' সংখ্যক ছড়ায় কিয়ামত আলী ও পরানবিবির ধারাবাহিক আবৃত্তিতে বিভিন্ন খাদ্য রান্নার কৌশল ও নারী সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বর্ণিত। 'ঙ' সংখ্যক ছড়াটি মেয়েলি, বিশেষত ঘরকন্যা বিষয়ক, যা বিশেষভাবেই সুই হারিয়ে গেলে তা উদ্ধারের জন্য পরিবেশিত হয়। রুবীনা বর্ষার সূর্যহীন আবছা অন্ধকার ঘরে সেলাই করতে গিয়ে এটি বিড়বিড় করে। 'চ' সংখ্যক ছড়াটি ঘুঘু পাখির লোককাহিনীর অন্তর্গত। কিষাণ গোবরগাদায় কলাগাছ কাটতে গেলে সেটি কথা বলে ওঠে এবং অবশেষে জানা যায়, তার স্ত্রী মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সতিনঝিকে হত্যার ঘটনা গোপন করেছে। 'ছ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আবৃত্ত বালক-বালিকাদের ছড়ায় নির্মল হাস্যরস ও উচ্ছ্বাস প্রকাশিত। 'জ' সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত ছড়াটি নেয়া হয়েছে চৈতার বৌ-য়ের লোককাহিনী থেকে। সন্তানহারা বিপন্ন এক নারীর অস্তিত্বসংকট মর্মস্পর্শী ভাষায় এ ছড়ায় রূপায়িত।

৩.৫ লোকসঙ্গীত

ক. পানির আসন পানির বাসন

পানির সিংহাসন।

বন্ধুর লাইগা পাইতা রাখছি

পরান ফুলের আসন ... (পৃ. ১৯)

খ. না ছিঁড়িও কাঁচা ফল

না তুলিও ফুল-ফুল করমচা

অকালে নাশ কইরনা ফল

পাকিলে খাইও রসাল করমচা। (পৃ. ১৯)

গ. ঘরের চান্দাইড়ে লাগাইলাম বাগুন

জ্বইলা উঠল চিত্তের আগুন

গুনের ননদ লো, তর ভাই ক্যান বৈদেশে। (পৃ. ২৯)

৪. লোকচিকিৎসা-- এ উপন্যাসে লোকসমাজে প্রচলিত কিছু চিকিৎসাপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে গ্রামবাসী শহরের ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসাগ্রহণে অসমর্থ। আবার উপজেলার হাসপাতালে গেলে তাদেরকে লালরঙ মিশ্রিত পানি দেয়া হয় যে কোনো রোগের প্রতিকারে। তাই তারা এর প্রতি অনাগ্রহী। সেকারণে তারা পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট থেকে শেখা চিকিৎসাপদ্ধতি ও বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রতিকার সম্পর্কিত ঘরোয়া রীতির ওপর নির্ভরশীল। উপন্যাসের 'তিন' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, হাসানের বড়ভাই মতলিবের ছেলে মানকিরের পেটে কৃমি হওয়ায় প্রথম দিন চুনভেজা পানি এবং দ্বিতীয় দিন আনারস গাছের কচি পাতার রস খাওয়ানো হয়। মানকিরের ছোটভাইয়ের কাশি হওয়ায় এর চিকিৎসা হিসেবে তুলসী পাতার রস খাওয়ানোর উল্লেখ রয়েছে। 'পাঁচ' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মরণী সূতিকা রোগে আক্রান্ত বলে রাতে ঠিকমত দেখে না। তাই এর চিকিৎসা হিসেবে তার শাশুড়ি কলার ভেতর জোনাকি পোকা ও টিকটিকির লেজ ভরে খাওয়ায়। 'চার' পরিচ্ছেদে গবাদি পশুর চিকিৎসার উল্লেখ রয়েছে। কিরামত আলীর গৃহপালিত বলদ দুটির একটি কাঁধে জোয়াল বেঁধে জমিতে লাঙল দেয়াতে একপর্যায়ে ঘা হয়। অন্যটির ক্ষুরে ঘা হয়। এমনকি সেটির শরীরের লোমও উঠে যায়। এর প্রতিকার হিসেবে সে গরুর ঘায়ে পাটের বীজ বেঁটে দেয়। আর ঘায়ের পোকার উপশম হিসেবে 'মাঠ থেকে কুড়িয়ে আনা মরা কুকুরের হাড় বেঁধে দেয় ওর গলায়। যদি না-ই মরে, ঝরে পড়বেই পোকারা' (পৃ. ৩৮)।

৫. লোকভাষা-- নরসিংদির গ্রামীণ লোকভাষার প্রয়োগ এ উপন্যাসের শিল্পসাফল্যে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। লেখক সচেতনভাবে এ অঞ্চলের প্রান্তিক নর-নারীর কথোপকথনের উপযোগী ভাষাভঙ্গিকে অবলম্বন করেছেন। যেহেতু ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন লোকসমাজের অন্তর্গত মানুষের চিন্তাচেতনার রূপরেখা প্রতীয়মান হয়, তাই তিনি স্বভাবতই তাদের আলাপে উচ্চারিত বাগধারা, প্রবাদ, কৌতুক-পরিহাস, অপভাষা ও গালাগাল, দেশজ ও আঞ্চলিক শব্দ, এমনকি এদেশের শব্দভাণ্ডারে গৃহীত অন্য ভাষার শব্দসমূহকেও প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে, বাঙালি মুসলমান কৃষক অধ্যুষিত অতসীপাড়া গ্রামের লোকমনস্তত্ত্ব অনুধাবনে আরবি, ফারসি শব্দও ভাষিক প্রতিবেশ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া কুশীলবদের ক্রোধ, ক্ষোভ, জড়তা, লজ্জা, দ্বিধা, ভয় প্রভৃতির বহিঃপ্রকাশে তাদের দেহভঙ্গিমা, ইশারা-ইঙ্গিত প্রভৃতিও সহায়ক ভুমিকা রেখেছে। এতদঞ্চলের লোকসমাজভুক্ত মানুষের জীবনাচার, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক পরিমণ্ডল সম্পর্কিত অবহিতি লেখককে সুযোগ করে দিয়েছে এত নিপুণভাবে এ ভাষাকে কুশীলবদের মাধ্যমে উপন্যাসে বাঙ্ময় রূপ দানে।

৫.১ শব্দভাণ্ডার

বিশেষণ– খড়খড়ে, বাঝাঁ, উঁকি, ধোয়া-পাকলা, পেটুক, চুটিয়ে, খড়া, তাক, ফকফকা, উদোম, ন্যাংটা, চিৎ, সটান, দাঁতাল, খাবলে, কাহিল, দুকপুক, খলখলে, ফাল, গুঁতো, কাহিল, কাঁচা, ন্যাড়া, তাকত, গেঁয়ো, তুলতুলে, উড়াল, মারফতি, চুঁইয়ে, অলস, ছিটকে, চোনাইয়া, ফুসলিয়ে, চকচকা, গড়াগড়ি, তরতরিয়ে প্রভৃতি।

অনুকার অব্যয়– কল-কলে, ছল-ছলে, শোঁ-শোঁ, ঝপাং-ঝোপ, কপ্‌কপ্‌, ঠনঠনে, খানখান, ফিসফিস, ঝাপটান, থিকথিকে, ঠা ঠা, ঠনঠনে, ধুকপুক, খানখান, খলখলে, খিলখিলিয়ে, গলগল, চকচকা, ডুবো ডুবো, গিলে গিলে প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– খোলস, ভাগাড়, ফাটল, গুগলি, গেরস্ত, কিষাণ, বুঁচি, ছেমড়ী, খাল, পাগার, নাও, জাঁক, গাঙ, টান, খাল, ছিলা, জাল, ডাঙা, ভাটি, সাঁকো, গতর, ফোঁড়া, মশারি, ঠোঙা, পিলা, লঙ্কা, গতর, ডেরা, লণ্ঠন, ঢেলা, ক্ষত, খলুই, চ্যাংড়া, বান, ধুলা, ঘোমটা, বিয়ান, তাছির, দুয়ার, মুগুর, খোঁটা, হাঁটু, খাল প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– গল্প>গপ্পো, দেখেছিস>দ্যাখছস, জিহ্বা> জিরবা, নৌকা>নাও, মৌসুম>মরসুম, দেখ>দ্যাখো, লেজ>ন্যাজ, যাচ্ছ>যাইতাছ, আসে>আইয়ে, খাড়া হয়ে> খাড়াইয়া, যাচ্ছ>যাইতাছ, কোথায়>কৈ, কেন>ক্যান, ধরে>ধইরা, অসুখ>বিমার, এগিয়ে>আওগাইয়া, চিনে>চিননা, ফেলেছিস>ফালাইছস, কাঁদা> প্যাক, অন্ধকার> আন্ধাইরা, দেশ>দ্যাশ, ঘৃণা> ঘিন্না, মৃত্যু>মওত, গিলে>গিল্লা, ক্যামনে>কীভাবে প্রভৃতি।

৫.২ বাগধারা

মাস চারেক বাদে কলা দেখিয়ে ফিরে আসে লোকটা। (পৃ. ৪৮)

মেম্বার যে দাম হাঁকে, ভাবতেই বুড়োর মাথাটা ভোঁ ভোঁ। (পৃ. ৫০)

মুখে যারা সমর্থন জানায় শেষটায় সবাই পিঠটান। (পৃ. ৬৫)

মানুষজন তার নাকের ডগার উপর দিয়ে ছুটে যায় যাত্রার প্যান্ডেলে। (পৃ. ৬৫)

গো-বৈদ্যের হাজার পেরেশানেও হায়াতের দড়ি নাগালে পায় না দামড়া। (পৃ. ৬৮)

সাত গাঙ্গের পানি খাওয়া মাইয়ারে করলি বৌ। (পৃ. ১০৫)

এত যে পানি ঢালাঢলি, চিড়ে তো ভেজেনা। (পৃ. ১৪৩)

রাজনৈতিক বীক্ষা, গ্রামীণ সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল– এ তিন প্রসঙ্গের সমবায়ে উপন্যাসটির শিল্পভাবনা আবর্তিত, যার কেন্দ্রবিন্দু সমাজের প্রান্তবাসী মানুষেরা। অতসীপাড়ার ভূমিনির্ভর মুসলমান বর্গাচাষীদের সঙ্গে জোতদার সামন্তপ্রভুদের দ্বৈরথ অনিবার্য হয়ে ওঠে স্বীয় অধিকার আদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়। প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের সঙ্গে ওঠাবসা, আলাপচারিতা, যে কোনো প্রয়োজনে অন্যের শরণাপন্ন হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্মীয় অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা নির্দেশ করে লোকজভাবনার প্রতি তাদের একাত্মতার অনুভবকে। গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজীবন ও লোকমানসের স্বরূপ অনুধাবনে হরিপদ দত্তের পারঙ্গমতা অনস্বীকার্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেলিনা হোসেন

ষাটের দশকের খ্যাতিসম্পন্ন কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭) লেখনী দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরেও সমাদৃত। বাংলাদেশের গণমানুষের সংগ্রাম, এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালীন ও পরবর্তী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহ ও ইতিহাস থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্য ও এর ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী বৃত্তান্ত, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ব্যক্তিত্বের জীবনী, লোকমানুষ, নাগরিক ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন, ছিটমহল সমস্যা, কৃষকের অধিকার, নারীর অস্তিত্বসংগ্রাম ও তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর সবকিছুই তাঁর লেখনীভুক্ত। একজন সৎ, সাহসী, বলিষ্ঠকণ্ঠ ঔপন্যাসিকের প্রত্যাশিত অবস্থানে তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বলা চলে, তাঁর মতো এতটা আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের আর কোনো ঔপন্যাসিক সমকালীন ও যুগের প্রতিনিধিত্বশীল প্রসঙ্গ ও ভাবনাকে উপন্যাসে শিল্পোত্তীর্ণ রূপ দিতে পারেননি। বিষয় নির্বাচনের অসামান্য দক্ষতা ও সাহসী মনোভঙ্গি তাঁর বিভিন্ন শিল্পসফল উপন্যাস লেখায় সহায়ক ভুমিকা রেখেছে। কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও অচিরেই তাঁর যে আত্মোপলব্ধি ঘটে গল্পের মধ্য দিয়ে[১৩৩] নিজেকে আবিষ্কারের আগ্রহে, তা সফল হয় ১৯৬৯ সালে, 'উৎস থেকে নিরন্তর' গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পরিণতিতে। নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর শিল্পিমানসে রয়েছে স্পষ্ট অবস্থান। তাই তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাসটিকে অকপটেই বাতিল কওে দেয়া প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন– 'প্রথম উপন্যাস 'উত্তর সারথি'। ... উপন্যাস লিখব বলে লেখা শুরু করেছিলাম। ... পরবর্তীকালেপ্রথম উপন্যাস হিসেবে 'উত্তর সারথি' আমার কাছে দুর্বল লেখা মনে হয়েছে। সেজন্য আমার বইয়ের তালিকা থেকে লেখাটি বাদ দিয়েছি। (পৃ. ১৫) তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে nvOi b'x †M‡bW, †cvKvgvK‡oi NiemwZ, gM ˆPZ‡b¨ wkl, hwcZ Rxeb Pv'‡e‡b, wbišÍi NÈvaŸwb, bxj gq‡ii †hŠeb,[134] Kvj‡KZ I djøiv, ÔvqÎx mÜ¨v, KvUvZv‡i cRvcwZ, NgKvZ‡i Cki, cY Qwei gMZv, fwg I Kmg, hgbv b'xi gkvqiv প্রভৃতি। তাঁর উপন্যাস বিষয়গৌরবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও এর রূপাঙ্গিকগত দুর্বলতা তুলনামূলকভাবে লক্ষণীয়। তবু বাঙালির

ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সফলভাবে রূপাঙ্কনে তিনি কৃতিত্বের অধিকারী। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর লেখা অনূদিত হওয়ায় আন্তর্জাতিকভাবেও তাঁর সাহিত্য আলোচিত।[১৩৫]

bxj gq‡ii †hŠeb

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন Phvc'-কে ভিত্তি করে রচিত সেলিনা হোসেনের bxj gq‡ii †hŠeb (১৯৮২) উপন্যাসে পর্বত-অরণ্য-টিলা তথা পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর জীবনভাষ্য উপস্থাপিত হয়েছে। Phvc'-এর সমকালীন বাংলা ভূ-ভাগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানকে ভিত্তি করে রচিত হলেও এ উপন্যাসে লেখকের শিল্পদৃষ্টিতে[১৩৬] গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ পেয়েছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। অরণ্যময় জীবনযাপনে অভ্যস্ত, কায়িক শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্মীয় উপলব্ধি, সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতি অদম্য অনুরাগ তাদের চেতনালোকে যে বিশেষ ছাপ ফেলে, এর রূপায়ণ উপন্যাসটিকে স্বকীয় মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছে।[১৩৭] স্বীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি দায়বোধ যে তাদের জীবনভাবনার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ, এর প্রতিফলন উপন্যাসটির আদ্যন্ত পরিস্ফুট। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা ও তার ব্রাহ্মণ অমাত্যবর্গের পীড়নে অচ্ছুত, ব্রাত্য বা শূদ্রোতর পর্যায়ে অবনমিত এসব প্রান্তবাসী লোকমানুষের বিভিন্নভাবে শোষিত হওয়ার নির্মম বৃত্তান্ত এতে ভাষ্যরূপ পেলেও লেখকের সহানুভূতি ও মমত্ববোধ তাদের প্রতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। গোষ্ঠীবদ্ধ এসব মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণ এবং প্রাত্যহিক জীবনের ওঠাবসায়, চালচলনে, উৎসব-আয়োজনে পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ আচরণ তাদের স্বভাবের বিশিষ্ট দিক। এরই প্রতিফলন ঘটে তাদের পরিচর্যিত সাহিত্যে, নৃত্য-গীতে, কারিগরী শিল্পে তথা বিভিন্ন মাধ্যমে। সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা ভূ-ভাগে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নকে তারা প্রতিনিয়ত চিন্তায়, পারস্পরিক আলাপে ও শিল্পকর্মে লালন করে, এর অবলম্বন তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় ও পূর্বসূরীদের অনুসৃত ঐতিহ্যবোধ। এ উপন্যাসে অরণ্যময় পাহাড়ী লোকগোষ্ঠীভুক্ত এসব মানুষের সাংস্কৃতিক রূপরেখা সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, তাতে সন্নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান।

১. লোকবিশ্বাস–– এ উপন্যাসে লোকসমাজে প্রচলিত কিছু বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, ডোম্বী কোমরে কালো সুতো পরিধান করে। তার বিশ্বাস, এর ফলে তার উপার্জন ভালো হবে। এ পরিচ্ছেদেই হরিণ শিকারের বৃত্তান্ত রয়েছে। এজন্য নদী পেরিয়ে ওপারের অরণ্যে যেতে হবে বলে অধিক যাত্রী পাবার আনন্দে ডোম্বী উল্লসিত হয়ে ওঠে। তার ধারণা, কোনো সৎ মানুষের মুখ স্বপ্নে দেখে ভোরে ঘুম ভাঙায় সে দিনের শুরুতেই হরিণশিকারে অংশ নেয়া অনেক যাত্রীকে পেয়েছে। পাশাপাশি, বিনে কড়িতে সবাইকে পার করে দেয়ার জন্য দেশাখ তাকে অনুনয় জানালে সে ক্ষিপ্ত হয়। দেশাখ খেয়ার ভাড়া পরিশোধের পরিবর্তে শিকার করা হরিণের ভাগ তাকে দিতে চেয়েছিল। সে এ প্রস্তাবে রেগে ওঠে। কেননা, শিকারীরা আদৌ হরিণ শিকার করতে পারবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। এরপর এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়, যার মূলে রয়েছে বাঙালি সমাজে প্রচলিত অকল্যাণ, অমঙ্গলসূচক লোকবিশ্বাস––

> হরিণের মাংসে তোকেও ভাগ দেবো ডোম্বি, বিনে কড়িতে পার করে দে। ... দেশাখের অনুরোধে দপ করে ওঠে ও, ইস আমার নাগর! বললেই দিলাম আর কি! ...হরিণ পাবে কি না ঠিক নেই। আগেই লোভ দেখাচ্ছে। ... দেশাখ চটে ওঠে, অলুক্ষণে কথা বলবি না। পার করে দিবি কি না বল। ... কড়ি দিলেই দেবো। ... এমনিতে দিবি না? ... না। আমাকে বলছো অলুক্ষণে কথা না বলতে। আর নিজেরা যে অলুক্ষণে কাজ দিয়ে যাত্রা শুরু করতে চাচ্ছো? শুভ কাজে আবার বিনে কড়ি কি? (পৃ. ২৮)

পঞ্চম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মদ তৈরি করে দিন চালানো শুড়ি-শুড়িনী রামক্রী-দেবকী দম্পতির শুড়িখানায় বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন দেখে খদ্দেররা এলে তারা তাদের সামনে সারিবদ্ধভাবে চৌষট্টিটি ঘড়া সাজিয়ে রাখে। সেসব বড় ঘড়া সংখ্যায় কখনো এর চেয়ে কমে না বা বাড়ে না। এ দম্পতির বিশ্বাস, চৌষট্টিটির কম বা বেশি ঘড়া খদ্দেরের সামনে থাকলে তাদের ব্যবসায় মন্দা নেমে আসবে। তাছাড়া, খদ্দেরের নিকট মদ বিক্রি করেই যেহেতু তাদের দিনযাপন করতে হয়, তাই তারা কখনোই তাদের বিমুখ করে না। তারা আরো বিশ্বাস করে, খদ্দেররা তাদের ব্যবসার লক্ষ্মী। কেননা, খদ্দের আছে বলেই তাদের মদ বিক্রি হয়, পরিবারের ভরণপোষণ চলে তাদের প্রদেয় অর্থে। জীবিকা সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের, আরেকটি দৃষ্টান্ত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়। ডোম্বী প্রতিদিন নৌকা নিয়ে খেয়াঘাটে উপস্থিত থাকে যাত্রী পারাপারের জন্য। এজন্য সে নির্দিষ্ট হারে তাদের নিকট থেকে কড়ি গ্রহণ করে। এ অর্থ দিয়েই তার ভরণপোষণ চলে। একদিন জনৈক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তার নৌকায় চড়ে ওপার থেকে এপারে এসে ভাড়া দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে। একপর্যায়ে পাওনা ভাড়া আদায় না হওয়ায় সে সেই দম্পতির সঙ্গে থাকা দ্রব্যসামগ্রীর মধ্য থেকে দুটি মাছ, এক আঁটি শাক ও দুটো নাড়ু রেখে দেয়। ছুটকি যখন ডোম্বীর কাছে জানতে চায়, সে ঐ দম্পতির ভাড়া মওকুফ করল না কেন, তখন সে অকপটে জানায়, 'বিনে কড়িতে পার করলে লক্ষ্মী থাকে না' (পৃ. ৭১)। এ লোকবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ডোম্বীর সংস্কার। সপ্তম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, শবরী ও দেশাখের পারস্পরিক কথোপকথনেও ক্রিয়াশীল রয়েছে লোকবিশ্বাস। সকলের কাছে কল্যাণীয়া, শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট গৃহবধূ সুলেখাকে স্তুতি করে প্রতিবেশী দেশাখ যখন জানায়, শিকার করতে যাবার আগে সুলেখার দেখা পাওয়ায় সে নিশ্চয়ই বড় কোনো জন্তু মারতে পারবে। সুলেখা তখন অকপটেই জানায়, এর বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে। এতে দেশাখ ক্ষিপ্ত হয়। কেননা, তেমননি ঘটলে গোষ্ঠীর সকলকে অনাহারে দিন কাটাতে হবে। এর প্রত্যুত্তরে সুলেখা পূর্বের কথা ফিরিয়ে নেয়। সে আশীর্বাদ করে, যেন দেশাখ এত জন্তু শিকার করতে পারে, যা বাড়ি বয়ে আনতে তাকে হাঁপিয়ে উঠতে হবে। যুক্তি-প্রমাণের কার্যকারিতা এড়িয়ে এ ধরনের লোকবিশ্বাস অনায়াসেই সমাজের প্রান্তিক জনমনে স্বতঃস্ফূর্তরূপে প্রভাব বিস্তার করে।

২. লোকসংস্কার–– বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের উল্লেখ এ উপন্যাসে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অতিথি সম্পর্কিত লোকসংস্কার। বিশেষত, গৃহবধূর প্রতি এ সংস্কার বিশেষভাবে পালনের নির্দেশ রয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, ধনশ্রীর দূর সম্পর্কের দুজন ভাই বাড়িতে এলে তাদের আপ্যায়নের ভাবনায় তার স্ত্রী

ভৈরবী বিচলিত হয়। কারণ, দরিদ্রের সংসারে একমুঠো চালও হাঁড়িতে নেই, যা রান্না করে তাদের খাওয়ানো যায়। অথচ অতিথি নারায়ণতুল্য, তাদের অনাহারে রাখলে পাপ হবে, এ চিন্তায় ভৈরবী বিচলিত হয়। স্বামীর বাড়ি ফেরার জন্য অপেক্ষা করেও একপর্যায়ে সে নিজেই করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। প্রেমিক কামোদের মুদি দোকানে হাজির হয়ে সে ধারে চাল নিয়ে আসে। যাকে তার বাবা অপমান করেছিল মেয়ের জামাই হিসেবে নির্বাচনে অস্বীকৃতি জানিয়ে, সেই মানুষটির নিকট এভাবে হাত পাততে ভৈরবী কুণ্ঠিত হলেও একপর্যায়ে সংস্কারের চাপে বাধ্য হয় কামোদের নিকট থেকে ঋণগ্রহণে। 'ঘরে অতিথি বলেই লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে আসতে হয়েছে ওকে। ও জানে অতিথিকে উপোস রাখলে সবচেয়ে বড় পাপ হবে' (পৃ. ২৬)। সে জানে, ধনশ্রীর সংসারে মনোযোগ নেই, কাজেই দিনের পর দিন কামোদের নিকট হতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে সে পারবে না। তবু নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সে নিছক সংস্কারবশত কামোদের দ্বারস্থ হয়।

বাঙালি নারীসমাজে প্রচলিত আরেকটি লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। পিপুল গাছকে দেবতারূপে সম্মান জানানো ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্গত। তবে, উপার্জনক্ষম পুত্র কামনায় প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে সেই গাছের গোড়ায় জল ঢেলে তিনবার প্রদক্ষিণের পর পূজা নিবেদনের আচার লোকসংস্কার থেকেই উদ্ভূত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর কাম্য সন্তান সবসময়ই ছেলে, মেয়ে নয়। কারণ ছেলেই পরিণত বয়সে সংসারের কর্তার ভূমিকা পালন করে, বৃদ্ধ মা-বাবার ভরণপোষণের সামর্থ্য রাখে। ফলে এ সংস্কার যতটা পারলৌকিক কল্যাণসূচক, তার চেয়ে বহুগুণে ইহলৌকিক সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত। কাককে বাঙালি সমাজে বরাবরই অমঙ্গল, অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ পাখি সংক্রান্ত ভাবমূর্তি লোকসমাজে সর্বদাই নেতিবাচক। বিশেষত ভরদুপুরে বা সাঁঝবেলাতে এর ডাক গৃহস্থের আসন্ন বিপদ বা সংকটের ইঙ্গিতবহ। সপ্তম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সাঁঝবেলায় রান্নাঘরের পেছনের আমগাছে কাকের কর্কশ ডাক শুনে সুলেখার শ্বশুর উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে এবং তাকে আদেশ দেয় সেটি তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু সুলেখা কাকটিকে দেখে ভয় পায়। কেননা কাকটির কর্কশ ডাক আর হিংস্র মুখভঙ্গি দেখে সে সন্ত্রস্ত বোধ করছিল। তবে দেশাখ সেটিকে তাড়িয়ে দিলে সুলেখা ও তার শ্বশুরের শঙ্কা দূর হয়। পরিবারে নারী ও পুরুষের ভূমিকাও পুরুষতান্ত্রিকতার নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট। সেকারণেই পরিবারের কর্তা হিসেবে অর্থোপার্জনের দায়িত্ব বহন করায় ঘরে ফিরে সে না খাওয়া পর্যন্ত তার স্ত্রীর অভুক্ত থাকার সংস্কার প্রচলিত। প্রথম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, শবরী গৃহস্থালী কর্ম ও রান্না সম্পন্ন করেও নিজে না খেয়ে কাহ্নুপাদের জন্য অপেক্ষায় থাকে। এমনকি স্বামীর সামনে নয়, সে খাবার গ্রহণের পর আড়ালে গেলে তবেই শবরী খাবার গ্রহণ করে, প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী। কাহ্নুপাদ এ সংস্কার অগ্রাহ্য করতে চাইলেও শবরীর পক্ষে তা এড়িয়ে চলা সম্ভব হয় না। তার ধারণা, নিয়ম অমান্য করলে তার পাপ হবে। এভাবেই বাঙালি নারীর অবচেতনলোকে পুরুষতন্ত্র প্রবর্তিত সংস্কার আর পাপ-পুণ্যের বিধান একাকার হয়ে তাকে অবদমিত রাখে। কুসংস্কারও যে লোকসমাজে প্রচলিত, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে সপ্তম পরিচ্ছেদে বিবৃত ভানুমতীর বৃত্তান্তে। জন্মের পর থেকে আট বছর পর্যন্ত নখ না কাটায় ভানুমতীর চলাফেরার সমস্যা হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে নবজাতক অবস্থায় তার মুখে কুকুরের দুধ দেয়া হলে এরপর থেকে তার নখ দ্রুত বাড়তে থাকে। এভাবে পরিস্থিতি জটিল রূপ নেয়। ভানুমতীকে কুকুরের দুধ পান করিয়ে সেই কবিরাজর তার জন্ম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু কুকুরের দুধ গ্রহণের পর তার নখগুলো কালচে হয়ে গেলে গ্রামবাসী তাকে অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে। সেকারণে গ্রামবাসী তাকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে চায়।

৩. লোক-উৎসব-- এ উপন্যাসে অরণ্যচারী বিভিন্ন লোকগোষ্ঠী তথা ব্যাধ (শিকারী), ডোম্বী (মাঝি, জেলে), কারিগর, (বস্ত্র ও কারুশিল্প), কৃষক, শুড়ি (মদ উৎপাদক), মুদি দোকানদার প্রভৃতি পেশাজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় মেলে, যেখানে তাদের সমন্বিত অংশগ্রহণ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন উৎসবের বর্ণনায়। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন টানাপোড়েন, সংকট, বাধা-বিপত্তি, সাংসারিক অনটন, দারিদ্র্যের করালগ্রাস, সর্বোপরি

রাজা ও তার অমাত্যবর্গের দ্বারা বিভিন্ন কৌশলে নিপীড়িত হওয়ার যন্ত্রণা থেকে তাদের সাময়িক মুক্তি লাভের সুযোগ ঘটে উৎসবকে ঘিরে।

এ উপন্যাসে এরূপ দুটি উৎসবের বিবরণ রয়েছে। একটি হলো সুখরাত্রিব্রতের উৎসব, অন্যটি কাম মহোৎসব। কার্তিক মাসে সুখরাত্রিব্রত উৎসব পালিত হয়। এটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই প্রিয় উৎসব। উৎসবের দিন ভোরে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে অতিথি অর্চনা ঘটে। তাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা, একটি সুগন্ধী ফুল আর হাতের তালুতে দই দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এ উৎসবের পূর্বদিন সন্ধ্যায় রাজবাড়িতে গ্রামবাসীর নিমন্ত্রণ থাকে। ভোজনের পূর্বে তাদের পরিবেশন করা হয় কর্পূর মেশানো সুগন্ধী জল। ভোজনের শেষে দেয়া হয় মসলাযুক্ত পানের খিলি। মূল ভোজনপর্বে থাকে কাগনি ধানের ভাতের সঙ্গে দই আর রাই সরিষার তৈরি ঝাল দেয়া ছাগলের মাংস। এ উৎসবে নৃত্যগীত ও বাদ্যের যৌথতায় সৃষ্টি হয় কলরোলমুখর আমেজ, যা নিত্যদিনের একঘেয়েমি থেকে গ্রামবাসীকে মুক্তি দেয়। সকলের শুভ-মঙ্গল কামনায় স্রষ্টার নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনায় প্রকাশিত হয় প্রশান্তি ও ্নিশ্চিতার আমেজ। প্রিয়জনকে ফুল দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশের রীতি এ উৎসবের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। অষ্টম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, ডোম্বী এ উৎসব উপলক্ষে কাহ্নুপাদকে গত বছর একটি চুমকুড়ি ফুল দিলেও এ বছর একটি গোলাপ দেয়। উৎসবের দিন ভোরের আঁধার কাটতে না কাটতেই দ্রিম দ্রিম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে পটহ-মাদল বেজে ওঠে। উৎসবের দুদিন তারা প্রাত্যহিক কাজ থেকে বিরতি নেয়। মনের সাধ মিটিয়ে নাচ, গান, হৈ-হুল্লোড় আর আড্ডায় তারা সময় কাটায়। এ সময় তাদের নিমন্ত্রণ থাকে রাজপ্রাসাদে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কোলাহলে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। ডোম্বীর নৃত্য-গীত পরিবেশন এ উৎসবের আমেজকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। সে ঘাটে খেয়া পারের কাজ বন্ধ করে উদ্দাম নৃত্যে সমগ্র গ্রামকে মাতিয়ে তোলে। 'কেউ আর ঘরে নেই, সবাই পথে নেমে এসেছে। যার যা ইচ্ছেমতো হাসছে, গাইছে, নাচছে। ফুর্তির শেষ নেই। কারো ঘরেই আজ রান্না হবে না। ফলমূল, বাসী খাবার বা সামান্য কিছু খেয়ে দুপুর কাটিয়ে দেবে। তারপর বিকেল পড়লেই ছুটবে রাজবাড়ির দিকে' (পৃ. ৯৬-৯৯)।

এ উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে কাম মহোৎসবের বিবরণ লক্ষণীয়। এটি আরণ্যক লোকগোষ্ঠীসমূহের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব, যার সঙ্গে তাদের জীবিকা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। ফসলের দেবতাকে তুষ্ট করার জন্যই এ উৎসবের প্রচলন ঘটেছে। তাদের মধ্যে এ সম্পর্কে সংস্কার প্রচলিত –'কামদেবতা তুষ্ট হলে ফসল ফলবে। সে ফসলে পেট ভরবে। নইলে উপোস।' (পৃ. ১১৪) আদিম লোকসংস্কার অনুযায়ী ভূমি বা ক্ষেতের রূপক নারী এবং কৃষকের লাঙলের রূপক পুরুষ। তাদের দেহমিলনের পরিণতিতে সন্তানের জন্ম হয়। তেমনিভাবে কৃষক লাঙল দিয়ে জমি চাষ করলে ক্ষেত ফসলে ভরে যায়। তাই চৈত্র মাসে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে রোদে পোড়া শুকনো জমিতে প্রচুর পানি ঢেলে কাদা বানিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গান আর জোড়া নৃত্য হয়। গ্রামবাসীর বিশ্বাস, এতে সন্তুষ্ট হয়ে কামদেব প্রচুর শস্য দেবে। একারণেই এ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে গোষ্ঠীর বয়স্ক ব্যক্তিরা নির্বাচন করে দশজোড়া স্বাস্থ্যবান যুবক-যুবতীকে, যারা সারারাত ধরে ভেজা ক্ষেতে নগ্ন হয়ে নাচবে, এরপর ভোরে সহবাসের মাধ্যমে ক্ষেতের উর্বরাশক্তি বাড়িয়ে তুলবে। তাদের বীর্যস্খলনে ভেজা ভূমি একসময় ফসলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, চাষীর গোলা চৈতালি ফসলে ভরে যাবে। এখনও আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত] প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন অফসলী জমিতে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। যেসব যুবক-যুবতীকে এ কাজের জন্য বাছাই করা হয়, তাদের সঙ্গে পুটুলিতে চিড়া ও নারকেল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন খাবার দেয়া হয়। কারণ, এ উৎসব মূলত রাতের। আর তাই রাতে নিজেদের ক্ষুধা মেটানোর পাশাপাশি সেসব খাবার জমিতে ছেটানো এবং কামদেবের নিকট প্রার্থনাও এ উৎসবের অংশ। পটহ, মাদল বেজে উঠলে ডোম্বীর নৃত্যগীতের মাধ্যমে উৎসব শুরু হয়। সন্ধ্যার আলো-আঁধারীতে যুবক-যুবতীরা গান গাইতে গাইতে জমিতে গিয়ে উদ্দাম নৃত্যে মত্ত হয়। তাদের বিশ্বাস, এর ফলে জীবনে আসবে প্রাচুর্য, স্থিরতা, পূণর্তা ও নিরাপত্তা। প্রতিবছরই নতুন নতুন জোড়া ঠিক হয়। এ

বছর লোকী ও গুণী এতে যোগ দেয়। তারা মহাখুশী, কেননা লোকী নাচবে নিমাইয়ের সঙ্গে, গুণী শেখরের সঙ্গে। বিকেলে গোসল সেরে প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে তারা খাবারের পোটলা নিয়ে চলে যায় নির্ধারিত জমিতে।

> নিমাই শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে উদ্দাম নেচে ওঠে, রক্তে মাতাল বন্যা। সবার এক অবস্থা। নাচটা যেন জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে গেছে। কামদেবতা তুষ্ট হলে ফসল ফলবে। সে ফসলে পেট ভরবে। নইলে উপোস। সে জন্যেই এ নাচের সঙ্গে আরো কিছু থাকে। ফসলের প্রাচুর্যের আবেগ। সেজন্যে এ নাচে ঢিলেমি সয় না। উদ্দাম হয়ে ওঠা প্রথম শর্ত। এ আসরে ওরা নতুন। কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা জড়তা ওরা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবু এটা একটা সামাজিক স্বীকৃতি। এতে সকলের সমর্থন আছে। (পৃ. ১১৩-১১৪)

তাদের অসহায় অভাবী মা মনে মনে প্রার্থনা করে, যেন তারা কোনো পুরুষের নজরে পড়ে নিজেরাই বিয়ের বন্দোবস্ত করে নেয়। তাহলে তাদের নিয়ে তার আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তার বৃদ্ধ স্বামীর পক্ষে মেয়েদের দায় বহনের সামর্থ্য নেই।

৪. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন-- এ উপন্যাসে লেখকের কল্পনাশক্তির স্বকীয় বিচ্ছুরণ ঘটেছে লোকজ নারীর সাজসজ্জা, আভরণ বিন্যাস ও প্রসাধনকলার বিবরণে। এর বিভিন্ন দৃশ্যে প্রেমিকা, গৃহবধূ ও স্বৈরিণী হিসেবে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত নারীরা উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী থেকে সর্বোচ্চ মধ্যবয়সের গণ্ডিতে উপস্থিত। সৌন্দর্যের প্রতি স্বভাবজাত মুগ্ধতার পাশাপাশি প্রেমিক, স্বামী ও সমাজের অন্য পুরুষদের নিকট নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে তার বেশভূষা ও অঙ্গভঙ্গি, প্রসাধনকলা সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রকৃতিতে সহজেই প্রাপ্য অথচ মনোহর নানা উপাদানে সে নিজেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে আগ্রহী। কখনো বা ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার অংশ হিসেবে, আবার কখনো অন্যের কাছে নিজের ভাবমূর্তিকে আবেদনময় করে তুলতে নারীদের লোকজ সাজসজ্জা ও প্রসাধনকলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ উপন্যাসে শবরী, দেবকী ডোম্বী, বিশাখা ও সুলেখার রূপচর্চার বর্ণনায় বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে শবরীর রূপচর্চার বিবরণের মাধ্যমে। মেঘবরণ চুলের অধিকারী শবরীর গোছা কাকইয়ে ধরে না। ফলে সেগুলো পরিচর্যায় তাকে দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। সে চুল খোপায় গুছিয়ে তাতে ময়ূরের পালক পরিধান কও়ে, তার গলায় শোভা পায় গুঞ্জার ফুলের মালা। তার হাতে কেয়ুর, কটিদেশে মেখলা এবং পায়ের নূপুর বাজে। এভাবে সজ্জিত হতে সে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, রূপময় মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধতা আনতে সে সারাদিন ধরে চন্দন বাটা লাগিয়ে রাখে। সাজসজ্জার প্রতি তার গভীর নিবিষ্টতার মূলে রয়েছে একান্ত তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি। তার কাছে সাজসজ্জা মানেই মনোহরভাবে অন্যের নিকট নিজেকে তুলে ধরা নয়। তার বিবেচনায় সাজসজ্জা প্রার্থনার মতো একান্ত, গভীর উপলব্ধির ফল। দেহকে সুসজ্জিত করতে হলে মনকেও এর প্রতি কেন্দ্রীভূত করতে হয়। তখন মনের স্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে দেহভঙ্গিমায়। তাছাড়া প্রচুর সাজসজ্জার মাধ্যমে নিজেকে জমকালোভাবে উপস্থাপনের চেয়ে পরিশীলিত প্রসাধনের রুচিশীল বিন্যাসের মাধ্যমে কাহ্নুপাদের নিবিড় মনোযোগ অর্জনই তার লক্ষ্য। হাতে পায়ে হলুদ মাখার পাশাপাশি সুযোগ করে পায়ে আলতা পরিধানও তার বিশেষ শখ। সপ্তম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, তার উক্ত সাজসজ্জার সঙ্গে যুক্ত হয় কড়ইয়ের হলুদ ফুলের পাপড়িকে টিপ হিসেবে কপালে এবং নাকছাবি হিসেবে নাকে পরিধানের খেয়াল। পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেবকীর অনিন্দ্য দেহবল্লীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লক্ষণীয়। লাল পেড়ে সাদা শাড়িতে তার রূপের বিভার সঙ্গে হীরার অলঙ্কারের বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যের প্রতিতুলনায় বিষয়টি উল্লেখিত। ঘিয়ের প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তার শাড়ির শুভ্র জমিনের সাদৃশ্য কল্পিত হয়েছে। সেই সঙ্গে, গলায় শোভিত জুঁই ফুলের মালার কান্তির সুবাস তার সাজকে পরিপূর্ণতা দেয় পিঠের ওপর ছড়ানো একরাশ চুলের লাবণ্যে। ডোম্বী যদিও নাচ-গানে পারদর্শী, তার সাজসজ্জার উল্লেখ এ উপন্যাসে নেই। তবে, কপালের টিপ এবং চোখের কাজল যে বাঙালি নারীর প্রসাধনকলার অপরিহার্য অংশ, এর উল্লেখ রয়েছে কাহ্নুপাদকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত ডোম্বীর প্রেমময় সংলাপে। সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রেমিকা বিশাখাকে প্রেমিক দেশাখ যে সাজে সজ্জিত দেখতে চায়, এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। এতে প্রতিফলিত হয়েছে নারীর লোকজ প্রসাধনপ্রীতির প্রতি পুরুষের বিমুগ্ধ কল্পনা –'সাজলে

হয়তো ওকে অন্যরকম দেখাতো। কানে কুণ্ডল, গলায় গুঞ্জারমালা, হাতে কেয়ূর ও শঙ্খবলয়, কটি দেশে মেখলা, পায়ে মল। কাঁচা হলুদে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে গাত্রবর্ণ, চন্দনের গন্ধ আসবে মৃদু' (পৃ. ৭৬)। এ পরিচ্ছেদে সুলেখার রূপচর্চায় উল্লেখিত হয়েছে কেশচর্চার প্রসঙ্গ। তার দীঘল চুল চিরুনি দিয়ে আচড়াতে বেগ পেতে হয়। সে চুল পরিচ্ছন্ন রাখতে খড়িমাটি দিয়ে মাথা ধুয়ে চপচপে তেল দিয়ে চুল ভিজিয়ে রাখে। এরপর সেগুলো সময় নিয়ে আঁচড়ে কাপড়ের পাড় ছেঁড়া সুতো দিয়ে টান টান করে চুলগুলো বাঁধে এবং খোপায় একটা কাঁঠালিচাপা গুঁজে দেয়। এসব বিবরণ থেকে বাঙালি নারীর সাজসজ্জা ও প্রসাধনকলা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৫. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে বাঙালি লোকজীবনে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্যের উল্লেখ লক্ষণীয়। অরণ্যচারী পাহাড়ী লোকগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা টিলা বা পাহাড়ের পাদদেশ সংলগ্ন সমতলভূমিতে বিভিন্ন খাদ্যশস্য ফলায়। পাশাপাশি নদী থেকে মাছ, শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি সংগ্রহ এবং অরণ্য থেকে জীবজন্তু শিকারের মাধ্যমে তাদের খাদ্যের যোগান ঘটে। লতাপাতা, বীজ, ফুল, ফল ও নানা উদ্ভিদ, শাকসবজির জন্য তারা ভূমির ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া তারা কখনো কঙ্গুচিনা ফল দিয়ে হাঁড়িয়ার পাশাপাশি ভাত, নারকেল, তাল গাঁজিয়ে বিশেষ ধরনের মদ তৈরি করে। কর্পূর মেশানো পান খাওয়াও তাদের খাদ্যাভ্যাসের অন্তর্গত। এ উপন্যাসে বাঙালি লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন খাদ্যের উল্লেখ রয়েছে--

> কাগনি ধানের ভাত রেঁধেছে শবরী। ঘরের মেঝেয় হরিণের চামড়া বিছিয়ে খেতে বসেছে কাহ্নুপাদ। সামনে ভাতের থালা, ধোঁয়া উঠছে। জলের ভাঁড় তরকারির বাটি। কাঁসার বাটিতে মুরলা মাছের ঝোল এবং হরিণের মাংসও আছে। ... শবরী যতটা সম্ভব নতুন নতুন খাবার বানাতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে নানারকম জিনিস সংগ্রহ করে। বেতি শাক, হেলেঞ্চা, গিমা, সজনে, সরপুঁটি, চিংড়ি, শামুক, কাঁকড়া সব কাহ্নুপাদের প্রিয়। ও পাহাড়ের দিক থেকে শামুক খুঁজে আনে, কচি বেতের ডগা কেটে আনে। বেতের ডগা দু'দিন জলে ভিজিয়ে রেখে মসুরের ডালের সঙ্গে বেটে বড়া ভেজে দেয়। গুঁড়া মাছ ধনে পাতা, কাঁচামরিচ এবং মসলা দিয়ে মাখিয়ে কলাপাতায় মুড়ে মাটির খোলায় করে রেঁধে দেয়। (পৃ. ১২-১৩)

> হরিণের মাংস তুমি বেশি ভালোবাস। ... কাহ্নুপাদ হো-হো করে হাসে, তোমার কি ভালো লাগে? ... এই ধরো, চিংড়ি দিয়ে সাদা ডাঁটার চচ্চড়ি, ভাদালি পাতার ভর্তা, এই সব আর কি। (পৃ. ১৪)

> সুলেখা এসে ওর হাতে এক টুকরো হরিণের মাংস গুঁজে দেয়, কবেকার মাংস দেশাখও জানে না। একসঙ্গে বেশি মাংস পেলে লবণ-হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে শুকিয়ে রাখা হয়। দরকার মতো বের করে গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে ভুনা করে সুলেখা। (পৃ. ২৩)

> অরুণ একমুঠি পান্তা এক সানকি পানির মধ্যে থেকে সপসপ করে খাচ্ছে (পৃ. ২৫)

> ঘরে ফিরে ভৈরবী চাল সেদ্ধ বসায়। ... কোনোদিন যদি বড় সরপুঁটির দোঁপেয়াজা করে সামনে বসিয়ে কামোদকে খাওয়াতে পারতো। ... উঠোন থেকে লাউ আর বেগুন তুলে এনে কাটতে বসে। মন খুশিতে ভরে ওঠে। অতিথিকে গরম ভাত আর গরম তরকারি দিতে পারবে, এই মুহূর্তে ভৈরবী এর বেশি কিছু আর ভাবতে পারে না। (পৃ. ২৭)

> শবরী রান্নার যোগার করছে। কানুর প্রিয় কচ্ছপের মাংস রাঁধবে, প্রচুর মসলা, দই, রাই, সরিষায় সে ব্যঞ্জনের গন্ধ টিলার গায়ে ম ম করবে। ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু, তালরস গাঁজিয়ে মদ তৈরি করা ছিল, আজ তা কানুর সামনে দেবে। নালিতা শাকের ঝোল করবে, সঙ্গে মুসুরির ডালের বড়া। (পৃ. ৪৪)

> জামাইয়ের বাড়ি গিয়ে তো ঢেকিশাক দিয়ে নোনা ইলিশ রেঁধে খাবে। (পৃ. ৭১)

> হরিদাসী অতিথিদের রান্নার জন্য চাল চাইতে যায় পাশের ঘরে। ওর বড় বোন এককাঁদি কাঁচা কলা এনেছিল, তার কিছু আছে। কাঁচা কলার ভর্তা আর নটে শাক ভেজে ভাত দেবে অতিথিদের। (পৃ. ৮৩)

> দিনের বেলা হলে নদীর ধার থেকে হেলেঞ্চা নিয়ে আসতো, ... সজারুর মাংসের সঙ্গে অনেক কাঁচামরিচ দিয়ে শাক ভেজে দিতে পারতো অতিথিকে। (পৃ. ৮৬)

দুজনে উঠে আসে ঘরে। হরিণের চামড়ার আসনটা ধনশ্রী বিছিয়ে দেয়। কলসি থেকে জল ঢালে। ভৈরবী ঠাণ্ডা ভাত বাড়ে মাটির বাসনে, সজারুর মাংস তুলে দেয় ধনশ্রীর পাতে। হাঁড়িয়া এনে সামনে রাখে। (পৃ. ৮৭)

৬. লোকভাষা–– এ উপন্যাসের লোকভাষা হিসেবে লেখকের অবলম্বন হয়ে উঠেছে শিক্ষিত মানুষের আলাপে প্রযুক্ত চলিত বাংলা গদ্যরীতি। পাহাড়ী লোকালয়ের মানুষের মুখের ভাষা নির্বাচনে তিনি পার্বত্য অঞ্চলসমূহের স্থানিক ভাষাকে গুরুত্ব দেননি। যেহেতু এ উপন্যাসের পটভূমি প্রায় হাজার বছরের অতীতকালের, তাই তিনি সে সময়ের প্রচলিত ভাষারীতি সম্পর্কে অনুমানের দ্বারস্থ হননি। বরং এযুগের শিক্ষিত পাঠকগোষ্ঠীর কথা ভেবেই সম্ভবত, তিনি তাদের নিকট পরিচিত এবং ব্যবহারোপযোগী এ ভাষাকে আশ্রয় করেছেন। তবে উপন্যাসটির শব্দভাণ্ডার ও বাগধারার উল্লেখ থেকে তৎকালীন লোকজীবনের আবহ নির্মাণে লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে অনুধাবন করা যায়।

৬.১ শব্দভাণ্ডার

ক্রিয়া– গুঁজে, ঝাঁকিয়ে, ঝুলিয়ে, কুলিয়ে, চেপে, পোড়ে, ঠেলা, গোছায়, ভাঙে, টানে, রেঁধেছে, মুড়ে, ঝরে, গুঁজে, বেটে, মুড়ে, ঝুলিয়ে, গুছিয়ে, দোহানো, সিঁটকানো, গাইতে, নাচতে, ভাসিয়ে, ছলকায়, বায়, গড়িয়ে, ফুলিয়ে, ঝুলিয়ে, কেচে, গুঁজে প্রভৃতি।

বিশেষণ– মেঘবরণ, ঝিম, পেকেছে, মেকি, নুয়ে, জমিয়ে, গাট্টা, গনগনে, ছিন্নভিন্ন, ছাইপাশ, আড়মুড়ি, ফিকে, ঝুঁকে, ঝাঁকুনি, লুটিয়ে, বিছিয়ে, দিঘল, খোদাই, ঝলকায়, জড়ো, তুখোড়, সরেস, দুলে, চিকচিক, সাঁইত, কাঁটাকুটো, তাক, দরদরিয়ে, উপোষ প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– গোছা, কাঁকই, খোপা, বেড়া, পুব, মল, কটি, মেখলা, মল, টিলা, চাঁচর, বেড়া, মিস, ঢঙ, , চুমুক, হাড়িয়া, কাদা, হাঁপর, তীর, ধনুক, ধুনো, ভাঁড়, হিঞ্চে, ডাঁটা, টাল, গিমা, সজনে, কাঁকড়া, বেত, ডগা, চাঙারি, খোলা, শুক্তো, চচ্চড়ি, ভাদালি, ছল, বাসন, পাড়া, পিঠা, মুদি, হোতা, দড়িদড়া প্রভৃতি।

হাজার বছর পূর্বের বাঙালি লোকজীবন ও সংস্কৃতিকে ইতিহাসের পটভূমিতে বিনির্মাণে লেখকের বিস্ময়কর সৃষ্টিসামর্থ্যের পরিচয় এ উপন্যাসে প্রকাশিত। প্রান্তবাসী মানুষগুলোর চেতনালোকে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ঘিরে স্বাধীন ভূ-খণ্ডে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বারবার দোলা দেয়, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণতা দিতেই বারবার লোকজচেতনার জগতে আশ্রয় খুঁজে ফেরে। কেননা, তাদের নিত্যদিনের জীবনাবাস্তবতার অনস্বীকার্য অংশ হিসেবে, মানবিক মূল্যবোধের জাগৃতিতে এর ভূমিকা অপরিসীম। কৌমবদ্ধ বিভিন্ন আরণ্যক লোকগোষ্ঠীর সমন্বিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিশ্বস্ত চালচিত্র গ্রন্থনায় এ উপন্যাস ভাস্বর হয়ে থাকবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হুমায়ূন আহমেদ

নিঃসন্দেহে হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) বাংলাদেশের জনপ্রিয় কথাশিল্পী।[১৩৮] পাশাপাশি তাঁর লেখা যে যথেষ্ট সাহিত্যিক মানসম্মত, এতেও সন্দেহ নেই। তবে বিপুল সংখ্যক উপন্যাস লেখায় তিনি পরিশ্রম ও ধৈর্যের পরিচয় দিলেও এসব রচনার শিল্পমান এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষের ব্যাপারে সংশয় থেকেই যায়। তবু তাঁর লেখনীতে এমন কিছু মৌলিক গুণ রয়েছে, যার প্রতি সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি সমালোচক ও বোদ্ধা পাঠকের আগ্রহও পরিলক্ষিত হয়।[১৩৯] স্কুলজীবনে গল্প, উপন্যাস লিখলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রাবস্থায় একরাতে লিখে ফেলা 'নন্দিত নরকে' উপন্যাসটি তাঁর লেখক পরিচয় পাঠকসমাজকে অবহিত করায়।[১৪০] সোমেন চন্দের 'ইঁদুর' গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁকে তাড়িত করেছিল লিখতে।[১৪১] গড়পরতা বাঙালি মধ্যবিত্তের আটপৌরে, ছকে-বাধা জীবনের চালচিত্রকে তিনি সহজ, সরলভাবে, গতিময় বর্ণনা ও আঁটোসাঁটো সংলাপের নিপুণ বিন্যাসে এতটাই সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে প্রাজ্ঞ সমালোচক ও সাহিত্যিকরাও এটি পড়তে আগ্রহী হন। পারিবারিক আবহে সাহিত্যচর্চার সুযোগ থাকা[১৪২] এবং সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহপ্রাপ্তি[১৪৩] তাঁর লেখনীকে বেগবান করেছে। প্রাত্যহিক জীবনের গতানুগতিক প্রসঙ্গ ও ঘটনাকে কৌতুক-পরিহাসযোগে চমকপ্রদ ভঙ্গিতে যথোপযুক্ত সংলাপের আশ্রয়ে চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার সহজাত মেধা [১৪৪] তাঁর কথাসাহিত্যের প্রাণ। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, আত্মজৈবনিক রচনা, রম্যরচনা ও শিশুতোষ রচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী প্রভৃতি লিখে তিনি নিজের মেধা ও সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি বাঙালি পাঠকসমাজকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার পাশাপাশি নতুন পাঠক সৃষ্টিতেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। সর্বমোট ৩৬৮টি গ্রন্থের রচয়িতা[১৪৫] হলেও এবং এর অধিকাংশই উপন্যাস হলেও সাহিত্যিক বিবেচনায় এগুলো নভেলা অভিধার উপযুক্ত। তবে দীর্ঘ পরিসরেও তিনি সাহিত্যিক গুণসম্মত উপন্যাস লিখেছেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো bw›`Z bi‡K, k•Lbxj KvivMvi, wbevmb, AwPbci, †div, Acivn, †MŠixci Rskb, hLb

wM‡q‡Q W‡e cÂgxi Pv‘, Pv‡‘i Av‡jvq K‡qKRb heK, 1971, Av¸‡bi cikgwb, †R¨vQbv I Rbbxi Mí, ga¨vý, ev‘kvn bvg‘vi, gvZvj nvIqv প্রভৃতি। নাগরিক জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবন, বিশেষত তাঁর নিজের গ্রামসূত্রে পরিচিত নেত্রকোণা ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের পরিসরে তিনি কিছু উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণের পাশাপাশি সমাজের প্রান্তিক বাসিন্দাদের চালচিত্রও তাঁর লেখায় যথেষ্ট মনোযোগ পেয়েছে।

†div

হুমায়ূন আহমেদের লেখনীতে বিবৃত গ্রাম-নগর নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অনাড়ম্বর, নির্মেদ অথচ অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ বারবার পাঠককে আলোড়িত করে। সংক্ষিপ্ত অথচ পরিমিত বর্ণনাগুণে গতিময় ভাষাকে হাতিয়ার করে তিনি মানবমনস্তত্ত্বকে যেভাবে বাঙ্ময় রূপ দেন, এর অনিন্দ্য দৃষ্টান্ত †div (১৯৮২) উপন্যাস। পারিবারিক আবহে বেড়ে ওঠার সূত্রে নেত্রকোণা তথা ভাটি অঞ্চলের গ্রামীণ পটভূমিতে সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনকে তিনি এতে উপজীব্য করেছেন। সোহাগী গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোকসমাজের যে রূপরেখা উপন্যাসটিতে প্রতিবিম্বিত, এতে সন্নিহিত রয়েছে এতদঞ্চলের মানুষের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনবাস্তবতা। যে কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রতিবেশ এর পারিপার্শ্বিক জনজীবনের চালচিত্র, জীবিকা, সংস্কৃতি ও চেতনালোকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এর পরিণতিতে তাদের প্রাত্যহিক চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, সামাজিক লেনদেন, ওঠাবসা, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও অনুশাসন সবকিছুই স্বতন্ত্র রূপ পায়। এ উপন্যাসে ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্র বয়ানে লেখকের পরিশ্রমী, সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয় কুশীলবদের সংলাপে, পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসে, নিত্যদিনের জীবনপ্রবাহের নানা অনুষঙ্গে, এমনকি তাদের মনোজগতের অতি তুচ্ছ প্রসঙ্গগুলোকে প্রাসঙ্গিকভাবে সন্নিবেশের প্রচেষ্টায়। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান রয়েছে।

১. লোকসংস্কার-- এ উপন্যাসে বাঙালি গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু বিশেষভাবেই আঞ্চলিক, অর্থাৎ নেত্রকোণার ভাটি অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। লেখক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সোহাগী গ্রামের বাসিন্দাদের চিন্তা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন, পারিবারিক সম্পর্কের গড়ন, কৃষিকর্ম সম্পর্কিত ধারণা, রোগব্যাধি, অলৌকিক ও অতিলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং এ সংক্রান্ত বিবিধ সংস্কারকে এ উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রামের অশিক্ষিত, বিজ্ঞানচেতনাশূন্য, যুক্তি-বুদ্ধি

দিয়ে কোনো ঘটনা মূল্যায়নে অসমর্থ লোকগোষ্ঠীর সমষ্টিচেতনার যে পরিচয় এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তাতে এসব লোকসংস্কারের প্রভাব বিদ্যমান।

১.১ অশরীরী ও ভূতবিষয়ক-- সোহাগী গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ভূত-প্রেত, অশরীরী সম্পর্কিত ভীতিবোধ প্রবল। উপন্যাসের '১' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, আজরফ যখন অসুস্থ মা শরিফাকে মোহনগঞ্জে নেয়ার জন্য নৌকা চালিয়ে সোনাপোতার হাওরের কাছে আসে, তখন সে ভীতিবোধে আক্রান্ত হয়। কারণ, এখান থেকেই নৌকাটি বড় গায়ে নামবে। লোকমুখে প্রচলিত রটনা হলো, এ জায়গাটা অশুভ। গাঙের মুখসংলগ্ন স্থানটিতে বেড়ে ওঠা তিনটি শ্যাওড়া গাছে নাকি অশরীরীদের আনাগোনা রয়েছে। গ্রামবাসী রাতে তাদের নাম মুখে নিতে ভয় পায়। '২' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, ভরদুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাছে ওঠাকে অশুভ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মতি মিয়ার ছোট ছেলে নুরুদ্দীন গাঙের পাড়ের জলপাই গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আনমনে কথা বলে, যা তার বাবার মোটেই পছন্দ নয়। মতি মিয়ার মতে এ সময়টি খারাপ, কেননা এসময় নাকি জিন-ভূত চলাচল করে। ফলে তাদের নজরে পড়লে তার কোনো সমস্যা হতে পারে। মতি মিয়ার বারণ সত্ত্বেও নুরুদ্দীন পুনরায় এ কাজ করায় তার জন্য তাবিজের বন্দোবস্ত করা হয়। তাবিজ সংক্রান্ত লোকসংস্কারও এর সঙ্গে জড়িত। বিশেষ কোনো পীর-ফকিরের দোয়া পড়া তাবিজ পরিধান করালে সেই ব্যক্তির কাছে কোনো অশরীরী আসতে পারে না। সে সকল বালা-মুসিবত থেকে দূরে থাকে। গ্রামের সাধারণ মানুষের এরূপ বিশ্বাসই এ ধরনের সংস্কারের পেছনে সক্রিয়। '৭' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, গ্রামের পরিত্যক্ত জঙ্গলা ভিটার ভাঙ্গা ঘাটে নুরুদ্দীন মাছ ধরতে যায়, যা তার বড় ভাই আজরফের পছন্দ নয়। লোকমুখে প্রচলিত, জায়গাটিতে দোষ রয়েছে। অর্থাৎ পরিত্যক্ত নির্জন স্থানটিতে অশরীরীর আনাগোনা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া, সেখান থেকে পূর্বদিকে তাকালে নিমতলি গ্রামের সীমাসংলগ্ন তালগাছ দুটিও আবছা চোখে পড়ে। এ গাছ দুটিতেও দোষ রয়েছে বলে গ্রামবাসীর ধারণা। 'গভীর রাত্রে মাছ মারতে এসে অনেকেই দেখেছে একটা জাম্বুরার মত বড় আগুনের গোলা গাছ দুটির মাথায়। এ গাছ থেকে ও গাছে যাচ্ছে আবার ক্ষণে ক্ষণে মিলিয়েও যাচ্ছে' (পৃ. ৪৬)। একবার সেখানে একাকী মাছ মারতে গিয়ে নুরুদ্দীন যে ভীতিকর অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিল, তা গ্রামবাসীর মধ্যে এ বিষয়ক ভীতিবোধকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

> জঙ্গলা ভিটাকে আর চেনা যায় না। পানিতে ডুবে একাকার। ... চারদিক দিনমানেই অন্ধকার। ... নুরুদ্দীন (নৌকায়) ভেসে বেড়াতে লাগলো। ... হঠাৎ চারদিক সচকিত করে থইরকল গাছ থেকে অসংখ্য কাক এক সঙ্গে কা কা করে উড়ে গেল। উত্তর দিকের ঘন বাঁশবনে হাওয়ার একটা দমকা ঝাপটা বিচিত্র একটি হা হা শব্দ তুললো। তার পরপরই নুরুদ্দীন শুনলো একটি অল্প বয়েসী মেয়ে যেন খিল খিল করে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে চার দিক নিশ্চুপ। ... নুরুদ্দীন ভয় কাতর স্বরে বললো, 'কেডা গো কেডা?' ... আর তখন তার চোখে পড়ল জঙ্গলা বাড়ির ভিটার কাছে যেখানে জল শ্যাওলায় ঘন সবুজ হয়ে আছে সেখানে মাথার চুল এলিয়ে উপুর হয়ে মেয়েটি ভাসছে। অসম্ভব ফর্সা তার একটি হাত ছড়ানো। হাত ভর্তি গাঢ় লাল রঙের চুড়ি। এই সময় প্রবল একটা বাতাস এলো। মেয়েটি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসতে লাগলো নুরুদ্দীনের দিকে। যেন ডুব সাঁতার দিয়ে ধরতে আসছে তাকে। (পৃ. ৬৬)

এ ঘটনার পর নুরুদ্দীন বহুদিন অসুস্থ ছিল। এমনকি জঙ্গলা ভিটার পুকুরে ভাসতে থাকা লাল চুড়ি পরিহিত মেয়েটিকে দেখে নুরুদ্দীন ভেবেছিল, কোনো পেত্নী বা অশরীরী তাকে ধরতে আসছে। এ ঘটনা ভিন্নভাবে গ্রামে প্রচারিত হয়– পরীর মতো অসামান্য রূপসী এক মেয়ে নাকি নগ্ন হয়ে সাঁতার কাটে। নুরুকে দেখে সে নাকি হাসতে হাসতে ডুব সাঁতার দিয়েছে। তার চিকিৎসার জন্য নিমতলির পীর তাবিজ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সেইসঙ্গে গৃহবন্ধন করা এবং জঙ্গলা ভিটায় কারো যাবার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কেননা, রাতে নিমতলির তালগাছে বজ্রপাত ঘটায় সেখানে বসবাসরত অশরীরী নাকি নতুন আস্তানা খুঁজছে। তাই জঙ্গলা ভিটায় তার আশ্রয় নেয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অথচ সমগ্র ঘটনাটি যে গ্রামবাসীর কাল্পনিক, অতিলৌকিক বিশ্বাস ও ভীতিবোধকে ঘিরে পল্লবিত, উপন্যাসের শেষভাগে আমিন ডাক্তারের বয়ানে তা প্রমাণসহ বিবৃত হয়েছে।

১.২ রোগব্যাধি সংক্রান্ত সংস্কার-- রোগীকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় ছাতা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা লোকসমাজে লক্ষণীয়। বিশেষত, ছাতা মেলে ধরলে রোগীর কোনো অমঙ্গলজনক পরিণতি ত্বরান্বিত হবে বলে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রবল বিশ্বাস। '১' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, অসুস্থ শরিফাকে বৃষ্টির মধ্যে নৌকায় নিয়ে মোহনগঞ্জে যাত্রার একপর্যায়ে আমিন ডাক্তার নিজেকে বৃষ্টির তোড় থেকে বাঁচাতে সঙ্গে রাখা ছাতা মেলে ধরতে পারে না । তেমনিভাবে গ্রামে কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে এর পেছনে অপশক্তি বা প্রেতাত্মার ভূমিকা রয়েছে বলে গ্রামবাসী ধারণা পোষণ করে। কেউ কলেরায় (ওলা ওঠা) আক্রান্ত হলে অন্যরা রাতের বেলা ঘরের দরজা লাগিয়ে রাখে, খুব প্রয়োজন না থাকলে বাইরে বের হয় না। কেননা, 'তখন বাইরে বেরুলে রাত বিরাট বিকট কিছু চোখে পড়তে পারে। চোখে পড়লেই সর্বনাশ' (পৃ. ৭৪)। এক রাতে ছয়জন গ্রামবাসী বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে এর প্রতিকারের জন্য তারা ফকিরের দ্বারস্থ হয়। ধনু ফকির এসে গ্রাম বন্ধন করে এবং অমাবশ্যার রাতে বসন্তকে অন্য গ্রামে চালান দেয় । সেকারণেই কৈবর্ত পাড়ার নিমু গোঁসাই কলেরায় মৃত্যুবরণের পর আর কেউ এতে আক্রান্ত না হওয়ায় গ্রামবাসী এর কৃতিত্ব দেয় সেই ফকিরকে। কারণ 'ফকির সাব ওলা উঠাকে পশ্চিম দিকে চালান করেছেন। সেই কারণেই শেষ রুগীটি হয়েছে পশ্চিমের কৈবর্ত পাড়ায়' (পৃ. ৭৬)। রোগব্যাধি ও এর প্রতিকার সংক্রান্ত এ ধরনের লোকসংস্কার সোহাগীর পাশাপাশি সারা দেশেই প্রচলিত ছিল।

১.৩ পীর-ফকির সংক্রান্ত-- সোহাগীর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা মুসলমান। গ্রামে চিকিৎসার বন্দোবস্ত না থাকায় আমিন ডাক্তার যখন মতি মিয়াকে পরামর্শ দেয় মিশনারি হাসপাতালে শরিফাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সে এতে ক্ষুব্ধ হয়। তার ধারণা যেহেতু মিশনারি হাসপাতাল খ্রিষ্টান ইংরেজ সাহেবদের দ্বারা পরিচালিত, তাই সেখানে শরিফাকে নিয়ে গেলে সে খ্রিষ্টান হয়ে যাবে। পীর-ফকিরের প্রতি অন্ধভক্তি এবং শ্রদ্ধাপ্রকাশও লোকসংস্কারের অন্তর্গত। তারা স্রষ্ট্রার প্রতিনিধি, ধর্মের বার্তাবাহক এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী; মানুষের সমুদয় সমস্যার সমাধান তাদের কাছে পাওয়া যায়, এ ধরনের বিশ্বাস থেকেই মূলত এতদ্বিষয়ক লোকসংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে। পীরের নামে দিব্যি দিয়ে সেই কাজ না করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, এরূপ সংস্কারবশত আমিন ডাক্তার অছিমুদ্দীনকে বিনা টাকায় চিকিৎসা করিয়েছিল। অথচ নিমতলির পীরের নামে দিব্যি দেয়ার পর প্রায় তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও অছিমুদ্দীন আমিন ডাক্তারকে সেই টাকা পরিশোধ করে না। '৬' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সুখান পুকুরের জনৈক রোগীর চিকিৎসার জন্য আমিন ডাক্তার বা সিরাজুল ইসলাম ডাক্তারের ওপর ভরসা করতে না পেরে রোগীর বাবা নিমতলির পীরকে আনাতে লোক পাঠায়। কারণ সে এসে রোগীকে দেখে যে সিদ্ধান্ত নেবে, রোগীর বাবা তা-ই করবে। দেখা যায়, বাস্তব জীবনে বিবিধ সংকটের মোকাবিলার জন্য লোকসমাজে পীর-ফকিরের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপনের প্রচেষ্টার অন্তরালেও এ ধরনের সংস্কার প্রচলিত।

১.৪ মৃত্যু সংক্রান্ত-- মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত কিছু লোকসংস্কার গড়ে উঠেছে ধর্মীয় বিধির প্রতি ভীতিবশত। যেমন, কেউ মারা গেলে সশব্দে কাঁদতে নেই। তাহলে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা কষ্ট পায় এবং কবরে তার আজাব হয়। '৬' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, জনৈক তরুণ অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার মা ছেলের শোকে কাঁদতে থাকে। তখন তাকে সান্ত্বনা দিতে আরেকজন জানায়, 'কাইন্দেন না। মউতের সময় কান্দন হাদিস মানা আছে।' (পৃ. ৩৯) আবার মৃত ব্যক্তির বাড়িতে চুলা ধরানো এবং রান্না করাও নিষেধ। এ প্রসঙ্গে যে লোকসংস্কার বাঙালি গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত, তা হলো মৃতের বিদেহী আত্মা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাড়ির চারপাশে ঘোরাফেরা করে। আগুনকে অশরীরীরা ভয় পায় বলেই সে বাড়িতে রান্নাবান্না বন্ধ থাকে। পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, আমিন ডাক্তার সেই তরুণের চিকিৎসা শেষে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হলেও এরূপ সংস্কারের জন্য খাবারের ব্যাপারে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

১.৫ কৃষি সম্পর্কিত-- ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা অঞ্চলে কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ লোকসংস্কার হিসেবে ফিরাইল সংক্রান্ত ভাবনার উল্লেখ লক্ষণীয়। 'ফিরাইল' হলো ক্ষেতের পাহারাদার বা রক্ষাকারী, যার বিশেষ

আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে। তবে তার ভূমিকা বিশেষভাবে শিলাবৃষ্টির কবল থেকে ফসল রক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কবে নাগাদ শিলাবৃষ্টি হবে, সেই সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং মন্ত্র পড়ে শিলাকে ফসলের মাঠ থেকে বিতাড়িত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা তার দায়িত্ব। '৭' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, উত্তর বন্দে (ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ) কৃষকরা ধান কাটা নিয়ে ব্যস্ত। কেননা ফিরাইল তাদের জানিয়েছে দুয়েকদিনের মধ্যেই প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হবে, যা মোকাবেলার সাধ্য তার নেই। তাই যত দ্রুত সম্ভব যেন ধান তুলে ফেলা হয়। ধান কাটা শেষ হলে ফিরাইল সোহাগী গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এর পরদিন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে ফিরাইলের ছাউনি তছনচ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীর ধারণা, "তাতো হবেই 'মাঠ বন্ধন' নেই। শিল আটকাবার আসল লোকই নেই" (পৃ. ৫০-৫১)। তাদের বিশ্বাস, ফিরাইল তার ক্ষমতা দিয়ে উত্তর বন্দকে রক্ষা করেছে এবং সমস্ত শিলা নিয়ে ফেলেছে নিমতলির বন্দে। এজন্য সোহাগীর বাসিন্দারা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। ফিরাইলের ক্ষমতা শুধু ফসল রক্ষায়ই নয়, বরং অশরীরী-ভূত-প্রেতের গতিবিধিও তার জানা। তাই সোহাগী ছেড়ে যাবার পূর্বে সে গ্রামবাসীকে সতর্ক করে, বাজ পড়ে নিমতলির তালগাছ দুটির একটিও পুড়ে গেলে তাদের মহাবিপদে পড়তে হবে। সেকারণে সে তাদের পরামর্শ দেয় 'নিমতলির তালগাছের নিচে তিনটা বড় শউল মাছ পুড়িয়ে ভোগ দিতে। তাল গাছে যে বিদেহী প্রাণীটি বাস করে তাকে তুষ্ট রাখা খুবই প্রয়োজন।' (পৃ. ৫০-৫১) পাশাপাশি গর্ভবতী নারীরা যেন আগামী অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় কোনোভাবেই উত্তর বন্দে যাতায়াত না করে, সে প্রসঙ্গেও তাদের সতর্ক করা হয়। জিন-ভূত সম্পর্কিত আরেকটি লোকসংস্কার উল্লেখযোগ্য। কোনো গৃহবধূ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হলে ধারণা করা হয় তার ওপর জ্বিনের নজর রয়েছে। '১০' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সিরাজ মিয়ার যুবতী রূপবতী স্ত্রী পরপর তিনবার আতুড়ঘরে গিয়েও বাচ্চা জন্ম দিতে ব্যর্থ হলে এ নিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে নানা রটনা প্রচারিত হয়। কেননা, তাকে ভর সন্ধ্যায় এলোচুলে বাড়ি ফিরতে অনেকেই দেখেছে। একারণে একপর্যায়ে সিরাজ মিয়ার সঙ্গে তার স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ হয়। লোকমুখে একপর্যায়ে গুজব রটে, সিরাজ মিয়া পুনরায় বিয়ে করতে যাচ্ছে। কাজেই নিজের সংসার টিকিয়ে রাখতে মরীয়া সিরাজের স্ত্রী অবশেষে বাধ্য হয় বশীকরণের দ্বারস্থ হতে। সে নুরুদ্দীনকে দিয়ে সুখান পুকুরের জনৈক কবিরাজের নিকট হতে পড়া পান আনতে চায়। এ ধরনের লোকসংস্কারগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যা সামগ্রিকভাবে গ্রামবাসীর চেতনালোকের বৈশিষ্ট্যসমূহকেই নির্দেশ করে।

২. লোকপ্রথা–– এ উপন্যাসে লোকপ্রথা হিসেবে নাইয়র প্রথার একাধিক উল্লেখ রয়েছে। বিবাহিত নারীর পিতৃগৃহে আসাকে ঘিরে এ প্রথা প্রচলিত। সাধারণত বর্ষাকালে যখন হাওর এলাকাসংলগ্ন ফসলের বিস্তীর্ণ নিচু মাঠগুলো (বন্দ) বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে যায়, তখন বিবাহিত নারীরা নাইয়রে আসে। চারদিকে অথৈ পানির মধ্যে সোহাগী গ্রামটি অনেকটা দ্বীপের মতো ভেসে থাকে। চৌধুরী বাড়ির পক্ষ থেকে হারিকেন ঠুলিয়ে রাখা হয় হিজল গাছে। গভীর রাতে যখন গ্রামের সব আলো নিভে যায়, তখন সেই আলো দেখে নাইয়রীরা উল্লসিত হয়। কেননা দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দে উদ্বেলিত বলেই সেই হারিকেনের আলোর বিচ্ছুরণ দেখে তারা বুঝে নেয়, পিতৃগৃহের কাছাকাছি তারা চলে এসেছে। এ প্রথাকে ভিত্তি করে লোকসমাজে নানা ধরনের সঙ্গীতেরও প্রচলন রয়েছে, যা থেকে ধারণা করা যায় যে এর ঐতিহ্যিক ও সামাজিক ভিত্তি বেশ প্রাচীন ও জোরালো। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে নতুন সংসারে নানা কাজে ব্যস্ত নারী একপর্যায়ে হাঁপিয়ে ওঠে। তাই বর্ষাকালে বাপের বাড়িতে এসে সে কিছুদিন থাকতে চায়। এক্ষেত্রে বাবা-মা যদি নৌকা সাজিয়ে কাউকে পাঠিয়ে তাকে আনার আমন্ত্রণ না জানায়, তখন মেয়েটির মধ্যে প্রবল অভিমান ও ক্ষোভ জমতে থাকে। এর বহিঃপ্রকাশ নিচের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত–

> শ্রাবণ মাস গেছে গেছে ভাদ্র মাসও যায়
>
> জানি না কি ভাবেতে আছে আমার বাপ ও মায়। (পৃ. ৬২)

চৌধুরী বাড়িতে আয়োজিত গানের আসরে কানা নিবারণের কণ্ঠে পরিবেশিত এ গান শুনে সেখানে উপস্থিত জনৈক তরুণী বধু ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। কেননা, এ বছর তাকে নাইয়রে নিতে কেউ আসেনি। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে তার মনে যে বিষাদ ও একাকিত্ব তীব্র হয়ে উঠেছিল, এরই আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সঙ্গীতের আধারে। এভাবেই লোকপ্রথা ও লোকসঙ্গীতের সমবায়ে এতদঞ্চলের লোকসমাজের নিজস্ব জীবনাচার ও মূল্যবোধের স্বকীয় রূপায়ণ ঘটে।

৩. লোকসাহিত্য-- এ উপন্যাসে নেত্রকোণার সোহাগী গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত লোকসাহিত্যের মধ্যে লোকসঙ্গীতের বিবিধ উল্লেখ লক্ষণীয়। এ উপন্যাসে কানা নিবারণ এবং মতি মিয়া দুজনই গ্রাম্য কবিয়াল হিসেবে লোকসঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে গ্রামবাসীর সমীহ আদায়ে সফল হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সরকার বাড়িতে গানের আসরে কানা নিবারণ গান গায়--

> আগে চলে দাসী বান্দি পিছে ছকিনা,
>
> তাহার মুখটি না দেখিলে প্রাণে বাঁচতাম না
>
> ও মনা ও মনা ...
>
> দুধের বরণ সাদা সাদা কালা দিঘির জল
>
> তাহার মনের গুপ্ত কথা আমারে তুই বল। (পৃ. ২)

তার পরিবেশিত গান শুনে আসরে সমবেত শ্রোতা মুগ্ধ হয়। মতিমিয়া নিজেও তার গান শুনেই মূলত, নিজের ভেতরে সুপ্ত গায়কসত্তাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। নিবারণের গান শুনে 'কন্যার মনের গুপ্ত কথাটির জন্যে তারো মন কাঁদতে লাগলো। আহ এত সুন্দর গান কানা নিবারণ কি করে গায়? কি গলা!' (পৃ. ২-৩)। সাংসারিক অনটন, স্বভাবগত উদাসীনতা আর বাউণ্ডেলেপনা তার চেতনালোকে জাগিয়ে তোলে গলা ছেড়ে গুনগুন করে গান করার বিচিত্র খেয়াল--

> লোকে আমায় মন্দ বলেরে
>
> মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলেরে
>
> আমি কোথায় যাব কি করিব
>
> দুঃখের কথা কাহারে কব রে।
>
> মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলেরে। (পৃ. ৯)

তার গান শুনে আমিন ডাক্তার 'বড় গাতক' হিসেবে প্রশংসা করে। স্ত্রী শরিফার চিকিৎসার জন্য মোহনগঞ্জে গিয়ে তার সঙ্গে কানা নিবারণের দেখা হয়, যে কিনা খ্যাতিমান কবিয়াল আসলামের গান শুনতে এসেছে। গ্রামে ফিরে রাতের বেলা নইম মাঝির বাড়িতে আয়োজিত গানের আসরেও সে ভিড়ে। '৫' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, বন্ধু আমিন ডাক্তারকে মতি মিয়া জানায়, -' "রূপকুমারী" যাত্রা পার্টির অধিকারী খবর পাঠিয়েছে মতি মিয়া যদি বিবেকের পাঠ করতে চায় তাহলে যেন অতি অবশ্যি মোহনগঞ্জ চলে আসে। আগের বিবেক চাকুরী ছেড়ে চলে গেছে বলেই এই সুযোগ' (পৃ. ৩১)। যেহেতু বিবেকের ভূমিকায় দশটি গান রয়েছে, তাই মতি মিয়া এ সুযোগ হারাতে অসম্মত। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তার স্ত্রী শরিফার মত নেই বলেই মতি মিয়া আমিন ডাক্তারকে অনুরোধ করে তাকে বোঝাতে। হাটবারে অবস্থাপন্ন খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য পতিতা নারীরা নৌকা নিয়ে আসে । পরীবানু নামের

উদ্ভিন্নযৌবনা রূপসী পতিতাকে দেখে মতি মিয়া তার প্রেমে পড়ে এবং নিজের অজান্তেই তাকে নিয়ে মুখে মুখে গান বাঁধে--

ও কইন্যা সোনার কইন্যা রে

ও কইন্যা রূপের কইন্যা রে। (পৃ. ৩৩)

কিছুদিন পর রূপকুমারী যাত্রার অধিকারীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সে গ্রাম ছেড়ে মোহনগঞ্জে গিয়ে বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করে পরিচিতি অর্জন করে। কিন্তু একপর্যায়ে এ চরিত্রে রূপদানকারী পূর্ববর্তী বিবেক ফিরে আসায় মতি মিয়া এ কাজ থেকে বরখাস্ত হয়। উপন্যাসের শেষভাগে '১৮' সংখ্যক পরিচ্ছেদে জানা যায়, এগারো বছরের ব্যবধানে কানা নিবারণের খ্যাতিকে টেক্কা দিয়ে মতি মিয়া স্বনামধন্য গাতক বা কবিয়াল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যার সংগ্রহে রয়েছে নয়টি সোনার মেডেল। তাকে রেডিওতে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং স্বয়ং মন্ত্রীর সঙ্গে সে ছবি তোলার সুযোগ পায়। শুধু তাই নয়, তার গানের রেকর্ড পাঁচ টাকা দরে বাজারেও বিক্রি হয়। ভবঘুরে, সংসারকর্মে অমনোযোগী, প্রিয়জনের প্রতি দায়িত্বহীন মতি মিয়া এভাবেই নিজের গায়কসত্তার প্রতিপালনের পরিণতিতে সকলের সমীহ ও মর্যাদা আদায় করে।

এ উপন্যাসে লোকসঙ্গীতের প্রতি গ্রামবাসীর আগ্রহের প্রকাশ দেখা যায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের শত ব্যস্ততায় নানা কাজের সমান্তরালে। যেমন ক্ষেত থেকে কাটা নতুন ধান মাড়াইয়ের কাজ বরাবরই সকলের অংশগ্রহণে মাঝরাতে মতি মিয়ার বাড়ির উঠানে সম্পন্ন হয়। পালাক্রমে একেক জনের বাড়ির কাজ এভাবে চলতে থাকে। তবে এর সঙ্গেও সম্পৃক্ত রয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের। যারা কাজে ব্যস্ত তারা ছাড়াও অন্যরা সেখানে উপস্থিত থাকে। তাদের জন্য পান, তামাক ও হুক্কার বন্দোবস্ত করে গৃহকর্তা। গ্রামের বিশিষ্ট কথক ও কবিয়ালদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সেখানে গানের আসর বসানো হয়। এদের মধ্যে আলাউদ্দীন উল্লেখযোগ্য। পেশায় চোর হলেও প্রকৃতপক্ষেই সে বড় গায়ক। সে যখন কোমরে লাল গামছা পেচিয়ে দুহাত নেড়ে বিশেষ ভঙ্গিতে লাল চান বাদশার কেচ্ছা সুর সহযোগে পরিবেশন করে তখন আসরে সমবেত শ্রোতারা তন্ময় হয়ে যায়। বছরের পর বছর এ কাহিনী শুনলেও এর আবেদন তাদের কাছে কখনোই ফুরায় না--

শুনেন শুনেন দশ জনাতে

শুনেন দিয়া মন।

লাল চাঁন বাদশার কথা হইয়াছে স্মরণ।

লাল চাঁন বাদশার মনে বড় দুস্ক ছিল,

বার বছর পার হইল পুত্র না জন্মিল।

লাল চাঁনের দুস্ক দেইখ্যা কান্দে গাছের পাতা ..." (পৃ. ৪৯)

সোহাগী গ্রামের বাসিন্দাদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি যাত্রার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, গ্রামীণ লোকসমাজে যাত্রার প্রতি সর্বশ্রেণির মানুষের বিশেষ আগ্রহ লক্ষণীয়। মোহনগঞ্জে যাত্রার দল এলে তা দেখতে তারা উৎসাহী হয়ে ওঠে। আসলাম মিয়া যাত্রায় বিবেকের অূমিকায় অভিনয় করে ছয়টি সোনার মেডেল পেয়েছে। তার অভিনয় দেখার সুযোগ থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না। সেকারণে এমন সুযোগ হঠাৎ করেই পেয়ে যাওয়ায় মতি মিয়া এ সাধ পূর্ণ করে। অন্যদিকে, "রূপকুমারী" যাত্রাদলে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে মতি মিয়াও এককালে খ্যাতিমান গায়ক হয়ে ওঠে। তাছাড়া "সরকারবাড়ির ছোটজামাই গান-বাজনা পছন্দ করে।

দু বছর আগে সে যাত্রা গান আনিয়েছিল, পালার নাম 'মীনা কুমারী'। তিন রাত যাত্রা হয়েছিল। সেই তিন রাত্র সোহাগীর কারোর চোখে ঘুম ছিল না।" (পৃ. ৮০)

৪. লোকউৎসব-- এ উপন্যাসে নেত্রকোণা অঞ্চলে প্রচলিত একটি লোকউৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। সেটির নাম বাঘাই উৎসব। সাধারণত ধানের ফলন ভালো হলে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ এটি স্পষ্টতই কৃষিজ উৎসব। কৃষকেরা যখন সারা বৎসরের জন্য পর্যাপ্ত ধান জমা রেখেও কখনো কখনো বাড়তি অংশটুকু যেমনভাবে খুশি খরচের সুযোগ পায়, তখন এর আয়োজন করা হয়। অষ্টম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, ধান কাটা শেষ হবার পরবর্তী সময়ে পূর্ণিমায় বাঘাই সিন্নির দল বের হয়। গ্রামের তরুণেরাই এর আয়োজক। তবে বয়স্কদের মধ্যে আমিন ডাক্তার এতে নিজের খুশিতে অংশ নেয়। সে-ই এর নেতৃত্ব দেয়। বাঘাই সিন্নির দল গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি ঘুরে সিন্নি রান্নার উপকরণ সংগ্রহ করে। এসময় একজন নিচের গানটি সুর করে গায়, অন্যরা তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়--

(মূল গীত)

আইলাম গো

যাইলাম গো

বাঘাই সিন্নি চাইলাম।

(ধোয়া) চাইলাম গো। চাইলাম গো। (পৃ. ৫১)

একপর্যায়ে দলের সকলেই হাত-পা ছুঁড়ে যথেচ্ছ নাচতে থাকে। বাড়ির মেয়েরা এ কাণ্ড দেখে মুখে আঁচল চেপে হাসতে থাকে এবং সিন্নি রান্নার জন্য ধামা ভর্তি চাল বের করে দেয়। অর্থাৎ কৃষিকাজের সঙ্গে তাদের জীবিকা ও উদরপূর্তির যোগ থাকলেও একে ঘিরেই গড়ে ওঠে বাঘাই সিন্নি রান্নার মতো একটি উৎসবের, যেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করে। এভাবেই তাদের পেশা, উৎসব ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস সমষ্টিমানুষের সমবায়ে হয়ে ওঠে লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্মারক। লোক-উৎসবের অসাম্প্রদায়িক রূপ এ উপন্যাসে উক্ত অনুষ্ঠানকে ঘিরে ফুটে উঠেছে।

৫. লোকখাদ্য-- এ উপন্যাসে নেত্রকোণা অঞ্চলের কিছু লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে–

জারুল গাছের ছায়ায় নৌকা বেঁধে ভর পেট চিড়া খেয়ে মতি মিয়া ঘুমিয়ে পড়ে। (পৃ. ৮)

গুড় দিয়ে এক থালা মুড়ি খেতে হল। (পৃ. ৪৩)

ইঁচা মাছ আর চোকাইয়ের তরকারী কোনদিন খাইছেন চাচাজী? (পৃ. ৬০)

চা খাইবা ছোড মিয়া? চা বানাই? নতুন খেজুর গুড়ের চা। (পৃ. ৮৬)

লাড্ডু খাইবা? তিলের লাড্ডু আছে। (পৃ. ৮৮)

৬. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে নেত্রকোণার ভাটি এলাকার লোকসমাজে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। কুশীলবদের অভ্যাস, আচরণ, মনোভঙ্গি প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটে ওঠে তাদের প্রাত্যহিক জীবনসংলগ্ন এ ভাষার প্রয়োগে। বিশেষ ধরনের উচ্চারণ, দেহভঙ্গি এবং কথা বলার টান থেকে অনুধাবন করা চলে, লেখক এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সেকারণেই, পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে তিনি উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে এ লোকভাষা সংশ্লিষ্ট 'নির্ঘণ্ট' যুক্ত করেছেন। এসব শব্দ নেত্রকোণার ভাটি এলাকায় প্রচলিত, যার সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ঐ অঞ্চলের লোকমানুষের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্ব। এছাড়া আঞ্চলিকভাবে প্রচলিত বিভিন্ন অশ্লীল-কদর্য গালিগালাজও এ ভাষায় আশ্রিত। কেননা, ব্যক্তির অবদমিত ক্রোধ, রাগ, অসন্তোষ প্রভৃতি এসব অপভাষার প্রয়োগে মূর্তময় রূপ পায়। এক্ষেত্রে শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা উল্লেখযোগ্য।

৬.১ শব্দভাণ্ডার

দেশজ শব্দ– ছাতা, ঢোল, বান্দি, গামছা, ছই, হুকা, কলকে, গাঙ, হাল, হাওর, গয়না, বাজার, নৌকা, ঘোমটা, কামলা, তাবিজ, কাঁথা, দরমা, চালা, পুটুলি, কুটুরী, শামুক, কুপি, বাঁশ, কঞ্চি, বেড়া, জালা, বিল, চাটাই, খিল, ডেকচি, মাইট, খুন্দা, দোস্তাইন, বাঘাই, সিন্নি, বারবান্দানী, লারবর্শি, মাছ-খলা, ফিরাইল, জিরাতী, কান্দা, বন্দ, পাইল করা, কেরায়া, জার, সরকি প্রভৃতি।

দ্বিরুক্ত পদ– ন্যাতা ন্যাতা, শোঁ শোঁ, হন হন, বিড় বিড়, গুন গুন, কোঁ কোঁ, ফর ফর, টপাটপ, ছপ ছপ, ট্যাঁ ট্যাঁ, ছম ছম, ছলাৎ ছলাৎ, ভন ভন, ঠিক ঠাক, ঘষে ঘষে, ঠেলা ঠেলি, ভক ভক, হম্বি তম্বি, নট খট, রি রি, পিট পিট, ফিক ফিক, হড় বড়, টুক টুক, খিক খিক, ঝুপ ঝুপ, মচ মচ, মস মস, খুট খুট, খিল খিল, খুন খুন প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– ফেলে>ফেলাইয়া, প্রণাম>পেন্নাম, এসে>আইসা, ভালো>বালা, রাত> রাইত, ছেলে>পুলা, নেয়া>নেওন, শঙ্কা>সঙ্গীন, জাগা>জাগন, জুত>জুইত, ভালো>বালা, যাচ্ছ>যাইতাছ, নেয়ার>নেওনের, টাকা>টেকা, নিশ্চয়ই>নিচ্ছয়, খুব ভালো> জব্বর, গ্রামীণ>গেরাইম্যা, খাঁটি>খাড়ি, প্রসব করাতে>বিযাতে, সঙ্গে>লগে, কেটে>কাইট্টা, শরীর>সরীল, ফোটা>ফোডা, সক্কু>সক্কাল, কে>কেডা, শোনা>হুনা, স্বাদ>সুআদ পভৃতি।

বিশেষণ– ঝাকড়া, পিছল, গাট্টা গোট্টা, কড়কড়ে, চুপসে, কেরামতি, ঝাঝিঁয়ে, কাটাকুটি, খাড়ি, কটকটে, গুটিয়ে, পুয়াতী, বোটকা, চক্কর, ঠাহর প্রভৃতি।

৬.২ বাগধারা

বৃষ্টি নামলে ভিজে ন্যাতা ন্যাতা হতে হবে। (পৃ. ১)

আমিন ডাক্তার আকাশ থেকে পড়লো। (পৃ. ৩১)

সামান্য জিনিস থেকে কুরুক্ষেত্র ঘটে যায়। (পৃ. ৩৬)

গা রি রি করে মতি মিয়ার। (পৃ. ৫১)

ভাটি অঞ্চলের লোকজীবন ও সংস্কৃতি এ উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনবদ্যভাবে উপজীব্য হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা এবং বাল্যকালীন পারিবারিক আবহ নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছে সোহাগী গ্রামের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র ও চেতনালোকের রূপরেখাকে সচেতনভাবে গ্রন্থনায়। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান এতদঞ্চলের মানুষকেও প্রভাবিত করে। তবু ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রতিবেশগত স্বাতন্ত্র্য, জীবিকানির্বাহের ভিন্নতাহেতু কখনো কখনো ভাটি অঞ্চলে সৃষ্টি হয় বিশেষ ধরনের বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে, এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের লোকজচেতনার স্বরূপ অনুধাবনে উপন্যাসটির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

Aciv\n

অপরাহ্ণ (১৯৮৭) উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদের শিল্পভাবনার মূলে রয়েছে নেত্রকোণার ভাটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনাজড়িত প্রাত্যহিক জীবনের চালচিত্র উপস্থাপনের আগ্রহ। এ অঞ্চল সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে এখানকার ভূ-প্রকৃতি ও জনজীবনের আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসকে রূপায়ণে। স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে স্থানীয় মানুষের জীবিকা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, জীবনাচার, সর্বোপরি চেতনালোকের বিশেষ রূপ এ সংক্ষিপ্ত উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এতদঞ্চলের মানুষের ওঠাবসা, চালচলন, সমন্বিতভাবে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিশ্বাস-সংস্কার মেনে চলা প্রভৃতি থেকে তাদের কৌমনির্ভর আদিম মানসিকতার ধরন অনুধাবন করা চলে। শিক্ষাবঞ্চিত, ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন, প্রকৃতিনির্ভর এবং নিয়তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বিত অভিঘাত তাদের চিন্তায়, আচরণে ও সৃষ্টিশীলতায় যে ছাপ ফেলে, তাতে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় লোকজচেতনার স্পন্দন। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে তারা যেমন পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আত্মস্থ করে, তেমনিভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়ও ফুটে ওঠে সৃষ্টিশীলতার বিভিন্ন অনুষঙ্গে। তাদের নিত্যদিনের জীবনপ্রবাহে পরস্পরের সঙ্গে আলাপে, আচরণে এবং মানসিকতায় প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন লোকজ উপাদানের উপস্থিতি এ উপন্যাসে বিদ্যমান।

১. লোকসংস্কার–– এ উপন্যাসে বানিয়াবাড়ি গ্রামের লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। এর মধ্যে কিছু বিশ্বাস ধর্মীয় আচার-আচরণ ও অনুশাসন, পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত। এছাড়া সাপে কাটা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিশ্বাসও এ উপন্যাসে বিবৃত। যেমন গ্রামের মসজিদের ইমাম খবির সাহেবের ধর্মীয় আচরণ,

মূল্যবোধ ও মনস্তত্ত্বে পারলৌকিক কল্যাণচিন্তার পাশাপাশি গ্রামবাসীর প্রতি মানবিক আচরণের বহিঃপ্রকাশও লক্ষণীয়, যেখানে লোকবিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটেছে। যেমন মনিরউদ্দিন কালনাগের কামড়ে আহত হলে তার প্রতিকারার্থে সে স্রষ্টার নিকট মোনাজাত করে, তার স্ত্রী শরিফাকে জানায় যে মসজিদে মিলাদ পড়াবে এবং এসব আচারের মাধ্যমে তার করণীয় কাজ সম্পন্ন করে। এতে মনিরউদ্দিন সুস্থ হোক বা না হোক, খবির হোসেনের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র শঠতা বা ফাঁকি নেই। আবার কখনো কখনো গ্রামবাসীর জীবনে নেমে আসা প্রাকৃতি দুর্যোগ, খরা, অনটনের জন্য সে নিজেকে দায়ী করে। তার ধারণা সে যেখানেই যায়, সেখানেই শেষ পর্যন্ত কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে। তাই সে স্রষ্টার কাছে এর প্রতিকার চায়। বলাবাহুল্য, তার এ ভাবনা যুক্তিহীন এবং নিতান্তই আবেগতাড়িত। 'খবির হোসেনের বারবার মনে হয় তিনি গ্রাম ছেড়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। এই বানিয়াবাড়িতে সুখের প্লাবন বইবে। এমন ফসল ফলবে যে কেটে আনতে ইচ্ছা করবে না। চাঁদের ফকফকা আলোয় ছেলেপুলেরা ছোটাছুটি করবে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভরপেটে ঘুমুতে যাবে।' (পৃ. ২৪) মনিরউদ্দিন সাপের কামড়ে আহত হলে তার স্ত্রী শরিফা প্রতিবেশীদের নিকট সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে কুণ্ঠিত ছিল। সে নিজে থেকে তখনই অন্যদের এ ঘটনা জানাতে চায়নি। কেননা, লোকবিশ্বাস হলো, 'সাপে কাটার ব্যাপারটা জানাজানি হওয়া খুব খারাপ। যতই জানাজানি হবে ততই বিষ উঠবে। ওঝা এসে ঝাড়-ফুঁক করবার পর লোকজন জানুক তাতে ক্ষতি নেই' (পৃ. ১৫)। সেকারণে শরিফা মনিরের বন্ধু জলিলের বাড়িতে এসে তাকে স্বামীর বৃত্তান্ত জানায়। জলিল ওঝার খোঁজ করতে উদ্যোগী হয়। জলিলের স্ত্রী শরিফার আসার কারণ জানতে চাইলে সে তাকে এর জবাব দেয় না। জলিল নিবারণ ওঝার খোঁজ করে। কেননা গ্রামে তার খ্যাতি বেশি বলেই সাপে কাটার এ মৌসুমে তাকে অনেকেই চিকিৎসার জন্য বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। জলিল নিবারণকে খুঁজতে গেলে পথে ভোলা মিঞার সঙ্গে তার দেখা হয়। সে তার দ্রুততার কারণ জানতে চাইলে জলিল এর জবাব না দিয়ে আরো দ্রুত এগিয়ে যায়। 'ভোলা মিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না। মনে হলো সে বুঝতে পেরেছে। এখন গ্রামে গিয়ে উঁচু গলায় বলাবলি না করলেই হয়। যতই জানাজানি হবে বিষ ততই চড়তে থাকবে। নিয়মই এই রকম' (পৃ ১৬)। সাপে কাটা রোগীকে কোনোভাবেই ঘুমাতে দেয়া যাবে না, এরূপ অনুশাসনের মূলে রয়েছে তার মৃত্যুসংক্রান্ত আশঙ্কা। উপন্যাসের তের পরিচ্ছেদে মনিরউদ্দিনকে গঞ্জে নিয়ে যাওয়ার সময় খবির হোসেন গরুর গাড়িতে তার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ করতে চায়। মনিরউদ্দিন যেন ঘুমিয়ে না পড়ে সেকারণেই খবির এমনটি করে। অন্যদিকে অন্তুমিয়া দুলাভাই মনিরউদ্দিনের সাপের কামড়ে অসুস্থতার খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলে খবির তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কান্না বন্ধ করতে বলে।। কারণ তার ধারণা মনিরউদ্দিন সুস্থ হয়ে উঠবে। অন্তুকে সে জানায়, 'কিছু হইলে খবর পাইতাম। মরণের খবর পাইতাম। মরণের খবর গ্রামের ইমাম পায় সবার আগে' (পৃ. ৬৮)।

এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত একাধিক লোকরীতির উল্লেখ রয়েছে। যেমন কাউকে সাপ কামড়ালে ওঝা তার চিকিৎসা করেও এর প্রতিকার করতে না পারলে তাকে কলার ভেলায় চড়িয়ে খাবারসহ ভাসিয়ে দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে মতির মায়ের বয়ানে জানা যায়, ফরিদের বাপকে সাপ কামড়ালে তার সুস্থতার জন্য ফরিদের মা একটি গরু মানত করে। তিনজন ওঝা এসে তার চিকিৎসা করালেও এর প্রতিকার হয়নি। মৃত ব্যক্তিকে কবর না দিয়ে কলার ভেলায় চড়িয়ে সাত দিনের খাবারসহ পতাকা বেঁধে ভাসিয়ে দিলে একসময় সেটি দুই মাইল দূরবর্তী নিশানপুর গ্রামে ভিড়ে। কিন্তু এরপর সেই মৃতদেহ পরিণত হয় শিয়ার-কুকুরের খাবারে। এ রীতির প্রচলন ঘটেছিল বেহুলার লোককাহিনীর আদলে। মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিতে বেহুলা যেভাবে সকল বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করেছিল, তেমনিভাবে সতী নারী তার চারিত্রিক সততাকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারলে তবেই তার প্রিয়জন মৃত্যুর কবল থেকে ফিরবে এমন ধারণাবশত এ রীতিকে মান্য করা হয়। এ উপন্যাসে নেত্রকোণার স্থানীয় লোকরীতির উল্লেখও রয়েছে। যেমন লাখের বাতি জ্বালানো। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, বানিয়াবাড়ির অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বজলু সরকারের কামলা মনিরউদ্দিন স্ত্রী শরিফাকে জানায়, বাড়িতে একদিন লাখের বাতি জ্বলবে। এ ব্যাপারে শরিফার ধারণা ছিল না। মনিরউদ্দিন বলে, লাখের বাতি হচ্ছে পুরানো কালের এক

উৎসব। কেউ লক্ষপতি হলে একটি উৎসব করা হয়। সেই উৎসবে লম্বা বাঁশের মাথায় বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। দূর-দূরান্তের মানুষ সেই বাতি দেখে এবং বলাবলি করে–লাখের বাতি জ্বলছে' (পৃ. ৩৯)। যেহেতু মনিরউদ্দিন পরিশ্রমী, সংসারের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট এবং দায়িত্বপালনে আন্তরিকতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারছে, তাই সে এ ধরনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সচেষ্ট।

২. লোকচিকিৎসা–– এ উপন্যাসে লোকচিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে মনিরউদ্দিনের সাপের কামড়ে আহত হওয়া থেকে শুরু করে শেষ পরিচ্ছেদে চিকিৎসার জন্য গঞ্জে নিয়ে যাবার যে বৃত্তান্ত উপস্থাপিত, তাতে এ প্রসঙ্গে বানিয়াবাড়ির গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। এক ভোরে নিজের বাড়িতে মনিরকে সাপ কামড় দিলে সে এর চিকিৎসা হিসেবে পাটের কোষ্টা দিয়ে এক হাতে দড়ি পাকিয়ে দুটি বাঁধ দেয়। একটি হাঁটুর নিচে, অন্যটি উরুতে। এরপর সে সাপের বিষ শরীর থেকে বের করতে স্ত্রী শরিফাকে পরামর্শ দেয় ধারালো কোনো অস্ত্র দিতে, যেন সেই ক্ষতস্থান চিরে বিষাক্ত রক্ত বের করা যায়। শরিফা জালালকে দিয়ে নিবারণ ওঝাকে আসার খবর জানিয়ে বাড়ি এলে মনির তাকে নির্দেশ দেয় চুলা ধরিয়ে ফুটন্ত পানি করে তার ক্ষতস্থানে ঢালতে। এর ফলে শরীর থেকে বিষ নেমে যাবে। শরিফা তার পরামর্শ মেনে পানি ঢালায় মনির খেয়াল করে. 'সাপের কামড়ের জায়গাটি থেকে ক্ষীণ একটি রক্তের ধারা নেমে যাচ্ছে। জমাট বিষ বেরিয়ে যাচ্ছে' (পৃ. ১৭)। মনিরউদ্দিনের বন্ধু জলিল সত্তরোর্ধ ওঝা নিবারণের শরণাপন্ন হয়। পেশাদারিত্বের জন্য আশেপাশের গ্রামে খ্যাতি থাকলেও তার সংসারের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়। কড়ি চালনা করে সাপ ডেকে এনে সেটিকে দিয়ে সাপের রোগীর দেহ থেকে বিষ বের করিয়ে নেবার গুপ্তবিদ্যায় সে পারদর্শী বলে লোকসমাজে খ্যাতি রয়েছে। জলিলের সঙ্গে আলাপকালে সে জানতে পারে, মনিরকে ভোরে সাপ কামড়েছে। সে একপর্যায়ে সিদ্ধান্তে আসে, 'রুগী বাঁচানি মুশকিল হইব। মঙ্গলবারে কাটছে। শনি আর মঙ্গল এই দুই দিনে সাপের বিষের তেজ থাকে বেশি।' ... শনি-মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষের সময় সাপে কাটা রুগী বাঁচানো অসম্ভব ব্যাপার' (পৃ. ৩১)। তাছাড়া রোগীর চিকিৎসার জন্য ওঝা হিসেবে কোনোরূপ সম্মানী বা অর্থ দাবি করা তার ওস্তাদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে তবে রোগী সুস্থ হয়ে পালা-পার্বণে কিছু দিলে তা গ্রহণে কোনো বাধা নেই। নিবারণের ধারণা যেহেতু সে সাপকে বশীভূত করে রোগীর চিকিৎসা করে, তাই সাপেরা তার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজছে। সে জলিলকে জানায়, অল্পবয়সে সাপুড়েবৃত্তি শিখলেও এ পেশায় আজীবন তার অভাব রয়ে গেছে। 'অহন পস্তাই। রাইতে ঘুম হয় না। বিছানার কাছে সাপ আনাগোনা করে। এরা সুযোগে আছে। বুঝলা সুযোগ খুঁজতাছে। আমার দিনও শেষ। ... বউটা মরছে সাপের কামড়ে। ঘরে ছিলাম না এই সুযোগে কাম শেষ করছে। ... সারা রাইত বাত্তি জ্বালাইয়া রাখতে হয়। সাপের আনাগোনা' (পৃ. ৩১)। নিবারণ বানিয়াবাড়ি গ্রামে এসে মনিরকে চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রথমেই জানায়, এ চিকিৎসার জন্য তার লাগবে নতুন মাটির হাড়িতে আনা কালো গাইয়ের এক হাঁড়ি দুধ, একটা পাঁচ হাতি গামছা, স্বর্ণ সিন্দুর, তালমিছরি, কাইকা মাছের দাঁত, কয়েকটি নতুন কলাপাতা ও পিতলের এক কলসি পানি। সে উৎসুক গ্রামবাসীকে সতর্ক করে, বিধাব নারীরা যেন মন্ত্রপাঠের সময় দূরে থাকে। নতুবা রোগীর চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনীয় সব উপকরণ জোগাড়ের পর নিবারণ কালো গাইয়ের দুধে মনিরের সাপে কাটা পায়ের গোড়ালি ডুবিয়ে জানায়, 'বিষ খুব তেজী। উঠছে অনেক দূর। কাল নাগের বিষ বড় কঠিন সমস্যা' (পৃ. ৩২)। এরপর নিবারণ হাতে স্বর্ণসিন্দুর নিয়ে মন্ত্রপাঠ শুরু করে। একপর্যায়ে সে মন্ত্রপাঠ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

> ও বালা লখিন্দররে ...
>
> কোন কাল ভুজঙ্গ তারে খাইলরে। ...
>
> ভৈরবী ছিন্নমস্তা, চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।

বগলা সিদ্ধ্যাবিদ্যা চ মাতিঙ্গি কমলাত্মিকা।

এতো দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধাবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিকা। ... (পৃ. ৩২)

কিন্তু এতে মনিরউদ্দিনের শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। বরং রোদের ভয়াবহ উত্তাপে অতিষ্ঠ হয়ে সে পানি পান করতে চাইলে নিবারণ তাকে তা থেকে নিবৃত্ত করে এবং তালমিছরি চোষার অনুরোধ জানায়। মন্ত্র পাঠ করতে করতে নিবারণের মুখে ফেনা জমে ওঠে। তার উচ্চারিত মন্ত্র এত দ্রুত উচ্চারিত হয় যে, অন্য কারো পক্ষে তা স্পষ্টভাবে শোনার সুযোগ ঘটে না। তার হাত প্রবল ক্ষিপ্ততায় বারবার মনিরের উরুতে আঘাত করে এবং নতুন উদ্যমে মন্ত্রপাঠ অব্যাহত রাখে–

ও বিষ বিষ রে

কালনাগের বিষ রে।

শীশ নাগের ইস রে–

মা মনসার রীশ রে–

এর বাড়িতে আইস না,

আসমান জমিন চাইস না

তোর পায়ে ধইরা সতী বেহুলা কান্দে রে।" (পৃ. ৫৩)

নিবারণের চিকিৎসায় মনিরউদ্দিনের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় জলিল এবং মতির মা তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। অনাহার এবং ক্ষুধার দাপট, বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে একপর্যায়ে সে নিজেই অসুস্থ হয়ে বমি করতে থাকে। গ্রামবাসী এতদিনে তার সম্পর্কিত প্রশংসা ও বাস্তবের গরমিল অনুধাবনের সুযোগ পেয়ে মনিরউদ্দিনকে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে গঞ্জের হাসপাতালে দ্রুত নেয়ার বন্দোবস্ত করে। এ উপন্যাসে মনিরউদ্দিনের মামার অপ্রকৃতিস্থতা এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। প্রচণ্ড আর্থিক অনটন, সংসার চালানোর অসামর্থ্য, ক্ষুধার কষ্ট ও বিভিন্ন অসুখে ভুগে সে একপর্যায়ে মনোবৈকল্যের শিকার হয়। গ্রামের অবস্থাপন্ন জোতদারের জমিতে মুনিষগিরি ও ঘরামীর কাজ করে স্ত্রী ও ভাগ্নেসহ নিজের পেট চালানো তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। একারণে একপর্যায়ে সে বাড়ি সংলগ্ন কাঁঠাল গাছের নিচে একটা চাটাই পেতে দিনরাত শুয়ে থাকত। বিড়বিড় করে সারাদিন কথা বলত গাছটির সঙ্গে। তার অসংলগ্ন আচরণ দেখে গ্রামবাসী বিস্মিত হতো। তার চিকিৎসার জন্য খালিশপুরের পীরসাহেবের তেলপড়া দেয়া হলেও এতে অবশ্য সে সুস্থ হয়নি।

৩. লোকজ্ঞান–– গোষ্ঠীসমাজের অন্তর্গত মানুষেরা বিভিন্নভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। সেকারণেই জীবিকা, বসবাস, কৃষিকাজ ও অন্যান্য প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিজেদের আয়ত্তে আনতে তারা উদ্ভাবন করে বিশেষ কোনো প্রযুক্তি বা পদ্ধতি। সেইসঙ্গে জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে প্রায়শই তারা যেহেতু বাল্যবয়স থেকে পরিচিত হয়, সেকারণেই বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও তাদের ক্ষেত্রে ঘটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষের অনুসৃত পেশাকেই প্রজন্মান্তরে জীবিকা নির্বাহের জন্য অবলম্বন করা হয়। সেকারণেই লোকসমাজের অন্তর্গত বাসিন্দারা বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে; যা একান্তভাবে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ, কৃষিকর্ম, আবহাওয়া ও বিশেষ পেশাসংশ্লিষ্ট। শরিফা সাপুড়েদের কর্মকাণ্ড এবং সাপে কাটা রোগীদের দেখেছে বলেই তার পক্ষে অসুস্থ মনিরউদ্দিনের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা সহজ। সে বুঝতে পারে, মনিরউদ্দিনের পায়ের ক্ষতস্থান বেয়ে বিষ শরীরের বেশির ভাগ স্থানে ছড়াতে পারেনি। তেমনটি ঘটলে মনিরউদ্দিন স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারত না। তার

কথা জড়িয়ে যেত। 'সে সাপে কাটা মানুষ মরতে দেখেছে। গলার স্বর আস্তে আস্তে ভারী হয়ে যায়। চোখের তারা বড় তাকে। এমনভাবে তাকায় যেন কাউকে চিনতে পারছে না অথচ ঠিকই চিনতে পারে। ঘন ঘন পানি খেতে চায় কিন্তু দু'-এক ঢোঁক খেয়েই বলে তিতা লাগছে। এক সময় অল্প অল্প বমি করে' (পৃ. ১৭)। অন্যদিকে, উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, জলিল মনিরউদ্দিনের চিকিৎসার জন্য নিবারণ ওঝাকে ডেকে আনতে গিয়ে একপর্যায়ে আতঙ্কিত হয়। সে দ্রুত হাত চালিয়ে নৌকা বাইলেও বাতাসের প্রতিকূলে দাঁড় বাওয়ার কারণে তার পরিশ্রম বেশি হচ্ছিল, অথচ নৌকা তেমন এগুচ্ছিল না। একসময় রোদেও তেজ কমে গেছে ভেবে সে আতঙ্কিত হয়। কারণ, তার আশঙ্কা, ঢল নামতে পারে। তাহলে গ্রামবাসীকে মহা বিপদে পড়তে হবে। কেননা ধান কাটা সবে শুরু হয়েছে। অবশ্য পরমুহূর্তে সে পুনরায় খেয়াল করে, আকাশ চকচকে নীল। কোথাও একখণ্ড মেঘও নেই। ফলে বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা কম। তবু একধরনের উদ্বেগ তাকে অস্থির করে তোলে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা শুধু অভিজ্ঞ বাসিন্দাদের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব। কেননা, তারা বিশেষ স্থানিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত আবহাওয়া, জলবায়ু, বাতাসের প্রবাহ, সূর্যের উত্তাপ, মেঘের ঘনঘটা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কৃষিকাজ করে। আট পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, খবির হোসেন ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের পথে হাঁটতে গিয়ে বিচলিত হয়। কেননা সে এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির ধরন সম্পর্কে জানে না। বিকেলের আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে সে উৎকণ্ঠিত ছিল। কারণ মাঠের পাকা ধান সবে কাটা শুরু হয়েছে, এর মধ্যে শিলাবৃষ্টি নামলে গ্রামবাসীকে সারা বছর অনাহারে কাটাতে হবে। মাঠে গিয়ে পরিচিতজনের সঙ্গে কথা বলে সে স্বস্তি পায়। কারণ বৈশাখের মেঘ দেখে তারা বলেছিল, বৃষ্টি বেশি হবে না। সামান্য বৃষ্টির পর পুনরায় আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে যাবে। খবির হোসেনের মনে পড়ে, গ্রামবাসীর অনুমান সঠিক ছিল। তারা 'আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু বলে ফেলে। প্রকৃতির উপর যাদের এত নির্ভর তাদের তো প্রকৃতিকে বুঝতেই হবে।' (পৃ. ৪৫)

৪. লোকপরিচ্ছদ ও প্রসাধন-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ নারীর প্রসাধন ও সাজসজ্জার কিছু উল্লেখ লক্ষণীয়। মনিরউদ্দিনের মামী চাঁনসোনা স্বামীর মৃত্যুর পর আর্থিক অনটনের কারণে দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়। সে বিষয়টি গোপন রাখতে চাইলেও একপর্যায়ে গ্রামবাসী তা জেনে ফেলে। এর ফলে গ্রামের পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, চাঁনসোনাকে গ্রামে থাকতে দেয়া হবে না। তাকে গঞ্জের খুপড়িতে পেশাদার পতিতা হয়ে দিন কাটাতে হবে। মাতবরদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ নিয়ামত খাঁর অভিমত ছিল, 'এই জাতীয় মেয়েছেলে গ্রামে রাখা যাবে না। জোয়ান ছেলেপুলের চরিত্র নষ্ট করবে। এরা থাকুক যেখানে তাদের মানায় সেখানে। গঞ্জের খুপড়িতে। সন্ধ্যায় পান খেয়ে ঠোঁট লাল করবে। ঘরের দাওয়ায় অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইশারা-ইঙ্গিত করবে, রঙ্গ-তামাশা করবে। ঝুনঝুন করে বাজাবে লাল কাচের চুরি। কুপির লাল আলো পড়বে তাদের গিল্টি করা গয়নায়। গয়না ঝিকমিক করবে' (পৃ. ২৫-২৬)। সাজসজ্জার প্রতি চাঁনসোনার বরাবর আগ্রহ ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সাত বিধবা লোকাচার অনুযায়ী তার পরনের রঙিন ছাপা রঙিন খুলে সাদা শাড়ি পরিয়ে দিতে চাইলে সে তাতে অসম্মতি জানায়। তার দুই হাতে কাচের চুরি বাজে। গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় সে কাজল দিয়ে চোখ রাঙিয়ে নতুন শাড়ি পরে সুন্দরভাবে সাজে। অন্যদিকে, মনিরউদ্দিন তার রূপবতী তরুণী স্ত্রী শরিফার জন্য নতুন শাড়ি, স্নো, গন্ধরাজ তেল, স্পঞ্জের স্যান্ডেল কিনে দেয়। সে জানে শরিফা এসব উপহার পেলে খুশি হবে। সাজগোজের প্রতি স্ত্রীর আগ্রহের বিষয়টি সে আরো খেয়াল করে তার নাকে সবুজ পাথরের নাকফুল দেখে। সম্ভবত গাইন বেটিদের (যারা বিভিন্ন প্রসাধনসামগ্রী ঝাঁপিতে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরে বিক্রির জন্য) নিকট থেকে সে এটি কিনেছিল। গ্রামের মেয়েরা ও গৃহবধূরা স্বামীকে না জানিয়েই 'তরল আলতা, ফিতা, রাংতা, কাচের চুড়ি, পাউডার, কাজল, লক্ষ্মীবিলাস তেল, স্বামী সোহাগী সাবান' (পৃ. ৬১-৬২) প্রভৃতি কেনে।

৫. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে কুশীলবদের সংলাপ বয়ানে লেখকের অবলম্বন হয়ে উঠেছে নেত্রকোণার লোকভাষা। পারিবারিক আবহ এবং ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা যে এক্ষেত্রে লেখককে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে, তা

অনুমান করা চলে। কুশীলবদের সংলাপে এতদঞ্চলের উপভাষার বিশেষ টান, আলাপের ধরন এবং দেহভঙ্গিমাযোগে কথোপকথনে পরিস্ফুট হয় সেই চরিত্রের মানসিকতা ও স্বভাবগত প্রবণতাসমূহ। প্রচলিত বিভিন্ন স্থানীয় ও দেশজ শব্দের প্রয়োগ গতিময় ও সাবলীলভাবে বক্তার মনোভাবনাকে ফুটিয়ে তোলে সংক্ষিপ্ত অথচ ঋজু বাক্যরাশির সমবায়ে। ফলে স্বল্পকথায় বক্তব্যকে অকপটে উপস্থাপন এবং উপন্যাসের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে সেই চরিত্রের সংযুক্তি অনুধাবনের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ হয়ে ওঠে। তবে কখনো কখনো অশ্লীল বাক্য, গালিগালাজ ও কদর্য ইঙ্গিত লোকভাষায় প্রকাশিত হয় কোনো চরিত্রের বিক্ষুব্ধতা, ক্রোধ ও অবদমিত মানসিক চাপকে প্রকাশের তাড়নায়। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার নেত্রকোণার লোকজ আবহ ও আঞ্চলিকতার সঙ্গে যুক্ত––

শব্দভাণ্ডার

বিশেষণ– রিনরিনে, ঝিম, কটু, ঝাপ্টাতে, বেঁটে, চকচক, বেকুব, ঘেমে, কেশে, পোয়াতী, চড়তে, তিতা, ফুটন্ত, বলক, ফুলে, তিয়াস, টলটল, গোস্বা, চকচকে, ঘষা, আনচান, চড়তে, রমরমা, ফুর্তি, ফকফকা, মোলায়েম, খাঁকারি, লুটেপুটে প্রভৃতি।

দ্বিরুক্ত পদ– বিন্দু বিন্দু, খুন খুন, খাঁ খাঁ, ঠন ঠন, বিড়বিড়, নাড়িয়ে নাড়িয়ে, খিলখিল, ছেড়েছুড়ে, ছোটাছুটি, ছল ছলাৎ, ফোঁপাতে ফোঁপাতে, কানায় কানায় প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– চৌকি, চিলুমচি, উঠোন, কাঁথা, কুপি, দেয়াশলাই, পুঁতি, চুলা, চাটাই, বালা, তালা, দম, সাঁকো, ওঝা, ঢোঁক, ফোস্কা, পাখা, শিল্লুক, পাতিল, মুনিষ, ঘরামী, ফুর্তি, বাজনা, চেংরা, খোরাকি, শীষ, ভাটি, ধান, লাথি, খোরাকি, ঢোল উজান, পুঁই, মাচা, খুপড়ি, গঞ্জ, ঝি, ফতুয়া, পাতিল, গামছা প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– বাহির>বাইর, করতে>করণ, মধ্যে>মইদ্যে, বাধন>বান্দন, সেটা>হেইডা, করছেন>করতেছেন, কেটেছে>কাটছে, বলবে>কইবা, কন>ক্যান, এসেছিল>আইছিল, এমনি>এমনে, বুঝেছিস>বুঝছস, মেয়ে>মাইয়া, খেদিয়ে>খেদাইয়া, লাথি>লাথ, ক্ষুধা>ক্ষিদা, বিড়াল>বিলাই, চোখ>চউখ, বাদ্য>বাইদ্য, লাগছে>লাগতাছে, তুলে>তুইলা, রাজ্য>রাইজ্য, থেকে>থাইকা প্রভৃতি।

ভাটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-প্রত্যাশাকে ভাষ্যরূপ দানে লেখকের অনায়াস দক্ষতার পরিচয় মেলে এ উপন্যাসে। বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক প্রতিবেশ তাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনের ভঙ্গিতে যে অভিঘাত সৃষ্টি করে, এর প্রভাব অবধারিতভাবে পরিলক্ষিত হয় তাদের ধর্মীয়-সামাজিক মূল্যবোধ, উৎসব-অনুষ্ঠান, পারিবারিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। কাজেই প্রকৃতিসংলগ্নতা তাদের প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। একে মান্য করেই তারা প্রাত্যহিক দিনযাপনে বিভিন্নভাবে সংস্কৃতিচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়। সেই বিবেচনায়, নেত্রকোণার স্বতন্ত্র ধরনের লোকজচেতনার রূপায়ণে উপন্যাসটির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নাসরীন জাহান

বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে নাসরীন জাহানের (১৯৬৪) নামটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আশির দশকে গল্প লিখে তাঁর পথচলা শুরু হয় এবং পরপর পাঁচটি গল্পগ্রন্থ উপহার দিয়ে তিনি সচেতন পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লেখালেখির বিষয়টিকে তিনি যে আত্মস্থ করেছেন এবং নিছক শখের বশে বা আবেগের তাড়নায় কলম হাতে তুলে নেননি, তা অচিরেই প্রমাণিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস উড়ুক্কু প্রকাশিত হবার পর। P‡›'i c_g Kjv, P›'‡jLvi Rv'we¯Ívi, hLb Pvicv‡ki ewZ¸‡jv wb‡f Avm‡S, †mvbvjx cni, k•LbZKxসহ আরো বেশ কিছু উল্লেকযোগ্য উপন্যাস লিখে তিনি স্বীয় মেধা ও সামর্থ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। নাগরিক জীবনের কোলাহল, নর-নারীর আন্তঃসম্পর্কের বিচিত্র অবয়ব, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব, ব্যক্তিমানুষের উৎকণ্ঠা, মনস্তাপ, ভয়, স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন, আত্মপীড়ন, রোমান্টিক চেতনার বলয়, ব্যক্তিমানুষের অস্তিসংগ্রাম ও অস্তিবাদী জীবনজিজ্ঞাসা, অবদমন, ও অবক্ষয়ী ভাবনা। তাঁর উপন্যাসগুলো বিশেষভাবেই পরাবাস্তব, জাদুবাস্তব, অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার সংঘাত, কোলাজ, চেতনাপ্রবাহরীতি, সময়ের উল্লম্ফনও ভগ্নানুক্রমিক বিস্তার, প্রচলিত পুরাণের বিনির্মাণ, আখ্যানের এলোমেলো ও বিসর্পিল গড়ন তথা উত্তরাধুনিক সাহিত্যাঙ্গিক ও প্রকরণকে অবলম্বন করে রচিত। উপন্যাসে রূপকথার কাঠামোকে তিনি স্থাপন করেন আধুনিক মানুষের ব্যতিব্যস্ত জীবনধারার ওপর। সময়ের কালানুক্রম মান্য না করে বরং সময়হীনতার ভেতরে

প্রবেশে তিনি উদ্যোগী হন, ঘুচিয়ে দেন অলীক ও বাস্তবের সীমারেখা এবং এভাবেই আঁকতে চান অদ্ভুত আঁধার নেমে আসা সময়ের ছবি, নিষ্ঠুর সমকালীন মহানাগরিক বাস্তবে প্রতিবেশের চালচিত্র। তাঁর উপন্যাস পড়তে বসা পাঠকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, অনেক প্রসঙ্গ এবং ভাবনার ধারাবাহিক শৃঙ্খলা তাতেই আবিষ্কার করতে হয়, অনুমান ও ধারণা পোষণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের ঘটনাংশের সঙ্গে কুশীলবদের যোগসাজশ ও কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটাতে হয়। পাঠকের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে তিনি অবলীলায় যেন মেতে ওঠেন আঙ্গিকের অবিরাম নিরীক্ষায়। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নারীদের জীবনভাবনা ও নিত্যদিনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার রূপরেখা অকৃত্রিমভাবে তাঁর উপন্যাসে স্থান পায়। তাঁর উপন্যাসে অবলম্বিত গদ্যরীতি গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নতুন পথে এগিয়ে যেতে প্রয়াসী। একজন সংবেদনশীল কবির প্রগাঢ় আবেগ আর অনুভবকে ভাষার যুক্তিনিষ্ঠ অথচ অন্তরঙ্গ বুননে এগিয়ে নেবার জাদুকরী ক্ষমতা তাঁর লেখনীতে রয়েছে। ফলে, প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনাকেও কল্পনার মায়াজালে, সাংগীতিক মুছর্নাযোগে অনুভবের বিরল সুযোগ তাঁর উপন্যাস পাঠে বারবার পাওয়া যায়। গ্রামীণ জীবনকে ভিত্তি করে তিনি একটি উপন্যাসই লিখেছেন, যেটি আমাদের অভিসন্দর্ভভুক্ত।

D‡o hvq wbwkc ÿx

D‡o hvq wbwkc ÿx (১৯৯৯) উপন্যাসের পটভূমি ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলসংলগ্ন নয়নপুর, যেটির গড়ন বাংলাদেশের অন্য যে কোনো গ্রামের অনুরূপ। এর লোকসমাজভুক্ত বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক চালচিত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে কায়িক শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের সংগ্রামশীল জীবনচিত্র। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা, সামাজিক শোষণ আর প্রকৃতির বৈরিতার সমন্বিত অভিঘাতে প্রতিনিয়ত মুখ থুবড়ে পড়া মানুষগুলোর চিন্তা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিত্যদিনের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার আগ্রহ এ উপন্যাসে বিধৃত শিল্পভাবনার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। উপন্যাসটি ধারণ করেছে গ্রামীণ জীবনবাস্তবতাকে। বেদে, চাষী, মাঝি ও কারিগরদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লোকগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের রূপরেখা বয়ানে লেখকের আগ্রহ এতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে লেখককে প্রভাবিত করেছে তা উপন্যাসটির কুশীলবদের নির্মিতি ও ঘটনাপ্রবাহে তাদের ভূমিকা থেকে অনুধাবন করা চলে।[১৪৬] বিশ শতকের শেষভাগের বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অবহিত হতে এ উপন্যাস পাঠ নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত। উপন্যাসটির আদ্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান।

১. লোকবিশ্বাস–– এ উপন্যাসে নয়নপুরের বাসিন্দাদের ভাবনা ও মনস্তত্ত্বে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের রূপায়ণ লক্ষণীয়। দীর্ঘকাল ধরে বহমান এসব বিশ্বাস গ্রামের নিরক্ষর বাসিন্দাদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এ উপন্যাসের পাঁচ পরিচ্ছেদে বেদে নারী চন্দ্রানীর বেপরোয়া স্বভাবের সঙ্গে তার

বহরের অন্যদের প্রতিতুলনায় বিষয়টি আভাসিত। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সংকট মোকাবিলার জন্য তারা সর্বাগ্রে স্রষ্টার দ্বারস্থ হয়। এতে সমস্যার সমাধান ঘটবে বলে তারা আশাবাদী। কিন্তু চন্দ্রানী এ ধরনের লোকবিশ্বাসে অনাগ্রহী। নদীপথে একস্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াতকালে 'তুফান আসলে সবাই যখন নৌকা বন্ধ করে আল্লাহর নাম জপতে থাকে, চন্দ্রানী তখন তামাম রঙ তামাশা দেখার জন্য পারলে ছইয়ের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়' (পৃ. ১৮)। 'আঠার' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সমির মিয়ার ছেলে ফজলু ছিচকে চোর। এজন্য গ্রামবাসী তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। অতীতে সে সঙ্গীদের নিয়ে গৃহস্থবাড়িতে সিঁদ কেটে সোনাদানা, মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিলেও একপর্যায়ে গ্রামবাসী বিষয়টি টের পেয়ে তাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করে। সেকারণে জীবিকার তাগিদে তাকে অবশেষে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের গোরস্তানে কবর দেয়া মৃতব্যক্তির কাফনের কাপড় চুরি ও বিক্রির মাধ্যমে ক্ষুন্নিবৃত্তির বন্দোবস্ত করতে হয়। জাগতিক পাপ-পুণ্য নিয়ে ফজলুর মনে কোনো ভীতি নেই' (পৃ. ৫৫)। রাতে চুরির অভিযানে বের হবার আগে ঘরের বেড়ায় প্রতিফলিত কুপির আলোতে নিজের দীর্ঘ ছায়া দেখে সে ভীত হয়ে পড়ে, কোনো বিপদের আশঙ্কায়। প্রচলিত লোকবিশ্বাস হলো, 'এমন ছায়া দেখে ঘর থেকে বেরুনো অকল্যাণ'। (পৃ. ৫২) কারণ, এ ছায়ার আড়ালে নাকি শয়তান লুকিয়ে থাকে। তাই ফজলু নিজের কালচে মুখমণ্ডলে, জ্বলন্ত কয়লার মতো চোখজোড়ায়, মাথার উসকোখুসকো চুলের সমন্বিত অবয়বে খুঁজে পায় বীভৎসতা, যা পরিণতিতে কালো লোমশ হিংস্র জন্তুর অবয়বে শয়তানের অস্তিত্বকেই যেন তার চেতনালোকে মূর্তময় করে তোলে। তেমনিভাবে রাতে চুরি করতে যাওয়ার সময় বিড়ালের শরণাপন্ন হওয়াও লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন।

> রাত অভিযানে বেরুনোর সময় মনে মনে সে একটি তাগড়া বেড়ালকে চোখের পর্দায় দৃশ্যমান করে আর বিড়বিড় করে বলে, বিলাই তোর পায়ে ধরি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কল্পনায় ঘুটঘুটে রাত্তিরে বেড়ালের ছায়া স্পষ্ট হয়। এ ব্যাপারে তার বদ্ধমূল বিশ্বাস, সে যদি আকস্মিকভাবে ধরাও পড়ে, পুরো ধোলাইটি যাবে বিড়ালের শরীরের ওপর দিয়ে। (পৃ. ৫৩)

২. লোকসংস্কার-- এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকমানসের স্বরূপ অনুধাবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী উপাদান হলো লোকসংস্কারের বিস্তৃত বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার, যার সঙ্গে কুশীলবদের নাড়ির টান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নয়নপুরের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত থেকে এখানকার বাসিন্দাদের চেতনালোকের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উপন্যাসটিতে লোকমানসসন্নিহিত বিশ্বাস ও সংস্কারের জগৎ গ্রন্থনায় লেখক অত্যন্ত কৌশলে ভিন্নবয়সী দুই নারীকে অবলম্বন করেছেন। তাদের জীবনবৃত্ত বয়ানসূত্রে লেখক এতদঞ্চলের লোকমানুষের চেতনালোকের পরিচয় নির্দেশে সচেষ্ট। বিজ্ঞানচেতনাশূন্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বারা প্রবলভাবে তাড়িত নিয়তিবাদী নয়নপুর গ্রাম ও এর সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য ও কর্তৃত্ববোধ প্রবল। একারণেই লেখক এ উপন্যাসে কুঁজো বুড়ি ও চন্দ্রানীকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন, যারা লোকসমাজের অন্তর্গত হয়েও এবং লোকজ বিশ্বাস-সংস্কার ও মূল্যবোধকে অনুসরণ সত্ত্বেও পুরুষতন্ত্রের দাপটকে অস্বীকার করে। নয়নপুর গ্রামের তিন যমজবুড়ির মধ্যে বড় বোন কুঁজো বুড়ি ও তার এককালের সহচর চন্দ্রানী বেদেনী – উভয়েই স্বভাবে একরোখা, বুদ্ধিমতী, কৌশলী, সর্বোপরি দুঃসাহসী। সেকারণেই যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলায় তারা নির্দ্বিধায় সম্মত। এ উপন্যাসে কুঁজো বুড়িকেন্দ্রিক আখ্যানের সিংহভাগই ব্যয়িত হয়েছে নয়নপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত লোকসংস্কারের সঙ্গে তার ঘাত-প্রতিঘাতমূলক সম্পর্কের রূপরেখা নির্দেশে। উপন্যাসের 'প্রথম' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, রাতের অন্ধকারে হাওরে যখন তুফান ওঠে, তখন নিজের আস্তানা ছেড়ে কুঁজো বুড়ি প্রবল উন্মাদনাবশত গ্রামের পথে বেরিয়ে যায় দমকা বাতাসের তাণ্ডব আর ঢেউয়ের প্রমত্ততা থামাতে। তার সঙ্গী দুই বোন মেজবুড়ি ও ছোটবুড়ি এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেও কুঁজো বুড়িকে কিছু বলে না। কেননা, তাদের কাছে সে 'আধ্যাত্মিক মানুষ' হিসেবে পরিচিত। তাদের ধারণা, এশার ওয়াক্তের পর বড় বোনের পোষা বস্তাবন্দি জিনগুলো রাতের নির্মল হাওয়া সেবনের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে বলেই সে তাদের অন্ধকারে ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ তার অলৌকিক শক্তির প্রতি গ্রামবাসীর মতো তারাও আস্থাশীল। তার চালচলন, কথাবার্তা, দিনযাপনের ভঙ্গি গড়পরতা মানুষের চেয়ে ভিন্ন বলেই সে

নয়নপুরের বাসিন্দাদের কৌতূহল, ভক্তি, সমীহার পাত্র। গ্রামবাসীর কাছে কুঁজো বুড়ি কুহকিনী, যমবুড়ি ও ডাইনি হিসেবেও খ্যাত; যার রয়েছে অলৌকিক নানা ক্ষমতা। সে নাকি বস্তার ভেতর জ্বিনদের বন্দি করে রাখে, মৃত ব্যক্তির প্রাণ ফিরিয়ে দেয় পাখির রূপে। 'তারা কুঁজো বুড়ির রাত্তিরের খেলাকে ডরায়, তোয়াজ করে চলে। এই বুড়ি তার আচরণের স্বাতন্ত্র্যের কারণেই সারা গাঁয়ে ভিন্ন। এমনকি তার যমজ দুই বোন পর্যন্ত তাকে আধ্যাত্মিক মানুষ মনে করে বহুকাল ধরে তাকে একা এক কোঠায় দিয়ে নিজেরা আলাদা ঘুমায়' (পৃ. ৭)। 'ছোট বুড়ি, মেজো বুড়ি ... কুঁজো বুড়ির বানানো কিচ্ছা এক সুরে গায়' (পৃ. ৭-৮)। তার কাছে রয়েছে জাদুকাঠি, বিশেষ মন্ত্র পড়ে যা দিয়ে সে তুফানকে শাসায় থেমে যাওয়ার জন্য। দুই বোনের ধারণা, তাদের বড় বোন 'অলৌকিক বুজি' সকল বিপদ, প্রতিকূলতা থামাতে সমর্থ। তাই তারা 'কুঁজো বুড়ির ওপর নির্ভর করেই ঝড়ে তুফানে বিপদে আপদে এতোকাল বেঁচে আছে' (পৃ. ৯)। কুঁজো বুড়ির কাছে নানা অঞ্চল থেকে মানুষ আসে জ্বিনের প্রতিকারের জন্য। কারণ লোকমুখে প্রচলিত গল্প হলো, সে তার আয়ুর সমান সংখ্যক জ্বিনকে বস্তাবন্দি করে রেখেছে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কারো ক্ষতি বা উপকার সাধনের জন্য। গ্রামবাসী নির্দ্বিধায় এসব কথা বিশ্বাস করে। কারণ 'কোরআনে তো আছেই জিন আর ইনসানের কথা' (পৃ. ২৯)। জ্বিনের প্রতি বিশ্বাস তাদের মনোলোকে যে প্রবল ভীতিবোধ ও আতঙ্ক গড়ে তোলে, এর প্রতিকারের জন্যই তারা কুঁজো বুড়ির কাছে আসে। শুধু তাই নয়, সে যে জাদুটোনা, মন্ত্রপাঠ ও বশীকরণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে সমর্থ, গ্রামবাসী এর প্রমাণ পায় বিভিন্ন ঘটনায়--

> ভক্তকুলের সামনে বুড়ির মুখ বন্ধ থলের মধ্যে বিড়াল মিউ মিউ করে কাঁদে, বুড়ি কি কি সব মন্ত্র পড়ার পর চারপাশ থেকে বিষধর সাপেরা তাকে ঘিরে ধরে, আবার চোখ বুজে ফুঁ দিতেই মুহূর্তে সেইসব না-ই হয়ে যায়, হাত পাকিয়ে পাকিয়ে বুড়ি যে কোনো স্থানে আগুন জ্বালাতে পারে, এইসব বিষয়কে তারা বুড়ির ধর্মগর্হিত জাদুটোনার শক্তি মনে করে। প্রকাশ্যে তারা এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না, কেননা বুড়িকে তারা নিজেরাও কি এক অজানা কারণে ভয় পায়। (পৃ. ২৯)

এমনকি, কেউ কুঁজো বুড়ির শক্তি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলে বা তাকে আঘাত করলে এর ফল যে তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, এর প্রমাণ হিসেবে তারা মেনে নেয় হাফিজউদ্দিনের মৃত্যুবরণের ঘটনাকে। তার প্রতি অবজ্ঞাবশত হাফিজউদ্দিন একদিন গুলতি ছুঁড়ে মেরেছিল। কপালে গুলতির আঘাত খেয়েও কুঁজোবুড়ি এর প্রত্যুত্তর না দিয়ে হাফিজউদ্দিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের আস্তানায় ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এ ঘটনা জানাজানি হলে গ্রামবাসী হাফিজউদ্দিনকে ভয় দেখায়, মৃত্যুবরণের পর কবরে গেলে তাকে কঠোর আজাব সইতে হবে। শুধু তাই নয়, সে কিছুতেই তিন কলেমা মুখস্ত করতে পারবে না। এর পরিণতিতে অচিরেই সে মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় গাছের পাতা বাতাসে নড়তে দেখলে সে চিৎকার করে। একপর্যায়ে তার সারাশরীরে ফোস্কা পড়তে থাকে এবং ভেদবমি করতে করতে সে মারা যায়। গ্রামবাসীর ধারণা, বড় ভাইয়ের এরূপ আচরণের ধারাবাহিকতাবশতই ছোট ভাই কুতুবউদ্দিন হাওরে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুপথে যাত্রা করে। তারা মনে করে, কুঁজো বুড়ি নিজের চোখ দিয়ে নয়, বরং তার পোষ মানানো জ্বিনদের মাধ্যমে চারপাশের সবকিছু দেখে। কেন কুঁজো বুড়ি সম্পর্কে নয়নপুর ও এর পাশের অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রটনা দিন দিন পল্লবিত হয়ে তাদের চেতনালোকে বিভিন্ন বিশ্বাস-সংস্কারের জন্ম দিয়েছে, লেখক এ উপন্যাসে সেই চালচিত্রও গ্রন্থিত করেছেন। বিজ্ঞানচেতনার অভাব, যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে কোনো ঘটনা সংঘটিত হবার কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা করার পরিবর্তে নিয়তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজের বোধবুদ্ধির অতীত যে কোনো পরিস্থিতি বা ঘটনার অন্তরালে অলৌকিক-অতিলৌকিক শক্তির উপস্থিতি মেনে নেয়া তাদের স্বভাবগত প্রবণতা। ফলে, কৌশলী, বিচক্ষণ ও স্বার্থসচেতন কুঁজো বুড়ির পক্ষে গ্রামবাসীকে নিজের আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছিল। এ উপন্যাসে বিবৃত তার অতীত জীবনের বৃত্তান্তেই প্রতিফলিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজালে শৃঙ্খলিত হবার পরিবর্তে অন্যদের নিজের আয়ত্তে রাখার দুঃসাহসী অভিপ্রায়। এক্ষেত্রে কুঁজোবুড়ির পক্ষে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে সহোদরাদ্বয়ের সঙ্গে তার প্রায় অভিন্ন দৈহিক আকৃতি এবং স্বকীয় স্বভাব, চালচলন ও ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে, তিন বুড়ির জন্মের বৃত্তান্ত যেহেতু প্রাকৃতিক কারণেই অন্যদের থেকে আলাদা, তাই তাদের প্রতি গ্রামবাসীর

কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা দিনের পর দিন অব্যাহত থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। তদুপরি, তৎকালীন আর্থ-সামাজিক গ্রামীণ বাস্তবতার পটভূমিতে নারীর প্রতি অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ করে তাদের বুদ্ধিমান, বিবেচক গ্রাম্য কবিয়াল বাবা যেসব বন্দোবস্ত করেছিল তার গুরুত্বও অনুধাবন করা জরুরি। নয়নপুর সেই গ্রাম যেখানে মেয়েশিশু জন্মানোমাত্র বাবা-মা তার মুখে লবণ গুঁজে মেরে ফেলে। কাজেই সেই গ্রামের হাটুরে কবির স্ত্রীর গর্ভে যখন তিনটি যমজ মেয়ের জন্ম হয়, তখন এ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই পরিবারটির ওপর বিপর্যয় নেমে আসা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কৌশলী হাটুরে কবির বিচক্ষণতায় তেমনটি ঘটেনি। যেহেতু সে গ্রামে খ্যাতি অর্জন করেছিল স্বরচিত কবিতা লিখে হাটে হাটে বিক্রির মাধ্যমে, কাজেই তার প্রতি গ্রামবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শ্রদ্ধাব্যঞ্জক। অর্থাৎ সৃষ্টিশীলতার নিরিখে লোকসমাজের সমীহ অর্জনের সুযোগ সে কাজে লাগিয়েছিল পারিবারিক বিপর্যয়ের ক্রান্তিলগ্নে। ভবিষ্যত সম্পর্কে দূরদর্শিতার কারণে সে স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় হাটের কবিতায় ইঙ্গিত দিয়েছিল, 'তিন ইন্দ্রিয় নিয়ে, অলৌকিক শক্তি নিয়ে এই গ্রামে জন্ম নেবে তিন শক্তি, যারা আমৃত্যু নয়নপুরকে নিয়ন্ত্রণ করে যাবে' (পৃ. ৯০)। সে তার কবিতায় ঘোষণা করেছিল, 'এমনটি যে নয়নপুরে ঘটবে, তা নাকি 'আল্লাতায়ালার বাও' (পৃ. ৯০)। এভাবেই হাটুরে কবি কবিতাকে মাধ্যম করে নিজের সন্তানদের নয়নপুরের কাণ্ডারী করে তুলতে সচেষ্ট ছিল। যথাসময়ে তার স্ত্রী তিনটি যমজ মেয়েকে প্রসব করলে এ ঘটনায় নয়নপুরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এমনকি সাংবাদিকরাও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের বন্দোবস্ত করে। তিনটি শিশুর মধ্যে প্রথমে ভূমিষ্ট মেয়েটি মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ চুল, সামনে একটি দাঁত এবং কুঁজো পিঠ নিয়ে জন্মায়। এর আধঘণ্টা পর অন্য মেয়ে দুটিকে হাটুরে কবির স্ত্রী আরো দুটি মেয়ে প্রসব করে। দৈহিক আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের গুণে কুঁজো বুড়ি জন্মের পর থেকেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়। মেয়ে সন্তানের জন্ম যে অঞ্চলে অভিশাপ এবং চরম অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে গণ্য হত, এ ঘটনায় সেই প্রেক্ষাপট বদলে দেয়। এমনকি তাদের বাবার কবিতার ভাষায় কথিত 'হাওরের ওপর বৈঠাহীন নাওয়ের মতো' (পৃ. ৯১) ভেসে চলা নয়নপুর এতদিনে বৈঠা শক্ত হাতে ধরা মাঝিদের সন্ধান পায়, যারা সাধারণ মেয়ে নয়। বরং 'মা দুর্গা অথবা কালীর মতো' (পৃ. ৯১) শক্তি ও দাপট দেখিয়ে গ্রামবাসীকে বশীভূত করতে তারা যে সমর্থ, এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের পরিণত বয়সের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। তিন বোনের জন্মাবার রাতেই তাদের বাবা হাওরে ঝড়ের কবলে মারা যায়। 'অন্য কোনো মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটলে গ্রামের লোকজন অলুক্ষুণে বাচ্চাদের নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে চাইত' (পৃ. ৯১)। কিন্তু হাটুরে কবি নিজেই কবিতায় এরূপ ইঙ্গিত দিয়েছিল। অর্থাৎ আত্মহত্যা অথবা আত্মগোপন– এর কোনো একটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সে নিজেকে পরিবার থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কর্তা হিসেবে কোনো পুরুষ দায়িত্ব পালন না করলে সেই পরিবারে স্বাভাবিক নিয়মেই বিপর্যয় নেমে আসার কথা। কিন্তু তেমনটি হাটুরে কবির পরিবারের ক্ষেত্রে ঘটেনি। কারণ, ভবিষ্যতে 'যারা নয়নপুরের চিরকালের বিপদ ঠেকাবে, তাদের অভিভাবক হয়ে ওঠে গ্রামের সবাই' (পৃ. ৯১)। তারা হাটুরে কবির দিকনির্দেশনা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল। কেননা তার কবিতায় 'সৌরজগত, মহাপৃথিবীর কথা আছে, এর মধ্যে সবচাইতে বেশি আছে নয়নপুরের ভূত ভবিষ্যত নিয়ে নানা ইঙ্গিত' (পৃ. ৯১-৯২)। গ্রামবাসীর চেতনালোকে সন্নিহিত লোকসংস্কারের প্রভাব সম্পর্কে এ সংক্রান্ত একটি উদাহরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিন বোনের জন্মের সন্ধ্যায় যখন পাহাড় থেকে ধেয়ে নামা ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে আতঙ্কিত গ্রামবাসী টিন পিটিয়ে স্রষ্টার নাম স্মরণ করছিল, তারা খেয়াল করে যে যমজ বোনদের জন্মকান্না ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাস হাওরের জলে মিলিয়ে যায়। এসব ঘটনার পরিণতিতে গ্রামবাসী তিন বোনকে পরম যত্নে ও সেবায় বড় করে তোলে। কিন্তু স্বভাবগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে তারা বয়োসন্ধিকালে ভিন্ন আচরণ করতে থাকে। 'এমনিতেই তিন যমজ বোনের জন্ম থেকে শুরু করে এই অব্দি (তাদের পনের বছর বয়স পর্যন্ত) যা যা ঘটেছে তাতে এরা কোনো স্বাভাবিক মানুষ নয়, গ্রামের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই এই ধারণা বদ্ধমূল। ছেলেবেলা থেকেই এদের আচরণ অন্য শিশুদের মতো নয়' (পৃ. ৯৩)। যেমন, অন্যদের সঙ্গে মেলামেশার পরিবর্তে তারা দিনরাত নিজেদের ঘরেই বন্দি থাকত। তারা হাঁটলে পায়ের শব্দ হয় না। নয়নপুরে কুঁজো বুড়ির আধিপত্য প্রথম প্রকাশিত হয় জ্বিনে ধরা জহুরাকে সুস্থ করে তোলার ঘটনায়। পঞ্চদশী কুঁজো বুড়ি তার সঙ্গে একান্ত আলাপে জানতে পেরেছিল, 'ভরপেট

ভাত খাইবার লাগি, স্বামীর মাইর থাইক্যা বাঁচনের লাগি জহুরা ... ভেক ধইরা থাকত' (পৃ. ৯৪)। কিন্তু একথা জানালে তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হবে বলে সে জ্বিনে ভর করা নারীর অভিনয় করত। সে প্রায়ই দাঁতকপাটি লাগিয়ে মুখে ফেনা তুলে মাটিতে শুয়ে ছটফট করত বলে একপর্যায়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়ানো হয়। বাপের বাড়িতে এলেই সে দিব্যি সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিছুদিন পর তার সুস্থতা লক্ষ করে পুনরায় শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলে সে যথারীতি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তার-কবিরাজের চিকিৎসা ব্যর্থ হলে জহুরার পরিবার গ্রামের মসজিদের ইমামের শরণাপন্ন হয়। সে চিকিৎসার নামে প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রামবাসীর সামনে তাকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে ঘোষণা দেয়, 'সে (জহুরার ওপর ভরকারী) এক বদখত জিন, তার ওপর যদি অত্যাচার করা হয় তবে সে গ্রামের সব মেয়ের ওপর আছর করবে। কোরআন তাবিজ কিছুই কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। ... জহুরাকে হত্যা করা হলে জহুরাই মরবে, জিনের কিছু হবে না। জিন কখনো মরে না। বরং সে আরও হিংস্র হয়ে যারা জহুরাকে মারছে তাদের একেকজনের কল্লা ছিঁড়ে খাবে' (পৃ. ৯২)। অবশেষে কুঁজো বুড়ি তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়। সে জহুরার নিকট থেকে অসুস্থতার গোপন বৃত্তান্ত জেনে জ্বিনের দোহাই দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে চাহিদামাফিক তার খাবারপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও স্বামীর দুর্ব্যবহার এড়ানোর বন্দোবস্ত করে। সে দুই বোনকে নিয়ে জহুরার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে জানায় একটি কালো বিড়াল এনে দেবার জন্য, যেটির মধ্যে ঢুকিয়ে সে জ্বিনকে নিয়ে যাবে। তিন বোনের মা এ ঘটনায় প্রচণ্ড শঙ্কিত ছিল। কারণ, জহুরার প্রতিকারে ব্যর্থ হলে গ্রামবাসী তাদের জলে ডুবিয়ে মারবে, এমনকি সংসার চালানোর জন্য তাকে সাহায্য করাও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তিন বোন তাতে বিচলিত হয় না। শ্বশুরবাড়ির একটি নির্জন ঘরে জহুরাকে নিয়ে যাবার সময় কুঁজোবুড়ি তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে জানায়, 'কেউ কোনো চিপা দিয়ে উঁকি দিলে জ্বিন তার শরীরে গিয়ে ভর করবে' (পৃ. ৯৩)। দুই ঘণ্টা পর বস্তাবন্দি বিড়ালকে নিয়ে বেরিয়ে আসে তিন বোন। কুঁজোবুড়ি জহুরাকে রেখে আসার সময় তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে করণীয় সম্পর্কে জানায়। জ্বিনকে বন্দি করার বিনিময়ে সে শর্ত জুড়ে দেয় জহুরার আবদার মেটানোর জন্য। জহুরা সুস্থ হয়ে উঠলে এভাবেই নয়নপুরে তিন বুড়ির স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি প্রতিষ্টার পালা শুরু হয়, যা বহুকাল ধরে অব্যাহত থাকে। 'বালিকাবুড়ি গ্রামের মধ্যে অলৌকিক এক ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গ্রাম গ্রাম তার খবর পৌঁছে যায়। ... এইভাবেই বালিকা বুড়ির অলৌকিক জীবনের শুরু।' (পৃ. ৯৪)

গ্রামের অন্যান্য নারীর মতো তিন যমজ বোন যথাসময়ে বিয়ে ও সংসার শুরু করলেও একপর্যায়ে অনেকটা নাটকীয়ভাবেই তাদের তিন ঘরজামাই হাওরে ঝড়ের কবলে প্রাণ হারায়। এরপর থেকে শুরু হয় সাংসারিক অনটনের সঙ্গে তাদের সংগ্রামের পালা। কেননা, মা-বাবার মৃত্যুর পর নিঃসন্তান ও বিধবা এ তিন বোন পুনরায় সংসারী হতে চায়নি। আবার, অতীতে আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল বিধায় এবং গ্রামে তার পিতার হাটুরে কবি হিসেবে খ্যাতি থাকায় পরিবারটি সম্ভ্রম ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। ইতোমধ্যে তাদের মাও সম্ভবত মৃত্যুবরণ করেছিল। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিত্যদিন ওঠাবসা, ভাববিনিময় থেকে তারা সচেতনভাবেই নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীর অনুগ্রহ ও করুণার পাত্র না হবার অভিপ্রায়েই মূলত কুঁজো বুড়ি তাদের দুর্বলতাকে পুঁজি করে নিজের অলৌকিক-অতিলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত কিংবদন্তিকে হাতিয়ার করে তুলেছিল জীবিকা নির্বাহের তাড়নায়। তাই অর্থের বিনিময়ে পীড়িত ব্যক্তিকে তাবিজ-কবচ দেয়া, তুকতাকের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আত্মার ওপর পাখির আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রাণ ফেরানো, সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণের বিনিময়ে বশীকরণ-জিনচালানের মাধ্যমে কারো সমস্যার সমাধান করা বা শত্রুনাশ প্রভৃতি কাজে সে সম্পৃক্ত ছিল। দিনদিন তার প্রতি মানুষের সমীহ যে বাড়ছিল, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে নয়নপুরের কাসা দিঘিতে তার তাবিজ বেঁধে দেয়ার ঘটনায়। কেননা, কেউ কুঁজো বুড়ির নিষেধ অগ্রাহ্য করলে তাকে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে বলে গ্রামবাসী বিশ্বাস করত। তদুপরি তার পালিত জিনরা এ দিঘি পাহারা দেয়, এ ধরনের গালগল্প থেকেও অনুধাবন করা চলে গ্রামবাসীর ওপর এই নারীর আধিপত্য বিস্তারের রূপরেখা। তবে লেখক এ উপন্যাসে নয়নপুরের বাসিন্দাদের সমষ্টিচেতনায় লোকসংস্কারের প্রভাব নিরূপণে

অবলম্বন করেছেন এ গ্রামেরই বাসিন্দা এবং একপর্যায়ে গ্রামপালানো মেধাবী, শিক্ষিত যুবক ওসমানের দৃষ্টিভঙ্গিকে। সে নিজের শিক্ষা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুক্তির মানদণ্ডে তিন যমজ বুড়ির অস্তিত্বসংগ্রামের চালচিত্র অনুধাবনে লোকসমাজে প্রচলিত নানা বিশ্বাস-সংস্কারের ভূমিকা অনুধাবনে সমর্থ হয়।

> কুঁজো বুড়ি যৌবনকালেই তাবিজ দিত। মুখে মুখে কেচ্ছা বানাতে তার বেশ খ্যাতি ছিল। ওসমান শুনেছে তার মায়ের পরপর কয়েকটা সন্তান মরার পর বুড়ির তাবিজ পড়া পানি খেয়েই দশ বছর পর সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। জন্মের পর ওসমান জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছিল না। বুড়ি কী সব তুকতাক করে তার দেহে প্রাণ এনে দিয়েছিলো। বুড়ির সাথে মায়ের বেশ খাতির ছিলো। গ্রামে এসে ওদের তিন স্বামীর নিখোঁজ হওয়া থেকে শুরু করে জিন পুষে কুঁজো বুড়ির অলৌকিক এক মানবী হওয়ার গল্প শুনেই ওসমানের নিঃসাড় প্রাণে ঘণ্টা বাজছিল। দেহাতি মানুষের কুসংস্কারকে পুঁজি করে কোন অস্তিত্ব সংকট থেকে, কোন ক্ষমতার জোরে বুড়ি এ রূপ ধারণ করেছে, তা একটু দেখে আসে। (পৃ. ৬১)

মেজো বুড়ি ও ছোট বুড়ি বরাবর বড় বোনের অনুগত হলেও তাদেরও যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা রয়েছে, এমন ধারণা নয়নপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে বদ্ধমূল। তারা সারামাস নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিনাতিপাত করলেও প্রতিমাসের অমাবশ্যায় সারারাত ধ্যানে মগ্ন থাকে। এমতাবস্থায় এদের একজন গ্রামের সব মানুষের পুণ্য এবং অন্যজন পাপ দেখতে পায় বলে লোকসমাজে গল্প প্রচলিত। তারা কুঁজো বুড়ির কাছে পরবর্তী পূর্ণিমায় সেসব বৃত্তান্ত পেশ করে। সে নাকি আরবিতে দলিল করে এসব জমা রাখে তার গোপন সিন্দুকে। এ গল্প একসময় গ্রামবাসীর মধ্যে এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, আবুল কালামের জনৈক শিষ্য সেই সিন্দুক চুরি করতে হানা দেয় কুঁজো বুড়ির আস্তানায়। সে বুড়িদের নজর এড়াতে গিয়ে তাদের বাড়ির সীমানাতেই সাপের কামড়ে মারা যায়। এরপর থেকে গ্রামবাসী তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। একপর্যায়ে গ্রামে আগত এনজিও কর্মীরা তিনবোন সম্পর্কিত এসব বৃত্তান্তকে তাচ্ছিল্য করলেও অচিরেই মহামারীর করালগ্রাসে ঘরে ঘরে মানুষ মারা গেলে গ্রামবাসী এ ঘটনাকে কুঁজোবুড়ির অভিশাপ বিবেচনায় তাদের তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যতই দিন অতিক্রান্ত হয়, গ্রামবাসীর চেতনালোকে তিন বোন সম্পর্কিত নানা বিশ্বাস-সংস্কার বিলীন হতে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রামের চেয়ারম্যানের ছেলে জহির হাসান যে শহুরে শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন ও মানসিকতাকে আত্মস্থ করেছে, সে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। দশ যুগ ধরে কাসার দিঘি সম্পর্কিত নানা কিংবদন্তির বিস্তার গ্রামবাসীর মুখে প্রচলিত ছিল। সেইসঙ্গে কুঁজো বুড়ির নিষেধাজ্ঞাসূচক তাবিজ দিয়ে এটিকে গ্রামবাসীর নিত্যদিনের প্রয়োজনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা আরোপ এবং এ নির্দেশ অমান্য করলে অমঙ্গল ঘটার হুমকি – উভয় বিষয়কেই জহির হাসান অস্বীকার করে। সে সুফিয়ার চল্লিশা উপলক্ষে লোকমারফত দিঘি থেকে মাছ আহরণ করিয়ে গ্রামবাসীর ভোজের বন্দোবস্ত করে। সেকারণেই সে যখন দুজন জেলেকে দিঘিকে নামায় মাছ ধরতে, তখন অমঙ্গলের শঙ্কায় গ্রামের ঘরে ঘরে সংস্কারাচ্ছন্ন বৌ-ঝিদের মধ্যে বিলাপ শুরু হয়। জহির হাসান গ্রামবাসীর সংস্কারাচ্ছন্ন চেতনালোককে জাগিয়ে তুলতে জেলেদের কাঁসা দিঘিতে মাছ ধরার ঘটনাটি জনৈক ফটো সাংবাদিক ক্যামেরাবন্দি করায়। লেখক ওসমানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। একমাত্র সে-ই সমগ্র বিষয়টি অনুধাবনে সমর্থ হয়– 'জহির হাসান ছেলেটা আধুনিক বটে, যে নিজের মাথায় সর্বনাশ নিয়ে এতো বছরের অন্ধ কুসংস্কার ভেঙে দিতে পারে' (পৃ. ১৪৩)––

> সুফিয়ার চল্লিশা উপলক্ষে এতদিনকার কুসংস্কার ভেঙে সেই মাছ রান্না করে পুরো গ্রামবাসী খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে সবার চোখে জহির হাসান এক অলৌকিক মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। ছয় মাস রুটি গুড় খেয়ে ভেটকি মারা লোকজন যার তার মধ্যে শুধু অস্বাভাবিকতা খোঁজে। তন্দ্রায়ে জাগরণে সেই অলৌকিক মানুষের কাণ্ডকারখানা নিয়ে ভাবতে, গল্প করতে তারা বেশ আমোদ বোধ করে। জহির হাসানের অলৌকিক মানুষ বনে যাওয়ার পেছনে অবশ্য কারণ আছে। কথিত ছিলো এই দিঘির মাছের গায়ে যে হাত রাখবে এক সপ্তাহের মধ্যেই রক্ত বমি করে সে মারা যাবে। যা হোক, গ্রামবাসীর জীবনের ওপর দিয়ে করাতের মতো গেছে এই এক সপ্তাহ।' (পৃ. ১৫২)

মন্নাফ খাঁ এ ঘটনার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও জহিরের যুক্তির নিকট হার মানতে বাধ্য হয়। গ্রামবাসীর মনে তিন বুড়ি সম্পর্কিত ভীতিবোধ, আস্থা ও বিশ্বাস অনেকটাই ভেঙে পড়ে কাঁসা দিঘি থেকে মাছ ধরে তা খাওয়ার ঘটনায়।

এর ফলে তিন বুড়ির উদরপূর্তি ও দিনযাপন অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সেকারণেই কুঁজো বুড়ি গ্রামবাসীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, যদিও অন্য দুই বুড়ি 'মনে প্রাণে ধড়ে বিশ্বাস করে, কুঁজো বুড়ির আসমান সমান ক্ষমতা। সে এমন কিছু করার ক্ষমতা রাখে, যাতে আস্ত নয়নপুর ধ্বসে যেতে পারে' (পৃ. ১৫৬)। সে কুঁজোবুড়ির বাড়ি এসে তিন বোনের তথাকথিত অলৌকিক শক্তি এবং এর ওপর গ্রামবাসীর নির্ভরতাকে যেভাবে ব্যঙ্গ করে, তাতে বোঝা যায় নয়নপুরের লোকমানসে প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থা দিনদিন ক্ষয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় গ্রামবাসীকে নিজের দাপট স্মরণ করিয়ে দিতে কুঁজোবুড়ি ঘোষণা দেয়, সে হাওরে তুফানের কবলে ডুবে অবশেষে মৃত কিশোর কুতুবুদ্দিনকে পুনরায় জীবিত করবে। সে নাকি স্বপ্নে তাকে জীবিত করার মন্ত্র পেয়েছে। এক্ষেত্রে কুঁজো বুড়ি আরোপ করে বিশেষ শর্ত, যাতে প্রকাশিত হয়েছে তার কৌশলী মানসিকতা। সেটি হলো, 'বস্তাবন্দি জিনগুলোকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে গ্রামবাসীর কুতুবুদ্দিনপ্রাপ্তি ঘটবে' (পৃ. ১৮০)। অভাব-অনটন, দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীর অস্তিত্বসংকট যখন চরমে ওঠে, ঠিক সেই বৈরী পরিস্থিতিতে এ ঘোষণায় তারা বিমূঢ় হয়ে যায়। লোকমুখে কুঁজোবুড়ির ঘোষণা বিভিন্ন গুজবে পল্লবিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত এ রূপ পায় – আগামী অমাবস্যার রাতে জীবিত কুতুবুদ্দিনকে গ্রামবাসী দেখবে। এ ঘোষণার পূর্বে কুঁজোবুড়ি গ্রামের এক চাষী পরিবারের জিনে ধরা জনৈক যুবতীর চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছিল। কিন্তু গ্রামবাসী এজন্য তার প্রতি পূর্বের সমীহ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে কুতুবুদ্দিনকে জীবিত করার ঘোষণা দেয়। সে আরো জানায়, 'এই গ্রামের দুটি শিশুর একটিকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য ওর জন্ম মুহূর্তে ওর প্রাণের মধ্যে সে দিয়েছিলো হাওরের জল, আরেকটি মুমূর্ষু চল্লিশ বছর আগে তার জন্মের পর পরই মুমূর্ষু শিশুকে বাঁচাতে বুড়ি স্থাপন করেছিলো পাখির আত্মা। জন্ম মৃত্যু নিয়ে এতো যে ক্ষমতা রাখে সেই বুড়িকে কোন সাহসে গ্রামবাসী তাচ্ছিল্য করে' (পৃ. ১৮১)। গ্রামবাসী এর প্রতিবাদ জানায়। কেননা, ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী, 'আত্মা দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। বুড়ি খোদার ওপর খোদগিরি কীভাবে করে? বুড়ি জানায়, সে হাওরের জল আর পাখির আত্মা দিয়ে আল্লাহর পাঠানো মুমূর্ষু আত্মাকে বাঁচিয়েছিলো' (পৃ. ১৮১)। সে গ্রামবাসীকে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে জানায়, কুতুবুদ্দিনের জন্মের পর সে যখন মৃত্যুপথযাত্রী, সেই সংকটকালে তার মা কুঁজো বুড়ির নিকট ছেলেকে এনেছিল। সে তখন কুতুবুদ্দিনের মুখে হাওরের জল দিয়েছিল বলেই ছেলেটি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। অবশেষে হাওরে ডুবে যাওয়ার পরিণতিতে তার মৃত্যুকে কুঁজোবুড়ি এভাবে আখ্যা দেয়–'কুতুবরে তার হাওর মায়ে টাইন্যা নিছে' (পৃ. ১৮১)। কুঁজোবুড়ির দাবি অনুযায়ী, যাকে সে পাখির আত্মা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিল, সে হল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসমান। চল্লিশ বছর পূর্বে ভূমিষ্ঠ হবার পরপর সে অসুস্থ হলে ওসমানের মা কুসুমের কাতর অনুরোধে সম্মত হয়ে সে তার ছেলেকে স্তন্যপান করিয়ে (কিছুদিন পূর্বেই কুঁজো বুড়ি নিজের একমাত্র শিশু সন্তানকে হারিয়েছিল) বাঁচিয়ে তুলেছিল। সে ওসমানকে জানায়, তার রুগ্ন আত্মার ওপর ডাহুকের আত্মা স্থাপন করে কুঁজোবুড়ি তাকে সুস্থ করে তুলেছে। তবু গ্রামবাসী কুঁজো বুড়ির ঘোষণাকে অবিশ্বাস করে। কারণ, 'যেখানে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা বলে দিয়েছেন, মৃতের পুনরুজ্জীবন কখনো কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় সেইখানে বুড়ি এরকম আজব ঘোষণা কোন সাহসে দেয়' (পৃ. ১৮১)। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কুঁজোবুড়ির ক্ষমতা যাচাই করার জন্য– 'আমরা এতকাইল বুড়ির মায়ার জালে বান্দা পইড়া আছি, এ ক্ষেমতা হেয় না দেহাইতে পারলে আমরা তার রশির গেরো থাইক্যা মুক্তি পাই' (পৃ. ১৮২)। কিন্তু মেজবুড়ি ও ছোটবুড়ি যখন তাদের জানায় যে, কুঁজোবুড়ি কুতুবুদ্দিনকে জীবিত করে বস্তাবন্দি জিনগুলোকে আকাশে মুক্ত করে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, তারা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে যার ঘরে যা সম্বল ছিল, তা দিয়েই তারা তাকে তুষ্ট করতে মরীয়া হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় জটিলতা সৃষ্টি হয় তখন, যখন কুতুবুদ্দিনের মা, 'হাজার লোক বাড়ি জড়ো করে বলে, এই জাতীয় বেশরিয়তী কাজের শিকার সে বেঁচে থাকতে কুতুবকে হতে দেবে না' (পৃ. ১৮৩)। সে হুমকি দেয়, কুঁজো বুড়ি যদি কোনো বেশরিয়তি কাজ করে, তবে সে গলায় দড়ি দেবে। এমতাবস্থায় গ্রামবাসী কুঁজোবুড়ির কাছে অনুনয় করে, তার ঘোষণা ফিরিয়ে নিতে। সে দীর্ঘদিন ধরে এ সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু যেহেতু গ্রামবাসী তার শক্তি আর প্রতাপের প্রতি সংশয় পোষণ করেছে, তাই এর প্রতিকারের জন্য সে তাদের নতুন প্রস্তাব দেয়, 'আমি পাখির জান দিয়া যারে

বাঁচাইছিলাম তারে জিন্দা কৈরা তুলি? তার চৌদ্দগুষ্টিত কেউ নাই, হেয় আইলে গেরামের মাইনষের লাভ আছে' (পৃ. ১৮৩)। গ্রামবাসী ওসমানের পরিচয় জানে না বলেই কুঁজোবুড়ির পক্ষে এ কৌশল অবলম্বন সম্ভব হয়। ত্রিশ বছর পূর্বে দশ বছরের বালক ওসমান গুপ্তঘাতকদের দ্বারা মা-বাবার নিহত হওয়ার জেরে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সে যখন এতকাল পর গ্রামে ফিরে আসে এবং বিস্তর পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে গ্রামের প্রভাবশালী জোতদার মন্নাফ খাঁর নিকট নিজের পরিচয় উপস্থাপন করে, এ ঘটনা জেনে কুঁজো বুড়ি গ্রামবাসীকে উক্ত কৌশলে পরাস্ত করতে চায়। সে চেয়েছিল পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ওসমানের বিস্তর সম্পত্তিকে চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামবাসী অবস্থার উন্নতি ঘটাক। কিন্তু স্বভাবে আপসকামী, নতজানু ওসমান এ ব্যাপারে উদ্যোগী না হওয়ায় কুঁজো বুড়ি তাকে ধিক্কার দেয়। এরপর কুঁজো বুড়ি সিদ্ধান্ত নেয়, দীর্ঘকাল ধরে তাকে নিয়ে গ্রামবাসীর চেতনালোকে সৃষ্ট বিশ্বাস-সংস্কারের শৃঙ্খলকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে। একারণেই হাওরের জলে ডুবে সে আত্মহত্যা করে। নয়নপুরে শারীরিক অস্তিত্বের বিনাশ ঘটিয়ে সে অদৃশ্যভাবে গ্রামবাসীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যই এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কেননা দীর্ঘকাল ধরে তার প্রতি গ্রামবাসীর ভীতিবোধ, শ্রদ্ধা ও সমীহ বিলীন হয়ে যাক, কুঁজো বুড়ি তা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারেনি। মৃত্যুর পর নয়নপুরের বাসিন্দারা তো বটেই, এমনকি ঢাকা শহরের আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষিত ওসমানের মনেও সেই রহস্যময়ী নারী উদ্ভাসিত হয়েছিল মায়াবিনীর ছদ্মবেশে। গ্রামবাসী চাইলেও যুগ যুগ ধরে তাদের মনোলোকে কুঁজোবুড়ি সম্পর্কিত সংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করা যে সহজসাধ্য নয়, তা প্রতীয়মান হয় সেই নারীর কুহকী আচরণে--

> বুড়ি থুক করে ফুঁ দিয়ে হারিকেন নিভিয়ে ফেলে। বটগাছের চিতল চিতল পাতা ফুঁড়ে আঁধার ছায়া বিচ্ছুরিত করে। বুড়ি দুই হাত জড়ো করেঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সামনের ভেজা পাতায় আগুন ধরায়, বুড়ির হাত যে পর্যন্ত ঘোরে, সেই পর্যন্ত আগুন ... বুড়ি খিলখিল করে হাসছে, কুঁচকানো চামড়া খুলে বেরিয়ে আসছে ... জোয়ান সুন্দরী নারী ... চামড়া খুলছে, আগুন জ্বলছে... আর হি হি হাসি তরঙ্গিত হতে হতে বলছে, আয় শকুনেরা আয়, ওই অবিশ্বাসী গেরামবাসীর কইলজা ছিড়্যা খা ..হি..হি..হি..হি.. আলো আধারীর ঘোর আগুন ছায়ায বুড়ির চোখ দুটো হয়ে ওঠে রক্তের বল ... চারপাশ, ভূপৃথিবীতে এক শব্দ হি হি ..হি ..। (পৃ. ১৮৮)

এভাবেই নয়নপুরের বাসিন্দাদের লোকমানসে কুঁজো বুড়ি জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুত্তরকালেও অতিলৌকিক-রহস্যময় গালগল্প, রটনাশ্রিত সংস্কারের ভুবন গড়ে তোলে।

কুঁজো বুড়ির প্রশ্রয় লাভে সমর্থ এবং তার গোপন ক্রিয়াকলাপের এককালের সহযোগী চন্দ্রানীর সংসারজীবনের সংক্ষিপ্ত চালচিত্রে গ্রামীণ বাঙালি পারিবারিক পরিমণ্ডলে অনুসৃত গার্হস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বৈরিণী বেদেনী চন্দ্রানী এসবের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরক্ত না হলেও শ্বশুরবাড়ির মানুষের আচরণ ও ভাবনায় প্রভাবসঞ্চারক এসব সংস্কারকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেনি। বরং তার ভবিষ্যত জীবনের রূপরেখা নির্ধারণে এর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তৃতীয় স্বামীর সঙ্গে চন্দ্রানীর কয়েক বছরের দাম্পত্যজীবন মোটেই স্বস্তিদায়ক ছিল না। পরপর দুবছর গর্ভপাতের পর তৃতীয় বছর একটি বিকলাঙ্গ শিশু ভূমিষ্ঠ হবার দুদিন পর মৃত্যুবরণ করলে চন্দ্রানীর স্বামী, শাশুড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে থাকে। সাংসারিক কাজে মনোযোগ দিলেও এবং সকলের সেবাযত্নে সময় অতিবাহিত করলেও তার প্রতি পরিবারের সদস্যদের বিতৃষ্ণা বাড়তে থাকে। সে দেখতে কালো বর্ণের এবং তার বাবার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়, পাশাপাশি পরিবারের প্রত্যাশামাফিক সুস্থ একটি ছেলের জন্ম দিতে অপারগ, এসব কারণে তাকে প্রতিনিয়তই বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। চন্দ্রানীর 'ভালোগর্ভ হওয়ার বাসনায় মোমবাতি মানত হয়।' (পৃ. ১০৮)। অন্যদিকে, তার প্রতিবেশী পশ্চিমের বাড়ির বাসিন্দার একচোখবিশিষ্ট বিকলাঙ্গ শিশুটি জন্মাবার পরই কারবারের অবস্থার উন্নতি ঘটায় আশেপাশের সকলেই তাকে পয়মন্ত ভেবে 'ঝাঁক বেঁধে টাকা দিয়ে যায়। কী সব নাকি সুফল মেলে' (পৃ. ১০৮)। শুধু তাই নয়, সেই বাড়ির আশেপাশে শামিয়ানা টানিয়ে দোকানপাটও বসে যায়। চন্দ্রানীও এমন একটি শিশুর প্রত্যাশী, যাকে নিয়ে সে চলে যাবে এমন কোনো অচেনা স্থানে যেখানে বেঁচে থাকতে তার

কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু পারিবারিক অশান্তি আর সন্তানকে হারানোর দুর্বিষহ বেদনা অচিরেই তাকে মনোবিকারগ্রস্ত করে তোলে। এর ধারাবাহিকতায় একপর্যায়ে সে স্বপ্নে দেখতে পায় বীভৎসাকৃতির এক প্রাণীকে যে তার বিকলাঙ্গ সন্তানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর কেউ দেখতে এবং তার অস্তিত্ব অনুধাবনে সমর্থ না হলেও চন্দ্রানী তার মায়াভরা দুচোখের দৃষ্টি ও আহ্বানকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। সেকারণেই যখন তখন অন্যদের সামনে অকারণে হাসাহাসি, উদ্ভট সব কথা বলা এবং অসংলগ্ন আচরণের ফলে সকলের ধারণা জন্মে, তার ওপর অশরীরীর প্রভাব রয়েছে। ইতোমধ্যে চতুর্থ বার বিকলাঙ্গ আরেক সন্তানের জন্মদান ও তার মৃত্যুর ঘটনায় বাড়িতে জনৈক পীরকে ডেকে আনা হয় চন্দ্রানীকে সুস্থ করার অভিপ্রায়ে। সে চন্দ্রানীকে পর্যবেক্ষণপূর্বক জানায়--

> নারীর মধ্যে আছে দুই জাত। সুজাত। কুজাত। এরপর সে সুজাত নারীর বিশ্লেষণে বসে। ... সেই নারীর শরীরে সারাক্ষণ গোলাপ ফুলের গন্ধ। পদক্ষেপে শব্দ নেই, কম খায়, কম ঘুমায়। ...সে নারী কখনো প্রেয়সী, কখনো দাসী, কখনো মাতা ... শেষে আসে কুজাত নারীর প্রসঙ্গ। ... এ জাতের নারী দেখতে কুৎসিত হয়, মরা ইঁদুরের মতো গন্ধ ছড়ায়, এদের গর্ভে কখনোই সুসন্তান হয় না। ... কুজাত নারী ডাইনির বংশধর। প্রাচীনকালে যে ডাইনিদের পুড়িয়ে মারা হতো তাদের অনেক বংশধর সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এরা দেখতে মেয়ে মানুষের মতো। কিন্তু এদের সমস্ত শরীরে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ। শ্রীহীন এদের আচরণ, চলাফেরা।' (পৃ. ১১০-১১১)

পীরের অভিমত অনুযায়ী, চন্দ্রানী ডাইনির বংশধর। সেকারণে সে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগৃহীত হয়। অন্য সবাইকে দেখে একপর্যায়ে চন্দ্রানীর মধ্যেও প্রতিবেশীর একচক্ষুবিশিষ্ট ছেলেটির উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ দান করার আগ্রহ জাগে, তার প্রতি সকলের বৈরী ও ক্রুদ্ধ মনোভাব বদলের অভিপ্রায়ে। কিন্তু সেখানে তার প্রবেশ নিষেধ; কেননা সে ডাইনি হিসেবে সকলের ঘৃণার পাত্রী। পীরের অভিমত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীর সঙ্গে সহবাসে গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকতে অসামর্থ্যের পরিচয় দেয়ায় সকলেই তার প্রতি এরূপ নেতিবাচক মনোভঙ্গি পোষণ করে। পুনরায় সন্তানধারণ করায় তার স্পর্শ পর্যন্ত কলুষিত বিবেচিত হয় শাশুড়ির নিকট, এমনকি আশেপাশে তার উপস্থিতিও অন্যদের নিকট অসহ্যকর হয়ে ওঠে। ফলে তার রান্না মুখে দেয়া দূরের কথা, তার পদচ্ছাপের দাগকেও অশুভ, বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে শাশুড়ি তাকে গৃহবন্দি করে রাখে। 'মুসলমানের নাম কেউ চন্দ্রানী রাখে? হায় হায় ... শাশুড়ির কান্নায় সীমাহীন বেদনা আমার বড় পুত্র, হায় বড় পুত্র, ... তোর কপালে এই ছিলো, কী চলার ধরন, হাসি দেখলে মনে হয় বান্দরের ছাও কানতাছে, ডাইনি, হায় বড় পুত্র, হায় আমাগোর ললাট লিখন, মাগী তোর মুখে বিষ বিষ ...'(পৃ. ১১২)। কীভাবে চন্দ্রানীকে বশীভূত করা যায় সে ব্যাপারে পীরের মাধ্যমে তার শ্বশুরবাড়ির স্বজনেরা সলাপরামর্শ করে। তারা তাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করার কথা ভাবলেও পীর জানায়, 'এই ধরনের জীবকে তাড়িয়ে দিলে পরবর্তী সময়ে তারা বদজিন হয়ে অদৃশ্যভাবে এই বাড়ির ক্ষতি করতে পারে। নিচজাতের দাসী পরিবারের জন্য ক্ষতিকর নয়। একে এ বাড়ির দাসীর মর্যাদায় রাখা যেতে পারে' (পৃ. ১১৪)। কিন্তু সেই অবস্থাতেই কামুক স্বামীর ভোগলিপ্সার পরিণতিতে চতুর্থবারের মতো চন্দ্রানী গর্ভবতী হয় এবং পুনরায় মৃত সন্তান প্রসব করে। এরপর অসুস্থ চন্দ্রানী স্বামীগৃহ ছেড়ে প্রতিবেশী বিধবা অপেরা দিদির সহায়তায় চিকিৎসা গ্রহণ করে বেদেবহরে ফিরে যায়। উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে কুঁজোবুড়ি ও চন্দ্রানীর জীবনবৃত্তান্তের সারৎসার অনুধাবনের প্রচেষ্টায় ওসমানের মনোলোকে জাগ্রত হয় এ দুই নারীর ব্যক্তিত্বময় মনোভঙ্গির স্বরূপ। সে স্পষ্টতই উপলব্ধি করে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে ঘরে-বাইরে, সমাজে-সংসারে কীভাবে প্রতি পদে নিপীড়িত, এমনকি অবদমিত থাকতে হয়। তার মতে, 'ছলাকলাটা মেয়েদের নিজের দৈন্য ঢাকার আব্রু। এই পুরুষতান্ত্রিক পৃথিবীতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যই হয়তো বোঝার বয়স থেকে মেয়েরা ছলনাটাকে রপ্ত করে' (পৃ. ১৮৬)। কেননা, তার ব্যক্তিত্বের জাগৃতি থেকে প্রজ্বলিত হতে পারে যুগ যুগ ধরে নারীসমাজের বঞ্চনা ও অবরুদ্ধতার বিরুদ্ধে দ্রোহের আগুন, যা পুরুষতন্ত্রের জন্য সর্বদাই হুমকিস্বরূপ। সেকারণেই লোকসমাজে প্রচলিত বিবিধ বিশ্বাস-সংস্কারকে হাতিয়ার করেই কুঁজো বুড়ি নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল অস্তিত্বসংগ্রামের লড়াইয়ে। অন্যদিকে চন্দ্রানীও সামাজিক সংস্কার ও অনুশাসনকে

মান্য করেই চতুর্থবার সংসারজীবনে স্থিত হতে চেয়েছে, নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তথাকথিত কল্যাণকামী-শ্রীমণ্ডিত রূপে উদ্ভাসিত হবার প্রচেষ্টায়।

৩. লোকসাহিত্য-- নয়নপুরের বাসিন্দাদের চেতনালোকে সন্নিহিত রয়েছে রূপকথা-লোককথা, কিংবদন্তি ও মন্ত্রের উপস্থিতি, যেসবের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাদের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার। বহুযুগ ধরে লোকমুখে প্রচলিত এসব অনুষঙ্গ তাদের ভাবনাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

৩.১ রূপকথার অনুষঙ্গ-- এ উপন্যাসে লেখকের বর্ণনা এবং বিভিন্ন দৃশ্য ও পরিস্থিতির বিবরণে, কুশীলবদের মনোভাবনায় বারবার বাংলা রূপকথা-লোককথার বিভিন্ন অনুষঙ্গ নেপথ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকেছে। বিজ্ঞানচেতনাশূন্য আদিম ধরনের প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনধারণ এবং নিয়তিনির্ভর লোকসমাজে এসব প্রসঙ্গ শুধু চিত্তবিনোদনের উপাদান বা মৌখিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসেবেই বিবেচিত হয় না। বরং এসবের মাধ্যমে তাদের আবেগ-সংবেদনা এবং অন্তর্বাস্তবতাও রূপকথা-লোককথার বিভিন্ন অনুষঙ্গের প্রতীকে, রূপকীয় তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেমন--

> নিজেকে তার রাজা মনে হতো। মনে হতো এটা রাক্ষস জলের তাকে নিয়ে আলাদীন দৈত্য খেলা। (পৃ. ১৩)
>
> বর্ষা সরে গেলে ... এক বিশাল রাক্ষস এসে এক চুমুকে প্রকাণ্ড সমুদ্রের মতন জলরাশিকে গিলে একেবারে সাফসুতরা জমিন বানিয়ে ফেলে (পৃ. ২০)
>
> হাওরের ওপারের দক্ষিণ পূবের গ্রামগুলো রাক্ষুসী ছোবলের কোপে কোপে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভেঙে পড়ছে। (পৃ. ২৪)
>
> তারা ঘরে এসে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর মতো চাপা কণ্ঠে কুজোবুড়ির কাছে সব বয়ান করার পর বুড়ির যদি মর্জি হয় তবে সে দরজার বাইরে পা রেখে নিঃশব্দে দক্ষিণের পাকুড় গাছটার নিচে গিয়ে বসে। (পৃ. ৩০)
>
> চাঁদের মাথায় সারাক্ষণ পাখি ডানা ঝাপটায়, ভ্রমরের মধ্যে যেমন রাক্ষসের প্রাণ (পৃ. ৪৫)
>
> স্বামীর স্মৃতি চাচির মনে গল্পে শোনা কোনো দৈত্য অথবা রাজকুমারের মতো। (পৃ. ৫৬)
>
> কঠিন কালো দৈত্যের মতো গাছ মাটি খাবলে খাবলে এগিয়ে আসা বাতাস তিন কন্যার জন্য কান্নার সাথে সাথে হাওরের জলের মধ্যে থিতিয়ে গেলো। (পৃ. ৯২)
>
> শাশুড়ি তো নয়, ঠাকুরমার ঝুলির রাক্ষুসী। দশটি পুরুষ ছা বিইয়ে মহিলার বিশাল বপু কেমন ঝুলঝুলে হয়ে উঠেছে। ঘুমাক্রান্ত চোখে আগুন জ্বলজ্বল করে। (পৃ. ১০৯)
>
> উত্তরের যে অংশটাকে সে নদী হিসেবে পেয়েছিলো তার মধ্যেও আজ অন্য চেহারা। মুহূর্তে যেন আলাদীন দৈত্য এসে নদীর জল খেয়ে সেখানে পলিমাটি দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছে নানা কিসিমের ঘর। (পৃ. ১২০)
>
> রাতেরবেলা কুতুব ওর কাছে জ্যোৎস্না রাতের পরী হয়ে আসে। ওর হাতের বৈঠাকে মনে হয় দুটো পরীর ডানা। (পৃ. ১২১)
>
> বাথরুমে যাওয়ার জন্য মধ্যরাতে দরজা খুলতেই ওসমান দেখে উস্কো চুলের মন্নাফ খাঁ সাক্ষাৎ ভূতের মতো তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। (পৃ. ১৫৪)
>
> পথ হারিয়ে কোনো রাজপুত্র হয়তো আউলা বাউলা বনে ঘোল খেতে খেতে হয় রাক্ষস না হয় রাজকন্যার প্রাসাদের দূরবর্তী আলো দেখতে পেলো। (পৃ. ১৯১)

৩.২ কিংবদন্তি-- নয়নপুর গ্রামের কাসার দিঘি সম্পর্কে লোকমুখে বহুদিন ধরে প্রচলিত কিংবদন্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে সেকালের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কিছু প্রসঙ্গ। জমিদারী প্রথার ক্ষয়িষ্ণুতার দিকটি

প্রতীয়মান হয় অর্থের অভাবে নিজ বোনকে জনৈক তরুণ জমিদারের বিয়ে দেবার অসামর্থ্যের ঘটনায়। শুধু তাই নয়, সাংসারিক অনটনের তাড়নায় রুটি খেয়ে কোনোমতে ক্ষুন্নিবৃত্তিতে বাধ্য হওয়া, এমনকি শেষ পর্যন্ত অপমানের গ্লানি সইতে না পেরে দিঘির জলে আত্মহত্যার ঘটনা থেকেও বোঝা যায়, এ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অলৌকিক-অতিলৌকিক কাহিনী, গালগল্প, যা জমিদারের স্বপ্নদর্শনের ঘটনায় এ উপন্যাসে বিধৃত। এসবে উপজীব্য হয়েছে সামাজিক জীবনে অনুসৃত নৈতিকতা এবং পরোপকারের বিভিন্ন দিক। দিঘির তলদেশ থেকে বাদুড়ের মতো ডানাবিশিষ্ট, কাতলা মাছের মুখসদৃশ কালোপোশাকধারী ব্যক্তির জমিদারের রুটি খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর বিনিময়ে অজস্র কাঁসার থালা-বাসন উপহার দেবার ঘটনায় প্রতিদানের বিষয়টি আভাসিত হয়। তেমনিভাবে, তার শর্ত অনুযায়ী, দিঘিতে মাছ শিকার বন্ধ করা হলে গ্রামবাসীদের অভাব-অনটন ও বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভের নিশ্চয়তা এবং এর অকার্যকারিতায় বিবিধ প্রতিকূলতার আশঙ্কা থেকেও বোঝা যায়, লোকসমাজে প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত মূল্যবোধের গুরুত্ব। ব্যক্তিমানুষের অসততা যে সমষ্টিজীবনের সংহতি ও ঐক্যবদ্ধতা প্রতিষ্ঠায় ঘটায়, সেই প্রসঙ্গও এ কিংবদন্তিতে ফুটে উঠেছে--

> সেই মাছমুখো মানুষ আরও বলে, তারা দীর্ঘদিন অনাহারে ছিলো। জমিদারের রুটি সেদিন তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এরপর সে জমিদারের কাছে এইসব কিচ্ছুর বিনিময়ে একটাই শর্ত আরোপ করে। কেউ কোনোদিন যেন সেই দিঘির একটা মাছও হত্যা না করে। যদি এর অন্যথা হয়, সারাগ্রামে সমূহ সর্বনাশ নেমে আসবে। আর যদি সবাই এই শর্ত মানে, তবে গ্রামের যে কারো বিয়েতে কারো কোনো খাদ্যের পেছনে টাকা ঢালতে হবে না। বিয়ের সময় পুকুর থেকেই শত শত থালাবাসন ভেসে উঠবে। এবং মেহমানদের সামনে যে যে খাবার খেতে চাইবে তা-ই সুসজ্জিত হয়ে থাকবে। স্বর্ণমোহর পাওয়ার পর সেই গরিব ছেলে অঞ্চলে এই বিষয়ে কড়া আইন জারি করলে বহু বছর সেই দিঘি মানুষের এইরকম সেবা করে গেছে। তবে কথিত আছে, বিয়ের পর থালাবাসনগুলো সব গুণে গুণে সেই দিঘিতে ভাসিয়ে দেয়ার শর্ত ছিলো, কিন্তু একবার এক বদ লোক খাওয়া শেষে একটা গ্লাস আর থালা চুরি করার পর সেই দিঘি মানুষের এই সেবা বন্ধ করে দেয়। ততোদিনে অবশ্য জমিদার মারা গেছে। তার নাতির আমলে এইরকম অঘটন ঘটার পর থেকে মানুষ এই দিঘির মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। (পৃ. ৪৪)

৩.৩ মন্ত্র

> আউলা বাতাস
>
> জাওলা বাতাস
>
> বদ বাতাসের মা,
>
> বুকের মইদ্যে তাগদ থাকলে
>
> খা আমারে খা
>
> ডরাস যদি খানকি মাগি
>
> ভাতার তলে যা। (পৃ. ৯)

৪. লোকবৃত্তি-- এ উপন্যাসে নয়নপুরের গ্রামীণ মুসলমান কৃষক সমাজের পাশাপাশি বেদে সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমান জীবনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। আদিম অরণ্যময় পরিবেশে যুথবদ্ধভাবে ভ্রাম্যমান জীবনে অভ্যস্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র লোকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের উপস্থিতি বর্তমানেও লক্ষণীয়। তাদের রয়েছে নিজস্ব ধরনের সমাজ ও এর অন্তর্গত রীতিনীতি। বেদেদলের সর্দারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দল পরিচালিত হয়। তার অধীনস্থরা নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকে। জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলকে তারা অবলম্বন করে। শুধু তাই নয়, পরিবার গঠন, সংসারের দায়িত্ব পালন এবং দলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক

সদস্যের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা থেকেও অনুধাবন করা চলে এ সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্যিক পরিচয়ের স্বরূপ। একই দলভুক্ত নারী-পুরুষের সম্মিলিতভাবে জীবিকা নির্বাহ এবং দিনযাপনের ক্ষেত্রেও রয়েছে নির্দিষ্ট অনুশাসন ও বিধি-নিষেধ। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বেদেনী চন্দ্রানী যে দলভুক্ত, এর অন্তর্গত সদস্যদের জীবিকা নির্বাহ ও নিত্যদিনের বিবিধ কর্মকাণ্ড থেকে উক্ত সম্প্রদায়ের লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে বাসস্থান ও জীবিকা নির্বাহের মানদণ্ডে স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে। তারা জলবেদে ও স্থলবেদে এ দুই ভাগে বিভক্ত। চন্দ্রানীর দল জলবেদে বলে বছরের বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকায় ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করে। যেখানে আস্তানা ফেলে নিরাপদে কিছুদিন অবস্থান করা যায় এবং জীবিকা নির্বাহ করা চলে, সেখানে তারা সাময়িকভাবে বসবাস অব্যাহত রাখে। নিরাপত্তা বা অন্য কোনো কারণে দলের কার্যক্রম বিঘ্নিত হলে তারা সেখান থেকে আস্তানা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যায়। তাদের পেশা হিসেবে রয়েছে বনজঙ্গল থেকে সাপ ধরে সেটিকে পোষ মানানো এবং এর খেলা দেখিয়ে দর্শকের নিকট থেকে অর্থ উপার্জন। এর পাশাপাশি সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসা এবং তাবিজ-কবচ-মাদুলি দিয়ে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের জন্য মন্ত্র-তন্ত্রের চালান, দাঁতের পোকা ফেলা প্রভৃতিও তাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। নয়নপুর গ্রামে সেকারণেই তারা বছরের অধিকাংশ সময় অবস্থান করে। নিরাপত্তাজনিত কারণে এবং মাস্তানদের উপদ্রব না থাকায়, পাশাপাশি গ্রামবাসীর সঙ্গে হৃদ্যতা সৃষ্টি হওয়ায় একপর্যায়ে চন্দ্রানীর দলের সর্দারও নদীপথের অনিশ্চিত ভ্রাম্যমান জীবন ছেড়ে এ গ্রামে জমি কিনে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে এদের বিপরীতে রয়েছে স্থলবেদে সম্প্রদায়, যারা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে জমি কিনে বসতি গড়ে তোলে এবং বিশেষভাবেই কবিরাজির ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। চন্দ্রানীর প্রথম স্বামী আব্বাস বেদে এ সম্প্রদায়ের। মানুষের দাঁতের পোকামাকড় ফেলা, শরীরে বিষরক্ত জমলে শিঙ্গা দিয়ে টেনে বের করা, ঘাসের ফাঁকে পোকা লুকিয়ে রেখে দাঁতের ব্যথায় কাতর ব্যক্তির চোখে ভেলকিবাজি দেখিয়ে সেগুলোকে তার সামনে টেনে বের করে কবিরাজি ওষুধ দিয়ে পয়সা আদায় এসবই তার দলভুক্ত বেদেদের কাজ। চন্দ্রানীর শত অনুনয়েও তাই সে পৈতৃক পেশা ছেড়ে জলবেদেদের সাপসংলগ্ন পেশায় যুক্ত না হওয়ায় একপর্যায়ে তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। চন্দ্রানীর দলভুক্ত বেদেদের জীবন ও সংসার উভয়ই নৌকানির্ভর, জলসংলগ্ন। লেখক জানিয়েছেন, 'নৌকার মধ্যেই ছেলেপুলে, সবার আস্ত সংসার। দেখা গেলো নৌকা ভাসতে ভাসতে উজানি স্রোতে আসমান ছুঁয়েছে, তখনই কারও অস্তিত্বে খসে পড়লো উন্মাতাল ভ্রূণ। এইভাবে জলে জলে বংশ বৃদ্ধি। নিচে পাটি, তার ওপর চেঁড়া কাঁথা বালিশ। মাঝখানে তক্তার খিড়কি। ওটাই ওদের দরজা। সন্তানদের একপাশে দিয়ে বন্ধ দরজার ওপারের পাটিতে স্বামী স্ত্রী ঘুমায়' (পৃ. ১৭)। জলবেদেদের কাজের মধ্যে নির্দিষ্ট বিভাজন রয়েছে। যেমন বনজঙ্গল থেকে বিষাক্ত সাপ ধরার কাজটি সবসময় দলের পুরুষেরা করে। এরপর সেটির কোমর ভেঙে বিষদাঁত উপড়ে ফেলে বেদেনীদের দেয়া হয় ঝাঁপিতে পোষ মানিয়ে সাপের খেলা দেখানোর জন্য। কাজেই কোনো নারী যদি এ ধরনের দুঃসাহসী কাজ করতে সচেষ্ট হয় এবং এক্ষেত্রে সফল হয়, তবে তার সাফল্যকে দলের সকলেই নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। এর মূলে রয়েছে নারীর প্রতি পুরুষের অপরতাবোধ তথা পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি। লোকসংস্কারবশত তারা সেই বেদেনীর স্বভাবে আবিষ্কার করে ডাইনিসুলভ অতিমানবিক শক্তির অস্তিত্ব এবং যে কোনো অজুহাতে তাকে কাবু করতে তারা সচেষ্ট থাকে। একারণেই চন্দ্রানী যখন নয়নপুরের গভীর জঙ্গলে একাকী নতুন মন্ত্রপূত কাপড়ের গিঁট পরনের শাড়িতে বেঁধে সবার অজান্তে একটি বিষাক্ত কালসাপ ধরতে উদ্যোগী হয়েছিল, এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সে শঙ্কিত ছিল--

> সর্প দংশনে আজ সে মারা গেলে আজ জীবনের সবচাইতে শেষ এবং বড় অঘটন। আর যদি ওইটার টুঁটি চেপে নাচাতে নাচাতে সে বহরের মধ্যে ফিরে যায়, বহরের কেউই একজন নারীর এ জাতীয় বীরত্বকে সহজভাবে নেবে না। তারা এর মধ্যে আবিষ্কার করবে চন্দ্রানীর ডাইনি সুলভ কোনো শক্তিকে, এরপর তারা ক্রমাগত চন্দ্রানীর মধ্যে আবিষ্কার করবে সেই বিষসাপের ছায়া। তারা ক্রমে ক্রমে একজোট হয়ে কী করে চন্দ্রানীর বিষদাঁত ফেলে তাকে অসাড় আর মৃতপ্রায় করে তোলা যায়, সেই চেষ্টা করবে।' (পৃ. ১৭-১৮)

বেদে সমাজে নারীর অবস্থান যে পুরুষের সঙ্গে প্রতিতুলনায় প্রান্তিক, চন্দ্রানী সম্পর্কিত উক্ত দৃষ্টান্তের পাশাপাশি এর আরো নমুনা প্রতিফলিত হয় তাদের মান্য অনুশাসনে। স্বভাবে কিছুটা উদ্দাম, খোলামেলা এবং কামুক পুরুষদের প্রলুব্ধ করে অর্থ আদায়ের প্রবণতা থাকায় বেদেনীদের প্রতি দলীয় অনুশাসন বরাবরই কঠোর। চন্দ্রানীর অনিন্দ্য দেহবল্লরীর প্রতি আসক্ত একাধিক পুরুষের প্রতি তার ছলনাময় আচরণ থেকে প্রতীয়মান হয় এ সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের বেপরোয়া, উদ্যত মনোভঙ্গির স্বরূপ। 'চন্দ্রানী বেদে মেয়েদের সাথে শহরতলীর পাশে বাঁধা নৌকা থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সাপ দেখিয়ে বেড়ায়। স্বামীর শরীরের স্বাদ পেয়ে ফিরে আসা চন্দ্রানীর নখরামি বাড়ে। পুরুষরা তার পেছন পেছন ছোঁক ছোঁক করে হাঁটে। তাদেরকে উস্কে উস্কে চন্দ্রানী হাসিতে ঢলে পড়ে। নানা ভঙ্গিতে গা মোড়ায়। কোনো পুরুষ যখন আরেকটু এগিয়ে ওদের পেছন পেছন কিছুটা নির্জনে চলে আসে, চন্দ্রানী খা খা খা বখখিলারে কাঁচা ধইরা খা–বলে বাক্স থেকে মুহূর্তে একটা কাল নাগিনী বের করে সেই পুরুষদের গায়ে ছুঁড়ে মারে। মুহূর্তে ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা পুরুষ চোঁ চোঁ দৌড় দেয়। এই কাণ্ড দেখে বেদে মেয়েদের হায়রে সে-কী হাসি' (পৃ. ৩৬)। একারণে দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্দার বিধান জারি করে, যত জরুরি কাজই হোক না কেন, বেশি রাতে কোনো নারীর বহরে ফেরার শাস্তি অত্যন্ত নির্মম, এমনকি তাকে দলচ্যুত করার দৃষ্টান্তও রয়েছে। এর উদাহরণ স্বয়ং মর্জিনা। একবার চলার পথে পা ক্ষতবিক্ষত হলে সে পুকুরঘাটে ঔষধিলতা খুঁজতে যায়। তাকে নির্জনে পেয়ে চারজন লম্পট ধর্ষণ করে। এরপর সে রাতে বহরে ফিরে এলেও সারারাত তাকে আস্তানার বাইরের বসে রাত কাটাতে হয়। পরদিন সকালে দলের সকলের সামনে সর্দার সংঘটিত ঘটনার জন্য তার কাছে ব্যাখ্যা চায়। 'সর্দার তাকে নানা কায়দায়, নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে পরীক্ষা করে দেখেছে, সে খারাপ কোনো কাজে বাইরে ছিলো কি-না, তার সতীত্ব ঠিক আছে কি-না। সর্দার যদি সিদ্ধান্তে আসতে পারে, কন্যা নিরপরাধী, তবেই তাকে এক্ষেত্রে বেদে সমাজে আশ্রয় দেয়া হয়। যদি মেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কথার পারম্পর্য ঠিক রাখতে না পারে, তবে তাকে কখনো কখনো সমাজচ্যুতও করা হয়' (পৃ. ১৮-১৯)। সেকারণেই নির্জন বনে সন্ধ্যা নেমে আসায় কালসাপ ধরতে ব্যর্থ চন্দ্রানী মরীয়া হয়ে বহরে ফিরে আসে, যেন তাকেও মর্জিনার মত দল থেকে বহিস্কৃত হতে না হয়। এ নিয়ম অমান্য করার সামর্থ্য অর্থাৎ সর্দারের আদেশের বিরোধিতা করা দলের কারো পক্ষে দুঃসাধ্য। কারণ 'বেদেরা একজন আরেকজনকে খুন করলেও কোর্ট কাছারিতে যাওয়ার নিয়ম নেই। সর্দারই এখানকার সব বিচার করে। সর্দার যদি বলে, সাতদিন কেউ বেরোতে পারবে না, তবে সবাইকে সেই নিয়মই মানতে হয়।' (পৃ. ১৭৮-১৭৯) এসব ঘটনায় আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের রূপ পরিস্ফুট।

এ উপন্যাসের ৪৮ পরিচ্ছেদে সাপে কাটা রোগীকে বেদেদের চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। নয়নপুরের জোতদার মন্নাফ খাঁর তৃতীয় স্ত্রী বানেছাকে সাপ কামড়ায়। খবর পেয়ে চন্দ্রানীর দলের সর্দার সঙ্গীদের নিয়ে সাপ ধরার সরঞ্জামসহ সেখানে যায়। সাপ বানেছার পায়ে কামড় দিলে তার চিৎকার শুনে মন্নাফ খাঁর প্রথম স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর ওপর শক্তভাবে কাপড় দিয়ে গিঁট দেয়, যেন বিষ শরীরের উপরিভাগে উঠে যেতে না পারে। এরপর বানেছা একপর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। চন্দ্রানী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে নিরীক্ষা করে দেখে, বানেছার পায়ের পাতাসংলগ্ন গিরার নিচে গোখরার বিষদাঁতের কামড়ে ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে। 'অচেতন বানেছার হাঁটুর নিচটা ব্লেড দিয়ে কেটে চেপে চেপে বিষরক্ত বের করে চন্দ্রানী। গলার ভেতরে আলজিভের আঁটুনি দিয়ে দম আটকে আটকে মুখ দিয়ে টেনে বের করে বিষরক্ত। এক ফোঁটা পেটে গেলে নিজের জীবনেরই সর্বনাশ। চন্দ্রানী পটিয়সী। মুখ কুলকুচি করে সে মন্নাফ খাঁর হতবিহ্বল মুখের দিকে তাকায়' (পৃ. ১৭৮-১৭৯)। বেদেদের ঐতিহ্যগত পেশা একপর্যায়ে সংকটের মুখোমুখি হয়। কারণ, সামাজিকভাবে এ বৃত্তিকে মর্যাদাপূর্ণ বলে কখনোই স্বীকার করা হয় না। বরং এদের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অবজ্ঞাপূর্ণ, উপেক্ষাসূচক। ফলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য কেউ কেউ বিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়, কেউ বা অর্থোপার্জনের তাগিদে তাদের গার্মেন্টসে ও কুলিগিরিতে পাঠায়। এভাবেই তাদের ঐতিহ্যগত পরিচয় ভাঙনের সম্মুখীন হয়। তাছাড়া প্রযুক্তির উৎকর্ষ এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের

ফলে চিকিৎসাবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ায় গ্রামের মানুষ কবিরাজি ও সাপুড়েদের হাতুড়ে চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। লেখক জানিয়েছেন, 'পূর্বপুরুষের পেশা ঐতিহ্য এই নিয়ে কোনো মায়াবেদনা বেদেদের মধ্যে নেই। ওদের কথা হলো, বয়স হৈছে, সমাজে মরার বিনিময়ে হৈলেও সম্মানডা চাই, ছেলে পিওনের চাকরি করলেও বাইদ্যার চাইতে ঢের বেশি তার সম্মান' (পৃ. ১৪০)। সেকারণেই উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে স্বভাবস্বৈরিণী চন্দ্রানীকেও চতুর্থ স্বামীর সঙ্গে সংসারযাপনে মনোনিবেশ করতে হয়। এভাবেই এ উপন্যাসে লোক সম্প্রদায়ভুক্ত বেদেদের সংগ্রামশীল জীবনের চালচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিসরে রূপায়িত হয়েছে।

৫. লোক-উৎসব-- এ উপন্যাসে লোকউৎসব হিসেবে মেলার উল্লেখ রয়েছে। নতুন ধান কাটা হলে নয়নপুর ও এর পাশের গ্রামগুলোতে নবান্ন উৎসব শুরু হয়। এ উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে বিক্রেতারা বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে মেলায় আসে। কেননা, এ সময় গ্রামবাসী নগদ টাকা না থাকলেও নতুন ধানের বিনিময়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় ও শখের জিনিসপত্র কেনে। কেউ কেউ এক গামলা ধান দিয়ে এক ডজন রঙিন কাঁচের চুরি কিনেই আহ্লাদিত কণ্ঠে অন্যদের জানায়, 'আল্লায় ধান দিছে ... হেই আসমান ফুঁইরা আসা ধান দিয়া যা কিনি তা-ই লাব' (পৃ. ১৯৮)। মেলা উপলক্ষে মনিহারী দোকানে পসরার পাশাপাশি বেদেনীদের সাপের খেলা, বাজিগরদের বানরের খেলা, পুতুলনাচের আসর, পুঁথিপাঠের আসর, জাদুকরের জাদুর খেলার আসর প্রভৃতির সমাবেশে নয়নপুর গ্রামের নিস্তরঙ্গ রূপ মুছে হৈ-হুল্লোড় ও কোলাহল জাগ্রত হয়। বাসিন্দারা বহুদিন পর মিলিত হয় প্রাণের উল্লাসে, মেতে ওঠে হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ আয়োজনে। ওসমান ছেলেবেলায় জাদুকরের খেলায় বিমোহিত হত। স্থানীয়ভাবে সে 'হিরালি' নামে পরিচিত। 'ঘরে ঘরে ধান তুলে সে যখন দেখতো আসমান গর্জে উঠেছে, দূরের কোনো দৈত্য এসে ধানক্ষেত মাড়িয়ে যাবে বলে ঘরে ঘরে টিন পেটানো হচ্ছে' (পৃ. ১৯৮)। তখন সে শিলাবৃষ্টিকে ভর্ৎসনা করে এর প্রতি ধান ছিটিয়ে দিত। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেলে হিরালী ছিটিয়ে দেয়া ধান কুড়িয়ে নিত, এমনকি গ্রামবাসীর নিকট থেকেও ধান ভিক্ষা করত। ভিক্ষার ধান ব্যতীত এ কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয় বলেই সে কারো চুরি করা ধান গ্রহণ করত না। যদিও শিলাবৃষ্টির কবল থেকে ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেত পাহারা দেয়াই তার প্রধান কাজ, তবু সে ভেলকিবাজি দেখিয়ে দর্শককে চমকিত করে তোলে। গাঁজা খেয়ে টলতে টলতে সে ধান ছিটিয়ে দিলেই সেগুলো উড়তে উড়তে খই হয়ে যায়। শুধু ওসমান নয়, গ্রামবাসীর নিকট তার পরিবেশিত জাদুকরী এ খেলার প্রতি আগ্রহ প্রবল। মেলায় বিভিন্ন ধরনের খেলা নিয়ে পসারিরা মনোহারি দোকানে পসার জমায়। এভাবে মেলা হয়ে ওঠে তাদের চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম।

৬. লোকভাষা-- এ উপন্যাসে লেখক ময়মনসিংহের গ্রামীণ লোকভাষাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন কুশীলবদের পারিপার্শ্বিক জীবনবাস্তবতা ও মনোলোকের স্বরূপকে ভাষ্যদানে। তবে এর সমান্তরালে রয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসমানের শিক্ষিত, রুচিশীল, মেধাবী দৃষ্টিভঙ্গির সংযত প্রয়োগ। ফলে ভাষিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক এ দুই ধারার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। তবে, উপন্যাসের প্রতিপাদ্য যেহেতু নয়নপুরের বাসিন্দাদের লোকমানসের রূপরেখা গ্রন্থনা, তাই তিনি সচেতনভাবেই পাত্রপাত্রীদের ভাষাভঙ্গিকে যথাসম্ভব বাস্তবানুগ করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। এ উপন্যাসে পরিচর্যিত লোকভাষার উপাদান হিসেবে শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

৬.১ শব্দভাণ্ডার

> বিশেষণ– খামচাখামচি, এলোমেলো, ছেঁড়া, কুচকানো, ঝাঁপ, কুঁজো, ডাঁশা, ঠাসা, থুত্থুরে, চিমসানো, ঝুলঝুলে, ড্যাবড্যাবে, কুঁচকানো, টিকালো, ছেঁটে, ঠাহর, দুমড়ে, মিশমিশে, হিসহিসানি, খাউজানি, ঝাঁকড়া, মটমট, টাটানি, পেঁচিয়ে, আচমকা, হুড়মুড়, ছিটেফোঁটা, দাপট, তেলেসমাতি, জুৎ, হামাগুড়ি, থিতিয়ে, ডুমোডুমো, ঝিমাতে, চাগিয়ে, থইথই, চিনচিনে, শিরশির, চকচকে, ফনফনিয়ে, ঝাঁকড়া প্রভৃতি।

ক্রিয়া– ঘোচাতে, ডরায়, উছিয়ে, চিল্লিয়ে, আঁচড়ায়, উজাইছে, ঠেসে, গুঁজে, গলিয়ে, মাড়িয়ে, ঘুলিয়ে, উগড়ে, উপড়ে, ছিঁড়ে, ছেনে, ঠেসে, ডুইব্যা, ঠেলে, দিছে, ঝরছে প্রভৃতি।

দ্বিরুক্ত পদ– বিরান বিরান, ফোঁস ফোঁস, ভাঁঙি ভাঁঙি, কুঁচকি কুঁচকি, ডহর ডহর, লটকে পটকে, খ্যাটাং খ্যাটাং, আতাল পাতাল, হাতড়ে হাতড়ে, ধু ধু, ছুঁতে ছুঁতে, ভন ভন, ঝিমাতে ঝিমাতে, হাতড়ে হাতড়ে, ঠেঙে ঠেঙে, ছ্যাতরে দ্যাতরে, কাঁপতে কাঁপতে, তালে তালে, ধিক্ ধিক্, ফেড়ে ফেড়ে, ধেই ধেই, ছিটকে মিটকে, খিক খিক, ঠেলে ঠেলে, টেঁউ টেঁউ, থরো থরো প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– কুপি, বিছা, ঘোর, উকুন, শন, গিটঠু, কাঁথা, ঢেকুর, কোঠা, খপ্পর, থুতনি, গুঁড়ো, ফোঁড়, খাউজানি, খিল, মটকা, কাঠি, ফোঁকড়, মচ্ছব, ফুটা, থালা, ঝোলা, হুজ্জোত, ঘা, ফসকাগেরো, চুলা, ঘাই, খড়কুটো, ক্ষ্যাপ, ঘুনসি, গুলতি, উপুড়, উস্কানি, তাতিয়ে, টাল, বৈঠা, খসে, ছিপি, খায়েশ, আঁতিপাতি, বকাঝকা, আঁশ, খোন্তা, টুঁটি, খিড়কি, বালিশ, ঝাঁপি, নৌকা, গলুই, ঠাশা, ভেলা, ঠেসে, ন্যাংটো, বিইয়ে, ন্যাকড়া, টরেটক্কা প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– চন্দ্র>চান্দ, ওয়াক্ত> অকত, রাত>রাত্তির, কে>ক্যাডা, বসে>বৈয়া, রয়েছে>রৈছে, আজব>আজিব, খুলে>খুইল্যা, জঙ্গল>জংলা, এতদূর>এ্যাদ্দুর, চক্র>চক্কর, এলোমেলো>আউলাঝাউলা, একাকার>একশা, গবীর>ডহর, সকাল>বিয়ান, বাকি>বাহি, আপনি>আফনে, ছেলে>পুলা, হওয়ার>হউনের, যাবেন>যাইতাইন, রাগ>গোসা, বজ্র>ঠাটা, থেকে>থাইক্কা, আল>আইল প্রভৃতি।

৬.২ বাগধারা

বাবা-মা'র দুইচোক্ষের বিষ হয়েও চন্দ্রানীর আহলাদ খাওয়ার আয়েশ মেটে না। (পৃ. ১৬)

বৈশাখের সব ফসল আসমান পাতাল পানির তলায় একেবারে লেজে গোবরে বিলীন হওয়ার পর আজ দুই মাস গেলো। (পৃ. ২৪)

এতো যার রঙ ঢং, এতো যার চারপাশ গন্ধে আমোদিত করে খেলা, সেই মেয়েই রইসউদ্দিনের সামান্য কম্পিত প্রস্তাবে এমন আগুনমুখী! চাষার ঘরের চাষা! বামুন হৈয়া চান্দের স্বপ্ন। (পৃ. ২৮)

কামলারা প্রভাত থেকেই আদাজল খেয়ে পরিশ্রম করছে। (পৃ. ৪১)

গ্রামবাসীর মাথায় আসমান ভেঙে পড়ে। (পৃ. ৫৯)

এ-কী ভয়ংকর গেঁড়াকলে পড়েছে সে। (পৃ. ৭৪)

ওসমানই হয়ে উঠবে তার প্রধান তুরুপের তাস। (পৃ. ১০০)

শিক্ষিত স্ত্রী'র ফুটানির সামনে ম্যাদা মেরে পড়ে থাকা পুরুষদের বড়ো অভাব। (পৃ. ১২৯)

তিনি ভেবেছিলেন মান্ধাতার আমলের নিয়মেই সব চলবে। (পৃ. ১৩৮)

তারা ... এই দুইবোনের হাইস্কুলে পড়াটাকে গরিবের ঘোড়ারোগ ... হিসেবে দেখে। (পৃ. ১৫৫)

সরকারের লগে স্যারের তো দহরম মহরম আছে যে স্যার কৈলো আর তুমার ভিডাত দালান হৈয়া গেলো। (পৃ. ১৫৫)

ওসমান যতো ওই ছেলের পক্ষে কাসুন্দি ঘাঁটে, ততো মন্নাফ খাঁ এই বিষয়টার মধ্যে ধূসর কুয়াশা আবিষ্কার করেন। (পৃ. ১৮৪)

মন্নাফ খাঁ বিড়বিড় করেন–গভীর পানির মাছ তুমি (পৃ. ১৮৫)

ময়মনসিংহের গ্রামীণ জীবনবাস্তবতাকে ভিত্তি করে বিশ শতকের শেষ দশকের পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসে লেখক মুসলমান চাষী ও বেদে সম্প্রদায়ের লোকজীবনের চালচিত্রকে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা এবং সমাজের উক্ত প্রান্তিক গোষ্ঠীদ্বয়ের জীবনচর্যার অন্তর্নিহিত সুরকে তিনি শৈল্পিক আবহযোগে গ্রন্থনায় অভিনিবিষ্ট। তাদের নিত্যদিনের জীবিকানির্বাহপ্রণালী, ঐতিহ্য ও বিশ্বাস-সংস্কারের জগত স্থানীয় ভাষাকে আশ্রয় করে লোকসংস্কৃতির যে পরিমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করে, এরই বিশ্বস্ত প্রতিবেদন এ উপন্যাস। গ্রামীণ পটভূমিতে বাংলাদেশের লোকমানুষের জীবনচর্যাকে প্রতিপাদ্য করে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় এর অবস্থান নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত ও সাফল্যমণ্ডিত।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সমালোচকের অভিমত--

> বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা কাব্যজগতে জসীমউদ্‌দীনের আবির্ভাব। ... তিনি গ্রামীণ জীবনের লোককাহিনী ও গাঁথা অবলম্বন করে পল্লীর সাদামাটা জীবনের মাধুর্যকে কাব্যমহিমায় ভাস্বর করে পাঠকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন। আধুনিক যুগমানসের সকল ক্ষেত্রেই যখন নাগরিক জীবন স্থান করে নিচ্ছিলো, তখন জসীমউদ্‌দীন বলিষ্ঠ কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন লোকজীবনের জয়গান। ... জসীমউদ্‌দীনের কবিতা সবচাইতে বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে লোকজীবনের চিত্র রূপায়ণে। ... জসীমউদ্‌দীন কাব্য সাধনার শুরুতেই সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর কবিতার ভিন্ন মেজাজের জন্য। (বিমল গুহ, AvaywbK evsjv KweZvq †jvKR Dcv`vb, RmxgD``xb-Rxebvb›` `vk-we‡ò †`, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২-১৩)

২. বিমল গুহ আরো জানিয়েছেন--

আমাদের সাহিত্যে জসীমউদ্‌দীনের অবদান স্বীকৃত ও সম্মানের সাথে উচ্চারিত। জসীমউদ্‌দীনের ... চিন্তাই ছিল সাহিত্যের এই দুই ধারার (নাগরিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্য) মধ্যে ব্যবধান ঘুচানো। এই দুই ধারার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে তিনি বাংলা কবিতার ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে জন্য তাঁকে যেতে হয়েছে লোকজীবনের কাছে। অবশ্য তিনি লোকজ বিষয়কে পরিমার্জিত ও সংশোধিতরূপে আধুনিক সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন, ... ভাষা, ... অলংকার ব্যবহারে আধুনিক শিল্পী মানসিকতার যেমন পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি জীবনের অভিজ্ঞতাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। ... লোকজ উপাদান ও পল্লীজীবন নিয়ে রচিত জসীমউদ্‌দীনের কাব্য তাই মানুষের তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হয়েছে এবং পল্লীর প্রতিনিধি হয়ে আধুনিক কাব্যসমাজে স্থান করে নিতেও সমর্থ হয়েছে। ... বাংলা সাহিত্যে জসীমউ্দীন এনেছিলেন গ্রাম-বাংলার সজীব জীবন সম্পর্কে চেতনা এবং গ্রামীণ মানুষের সহজ মানবিকতা। তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে লোকজ উপাদান ও আধুনিক শিল্প চৈতন্যের সমন্বয় ঘটেছে। ... তাঁর কবিমানসে লোকজীবন ও লোক-ঐতিহ্য কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়ার ফল নয়, বরং তা বৃহত্তর বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে তাঁর নিবিড় ও প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলশ্রুতি। লোকায়ত জীবন প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় প্রধান উপাদান এবং লোকজীবন-প্রবাহ তাঁর কাব্যের মূলস্রোত। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬)

৩. Kwe Rmxg D‘‘x‡bi ceÜmgn (wØZxq LÐ), খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্‌দীন (সম্পাদিত), পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩০-৩৫

৪. ‘কবির একটি সাক্ষাৎকার’, সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নাম অনুল্লেখিত, RmxgD‘‘xb : HwZ‡n¨i AnsKvi, মিএগ্রা লুৎফার রহমান ও ফজলুল হক সৈকত সম্পাদিত, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪

৫. RmxgD‘‘xb : Kwegvbm I Kve¨mvabv, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা. ২০১২, পৃ. ৩২০

৬. জসীমউদ্‌দীন জানিয়েছেন--

বাঙলার নভেল উপন্যাসগুলি শুধু কলিকাতাবাসী কয়েকজন মধ্যবিত্ত লোকের কথায় ভরা। দেশের জনসাধারণ তার ভেতরে নিজেদের খুঁজে পায় না। ... আজ শহরের সাহিত্যিকেরা তাঁদের মধ্যবিত্ত- সমাজ নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করছেন, তা শহরের মধ্যবিত্তদের যেমন ভালো লাগে, গ্রামের মানুষের কাছে তেমন ভালো লাগছে না। গ্রামের মানুষ যখন শহরের মানুষের সমান শিক্ষিত হবে, তখনও ভালো লাগবে না। সাহিত্য যেমন বিশ্বের, তেমনি তা ঘরেরও। বিশ্বসাহিত্যই বল, আর সাম্প্রদায়িক সাহিত্যই বল, সব সাহিত্যই তৈরি হয় ঘরের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য। যে-সাহিত্য ঘরে প্রদীপ জ্বালাল না, সে-সাহিত্য বিশ্বে আলোকপাত করতে পারে না। দেশের জনসাধারণের জন্যই ত সাহিত্য তৈরি হয়। [RmxgD‘‘x‡bi ceÜ mgn (দ্বিতীয় খণ্ড), খুরশীদ আনোয়ার জসীম উদদীন সম্পাদিত, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৪-৩৫]

৭. এ উপন্যাস সম্পর্কে দুজন সমালোচকের প্রাসঙ্গিক অভিমত--

ক. জসীমউদ্‌দীন আপন কবি-স্বভাবের তাগিদেই 'আজাহেরের কাহিনী' শোনাতে গিয়ে যেভাবে ভাবাবেগের বশীভূত হয়েছেন তাতে ঔপন্যাসিকের বাস্তব দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী মন অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ... 'বোবা কাহিনী' তে উপন্যাস সৃষ্টির পোষকতা করে এমন উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তা উপযুক্ত শিল্পসুষমা লাভ করতে পারে নি। গদ্যে উপন্যাস লিখতে গিয়েও জসীমউদ্‌দীন গীতি-গাথার ভাবলোকেই যেন বারবার ফিরে গিয়েছেন। ... 'বোবা কাহিনী' পল্লীর জীবনবাস্তবের সাথে আমাদের পরিচয়কে নিবিড়তর করে তুলেছে এবং আমাদের উপন্যাসে নতুন দিগন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। ... (এর) ভাষা সরল ও আবেগময়। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মুখে আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ জুড়ে দিয়ে, এদের জসীমউদ্‌দীন একটা স্থানিকতা (local colour) দিতে পেরেছেন। তা ছাড়া উপন্যাসে মাঝে মাঝে পল্লীগীতি-গাথার ব্যাপক উদ্ধৃতি ও প্রয়োগ এতে পল্লীর যথার্থ আবহ সৃষ্টিতেও সাহায্য করেছে। (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১-৩২২)

খ. একচল্লিশটি পরিচ্ছেদে নির্মিত জসীমউদ্‌দীনের 'বোবা কাহিনী'তে আধুনিক উপন্যাসের গঠন-কৌশলের ঘাটতি ও শিল্পদৃষ্টির অভাববোধ হলেও চরিত্র, পারিপার্শ্বিকতা, পরিবেশ, জীবন যন্ত্রণা, জীবনানুভূতির তেমন কোনো ঘাটতি নেই। ভাষা ও সংলাপ উপন্যাসোপযোগী। এ-সত্ত্বেও এর বাঁধন মজবুত নয়। ... 'বোবা কাহিনী'র পটভূমির বিস্তৃত ক্যানভাস−পল্লী। জসীমউদদীন পল্লী থেকে জীবনচিত্র নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। (তিতাশ চৌধুরী, RmxgD‘ ‘xb : KweZv, M‘¨ I ¯§wZ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১৯)

৮. সমালোচকের অভিমত−−

বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দনটি ধরতে পেরেছিলেন জসীমউদ্‌দীন ... তিনি এঁকে গেছেন লোকজীবনের শাশ্বত স্মারকচিহ্ন, তাই তাতে ধ্বনিত হয়েছে সাধারণ মানুষের প্রাণের স্পন্দন। ... জসীমউদ্‌দীন হাজার বছরের গ্রামবাংলা ঐতিহ্য, লোকাচার, লোকমানসকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন− তা শুধু ছবির সঙ্গে তুলনা করা চলে। ... লোকজীবনের চলিষ্ণুতার সাথে হৃদয়ের আর্তি আর ভালোবাসা মিলিয়ে ... তিনি ঐতিহ্যের গুরুত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ... সুজলা সুফলা বাংলার রূপ বাঙালির আজন্ম আকর্ষণ। ... বাংলার লোকশিল্প ও সাহিত্যে প্রাচীন ঐতিহ্য এখনো প্রভাব বিস্তার করে আছে। ... জসীমউদ্‌দীন সফল হয়েছেন−বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর গ্রামকেন্দ্রিক নদীমাতৃক বাংলার সজীব প্রকৃতিকে একান্ত আপন করে ধরে রাখতে পেরেছেন বলেই। (বিমল গুহ, AvawbK evsjv KweZvq †jvKR Dcv‘vb : RmxgD‘ ‘xb-Rxebvb›‘ ‘vk-weò †‘, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩-১৪)

৯. সমালোচক জানিয়েছেন−−

জসীমউদ্‌দীন ১৯৩১ সালে শান্তিনিকেতনে বীরভূমের জেলা প্রশাসক, ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক লোকসংস্কৃতি-প্রেমিক গুরু সদয় দত্তের (১৮৮২-১৯৪১) সাথে পরিচিত হন। তাঁরা ... একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। জসীমউদ্‌দীন এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে পল্লীশিল্পের বেশ কিছু মূল্যবান নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছিল। ... তিনি ১৯৩৩ সালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে যোগদান করেন। এই পদে তিনি ১৯৩৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। দায়িত্ব ছিল পল্লী গীতি গাথা সংগ্রহ করা। (সাজজাদ আরেফিন, 'জসীমউদ্‌দীনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি', জসীমউ' '›b : H‡Z‡n¨i AnsK›i, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০)

১০. জসীমউদ্‌দীন এ উপন্যাসে গ্রামবাংলার নারীদের শাড়ি সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা তিনি গ্রহণ করেছেন ময়মনসিংহে লোকগাথা সংগ্রহকালে। 'ওতলা সুন্দরীর পালা'-তে উল্লিখিত বিভিন্ন শাড়ির যে বর্ণনা রয়েছে, তা এ উপন্যাসে অপরিবর্তিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন--

প্রায় ২৫ বৎসর আগে আমি ময়মনসিংহের গ্রামগুলি হতে কতকগুলি শাড়ির নাম টুকে এনেছিলাম। আজকাল সুতোর অভাবে এই শাড়িগুলি ওদেশের তাঁতিরা এখনও তৈরি করে কি না, জানিনে। ... আমার সংগৃহীত ওতলা সুন্দরীর পালাগান হতে এবার কতকগুলি শাড়ির বর্ণনা উদ্ধৃত করব।

রাজকন্যাকে বিয়ের সময় তাঁর সখীরা পরাচ্ছেন:

প্রথমে পরিল শাড়ি পিনল বড় ঠাটে

নীমা নামের কালে যেমন সূর্য বইল পাটে।

এই শাড়ি পরিয়া কন্যা শাড়ির পানে চায়,

মনমতো না হইলে দাসীকে পিন্দায়।

তারপরে পরিল শাড়ি নামে গঙ্গাজল

হাতের উপর থইলে শাড়ি করে টলমল। ...

কিন্তু সে-শাড়িও রাজকন্যার পছন্দ হল না। তখন সব সখীতে যুক্তি করে একখানা পুরাতন শাড়ি রাজকন্যাকে পরাল ... এই শাড়ি পরে রাজকন্যার কিরূপ শোভা হল, পল্লীকবি তারও বর্ণনা করেছেন–

খিল খাড়ুয়া বাক মুড়া পায়েতে পাশুলি

বনমালা চন্দ্রহার গলেতে হাশলি।

কাজলে মাজিয়া আঁখি অরুণ দুটি কূল,

আলোকের চিত্র যেন হাতে দশাঙ্গুল।

অতিশায় বাজাখানি শিকারী বাসিনী,

হাটল কুঞ্চন রূপ দেখতে ভোলে মুনি।

সাজিয়া পরিয়া এইদিন কন্যা হৈল ক্ষীণ,

কোমরে তুলিয়া দিল সোনার একখান জিন।

জিনখান পরিয়া কন্যা করে তানা নানা,

গলেতে তুলিয়া দিল সুবর্ণের দানা।

দানার মধ্যে গাঁথা আছে সুবর্ণের হাসি

এই দানা পিন্দিয়া কন্যা বাজায় মোহন বাঁশি।

নিত্যই নিত্যই ওঠে চন্দ্র আকাশের গায়,

আজকের চন্দ্র দেখি রাজার কোঠায়।

কবিকঙ্কণের রচিত চণ্ডিমঙ্গল কাব্যে দুর্গার কাচুলির যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে উপরের শাড়িখানার অনেকখানি মিল আছে। [RmxgD' 'x‡bi ceÜ mgn (2q LÐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬-২৮]

১১. 'কমিশার পদাভিলাষী যোগী', আবুল আহসান চৌধুরী ও মাসুদ রহমান (সম্পাদিত), ûgvqb K‡ei Rb¥kZel ¯§iY, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১২৪

১২. সমালোচক জানিয়েছেন--

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান তুলনাহীন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে যথেষ্ট গৌরব অর্জন করেছেন। ...ত্রিশ দশকে তাঁর লেখা বিভিন্ন ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে। ... প্রথম জীবনে তিনি অনেকগুলো নাটক লিখেছিলেন, যেগুলো অভিনীতও হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়নি। ... সম্পাদক হিসেবেও তাঁর রয়েছে প্রচুর খ্যাতি। নওগাঁ কেডি হাই স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি স্কুল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছেন (১৯২০), কলেজে পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিন (১৯২৬)। অক্সফোর্ডে থাকাকালীন ... দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। অক্সফোর্ড থেকে দেশে ফিরে ১৯৩২ সালে 'বারোমাসি' নামের একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৩৯-১৯৬৯ পর্যন্ত সম্পাদনা করেছেন 'চতুরঙ্গ' নামের অত্যন্ত উঁচুমানের ত্রৈমাসিক বাংলা সাময়িক পত্র। (মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'হুমায়ুন কবিরকে জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি', ûgvqb K‡ei Rb¥kZel ¯§iY, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯-৯০)

১৩. আরেকজন গবেষক জানিয়েছেন--

কথাসাহিত্যের অঙ্গনে হুমায়ুন কবিরের বিচরণ সংক্ষিপ্ততম হলেও এক্ষেত্রে তাঁর ছিলো উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তাঁর রয়েছে একটি মৌলিক উপন্যাস 'নদী ও নারী'। 'বিচিত্রা', 'বুলবুল' ইত্যাদি পত্রিকায় কিছু গল্প পাওয়া যায় কিন্তু কোনো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবির দেওয়ান চিমনিলালের 'কুলি' উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (মাসুদ রহমান, ûgvqb K‡ei : Rxeb I mvwnZ¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫, 'প্রসঙ্গকথা', পৃ. সাত)

১৪. সমালোচকের অভিমত--

হুমায়ুন কবির সেই ব্যতিক্রমী লেখকদের দলে, যাঁরা সম্প্রদায়গত চিন্তা নয়, শিল্প ও জ্ঞান অন্বেষণ-সৃষ্টিতে উৎসাহী ছিলেন। হুমায়ুন কবির, তাঁর অগ্রজ লেখক কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথাগত সাহিত্য তথা গদ্যচর্চার ঘরানা থেকে সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে শিল্পের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের রচনায় চিন্তা ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে বলে মোহাম্মদ নজিবর রহমান বা কাজী ইমদাদুল হকের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তার পরও কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, হুমায়ুন কবির আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দাবি করেন। কলকাতা কেন্দ্রিক যে রেনেসাঁশ ঘটেছিল, তার বিলম্বিত বিচ্ছুরণ হুমায়ুন কবিরকেও স্পর্শ করে। দর্শন ও সাহিত্যচর্চায় সাফল্য লাভ, রাজনীতিতেও প্রতিষ্ঠা অর্জন! ব্যক্তিজীবনে সফল ও প্রতিষ্ঠিত এই লেখকের নদী ও নারী যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তার আগেই তিনি বঙ্গী ব্যবস্থাপনা সভার সদস্য সির্বাচিত হন ও বঙ্গীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হকের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে কাজ করেন, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশর্শন বিভাগের প্রফেসর হন এবং

একই বছর (১৯৪৫) প্রকাশিত হয় তাঁর অনন্যসাধারণ প্রবন্ধগ্রন্থ বাংলার কাব্য। এই পরিণত ব্যক্তির রচনা b'x I bvix। (সৌমিত্র শেখর, 'b'x I bvix : পরিণতির ইঙ্গিত', K_wkí A‡š¦Y, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৯)

১৫. এ উপন্যাসের প্রকাশকাল প্রসঙ্গে সমালোচকদের মধ্যে মতবিভেদ রয়েছে। মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ জানিয়েছেন, (দ্রষ্টব্য : El‡jv‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, নব পর্যায় প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১, ঢাকা, 'পত্রিকার কথা'– অংশ, পৃ. অনুল্লেখিত) b'x I bvix হুমায়ুন কবিরের লেখা একমাত্র উপন্যাস। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে, *Men and Rivers* নামে। (হিন্দ কিতাবস্ সংস্করণ, ১৯৪৫)। পরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় b'x I bvix নামে (ওরিয়েন্ট লংম্যানস লিমিটেড সংস্করণ, ১৯৫২)। তিনি এ তথ্য গ্রহণ করেছেন যে গ্রন্থ থেকে, সেটি হলো, (*The Bengali Novel*, Humayun Kabir, Published by Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1968, p 126) আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা ওরিয়েন্ট লংম্যানস লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত b'x I bvix-র সংস্করণে প্রকাশকাল উল্লেখ না থাকায় এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। সৈয়দ মুর্তাজা আলী জানিয়েছেন, b'x I bvix-র প্রকাশ সাল ১৯৫২ ও *Men and Rivers*-এর প্রকাশ সাল ১৯৪৫ (ûgvqb Kwei : "মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" : সৈয়দ মুর্তাজা আলী, এ, বি. বুক স্টোর, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, পৃ. ১২৩, ১২৭)। শাহরিয়ার ইকবাল উল্লেখ করেছেন, উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশকাল ১৯৪৫ সাল (ûgvqb Kwei, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮)। হুমায়ুন কবিরের অনুজ আকবর কবির জানিয়েছেন, *Men and Rivers* বইয়ের প্রকাশকাল ১৯৪৫ সাল আর b'x I bvix বইয়ের প্রকাশকাল ১৯৫২ সাল। (মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত El‡jv‡K, নভেম্বর ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ. ১১৭)। বুদ্ধদেব বসু b'x I bvix-র সমালোচনা লিখেছিলেন 'চতুরঙ্গ' (১৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা), কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯ (ইংরেজি ১৯৫২ সালে) সংখ্যায়। এর দুবছর আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭ ও মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭ (ইংরেজি ১৯৫০ সালে) পর পর দুই সংখ্যায় 'পদ্মা' নামে b'x I bvix-র প্রথম খণ্ড 'নজুমিয়া' প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পর এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। ১৯৫৩ সালে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এ বইয়ের বিজ্ঞাপন। ... এসব তথ্য বিবেচনা করে ধরে নেয়া চলে, সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও আকবর কবির-উল্লেখিত b'x I bvix-র প্রকাশকাল ১৯৫২ সাল হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। (এসব তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : El‡jv‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, নব পর্যায় প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১, ঢাকা, 'পত্রিকার কথা'– অংশ, পৃ. অনুল্লেখিত)

১৬. এ উপন্যাসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সমালোচকদের বিপরীতধর্মী অভিমত পোষণের দৃষ্টান্ত––

ক. 'নদী ও নারী'র সংলাপে কোনো স্থানীয় চরিত্র ফোটেনি–অনেক সময় কেতাবি ভাষা ঢুকে পড়ে তার সুর কেটে দিয়েছে। ... আধুনিক উপন্যাসের আদর্শে 'নদী ও নারী' বিচার্য বলে আমার মনে হয় না, একে বলা যেতে পারে পুরোনো অর্থে উপাখ্যান, কিংবা ক্রনিকল, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা থেকে মূল গল্পাংশটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে লেখক তাকে বিস্তার করেছেন দৃশ্যের পর দৃশ্যে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে, একটি কেন্দ্রিক চরিত্রের শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত বহুবর্ষব্যাপী পটের উপর সুখ-দুঃখের রং বুলিয়ে গেছেন। ... ট্র্যাজিক সুরের বদলে করুণ রসে (এর) পরিসমাপ্তির পিছনে হয়তো পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রভাবই বর্তমান। (বুদ্ধদেব বসু, "হুমায়ুন কবির-এর 'নদী ও নারী' ", ûgvqb Kwei Rb¥kZel ¯§iY, আবুল আহসান চৌধুরী ও মাসুদ রহমান সম্পাদিত, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০৩)

খ. হুমায়ুন কবিরের b'x I bvix Epic form-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নদীপ্রবাহ, জীবনপ্রবাহ ও সময়প্রবাহকে একীভূত করে জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রচেষ্টাধন্য এ-উপন্যাস। পদ্মা-তীরবর্তী সংগ্রামশীল মানুষের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতা, তাদের প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এবং সর্বোপরি অস্তিত্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার মধ্যেও ভবিষ্যৎসঞ্চারী চিরজয়ী জীবনাকাঙ্ক্ষা ও সক্রিয়তার রূপায়ণে হুমায়ুন কবিরের সার্থকতা সন্দেহাতীত। এ-উপন্যাসে জীবনপ্রবাহ যেমন নদীর বহমানতার সাথে সমান্তরালভাবে উপস্থিত, তেমনি ভাষাভঙ্গিও নদীর মতই গতিচঞ্চল, তরঙ্গময়। জীবনের সমগ্রতায় বিশ্বাস, বুর্জোয়া জীবনচিন্তা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং জীবনের যথাযথ রেখা, পরিপ্রেক্ষিত, পরিবেশ, মাত্রা ও রঙে ... হুমায়ুন কবির অবলোকন করতে চেয়েছেন জীবনকে। শৈল্পিক উত্তরাধিকার ও সমকালসংলগ্ন ফর্ম-নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত উপন্যাস বাংলাদেশের উপন্যাসপ্রবাহে দূরসঞ্চারী। (সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : আঙ্গিক বিবেচনা', cm½ : evsjv K_vmwnZ¨, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১২-১১৩)

গ. উপন্যাস, বিষয় ও প্রকরণে হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) b'x I bvix বাংলাদেশের উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে দূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে। যে-ভৌগোলিক পরিসরকে হুমায়ুন কবির তাঁর উপন্যাসের কাহিনী-উৎস হিসেবে নির্বাচন করেছেন, বাংলা উপন্যাসের পটভূমিতে তা স্বতন্ত্র। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জনজীবন উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে ইতঃপূর্বেও গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সমষ্টির জীবনচৈতন্যের সঙ্গে নদী, মৃত্তিকা ও নারীর এমন অস্তিত্বময় সংযোগ সেখানে অনুপস্থিত। যে বিশাল ক্যানভাসে নদী ও মানুষের গতিময় জীবনের চলচ্ছবি তিনি রূপায়িত করেছেন, তা নতুন মানচিত্র ও জীবনসন্ধানী সংগ্রামশীল মানুষের রূপককথায় (allegory) পরিণত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টিতে জীবনের মহাকাব্যিক সম্ভাবনা তার সমগ্র স্বরূপ নিয়েই বিদ্যমান ছিলো বলে মনে হয়। যে জীবন ভঙ্গুর, পদ্মার ভাঙনশীল রূপের কাছে নিয়ত পরাভূত, সেই জীবনকে অস্তিত্বের প্রয়োজনে পদ্মারই মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। অর্থাৎ নদী এখানে কেবল বিনাশী শক্তি নয়, প্রাণদায়িনীও বটে। নদীর এই স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্বের বিন্যাস b'x I bvix-কে আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্যে উন্নীত করেছে। (রফিকউল্লাহ খান, evsjv‡`‡ki Dcb¨vm : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৮-২৯)

বুদ্ধদেব বসুর তিন পৃষ্ঠার এ সমালোচনার আড়াই পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে পূর্ববঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে। এরপর তিনি এ উপন্যাসের আলোচনা টানতে সূত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের cÜvb'xi gwS-কে। স্বাভাবিকভাবেই দুই উপন্যাসের উল্লেখের কারণটিও অনুমান করা চলে। তাঁর বিবেচনায় এটি যে মানিকের উপন্যাসের ধারেকাছেও যায়নি, সেই বিষয়টি পাঠককে জানাতেই তিনি এ সমালোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে নিছক একটি বাক্যে তিনি এর সম্ভাবনা নির্দেশ করেছেন– 'ভূমিজীবী মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার সমাজ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার অচেতন বীরত্ব [?]– এইসব সমাবেশের ভিতর দিয়ে বইখানা মূল্যবান হয়ে উঠেছে।' (পৃ. ২০৩) প্রকৃতপক্ষে তিনি এ উপন্যাসে হুমায়ুন কবিরের সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারেননি। ফলে, রহিমপুর ও বিয়ানচরের বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক চালচিত্র এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাঁর দৃষ্টিতে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। আর পালাগান এ উপন্যাস রচনার উৎস, এ অভিমত যথার্থ নয়। বরং লেখকের মৌলিক ভাবনা প্রকাশের সহায়ক অনুষঙ্গ হিসেবেই এটি নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত পালায় বর্ণিত সহজ-সরল,স্নিগ্ধ গ্রামীণ জীবনের যে অনাবিল আবেদন, এর প্রভাব এ উপন্যাসেও নিজস্ব রূপে ও পরিচয়ে উদ্ভাসিত। পালার কয়েকটি চরিত্রের ও স্থানের নাম, জলদস্যু কর্তৃক মালেকের অপহরণের বৃত্তান্তের ভাবানুষঙ্গ গ্রহণ ব্যতীত সর্বত্রই তিনি নিজস্ব ভাবনা, ব্যক্তিক

অভিজ্ঞতা এবং পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কিত ধারণার আলোকে আন্তরিক অবস্থান থেকে তাদের চালচিত্র গ্রন্থনা করেছেন। সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেন এবং রফিকউল্লাহ খান এ উপন্যাসকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মূল্যায়নে সচেষ্ট। ফলে এ উপন্যাসে বিধৃত পদ্মা-তীরবর্তী কৃষক সম্প্রদায়ের প্রকৃতিনির্ভর, দৈবতাড়িত জীবনপ্রবাহ সময়ের ধারাবাহিকতাকে মান্য করেও অস্তিত্বসংগ্রামে উত্তীর্ণ হবার প্রচেষ্টাকে যে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে, এ প্রসঙ্গে তাঁরা আলোকপাত করেছেন।

১৭. b‘x I bvix উপন্যাস লিখতে গিয়ে হুমায়ুন কবির জনৈক লোককবি রচিত পালা 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা' পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সমালোচক মাসুদ রহমান জানিয়েছেন--

> 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা' পালার প্রথম সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪)। ১৯২৮ সালে তিনি চট্টগ্রামের দেওগাঁ পাহাড়ের নিকটস্থ বড় উঠান গ্রাম নিবাসী হযরত আলীর নিকট থেকে পালাটি শোনেন এবং সংগ্রহ করেন। পরে এটি দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ড ২য় সংখ্যায় সঙ্কলিত হয়। ১৯৩৫ সালে পালাটি আরো সামান্য কিছু বেশি পংক্তিযোগে আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, 'কবরের কান্না' নামে। এটি তাঁর সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৫ম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। তবে হুমায়ুন কবির সম্ভবত আশুতোষ চৌধুরীর সংগ্রহ থেকেই কাহিনীটির সঙ্গে পরিচিত হন। কারণ আশুতোষ চৌধুরীর কিছু সংগ্রহ তিনি দেখেছিলেন (মাসুদ রহমান, ûgvqb Kwei : Rxeb I mvwnZ¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৭৭-৭৮)

কিন্তু এ উপন্যাস প্রসঙ্গে শিপ্রা দস্তিদার যে মন্তব্য করেছেন, তা থেকে সন্দেহ জাগে, তিনি আদৌ এর নিরপেক্ষ মূল্যায়নে সচেষ্ট কি না! তাঁর অভিমত--

> 'নদী ও নারী' হুমায়ুন কবিরের মৌলিক রচনা বলেই বিবেচিত। ... এখানে ... ঔপন্যাসিক যা পারেন নি তা হচ্ছে, কাহিনীর সঙ্গে সেই বিশেষ অঞ্চলের জীবন সমগ্রকে যুক্ত করা। ... রূপকথার গল্প যেভাবে বর্ণিত হয়, 'নদী ও নারী' উপন্যাসের গল্পও খণ্ডে খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে স্বাভাবিক বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে, ... লোকগাথায় যেভাবে জীবনের গল্প বলা হয় অনেকটা সেইভাবেই হুমায়ুন কবির পদ্মাতীরের কিছু মানুষের গল্প বর্ণনা করেছেন। ... লোকজীবনের সারাৎসার থেকে উপাখ্যান বা পালাগানের যে উপাদান পাওয়া যায় তা-ই উপন্যাসের উপজীব্য। (শিপ্রা দস্তিদার, "ঔপন্যাসিক হুমায়ুন কবির ও 'নদী ও নারী'র অন্তরালের প্রসঙ্গ", ûgvqb Kwei RbkZeI ¯§iY, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩)

শিপ্রা দস্তিদার যেসব বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি b‘x I bvix-র মৌলিকত্ব সম্পর্কে সমগ্র প্রবন্ধেই একপাক্ষিক মন্তব্য করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন, এ উপন্যাসের যে কালজয়ী মর্যাদা, এর অনেকটাই নামহীন সেই লোককবির প্রাপ্য। তিনি হুমায়ুন কবিরের মৌলিকত্ব স্বীকারে অসম্মত এবং লোকগাথার কবিকে অধিক কৃতিত্ব দিতে চান। কিন্তু এ অভিমত আমাদের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পূর্বোক্ত পালার কবি তাঁর রচনার ভিত্তিতেই পাঠকের দ্বারা মূল্যায়িত হবেন। হুমায়ুন কবিরের এ উপন্যাস পাঠের সূত্রে নামহীন সেই লোককবির প্রতি ঋণ স্বীকার করলেও সৃষ্টিশীলতার বিবেচনায় মানতেই হয়, নিঃসন্দেহে b‘x I bvix রচনার পুরো কৃতিত্ব লেখকেরই। এতে লোককবির জোরালো স্থানলাভ অযৌক্তিক। স্মতর্ব্য, এ উপন্যাসের বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণই পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর মৌলিকত্ব না থাকলে এমনটি কখনোই সম্ভব হত না। শিপ্রা লক্ষ করেননি, লেখক লোকগাথা বহির্ভূত অনেক উপাদান এ

উপন্যাসে সংযুক্ত করেছেন যা বিশেষভাবেই বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। এসব উপাদানের সম্মিলনে এ উপন্যাস নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে ওঠে এবং তাৎপর্যমণ্ডিত লোকজীবনের বৈচিত্র্যময় রূপরেখাকে শিল্পভাষ্যে উন্নীত করার যথাযোগ্য দাবিও জানায়। শিপ্রার অভিমতের ধারাবাহিকতায় বলতেই হয়, স্থানিক পটভূমি, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরা তথা ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে এ উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী বাসিন্দাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র বাস্তবতার আবহযোগে অনুপুঙ্খরূপে যে ফুটে উঠেছে, এ প্রসঙ্গে প্রায় সব সমালোচকই একমত। রূপকথা বা লোকগাথার আদলে নয়, বরং তিনটি পৃথক শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে বিন্যস্ত মোট বাইশটি পরিচ্ছেদে (তিনটি সংক্ষিপ্ত অবতরণিকাসহ) নজুমিয়া-আসগর-আমিনা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম নুরু-মালেকের জীবনাখ্যানকে লেখক এ উপন্যাসে শিল্পাবয়ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অবাস্তব, অলৌকিক-অতিলৌকিক ঘটনা ও কাল্পনিক প্রসঙ্গের সমাহারে গড়ে তোলা লোকগাথা বা রূপকথার চেয়ে পারিপার্শ্বিক জীবন, সমাজ-সমকাল ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হুমায়ুন কবিরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাস্তবতার শর্তবন্দি এ উপন্যাস লিখতে। মাসুদ রহমান পূর্বোক্ত পালার সঙ্গে উপন্যাসটির প্রতিতুলনাপূর্বক এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

> হুমায়ুন কবির প্রধানত ঘটনাবলী ব্যবহার করেছেন, চরিত্রগুলোর নামও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তারপর ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছেন। পালার যাবতীয় অবাস্তবতা, অলৌকিক বিষয়াবলী বর্জন করেছেন। অনেক নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সামগ্রিক জীবনচিত্র অঙ্কনের স্বার্থে অনেক শাখা কাহিনী যুক্ত করেছেন। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা চরিত্রগুলোর জীবনবোধই নিজ ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। পূর্বোল্লিখিত চারটি শাখা কাহিনীর তিনটিই (কুমির শিকার, হাকিম প্রসঙ্গ, ফকির বিষয়ক) নতুন সংযোজন। আর চতুর্থ শাখা কাহিনীতে এনেছেন বেশ পরিবর্তন। পালাতে রঙদিয়া (উপন্যাসে বিয়ানচর) গ্রামটিই আক্রান্ত হয় এবং হার্মাদরা নুরু ও মালেক দুইজনকেই বন্দী করে নিয়ে যায়। তারপর মালেককে হত্যা করতে উদ্যত হলে নুরু 'মা' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাতেই দমকা হাওয়ার ঝাপটায় নৌকার পালের দড়ি ছিঁড়ে যায় এবং ঘুরতে ঘুরতে নৌকা যে চরে গিয়ে পৌঁছায় সেখানে কিছু জেলে অবস্থান করছিল, তাদের সাথে ডাকাত দলের যুদ্ধ হয়। জেলেদের জয় হয় অবিশ্বাস্যভাবে–একজন বুড়ো জেলের নিক্ষেপিত মরিচের গুঁড়ায় ডাকাতেরা ঘায়েল হয়। উপন্যাসে একাকী মালেক সাগরে ডিঙিতে থাকার সময় ডাকাত কর্তৃক বন্দী হয়। তার মুক্তির ঘটনাও অবিশ্বাস্য নয়। উপন্যাসের যেখানে শেষ, পালার কাহিনী সেখানে শেষ নয়। মালেক পাঁচ বছর পর ফিরে আসে "সদাইগর" (সওদাগর) হয়ে, সে তখন "মস্ত তোয়াঙ্গর" (গণ্যমান্য ধনীব্যক্তি) আর ইতোমধ্যেই বসন্ত রোগে মারা গেছে নুরুসহ বাড়ির সবাই। সবাই বলতে নুরুর বাপসহ মা আমিনাও। পালাতে উপন্যাসের মতো আমিনা পূর্বেই মারা যায় নি। যাহোক, মালেক নুরুর কবরের কাছে যায়–কবরের ভিতর থেকে নুরু কথা বলে "ভুলি নাইরে তোমার কথা"। মালেক ধনসম্পত্তি ত্যাগ করে সেই কবরের পাশে "দেওয়ানা" হয়ে রয়ে যায়। আধুনিক সামাজিক উপন্যাসের দাবিতে কবির ঐসব অবাস্তবতা বর্জন করেছেন। কাহিনীকে একটি সামাজিক-ব্যক্তিক জীবন অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন-চিত্র হিসেবে পুনর্গঠিত করেছেন। পালার কাহিনীর মূল অংশ অনেকটা গৌণ হয়ে গেছে–সেখানেই কবিরের সার্থকতা এবং মৌলিকতা। (মাসুদ রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮)

আবু হেনা মোস্তফা কামাল এ উপন্যাসকে 'কালজয়ী' আখ্যা দিয়েছেন। ('প্রসঙ্গ-কথা', ûgvqb K\e i, শাহরিয়ার ইকবাল, বাংলা একডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত)। অন্যদিকে স্বীয় প্রবন্ধে শিপ্রা দস্তিদার কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন, যা থেকেও প্রতীয়মান হয়, এ উপন্যাস নিজ গুণেই সর্বভারতীয় পাঠকের মনোযোগ ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিল, যা এখনো অটুট রয়েছে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এ উপন্যাসটির পরপর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ওরিয়েন্ট লংম্যানস এবং ওরিয়েন্ট অ্যান্ড গ্রীন কোম্পানি থেকে। ... সঙ্গত কারণেই 'Men and Rivers' উপন্যাসটি 'নদী ও নারী'র অনুবাদ নয়। ... ইংরেজিতে লিখিত এই উপন্যাসের কাহিনীও 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা'। উল্লেখ্য যে প্রকাশের অল্পদিন পরেই এই উপন্যাস মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক) স্তরের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। একজন ভারতীয় লেখক রচিত এটিই প্রথম ইংরেজি উপন্যাস যা ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি পড়াবার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। (আবুল আহসান চৌধুরী ও মাসুদ রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০- ২৩১)

১৮. এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত মূল উপন্যাসের সব উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য : হুমায়ুন কবির, b'x I bvix, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৯। উদ্ধৃতির পাশে গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীতে নির্দেশিত।

১৯. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন জানিয়েছেন--

লোকশিল্পে যে ছবি বা নকশা আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে মনের মাধুরীর সমাবেশ অনেকখানি রয়েছে। আমাদের লোকশিল্প রূপ পেয়েছে মাটিতে, পাথরে, কাঠে, কাপড়ে, মানুষের দেহের উল্কিছাপে, বেতের বন্ধনীতে, সুতার শিকায়, নানা রঙে, নানা রেখায় আর নানা ভঙ্গিতে। ... ঘরের মেঝেতে নকশিকাঁথাটি মেলে ধরে পল্লীবধূ তাঁর কলমি ফুলের মতো সুন্দর আঙুলখানি দিয়ে সরু সূত্র-জালে ... পদ্মফুলটিকে জীবন্ত করে তুলছেন ... পল্লীশিল্পের কথা ভাবতে প্রথমেই নকশিকাঁথার কথা মনে পড়ে। এই কাঁথাতে সাধারণত মাছ, পাতা, ধানের ছড়া, চন্দ্র, তারা. ঘোড়া, হাতি, দেব- দেবীর ছবি অথবা কোনো গ্রাম্য ঘটনার ছকি বুনট করা হয়। নকশিকাঁথা সাধারণত দুই পাটের অথবা তিন পাটের হয়ে থাকে। চার পাঁচ পাটের কাঁথা শীত নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাতে কোনো কারুকার্য থাকে না। কাঁথাকে মেঝের উপর তুলে ধরে তার উপরে বসে কাঁথা সেলাই করতে হয়। সাধারণত পুরাতন কাপড়ের পাড় হতে সুতো তুলে অথবা হাট হতে তাঁতিদের কাছ থেকে নীল, লাল, হলুদ প্রভৃতি সুতো কিনে এনে কাঁথা সেলাই করা হয়। ঘরের মেঝেতে পা মেলে পায়ের আঙুলের সঙ্গে সুতোর এককণা জড়িয়ে এক একটি গুচ্ছ সুতো পাক দেওয়া হয়। পাক দেওয়া হলে তাদের এক-একটি আঙুলের মধ্যে আটকিয়ে দুটো দুটো পাক দেওয়া সুতো একত্র করে উল্টো পাক দেওয়া হয়। এইভাবে সুতো তৈরি হলে তাদের হাতের কব্জিতে জড়িয়ে আবার পাকিয়ে রাখা হয়। কাঁথা সেলাই-এর সময় খুলে ইচ্ছেমতো কাজে লাগানো হয়। ['পূর্ববঙ্গের নকশি কাঁথা ও শাড়ি', RmxgD''x‡bi ceÜmgn (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৫]

২০. সমালোচক জানিয়েছেন--

কবিরউদ্দিন আহমেদ (লেখকের পিতা) ... ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে মনোনীত হয়েছিলেন। চাকরি জীবনে তিনি চাম্পারান (বিহার), মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, রাঁচি, কৃষ্ণনগর, বরিশাল, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, নওগাঁ, পাবনা ও কলকাতায় কর্মরত ছিলেন। (শাহরিয়ার ইকবাল, 'হুমায়ুন কবির : পরিবার-পরিচিতি ও সংসার-জীবন', আবুল আহসান চৌধুরী ও মাসুদ রহমান সম্পাদিত ûgvqb Kwei Rb¥kZel ¯§iY, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

২১. সমালোচকের অভিমত––

‘দেশ’-এ যে সকল তরুণ সাহিত্যিককে সাহিত্য রচনায় অদ্বৈত উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অন্যতম। ওই সময় ‘দেশ’-এ অদ্বৈতের Irving Stone (ভ্যান গঘের জীবন নিয়ে লেখা ‘Lust for Life’-এর অনুবাদমূলক উপন্যাস ‘জীবনতৃষা’ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত (১৯ মার্চ ১৯৪৯ থেকে ২০ মে ১৯৫০) হয়। সাগরময়বাবু তাঁকে দিয়ে গ্রন্থটি অনুবাদ করান। এই অনুদিত গ্রন্থটি পড়ে সাগরময়বাবু ভাবেন “... তাঁকে দিয়ে একটি মৌলিক উপন্যাস লেখাব।” কিন্তু ক্ষয়রোগ ধরা পড়ায় সে ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে যায় তাঁর। (মিলনকান্তি বিশ্বাস, A‰ØZ gjøegY I evsjvi †jvKms¯‹…wZ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ, ২৭)

২২. দুজন গবেষক ও সমালোচকের মাধ্যমে জানা যায়––

ক. ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এর সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকলেও এবং এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক সাহিত্যকীর্তি হলেও তিনি এই উপন্যাসটি ছাড়াও সাহিত্যের নানা শাখায় প্রচুর কাজ করেছেন। কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনই শুধু শুরু করেন নি বেশকিছু শিশুতোষ কবিতাও রচনা করেছেন। দীর্ঘ পনের বছরের সাংবাদিক জীবনে তিনি যুগপৎ সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রেখেছেন। ... ‘তিতাস’ প্রকাশের আগে আগেই অবশ্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ সুধী পাঠকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ‘সোনার তরী’ মাসিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ লিখেছিলেন ... উপন্যাস ‘সাদা হাওয়া’। এছাড়া ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস ‘রাঙা মাটি’ও বই হয়ে বেরোয়। (শান্তনু কায়সার, A‰ØZ gjøegY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪-৫, ৯-১০)

খ. অদ্বৈত বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় মাসিক ‘ত্রিপুরা’ পত্রিকায় তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। একপর্যায়ে শ্রীকাইলের ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত ‘নবশক্তি’ পত্রিকায় যোগ দেন। এরপর ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হন। তাছাড়া ‘দেশ’, ‘নবযুগ’, ‘কৃষক’, ‘যুগান্তর’ প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন সম্পাদনাসূত্রে। (A‰ØZ gjøegY I wZZvm GKwU b‘xi bvg, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, প্রকাশক শুভ রহমান, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৫)

২৩. এ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত––

ক. তিতাসকে একসময় আমি বলেছিলাম ‘নদীর পাঁচালী। ... আমি দেখতে পাই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং তার স্রষ্টার অচ্ছেদ্য অন্বয়ের নিগূঢ় যোগাযোগকে। কোনও ব্যক্তি, তা সে তিনি যত বড়ো শিল্পীই হোন না কেন, বাইরে থেকে গিয়ে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ লিখতে পারেন না। কাহিনী এবং কাহিনীকার দুজনকেই সেই সুনির্দিষ্ট জলমাটি হাওয়া থেকে, সেখানকার সংস্কার থেকে, বিশ্বাস থেকে, জীবন-জীবিকার ঘাম কাদা মেখে এবং ছেনে উঠে আসতে হবে। বিষয় ও ব্যক্তিগুলি দীর্ঘকাল ধরে তাঁর কাছে অপ্রত্যাখ্যেয় হয়ে থাকে, তার পরে তার প্রকাশ অনিবার্য হবে।

তিতাসের সঙ্গে জড়িত, গ্রথিত জীবন এই উপন্যাসের বিষয়। (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুখপাত', wZZvm GKwU b'xi bvg : cmÿ I Abl½, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. অনুল্লেখিত)

খ. 'তিতাস একটি নদীর নাম' যখন প্রথম ধারাবাহিকভাবে মাসিক মোহাম্মদী-তে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তা সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পরে গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে বেশ সাড়া জাগায়। ১৩৬৩-তে প্রথম প্রকাশের পর এ গ্রন্থের বেশ বয়েকটি সংস্করণ হয়েছে, হয়েছে এর কাহিনীর চিত্ররূপও। কাজেই ভূমিকায় প্রকাশক যে লিখেছিলেন– 'আমাদের বন্ধু অদ্বৈত দীর্ঘজীবী হয় নাই, হয়ত তাঁহার তিতাসের কাহিনী দীর্ঘজীবী হইবে।' ... লেখক আরো গ্রন্থ লিখেছিলেন, কিন্তু বোধ করি এই গ্রন্থেই তিনি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে দিতে পেরেছিলেন বলেই–'অদ্বৈতের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মধ্যে এই গ্রন্থটিই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কীর্তি' হতে পেরেছে। (গুণময় মান্না, অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস, wZZvm GKwU b'xi bvg : cmÿ I Abl½, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৪)

গ. একটি উপন্যাস রচনা করেই শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রামের ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থে যে-আন্তরিক মমতায় রূপায়িত হয়েছে তার তুলনা বাংলা কথাসাহিত্যে খুব বেশী নেই। দরিদ্র ধীবর পরিবারের সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে এক উপেক্ষিত সমাজের জীবন সংগ্রামের কাহিনীকে দিয়েছেন অবিনশ্বরতা। (আবু হেনা মোস্তফা কামাল, উদ্ধৃত, শান্তনু কায়সার, A‰ØZ gjøegY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, 'প্রসঙ্গ-কথা', পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত)

ঘ. 'তিতাসে'র মানবিক ও সার্বজনীন আবেদন এবং প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও এর স্থানীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ও স্বাক্ষর। তিতাসকে কেন্দ্র করে এই জনপদে যে কালচার ট্রেটের জন্ম হয়েছে তারও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লক্ষণ প্রকাশিত এই উপন্যাসে। উদাহরণ হিসেবে তিতাস-কেন্দ্রিক নৌকা বাইচের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পর্বটি নৌকা বাইচের ওপর রচিত। এই পর্বটির শিরোনাম 'রাঙা নাও।' কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ যা তা হচ্ছে, ঔপন্যাসিক এখানে নৌকা বাইচকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেননি। নৌকা বাইচের প্রস্তুতি থেকে পরিণতি পর্যন্ত পুরো বিষয়টির সঙ্গে ঔপন্যাসিক এখানে জীবনের প্রবহমানতাকে যুক্ত করেছেন। ফলে একদিকে যেমন কাদিরের তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্তের জীবনেরও নানা বাঁকের ইঙ্গিত এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বর্ণিত অঞ্চলের সমস্ত প্রেক্ষাপট এসে মিলেছে ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে। তাতে নৌকা বাইচের সাংস্কৃতিকতা জীবনেরই ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। নৌকা বাইচের সময় গীত গানগুলি আঞ্চলিকতাকে ধারণ করা সত্ত্বেও কিংবা সে কারণেই হয়ে ওঠে হার্দ্য উচ্চারণ। (শান্তনু কায়সার, A‰ØZ gjøegY, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮)

ঙ. এক ধরনের পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া কখনওই লেখা সম্ভব হতে পারে না, অন্তত 'তিতাস' গোত্রের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের বলার বিষয়টি এখানে, উপন্যাস কাগজে-কলমে লেখার বহু আগেই তিনি একটি উপন্যাসের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মহৎ কর্মের ক্ষেত্রে যেটা জরুরি। তিনি বহু আগেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন মালো জীবন

আর সেই সঙ্গে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহে হয়ে উঠেছিলেন পারদর্শী। (দেবীপ্রসাদ ঘোষ, A‰ØZ gjøegY : GK wfb cwZ‡mvZ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৮)

চ. 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই মহৎ উপন্যাসখানি ও তার স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ একে অন্যের পরিপূরক। উপন্যাসখানিকে এক পাশে সরিয়ে রেখে ব্যক্তিমানুষ অদ্বৈতকে ভাবতে কষ্ট হয়। আবার স্রষ্টা অদ্বৈতকে আমরা যদি স্মৃতিতে আড়াল করি তা হলে তিতাসের জল আর তার কূলের সভ্যতার এককালের ধারা ভুলতে বসি। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টা একাত্ম, অভিন্ন। একের অস্তিত্বের সঙ্গে অন্যের অস্তিত্ব মিশে আছে। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। নেই বললেই চলে। ... তিতাস কূলের জীবন চর্যার শরিক অদ্বৈত। সেই জীবন চর্যাকে অমরত্ব দিয়েছেন, অর্থবহ করেছেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসকে কেন্দ্রমূলে রেখে হয়েছে সেই কাজ। ... তিতাস ও অদ্বৈত মিলেমিশে অন্ত্যজ বাঙলার এক চলমান দলিল– অনন্তকালের চাকার আবর্তিত ইতিহাস। (মনোহর বিশ্বাস, wfb‡Pv‡L ceÜgvjv, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৩)

ছ. তিতাস-তীরের গোকর্ণ গ্রামের যে-পাড়ায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের বেড়ে ওঠা, ভদ্রভাষায় তার নাম মালোপাড়া হলেও, সেটি 'গাবরদের পাড়া' বলেই বহুল পরিচিত। শ্রমজীবী অন্তেবাসী জেলে সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা থেকেই 'ভদ্র'লোকেরা এ নাম সৃষ্টি করেছেন। জন্মসূত্রে এই 'গাবরদের পাড়া'র লোক বলে অদ্বৈতের শৈশব-কৈশোর-যৌবন কী বিড়ম্বনা ও অসহায়তার মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। এই অবজ্ঞা আর বিড়ম্বনাই উত্তরকালে প্রাকৃত জীবনের কথান্যাস নির্মাণে অদ্বৈতকে অনুপ্রাণিত করেছে। কেবল তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসেই নয়, তাঁর আর সব প্রধান রচনাতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রাকৃত জীবন ও কৌম সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা। ... তাঁর জীবন ও সাধনার কেন্দ্রীয় প্রবণতাই হচ্ছে কৌমজীবনের অঙ্গীকার। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'তিতাস একটি নদীর নাম : জল ও জীবনের বিকল্প নন্দন, †jvKcivY, RbmgvR I K_wkí, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২৬-১২৭)

জ. অদ্বৈত স্বাতন্ত্র্যের সাধনাকেই বড় করে দেখতে চেয়েছেন। বস্তুত, গোকর্ণ গ্রাম ব্রাক্ষ্মণবেড়িয়া ও তিতাস অঞ্চলের ভূমিপুত্র, তিতাসের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, নদীলিপ্ত জনপদের অভিজ্ঞতায় বিত্তবান ও আর্থিক দিক থেকে প্রবল পশ্চাৎপদ শ্রেণীর, মালো কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত, অদ্বৈত মল্লবর্মণের আত্মবিশ্বাস ও মৌলিকত্বের অভিজ্ঞানে বিশিষ্ট ধারণাই ... নিজেকে নিজের মতন করে গড়ে তোলায় প্রাণিত করেছে আর তারই ফসল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ... অদ্বৈত'র বড় হয়ে ওঠা, গড়ে ওঠা এই জেলে বা মালো জীবনের ভিতর থেকেই। তাই তাঁর তিতাস হয়ে ওঠে 'জেলে জীবনের মহাকাব্য'। জলমজুর জেলে মালো সম্প্রদায়ের মানুষ অদ্বৈত, প্রকৃত অর্থে, ব্রাত্য-জীবনের কথাকার। ... (এ) উপন্যাস অদ্বৈত মল্লবর্মণের অভিজ্ঞতার দলিল ... জীবন-অভিজ্ঞতাকে শিল্প-অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করে একটি অসামান্য সাহিত্যকর্ম উপহার দেওয়া তাঁর প্রতিভারই পরিচয়বহ। (শুভঙ্কর ঘোষ, 'ব্রাত্য জীবনের কথকতা : কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ', K_wk‡íi eûgwÎKZv, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৯৫-৯৬)

২৪. A‰ØZ gjøegY I wZZvm GKwU b'xi bvg, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৫৫

২৫. b'xwfwËK evsjv Dcb¨vm I ˆKeZ RbRxeb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫৯

২৬. উদ্ধৃত, শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২৭. সমালোচকদের অভিমত––

ক. 'নবশক্তি'র সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণ বেশ কিছু নিবন্ধ লিখেছেন, যেগুলিতে তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চার নিবিড় আগ্রহের পরিচয় বর্তমান। ... লৌকিক উপাদান উপন্যাসে যখন উপস্থাপিত হয় তখন তা সাধারণভাবে আঞ্চলিকতার অনুষঙ্গী হয়ে ওঠে। তিতাস একটি নদীর নাম-এ যেহেতু আঞ্চলিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তাই লোকজীবন প্রবাহের অন্তর্গত হয়ে এসেছে লোকসংস্কৃতির উপস্থাপনা। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি অদ্বৈতের দুটি মন কাজ করে গেছে : ১. সংগ্রাহক ও বিশ্লেষক-মন, আর, ২. গৃজনশীল মন। 'নবশক্তি'- তে প্রথম স্তরের আর তিতাস একটি নদীর নাম-এ দ্বিতীয় স্তরের অদ্বৈতকে খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লোকজীবন আসে গূঢ়তর তাৎপর্য অঙ্গীকার করে।" (অচিন্ত্য বিশ্বাস, A‰ØZ gjøegY I wZZvm GKwU b'xi bvg, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫, ১২৮-১২৯)

তিনি এ উপন্যাসে অদ্বৈতের সংগৃহীত বিভিন্ন গানকে সরাসরি ব্যবহারের একটি তালিকা দিয়েছেন। এসবের অন্তর্গত সাতটি গান এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

খ. অদ্বৈত মল্লবর্মণ কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় হলেও লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহক ও গবেষক হিসেবেও তাঁর অবদান কম নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছাব্বিশটি প্রবন্ধের মধ্যে আঠারোটি প্রবন্ধ বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। গ্রাম-বাংলা থেকে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান তিনি সংগ্রহ করে প্রবন্ধকারে 'নবশক্তি', 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ... কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহক ও গবেষক হিসেবেই নয়, কথাসাহিত্যিক হিসেবেও অদ্বৈতের বিস্ময়কর প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই উপন্যাস রচনার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল, যখন তিনি অবিভক্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি এই উপন্যাস রচনা করেন, তখন বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠে ত্রিপুরার গ্রাম থেকে সংগ্রহীত লোকসঙ্গীতগুলি সংযোজন করে উপন্যাসটিকে নতুন মাত্রা দান করেছেন। (মিলনকান্তি বিশ্বাস, A‰ØZ gjøegY I evsjvi †jvKms¯‹…wZ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১১-১২)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মোট ছাব্বিশটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলোর অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। এ প্রসঙ্গে জানতে দ্রষ্টব্য : মিলনকান্তি বিশ্বাস, A‰ØZ gjøegY I evsjvi †jvKms¯‹…wZ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : পৃ. ৪৮-৪৯

২৮. অদ্বৈতের সুহৃদ সুবোধ চৌধুরী সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন––

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছিল মানুষ আর প্রকৃতি সম্পর্কে সুগভীর insight . এমনটি আমাদের ছিল না। আমরা দেখেছি দর্শকের মতো, ভালো হয়ত লেগেছে। তবে অদ্বৈত দেখেছেন শিল্পীর চোখে। তাঁর সত্তার সঙ্গে তিতাস ছিল মিশে।

এটা পৃথক করতে পারেন নি তিনি, চানও নি। তাঁর উপর ছিল তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ... প্রথম যখন পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম– "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' আর কি তোমার বই মানুষ নেবে"? বলেছিলেন অদ্বৈত "সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা– রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা" আর কিছু বলেন নি। পরিচয়ের এই প্রত্যক্ষতাই ছিল তাঁর গৌরবের ভিত। (অ‰ØZ gjøegY I wZZvm GKwU b'xi bvg, প্রকাশক শুভ রহমান, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৮-৯)

২৯. এ আলোচনায় ব্যবহৃত উপন্যাসের সব উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্যঃ A‰ØZ gjøegY iPbvmgM, অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১। সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতির পাশে গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বন্ধনীতে নির্দেশিত।

৩০. আমাদের গবেষণাভুক্ত উপন্যাসগুলোর মধ্যে শুধু এ উপন্যাসেই লোকপুরাণ বিস্তৃত পরিসরে শৈল্পিক ভাষ্যরূপ পেয়েছে। মালো জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অদ্বৈত নিজ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক গড়ন ও পরিমণ্ডল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যে আর্থ-সামজিক প্রতিবেশ ও ঐতিহ্যকে তিনি জন্ম-পারিবারিক সূত্রে পেয়েছিলেন, তাকে অকৃত্রিমভাবে এ উপন্যাসে তিনি ধারণ করেছেন। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি আর সংবেদনশীল সামাজিক মানুষের নৈয়ায়িক অবস্থান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের সামগ্রিক জীবনচর্যা গ্রন্থনায়। তাই প্রকৃতিনির্ভর জীবিকা নির্বাহ আর আদিম ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত মানুষের কৌমবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয় এ উপন্যাসে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উপস্থিত। লোকপুরাণের বর্ণাঢ্য জগতকে তিনি মালোদের প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতা ও সমষ্টিচেতনার পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এ সম্পর্কে দুজন সমালোচকের তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত––

ক. প্রধানত যে তিনটি পুরাণ সংস্কৃতি-জাত আখ্যান তিনি নির্বাচন করেছিলেন তা হলো মনসামঙ্গল গান, দ্বিতীয়টি রাধাকৃষ্ণ কথা এবং তৃতীয়টি তুলনায় আগের দুটির চেয়ে কম শিব-দুর্গা কাহিনী। বিশেষত উদাসীন দেবতা শিব, যিনি চাষ করেন, ভিক্ষে করেন, গাঁজা খান অথচ প্রলয়ঙ্কর মহাদেব কোথাও কোথাও প্রতীকের মতো এসেছেন। ... প্রবাস খণ্ডে যখন কিশোর আর সুবল নৌকা বেয়ে মেঘনা নদীর স্রোতে চলতে চলতে আর এক মালোপাড়ায় গিয়ে নোঙর গড়ল, সেই গ্রামে বিষ্ণু ভক্ত অনেকেই। 'কৃষ্ণমন্ত্রী'দের গ্রাম। যেখানে নিত্য বাক্যালাপে পাঁজি-কীত্তনের শুরু। বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন, লোলিতাসখী শ্রীমতী রাধিকাকে নিয়েই গড়ে ওঠে এক রসের মানসকুঞ্জ। কিশোর ও সুবল নাম দুটি যেন এই গ্রামে এসে পূর্ণতা পেলো। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ শ্যামল কিশোর আর সখা সুবল। যেন আপনা থেকেই মূর্ত হলো কিশোর ও সুবলের মধ্যে। ... অদ্বৈত সেই গ্রামের দোল পূর্ণিমার বর্ণনা দিয়েছেন। ... বৈষ্ণবীয় বাতাবরণ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহকথার মাধুর্য এই উপন্যাসে যেভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি তার লোকায়তিক রূপটি আরও অনেক জায়গাতেই পাই। এখানে উল্লেখ্য একটি কথা–বিষ্ণু বা কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা হওয়া সত্ত্বেও বাংলার লোকজীবনেরই অন্তর্গত হয়ে গেছে। যা একদা ছিল শিষ্ট সাহিত্য, তা প্রাচীন কালে যখন সমাজের সাহিত্য ছিল প্রধানত শ্রুতি বহির্ভূত, তখন লোকজীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে অনেক গভীরভাবে। তাই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ব্রাহ্মণ্য নীতি শাসিত শিষ্ট সাহিত্য হলেও তা ভারতের লোকজীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। এই দিক থেকে দেখলে অদ্বৈতের উপন্যাসে এই উপাদানটি গৃহীত হয়েছে। পৌরাণিকতায় নয়, লৌকিকতায়। দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ডে 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' এবং 'রামধনু' অংশে আবার প্রধান হয়ে ওঠে শক্তিদেবতা কালী আর মনসা-কেন্দ্রিক পুজো। যে উপন্যাস জলধারার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হয় সে উপন্যাসে মনসামঙ্গলের স্মৃতি অনিবার্য। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' অংশে

আছে কালীপুজোর অনুষ্ঠানের বর্ণনা। 'রামধনু' অংশে আছে পদ্মাপুরাণ পাঠ, জালাবিয়া এবং মনসাপূজার বিবরণ। এ সবই মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গ। (সুমিতা চক্রবর্তী, 'তিতাস একটি নদীর নাম : ভাষা ও প্রকরণ', wZZvm GKwU b'xi bvg : cm½ I Abl½, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩-৩৪)

খ. তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের নানা স্থানে মিথিক অনুষঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মিথের সূত্র ধরে আলোচ্য উপন্যাসের ভিন্ন এক তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব। উপন্যাসের তলদেশে ক্রিয়াশীল আছে পৌরাণিক এক দ্বৈধের স্মৃতি। মালোর সন্তান 'জাউলার পোলা' অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাছে সে-দ্বৈধের স্মৃতি অজানা থাকার কথা নয়। অজানা যে নয়, তা বোঝা যায় ওই প্রত্ন-উৎসের পৌনঃপুনিক ব্যবহার দেখে। ক্ষত্রিয় পিতা আর বৈশ্য-মাতার মিলন থেকে কৈবর্ত বা মালোদের জন্ম। মহাভারত-এ আছে অন্য এক অনুষঙ্গ। রাজা শান্তনু বা মুনি পরাশরের মতো উচ্চ ও অভিজাত বর্গের সন্তান হয়েও স্বীকৃতির অভাবে মৎস্যজীবী বর্গ সমাজে ছিল উপেক্ষিত। কৈবর্তদের মাঝ থেকে ক্রমে দুটি শাখা সৃষ্টি হয়–হালিয়া দাস তথা চাষি, আর জালিয়া দাস তথা জেলে। পুরাকাহিনীতেও আছে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই দুই শাখার দ্বৈরথের কথা। বক্ষ্যমান উপন্যাসেও দেখা যায়, তিতাসের বুকে চর জেগে উঠলে তার দখল নিয়ে জেলেদের সঙ্গে চাষিদের বিরোধ বাঁধে এবং সে-বিরোধেই ক্রমে শেস হয়ে যায় জেলেরা। তিতাস-তীরের এই কাহিনীতে পুরাকাহিনীর প্রত্নস্মৃতি কী তাহলে অলক্ষ্যে উঁকি দেয়? ... অনন্তের পরিণতির দিক থেকেও পুরাকাহিনীর ভিন্ন এক অনুষঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। অনন্তের কাছে তিতাসের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন প্রবীণ তিলকচাঁদ, আর নদীর উৎসের ভিন্ন এক মিথকথা অনন্তকে শোনায় উদয়তারা– 'নদীর সির্জন হইয়াছে হিমাইল রাজার দেশে। সেই দেশে স্বর্গে-সংসাওে মিলন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির মহারাজা সেই দেশে গিয়া তারপর হাঁটিয়া স্বর্গে গেল।' যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পশ্চাতেও আছে একই উৎস থেকে জাত দুটি গোষ্ঠীর ভয়াবহ যুদ্ধের প্রত্নস্মৃতি। মহাভারতের 'মৌষল পর্বে' ভয়াবহ যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল যদুবংশ। তিতাসের তীরে চাষি আর জেলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জেলেদের পরাভব ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া কী একালের 'মৌষল পর্ব' নয়? বিশেষত যখন দেখি, নব্য-যুধিষ্ঠির অনন্তও তিতাসের তীর ধরে যেতে চায় হিমাইল রাজার দেশে, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে স্বর্গলোকে। ... কেবল যুধিষ্ঠির নয়, উদয়তারা অনন্তকে শোনায় বেহুলার গল্পও–যুধিষ্ঠিরের মতো বেহুলাও উজান ঠেলে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিল স্বর্গে। বেহুলার গল্প শোনাতে শোনাতে উদয়তারা অনন্তকে জিজ্ঞাসা করেছিল–'তুই কি লখাই পণ্ডিত?' অনন্তের কাছে উদয়তারার কেন এই প্রশ্ন? অনন্ত কি লখিন্দরের মতোই পরিস্থিতির শিকার, উচ্চবর্গ-নিচবর্গের দ্বৈরথের পরিণাম? অনন্তের প্রতি উদয়তারার প্রশ্নের মাঝেই লুকিয়ে আছে আলোচ্য প্রতিবেদনের ভিন্ন এক মিথিক অনুবর্তন। ... কেবল উদয়তারার বয়ানেই নয়, এ উপন্যাসের নানা জায়গাতেই আছে পদ্মাপুরাণের কথা, বেহুলার কথা, আছে সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য-পাঠের কথা। উপন্যাসে যুধিষ্ঠিরের পুরাকথা উত্তরণের সংকেতগর্ভ, বেহুলার বৃত্তান্ত পুনরুজ্জীবনের প্রতিভাস। প্রথম গল্পস্রোত ধরে অনন্ত যাত্রা করে আরেক 'হিমাইল রাজার দেশ' শহরে, শিক্ষিত হতে; আর দ্বিতীয় স্রোত ধরে সে প্রত্যাবর্তন করে গোকর্ণ গাঁয়ে, মৃতকল্প অনন্তবালার খোঁজে। কিন্তু বিশ শতকের অনন্ত যুধিষ্ঠির নয়, নয় বেহুলাও–তাই কিছুই করতে পারে না সে; নিরাসক্তভাবে কেবল দেখতে পায় এ কালের 'মৌষল পর্ব' মালোকৌমের ধ্বংস ও বিনষ্টি। এভাবে দেখলে, একথা বলতেই পারা যায়, তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে পুরাণকথা বিনির্মাণের ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত। অদ্বৈতের অনন্ত প্রতিকল্পে যুধিষ্ঠির সঞ্চার করে উত্তরণের ইঙ্গিত, আর বেহুলা পুনরুজ্জীবনের সংকেত। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, †jvKcivY, RbmgvR I K_wkí, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ১৪৩-১৪৪)

৩১. সমালোচকের অভিমত––

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নদীনির্ভর জনগণের কতগুলো নিজস্ব সম্পদ আছে; এদের অন্যতম হলো লোকগান। লোকসঙ্গীত প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর জীবনের মহার্ঘ সম্পদ। নদী- নৌকা-মাঝি-এই তিনটি অনুষঙ্গে স্বতঃই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে উদাত্ত কণ্ঠের গান। তাইতো দেখা যায়, কোনো ঘাটে একরাতের জন্য আশ্রয়রত নানা নৌকা থেকে বিচিত্র সঙ্গীতের মূর্ছনা ধ্বনিত হয়। কোনো নৌকায় গাওয়া হয় মুর্শিদি-বাউল, কোনো নৌকায় বারোমাসি গান, কোনো নৌকায় চলে পুঁথিপাঠ, আবার কোনো নৌকায় থাকে কেচ্ছার আয়োজন। এছাড়া, ভাটির টানে নৌকা ভাসিয়ে মাঝিরা গায় ভাটিয়ালি কিংবা নৌকাবাইচের সময় বৈঠাপতনের সঙ্গে তাল রেখে সারিগান। ... নদী-নৌকা-জাল-নির্ভর মালোজীবনের কাহিনী লিখতে গিয়ে অদ্বৈত গানের ডালি দিয়ে সাজিয়েছেন এই উপন্যাসটিকে। ... তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গ, নানা ব্রতকথা, পূজা-পার্বণাদি এই উপন্যাসে সঙ্গীত নির্ভর হয়ে পরিবেশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পূর্ণ এবং আংশিক কলি নিয়ে মোট ৫৯টি গান ব্যবহার করেছেন। ... গানগুলোর অধিকাংশই মালোদের সামগ্রিক জীবনচর্যার সঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রাণের গভীর হতেই এই গানগুলোর উৎসারণ ঘটেছে। (হরিশংকর জলদাস, b'xwfwËK evsjv Dcb¨vm I ˆKeZRbRxeb, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১-১৮৩)

৩২. নাইয়র প্রথা সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে দ্রষ্টব্য : রাজিয়া সুলতানা, 'বাংলা সাহিত্যে নাইয়র-এর সামাজিক উৎস', mwnZ¨ exÿY,

বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ১৩১-১৩৯।

৩৩. সমালোচকের অভিমত--

'তিতাসে'র মানবিক ও সার্বজনীন আবেদন এবং প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও এর স্থানীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ও স্বাক্ষর। তিতাসকে কেন্দ্র করে এই জনপদে যে কালচার ট্রেটের জন্ম হয়েছে তারও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লক্ষণ প্রকাশিত এই উপন্যাসে। উদাহরণ হিসেবে তিতাস-কেন্দ্রিক নৌকা বাইচের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পর্বটি নৌকা বাইচের ওপর রচিত। এই পর্বটির শিরোনাম 'রাঙা নাও।' কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ যা তা হচ্ছে, ঔপন্যাসিক এখানে নৌকা বাইচকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেননি। নৌকা বাইচের প্রস্তুতি থেকে পরিণতি পর্যন্ত পুরো বিষয়টির সঙ্গে ঔপন্যাসিক এখানে জীবনের প্রবহমানতাকে যুক্ত করেছেন। ফলে একদিকে যেমন কাদিরের তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্তের জীবনেরও নানা বাঁকের ইঙ্গিত এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বর্ণিত অঞ্চলের সমস্ত প্রেক্ষাপট এসে মিলেছে ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে। তাতে নৌকা বাইচের সাংস্কৃতিকতা জীবনেরই ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। নৌকা বাইচের সময় গীত গানগুলি আঞ্চলিকতাকে ধারণ করা সত্ত্বেও কিংবা সে কারণেই হয়ে ওঠে হার্দ্য উচ্চারণ। (শান্তনু কায়সার, A‰ØZ gjøegY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮)

৩৪. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : ক. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, evsjvi eZ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪৩ খ. প্রদ্যোত ঘোষ, evsjvi †jvKwkí, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪ গ. খগেশকিরণ তালুকদার, evsjvi †jvKvqZ wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭ ঘ. মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পাদিত), e½xq wkí cwiPq, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪

৩৫. সমালোচক জানিয়েছেন--

উপন্যাসে লোকায়ত জনগোষ্ঠীকে জীবন্ত করে তোলার পথে সর্বাধিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সংলাপের ভাষা। বিবৃতির ভাষায় লেখক নিজস্ব বাকশৈলী ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনে কিছু আঞ্চলিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নিয়ে আসতে পারেন স্থানীয় বর্ণাভা। কিন্তু সংলাপের ব্যবহার ভিন্ন। সেখানে, যদি লেখকের জানাও থাকে সেই জন-গোষ্ঠীর মুখের ভাষা স্বরূপ, তবু তা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে সব সময় তিনি সক্ষম হন না। কারণ, সে ভাষা বোধগম্য হবে না তাঁর উপন্যাসের পাঠকদের। আবার পাঠক যে ভাষায় কথা বলে, সেই নাগরিক ও শিষ্ট চলিত বাংলাও ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তেমন হলে উপন্যাসের স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে না। মানুষগুলি হবে না জীবন্ত। ... অদ্বৈত মল্লবর্মণ কাজ করবার চেষ্টা করেন বিশেষ শব্দের প্রয়োগে, ক্রিয়াপদের বিশেষ ধরনের এবং স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে। ... অদ্বৈত মল্লবর্মণের মাতৃভাষাই ছিল সেই মালোপাড়ার ভাষা। কাজেই সমস্যা তাঁর কিছু ছিল না। (সুমিতা চক্রবর্তী, 'তিতাস একটি নদীর নাম : ভাষা ও প্রকরণ', wZZvm GKwU b'xi bvg : cm½ I Abl½, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০)

৩৬. উদ্ধৃত, আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'শওকত ওসমান', GK‡ki ¯§viKMš 2000, সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৪-১৫

৩৭. কুদরত-ই-হুদা, kIKZ Imgvb I m‡Z¨b †m‡bi Dcb¨vm : Aw½K wePvi, আদর্শ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৬

৩৮. ˆmq' AvKig †nv‡mb, cm½ : evsjv K_vmwnZ¨, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১২৩

৩৯. হুমায়ুন আজাদ, 'শওকত ওসমান : কথাসাহিত্যের পথিকৃত', ûgvqb AvRv‡'i mvÿvrKvi, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৬

৪০. এ উপন্যাসের প্রকাশ সম্পর্কে সমালোচকরা বিভিন্ন তথ্য জানিয়েছেন--

ক. আর্থ-সামাজিক চেতনানিষ্ঠ শওকত ওসমানের প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৬১)। এটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা বুকস প্রকাশনী থেকে, জানুয়ারি, ১৯৬১ সালে। এর কিয়দংশ 'সওগাত' পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৫ সনে ছাপা হয়। ...তখন এর নাম ছিল 'জিন্দান'। ১৯৬১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মুখবন্ধে এই উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

বৃটিশ আমলের পটভূমিকায় বিধৃত এই গ্রামকাহিনী অনেকের কাছে আজ রূপ কাহিনী মনে হতে পারে। ১৯৪০ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। স্বাধীন স্বদেশে এর সমাপ্তি। কাহিনীর পটভূমি চল্লিশ বছর আগেকার।

অর্থাৎ, "১৯২০ এর দশকের সময়কালের বাংলাদেশের বিশেষত শওকত ওসমানের দেখা পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙ্গা গ্রামের কৃষক পরিবারের জীবন চিত্রায়ণের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে 'জননী'র কাহিনী। এই উপন্যাসে লেখকের আর্থ-সামাজিক জীবনদৃষ্টির ব্যাপকতা তৎসঙ্গে বাংলার গ্রামীণ জীবনের নানা হাসি-কান্নার কাহিনী বিধৃত হয়েছে।" (অনীক মাহমুদ, evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ৬৬)

খ. Rbbx উপন্যাসটি উর্দুতে আম্মিজান নামে অনূদিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে Rbbx উপন্যাসটি রচনার সূত্রপাত এবং স্বাধীন স্বদেশে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর উপন্যাসটি লেখার কাজ শেষ হয়। (কুদরত-ই-হুদা, kIKZ Imgvb I m‡Z¨b †m‡bi Dcb¨vm : Aw½K wePvi, আদর্শ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৫)

গ. 'জননী' শওকত ওসমানের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাস লেখকের মুখবন্ধ 'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায়, ১৯৪০ সালে দ্বিতয়ি মহাযুদ্ধেও সময়ে এ উপন্যাস রচনার সূত্রপাত এবং স্বাধীন স্বদেশে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর লেখার কাজ শেষ হয়। 'মুখবন্ধ' থেকে আরো জানা যায় যে–

নূতন পরিবেশে খসড়া উপন্যাসের কিছু অদল বদল করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক যুগের দলিল হিসাবে, যথাযথ রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। ...উপন্যাসের কিয়দংশ 'সওগাত' পত্রিকায় ৪৪-৪৫ সনে ছাপা হয়। তখনই পুস্তকাকারে প্রকাশের সুযোগ থাকলে, রচনা বৃটিশ আমলেই সমাপ্ত হতে পারত। ... নানা ঝঞ্ঝাটে বিলম্বের সীমানা বিশ বছরে এসে দাঁড়াল। (শিরীণ আখতার, evsjv‡`‡ki wZbRb Jcb¨vwmK, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৯)

৪১. বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় শওকত ওসমানের Rbbx-র অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত––

যদিও জননী উপন্যাসের পটভূমি পূর্ববঙ্গ নয়, তবু পূর্ববাংলার উপন্যাসের আলোচনায় জননী অবশ্য আলোচ্য হয়ে ওঠে। এর কারণ একাধিক : প্রথমত, উপন্যাসটি শওকত ওসমানের রচনা, যিনি জন্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বাসিন্দা হলেও তার সৃষ্টিশীলতার বিকাশ-প্রকাশ ঘটেছে পূর্ববাংলায় তথা বাংলাদেশে। ফলে সৃষ্টিশীল সত্তা শওকত ওসমানের সৃষ্টিশীলতার পূর্ণ বিবরণ যখন হাজির করা হয় তখন সঙ্গত কারণেই তাঁর স্থান-কালনির্বিশেষ সৃষ্টিকর্মকে বিবেচনায় আনা হয়। তাই শওকত ওসমান সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্যে এবং আলোচনায় পূর্ববাংলার ভূমিজ উপন্যাস না হওয়া সত্ত্বেও জননী ধর্তব্যের মধ্যে চলে আসে। দ্বিতীয়ত, জননী উপন্যাসে প্রথম বাঙালি মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলের সংস্কৃতি এবং বহির্বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। এর আগে রচিত অধিকাংশ উপন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম পরিবার ও সমাজের মূল্যবোধের সংস্কার। সেসব উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিভাবক হয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু এ উপন্যাসে ওসমান সম্প্রদায়ের অভিভাবকের দায়িত্ব নেননি, শিল্পীর ভূমিকা নিয়েছেন। তৃতীয়ত, যে কারণে জননী বহুল আলোচিত উপন্যাস তা হলো, উপন্যাসটিতে প্রথম একজন বাঙালি মুসলমানের মহৎ শিল্পসৃষ্টির ব্যাকুলতা, সম্ভাবনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। ... এ কথা স্বীকার্য যে, একটি নির্দিষ্ট ল্যান্ডস্কেপের জীবনকে উপস্থাপনের জন্য ভাষার মধ্যে যে আকাঁড়া স্বর এবং ভঙ্গির প্রয়োজন ছিল, তা Rbbxতে নেই বললেই চলে। ... জননীর ভাষার মধ্যে কৃত্রিমতা এবং আড়ষ্টতা দুর্লক্ষ নয়। অবশ্য এটি শওকত ওসমানের যাবতীয় গদ্যকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর নিজস্ব গদ্য ভাঙা-ভাঙা, হোঁচট

খাওয়া, আড়ষ্ট। জননী তার ব্যতিক্রম নয়। (kIKZ Imgvb I m‡Z¨b †m‡bi Dcb¨vm : Aw½K wePvi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬, ৯২)

৪২. এ উপন্যাস সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত–

শওকত ওসমানের মতো কালসচেতন লেখক যে উপন্যাসটির (জননী) রচনাকালের তপ্ত পটভূমি পরিত্যাগ করে সোজা বিশ বছর পেছনের গ্রামজীবন নিয়ে লেখার মনস্থ করেছিলেন তাতে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় মেলে। আমার ধারণা তিনি সঠিক বিষয়বস্তুই বেছে নিয়েছিলেন। .. বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে শওকত ওসমান যখন গ্রামই বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাসের জন্যে, তখন নিঃসন্দেহে তিনি চটকদারির মোহ বর্জন করে দরদী শিল্পীর ভূমিকাই পালন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে আমরা পেয়েছি 'জননী'র মতো উপন্যাস– বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। যে আন্তরিকতা ও মমতার সঙ্গে তিনি এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন তা আর কোনোদিন এমন কি তাঁর মধ্যেও দেখা যায় নি। সাধারণভাবে উপন্যাস সাহিত্যের কথা ভাবলে 'জননী'কে মহৎ উপন্যাস বলা যাবে না, কিন্তু সীমিত পরিসরে এই উপন্যাসটির সার্থকতা প্রশ্নাতীত। এই শতাব্দীর প্রথমদিকের গ্রামগুলির গঠন, আর্থনীতিক বিন্যাস, হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজের বাস্তব ও সত্য সম্মিলিত জীবনযাপন, শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানুষের সহাবস্থানের প্রচণ্ড দাবি এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট তীক্ষ্ম রেখাঙ্কিত ব্যক্তি এমন ঔপন্যাসিক সততায় আমাদের উপর ছাপ ফেলে যায় যে তা কোনোরকমেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। ('দুই যুগের দেশ মানুষের কথা', nvmvb AwRRj nK iPbvmsMn-4, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮-১৯)

৪৩. শওকত আলীর অভিমত––

"জননী একজন সৃজনশীল তরুণ লেখকের জীবন ও জগৎ পর্যবেক্ষণমান ও গভীওে বিশ্বস্ততা দিয়ে নির্মিত এক নতুন শিল্পরূপ।" তিনি এই উপন্যাসের তিনটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। '১. যাপিত জীবনের বাস্তবতা উপন্যাসখানির মৌলিক উপাদান। ২. চরিত্র-সৃষ্টিতে কোনোরকম বানানো ব্যাপার নেই, চরিত্রগুলো জীবন থেকে খুবই স্বাভাবিকভাবে কাহিনীর মধ্যে উঠে এসেছে এবং ৩. ওপর থেকে চাপানো কোনো নীতিশিক্ষা কিংবা আদর্শ প্রচার এ উপন্যাস রচনার পেছনে কাজ করেনি। (শান্তনু কায়সার, kIKZ Imgvb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৪)

৪৪. সৈয়দ আকরম হোসেন জানিয়েছেন–

জননী শওকত ওসমানের মানবতাবাদী চেতনাপ্রবাহের ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ। ... সমাজের অন্তৎঅসঙ্গতিজাত দ্বান্দ্বিক অগ্রগামী চিত্ররূপ হতে গিয়েও 'জননী'র দরিয়াবিবি হয়েছে ট্রাজেডিতে পরিণত। মাতৃত্বের গৌরবই হয়েছে সারকথা। দরিয়া বিবির চেতনায় জীবনসংগ্রাম মাতৃত্ব উৎসজাত। শওকত ওসমানের Pictorial treatment এবং Dramatic treatment -এর জন্ম তার যথাস্থিতবাদী নিরাসক্ত মানসলোকে। (প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১)

৪৫. এ উপন্যাসের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সমালোচকদের মনোযোগ অর্জন করেছে। সৈয়দ আকরম হোসেন (cm½ : evsjv K_vmvwnZ¨), মনসুর মুসা (ce evOjv Dcb¨vm), শান্তনু কায়সার (kIKZ Imgvb), ভুঁইয়া ইকবাল (evsjv‡`‡ki Dcb¨v‡m mgvRwPÎ), রফিকউল্লাহ খান (evsjv‡`‡ki Dcb¨vm : wel q I wkí i /c), শিরীণ আখতার (evsjv‡`‡ki wZbRb Jcb¨wmK), হোসনে আরা জলী (kIKZ Imgvb I Ab¨vb¨ cm½), আবুল আজাদ (kIKZ Imgv‡bi Dcb¨vm), কুদরত-ই-হুদা (kIKZ Imgvb I m‡Z¨b †m‡bi Dcb¨vm : Aw½K wePvi) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। শিরীণ আখতার এক বাক্যে এ উপন্যাসে বিধৃত লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে জানিয়েছেন–– ‘মুসলিম সমাজের নানা প্রথা, লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের নানা দিকও এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।’ (পৃ. ৩৩) তিনি এরপর এ প্রসঙ্গে উপন্যাস থেকে এ সংক্রান্ত তিনটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। চন্দ্রকোটালের স্বভাবে বিদ্যমান লোকসঙ্গীতপ্রীতি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন ‘তার কথায় ও গানে গ্রামবাংলার লোকজীবনের কথা ও সুর ধ্বনিত হয়েছে। এক সময় এ ধরনের লোককবিতা ও গান সাধারণ মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত। (evsjv‡`‡ki wZbRb Jcb¨wmK, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬)

৪৬. এ উপন্যাসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি যে গ্রন্থ থেকে গৃহীত : শওকত ওসমান, Dcb¨vm mgM 1, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১। উদ্ধৃতির পৃষ্ঠাসংখ্যা পাশে নির্দেশিত।

৪৭. উদ্ধৃত, আবদুল আন্নান সৈয়দ, ˆmq` IqvjxDjøvn, অবসর, ২০০১, ঢাকা, পৃ. ৩

৪৮. সৈয়দ আকরম হোসেন, ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস : দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা’, cm½ : evsjv K_vmvwnZ¨, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯১

৪৯. সমরেশ মজুমদার, “‘লালসালু’-র পুরুষ চরিত্রানুসন্ধান”, jvjmvj : bvbv cm½, রবিন পাল (সম্পাদিত), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৫

৫০. এ উপন্যাসের প্রকাশ এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পর্কে দুজন সমালোচক জানিয়েছেন––

ক. ওয়ালীউল্লাহ্-র প্রথম উপন্যাস ‘লাল সালু’ লেখা শুরু হয় কলকাতায় ১৯৪৭ এর আগে, শেষ হয় ঢাকায়। কমরেড পাবলিশার্স থেকে লেখক নিজেই বার করেন ১৯৪৮-এ। প্রথম সংস্করণ সমাদৃত হয়নি। আবদুল মকসুদ-এর মতে কারণ চারটি–বইটির প্রচ্ছদ জয়নাল আবেদীন-এর হলেও অঙ্গসজ্জা আকর্ষণীয় ছিল না, প্রকাশের পর পরই লেখক করাচি, তারপর নয়াদিল্লী চলে যাওয়ায় প্রচার হয় নি, উল্লেখযোগ্য কোনো সমালোচনা হয় নি, উপন্যাসটি কাহিনী ও

বিষয়বস্তুতে ছিল ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারকে কটাক্ষ যা সে সময় লোকে পছন্দ করে নি। যাহোক বারো বছর পর ১৯৬০-এ ঢাকার 'কথাবিতান' থেকে 'লাল সালু'-র দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয় এবং ১৯৬১-এ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ... বইটি উর্দুতে অনুদিত হয় ১৯৬০-এ, অনুবাদক কলিমুল্লাহ, প্রকাশক পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ। ফরাসীতে অনূদিত হয় ও প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-এ, প্যারিসের বিশিষ্ট প্রকাশনী – 'এদিশিও দ্যা সই' থেকে, L'arbre sans racines নামে, অনুবাদ করেন লেখকের স্ত্রী অ্যান-মারি থিবো। ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৯৬৭-তে ইউনেস্কোর উদ্যোগে, লেখকের অনুবাদ, Tree Without Roots নামে প্রকাশ লন্ডনের চ্যাটু অ্যান্ড উইনডাস থেকে। একই সময়ে অনুবাদ হল জার্মান ও চেক ভাষার (দুশান য্বাভিতাল-এর অনুবাদ), অল্প কিছুদিন পরে চেক ভাষায়, তার পর পূর্ব বার্লিন থেকে Baum Ohne Warzhein নামে। লেখকের মৃত্যুর পর অনুবাদ হয় ইন্দোনেশীয় এবং জাপানীতে। ফরাসী অনুবাদ ফরাসী দেশ, সুইৎজারল্যান্ড, বেলজিয়ামে আগ্রহ তৈরি করে, অপরিচিত জীবনের এই উপন্যাস তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিন হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। ওই সব পত্র পত্রিকায় বইটির আলোচনা সমালোচনা বার হয়। তাছাড়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, সেনেগাল-এ এটি প্রশংসা পায়, বিক্রি হতে থাকে। ... 'লালসালু' এবং তাঁর ইংরেজি অনুবাদ Tree Without Roots কিন্তু হুবহু এক নয়। (রবিন পাল, রবিন পাল সম্পাদিত jvjmvj : bvbv cm½, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮-৯)

খ. 'লালসালু' প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য–– জুলাই ১৯৪৮। কমরেড পাবলিশার্স, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৬০, কথা-বিতান, ঢাকা। তৃতীয় থেকে সপ্তম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ পর্যন্ত। অষ্টম সংস্করণ : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। (আবদুল মান্নান সৈয়দ, ˆmq' IqvjxDjøvn্, অবসর, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭৩)

৫১. চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন––

সাহিত্যিক হতে হবে ব'লে লেখা ... সে আমি ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা! আপনা থেকে যা বেরুবে তা-ই খাঁটি। æI want to write" মুসলমান সমাজ নিয়ে–আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সে দিক পানে। এও একরকম passion থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা–এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত (?) করতে চাই। আমি আমার আঁকা ছবিতে সে-সমাজকে প্রতিফলিত করতে চাই, যাতে তারা নিজের সুষ্ঠু চেহারা দেখবার সুযোগ পায়। ... পশ্চিম জগত যতখানি এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরী। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়তো ততখানি এগিয়ে যাবো না বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমার লেখা পিছিয়ে রাখবো যারা পিছিয়ে আছে। তাতে আমার ক্ষোভ নেই, এবং এতে বড় রকম একটা sacrifice হবে অনেকে বলতে পারেন কিন্তু তাতে আনন্দ নেই, আছে সেই জ্ঞানে যে আমি মানুষ হিশেবে উৎরে গেলাম, ওরাও যুগোপযোগী সাহিত্য পেলো, সে সাহিত্যে কিছুটা হয়তো ভবিষ্যতের স্বপ্নের যোগ ছড়িয়ে থাকলো। (সৈয়দ আবদুল মকসুদ, ˆmq' IqvjxDjøvn-i Rxeb I mvwnZ¨ (প্রথম খণ্ড), মিনার্ভা বুকস, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৬৫)

৫২. এ উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন--

একটি উপন্যাসের বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরে ভাবছি। একজন গ্রামের সাধারণ মানুষ যার সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সে ব্যবসা হিসেবে বেছে নিল কবরপূজা। এ লোকটি কি রকম আচরণ করে তা আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। চট্টগ্রামে আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন লোক হঠাৎ উঁচু একটা মাটির ঢিবির ওপর চুনকাম করে তার ওপর লালসালু বিছিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে পয়সা নিতে লাগল। সরল বিশ্বাসী পথচারীরা চিরন্তন বিশ্বাসের ভারে এতই অভিভূত যে তারা নানাবিধ কামনায় সেখানে টাকা পয়সা দিতে লাগল। আমাদের দেশে এরকম দরগা কিন্তু অনেক গড়ে উঠেছে। ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না জানি, তবুও এ ব্যবসা ক্রমান্বয়ে প্রসারের পথে। এইরকম একজন ব্যবসায়ীর চাতুর্যকে আমি আবিষ্কার করতে চাই, আবার মমতার মধ্যেও তাতে পেতে চাই। এটা কি করে সম্ভব হবে আমি জানি না কিন্তু আমি চেষ্টা করছি। (তানভীর মোকাম্মেল, ˆmq' IqvjxDjøvn wmwmdvm I Dcb¨v‡m HwZn¨ wRÁvmv, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৪)

৫৩. এ উপন্যাস সম্পর্কে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক অভিমত--

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পী মনের প্রবণতা জীবন-বাস্তবতার ভেতরের দিকে চ'লে যাবার। যে বাস্তবতা শুধু চোখে লাগে, যা কেবলমাত্র বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তেমন বাস্তবতা এই লেখকের কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব নয়। বরং যে-বাস্তবতা জীবনের সঙ্গে যুক্ত, যার ভেতরে জীবনের সজীব সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রহস্য–বাইরের ঘটনা ও মানুষের ক্রিয়াকলাপের উৎস যেখানে–লেখক যেন সেইখানে পৌঁছাতে চান। ...লালসালুতে প্রত্যক্ষ বাস্তবতাই প্রধান। লেখক আমাদের এমন এক গ্রামীণ সমাজে নিয়ে যান যেখানে যুগ যুগ ধরে মানুষের মনের চারিদিক ঘিরে অসম্ভব শক্ত অথচ অদৃশ্য একটি বেষ্টনী : মানুষ যেখানে সমস্ত কিছুই ভাগ্য বলে মেনে নেয়, অলৌকিকত্বে যেখানে তার অগাধ বিশ্বাস। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই দৈবশক্তির লীলা দেখতে পায় সে, আর তাতে তয় পায়, শ্রদ্ধা করে এবং কখনো কখনো ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়ে। কাহিনী যতোই উন্মোচিত হতে থাকে ততোই দেখা যায় শস্যেও চাইতে টুপির সংখ্যা বেশি। কেবলি কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস–সেই সঙ্গে তার অনিবার্য পরিণতি ভয় এবং আত্মসমর্পণ। বিরুদ্ধে যায় না কেউ–গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। লেখক দেখান সেই সমাজের পরতে পরতে কেবল শোষণ আর শোষণ–দেহের, মনের এবং জীবনের। ... এ সমাজকে কল্পনা করে নিতে হয় না। বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামাঞ্চলে সমাজের ভেতরকার চেহারা এরকমই। (শওকত আলী, "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস", kIKZ Avjxi ceÜ, শ্রাবণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১)

খ. চারের দশক ও পাঁচের দশকের প্রথমদিকের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসগুলোর ...ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সবচেয়ে প্রতিভাবান, সচেতন ও শক্তিশালী শিল্পী। সম্ভবত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এখনো (আটের দশক) তিনি তাই। ... জীবননিষ্ঠা ও আধুনিক শিল্প-প্রকরণ, তীব্র শৈল্পিক সচেতনতা ও দক্ষতা,স্নায়ু-ছেঁড়া সংযম ও পরিমিতিবোধ, নিচু ও নির্বিকার উচ্চারণ–আধুনিক সুনির্মিত উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌তে পাওয়া যায়। 'লাল সালু' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের উপন্যাস আধুনিক কথাসাহিত্যে প্রবেশ করে। ... 'লাল সালু'ই সম্ভবত গ্রাম্য সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে দুর্মর, কুসংস্কার এবং ধর্মব্যবসার মর্মান্তিক প্রকৃতি নিরুপণে প্রথম আধুনিক প্রচেষ্টা। আমাদেও বাঙালি মুসলমান গ্রামসমাজ এই প্রথম একজন নির্মম পর্যবেক্ষকের ও প্রথম শ্রেণীর

সাহিত্যিকের হাতে বিশ্লেষিত হলো। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কৃতিত্ব একজন সমাজবিজ্ঞানীর কিন্তু ততোধিক বোধহয় একজন বড়ো শিল্পীর। মিতভাষণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, শাণিত, ঋজু ও ধনুকের জ্যা-ও মতো টানটান বাক্যবন্ধ, অন্তর্লীন আবেগের প্রচণ্ড চাপ, মোহহীন বুদ্ধিদীপ্ত মনোভঙ্গি এবং অনন্যলক্ষ দৃড় নির্মাণ-সাফল্য–ইত্যাদি বহুবিধ সিদ্ধি অর্জনে ‘লাল সালু’র লেখক এমন কৃতিত্ব প্রদশৃন করেছেন যে তাঁকে ভাবালু বাঙালি ঔপন্যাসিকদেও দলভুক্ত করতেই অসুবিধা হয়। ব্যক্তির মনের ভেতরটায় আলো ফেলে তন্নতন্ন অনুসন্ধানের কাজটাও তিনিই প্রথম করেন। (হাসান আজিজুল হক, ‘দুই যুগের দেশ মানুষের কথা’, nvmvb AwRRj nK iPbvmsMn-4, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩ পৃ. ২১-২২)

গ. বাংলার মুসলমান ধর্মভীরু, এবং এক শ্রেণীর মোল্লা, মোতাওয়াল্লি, ভণ্ডপীর এই জিনিসটাকে কাজে লাগিয়ে ধর্ম - ব্যবসা করে। এই সমাজ-সত্যটাকে অবলম্বন করে আলোচ্য উপন্যাস লেখা হয়েছে। ...লাল সালু’ উপন্যাসে দেখা যায়, ধর্ম সম্পর্কে এর লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোনো মোহ নাই। তবে মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব কত গভীর সেটি তিনি দেখিয়েছেন। ... ধর্ম ও সমাজ এই উপন্যাসে জড়াজড়ি ও মাখামাখি হয়ে আছে। ... আমাদের গ্রামীণ সমাজ লৌকিক সমাজ। সেখানে ধর্ম আর লোকাচার, প্রথা, সংস্কার, লোক-বিশ্বাস একাকার হয়ে যায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে এই জিনিসগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাই সমাজদৃশ্যগুলি বড় বাস্তব মহিমায় উজ্জ্বল আর জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। বশীর আল হেলাল, “‘লাল সালু’ উপন্যাসে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ-বিশ্লেষণ”, jvjmvj Ges IqvjxDjøvn, মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পাদিত), অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮]

৫৪. এ উপন্যাসের উদ্ধৃতিসমূহ যে গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে : [ˆmq‘ IqvjxDjøvn iPbvejx (c_g LÐ), সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত ও সংকলিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মাঘ ১৩৯২। উদ্ধৃতির পাশে গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীতে উল্লেখিত।]

৫৫. সমালোচকের অভিমত––

সম্প্রদায়ে একজন ম্যাজিকম্যান থাকবে যে অশুভ শক্তিসমূহকে রুখবে, প্রায় প্রতিটি প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায়েরই এ এক আদিম প্রথা। ভুঁয়ো মাজারের খাদেম মজিদ আদিম ম্যাজিকম্যানদের সেরকমই এক আর্কিটাইপ যেন। ... মোহব্বতনগর কৃষিভিত্তিক গ্রাম, তবে অধিবাসীরা আরো কৃষিজ। কৃষি ও জমির ভূমিকা নিয়ামক ও সর্বত্র অনুভূত। ধর্ম, খোদা ও (সামাজিক) উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরিই তাদের উৎপাদন-প্রক্রিয়া, কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত ... “লালসালু”-তে আমরা দেখি ধর্ম ক্রমশই অবস্থান নিচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিপ্রতীপে। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সনাতন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই কৃষিজ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। কিন্তু এদেশে উন্মুল, ও মূলত পণ্যবাণিজ্যভিত্তিক ইষলাম ধর্মের, একটা স্ববিরোধিতা রয়েই গেছে কৃষি ভিত্তিক পূর্ববঙ্গের মুসলমান গ্রামীণ সমাজের স্বাভাবিক জীবনাচরণের সঙ্গে। কৃষিনির্ভর বাঙালি মুসলমানের পরিচয়-সঙ্কটের এটাও অন্যতম মূল অবজেকটিভ কারণ। যে সঙ্কট হয়তো আরো তীব্র হয় মজিদের আর্কিটাইপ-রূপী-পেশাদার-ধর্ম ব্যবসায়ীদের দ্বারা ধর্মের লোকজ উপাদানগুলিকে অস্বীকৃতির চেষ্টায়। (তানভীর মোকাম্মেল, ˆmq‘ IqvjxDjøvn wmwmdvm I Dcb¨v‡m HwZn¨ wRÁvmv, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬)

৫৬. এ উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক অভিমত–

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শুধু কথা-শিল্পী ছিলেন না, ভাষা-শিল্পীও ছিলেন। ভাষা পরিচর্যায় তাঁর আগ্রহ ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ করার সময় লালসালুর প্রথম সংস্করণের প্রকাশভঙ্গী, বাক্যগঠন ও বানানরীতিতে তিনি উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। লালসালুর ভাষার অন্য এক তাৎপর্য আছে–ভাষা প্রয়োগে যাথার্থ্য ও শুদ্ধাশুদ্ধ সংস্কারের প্রশ্নে লালসালুর শিল্পী যাথার্থ্যের দিকে ঝুঁকেছেন জীবন সংলগ্নতার কারণে। ভাষা-শিল্পী হিসেবে এখানেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কৃতিত্ব। [মনসুর মুসা, 'লালসালু : ভাষারীতি', jvjmvj Ges IqvjxDjøvn, মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পাদিত), অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৭৩]

খ. jvjmvj-র শিল্পগৌরবের একটি প্রান্তবিন্দু এর ভাষা যা আরবি-ফারসি শব্দ, আঞ্চলিক বুলির ব্যবহার কিংবা ক্রিয়াপদ, নাম-প্রতিনাম পদের ব্যবহার- নৈপুণ্যের মধ্যেই কেবল সীমায়িত নয়। ... jvjmvj-র ভাষা এ উপন্যাসের চরিত্রাবলির অভিজ্ঞতারই ভাষা; ঔপন্যাসিকের দেশকাল-সমাজ ও সময়-সচেতনতার শব্দরূপ (জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ˆmq' IqvjxDjøvn : Rxeb'kb I mwnZ¨Kg©, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১৩-১১৫)

গ. উপন্যাস হিসেবে লাল সালু'র যে পার্থক্য লেখকের অন্য দুই উপন্যাস থেকে আলাদা হয়ে ধরা পড়ে তা হলো সংলাপের পর্যাপ্ত ও যথাযথ ব্যবহার। কথোপকথন সাধারণত আঞ্চলিক ভাষায় হলেও কোন ধরনের পাঠকেরই তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। পরিমিত সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রায়ণে যে বৈচিত্র্য এসেছে তা 'লাল সালু'র এক লক্ষ্যযোগ্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও সফলতা। (আবু রুশ্দ, kIKZ Imgvb I ˆmq' IqvjxDjøvni Dcb¨vm, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫৬)

ঘ. 'লালসালুঃ উপন্যাসের ভাষা এর শিল্পরূপের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ... আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের ফলে পাত্র-পাত্রী ও পরিবেশ অধিক সজীব হয়ে উঠেছে এখানে। সচেতন শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী প্রয়োজনমতো ভাষা ও শব্দ চয়ন করেছেন। তাই দেখা যায়, কোনো কোনো সময়ে মজিদ বক্তৃতা দেয় সংস্কৃতগন্ধী পোশাকী ভাষায়। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে সে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে। আবার আরবি-ফারসি শব্দমালার ব্যবহারও লক্ষণীয়। (শিরীণ আখতার, evsjv‡'‡ki wZbRb Jcb¨wmK, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬)

৫৭. evsjv‡'‡ki wZbRb Jcb¨wmK, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

৫৮. আহমাদ মাযহার, 'আবু ইসহাক : জীবন ও কর্ম', মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), EIv‡jv‡K নব পর্যায় পঞ্চম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ২২০

৫৯. 'আবদুল হকের চোখে আবু ইসহাক', ভূমিকা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : আহমাদ মাযহার, আবদুল হকের দিনলিপি থেকে উদ্ধৃত, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত) EIv‡jv‡K নব পর্যায় পঞ্চম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ২১৩

৬০. সমালোচকের অভিমত--

'তিনি ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের করাচিতে বসে cÙvi cjøxc রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রচনার শুরুও করেছিলেন সম্ভবত সেখানেই। যদিও উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর। ... উপন্যাসটির ষোলটি অধ্যায় ১৯৭৪-৭৬ কালপর্বে বাংলা একাডেমীর সাহিত্য-সাময়িকী 'উত্তরাধিকার'-এ মুখর মাটি নামে ছাপাও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ খিস্টাব্দে উপন্যাসটির রচনা সম্পূর্ণ হয় ও ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। এত দীর্ঘ সময় ধরে একটি উপন্যাস লেখার দৃষ্টান্ত বিরল। বুঝতে অসুবিধা হয় না পদ্মার পারিবেশিক বাস্তবতায় আশৈশব বড় হয়ে ওঠা আবু ইসহাকও একই সঙ্গে দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধানকে ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার শিল্পকৃতিকে শুদ্ধতর করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। [ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'পদ্মার পলিদ্বীপ : জীবনযাত্রা ও রোমান্স', মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), El¨‡j¨‡K নব পর্যায় পঞ্চম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৯]

৬১. 'আবদুল হকের চোখে আবু ইসহাক', ভূমিকা গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : আহমাদ মাযহার, 'আবদুল হকের দিনলিপি' থেকে উদ্ধৃত, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত) El¨‡j¨‡K, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬

৬২. কথাশিল্পী হরিপদ দত্তের প্রাসঙ্গিক অভিমত--

আবু ইসহাক ছিলেন ... খাঁটি লেখক ... এই নিভৃতচারী কথাশিল্পীকে তাঁর নিজের লোকেরাই জানতো না, যারা গ্রামে বসবাস করে। তাঁর সাহিত্যের উৎস এবং প্রবাহ তো সেই গ্রাম। ... তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে mh-'xNj evox উপন্যাস। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগের ভিতর দিয়ে অস্তিত্ব-সংগ্রামী মানুষের স্বপ্নভঙ্গের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি এই উপন্যাস। উপন্যাসটি সর্বাংশে হয়ত-বা শিল্পগুণে অন্বিত নয়, তবু কালচেতনায় তার আবেদন অনেক বড়। ... আবু ইসহাকের পদ্মার পলিদ্বীপ উপন্যাস স্বাধীনতা-উত্তর রচনা। এই উপন্যাসও ধারণ করে আছে মানুষের অস্তিত্ব-সংগ্রাম। খেয়ালী পদ্মার ভাঙন, গ্রাম-বিলয় এবং মানুষের উন্মুল জীবন এর উপাখ্যান ভাগ। এই উপন্যাসে আবু ইসহাককে আরো গভীর সংস্কৃতি-সচেতন শিল্পী হিসেবে শনাক্ত করা যায়। সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাস যে-লেখককে গ্রাম জীবনের দ্বান্দ্বিক গতি-প্রকৃতি অনুভবের ক্ষেত্রে উদাসীন করে রেখেছিল, পদ্মার পলিদ্বীপ সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিয়েছে। সূর্য-দীঘল বাড়ী যদি স্কেচধর্মী হয় তবে পদ্মার পলিদ্বীপ উপন্যাস অবশ্যই মানব অস্তিত্বেও প্রবহমান বাস্তবতা। ...আবু ইসহাকের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজের সম্পর্কে নির্লিপ্ততা। আত্মপ্রচার বিমুখ এই শিল্পীর সবটুকু দাবিই ছিল আপন শিল্পসত্তার কাছে, খ্যাতি-বাসনার কাছে নয়। ['আবু ইসহাকের কথাসাহিত্য মূল্যায়নের কিছু খণ্ডচিত্র', K_wkíx Ave BmnvK, ফজলুল হক সৈকত (সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২২৭-২২৮]

৬৩. এ উপন্যাস রচনার পটভূমি সম্পর্কে লেখক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন--

১৯৪৪ সালে আমার পোস্টিং হয় নারায়ণগঞ্জে। ... ছুটির দিনে নারায়ণগঞ্জ থেকে বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করার জন্য ঢাকায় যেতাম। তখন দেখতাম জয়গুনের মতো মেয়েদের চাল কেনার জন্যে ময়মনসিংহ যেতে। আবার

বিকেলেও, ফেরার সময় দেখতাম ওদের। ফতুল্লায় পৌঁছার আগেই ওরা ট্রেন থেকে চালের থলে দুপদুপ করে ফেলে দিত। ওখানে দু-একটা ছেলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। এ বিষয় নিয়েই একটা গল্প লিখতে শুরু করি। লিখতে লিখতে মনে হলো এটার মধ্যে উপন্যাসের এলিমেন্ট আছে। ... নারায়ণগঞ্জে বসে উপন্যাসটি অর্ধেকটা লিখি, বাকি অর্ধেকটা লিখতে হয় পাবনায় বসে। (সৌভিক রেজা, 'নতুন অনুসন্ধিৎসার আলোকে সূর্য-দীঘল বাড়ী', K_wk‡íi K_v, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪৭)

সমালোচক জানিয়েছেন--

আবু ইসহাক তাঁর 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাস রচনায় হাত দেন ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের কিছু পরে, অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে। উপন্যাসের অর্ধেকেরও বেশি অংশ তিনি লেখেন নারায়ণগঞ্জ থাকাকালে। বাকি অংশ শেষ করেন ১৯৪৮ সালে; চাকুরি উপলক্ষে পাবনায় অবস্থানকালে। ১৯৫০-১৯৫১ সালে এটি 'নওবাহার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরে নবযুগ প্রকাশনী এটি কলকাতা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে ১৯৫৫ সালে। ... লেখক গ্রাম-বাংলার ওঝা-ফকিরের ঝাড়ফুঁক ও অসহায় রমণীদের দুঃসহ জীবন সংগ্রামও দেখেছেন। লেখকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তাঁর মামাবাড়ির পাশে একটা ছাড়া-ভিটে ছিল। সেই ভিটের নাম 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'। সে বাড়িতে মানুষজন স্থায়ীভাবে বাস করতে পারতো না। যারা করেছে তারা সবংশে নির্মূল হয়েছে। এ রকম একটি কিংবদন্তি তিনি তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন। (শিরীণ আখতার, evsjv‡'‡ki wZbRb Jcb¨wmK, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১)

৬৪. এ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত--

ক. সূর্য দীঘল বাড়িকে আমি তেমন বড়মাপের লেখা মনে করি না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আমল থেকে সমালোচকদের উপন্যাস আলোচনায় সূর্য দীঘল বাড়ি প্রথমেই উচ্চারিত হচ্ছে এবং খুব গুরুত্বের সঙ্গে তা উল্লেখিত হচ্ছে। এখন বাংলাদেশের সাহিত্য আলোচনার সময়ও সূর্য দীঘল বাড়ির কথা বার বার আসে। কিন্তু এরচেয়ে ভালো লেখা হয়েছে, বড়ো মাপের কাজ হয়েছে। (সৈয়দ শামসুল হক, ûgvqb Avn‡g‡'i mvÿvrKvi, তালহা বিন জসিম, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬১)

খ. শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসও ... শীর্ণ তর্জনী তুলে আমাদের গ্রাম সমাজের গলিত, ধসে-পড়া, বিবর্ণ, দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত, কুসংস্কার-শাসিত চেহারার দিকে ক্রমাগত ইঙ্গিত করতে থাকে। বস্তুত 'সূর্য দীঘল বাড়ি' ... চিরায়ত বাংলাদেশের গল্প এবং গল্প পাঠ করলে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, শহরের বিকাশ আর জলুস এমন মিথ্যা আর তেতো বলে মনে হয় যে নিশ্চিন্ত মনে মুখে অন্ন তুলতে ঘৃণা হতে থাকে। একটা অপরাধবোধের জ্বালা অবিরাম পীড়ন করতে থাকে আমাদের। ... তবে উপন্যাসটির শিল্পসিদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় বই কি! পড়বার সময় মনে হয় যেন একটি ক্যামেরা অতি ধীরে আমাদের গ্রামসমাজের ভিতরে, গরিব মানুষের উঠানে, শোবার ঘরে, গোয়ালে, রান্নাঘরে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। উপন্যাসের সমস্ত উপাদান, জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও খবর শিল্পীর কল্পনা ও সৃষ্টিনৈপুণ্যে জারিত হয়ে অনন্য হয়ে উঠতে পারছে না– কোনো একটা দৃষ্টি গড়ে উঠছে না, উপন্যাস একটি জীবন্ত সত্তায় পরিণত হচ্ছে না। (হাসান

আজিজুল হক, 'দুই যুগের দেশ মানুষের কথা', nvmvb AwRRj nK iPbvmsMn (চতুর্থ খণ্ড), সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২০)

গ. আবু ইসহাকের mh'xNj evwo (১৯৫৫) বহু বিতর্কিত উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব বাংলার সমালোচকগণ একে 'বিস্ময়কর', 'শিল্পকুশল', 'সার্থক সাহিত্য', 'স্মরণীয় সাহিত্য' বলে প্রশংসা করেছেন এবং অপরপক্ষে কেউ কেউ mh'xNj evox-কে 'সার্থক উপন্যাসই নয়', স্কেচধর্মী রচনা' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এবং এর সমর্থনে সাংগঠনিক ত্রুটি ও চরিত্রচিত্রণের অপরিমিতির উদাহরণও গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। সব সমালোচকের উক্তিগুলো পরীক্ষা করলে একটা সত্য পাওয়া যায়, কিন্তু তার কারণ পাওয়া যায় না। আবু ইসহাকের mh'xNj evwo ভূতুড়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো গৃহকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, উন্মূলিত জয়গুন-পরিবারের জীবন-অন্বেষার কাহিনী। ... জয়গুনের জীবনসংগ্রাম ও অবশেষে ছিন্নমূল হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মাঝেও যে mh'xNj evox-র ট্রাজিক পরিণাম দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, তার কারণ আবু ইসহাকের শিল্পদৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা। আবু ইসহাকের চোখের এবং মনের দেখা জীবন ও জীবনচিত্র-মননে পরিশীলিত হয়ে প্রাগ্রসর চেতনাপুঞ্জের শব্দরূপ পায়নি। আবু ইসহাক আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছেন যে, গ্রামীণ পরিবার উন্মূলিত হচ্ছে নতুন সমাজব্যবস্থার কৃত্রিম বিন্যাসে। ... আবু ইসহাক গ্রামজীবনের স্থবিরতার চিত্রে অধিক আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু আপাত স্থবিরতার মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল গতি বহমান তা তিনি ধরতে পারেননি। এ-কারণে তাঁর বাস্তব আবেগীচিত্রগুলিতে বেগ সঞ্চার হয়নি। (সৈয়দ আকরম হোসেন, cm½ : evsjv K_vmvwnZ¨, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১০২-১০৩)

ঘ. পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০/১৯৪৩) থেকে দেশবিভাগ (১৯৪৭)–এই পাঁচ বছরের সময়-পরিসরে এ-উপন্যাসের ঘটনাংশ বিস্তৃত হলেও জয়গুন পরিবারের জীবনান্বেষার স্বরূপ-উন্মোচনই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। বহমান সময়ের পট-পরিসরে বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন ও সেই জীবন-অন্তর্গত মানুষের অস্তিত্ব-অন্বেষার ভয়াল রূপ চিত্রিত করেছেন আবু ইসহাক। কিন্তু জীবনকে সর্ব-আয়তনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন ও রূপায়ণে তিনি সর্বাংশে সক্ষম হন নি। জীবনের বহির্চিত্র অঙ্কনের আত্যন্তিকতায় তাঁর mh-'xNj evox পাঠকচৈতন্যে গভীর জীবনবোধ সঞ্চারে ব্যর্থ হয়। কিন্তু জীবন-নির্বাচনে সমকালমনস্কতা এবং রূপায়ণে বস্তুনিষ্ঠ নিরাসক্তি এ-উপন্যাসকে নবতর মাত্রা দান করেছে। (রফিকউল্লাহ খান, evsjv‡'‡ki Dcb¨vm : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৭০)

ঙ. গ্রামের মানুষ ও সমাজ নিয়ে যে সকল লেখক সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের কথাশিল্পী আবু ইসহাক অন্যতম। উভয় বাংলার ... কথাসাহিত্যের মধ্যে তাঁর 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি এক বিশেষ স্থান দখল করেছে। নিঃসন্দেহে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। উপন্যাসটি প্রথমে নওবাহার পত্রিকায় ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৫৫ সালে কলকাতার 'নবযুগ' প্রকাশনী থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর তা সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। [বীরেন চন্দ, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী : নিপীড়িত মানুষের উত্তরণের কাহিনী' K_wkíx Ave BmnvK, ফজলুল হক সৈকত (সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৮]

৬৫. এ উপন্যাসের রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে সমালোচক যেসব তথ্য জানিয়েছেন––

আবু ইসহাক ... ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের করাচিতে বসে cÙ¥i c¥jøxc রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রচনার শুরুও করেছিলেন সম্ভবত সেখানেই। যদিও উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর। পঁচিশ বছরের দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠা এই উপন্যাসটির ষোলটি অধ্যায় ১৯৭৪-৭৬ কালপর্বে বাংলা একাডেমীর সাহিত্য-সাময়িকীতে gLi g¥U নামে ছাপাও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটির রচনা সম্পূর্ণ হয় ও ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। এত দীর্ঘ সময় ধরে একটি উপন্যাস লেখার দৃষ্টান্ত বিরল। [ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'পদ্মার পলিদ্বীপ : জীবনযাত্রা ও রোমান্স', El¥‡j¥‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ২৯]

৬৬. সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক অভিমত--

ক. পদ্মার পলিদ্বীপ-য়ে চিত্রিত হয়েছে পদ্মার চরাঞ্চলের জীবন, এই জীবনের সঙ্গে আবু ইসহাক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এই জীবনে আছে প্রকৃতির আশীর্বাদ, যা সময় সময় অজস্র; কিন্তু তেমনি আছে তার অন্ধ নিষ্ঠুরতা। ... আবু ইসহাক পল্লীজীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। পদ্মার পলিদ্বীপ-এ পল্লীজীবনের একটা বিশেষ দিক, চরাঞ্চলের সংঘাতময় জীবনের কথা নিয়ে লিখেছেন। এই বিশেষ দিকটির সঙ্গে তিনি উত্তমরূপে পরিচিত। বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার তিনি সুব্যবহার করেছেন। পল্লীগ্রামের দোওয়া-দরুদ-যাদু-টোনা-পানিপড়ার অন্ধকার জগৎকে তিনি জানেন এবং তার অনেক চিত্র দিয়েছেন। [আবদুল হক, 'আবু ইসহাকের পদ্মার পলিদ্বীপ', El¥‡j¥‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭-১৮৯]

খ. 'খুনের চর'কে উপলক্ষ করে 'কোলশরীক' ও 'চাকরিয়া'দের জীবনযাত্রার বাস্তবতা cÙ¥i c¥jøxc উপন্যাসের গৌরব। ঔপভাষিক সংলাপ, পদ্মার জল মাটি ও পারিবেশিক বাস্তবতা থেকে উত্থিত প্রবাদ-প্রবচনের সমাহার এবং সর্বদর্শী কথাশিল্পীর ভাষ্যে ব্যবহৃত আঁকাড়া ঔপভাষিক শব্দ, পদ্মাবিধৌত জীবনের আঞ্চলিক রূপ ও ধ্বনির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। ... ঘটনা-পরম্পরায় আগত চরিত্রসমূহের উচ্চারিত সংলাপে এবং সর্বদর্শী ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তিনি যে-সব প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা যেমন চরজীবনের তৃণমূল-সম্পৃক্ত তেমনি ঔপন্যাসিকের দক্ষতা, ঔচিত্যবোধ এবং জীবন-অভিজ্ঞতারও স্মারক। ওইসব প্রবাদ-প্রবচনের অনেকগুলি প্রচলিত বাগধারা অভিধানে সংকলিত হয়নি। বোঝা যায়, পদ্মাবিধৌত বাংলাদেশের চরজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভিন্ন ওইসব প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারা যে-সব মানুষের বাগভঙ্গির অংশ, তাঁদের সঙ্গে আবু ইসহাকের ছিল নিবিড় সংযোগ। [ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'পদ্মার পলিদ্বীপ : জীবনযাত্রা ও রোমান্স', El¥‡j¥‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১]

গ. পদ্মা-তীরবর্তী অন্ত্যেবাসী জনগোষ্ঠীর লোকায়ত জীবন ও প্রান্তিক সংস্কৃতি আলোচ্য উপন্যাসটিতে নিয়ে এসেছে ভিন্ন এক মাত্রা। সন্দেহ নেই, বক্ষ্যমান প্রতিবেদনে লোকায়ত সংস্কৃতির নানা প্রান্তের বিশ্বস্ত ছবি নির্মাণ ছিল উপন্যাসকারের প্রধান অন্বিষ্ট। লোকবিশ্বাস আর লোকায়ত সংস্কৃতির কুশলী উপস্থাপনা পদ্মা-তীরের ভিন্ন বাস্তবতার পরিচায়ক। ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকছড়া, লোকক্রিড়া–এসব নিয়েই আলোচ্য প্রতিবেদনের লোকসংস্কৃতির বিশাল জগৎ। পদ্মার পলিদ্বীপ এ কারণেই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে যে, আখ্যানের মৌল বয়ানের সঙ্গে অন্তর্বয়নে এখানে উপস্থাপিত হয় নানা মাত্রিক লোকসংস্কৃতি। [বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'পদ্মার পলিদ্বীপ : পাঠোত্তর প্রতিবেদন', El¥‡j¥‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

ঘ. পলিদ্বীপের অবস্থানগত বর্ণনা; সেখানকার মানুষের জীবন-যাপন, উত্থান-পতন, নদী-চরের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। ... খুনের চর, লটাবনিয়া, আসুলী, মিত্রের চর, চর ধানকুনিয়া, চর পাঙ্গাশিয়া, কুমীরভাঙ্গা, বগাদিয়া, দিঘলী, গুণগাঁ, নয়াকান্দি, দিঘীরপাড়ের হাট–এসব অঞ্চলের যাপিত জীবন ও চালচিত্র বর্ণনায় উপন্যাসে যে ঘটনাপ্রবাহ অনুপুঙ্খে রচিত হয় তা বিশ্বস্ততার চূড়া স্পর্শ করেছে। শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতির অবিকল রূপ অনুভবে এনে লেখক প্রবাদ-প্রবচন, ছন্দে-গাঁথা গান, রন্ধন শৈলী, ব্যঞ্জন, পেশা ও জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবহার্য উপকরণ আঙ্গিকে এনেছেন। দ্বীপ ও চরের মানুষের নৈমিত্তিক জীবনাচরণ, তাদের চর্চিত স্বপ্নসাধ-ব্যথাবেদনা, প্রতিরোধী জীবনসংগ্রামের উজ্জীবনী মন্ত্র ঐক্যসূত্রে এবং সমগ্রতায় বেঁধেছেন লেখক। [শহীদ ইকবাল, 'পদ্মার পলিদ্বীপ : বিষয় ও বিন্যাসে', El¨‡j¨‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২]

৬৭. এ প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন--

লোকক্রিড়া গ্রামীণ জীবন-বাস্তবতার এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। লোকক্রিড়ার এক মর্যাদার লড়াই পদ্মার পলিদ্বীপ উপন্যাসকে স্মরণীয় করে রেখেছে। জীবনবৃত্তের অনিবার্য প্রকাশ ঘটে যে লোকক্রিড়ায় আঞ্চলিক উপন্যাসে তার রূপায়ণ ঔপন্যাসিকের আয়ত দৃষ্টিভঙ্গিরই দ্যোতক। ... জীবন-বাস্তবতার পটভূমিকাতেই উত্তেজনামুখর কাবাডি খেলার আয়োজন। ফজল যে ক্রমশ চরের কোলশরীকদের নেতা হয়ে উঠবে, তার প্রস্তুতি হিসেবেও এর গুরুত্ব সমধিক। পদ্মার পলিদ্বীপ উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনযাত্রার যে বাস্তবতা রূপান্বিত হয়েছে, কাবাডি খেলার উত্তেজনা-মাখা অনুষ্ঠানটি মনে হয় তার শিখর। মর্যাদা, প্রতিপত্তি, কলঙ্ক-অপনোদন ও উত্তেজনা-উৎকণ্ঠার মেশামেশিতে উদ্বেলিত এবং অনিশ্চিত জয়-পরাজয়ের সূক্ষ্মতম সীমায় উত্তীর্ণ, সমাগত খেলোয়াড় ও দর্শকদের ঔপন্যাসিক যে প্রক্রিয়ায় ও ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, তা লোক-জীবনযাত্রার অবিমিশ্র শুদ্ধতা পেয়েছে এবং উপন্যাসটিকেও স্মরণীয় করে রেখেছে। [বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'পদ্মার পলিদ্বীপ : পাঠোত্তর প্রতিবেদন', El¨‡j¨‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫]

৬৮. এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত জানতে দ্রষ্টব্য-- দীপঙ্কর ঘোষ, evsj¨vi g‡Lvk, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৬১-১৬২

৬৯. সমালোচকের অভিমত--

এ উপন্যাসে আবু ইসহাক ভাষা-নির্মাণে বিশেষত মুন্সীগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্যের অনুসারী। এ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে তিনি নিঃসন্দেহে দক্ষ ও সাবলীল। চলিত ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণে যে ভাষারূপ নির্মিত হয়েছে, তা কখনোই এ উপন্যাসের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন মনে হয়নি। বিশেষত সংলাপ নির্মাণে আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির ব্যবহারে লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। [গিয়াস শামীম, 'পদ্মার পলিদ্বীপ', El¨‡j¨‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২]

৭০. সমালোচকের অভিমত--

দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী গ্রামীণ জনপদ ও তার সংগ্রামশীল জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছে শামসুদদীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)-এর সাহিত্যভুবন। নিম্নবর্গের গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণে তাঁর সিদ্ধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। খেটে-খাওয়া অসহায় মানুষ ও তাদেও জীবনযুদ্ধ শামসুদ্দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যের এক পৌনঃপুনিক অনুষঙ্গ। বিশ শতকের কলোনিশাসিত বাংলার গ্রামীণ জনপদ ও তার মানবগোষ্ঠী সামূহিক বাস্তবতা নিয়ে শব্দবন্দি হয়ে আছে শামসুদ্দীনের রচনায়। দক্ষিণ বাংলার নিম্নবর্গীয় মানববৈচিত্র্যের রূপকার হিসেবে শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাস ও ছোটগল্প বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেও ধারায় সংযোজন করেছে এক স্বতীয় মাত্রা। কলোনির শোষণপ্রক্রিয়া, গ্রামীণ জোতদার ও ভূস্বামী এবং প্রাকৃতিক নিষ্ঠুরতায় বিপন্ন বিপর্যস্ত বিভঙ্গ নিম্নবর্গ শামসুদ্দীনের রচনায় উঠে এসেছে মহাকাব্যিক ক্যানভাসে– তাদের ব্যক্তিক পরাভবচিত্রে প্রতিভাসিত হয়েছে একটি বিশেষ জনপদ ও তার মানবগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, আশা ও আনন্দ, বেদনা ও বিপন্নতার ছবি। [বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'কাশবনের কন্যা : নারীর মুখ', El‡j›‡K, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩

৭১. লেখকের বোন জানিয়েছেন––

আকরাম আলীর একমাত্র পুত্র কাঞ্চন। এই কাঞ্চনই শামসুদদীন আবুল কালাম। ... কাঞ্চনের বাবা স্বদেশী আন্দোলনের সময় বৃটিশ বিরোধী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ... নিজ ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য তিনি স্বপরিবারে বরিশালে বসবাস করেন। গোরাচাঁদ দাস রোড়ের আলেকান্দায় একটি কাঠের দোতলা বাড়ীতে শামসুদদীনের কৈশোর কাল কাটে। মাঝে মাঝে লঞ্চে চড়ে গ্রামের বাড়ীতে যেতেন। গ্রামের নদী নালা, খালবিল, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, আঁখের বন, হোগলা বনে মাছ ধরে, পাখি শিকার করে তাঁর দেশের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দেশের মানুষের চলন, বলন সব কিছু তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন। ... ছাত্র জীবনে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। এখান থেকেই তাঁর লেখা আরম্ভ হয়। দেশের বাড়ীতে লোকদের জীবন যাপন, কথা বার্তা, সমাজ ব্যবস্থা থেকে তিনি লেখার উপকরণ সংগ্রহ করেন। যা ছিল তাঁর রচনার উৎস বা বুনিয়াদ। শামসুদদীন এসব পেয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। ... তিনি ছিলেন তৎকালের স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বদ্ধ একজন সংগঠক। তাঁর কণ্ঠে ছিল দেশের জারী গান, ভাটিয়ালী গান। তিনি দরাজ গলায় গাইতেন–বাড়ীর সব লোককে, দেশের লোককে শোনাতেন। দেশ সমাজ সম্পর্কে, টৃথিবী সম্পর্কে তিনি মানুষকে সচেতন করতেন। শামসুদদীন বাবার কাছে দেশ ও মানুষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। যা পরবর্তীকালে তার লেখায় স্থান পেয়েছে। [সাঈদা আখতার খুকু, 'আমার ভাই কাঞ্চন', সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদিত) kvgm‘‘xb Avej Kvjvg ¯§iKMš', বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩০-১৩২]

৭২. ইয়াহ্ইয়া মান্নান, kvgm‘‘xb Avej Kvj‡gi Dcb¨v‡m mgvRev¯ÍeZv, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪৮

৭৩. সমালোচকের অভিমত––

চল্লিশের দশকে ... কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত পড়তাম। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে ছিল ‘পরিচয়’, ‘কুয়াশা’ ও ‘সওগাত’। পত্রিকাগুলির মাধ্যমে দু’জন উদীয়মান লেখকের ছোটগল্পের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এঁরা ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। ‘পরিচয়’ পত্রিকায় শামসুদ্‌দীন সাহেবের ছোটগল্প ‘মনু’ পড়ে নিশ্চিত ছিলাম, তিনি একদিন খ্যাতির শিখরে উন্নীত হবেন। ... এই গল্পে লেখক দক্ষিণ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এক সাধারণ কৃষকের জীবন-সংগ্রামের এক হৃদয়স্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ ও মহামন্বন্তরের দশকে প্রকাশিত এই গল্প রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। [আবদুল মতিন, ‘শামসুদদীন আবুল কালাম স্মরণে’, সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদিত) kvgm‘‘xb Avej Kvjvg ¯§viKMš, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮ পৃ. ১৩]

৭৪. তিনি জানিয়েছেন--

সে বরিশাল থেকে এসে ১৯৪৮ সালের শুরুতে আমার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করে। সে তখনই একজন প্রতিশ্রুতিশীল গল্প লেখক হিসাবে পরিচিত। ... ‘কাশবনের কন্যা’ ... বইটি নিয়ে তার খুব গর্ব ছিল। সে বলত “এই বইতে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে সেই জীবনকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি সে জীবনের মধ্যেই ছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার বইটি সবার ভাল লাগবে।’ ... ষাটের দশকে ... শামসুদদীনের একটি উপন্যাস বেরিয়ে গেছে সে বলল। সে এক প্রকার স্বস্তি এবং আনন্দের সঙ্গে বলল, ‘বিদেশে থাকি কিন্তু আমার মনের মধ্যে আমার দেশ একটি স্থায়ী আসন গড়েছে। বরিশালের মানুষ আমি, বরিশালের নদীর কথা, খাল-বিলের কথা এবং জঙ্গলের কথা আমার খুব মনে পড়ে। এগুলো আমার মনে আছে বলেই আমি বেঁচে আছি।’ ... দীর্ঘদিন বিদেশ থাকলেও শামসুদ্‌দীনের গল্প এবং উপন্যাসের পটভূমি ছিল তার স্বদেশ বিশেষ করে গ্রাম, জনপদ, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের যে জীবন, সে জীবনের একটি উজ্জ্বল ছবি মনোরমভাবে প্রকাশ পেয়েছে ... তার রচনায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি আশ্চর্যজনকভাবে মিশে গিয়েছে। ... আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে শামসুদ্‌দীনের দানকে উপেক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রকৃতির যেমন একটি আদিম বিস্তার এবং অপরিবর্তনীয় ভঙ্গি আছে সে ভঙ্গিটাকেই সে তুলে ধরেছে লেখার মাধ্যমে। [সৈয়দ আলী আহসান, ‘শামসুদ্দীন আবুল কালাম’, সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদিত), kvgm‘‘xb Avej Kvjvg ¯§viKMš, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫-৩৮]

৭৫. গল্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বারংবার তিনি পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের গ্রাম জনপদকে। তাই তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে গ্রামীণ জীবনের কথা। বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলার জনপদ জীবনের এক আশ্চর্য বর্ণোজ্জ্বল ছবি মনোহর হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। সেখানকার প্রকৃতি, মানুষ ও তাদের জীবনসংগ্রামের কথা দরদ ও নিপুণতার সঙ্গে তিনি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। ... তবে ‘কাশবনের কন্যা’য় যার সূচনা, তারই ব্যাপিতময় বিকাশ সাধিত হয়েছে ‘সমুদ্র বাসর’ (১৯৮৬)-এ এসে। এ উপন্যাসটি যেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সমগ্র জীবনের স্বপ্নে গড়ে তোলা এক চিরায়ত সৃষ্টি। ১৯৪৭ সালে তিনি এই উপন্যাসটির খসড়া তৈরি করলেও তা চূড়ান্ত করেছেন ১৯৮১ সালে এসে। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে একটি উপন্যাসের জন্ম প্রক্রিয়াকে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিতে গিয়ে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম একজন মহৎ শিল্পীর কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। [সরদার আবদুস সাত্তার, ‘শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের চলে যাওয়া এবং রেখে যাওয়া’, সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদিত), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৯৮-১০৪]

৭৬. বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের লোকজীবন, নৈসর্গিক পরিমণ্ডল ও মাসবসম্পর্কের ব্যতিক্রমী উপস্থাপনের গুণে এ উপন্যাসটি পাঠকমহলের অভিনন্দন মনোযোগ এবং সমালোচকদের অর্জন করেছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর অপতৎপরতায় লেখককে একাধিকবার বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়, যা মোটেই কাম্য ছিল না। স্বয়ং লেখক দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তের বেদনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন--

ক. কাশবনের কন্যা আমার রচিত প্রথম উপন্যাস। ইহা ১৯৪৭ সালে লিখিত হইলেও, নানা কারণে এতোকাল পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'তাহজীব' এর সম্পাদক জনাব সৈয়দ আবদুল মান্নান সাহেবের আগ্রহে ইহার কিয়দংশ উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার কালে বহু অনুরাগীজন মৌখিকভাবে এবং পত্রে ইহাকে পুস্তকাকারে পাইতে চাহিয়াছেন ... মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের সবাই সব সময়ই যেন পশ্চিমমুখী। স্বীয় দেশজ জীবন এবং সাংস্কৃতিক সম্পদকে বারে বারে অবহেলার ব্যাধি যেন আমাদের গুরুতর ভাবে পেয়ে বসেছে। K¨ke‡bi Kb¨v উপন্যাসটিও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হতে পারেনি। ওর একটা বিরাট অংশ আমাকে বাধ্য হয়েই নষ্ট করে ফেলতে হয়েছিল। তবুও বইখানি যখন ... 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবকে পড়তে দিয়েছিলাম, তিনি বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠেছিলেন : 'এ আমাদের সাহিত্য নয়, মুসলমান কখনো বৈষ্ণব ভাব পোষণ করতে পারে না।' এর পরবর্তী বইগুলো তাই এখরও অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। এখন তার প্রকাশ নানা রাজনৈতিক কারণে আরো দুরুহ হয়ে ওঠে। ... আমার উপন্যাসগুলিতে গাঙ্গেয় সভ্যতার আবহে যেমন জীবনচিন্তা গোটা মানুষের জীবনচিন্তার অঙ্গস্বরূপ গড়ে উঠেছে, তার সঙেবগ সনাক্তিকরণ-এর সংগ্রামই মূল উপজীবন্ত। ... ১৯৫৬ সালে UNESCO কাশবনের কন্যা অনুবাদের জন্য ৫০০ ডলঅর বরাদ্দ করেছিল, কিন্তু আমিও তার কোনও উদ্যোগ নেইনি। ... কিন্তু মিসেস রায় (লীলা রায়) যদি আমার বইটি অনুবাদ করতে চান, সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য। ['কাশবনের কন্যা সম্পর্কে', মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, El¨‡j¨‡K, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯৩, ৯৫]

খ. আমার হেলায়-ফেলায় লেখা 'কাশবনের কন্যা' যখন বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই সময় (পঞ্চাশের দশকে) বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী মহল থেকে কেবল নিন্দাবাদই নয়, এমন কি অশ্লীলতার অজুহাতে এবং অ-পাকিস্তানী মনোভাব প্রচারে দুষ্ট বলে বাজেয়াপ্ত করার কথাও উঠে। দৈনিক 'আজাদ' সম্পাদক (আবুল কালাম শামসুদ্দিন) আমাকে সরাসরিও বলেন যে, মুসলমান কখনও বৈষ্ণব হয় না। তাঁর প্রধান আপত্তি ছিল, বইয়ের মলাটের পরেই উদ্ধৃত পল্লী-পদাবলী 'গৌররূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল' ... গীতিটি। পরবর্তী সংস্করণে আমি তা পরিবর্তনে বাধ্য হই। প্রকাশক তো গোড়াতেই সে বইয়ের অনেকাংশ বাদ দিয়েছিলেন। ফলে অনুবাদও সম্ভব হয় না ইউনেস্কোর উদ্যোগে, না শ্রীমতি লীলা রায়ের আগ্রহে। বিভিন্ন মহলের পুরস্কার সুপারিশও প্রচণ্ডভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে : কারণ তা পাকিস্তানী সাহিত্য নয়, পাকিস্তানী মনোভাবেরও পরিচায়ক নয়। আমি নিজেও বেশ অবাক হয়ে যাই, ভড়কেও যাই।" (আবদুল মতিন, kvgm' 'xb Avej Kvjvg I Zvi cÎvejx, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৪)

৭৭. সমালোচক জানিয়েছেন--

আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর কাশবনের কন্যা উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকার করে নেন। নিচজীবী-হতদরিদ্র-শ্রীহীন মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার মহিমা কীর্তিত হতে দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে। উনিশ শতকের মধ্য-শেষভাগে মার্টিন-হান্টার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষিজীবী যে-মানুষদেও পরিসংখ্যান ও ইতিহাস দেন তারাই এক ধারাবাহিক নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপনীত হয় শামসুদ্দীন আবুল কালামের সমকালে এবং তারা উপন্যাসে হাজির হয় রক্তমাংসের অবয়বে। বাংলাদেশের উপন্যাসে ভাটি অঞ্চলের জীবনকথার বর্ণনায় অনন্যসাধারণ গৌরবের াধিকারী হন তিনি এবং কাশবনের কন্যার পর অন্য উপন্যাসগুলোতে সে-০অঞ্চলের মানুষজনের পরিপ্রেক্ষিত ধরা পড়ে নানাভাবে। কাশবনের কন্যার সমাজচিত্র এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তা-চালচলন আটপৌরে অবয়বে উৎকীর্ণ হয়েও তা কালের সীমানা ডিঙিয়ে যায়। ... কাশবনের কন্যা সমতল জলাস্তীর্ণ দক্ষিণবঙ্গের বাস্তব জীবনগাঁথা হলেও শামসুদ্দীন আবুল কালামের আরো কয়েকটি উপন্যাস রয়েছে যেগুলো একই পথানুবর্তী। ... কাঞ্চনমালা, সমুদ্র বাসর প্রভৃতি উপন্যাসে ভাটি অঞ্চলের নিচবর্গ মানুষের কঠিন জীবনের বাস্তবতা এবং সেটিকে জয় করবার অদম্য অভীপ্সার দেখা মেলে। ... ঔপন্যাসিকের পরম সম্পদ বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা। ... জীবনাভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক অসাধারণ শিল্পকর্ম নির্মাণ করতে পারেন। ... Kvke‡bi Kb¨v কিংবা mg‘evmi উপন্যাসে ভাটি অহ্চলের যে জীবনাভিজ্ঞতার চিত্র পাওয়া যায় এবং ঔপন্যাসিকের চোখে দেখা এক বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের যে কাহিনী শ্রুত হয় তা এক অর্থে তখনকার সমগ্র পূর্ববঙ্গেরই চিত্র। ... সমুদ্রবাসর তাঁর ভাটি অঞ্চলের দর্শনজাত এক জীবনঘনিষ্ঠ সৃষ্টি। [মহীবুল আজিজ, 'ভাটি অঞ্চলের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও সমুদ্রবাসর', উলুখাগড়া, সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৫, ঢাকা, পৃ. ২৬২-২৬৪]

৭৮. এ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত––

ক. পূর্ব বাংলার মানুষকে গত পাঁচ শতাব্দী ধরে যে ধরনের আনন্দবেদনাময় কাহিনী হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, তাকে নোতুন রূপে এনেছেন লেখক। লোকগীতির আবেদনটি এখানে রক্ষিত হয়েছে। দক্ষিণ বাংলার কাশবনের দেশের মানুষ আর প্রকৃতির প্রতি লেখকের নিশ্ছিদ্র আনুগত্য, উপন্যাসের মধ্যে ব্যবহৃত লোকসংগীত, আঞ্চলিক পরিবেশ ও উপভাষার প্রতি আনুগত্য, উপন্যাসের প্রতি পর্বের সূচনায় উদ্ধৃত লোকসংগীত–এ সব কিছুই লোকজীবনের প্রতি লেখকের রোমান্টিক আনুগত্যের পরিচায়ক। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, উদ্ধৃত, রফিকউল্লাহ খান, evsjv‡`‡ki Dcb¨vm : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৫)

খ. শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসে ... সময়ের কোনো বোধ নেই, শওকত ওসমান ও আবু ইসহাক সচেতনভাবে গ্রহণ ও বর্জনের যে কাজ করেন, আবুল কালামের রচনায় তার চিহ্নমাত্র নেই। ... শামসুদ্দিন আবুল কালাম একটি স্থূল ও পুরুষ্টু কাহিনী ছাড়া আর কিছুই আমাদের দেন না। বরিশাল অঞ্চলের গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসটি যেভাবে এগিয়ে চলে তা পাঁচশো বছর আগেকার গ্রাম হতে পারতো এবং যে-কোনো গ্রাম্য পুঁথির বিবরণ হলে তাতে কোনো বাধা ছিলো না। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে (এ) উপন্যাস ... যে কাহিনী আমাদের উপহার দেয়, তার মধ্যে চিরায়ত বাংলাদেশের কোনো সত্যও ধরা পড়ে না। 'কাশবনের কন্যা' ... আদর্শবাদী বক্তৃতা, বিরক্তিকর, মামুলি ও গ্রামজ দার্শনিকতা এবং অচেতন, অবয়বহীন একটি কাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও হোসেন এবং শিকদারের প্রেমকাহিনী আমাদের খানিকটা স্পর্শ করে– মানিকের

‘পদ্মানদীর মাঝি’র অস্বস্তিকর উপস্থিতি মেনে নিয়েও তা ঘটে। (হাসান আজিজুল হক, ‘দুই যুগের দেশ মানুষের কথা’, nvmvb AwRRj nK iPbvmsMn (চতুর্থ খণ্ড), সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২০-২১)

গ. বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেই যশস্বী এবং জনপ্রিয় হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)-ও এই দৃষ্টান্তমালার মধ্যে অন্যতম উল্লেখ্য এক উপন্যাসকার। তাঁর ‘কাশবনের কন্যা’ উপন্যাসটি (১৯৫৪) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন তুলেছিলো, এবং আমাদের মতে, পূর্ব পাকিস্তান তথা পরবর্তী বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস যে পশ্চিম বাংলা তথা সর্ববঙ্গীয় গল্প-উপন্যাসের ব্যাপকতর ধারার মধ্যে একটি নিজস্বতা অর্জন করতে শুরু করেছিল ... তারও এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ... মামুলি ন্যারেটিভ ধরনের একটি গদ্যবর্ণনা ও সংলাপময় উপন্যাস না লিখে লেখক প্রথমেই এটিকে লোকবৃত্তান্তের আঙ্গিকে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন, লোককথার একটি আবহ তৈরি করেছেন। অজস্র লোকসঙ্গীত, কিছু লোকগল্প প্রচুর গ্রামীণ শব্দ ও গ্রাম্য প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে দিয়েছেন। চরিত্রগুলোও সম্পূর্ণতই গ্রামীণ, সম্ভবত বরিশাল অঞ্চলের নদী খালবিল কদর্ম-পরিকীর্ণ বৃক্ষলতাবহুল মফস্বলের বাসিন্দা, ফলে এক মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ জীবন যেন প্রায় এক গ্রাম্যগাথার মতো পরিবেশিত হয়েছে। ...শুধু বর্ণনা ও সংলাপ দিয়ে এ আখ্যান রচনা করেন নি (তিনি)। লোকসঙ্গীত ও কবিতা থাকছে প্রতিটি পরিচ্ছেদের আগে, ভূমিকা হিসেবে, ভিতরে তো আছেই নানা স্বরবৈচিত্র্য। আখ্যান তো আছেই, আখ্যানের বাইরেও আছে একটি ব্যাপকতর লোকনন্দনতত্ত্বের পরিমণ্ডল। (পবিত্র সরকার, Kvke‡bi Kb¨v, ‘ভূমিকা’, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৮৪, ৮৭-৮৮)

ঘ. ‘কাশবনের কন্যা’ শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রথম উপন্যাস। এর রচনাকাল ভাদ্র ১৩৫৫ হলেও উপন্যাসটি প্রকাশ পায় আশ্বিন ১৩৬১ ... বই হয়ে বেরুনোর আগে ‘তাহজিব’ নামে একটি মাসিক পত্রিকায় এর কিছু অংশ ছাপা হয়। সেই সময়ে লেখাটি অনেকেরই চোখে পড়ে এবং প্রশংসাও পায়। ... প্রথম চোদ্দ বছর এর তিনটি সংস্করণও হয়। ... প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। ... শিল্পাচার্যের অলঙ্করণ-কাজ এ-বইয়ের এক বড়ো সম্পদ। লোকজ জীবন, নিসর্গ আর প্রেম তাঁর রেখা ও রঙে এক অসামান্য মরমী শিল্পমহিমায় প্রকাশিত। এই চিত্রাবলি ও তার পাশাপাশি প্রতি পরিচ্ছেদের মুখপাতে উদ্ধৃত লোকগানের যুগলবন্দিতে ... গল্পটি যেন আভাসে ফুটে উঠেছে। ... হয়তো শিল্পসিদ্ধির নিরিখে এই উপন্যাস সাফল্যের শিখর স্পর্শ করতে পারেনি, কিংবা জীবনের মহত্তম অভিপ্রায় এখানে রূপায়িত হয় নি, কাহিনী-বুননে কাঁচা হাতের ছাপ চোখ না-ও এড়াতে পারে–এইসব সীমাবদ্ধতা-ত্রুটি-অপূর্ণতা সত্ত্বেও দেশভাগের পরপরই লোকজীবনের মর্মমূলে পৌঁছে গিয়ে গ্রামীণ মানুষের বিরহ-সুখ বেদনা-আনন্দ ও প্রবহমান জীবনধারাকে উপন্যাসে রূপায়িত করার গ্রাহ্য-প্রয়াস Kvke‡bi Kb¨v-তেই প্রথম আবিষ্কার করা গেলো। (আবুল আহসান চৌধুরী, ‘কাশবনের কন্যা : চকিত অবলোকন’, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, Elv‡jv‡K কাশবনের কন্যা সংখ্যা, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, ঢাকা, পৃ. ১০)

ঙ. নদীবিধৌত দক্ষিণ বাংলার গ্রামজীবনের চিরায়ত শব্দছবি হিসেবে শামসুদ্দীন আবুল কালামের Kvke‡bi Kb¨v (১৯৫৪) এক উজ্জ্বল নির্মাণ। এ উপন্যাসে দক্ষিণ বাংলার ভূ-প্রকৃতি, নদীসংস্কৃতি, নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনসংগ্রাম–তাদের আনন্দ-বেদনা স্বপ্ন সাহস হতাশা-বিপন্নতা অকৃত্রিম ভাষ্যে রূপায়িত হয়েছে। ...বিষয়াংশের মতো প্রকরণ-পরিচর্যা এবং ভাষা-ব্যবহারেও ঔপন্যাসিকের স্বকীয়তা সবিশেষ লক্ষণীয়। দক্ষিণ বাংলার আঞ্চলিক ভাষা এ উপন্যাসে

শৈল্পিক সার্থকতা নিয়ে বিকিরণ করেছে নতুন মাত্রা। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'কাশবনের কন্যা : নারীর মুখ', El¦‡j¦‡K কাশবনের কন্যা সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩)

চ. একটি সার্থক উপন্যাসের কাছে কাঙ্ক্ষিত অনেক কিছুই আমরা এ উপন্যাসে পাই না; কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটি কেন বহুল উল্লিখিত এ জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করতে গেলে কয়েকটি দিক স্পষ্টভাবে আমাদের নজরে আসে। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু আসলে মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন শুধু নয়, এর গভীর উপজীব্য আসলে মানুষের ভাবজীবন। ... যে অঞ্চলের জনজীবনকে আশ্রয় করে লেখক তাঁর উপন্যাসকে পল্লবিত করে তুলেছেন সে অঞ্চলের লোকগীতিকার মধ্যে জীবন সম্পর্কে যে-সব দার্শনিক উপলব্ধি বহমান তার পরিচয় এখানে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের অঙ্গ-সংগঠনের মধ্যেও তাই রয়েছে গীতিকার আদল। এর প্রতিটি শিরোদেশে রয়েছে একটি করে লোকগীতি বা গীতাংশ। পুরো ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে লোককথার বৃত্ত তৈরির প্রচেষ্টা। (আহমাদ মাযহার, 'জীবন বাস্তবতার ছবি : K¨ke‡bi Kb¨v', El¦‡j¦‡K কাশবনের কন্যা সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩-২৪)

ছ. 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসের ... উল্লেখযোগ্য দিক হলো বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গের গ্রামীণ জীবনের নদী ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা জীবন ও সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতির ভেতর নদীকে কেন্দ্র করে মাছ ধরা এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে। সেই সমাজেরই মানুষ, তার আবেগ, অনুভূতি, প্রেম, বিরহ, আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাস, অধ্যাত্মবাদ, কাহিনী, উপকথা, সংস্কার–এই উপন্যাসে অত্যন্ত শিল্পিত মননে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ... শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম দেশপ্রেমের আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয়েই হাজার বছরের গ্রামবাংলায় গড়ে-ওঠা সকল ধর্মের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত এক নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্মবাদকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন–যা বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। ... এই উপন্যাসে প্রায় ৫৩টি গান রয়েছে। এই গানগুলোর মধ্য দিয়েও পাঠক উপন্যাসে গড়ে-ওঠা দেশপ্রেমের আদর্শবাদ, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগকে অনুধাবন করতে পারেন। (মাসুদুল হক, 'কাশবনের কন্যা : লোক-সংস্কৃতির অন্যতম দলিল', El¦‡j¦‡K কাশবনের কন্যা সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮, ৭১)

এ উপন্যাসের দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, সমালোচকের বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত, নদীমাতৃক বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির চালচিত্র এ উপন্যাসে যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, তাতে ফুটে উঠেছে ইয়োরোপীয় মডেলের পরিবর্তে এদেশীয় লোককাহিনী, কিংবদন্তি, আখ্যানসম্পৃক্ত উপন্যাসের স্বতন্ত্র ধরন ও আবহ। আদর্শবাদ ও নৈয়ায়িক জীবনবোধের রূপায়ণ শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের আজীবনের সাহিত্যসাধনার অবলম্বন। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় যে কোনো গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসকেই বেছে নেয়া চলে। একথা অনস্বীকার্য, তাঁর এ উপন্যাসে কুশীলবদের বক্তব্যে ও লেখকের বিবৃতিতে আদর্শবাদকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা বহুলাংশেই এর শিল্পরসে হানি ঘটিয়েছে। ফলে একঘেয়েমি এবং ক্লান্তি পাঠকের মনোযোগ ও আগ্রহনাশের সম্ভাবনা বাড়ায়। কিন্তু একথা যথার্থ নয় যে এ উপন্যাস মধ্যযুগের গ্রামীণ বাংলার পরিচিত রূপায়ণ ছাড়া আর কিছু হয়ে ওঠেনি। বরং গ্রামীণ বাংলার লোকজীবন ও সংস্কৃতির রূপায়ণে প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসের তালিকায় এটি নির্দ্বিধায় বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত। হাসান আজিজুল হক ছাড়া অন্য সমালোচকদের বক্তব্যে বিষয়টি প্রতীয়মান।

৭৯. এ প্রসঙ্গে লেখক ও সমালোচকের অভিমত––

ক. উপন্যাসখানির ভাষাতে আঞ্চলিক প্রকাশ-ভঙ্গির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ... ইহাতে যে গানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই আমার সংগ্রহ এবং রচনা। অন্যগুলি কিছু কিছু পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীত গায়ক মমতাজ আলী খান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং 'সংগ্রহ' বলিয়া উল্লিখিত কিছু কিছু গান শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয়ের 'পূর্ব্ববঙ্গ ও পল্লীগীতি' নামক সংকলন হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। (উদ্ধৃত, আবুদল মতিন, kvgm' 'xb Avej Kvjvg I Zvi cÎvejx, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩)

খ. শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম আমাদের লোকজ জীবনের ... বিপুল অধ্যায় নিয়ে কাজ করেছেন ... প্রতিটি অনুঘটনার পূর্বাহ্নে এক একটি লোকগীতির সংযোজনার ভেতর দিয়ে উক্ত দৃশ্যের একটি তাৎপর্যময় বিষয় হলো, লোকজ জীবনের ও মননের আদিকল্প উদঘাটন করার প্রাণশক্তিও এর মধ্যেই নিহিত। যে সময়ে এসে আমরা চর্যাপদের জীবনাভিজ্ঞতা, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির প্রেম-দর্শন, মঙ্গল কাব্যের দারিদ্র্যপীড়িত সংগ্রামমুখর জীবন, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম, লৌকিক জীবনের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে শাক্ত পদাবলীর ভক্তিরসের অপ্রাকৃত কাব্যমাধুর্য ও বাউল জীবনতৃষ্ণার কথা প্রায় ভুলতে বসেছি সে সময়ে উপন্যাস শিল্পের মধ্যে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম সেই জীবনের এক কথনভাষ্য রচনা করেছেন। ফলে লোকগীতির ব্যবহার এই উপন্যাসের আখ্যান-সংগঠনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। (সরকার আবদুল মান্নান, 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের Kvke‡bi Kb¨v আখ্যান-দর্শন', evsjv K_vmwnZ¨ : AvawbKZvi Kkxje, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১১-১১২)

৮০. দুজন সমালোচকের অভিমত--

ক. প্রেসিডেন্সি কলেজে ... লেখাপড়া করার সময়ই শহীদুল্লা কায়সার বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্র ফেডারেমনের উৎসাহী সমর্থক ও কর্মী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ... আদর্শবাদী তরুণ সমাজ বিশেষত ছাত্রদেও মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হয়ে ওঠে নির্যাতিত শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তির মন্ত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ই শহীদুল্লা কায়সার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং কমিউনিস্ট পার্টিও সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। (সুব্রত বড়ুয়া, K_wkíx knx' jøv Kvqmvi : Rxeb I Kg©, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৬)

খ. শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রথম প্রগতিশীল গণসংগঠন গণতান্ত্রিক যুবলীগ (১৯৪৭)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন এক ব্যক্তিত্ব, যার প্রমাণ আমরা পাই ১৯৪৬ সালে যখন অবিভক্ত ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে লেখাপড়া বাদ দিয়ে পার্টির সর্বসময়ী কর্মী হিসেবেও তিনি যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্বও প্রদান করেন। এ প্রেক্ষাপটে তিনি ... পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন। তবে ১৯৫৫ সালে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেও ঠিক এক মাস পরই আবার গ্রেফতার হয়ে কারাগারে যান। ... রাষ্ট্রশক্তি থেকে বারবার এই গ্রেফতার প্রক্রিয়া প্রভাব ফেলেছিল তাঁর পারিবারিক জীবনেও। (আরজুমান্দ আরা বানু, knx' jøv Kvqmvi I Rwni ivqnv‡bi K_vmwnZ¨ : welq I cKiY, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮ পৃ. ১৭-১৮)

৮১. সুব্রত বড়ুয়া জানিয়েছেন--

শহীদুল্লা কায়সার পেশায় সাংবাদিক এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডর সূত্রে রাজনীতিবিদ হলেও তাঁর পরিচিতি মূলত একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে। সারেং বৌ এবং সংশপ্তক-এর মতো দুটি অসাধারণ উপন্যাসের লেখক হিসেবে তিনি জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি দুটিআ লাভ করেছেন। দুটি উপন্যাসই লেখেন তিনি কারাজীবনে। mv‡is †eŠ উপন্যাসটি লেখার কাজ শেষ করেন তিনি ১ অক্টোবর ১৯৬১ তারিখে। তখন তিনি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগাওে জননিরাপত্তা আইনে বন্দি। বইটি ১৯৬২ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং এ উপন্যাসটির জন্য সে বছরের আদমজী পুরস্কার লাভ করেন তিনি। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০)

৮২. knx' jøv Kvqmvi I Rwni ivqnv‡bi K_vmvwnZ¨: wel q I cKiY, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-২৮

৮৩. সমালোচকের অভিমত--

উপন্যাসটি রচনার আগে শহীদুল্লা কায়সার লেখক হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নেবার কাজটি শুরু করেছিলেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং শ্রমসাধ্য প্রয়াসের মাধ্যমে। তাছাড়া নিজের প্রস্তুতি পর্যায়ে একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন তিনি। সম্ভবত উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন তিনি ১৯৫৯ সালের শেষের দিকেই। ... নিজের প্রথম উপন্যাসটি সম্পর্কে শহীদুল্লা কায়সারের মনে দ্বিধা ছিল যথেষ্ট। অন্যদিকে 'দুর্বল মায়া'র কারণে এটি নষ্ট করতেও কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। অবশেষে মনস্থির করলেন তিনি। ... নিজেই নষ্ট করে ফেললেন নিজের উপন্যাসটি। ১০ ডিসেম্বও ১৯৬০ তারিখের চিঠিতে ঔপন্যাসিক ও সুহৃদ রাজিয়া খানকে লেখেন-"নিজের মানদণ্ডেই যদি উত্তীর্ণ না হলাম তবে অন্যের সুমুখে উপস্থিত হব কেমন করে? সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে যে-রচনা উত্তীর্ণ হল না তা সাধারণ্যে পরিবেশন করাটা প্রবঞ্চনা বলেই তো মনে হয় আমার।" (সুব্রত বড়ুয়া, K_wkíx knx' jøv Kvqmvi : Rxeb I Kg©, পৃ. ৩৬-৩৭)

৮৪. knx' jøv Kvqmvi I Rwni ivqnv‡bi K_vmvwnZ¨: wel q I cKiY, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৮৫. এ উপন্যাস লেখার পটভূমি সম্পর্কে লেখকের স্ত্রী পান্না কায়সার জানিয়েছেন--

জেলের অন্ধ কুঠুরিতে এক কয়েদীর সঙ্গে ওর পরিচয় ঘটে। কোন এক সময় সেই কয়েদী ছিল সারেং। শহীদুল্লা জীবনাভিসারী ছিল বলেই সব মানুষের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত সুখ-দুঃখ জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে খুঁজতে চেয়েছে। 'সারেং বৌ' লেখার অনুপ্রেরণা সে পেয়েছিল এভাবেই। শহীদুল্লা কায়সার নিজেও বলেছিল, আইয়ুব খাঁ জেলে পাঠিয়েছিলেন,

তাই আমি সাহিত্যিক হতে পেরেছি। অন্ধ কুঠুরিতে অসহ্য নিঃসঙ্গতায় কখন যে হঠাৎ কলম তুলে নিয়েছিলাম হাতে, এখন সেটা স্মরণ করতে পারি না। ... সামগ্রিক জীবনবোধে এক সার্থক আলেখ্য 'সারেং বৌ'। রাজনৈতিক আদর্শে যে-জীবন ও সমাজের স্বপ্ন দেখেছে শহীদুল্লা কায়সার, 'সারেং বৌ'তে তারই আন্তরিক প্রতিধ্বনি। সমুদ্র এসেছে শক্তিরূপে, জলোচ্ছ্বাস এসেছে বিপ্লবের প্রতীক হয়ে। উপন্যাসের শেষে ধর্মের চেয়ে জীবনের গুরুত্বের শিল্পরূপ ঔপন্যাসিকের জীবন বোধের পরিচায়ক। নবিতুন আর কদম আলীর দু'চোখের স্বপ্নে নতুন সমাজ লেখকের সারা জীবনের আরাধনা। স্বপ্নের শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ। উদ্ধৃত, মাহমুদুল বাসার, evsjv‡`‡ki K_vmvwnZ¨, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৬১-১৬২

৮৬. এ উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচকদের অভিমত--

ক. শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বউ' বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। বইটি আকারে ছোটো, কাহিনী এতই নিটোল যে গল্পটি অনুচিত দখল পায় মনে। কিন্তু শহীদুল্লা এমন দুর্লভ আন্তরিকতা নিয়ে বইটি লিখেছেন যে গরিব শ্রমজীবী মানুষের তিক্ত সংগ্রাম, সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা আর রঙিন স্বপ্ন শরীরী বাস্তবতা নিয়ে আমাদের সামনে ধরা দেয়। বস্তুত 'সারেং বউ'-এর কাহিনী বাংলাদেশের পূর্বাংশের মানুষের চিরকালীন কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু 'সারেং বউ' এর নায়ক যুদ্ধ করে বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যার কাছে সে বংশপরম্পরায় মার খায় এবং কখনো সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় না–সে মানুষের তৈরি সমাজবিন্যাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শেখে না। তবে লড়াই তাকে প্রতিনিয়ত করতেই হয়। ঔপন্যাসিক সেটাকে সামনে না নিয়ে আসার ফলে 'সারেং বউ' প্রকৃতি আর ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি দলিল হিসেবেই থেকে যায়। [হাসান আজিজুল হক, 'দুই যুগের দেশ মানুষের কথা', nvmvb AwRRj nK iPbvmsMÖn (PZ_ LÐ), সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৩]

খ. পূর্ব বাঙলার তরুণ প্রতিভাবান এবং নিষ্ঠাবান ঔপন্যাসিকদের অন্যতম হচ্ছেন শহীদুল্লা কায়সার। তাঁর 'সারেং বৌ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ... 'সারেং বৌ' একটি আঞ্চলিক জীবন চিত্র। এই জীবন-স্বভাবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কিছুটা অনবধানতা এবং কিছুটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে এতদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের এই 'সারেং' জীবনের বিচিত্র কাহিনীকে আমাদের শিল্পীরা রূপ দিতে পারেন নি। তাই জীবনের এক বিচিত্র রূপ আমাদের শিল্পকর্মে অনুপস্থিত ছিল। এই দিক থেকে শহীদুল্লা কায়সারের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। (মনসুর মুসা, ce evOjvi Dcb¨vm, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৭১)

গ. দক্ষিণ বাংলার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বৃত্তের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন এবং সেই ভৌগোলিক কাঠামো অন্তর্গত জনগোষ্ঠীর ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ-উচ্চারণ, সংস্কার, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য প্রভৃতি অত্যন্ত দক্ষতায় শিল্পায়িত করেছেন শহীদুল্লা কায়সার। কদম সারেং ও তার স্ত্রী নবিতুনের জীবনরূপ উন্মোচনসূত্রে সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনজীবনের দৈনন্দিনতা, মানবীয় প্রত্যাশা-অপ্রাপ্তি, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, আবেগ ও সংগ্রামশীলতার রূপ-স্বরূপ বিন্যস্ত হয়েছে এ-উপন্যাসে। ... বিষয়কল্পনা ও জীবনজিজ্ঞাসার বিচারে সারেং বৌ এক অনবদ্য সৃষ্টি। জীবনার্থের রোমান্টিকতা সত্ত্বেও শহীদুল্লা কায়সারের প্রগতিশীল ও মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এ উপন্যাসকে সাফল্যস্পর্শী করেছে। বিশেষ ভৌগোলিক আয়তনের বস্তুসমগ্রতা, সমুদ্র ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনপদের বাস্তবজীবন ও ভাবজীবন, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ও ক্রোধে নির্মাণ ও ভাঙনশীল মানবপ্রবাহ প্রভৃতি বিষয়কে দক্ষতার সঙ্গে রূপদান করেছেন ঔপন্যাসিক। ...

লোকজীবনের রূপ-রূপান্তর, বিশ্বাস ও সংস্কারের আঞ্চলিকতা, শ্রেণীচরিত্রের বাস্তবসম্মত উপস্থাপন সর্বোপরি উপকরণের অভিনবত্বে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় সারেং বৌ স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। (রফিকউল্লাহ খান, evsjv‡`‡ki Dcb¨vm : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২৫-১২৬)

ঘ. বইখানি ১৯৬২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হল। মুসলিম লেখকের লেখা শিল্প-সার্থক নয়। এ কারণে পূর্ববাংলার লেখকদের বই কেউ পড়ে না, সবাই চায় কলকাতার বই– লেখক ও প্রকাশকের এ অভিযোগ আগেও শোনা গেছে, এবং শুনতে হয় এখনো। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সার মনে করেন এ অভিযোগের দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন মুসলিম লেখকরাও শিল্পসমৃদ্ধ বই লিখতে সমর্থ। কাজেই তিনি সমুদ্র আর সমুদ্রপারের মানুষকে উপন্যাসে আমদানী করলেন। লেখা হল এক অভিনব কথাসাহিত্য। 'সারেং বৌ' বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত সারেং জীবন-কাহিনীর প্রথমতম আলেখ্য। নদ-নদী বিধৌত সমুদ্রবেষ্টিত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মেহনতী মানুষের সংগ্রামমুখর জীবন এ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। ... শহীদুল্লা কায়সার কথাশিল্পীর নির্লিপ্ততা ও অন্তরঙ্গতা নিয়ে সমুদ্রোপকূলবর্তী নর-নারী ও সংগ্রামী জীবনের কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। গোলাম সাকলায়েন, উদ্ধৃত, সরদার আবদুস সাত্তার, K_vmvwn‡Z¨i AwÖbvq `wo‡q, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৮৪-১৮৫)

৮৭.mv‡is te․ -এর কাহিনীর উৎস সম্পর্কে শহীদুল্লা কায়সার ডায়েরিতে ২৩.১২.৫৯ তারিখে লিখেছিলেন–(পৃ. ৩০)

ক. "হঠাৎ পরিবর্তনের ধাক্কায় আর সিমেন্ট শয্যার জমাট শীতে এমনিই বেসামাল, তার উপর আমার প্রতিবেমীরা যে-নিদ্রাবিরোধী জেহাদ শুরু করেছে তাতে ঘুম পালালো এ-তল্লাট থেকে। গোটা রাত এক রত্তি ঘুম এলোনা চোখে।... ভাগ্যিস সিগারেট ছিল সাথে। বসে বসে পোড়ালাম আর প্রতিবেশীদেও নিশীথ রাতের কথোপকথন শুনলাম। অনেকদিন এমন খাপছাড়া আলাপ শুনিনি।" (উদ্ধৃত, মাহমুদুল বাসার, evsjv‡`‡ki K_vmvwnZ¨, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৬১)

খ. ৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগের জন্য তৃতীয় শ্রেণির কয়েদি হিসেবে জেলে থাকার সময় সাধারণ কয়েদিদেও অনেকের সঙ্গে শহীদদুল্লা কায়সারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। যতদূর জানা যায়, সারেং বৌ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্র তিনি এখান থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী পান্না কায়সারকে কথা প্রসঙ্গে একবার তিনি এরকমই জানিয়েছিলেন। (সুব্রত বড়ুয়া, K_wkíx knx`jøv কায়সার : জীবন ও কর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০)

৮৮. কোনো কোনো সমালোচক এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুগত মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন, যা যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ নয়। কেননা, এদের কেউই কথিত উৎসের সঙ্গে এ উপন্যাসের ভাবগত সাদৃশ্য এবং লেখকের ঋণগ্রহণের পরিধি নির্দেশ করেননি।

ক. 'সারেং বৌ' উপন্যাসের মৌলিকতা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। উপন্যাসের গোটা কাহিনী দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র (দ্বিতীয় খণ্ড) 'নসর মালুম' লোক-কাহিনী থেকে গৃহীত। এটা অসম্ভব নয় যে, শহীদুল্লা কায়সার চট্টগ্রাম অঞ্চলের এই লোক-কাহিনীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তথাপি 'সারেং বৌ' ও 'নসর মালুম' এক

বস্তু নয়। দু'য়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। রচনাসৌষ্ঠবে ও কাহিনীর সুনিপুণ পরিচর্যায় যেমন ঠিক তেমনি মানুষের সামগ্রিক জীবনবোধের এক সার্থক আলেখ্য 'সারেং বৌ'। কিন্তু 'নসর মালুম' তা নয়। রচনা-বৈশিষ্ট্যে 'নসর-মালুম' একখানি 'ব্যালাড', পক্ষান্তরে 'সারেং বৌ' শিল্পকর্মগুণে সার্থক কথা-সাহিত্যে উত্তীর্ণ। ... মানুষের ভালবাসা, প্রেম ও সততা যদি সত্য হয় তাহলে 'সারেংবৌ' উপন্যাসের নিপীড়িত মানুষগুলিও চিরকালের সত্যরূপে পাঠকদের হৃদয় জয় করবে। মাঘ-মণ্ডলের ব্রতের ছড়া, আঞ্চলিক শব্দের নিপুণ ব্যবহার গ্রন্থটির আকর্ষণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে। (জয়ন্তী সেন, উদ্ধৃত, সুব্রত বড়ুয়া, K_wkíx knx'jøv Kvqmvi : Rxeb I Kg©, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২)

খ. শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস 'সারেং বৌ' ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯৬১ সালে রচিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র 'নছর-মালুম' লোক-কাহিনী অবলম্বনে তিনি 'সারেং বৌ' রচনা করেন। [ভূঁইয়া ইকবাল, evsjv‡'‡ki Dcb¨v‡m mgvRwPÎ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৭৫]

গ. শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস সারেং বৌ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯৬১ সালে রচিত হয়েছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার 'নছর মালুম' লোককাহিনী অবলম্বনে তিনি সারেং বৌ রচনা করেন। (আরজুমান্দ আরা বানু, knx'jøv Kvqmvi I Rwni ivqnv‡bi K_vmvwnZ¨ : welq I cKiY, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩১)

৮৯. এ আলোচনায় উপন্যাসের সব উদ্ধৃতি যে গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে : শহীদুল্লা কায়সার, mv‡is †eŠ, চারুলিপি, ঢাকা, ২০০৯। উদ্ধৃতির পাশে গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীতে নির্দেশিত।

৯০. সমালোচকের অভিমত--

সারেং বৌ উপন্যাসে বিধৃত উপমা-অলংকার উপন্যাস-বর্ণিত অঞ্চলের জীবনাভিজ্ঞতা-আহৃত। ঔপন্যাসিক এতদঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা, আচরণ-উচ্চারণ, আনন্দ-বিষাদ, ভাবনা-প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে উপমাসমূহ নির্মাণ করেছেন। উপপমা-অলঙ্কারের প্রয়োগ নৈপুণ্যের কারণে মনে হয়, লেখক যেন স্বয়ং সে অঞ্চলেরই নিখাদ প্রতিনিধি। ... শহীদুল্লা কায়সার সারেং বৌ উপন্যাসের গদ্যনির্মাণে ছিলেন ফেনী জেলার দক্ষিণাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির অনুসারী। পরিমার্জিত সাহিত্যিকরীতির আদলে বাক্য গঠন করেও তার মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন আঞ্চলিক ছন্দস্রোত। তাঁর ভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্যে দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র-তীরবর্তী এ অঞ্চলের আবেগ-অনুভূতি পরিণত হয়েছে এক দুর্জ্ঞেয় জীবনরহস্যের প্রতীকে। (গিয়াস শামীম, evsjv‡'‡ki AvÂwjK Dcb¨vm, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ৬৩-৬৪)

৯১.সমালোচক জানিয়েছেন--

রাজনৈতিক মতাদর্শে যেমন, সাহিত্যের আদর্শেও তেমনি শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে অদ্ভুত মিল। ... জীবন-সত্য তাঁদের সাহিত্যশিল্পে ধরা পড়েছে বাস্তবতার আলোকে। আবেগে ভাষাকে বিলিয়ে দেননি তাঁরা কেউই। ... তাঁদের প্রতিটি গল্প-উপন্যাসের আড়ালে রয়েছে সমসাময়িক সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং পারিবারিক

জীবন-ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্য চিত্রমালা। কোথাও কোথাও আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তাঁদের রচনাবলি। তাঁদের শিল্পরূপের এ মর্যাদার পেছনে রয়েছে জীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তাঁদের বিচরণের সাযুজ্য। ... আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম-জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নিপীড়ন ও শোষণ এবং তা থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা উভয়ের উপন্যাসে সমানভাবে বিধৃত। ... উভয়ের কথাসাহিত্যে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ, গ্রামের নিঃস্ব অসহায় মানুষ এবং নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষের প্রাধান্য রয়েছে। ... সমসাময়িক নাগরিক ও গ্রামীণ জীবন শিল্পসম্মত রূপ পেয়েছে। ফলে কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের বৃহত্তর জনজীবনের পারিপার্শ্বিকতা ও নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমিকেও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা তুলে ধরেছেন। ... বিভাগ-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের বস্তুনিষ্ঠ ছবি অঙ্কনেও সমাজ-সচেতনতার পরিচয় রয়েছে উভয়েরই গল্প-উপন্যাসে। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর দ্বন্দব-সংঘাত, কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের নিপীড়ন ও শোষণ এবং সাধারণ মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার ছবিও তাঁদের উপন্যাসে দালিলিক বিবরণের মতোই সমৃদ্ধ। ... দুজনেরই কৈশোর কেটেছে কলকাতায়, পিতার সরাসরি তত্ত্বাবধানে। দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালে দুজনই ঢাকায় চলে আসেন। পেশাগত জীবনে শহীদুল্লাহ কায়সার বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা, আর জহির রায়হান চলচ্চিত্র-পরিচালনা। শহীদুল্লাহ কায়সার সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন, অন্যদিকে জহির রায়হান পুরোপুরি রাজনীতি-সচেতন থাকলেও পার্টিগত বাঁধা-ধরায় ছিলেন না। ... ভারত বিভাগ-উত্তর পূর্ববাংলার উপন্যাসে সমাজ-জীবনের বাস্তবধর্মী চিত্রনির্মাণে রয়েছে তাঁদের সমন্বিত অবদান। বিশেষ করে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপড়েনে গ্রামজীবনে অস্থিরতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি নিপীড়ন এবং মুক্তিকামী মানুষের এর থেকে বাঁচার প্রচেষ্টারত যে-শ্রেণীটি এই দুই সহোদরের শিল্পকর্মে মহান ও মহিমান্বিত চরিত্র হিসেবে বারবার এসেছে তারা অভিজাত কেউ নয়; তারা শহর কিংবা গ্রামের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। (আরজুমান্দ আরা বানু, knx'jøv Kvqmvi I Rwni ivqnv‡bi K_vmwnZ¨: welq I cKiY, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১১-১৪)

৯২.সমালোচকদের অভিমত--

ক. বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার সুদীর্ঘ পরিসর উপজীব্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে জহির রায়হানের (১৯৩৩-১৯৭২) হাজার বছর ধরে (১৯৬৪) উপন্যাসে। জীবনের এই আয়তন-কল্পনার পেছনে ঔপন্যাসিকের রোম্যান্টিক মন-মানসিকতার ভূমিকাই মুখ্য। যে-কারণে, আবহমান বাংলা ও বাঙালির চলমান জীবনরূপ আবেগী শব্দরূপায়ণের মধ্যেই হয়ে পড়েছে সীমাবদ্ধ। তবে দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ময় বিন্যাসে হাজার বছরের মন্থর জীবনস্রোতের মধ্যেও তরঙ্গিত হয়েছে মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা-অচরিতার্থতা-বেদনার রূপ-বৈচিত্র্য। ... জহির রায়হান বাংলাদেশের গ্রামজীবনকে অভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলেও একটা নিরাসক্ত দূরত্ব উপন্যাসবিন্যস্ত জীবনকে করেছে বহুমাত্রিকতায় বিশিষ্ট। সুরত আলী এবং তার ছেলের ভিন্ন পরিস্থিতিতে পুঁথি পড়ার মধ্যে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরের অন্তর্বর্তী সঙ্গতি বিদ্যমান। ... যৌথ জীবনের বৈশিষ্ট্য, তার মন্থরগতিপ্রবাহ এবং নিস্তরঙ্গ জীবন অন্তরালেও ঔপন্যাসিক জীবনের আবহমান রূপ সন্ধান করেছেন। রোম্যান্টিক দৃষ্টি দিয়ে গ্রামজীবনের অনাবৃত রূপ অবলোকনের ফলে বাস্তবতার চাহিদা অনেকটা ক্ষুণ্ন হয়েছে এ উপন্যাসে। কিন্তু জীবনের স্থবির, বিবর্ণতার মধ্যেও কোনো কোনো চিত্রের উজ্জ্বলতা ও চরিত্রের সক্রিয়তা উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে করেছে গতিশীল, প্রাণবন্ত। ...দূরবর্তী জীবনকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করার ফলে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির আবেগময়তাকে মনে হয় না অসঙ্গত, বাস্তবতাবিবিক্ত। (রফিকউল্লাহ খান, evsjv‡'‡ki Dcb¨vm: welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২০-১২২)

.খ জহির রায়হানের একমাত্র গ্রাম কেন্দ্রিক উপন্যাস ‘হাজার বছর ধরে’। জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতে সাধারণভাবে এ উপন্যাসটিকে সামনে টেনে আনা হয়। অবশ্য কবীর চৌধুরী ‘বরফ গলা নদী’কেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছেন। ... গ্রাম বাংলার বিস্তৃত বাস্তবতার মর্মমথিত চিত্র এসেছে এ উপন্যাসে । ... এখানে লেশমাত্র তত্ত্ব বা আদর্শ কিংবা মতবাদ চাড়া দিতে পারেনি। অবিকল গ্রামবাংলার সমাজবাস্তবতা, সরস, অনায়াস, দরদমাখা, আন্তরিকতার অভিনবত্বে চিহ্নিত হয়েছে। ... হাজার বছরের গ্রামের নিজস্ব ঐতিহ্যকে জহির রায়হান পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন। (মাহমুদুল বাসার, Rxebwkíx Rwni iwqnvb, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৭-৪৮)

৯৩. এ উপন্যাসের আধার ও আধেয় সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভঙ্গি সক্রিয়--

ক. জহির রায়হানের ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাস হিসেবে পুরস্কার লাভ করলেও এটা রীতিমত উপন্যাস নয়। উপন্যাসের জীবন বিস্তৃতি এতেও নেই, কাহিনী, চরিত্র, ভাষা কিছুতেই না। এর কাহিনীতে আছে একটি ছোট গল্পের প্রামাণিক ঘূর্ণাবর্ত, চরিত্রে একটি বাতায়নিক গঠন; ভাষায় আছে একটি সংকেতধর্মী উল্লম্ফণ। উপন্যাসের কাহিনীর জটিলতা ব্যাপ্তি ও গাম্ভীর্য ‘হাজার বছর ধরে’র মধ্যে নেই; আর কাহিনীর যে টুকুন গতি আছে তাও বিশ্লেষণে গভীর নয়, বর্ণনায় পরিব্যাপ্ত মাত্র। চরিত্রগুলো নিটোল ও বলিষ্ঠ নয়। ... ‘হাজার বছর ধরে’র সবচেয়ে বড় সার্থকতা হচ্ছে হাজার বছর ধরে বাঙলা দেশের যে জীবনরূপ সাহিত্যে অনাদৃত রয়ে গেছে, তার রূপায়ণে। লেখক গভীর মমতায় এ জীবনকে উপলব্ধি করেছেন এবং তার অবিকৃত রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। তবে হাজার বছর ধরে তিনি যে সামাজিক স্থিতির কথা বলেছেন তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তা ছাড়া বর্তমানে সে জীবন দ্রুত ভাঙ্গনের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং সেখানে নতুন জীবন শুরু হচ্ছে। উপন্যাসে সে নতুন জীবনের কোন ইঙ্গিত নেই। হাল্কাভাষার লঘু পদচারণা এ উপন্যাসকে মহত্ব না দিলেও উপন্যাসকে সহজ পাঠ্য করে তুলতে সাহায্য করেছে। (ce evOjvi Dcb¨vm, মনসুর মুসা, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৯০-৯১)

খ ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে হাজার বছরের পুরানো বাংলার গ্রাম রূপকথার ছবি হয়ে ধরা দেয়। ... জহির রায়হান আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন এক আদিম গ্রামের চিত্রকল্প। ... যে সময়ে জহির রায়হান এ উপন্যাস লিখেছেন, পূর্ব বাংলার গ্রামে তখন পুঁথি পড়ার দিন গত হয়ে গেছে। তাই সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে লেখকের রোমান্টিক কল্পনা আধুনিক পাঠককে নিয়ে যায় এক ফ্যান্টাসীর জগতে। কারণ বাস্তবে এমন গ্রাম আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ... ‘হাজার বছর ধরে’-র কাহিনীতে ব্যাপ্তি নেই, জটিলতা নেই। আছে ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনা ও কাব্যিক ভাষার সাংকেতিক দ্যোতনা। ... বাংলা উপন্যাসে গ্রামজীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় গ্রাম-প্রকৃতির আশ্চর্য সুন্দর সজীব সত্তার পাশাপাশি মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের যে বাস্তবতা প্রকটভাবে মূর্ত হয়, তেমন জীবন-সত্যের উদ্‌ভাষণ জহির রায়হানের উপন্যাসে নেই। (শাহীদা আখতার, ce I cwðg evsjvi Dcb¨vm, বাংলা একাডেমি, ১৯৯১, ঢাকা, পৃ. ৮৪-৮৫)

গ. ‘হাজার বছর ধরে’ জহির রায়হানের তৃতীয় উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৬৪ সালে ‘আদমজী পুরস্কার’ পেয়েছিল। গবেষক-সমালোচক অনেকে অবশ্য ‘হাজার বছর ধরে’ গ্রন্থকে উপন্যাসের মর্যাদা দিতে রাজি হননি। কিন্তু কাঠামোগত ও উপস্থাপনাগত কিছু দুর্বলতা থাকলেও ‘হাজার বছর ধরে’ জহির রায়হানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ... উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে মূলত গ্রামবাংলার জনমানুষের কথা। ...

উপন্যাসটি জহির রায়হানের একমাত্র গ্রামনির্ভর উপন্যাসও। গ্রামীণ জীবনের যে আঞ্চলিক জীবনধারা ছিল উপেক্ষিত অবহেলিত, সেই জীবনধারার শিল্পরূপ 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, আচার-আচরণ, রুচিবোধের নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন জহির রায়হান। ... উপন্যাসের নামকরণের ভেতরই ঔপন্যাসিক নির্দেশ করেছেন এখানে যে গ্রামীণ জনজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে তা মূলত হাজার বছরের পুরাতন; সে-জীবনে পরিবর্তন নেই, জীবনের গতি নেই, সংস্কার ও অগ্রগতির কোনো ছোঁয়া নেই। এই অপরিবর্তিত সমাজকাঠামোর ভেতরকার সহজ-সরল, অনাড়ম্বর সমাজের কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ ... বাংলার সাধারণ সরল, দরিদ্র, অসচ্ছল গ্রামীণ মানুষেরা। (আরজুমান্দ আরা বানু, knx' jøv Kvqmvi I Rwni ivqnv‡bi K_vmvwnZ¨: welq I cKiY, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২১৬-২১৮)

ক সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত সমালোচকের অভিমত যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নয়। স্বল্পায়তনের এ উপন্যাসে লেখক আবহমান বাংলার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার পটভূমিতে নির্দিষ্ট লোকগোষ্ঠীভুক্ত কুশীলবদের জীবনচর্যা অবলম্বনে যে শিল্পিত ভাষ্যরূপ দিতে আগ্রহী ছিলেন, তা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। স্মর্তব্য, উপন্যাসের প্রাকরণিক সারল্য এবং আয়তনিক বিস্তারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যে স্থানিক ও কালিক পটভূমিতে, যাদের জীবনবাস্তবতাকে ভিত্তি করে তিনি উপন্যাসটি লিখেছেন, তা সামগ্রিকভাবে শৈল্পিক উৎকর্ষ অর্জন করতে পেরেছে কি না। স্মর্তব্য, এ উপন্যাস ১৯৬৪ সালে 'আদমজী পুরস্কার' পেয়েছিল, যা থেকে প্রতীয়মান হয়, তৎকালে পাঠকের আগ্রহ এবং মনোযোগ অর্জনের সামর্থ্য এর ছিল। বর্তমানেও এর সাহিত্যিক আবেদন অটুট রয়েছে। বাংলাদেশের অন্য কোনো লেখকের উপন্যাসে এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাঙালি গ্রামীণ পরিমণ্ডলের অন্তর্গত লোকমানুষের জীবনবাস্তবতা বিশ্বস্ত ভাষ্যরূপ পায়নি। আর, গ্রামীণ জীবনের ভাঙন এবং পরিবর্তিত জীবনবোধ, সামাজিক মূল্যবোধের রূপান্তরের যে ঘাটতির কথা তিনি বলেছেন, তা যথার্থ নয়। কারণ, টুনি-মন্তু-আম্বিয়াকেন্দ্রিক ত্রিভুজ প্রেমের বলয়ে একপর্যায়ে মন্তুর আম্বিয়াকে বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিণতিতে একান্নবর্তী শিকদার বাড়ির সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত ঘটে। এর ধারাবাহিকতায় বুড়ো মকবুলের মৃত্যুর পর টুনিকে যেমন স্বামীর ভিটা ছেড়ে চিরতরে বাপের বাড়িতে চলে আসতে হয়েছে, অন্যদিকে আম্বিয়া-মন্তুকেও সংসারী হতে হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, লোকসমাজে ঘটে চলা নানা ঘটনার সমান্তরালে এর অন্তর্গত বাসিন্দাদের চেতনালোকে সঞ্জাত সাংস্কৃতিক আবহ ও আয়োজনের প্রতি অনুরাগ শেষ পর্যন্ত অটুট থেকেই যায়, যা তাদের বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন। আর বাঙালির এ ঐতিহ্যপ্রীতির পরিচয় সেই হাজার বছর আগের Phvc'-এর কাল থেকেই চলে আসছে। সেই বিবেচনায়, কালিক প্রবাহ ও যুগের মেজাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকসমাজে ধীরগতির পরিবর্তন ঘটলেও ঐতিহ্যপ্রীতি ও যূথবদ্ধতার গুণে নিজস্ব সংস্কৃতি লালনের প্রতি তারা বরাবর সচেষ্ট থাকে। ফলে এক প্রজন্মের মৃত্যু ঘটলেও পূর্বসূরীর নিকট থেকে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পরের প্রজন্মে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত হয়। কাজেই, এ উপন্যাসে প্রতীপাদ্য লোকজচেতনার সাহিত্যমূল্য মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। হাজার বছরের স্থবির, অপরিবর্তনশীল, পশ্চাৎপদ গ্রামীণ জীবনের অভ্যন্তরভাগে চলমান বিভিন্ন উৎসব, আয়োজন আর নিত্যদিনের যাপিত জীবনের আড্ডা, কোলাহল, সমাবেশ প্রভৃতির সম্মিলনে গ্রন্থিত লোকজচেতনার স্বরূপ বুঝতে হলে তাদের জীবিকানির্বাহরীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও কর্মপ্রবাহের যোগসূত্র অনুসন্ধান জরুরি। কোন বিবেচনা থেকে লেখক উপন্যাসের এ নামকরণ করেছেন, তা ওপর থেকে গড়পরতা অনুমান করলে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা যে যথেষ্ট, গ সংখ্যক উদ্ধৃতিভুক্ত সমালোচকের অভিমতে তা প্রকাশিত।

৯৪. এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত জানতে দ্রষ্টব্য : ক. ev½vjv cw_ mvwnZ¨, (সংকলকের নাম অনুল্লেখিত, পাকিস্তান, পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৫ খ. ওসমান গনি, Bmjvgx evsjv mvwnZ¨ I evsjvi cw_, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০০

৯৫. হাসান আজিজুল হকের অভিমত--

> যদি সাহিত্যের দিক থেকে দেখতে চাই তাহলে ইলিয়াসের ... অবস্থানকে ভীষণ দুঃসাহসিক ও বৈপ্লবিক বলা যায়। ... প্রশ্নটা যখন সাহিত্যের, তখন ইলিয়াস বাংলাসাহিত্যের প্রচলিত কাঠামোই ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হলেন। ... ইলিয়াস, বাস্তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হয়েও আর মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে জনগণকে দেখতে চাইলেন না, তিনি নেমে গেলেন জনগণেরই মধ্যে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদেও দেখায়। এই দেখানোয় যতরকম প্রতিবন্ধক, ... (তা) অতিক্রম করার মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে মধ্যবিত্ত রচিত সাহিত্যের প্রচলিত কৌশলের একটিও আর ব্যবহার না করা। এজন্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রথমেই ভুলতে চাইলেন মধ্যবিত্তের ভাষা এবং অন্যান্য সামাজিক আচার আচরণ। ... সরাসরি গ্রহণ করেছিলেন তাদেরই ভাষা যারা নিজেরাই নিজেদের দেখানোর দায়িত্ব নিচ্ছে। (হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : সাহিত্যের নতুন সীমানা', fd‡i †'Lv mvivRxeb 2, মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান সম্পাদিত, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬৬-৬৭)

৯৬. ফ্ল্যাপের লেখা, AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm iPbvmgM 2, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২

৯৭. সম্পাদকীয়, wd‡i †'Lv mvivRxeb 1, মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পাদিত), ঢাকা, ২০০০ পৃ. অনুল্লেখিত।

৯৮. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : জীবনপঞ্জি, ZYgj, আনু মুহাম্মদ (সম্পাদিত), ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. অনুল্লেখিত।

৯৯. মেঘ মুখোপাধ্যায়, 'চিলেকোঠা থেকে মুক্ত উপন্যাস', wd‡i †'Lv mvivRxeb 1, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

১০০. পৃথ্বীশ সাহা, 'কী সব হাবিজাবি লেখা', fd‡i †'Lv mvivRxeb 2, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

১০১. আনু মুহাম্মদ, 'ইলিয়াসের লেখার জমিন', fd‡i †'Lv mvivRxeb 2, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯

১০২. †Lvqvebvgv (১৯৯৬) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক পরিকল্পনা, দীর্ঘ সময়, অক্লান্ত পরিশ্রম, বিষয়গৌরব ও প্রকরণরীতির প্রাতিস্বিক বুননের সমন্বিত ফসলরূপী সাম্প্রতিককালের শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস। বিষ্ণু বসুকে দেয়া সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন, এর প্রথম অংশ (২৯ পৃষ্ঠা, মূল উপন্যাস ৩৬০ পৃষ্ঠার) প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত wjwiK পত্রিকায় ('আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা'য় ১৩৯৯ সালের বৈশাখে) এর প্রায় চার বছর পরে (১৯৯৬) উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। [আলাউদ্দিন মণ্ডল সম্পাদিত AvLZviæ¾vgvb Bwjqvm : PY fvebv I PY K_v msMn, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮২]। পশ্চিমবঙ্গের লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়কে ১০.০৭.১৯৮৯ তারিখে লেখা চিঠিতে ইলিয়াস জানান– 'নতুন একটা উপন্যাসে হাত দেবো করে অনেকদিন ধরে পাঁয়তারা কষছি, শুরু আর করা যাচ্ছে না।' (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬)। মহীবুল আজিজকে ২১.০৭.১৯৮৯ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি জানান– 'একটি উপন্যাস মাথার ভেতর দিনদিন তেলেজলে বেড়ে উঠছে, এখন লিখতে ভয় হয় যে রক্তমাংসের যোগান ঠিকমতো দিতে না পারলে একটা ল্যাজেগোবরে কাজ করে ফেলব।'

(আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬)। হাসান আজিজুল হককে ১০.০২.১৯৯১ তারিখে লিখিত চিঠিতে ইলিয়াস জানান– 'আমি নভেম্বরে একটি উপন্যাস শুরু করেছি, নভেম্বর জুড়ে বেশ লেখা হলো।' (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১)। শিবনারায়ণ রায়কে ০২.০৩.১৯৯৩ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি জানান–" 'খোয়াবনামা' নামে একটা উপন্যাস লিখছি ...এই লেখাটা ভালোই এগুচ্ছে।" (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১)। সাধন চট্টোপাধ্যায়কে ১০.০৩.১৯৯৩ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, "গত বছরের শুরুতে 'খোয়াবনামা' নামে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করি। এর অল্প খানিকটা ছাপা হয়েছে চট্টগ্রামের 'লিরিক' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনে।" (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮)। মহীবুল আজিজকে ০৪.১২.১৯৯৪ তারিখের চিঠিতে ইলিয়াস জানান– "চট্টগ্রামের লিরিক আমার ওপর বিশেষ সংখ্যা করেছিল ... ঐ সংখ্যায় আমার উপন্যাস 'খোয়াবনামা'র খানিকটা ছাপা হয়। গত আড়াই বছর ধরে আমি ওটা লিখছি। ... গত এপ্রিল থেকে দৈনিক জনকণ্ঠের সাপ্তাহিক সাহিত্যপাতায় ওটা ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে, এপর্যন্ত ২৩টি অধ্যায় বেরিয়েছে, আরো গোটা দশেক অধ্যায় চলবে।" (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২)। সাধন চট্টোপাধ্যায়কে ০৭.০৪.১৯৯৫ তারিখে লেখা চিঠিতে ইলিয়াস জানান– 'আমার উপন্যাস খোয়াবনামা এখন শেষের দিকে, বলতে পারেন প্রায় নিকেশ করে ফেললাম। বড়ো কাজ, মানে সাইজে বড়ো। আর কোনোদিক দিয়ে বড়ো হবে বলে ভরসা হয় না। চরিত্রগুলোকে সবসময় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। প্রথমে যে খসড়াটা ছিল দৈনিকের সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত হতে হতে তার অনেকটা পাল্টে গেছে, অনেক চরিত্র এসে শামিল হয়েছে। অনেক লোক অন্যরকম ব্যবহার করছে। জুন মাসে লম্বা ছুটি পাবো কলেজে, তখন ভাবছি মাসখানেক বগুড়ায় থেকে লেখাটা ফের নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করব। একটু সম্পাদনা ছাড়া এটাকে বইয়ের আকার দেওয়া মুশকিল। আমার আর কোনো লেখা আমাকে এরকম ঝামেলায় ফেলেনি, এটা যে শেষ পর্যন্ত কি বস্তু হবে তাই নিয়ে বড়ো ভাবনায় পড়েছি সাধন।' (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০)।

লেখকের সঙ্গে বিভিন্নজনের আলাপে উল্লেখিত হয়েছে, এ উপন্যাস লিখতে তিনি কত বিচিত্র উপাদানকে গ্রহণ করেছেন। সেখানে ইতিহাস, রাজনীতি, কিংবদন্তি, কৃষিবিজ্ঞান, পুথিসাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য তিনি শুধু বইপত্র ও সমসাময়িক দলিলের ওপরই নির্ভর করেননি, বারবার বগুড়ায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলো সম্পর্কে রীতিমতো গবেষণা চালিয়েছেন, সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেখানকার বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবিকার আন্তঃযোগ, সর্বোপরি সমষ্টিমানসের লোকজচেতনার স্বরূপকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন স্বীয় উপলব্ধিতে। কথাশিল্পী শাহাদুজ্জামান জানিয়েছেন, †Lvqvebvgv-র সম্ভাব্য নাম ছিল 'ভাবের ব্যারাম'। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতেই যে এ উপন্যাসের পরিকল্পনা ও খসড়ার কাজ শুরু করছিলেন, এর সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর সম্পাদিত সপ্তম ডায়েরিতে লিখিত বিভিন্ন অনুষঙ্গে। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৭)। যেমন, জানুয়ারির ২৩ তারিখে তিনি দুচরণের যে শ্লোক লেখেন পাকুড় গাছ, মুনসি বয়তুল্লা শাহ ও গজার মাছের উল্লেখযোগে, সেটি হুবহু স্থান পেয়েছে এ উপন্যাসের '৩' পরিচ্ছেদে, তমিজের সৎ মা কুলসুমের দাদা চেরাগ আলির কণ্ঠে। তমিজের প্রসঙ্গে ডায়েরিতে লেখা হয়েছে 'ধান কাটতে গেছে খিয়ারে, এক মাস তার খবর নাই।' তমিজের বাপ উপন্যাসের প্রথম পরিকল্পনাতেও যথারীতি নামহীন, তার রয়েছে একাধিক স্ত্রী। তমিজের মা (সৎ মা) কুলসুম সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য 'স্বামীর প্রভাবে অস্বাভাবিক'। এসব প্রসঙ্গের রূপায়ণ †Lvqvebvgv-তে লক্ষণীয়। ১৮ ফেব্রুয়ারিতে এ উপন্যাসের নামকরণ সম্পর্কে লেখেন 'ভাবের ব্যারাম'। মূল উপন্যাসের '২৫' পরিচ্ছেদে চেরাগ আলির গানে এ শব্দবন্ধের উল্লেখ রয়েছে––

আমার হইলো ভাবের ব্যারাম।

এই ব্যারামের নাইকো আরাম গো ও ও ও! (পৃ. ৫০৯)

১০৩. এ উপন্যাসের পটভূমি প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন--

খোয়াবনামার সময়সীমা ১৯৪৪-১৯৪৮। দেশভাগের অব্যবহিত আগের ও পরের দেশের রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি। রানী ভবানীকে মনে আছে তো। সে সময় সবচেয়ে সেন্সেবল জমিদার। ...ফকির মজনু শা চিরদিন বলে এসেছে,– আমাদের লড়াই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। রানী ভবানীকে মজনু শা চিঠি দিয়েছিলেন– আপনি আমাদেরও রানী। উনি কোনো উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। ...বগুড়া জেলায় পূর্বাঞ্চলে আমাদের যেখানে বাড়ি, সেই অঞ্চলে যারা বসবাস করত, তার সত্তর ভাগ এসেছে ফকিরদের সঙ্গে। ১৭৬৬ সালে মিরকাশিম যখন হেরে যান তার পলাতক সৈন্যবাহিনীর সেনানীরা যোগ দিলেন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। অবাক লাগে তাই না। ... ফকির বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দুটো আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে নিচবর্গের মানুষের কাছ থেকে। কোনোভাবেই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। ... আমার বারবার মনে হয়েছে নিচবর্গের মানুষ গোটা বাংলায় কোনো না কোনো সময়ে বিদ্রোহ করেছে। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪)

এ প্রসঙ্গে আরো কিছু ঐতিহাসিক তথ্য হলো--

ক. মন্বন্তরের থাবা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে বাংলা-বিহারে। ... ১৭৭০ সন থেকে পুরো তিন বছর মন্বন্তর ও তার নিষ্ঠুর অভিঘাতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ হয় মরলো কিংবা অর্ধমৃত হয়ে বেঁচে রইলো। ... এই সময় মাদারি ফকিরদের নেতা মজনুশাহ দিনাজপুরে বারবার আক্রমণ চালিয়ে কিছু মানুষের মনে ও কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। মজনুশাহের আদিনিবাস ছিল কানপুরের কাছে মাখনপুরে। সম্ভবত ১৭৭১ সনের প্রথমদিকে তিনি পূর্ণিয়ার ভেতর দিয়ে সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবেশ করেন। কোম্পানির প্রতিবেদন অনুযায়ী মহাস্থানগড়ের বিখ্যাত দরগায় যাবার সময় লেফটেনান্ট ফেলডাম তার গতিরোধ করে। কোম্পানির বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে মজনুশাহ ও তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। ফেলে যায় দশজন নিহত ও সাতজন বন্দীকে। (নিখিল সুর : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী–ফকির বিদ্রোহ', উদ্ধৃত, আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, ৫২৪)

খ. মজনু শাহ, মুনসি বরকতুল্লাহ শাহ, ভবানী পাঠকের কথা, ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধের লোকমুখে প্রচলিত বয়ান নানাভাবে নানা জায়গায় এসেছে এই উপন্যাসে। অবশ্য কোথাও বিস্তারিতভাবে, ঘটনার সন-তারিখ মিলিয়ে বলা হয়নি, ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়ও সেরকম ছিলো না। কিন্তু সচেতন পাঠক ঠিকই বুঝে নেন ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনি; লোকজীবনে তার অভিঘাতের প্রতিই লেখক বারেবারেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। ১৭৬০ সালে বাংলার বুকে ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘটিত এই বিদ্রোহ আরও তীব্রতা পায়। ১৭৬৩ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় এই বিদ্রোহ দাবানলের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই ফকির-বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মজনু শাহ, আর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক। এই উপন্যাসে বারবার যে মুনসি'র প্রসঙ্গ এসেছে, তিনি হচ্ছেন বরকতুল্লাহ শাহ, যিনি ইংরেজের গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেও, লোকমুখে 'জীবিত' হয়ে অন্য-এক মিথে

পরিণত হন ... এমন এক নিশিচারীর (তমিজের বাপ) সন্ধান দিচ্ছেন ঔপন্যাসিক, যে কিনা নিজের জীবনের সঙ্গে ওই মিথের সত্যতা বহন করে চলেছে। (সৌভিক রেজা, K_wk‡íi K_v, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৮২)

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে দ্রষ্টব্য : আনন্দ ভট্টাচার্য, mb¨vmx I dwKi we‡`vn : BwZnv‡mi cbwe©‡ePbv, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০)

১০৪. এ উপন্যাসে লেখক স্বীয় ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক উত্তরাধিকারকেও সম্পৃক্ত করেছেন। বগুড়া জেলার যে দুটি গ্রামকে তিনি এ উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এ প্রসঙ্গে জানা যায়--

ক. যে গ্রামটা নিয়ে লিখেছি ... গ্রামটা আমার খুব চেনা। এটা যদিও আমাদের গ্রাম নয়। আমাদের গ্রামটা আরো ভেতরে। আমার ঠাকুরদা বগুড়া চলে এসেছিলেন। এই গ্রামটি বগুড়া থেকে বারো মাইল ভিতরে। বাসে যেতাম, খুব ঘুরেছি। খুব বাজে রাস্তা। ... (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭)

খ. বই লেখার তাগিদে আমাদের বগুড়ার গ্রামে আমার খুব যেতে হয়। আর আমি তো গ্রামেরই লোক। বগুড়ার গ্রামগুলোতে আমি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, নিম্নবর্ণের হিন্দু, নিম্নবিত্তেরও বটে– ... তাদের সঙ্গে নিম্নবিত্তের মুসলমানের সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক কম। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৪)

সমালোচক জানিয়েছেন--

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবাদ-প্রতিম শিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর অন্যতম সৃষ্টি ... খোয়াবনামা। এর ...ভিত্তিভূমি হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন পিতৃভূমি বগুড়া জেলার গাবতলী থানার ৮/১০ মাইল পূর্বের কাৎলাহার নামের একটি বিলকে। এই বিলটির অবস্থান তাঁর বাপ-দাদার বাড়ির কাছে। এই কাৎলাহার বিল ও বিলপাড়ের সাধারণ মানুষজনের জীবনব্যবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণের মুন্সীয়ানায় আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ। ... ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার জন্যই কাৎলাহার বিল, বিলপাড়ের মানুষ ও মানুষের জীবন, পোড়াদহের মেলা, তরণীর হাট, গোলাবাড়ি হাট ইত্যাদি স্থান স্ব-চক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হই। কাৎলাহার বিলপাড়ের দুই গ্রাম রানীরপাড়া ও পার-রানীরপাড়ায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে টেপরেকর্ডারে ধারণ করি। (মোস্তফা মোহাম্মদ, 'কাৎলাহার পর্ব : মুন্‌শী আবেদ আলী', mwn‡Z¨ gbb-mRb I AvLZvi"¾vgvb Bwjqvm, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৫-৮৮)

১০৫. মহীবুল আজিজকে ০৪.১২.১৯৯৪ তারিখে লিখিত চিঠিতে লেখক জানিয়েছেন, এ উপন্যাস লিখতে গিয়ে তাঁর বিস্তর ক্লেশ গ্রহণ ও বিপুল আঁকর সমাবেশের ইতিবৃত্ত--

> ১৯৪৫-৪৭ এর বাঙলার গ্রামের পটভূমিতে লিখতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, অনেক কিছুর জন্যে নির্ভর করতে হচ্ছে এই সময়ের কাগজপত্রের ওপর। আবার প্রধান লোকজন সব চাষা আর জেলে, তাদের সেই সময়ের মনস্তত্ত্ব বোঝা কি সোজা কথা? শুরু করে আটকে গিয়েছি, তাদের একটা গতি তো করতে হয়। আমাদের গ্রামের কাছাকাছি একটা গ্রামের মিথ খুব ব্যবহার করছি ধুমসে, ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। একেকটা অধ্যায় লিখতে জান বেরিয়ে যায়, তবে জান নিয়ে টানাটানি যেখানে বেশি, সেখানে সুখও বেশি। এখন একটা টাফ অবস্থায় আছি, কি যে হয় সেই ভাবনায় কাতর। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২)

৩০.১০.১৯৯৪ তারিখে বিষ্ণু বসুকে চিঠিতে ইলিয়াস জানান--

> আমার উপন্যাস 'খোয়াবনামা' ছাপা হচ্ছে এখানকার একটি দৈনিকের সাপ্তাহিক সাহিত্যের পাতায়। এই লেখাটা আমাকে দারুণ ভোগাচ্ছে। আমার মস্ত মস্ত তিনটে ডায়েরিতে যেসব নোট করেছিলাম তার বেশির ভাগই অগ্রাহ্য করে আমার বাহাদুর চরিত্ররা যা তা করে বেড়াচ্ছে। আমার স্কিম ভেস্তে যাচ্ছে, আামি অসহায়ের মতো এই ভাঙন পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করছি। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫)

কথাশিল্পী শাহাদুজ্জামান জানিয়েছেন এ উপন্যাস রচনাকালে তাঁর সঙ্গে লেখকের আলাপের খানিকটা স্মৃতিকথা– "মনে পড়ছে 'খোয়াবনামা' রচনার প্রস্তুতিপর্বের একটু আধটু। ... উত্তেজনায় বারবার নিভে যাচ্ছে পাইপ, তিনি বর্ণনা করছেন, বগুড়া থেকে চল্লিশ দশকের দুর্লভ কিছু পত্রিকা উদ্ধারের কাহিনী। টেবিলের উপর ছড়িয়ে আছে ফকির বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন নিয়ে বিস্তর বই, বাজার চলতি খোয়াবনামাও" (উদ্ধৃত, আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭)। অগ্রজ লেখক শওকত আলী জানিয়েছেন, এ উপন্যাসের প্রয়োজনে লেখক তাঁর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আলাপ করেছেন এবং সে সময়ে তাঁর মনোভঙ্গি--

> ইতিহাস আর নৃতত্ত্ব যেন তাঁকে পেয়ে বসল– সেই সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বও। প্রায়ই বাড়ি যেতেন, বগুড়ায়। আর ওখানে গেলেই চলে যেতেন 'মহাস্থানগড়' এলাকায়। প্রাচীন মূর্তি, টেরাকোটার বিষয় এবং ফিগার, দালানের ভিত-এর নকশা, ইটের সাইজ, এসব তো লক্ষ করতেনই। আরও বেশি লক্ষ্য করতেন ওই এলাকার লোকজনের মুখের ভাষাভঙ্গি, আচার আচরণ, নামের বৈশিষ্ট্য, পদবির বৈচিত্র্য এইসব। নতুন কিছু চোখে পড়লেই ঢাকায় ফিরে এসে আমাকে জানাতেন। ... একদিন এসে মাদারি ফকিরদের সম্পর্কে কী জানি জানতে চাইলেন। যা জানি বললাম, কিন্তু পরে দেখি উনি আমার চাইতেও বেশি জেনে ফেলেছেন। আবার একদিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, গিরি কাদের পদবি? নিশ্চয়ই সাধু সন্ন্যাসীদের? আমার যে অভিজ্ঞতা অন্যরকম, জানালাম সেটা। বললাম, কুড়িগ্রাম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং নেপালের ভেতরেও অনেক মুসলমানের নামের পেছনে গিরি পদবি দেখতে পাওয়া যায়। সেই সূত্রে তাঁদের বগুড়া অঞ্চলে গিরডাঙ্গা গিরিরডাঙ্গা নামগুলোর প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহাসিকতা আরও বোঝা গেল ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে ওই গিরিদের সম্পর্ক কী এবং কেমন ছিলো। ... নিরলসভাবে জীবনকে তার মর্মমূলে পর্যন্ত খোঁজার এবং খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে দেখার স্বভাব অর্জন করেছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। যার ফলে সম্ভব হয়েছে খোয়াবনামার মত কালজয়ী একখানি উপন্যাস লেখা, যা সকল বাংলাভাষীকে বহুকাল ধরে তৃণমূলের মানুষকে চিনতে এবং জানতে সাহায্য করবে। ('ইলিয়াস : মিল অমিলের প্রিয়জন', kIKZ Av‡j¨i ceÜ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১৪)

১০৬. মাকানপুরের সুফিসাধক শাহ বহিউদ্দীন মাদারের অনুসারীরা মাদারি ফকির হিসেবে পরিচিত। শাহ মাদারের (জন্ম : ১৩১৫ খ্রিস্টাব্দ) পিতা ও পূর্বপুরুষ ইহুদি ছিলেন। মদিনায় গিয়ে তিনি ইসলাম ধর্মে আগ্রহী হন। মদিনা থেকে তিনি একপর্যায়ে ভারতের গুজরাটে আসেন। শাহ মাদারের শিষ্যরা মনে করেন, তিনি সরাসরি হজরত মহম্মদের (সঃ) কাছ থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁর জীবনধারায় সিয়া-সুন্নী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। তিনি চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরে পরিভ্রমণরত অবস্থায় মাদারি মতবাদ প্রচার করেছিলেন বলে কথিত আছে। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং মহৎ ধর্মপ্রচারক ছিলেন, তার অনুসারীরা এরূপ ধারণা পোষণ করত। ভারতীয় উপমহাদেশে আগত বিভিন্ন পীর-দরবেশ, ফকিরদের মধ্যে মাদারি ফকিরদের অবস্থান যে লোকায়ত সংস্কৃতিতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ আনন্দ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মাদারী পীরকে কেন্দ্র করে যে লোকায়ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে অন্যান্য সুফিদের নিয়ে সে ধরনের চিন্তাভাবনা লক্ষ করা যায় না।' [উদ্ধৃত, আলাউদ্দিন মণ্ডল, 'খোয়াবনামা-য় মরমি অভিভব এবং মাদারি ফকির প্রসঙ্গ', মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পাদিত), El‡j‡K, নব পর্যায় অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১৪৪]। সতের শতকের মধ্যভাগ থেকে উত্তরবঙ্গে মাদারিদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সাংসারিক পরিমণ্ডল ছেড়ে দরগাকেন্দ্রিক জীবনাচারে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। উরস থেকে অর্জিত অর্থেই মাদারি সম্প্রদায়ের আর্থিক ভিত্তি মজবুত ছিল। মাদারি ফকিরদের দরগা সংলগ্ন এলাকার গ্রামবাসী অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করত। এই অর্থ দানকে কেন্দ্র করেই বাংলার জমিদার ও কৃষকদের সঙ্গে ফকিরদের দ্বন্দ্ব আঠারো শতকে চরমে উঠেছিল। (এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত জানতে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

১০৭. †Lvqvebvgv উপন্যাসের আখ্যানগত পটভূমি নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নেপথ্যে উপস্থিত রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে এ বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফকিরকুণ্ডির (রংপুর) দেওয়ানি গ্রহণ করে এবং দেবী সিংকে এর ইজারাদার পদে নিয়োগ দেয়। তার বিবিধ অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষকেরা ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সমকালে সংঘটিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ অভিঘাতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এরই পরিণতিতে কৃষকেরা পরিণত হয় দস্যুতে, যারা বিভিন্ন সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিয়েছিল। এদেরই একজন 'কৃপানাথ' নিজের বিরাট দল নিয়ে পঞ্চগড়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আস্তানা গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। ভবানী পাঠকও ছিলেন সন্ন্যাসীদের অন্যতম। মাদারি ফকির সম্প্রদায়ও একপর্যায়ে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এ বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ হলেন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, ইমামবাড়ি শাহ, জয়রাম, জহুরীশাহ, দর্পদেব, বুদ্ধশাহ, মজনুশাহ, মুসা শাহ, রামানন্দ রগাঁসাই, সোভান আলী প্রমুখ। এদের বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসীগণ প্রথম বর্ধমান জেলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে সম্পৃক্ত হন। তবে একপর্যায়ে ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধুরাণীর দলের সন্ন্যাসীরা ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হন ও মৃত্যুবরণ করেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজদের কাছে অভিযোগ আসে যে, ভবানী পাঠক নামে এক ব্যক্তি তাদের নৌকা লুট করেছে। লেফটেন্যান্ট ব্রেনোর নেতৃত্তাধীন অভিযানে ভবানী পাঠক মারা যান। অন্যদিকে পঞ্চগড় ও জলপাইগুড়ি এলাকাসহ উত্তরবঙ্গে ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন মজনু শাহ। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহকে দমন করার জন্য দিনাজপুর ও রংপুরে পাঠানো হয় অতিরিক্ত ব্রিটিশ সৈন্য ও দেশীয় সিপাহী। পরের বছর তাঁর নেতৃত্বে ফকিরগণ বগুড়া, রংপুর, জলপাইগুড়ি, বৈকুণ্ঠপুর, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় আক্রমণ চালায়। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর মজনু শাহ পাঁচশত সৈন্যসহ বগুড়া

জেলা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করার পথে 'কালেশ্বর' নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। এতে তিনি মারাত্মক আহত হয়ে অবশেষে 'মাখনপুর' নামক স্থানে মারা যান। মজনু শাহের মৃত্যুর পর তার ভাই মুসা শাহ দলের নেতৃত্ব দিলেও ১৮০০ সাল নাগাদ এ বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে দমন করে। (নাজমুল হক, cÂMo †Rjvi BwZnvm I †jvKms¯'wZ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৪-৮৮)

১০৮. তপোধীর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন--

ফুলজান ও সখিনা এভাবে কেবল সময়ের বাসিন্দা হয়ে থাকে না, ক্ষুৎপীড়িত নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজনের খাঁটি প্রতিনিধি হিসেবে মহাসময়েরও চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। যখন ফুলজানের অনুভূতিতে সখিনার চুপ হয়ে-যাওয়া অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের অনুষঙ্গে গৃহীত হয়, আমরা লক্ষ করি, উপন্যাসে খণ্ডসময়ের মধ্যে মহাসময়ের ধারাবাহিকতা : 'কিন্তু বেটি তার এরকম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? ... তমিজের বাপ নিশ্চয়ই তার ওপর আসর করে নাতনির মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার জানা অজানা মুনসির পাওনা শোলোক।' ইলিয়াস এই সংকেত দিচ্ছেন যে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের অভিজ্ঞতা ও অবস্থানজনিত দূরত্ব যতই বাড়ুক না কেন, যৌথ নিশ্চেতনায় সঞ্চিত থাকে কৌম অনুভূতির প্রত্নস্মৃতি যা জীর্ণও হয় না হারিয়েও যায় না পুরোপুরি। (Dcb¨v‡mi mgq, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৮৫)

১০৯. এ উপন্যাস সম্পর্কে তিনজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকের অভিমত--

ক. আমি বিশ্বাস করি, কি পশ্চিমবাংলা কি বাংলাদেশ সবটা মেলালে তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক। আমার চেয়ে অনেক বড় লেখক। [মহাশ্বেতা দেবী, ZYgj, আনু মুহাম্মদ (সম্পাদিত), ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৭]

খ. গত কয়েক বছরে (এ প্রবন্ধ ১৯৯৭ সালে লিখিত) নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাঁরা একালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন–এমনকি নোবেল পুরস্কার না পেয়েও ... ইত্যাদি অসংখ্য সমকালীন লেখকদের পাশাপাশি বাংলাভাষার লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে জায়গা দিতে আমি এতটুকু হীনম্মন্যতা বা অতিশ্লাঘাবোধে ভুগি না। আমার কাছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। ... চিলেকোঠার সেপাই-এর পর নয়, খোয়াবনামার পরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে আমি সমকালীন পৃথিবীর প্রধান লেখকদের একজন বলে মনে করি ... তাঁর তিন দশকের লেখকজীবনে–পরিমাণে তা কতটুকুই-বা, কিন্তু আমি মনে করি–অনেকটা দূর পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গী হতে পারবেন। (হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : স্বপ্নছায়াকল্পনার মূর্ত বাস্তব', evsjv K_vmvwn‡Z¨ K‡qKRb : gM Ae‡jvKb I mvgvb¨ wePvi, চারুলিপি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১২৬-১২৭)

গ. 'খোয়াবনামা' একা দৈত্যের মত ... বেনো প্লাবনের মুখে পা গেড়ে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ রচনা করেছে। অধিকন্তু, একটা অস্তিবাচক বিকল্প দুর্গপ্রাচীর খাড়া করেছে। কাৎলাহার বিলকেন্দ্রিক একটি বিশাল জনপদ, তার বহুরঙা নরনারীর পোড় খাওয়া মচকে যাওয়া অবয়ব ও অন্তহীন স্বপ্নজীবী মনোজগৎ, দূর নাগরিক ঔরসে জাত রাজনৈতিক আন্দোলনে টোল খাওয়া সম্পর্কগুলোর মফঃস্বলী দ্বন্দ্বক্রিয়া, শ্রেণীগুলির ট্র্যান্‌জিশনাল ঘাতপ্রবণতা ও ট্র্যাডিশনাল ঘাতসহ নির্বেদী

স্বভাব, প্রতিটি ব্যক্তি যেখানে নিজের নিজের ডিটেইল মনক্রিয়ার লেনদেনে ও পারস্পরিক টানাপোড়েনে ক্রমবিকাশমান অথচ প্রত্যেকে তারা সমগ্র মানব অস্তিত্বের মূল সংস্থানে সূক্ষ্ম সূত্রবন্ধনে শরীক, ইতিহাস ও ভূগোল যেখানে বেণীবদ্ধ অবস্থায় অবিভাজ্য কালশরীরে ত্রিকালিক বিভাজনচিহ্ন দেগে দেয়, যেখানে আবহমানকালীন লোকসংস্কৃতি সম্পূর্ণ আধুনিক রূপকার্থে এক বৈপ্লবিক যুগভাষ্য ধারণ করে, শেষ পর্যন্ত অনাগত কালের গর্ভে নতুন প্রজন্মের সূচনাইংগিত; এত বড় এপিক ও প্যানোরমিক উপন্যাসপ্রয়াস বাংলাদেশের সাহিত্যে নজিরবিহীন। মাত্র একটি গ্রন্থের জোরেই আমাদের গার্হস্থ্য উপন্যাসসাহিত্যের গণ্ডি তচনচ করে কী ভীষণ আন্তর্জাতিক করে দিয়ে গেলেন ইলিয়াস! (আবুবকর সিদ্দিক, mwn‡Z¨i msMcmsM, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬২-১৬৩)

১১০. এ আলোচনায় ব্যবহৃত উপন্যাসের সকল উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, iPbvmgM 2, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,

২০১২। উদ্ধৃতির পাশে গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীতে নির্দেশিত।

১১১. এ উপন্যাসের নামকরণ এবং আখ্যান সম্প্রসারণের অন্যতম অবলম্বন স্বপ্ন। এ সম্পর্কে লেখকের প্রাসঙ্গিক অভিমত--

খোয়াবনামায় ফ্যানটাসিটা অনেক বেশি। একটা গোটা কমিউনিটি স্বপ্ন দেখছে। শুধুমাত্র তমিজের বাপ একা নয়। খেত মজুর না হয়ে তমিজ বর্গা চাষি হবে এই অবধি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ... আমি চেয়েছি কমিউনিটিকে সামনে আনতে। যেমন তমিজের বাপ। যে মানুষটি কখনো সামনে আসে নি– চেরাগ আলি– তারও স্বপ্ন আছে। কেরামত আলি একজন আছে সেও স্বপ্ন দেখে। ... গোটা কমিউনিটির খোয়াব দেখাতে গিয়ে আমি ফ্যানটাসিতে চলে এসেছি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেকার নিজস্ব ধর্ম, সেখানকার মিথ নিয়েই তো অ্যাসোসিয়েট মানুষ। আমাদের জীবন তো স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটছে। ... মানুষ স্বপ্ন দেখে, চাষিরা, কামাররা এরপরেও স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন না দেখলে বাঁচার কোনো আশা থাকে না। ... স্বপ্ন ভাঙে, নতুন করে স্বপ্ন তৈরি হয়। সেটাও ভাঙে। কিন্তু স্বপ্ন দেখা তো থেকেই যায়। না হলে এরা বাঁচবে কীসের হাত ধরে। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬)

১১২. বাংলা ব্যাকরণে সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত ‘অপর’ শব্দ বহুমাত্রিক অর্থবিশিষ্ট এবং পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাসমূহে এর অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল। এ শব্দটি সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় সবিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে অর্থের বিশিষ্ট প্রয়োগের সামর্থ্যগুণে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের e½xq kã‡Kvl -য়ে ‘অপর’ শব্দের অর্থ হিসেবে অন্য, ভিন্ন, পৃথক, ইতর, অর্বাচীন, নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, অন্যজাতীয়, প্রতিকূল, বিরোধী, শত্রু ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয় যে, শব্দটির অর্থসমূহে রয়েছে ব্যবধান বা দূরত্ব, অনন্বয়সূচক মনোভঙ্গি। প্রকৃতঅর্থে, ‘অপর’-সম্পর্কিত ভাবনার আশ্রয় হলো ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত প্রেক্ষাপট। সমাজ-অন্তর্গত যে কোনো ব্যক্তি কেন্দ্র-প্রান্তের আলোকেই নিজস্ব মূল্যায়নে বাধ্যগত। যে কেন্দ্র থেকে যত দূরে অবস্থান করে, প্রান্তিকতার কারণে তার মধ্যে হীনম্মন্যতাবোধ তত বেশি সক্রিয়। অন্যদিকে যে কেন্দ্রাভিগ অবস্থানের অধিকারী, অন্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রকাশের সুযোগ ও আধিপত্যবাদী মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই তার আচরণ, চিন্তায় বিস্তৃতিলাভে

সক্ষম হয়। সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগত বিপ্রতীপতা ও সংঘাতের অনিবার্যতাই কেন্দ্র-প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থানে বিরাজমান অপরতাবোধের নিয়ামক শর্ত। এর সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতা, অন্যের ওপর কর্তৃত্বশীলতার অভিপ্রায়, আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে অন্যের সমীহ আদায়ের অভীপ্সা প্রভৃতিও সামাজিক শক্তির ধারক-বাহক হিসেবে কেন্দ্র-প্রান্তের সম্পর্কগত বিন্যাসকে ক্রমশ জটিল করে তোলে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত--

> 'পর'কে যদি 'আত্ম'র শাসনভুক্ত, শর্তসাপেক্ষ করে তোলা যায়, 'পর'কে যদি 'আত্ম'র ছাঁচে সাজিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেই 'পরে'র স্বাতন্ত্র্য লোপ পেতে বাধ্য। ঐ আত্মীকৃত আদল বা নির্মিতি তাকে পরিণত করে 'আত্ম'র এক প্রক্ষেপে, প্রতিবিম্বে। 'পর' তখন আর ঠিক পর থাকে না, পৃথক কোনো সত্তায়, নিজস্ব কোনো সংজ্ঞায় তাকে শনাক্ত করা যায় না; 'পর' হয়ে ওঠে 'আত্ম'র উৎক্রম (ইন্‌ভারশান্‌), সবয়ব প্রত্যক্ষতা হারিয়ে মনগড়া, বিমূর্ত ধারণা কেবল। আত্মকেন্দ্রিক এই চিহ্নব্যবস্থায় 'পর' কখনই বিষয়ীর মর্যাদা পায় না, নিছক বিষয় থেকে যায়। ... আত্তীকরণ, আত্মসাৎ-এর এই কৃৎকৌশল আত্মকে জোগায় একধরনের নিরাপত্তা; তার অন্তর্বিন্যাসের শৃঙ্খলা বা সংগতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলবার আর দরকার পড়ে না, ... 'আত্ম' যেহেতু 'পরে'র মুকুরেই নিজেকে দেখতে চায় তাই নিজের কাছেও তার পরিচয় মূলত নেতিবাচকই থেকে যায়–উৎক্রমের উৎক্রম ঘটিয়েই কেবল পৌঁছোনো যায় আত্ম-কেন্দ্রে, এমন এক কেন্দ্রে, আদতে যা ফাঁপা এবং ফাঁকা। (শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, †Mvcvj-ivLvj Ø¬Ømgvm : Dcwb‡ekev' I evsjv wkïmwnZ¨, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৮-৯)

১১৩. এ উপন্যাসে ব্যবহৃত কিংবদন্তি সম্পর্কে লেখক বলেছেন--

> ক. ফকির বিদ্রোহের এক সৈনিক মারা গিয়ে পাকুড় গাছের ওপর জিন সেজে বসে আছে। বারবার তমিজের বাপ সেখানে যাচ্ছে। যদি ওর সঙ্গে (জিন) দেখো মেলে, তাহলে দুর্দশা কেটে যাবে। কথাটা খুব স্পষ্টভাবে বলা নেই। খুব স্পষ্টভাবে ভাববার ক্ষমতাও নেই। বোকা টাইপের মানুষ। লোকটা স্বপ্ন দেখে ভাগ-চাষি হওয়ার। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫)

> খ. একটা গাছ আছে। গাছকেই বিশ্বাস করতে চায়। depend করতে চায় সেটার উপর,– মানে গাছটাতে বলতে পারো ঈশ্বর-টিশ্বর বা দেবতা-টেবতা কিছু আছে। ... জিনটাই তো দেবতা আর কি। ... পরের প্রজন্মের একজন হারিয়ে যায়। তারপর একদিন সবাই জানতে পারে গাছেই উনি আছেন। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১-১১২)

১১৪. এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন--

> ক. আমি চেয়েছি কমিউনিটিকে সামনে আনতে। যেমন তমিজের বাপ। যে মানুষটি কখনো সামনে আসে নি– চেরাগ আলি– তারও স্বপ্ন আছে। কেরামত আলি একজন আছে সেও স্বপ্ন দেখে। সে কবিতা লেখে। গ্রামের কবিতা লেখে। পার্থক্য হচ্ছে চেরাগ আলিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই কবিতা তুমি বাঁধলে? তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। বলে কবিতা কি বাঁধার জিনিশ! আমরা কবিতা বাঁধি না এসব আমরা পাই। রেগে যেত। ওর কাছে বিষয়টা ঐশ্বরিক ব্যাপার। কেরামত আলি বলে আমি কবিতা বাঁধি। সে গ্রামের কবি কিন্তু আধুনিকতামনস্ক। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬)

খ. মেলায় গিয়ে কেরামত আলি যে গানটা গাইছে একটু একটু অশ্লীল। সেই গানটা পুরোটাই আমি ওদের ওখান থেকে নিয়েছি। ... বিশ বছর আগে যখন গ্রামে যাই, তখন কিন্তু মনে হয়নি গ্রাম আমার মধ্যে পরিণত হচ্ছে। আমি বহু পদ ওদের মধ্যে থেকে নিয়েছি ... নিচবর্গর যে কথা আছে তা আমি ইচ্ছা করে যে নিয়ে এসেছি তা নয়। বরং বলা যায় চলে এসেছে। আর এভাবে চলে না আসলে বুঝি উপন্যাসটাও দাঁড়ায় না। (আলাউদ্দিন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭)

সমালোচকের অভিমত--

কেরামতের বাঁধা গান তেভাগার গান, সংগ্রামের গান, তাতে কোনো কুয়াশা নেই। কিন্তু ফকিরের গানে কাল পরম্পরায় সভ্যতা, জীবন পরিবর্তনের কথা। কিন্তু কুয়াশা জড়ানো। চেরাগের আর একটি গান থেকে আমরা জানতে পারি– 'আমার হইলো ভাবের ব্যারাম।/এই ব্যারামের নাইকো আরাম, গো ও ও ও!' শিল্প কিংবা সংগ্রাম–দুটি ক্ষেত্রেই এই 'ভাবের ব্যারাম'-এর কথা পাঠক জানেন। আবার আর একটু পরে লেখক জানান–চেরাগ আলির নামে যে গান চলে আসছে সেটাই বা কে কবে বেঁধেছিল তাও জানা যায় না। অর্থাৎ কাল পরম্পরাবাহিত যে গান, যা মানুষকে বাঁচায়, দুঃখের সাথী হয়ে ওঠে। (রবিন পাল, Dcb¨vm : cvP¨ I cvðvZ¨, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১১ পৃ. ১৪৯)

১১৫. আনন্দ ভট্টাচার্যের প্রাসঙ্গিক অভিমত--

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর Avb›`gV (১৮৮২) লেখার তাগিদে অবশ্যই হান্টার বর্ণিত ঐতিহাসিক উপাদানকে কাজে লাগিয়েছেন। যদিও হান্টার বলছেন যে তিনি গ্রামবাংলার কাহিনী বর্ণনা করতে ব্যস্ত কিন্তু তাঁর আলোচনা মূলত বীরভূম, বিষ্ণুপুর বা সামগ্রিক অর্থে দক্ষিণবঙ্গকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। হয়তো এই চিন্তাভাবনার তাগিদে বঙ্কিমচন্দ্রের Avb›`gV-এ বর্ণিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হিসাবে উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের বদলে বীরভূমকে বাছা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল মাত্র বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন তাই নয়, তিনি বিদ্রোহীদের যে বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন তার সঙ্গেও ইতিহাসের বিস্তর পার্থক্য। এমনকি Avb›`gV-এর প্রথম দুটি সংস্করণের সঙ্গে তৃতীয় সংস্করণের বিষয়বস্তুর বিস্তর প্রভেদ। সম্ভবত রাজরোষ থেকে বাঁচবার জন্যই তাঁকে এই পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকাকে হাজির করেছেন সে ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ মেলে। তিনি বিদ্রোহের সন্ন্যাসী বলতে যাদের হাজির করেছেন তারা নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত ও অনুশীলন তত্ত্বে বিশ্বাসী একদল সন্তান যারা স্বদেশসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। ... বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন যে Avb›`gV ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় যেহেতু এটা লেখা এবং বেশ কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রের সন্ধান দিয়েছেন এবং তার চেয়ে বড় কথা, ঐতিহাসিক ঘটনা অর্থাৎ সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে উপস্থিত করেছেন তাই বেশ কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে যার ফলে প্রশ্ন ওঠে "সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া

গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিভিল না”–– সত্যানন্দ কে এবং তিনি কোন আগুন জ্বালিয়েছেন যা নেভেনি। সত্যানন্দকে যে সন্তান বলে অভিহিত করা হচ্ছে তার সঙ্গে ইতিহাসের সন্ন্যাসীদের কোনও মিল নেই। (c‡ev³, পৃ. ১১-১২)

১১৬. এ প্রসঙ্গে গবেষক জানিয়েছেন––

> আদি মধ্যযুগে ... যমুনার উল্লেখ পাই ধোয়ির ‘পবণদূত’ কাব্যে, ... এরপর ... মধ্যযুগের ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে। আবুল ফজল সেখানে বর্ণনা দিয়েছেন It is divided into three streams; one the Sarsuti (Saraswati); the second the Jamuna (Jamuna) and the third the Ganges, called collectively in the Hindi Language. Tribeni, and held in high veneration.” রেনেলের মানচিত্রে যমুনা ক্ষীণকায়া। ... ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের ভুমিকম্প যার ফলে গৌড়ের কাছে গঙ্গার খাত পরিবর্তন হয়। তার আগে কিন্তু যমুনা বেগবতী – এমন বর্ণনাই পাই বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়’ কাব্যে ... সুতরাং যমুনার শাখা পদ্মাও তখন বেগবতী ছিল ... পদ্মার পতনের মূলে হয়তো ২ এপ্রিল ১৭৬২-র ভুমিকম্প বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। এই ভূ-কম্পনের ফলশ্রুতিতে বঙ্গ ও মায়ানমারের ভূস্তর উঁচু হয়ে ওঠে এবং পদ্মার জলধারা অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এছাড়াও ১৮শ শতকে দামোদর তার খাত পরিবর্তন করে বর্তমান পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে, যার ফলে যমুনার সঙ্গে তার শাখা নদী পদ্মারও পতন ত্বরান্বিত হয়। ... ধ্বংসস্তুপ থেকে পদ্মার দূরত্ব বর্তমানে ... প্রায় তিন মাইল। কিন্তু পরবর্তীকালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বিদ্যাধরী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি একে যমুনার তীরে বলে বর্ণনা করেছেন। সাম্প্রতিক কালে ১৯৯৩ সালে ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA এই অঞ্চলে যে সমীক্ষা চালিয়েছে তাতে এই নদীকে ... পদ্মা বিল বলা হয়েছে। ... কিন্তু বিল যে আদতে নদী ছিল তা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল চাঁদা গ্রামে ‘ল্যাব-টু-ল্যান্ড প্রজেক্টে’ তাতে এই নদী দিয়ে নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ চলাচলের তথ্য উঠে এসেছে ইংরেজ আমলে। ... ড. গৌরীশঙ্কর দে তাঁর ‘হাবড়ার কথা’ বইতে হাবড়া শ্যাম মার্কেটের নিকটে নীল রপ্তানির জন্য ঘাটের উল্লেখ করেছেন। যার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান– ঘাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত, কিন্তু খালটিও এখনও বিদ্যমান। [শংকর রঞ্জন মজুমদার, ‘যমুনা ও শাখা নদী পদ্মা–সংলগ্ন অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি’, †jvK : evsjvi b‘b‘x, Rjvkq 1, প্রণব সরকার (সম্পাদিত). কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৬৪-৩৬৭]

ঐতিহাসিক তথ্য ও বৃত্তান্তের সঙ্গে †Lvqvebvgv-য় বিবৃত যমুনা নদীর খালে রূপান্তরিত হওয়ার কিংবদন্তির প্রতিতুলনা করলে বোঝা যায়, লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে নিজেই এ কিংবদন্তি রচনা করেছেন। লোকমানসে বিভিন্ন কিংবদন্তি যুগ যুগ ধরে প্রজন্মান্তরে প্রচলিত থাকে। মাদারি ফকিরদের সম্পর্কে লোকসমাজের ভক্তি, সমীহা এবং বিশ্বাস গড়ে তুলবার সহায়ক উপাদান হিসেবেই লেখক এ উপন্যাসে চেরাগ আলি ও তমিজের বয়ানে দুটি পৃথক কিংবদন্তিকে উপস্থাপন করেছেন। চেরাগ আলি নিজেও মাদারি ফকিরের বংশধর বিধায় তার পূর্বপুরুষদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত বৃত্তান্ত উপস্থাপনের তাগিদে কুলসুমকে এ কিংবদন্তি শোনায়। জনৈক সর্দার পীরের অভিশাপে যমুনা নদী খালে পরিণত হয়। অন্যদিকে তমিজ তার মায়ের কাছ থেকে যে কিংবদন্তি শুনেছিল, তার প্রতিপাদ্য ছিল, যমুনা নদী খালে পরিণত হয়েছিল এবং খালটিই বাঙাল নদীর স্রোতধারায় মিশে কাৎলাহার বিল গড়ে তোলে। এ ঘটনার সঙ্গে মুনসি বয়তুল্লা শাহের সম্পৃক্ততা থাকায় তা তমিজের মনোগহীনে রেখাপাত করেছিল। লক্ষণীয়, উভয় কিংবদন্তির সঙ্গে যুক্ত মূল ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ হিসেবে ভূমিকম্পের উল্লেখ রয়েছে। জানা যায়, ১৭৬২ সালে (তদানীন্তন বার্মা) মায়ানমারে সংঘটিত ভূমিকম্পে বাংলাদেশেও ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। লেখক এ প্রসঙ্গের সঙ্গে

উপন্যাসে বিবৃত দুটি কিংবদন্তিকে সংযুক্ত করেছেন লোকসমাজের কল্পনা, ধর্মীয় ভাবপরিমণ্ডল ও চেতনালোকের রূপরেখা ফুটিয়ে তোলার তাগিদে।

১১৭. আহমদ ছফা স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন--

> ইলিয়াস ভাইতো 'খোয়াবনামা' লিখতে আরম্ভ করেছেন। ... একদিন বললেন, ... এই যে মুসলমানরা যে পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছেন তার কিছু নমুনা আমার প্রয়োজন। ... আপনি তো পুঁথি নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। এ বিষয়ে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারেন কি না। আমি জানালাম, ইসলামপুর চলে যান। ওই সমস্ত দোকানে ইউসুফ জুলেখা, আমীর হামজা, জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, কাসাসুল আম্বিয়া এরকম অনেক ইসলামি বইয়ের পুঁথি কিনতে পাওয়া যায়। ... এ গ্রন্থে ... যে সকল পুঁথির পংক্তি কিংবা অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে সবগুলো ইলিয়াস ভাই নিজেই লিখেছেন। পুঁথিসাহিত্য আসলে মধ্যযুগীয় মানসফসল। ইলিয়াস ভাই পলাশীযুদ্ধ পরবর্তী সময়টাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে যেয়ে এই মধ্যযুগীয় মানস হুবহু উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলো কোনো পুঁথি থেকে আহরণ করে তিনি উদ্ধৃতি হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন বলা হলে, খুব কম পাঠকের মনে কোনো রকম সন্দেহ জন্মাবে। ... এ থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব, ইলিয়াস ভাই কতো সতর্কতার সঙ্গে 'খোয়াবনামা'র কাহিনীটি বিকশিত করে তুলেছেন। (ZYgj, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১)

১১৮. লেখক জানিয়েছেন--

> বই লেখার তাগিদে আমাদের বগুড়ার গ্রামে আমার খুব যেতে হয়। আর আমি তো গ্রামেরই লোক। বগুড়ার গ্রামগুলোতে আমি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, নিম্নবর্ণের হিন্দু, নিম্নবিত্তেরও বটে ... তাদের সঙ্গে নিম্নবিত্তের মুসলমানের সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক কম। ...পূজা-পার্বণে গ্রামের নিম্নবিত্তের মানুষের ধর্মনির্বিশেষে অংশগ্রহণ অনেক বেশি। বগুড়ার পোড়াদহে একটি মেলা হয়। সেই মেলার নাম হল সন্ন্যাসীর মেলা। সেই মেলায় একটা সন্ন্যাসীর মূর্তি তৈরি করা হয়। পরে সেটা পুজো করে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেখানে সেটা কিন্তু একটা পারিবারিক-সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ নেয়। মেলা উপলক্ষে বাড়ির লোকদের আত্মীয়-স্বজনদের আনতে হবে, বিশেষ করে মেয়ে-জামাইকে আনতে হবে। তা না হলে সেই মেয়েদের পক্ষে শ্বশুরবাড়িতে থাকা মুশকিল হবে। এই মেয়ে নিয়ে আসছে, এটা কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সবাই। ... হিন্দু মুসলমানের কিছু কমন পারিবারিক বা সামাজিক উৎসব নেই। ওটা তো তাই, হিন্দু-মুসলমানের কমন উৎসব। এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার না? আমি দেখছি বুড়ো নিম্নবর্ণের হিন্দু গরিব মানুষ আমায় বলেছে, দেখ তো, জামাইবাবাজী জীবনে আমার খোঁজ নেয় না, কিন্তু মেলার সময় সে ঠিক আসতে শুরু করেছে। এখন তাকে মেলা দেখার সব খরচ দিতে হবে। একই কথা গরিব মুসলমানের কাছেও শুনেছি, মাঘ মাসের শেষ বুধবার মেলাটা হয়। দুর্গাপূজা বা ঈদে ওখানে যে উৎসবটা হয়, তার থেকে অনেক বড় উৎসব হয় এই মেলা। এই জিনিসটা আমি আর কোথাও দেখিনি। ... শেরপুরের কাছে একটা জায়গা আছে কেল্লাতোষ। সেখানেও এই সন্ন্যাসীর মেলা হয়। ... জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরেও একই জিনিস হচ্ছে। এগুলো আমার মনে হয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল না আঠার শতকের শেষের দিকে, মজনুশাহ যে ফকির বিদ্রোহ করেছিল, আমার মনে হয় ওইসময় থেকে এই ব্যাপারগুলোর সূচনা হয়েছিল। আমার মনে হয় সন্ন্যাসীর মধ্যে ভবানী পাঠকও আছেন। হয়তো ভবানী সন্ন্যাসীও হতে পারে। এই জিনিসগুলো কিন্তু লেখকরা এড়িয়ে গেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ব্যাপারটা

দেখতে গেলে অনেক নীচের দিকে যেতে হবে। একেবারে প্রলেতারিয়েত স্তরে; ... বাঙালি নিচবর্ণের নিচবিত্তের হিন্দু ও মুসলমানরা কিন্তু অনেক ব্যাপারটার অনেক কাছাকাছি আছেন। ... আরবি-ফারসি সংস্কৃতির যে ব্যাপারটা বলা হয়, সেটা কিন্তু ওপরের স্তরে। নীচের স্তরে সেটা নেই। (আলাউদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৪)

খ. কথাশিল্পী শওকত আলীর অভিমত--

†Lvqvebvgvর লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পৈত্রিক নিবাস বগুড়া জেলা শহরে। তিনি লক্ষ্য করেন, মাঘ মাসের শেষদিকের বিশেষ একদিনে তাদের বাড়ির কাজের লোকেরা তাদের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠতো। দুটি কাজের মেয়ে তাদের বগুড়ার বাড়িতে কাজ করতো। তারা ওই পোড়াদহের মেলায় যাওয়ার জন্য মাত্র দুদিনের ছুটি পায়। অসুস্থ মায়ের কষ্ট হবে বলে তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হয়–কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কাজে আসে না। দুটি মেয়েই পালায়। এমনকি তার ঢাকার বাসায় মিনু নামে যে মেয়েটি কাজ করতো সেও পোড়াদহের মেলায় যেতে পারতো না বলে কাঁদতো। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পোড়াদহের মেলায় কী আছে? তো জানা যায় যে, এই মেলা বসে একদিনের জন্য এবং সে মেলায় সন্ন্যাসীর থান আছে–ওই থানে পূজা দেয়া হয়–পূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নন–রাতের মধ্যেই মূর্তি স্থাপন, পরের দিন পূজা এবং যাবতীয় অনুষ্ঠান দিনে দিনেই শেষ করে দিতে হয়। আর অদ্ভুত কথা এই যে, চারদিকের গ্রামগুলোতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেয়ে জামাইকে নাইওর আনার রেওয়াজ আছে এবং খরচপত্র করার জন্য টাকাপয়সা জামাইয়ের হাতে দেয়া হয়–তা সে জামাইর বয়স যাই হোক। আরও জানা যায় যে, ওই মেলার আদিতে নাম ছিল সন্ন্যাসী মেলা। কাছাকাছি গ্রামের কাছে গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা– কেন এমন নাম? গিরি মানে তো পাহাড়, তো পাহাড় কোথায় ওই এলাকায়? ... জানা যায়, গিরি হচ্ছে পদবি। উত্তরে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি-ঠাকুগাঁও অঞ্চলে গেলে মানুষের নামের সঙ্গে অমন পদবি পাওয়া যায়। আরও অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা এই যে, সন্ন্যাসীবিদ্রোহের নায়কদের অনেকেরই নামের সঙ্গেই পদবি ছিলো গিরি। ('মীথ : তৃণমূলে যাবার এক পথ', kIKZ Avjxi ceÜ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৩-১৩৪)

১১৯. এ প্রসঙ্গে দুজন সমালোচকের অভিমত--

ক. আহমদ ছফা ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ... সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যে তিনি ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তার প্রথম কারণ অবশ্যই তাঁর প্রতিভা ও মেধা। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাধর ও মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। ... আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় তাঁকে উপরে উঠতে সাহায্য করেছিল। ... তাঁর অকালমৃত্যুতে তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে আমাদের। আমরা হারিয়েছি সমকালের সবচেয়ে প্রতিভাধর মানুষটিকে– যিনি আরো ছিলেন সাহসী, মানবিক গুণে সমৃদ্ধ, দেশের সম্মান ও সমৃদ্ধির প্রশ্নে আপসহীস, যে-কোনো সম্ভাবনাময় তরুণের স্নেহপ্রবণ উদার অভিভাবকের মতো। [সাঈদ-উর রহমান, 'আরেকজন সাহসী মানুষ চলে গেলেন', Avng' mdv ¯§iKMš, মোহাম্মদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩ পৃ. ৭২-৭৩]

খ. তরুণ প্রতিভা আবিষ্কার করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আহমদ ছফার। হুমায়ূন আহমেদ থেকে শুরু করে অনেকেই তাঁর উৎসাহেই লেখার জগতে অবস্থান নিয়েছিলেন। নিজেও তিনি অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও গানের জগতে বিচরণ করতে পারতেন। ফাউস্ট অনুবাদ করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। দুই বাংলার সাহিত্যামোদীরা নির্দ্বিধায় এটাকে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম কীর্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন। ... e¨¯Í DRvo, GKwU cexY e‡Ui Kv‡Q cv_bv বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। I¼vi, GKRb Avjx †Kbv‡bi DÌvbbcZb বারবার পড়তে ইচ্ছা করে। বাঙালি মুসলমানের মন মননশীল রচনার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে যে-লেখাটিকেবারেই অনন্য, এক কথায় অসাধারণ সেটি তাঁর পুষ্প, বৃক্ষ ও বিহঙ্গপুরাণ। ... আহমদ ছফা এ লেখার মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছেন। (আহমেদ কামাল, 'আহমদ ছফা : একটি নক্ষত্র নিভে গেল', Avng' Qdv ¯§iKMš, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬)

১২০. 'আহমদ ছফা : জীবনপঞ্জি',Avng' Qdv ¯§iKMš, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০

১২১. কবি ও সমালোচক আসাদ চৌধুরী জানিয়েছেন--

ছফা আমাকে তাঁর উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী' বইটি পাঠিয়েছিলেন। ... আমার কী যে ভালো লেগেছিল, এ ভালোলাগার খবরটি আমি আল মাহমুদকে জানাতে ভুলিনি। কী অসাধারণ প্রয়োগ আঞ্চলিক শব্দের। হিন্দু থেকে মুসলিম হওয়া মানুষটির সিদ্দতের বর্ণনায় তাঁর নৈপুণ্য দেখে অবাক হয়েছি। ... আহমদ ছফা 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাস -তে কিছু চরিত্র উপস্থাপন করেছেন, যেগুলো বাস্তবধর্মী নয়, বরং একেবারেই বাস্তব। চরিত্রগুলোর নামসমূহ পর্যন্ত তিনি পরিবর্তন করেন নি। ('আহমদ ছফা : তাঁর সৃষ্টি তাঁর সাহিত্যপ্রেম',শামসুল আরেফীন, Avng' Qdvi A›'ignj, বলাকা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৫)

১২২. 'সূর্য তুমি সাথী'-র চতুর্থ সংস্করণের ভুমিকা'-য় লেখক বলেন--

মা বাবার পঞ্চম সন্তানের মতো 'সূর্য তুমি সাথী'র উপর আমার একটি পক্ষপাত বরাবর থেকেই যাবে। বইটি প্রথম স্টুডেন্ট ওয়েজ থেকে ১৯৬৭ সালের দিকে ছাপা হয়েছিলো। লিখেছিলাম তারও প্রায় দু বছর আগে। তখন আমার বয়স বড়ো জোর একুশ। এই লেখাটির ভেতর তরুণ বয়সের আবেগ উত্তাপ সবটাই চারিয়ে দিয়েছিলাম। যে গভীর বেদনা এবং অসহ্য যন্ত্রণা আমি এই বইটি লেখার সময়ে অনুভব করেছিলাম, সেই বেদনা, সেই আনন্দের রেশ আমার মর্মকোষে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। (স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯৩)

১২৩. এ উপন্যাস রচনার পটভূমি সম্পর্কে লেখকের ভ্রাতষ্পুত্র নূরুল আনোয়ার বলেন--

সংবাদ অফিসের সন্নিকটে ছিল তাঁর (আহমদ ছফা) অকৃত্রিম বন্ধু অরুণেন্দু বিকাশ দেব-এর বাসা। ওখানে নিয়মিত তাঁর যাতায়াত ছিল। ফলে ওই এলাকায় তাঁর একটা আড্ডাও গড়ে উঠেছিল। ... আড্ডার নিয়মিত সদস্য ছিলেন নরেন বিশ্বাস, জামাল খান, পবিত্র কুমার দাস, অরুণ। মাঝে মাঝে আসতেন সন্তোষ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন প্রমুখ। ... আড্ডাটির নাম ছিল 'নটি কর্নার'। এই নটি কর্নারের একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছফা কাকা 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসটি লিখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

নটি কর্নারে আমি কথাটি উঠিয়েছিলাম। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গেও যে সকল লেখকের রেখা আমরা পড়ি এবং তারিফ করি, সে ধরনের রচনা আমরা নিজেরাই আমাদেও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করে লিখতে পারি। জামাল খান আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। তুমি কি সে ধরনের লেখা লিখতে পারবে? আমি বললাম, লিখতে পারি। সে বলল, লিখে দেখাও। জামাল বলল, ঠিক আছে, একশ' টাকার বাজি। লিখলে চলবে না সংবাদেও সাহিত্য পাতায় লিখে দেখাতে হবে। ৷ামি বাজি ধরেই আমার প্রথম উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী' লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। প্রথম অধ্যায় লিখে যখন রণেশদাকে দেখালাম, তিনি বললেন, বেশ তো হচ্ছে, লিখে যাও। পর পর দুটি অধ্যায় লিখেছিলাম এবং রণেশদা সংবাদে ছেপেছিলেন। আমি বাজি জিতেছিলাম, কিন্তু জামাল টাকা দেয়নি। তারপর লেখাটা আর ধরিনি। রণেশদার তাগাদায় প্রায় দু'বছর পরে লেখাটা শেষ করি। (নূরুল আনোয়ার, QdvgZ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৭-৫৮)

১২৪. সমালোচকের অভিমত--

আহমদ ছফার সাহিত্যকর্ম পূর্বাপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সেই উদ্দেশ্যের কার্যকারণ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন। ... ১৯৬৭ সালের রচনা এবং তাঁর প্রথম উপন্যাস সূর্য তুমি সাথীর দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। এতে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য, ধানের লড়াই, জমি-দখলের রাজনীতি, শোষণ এসবের ভেতর দিয়ে আরও এক বিচিত্র সমস্যার চিত্র এসেছে। সাতবাড়িয়া গ্রামের দরিদ্র যুবক হাসিম গোকুল ধরের কনিষ্ঠ সন্তান, কাজী-বাড়ির রহমত কাজীর মেয়ে জরিনার প্রেমে পড়ে হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল একথা গ্রামের লোকেরা কোনোভাবেই ভুলতে পাওে না। নানা সময়ে নানাভাবে তারা সুযোগ পেলেই এ-সত্য উত্থাপন করে। যেন ভূমিহীনতা, ক্ষুধা, অভাব এসবের ন্যায় হাসিমের পিতার পূর্বপরিচয়ও অঞ্চলটির জনগোষ্ঠীর জীবনে এক মহাসংকট। সমাজের খোলসে লুকিয়ে থাকা এ-সমস্যাটিকে ছফা চিহ্নিত করেছেন আজ থেকে প্রায় সিকি শতাব্দীকাল আগে। ... সমাজের নানা অসম্পূর্ণতার মধ্যে যে-সংকট দেখতে পান সূর্য তুমি সাথীর রচয়িতা সেটা শুধু একজন হাসিম বা একজন ব্যক্তির সংকট নয়, একটি জাতির সংকট। যে-সংকট বিদ্যমান ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক কালে, স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে জাতিসত্তার বিকাশ সত্ত্বেও তার উপস্থিতি দূরীভূত হয়নি। (মহীবুল আজিজ, 'আহমদ ছফা : তাঁর সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা', Avng' Qdv ¯§viKMš', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১)

১২৫. বিশিষ্ট সমালোচক আহমদ শরীফের অভিমত--

আহমদ শরীফের অভিমত হরিপদ দত্তের দেখবার চোখ, জানবার মন, বুঝবার শক্তি, অনুভব করবার হৃদয় যেমন আছে, তেমনি প্রতিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণনা করবার বাঞ্ছিত শক্তি এবং বর্ণিত মানুষের আর্থ-সামাজিক-আংস্কৃতিক অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ও ভঙ্গি প্রয়োগের নৈপুণ্যও রয়েছে তাঁর। ... মুসলিমের বিশ্বাস-সংস্কার, শাস্ত্র-সমাজ, ঘরোয়া জীবনাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লেখক সযত্নে অর্জন করে পাকা হাতে সুপ্রয়োগ করেছেন, তাঁর এ কৃতিত্বও অসামান্য। ... দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা চলে যে, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার একজন নতুন রূপকারকে, সমাজ পরিবর্তনের একজন সংগ্রামী নতুন কর্মীকে, গণমত সংগঠনের একজন উৎসাহী নতুন প্রচারককে, সর্বোপরি সমকালীন জীবনের ও জীবিকার একজন শিল্পচিত্রীকে ও একজন সফল শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করলাম। (হরিপদ দত্ত, Ckv‡b AwM'vn, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, বইয়ের মলাটের শেষ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত।)

১২৬. সমালোচকের অভিমত--

হরিপদ দত্ত ... লিখে এসেছেন বড়ো পরিসরে মহাকাব্যতুল্য উপন্যাস–সমাজগতি, সময় আর ব্যক্তিমানুষের সত্তা-স্মৃতি-হৃদয়নৈতিকতার স্বরূপদর্শনই ছিল তাঁর আধেয়। লেখনী ছিল আঙ্গিক আর ভাষাসৃষ্টির নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত শ্রমশীল। ... আত্মসচেতন, বলিষ্ঠ জীবনবাদী বক্তব্য ও পরিপ্রেক্ষিত-জিজ্ঞাসার অনুসন্ধিৎসায় হরিপদ দত্ত এখনও নিরলস। ... হরিপদ দত্তের উপন্যাসে জীবনের প্রতীকায়ন সর্বদাই প্রতীক সন্ধানী হয়, তিনি কখনো অ্যালিগরির দ্বৈততায় জীবনকে ঢেকে ফেলেন না। এটি ঘটে তাঁ রআত্মসচেতন, জীবনজিজ্ঞাসু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও সঙ্গে অভিজ্ঞতামিশ্র কল্পনাশক্তির মিথস্ক্রিয়ার জন্য। [সুসীমা হক, 'পিতৃহত্যার রাত ও অগ্নিবিন্দু', DjLWMoV, সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২০৩-২০৪]

১২৭. হরিপদ দত্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন--

রাজনীতি হচ্ছে একটি আদর্শের বিষয়। কালিক ভাবনা রাজনীতির সঙ্গে সংবেদনশীল মানুষকে জড়িয়ে ফেলে। ... ছাত্রজীবন থেকে সরাসরি মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। ... একাত্তরের স্বাধীনতার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীনপন্থীদের ভুল পদক্ষেপ আমাকে ভাবিয়ে তোলে। প্রকৃত অর্থে সে সময় থেকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে হতাশ হতে থাকি। নিজের এই ব্যর্থতাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার জন্য মার্কসীয় ক্ল্যাসিকসাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করি। এরই ফলস্বরূপ ছোটগল্প লিখতে শুরু করি। (হরিপদ দত্ত, K_v I mwnZ¨, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১০৭-১০৮)

১২৮. তাঁর অভিমত--

রাজনীতি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যদিকে সাহিত্য হচ্ছে জীবনের নান্দনিক কথাচিত্র। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিবর্জিত কোনো সাহিত্যই হয় না। ... রাজনৈতিক সাহিত্যকে একদিকে যেমনি রাজনীতি হতে হয় আবার সাহিত্যও হতে হয়। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮)

১২৯. তিনি জানিয়েছেন--

বাংলা সাহিত্যের একজন পাঠক হিসেবে আমি সব লেখকের কাছেই ঋণী। তাঁরা আমাকে শিখিয়েছেন এবং চিনিয়েছেন দেশকে, মাটিকে, মানুষকে এবং ভাষাকে। প্রকৃত অর্থে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি আন্দোলিত হয়েছি বিদেশী সাহিত্যের পথ ধরে। রুশ সাহিত্য, চীনা সাহিত্য, বুলগেরিয়ান সাহিত্য তথা অপরাপর সাহিত্য কর্ম আমাকে প্রভাবিত করেছে। ... বাংলাদেশের কোনো কথাসাহিত্যিক বা লেখকই প্রকৃত অর্থে আমার সাহিত্যের মানসভূমি তৈরিতে সহায়তা করেনি। তবে সব লেখকের লেখালেখির কাছে আমি পরোক্ষভাবে ঋণী। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১)

১৩০. তিনি জানিয়েছেন--

যেকোনো সমাজে প্রচলিত মিথগুলো আকাশ থেকে পতিত হয় না, এর ভিত্তিভূমি মাটি এবং মাটিতে দণ্ডায়মান মানুষ। তাই বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হিসেবে আমারও রয়েছে একটি মিথের জগৎ। সেই জগৎ থেকে প্রকৃত সত্যকে তুলে আনা লেখক হিসেবে আমার দায়িত্ব। সেই মিথ হিন্দু-মুসলিম বা বৌদ্ধ যাই হোক না কেন। আরো বাড়িয়ে বলা যায়, মিথের এক রহস্যময় জগৎ রয়েছে যেখানে অতি আধুনিক মানুষও এক ধরনের অবচেতন মনের খেলায় আনন্দ অনুভব করে। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩)

১৩১. তাঁর অভিমত--

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটি মাত্র পথই রয়েছে, তা হচ্ছে মার্কসবাদ। অন্যদিকে আমি বিশ্বাস করি না পৃথিবীর ধর্মগুলো মানবতাবাদী তথা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও ঊর্ধ্বে। ... একজন লোককে কমিউনিস্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনি যদি অসাম্প্রদায়িক হতে চান কবে তাকে অবশ্যই মার্কসের সমাজ ব্যাখ্যাকে স্বীকার করে নিতে হবে। ... মার্কসবাদ বিশ্বাস করে না এমন লোক কোনো দিনই অসাম্প্রদায়িক হতে পারে না। হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে সেই নোংরা সাম্প্রদায়িক ব্যাধি থেকে মুক্তি দিয়েছে। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩)

১৩২. ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন-

ঈদ সংখ্যা সচিত্র সন্ধানীতে ‘আযাযীলের পরান ভোমর’ উপন্যাসটি ব্যবচ্ছেদ করে ছাপা হয়। বই আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে যেমনি নামকরণটি বদলে গেছে, সুযোগ এসেছে তেমনি লেখাটির শারীরিক পূর্ণতা লাভের। ... কিছু কিছু গ্রামীণ ছড়া, প্রবাদ, গান এবং সেখানকার মানুষের কবিয়ালি ঢঙ-বাচ্য অনিবার্য কারণেই লেখাটিতে যুক্ত হয়েছে। ... বিপ্লবী রাজনীতিশূন্য গ্রামীণ সমাজে সেঁটে আছে সামন্ত সংস্কৃতি। সূত্রায়িত অবিরাম সংগ্রামের পরিবর্তে আজকের আধা শ্রেণী-সচেতন মানুষের বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম আগামী প্রস্তুতিরই বাস্তব সত্য। (হরিপদ দত্ত, Ckv‡b AwM‘wn, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬। উপন্যাসের ভূমিকা অংশ থেকে এ উদ্ধৃতি গৃহীত)

১৩৩. তিনি জানিয়েছেন--

আমার প্রথম লেখা ছিল একটি গল্প। ১৯৬৪ সালে রাজশাহী শহরে আন্তঃবিভাগীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য গল্পটি লিখেছিলাম। নাম মনে নেই। ... বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় যে গল্পটি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত ‘পূবালী’ পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিল তার নাম ‘বিষণ্ন অন্ধকার’। তবে গল্প লেখার আগে প্রচুর কবিতা লিখেছি। ঢাকার কাগজ ‘পূর্বদেশ’, ‘বেগম’ ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা ছাপা হয়েছে। ... ‘উৎস থেকে নিরন্তর’ ১৯৬৯ সালে ছাপা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে যে গল্পগুলো লিখেছিলাম সেগুলো নিয়ে বইটি ছাপা হয়। আমার শিক্ষক আবদুল হাফিজ স্যার বলেছিলেন, একটি বই বের কর। চাকরি পেতে সহজ হবে। তোমার সিভির গুরুত্ব বাড়বে। বলেছিলাম, স্যার কে ছাপবে। স্যার বলেছিলেন, কেউ ছাপবে না। বাবার কাছ থেকে টাকা আনো। বাবা টাকা দিলে বই ছাপা হয়।

দু'জন প্রখ্যাত মানুষ বইটির ভালো সমালোচনা করেছিলেন। একজন শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। ... বাংলা একাডেমীতে আসতেন কবি-গবেষক হুমায়ুন আজাদ। তিনি আমার বইটির সমালোচনা লিখেছিলেন। প্রশংসা যেমন করেছিলেন ত্রুটির কথাও বলেছিলেন। (চন্দন আনোয়ার গৃহীত সাক্ষাৎকার, MíK_v, বর্ষ ৫ সংখ্যা ৬, রাজশাহী, ২০১৫, পৃ. ১৫)

১৩৪. সমালোচক জানিয়েছেন--

সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের আবহ নির্মাণের উদ্দেশ্য সেলিনা হোসেনেরও ছিল। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের সামাজিক শোষণ, সাংস্কৃতিক শেঅষণ ও সামন্ত রাজার অর্থনৈতিক শেঅষণের স্বরূপ আবিষ্কার এবং তা থেকে মুক্তির জন্য নিচবর্ণের দরিদ্রশাসিত শ্রেণীর দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আর প্রচেষ্টার রূপায়ণ। তাই তিনি নীল ময়ূরের যৌবন উপন্যাসে গল্পকে সীমায়িত রাখেন রঙ্গদেশের একটি বিশেষ সামন্ত রাজ্যে, দ্বন্দ্বকে সীমায়িত রাখেন রাজপ্রাসাদ ও প্রজার মধ্যে। ... সেলিনা হোসেন তাঁর শৈশব কৈশোর ও যৌবনে প্রত্যক্ষ করেছেন শোষণ, সাংস্কৃতিক দমন দেখেছেন তিনি। দেখেছেন ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি-ছেষট্টি-উনসত্তরের আন্দোলন, একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধ, এককথায় বাঙালির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম। চর্যাপদের জীবনের মাধ্যমে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এ সকল ঘটনা প্রকাশের সময় সেলিনা হোসেনের মনে এই পটভূমি উপস্থিত থাকা অসম্ভব নয়। [সফিকুন্নবী সামাদী, 'বেনের মেয়ে ও নীল ময়ূরের যৌবন : তুলনামূলক আলোচনা', †mwjbv †nv‡m‡bi K_vmwnZ¨ : †'k Kvj RwZ, মাসুদুজ্জামান ও বরেন্দু মণ্ডল (সম্পাদিত), লেখাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৭১]

১৩৫. বিশ্বজিৎ ঘোষের অভিমত--

বর্তমান সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাধনায় ইতিমধ্যে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব একটি ভুবন। পাঠককে চিনিয়েছেন নিজস্ব সত্তার সংগ্রাম। ... ইতিহাসের গভীওে সন্ধানী আলো ফেলে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন সৃষ্টিতে তাঁর সিদ্ধি কিংবদন্তিতুল্য। বস্তুত, ইতিহাসের আধারেই তিনি সন্ধান করেন বর্তমানকে শিল্পিত করার শিল্প-উপকরণ। ... সাহিত্যিক নির্মাণকে ভেঙে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ধারায় সেলিনা হোসেন রেখেছেন প্রাতিস্বিক প্রতিভার স্বাক্ষর। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন 'নীল ময়ূরের যৌবন' ... মূল রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও সেলিনা হোসেনের হাতে তা এক অভিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত হয়েছে এ ...উপন্যাসে। ... সাহিত্যিক হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে তিনি বিস্মৃত হননি। ফলে তাঁর ... রচনার পশ্চাতেই থাকে একটা সামাজিক অঙ্গীকার, থাকে একটা প্রগতিশীল ভাবনা। ['সেলিনামঙ্গল', MíK_v, চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত), বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯]

১৩৬. তিনি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে জানান--

ঐতিহ্যের অনুসন্ধান আমার কাছে শুধু অতীতের বিষয় নয়। আমি ঐতিহ্যকে তখনই গ্রহণ করেছি যে বিষয়কে আমি Contemporary parallel-এ দাঁড় করাতে পেরেছি। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের পটভূমি দশম-দ্বাদশ

শতকের বাংলাদেশ। উপন্যাসে নায়ক কাহ্নুপাদের নিজ ভাষার জন্য লড়াই আমাদের বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্যারালাল। রাজার অত্যাচারে পালিয়ে গিয়ে গ্রামবাসী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিয়ে চামড়া পোড়ার গন্ধ বুকে টেনে নেয়। তখন নিজেদের ভূখণ্ড হবে এমন স্বপ্ন দেখে তারা। সেই স্বপ্নে বাংলাদেশের সীমানা বর্ণনা করি। অর্থাৎ তা হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্যারালাল। এভাবে আমি আঙ্গিকের ব্যবহার করেছি। রূপকের আশ্রয় নেইনি। (MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮)

১৩৭. সমালোচকের অভিমত--

সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' হাজার বছর আগের বাংলার পটভূমির রূপকের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকেই সাজিয়ে রেখেছেন। এই উপন্যাসে ... হাজার বছর আগের, চর্যাপদের সময়কালের বাংলার একটি কল্পবাস্তব কাহিনির মোড়কে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ব পাকিস্তান কীভাবে রূপান্তরিত হয় আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ ঐতিহ্যময়, অথচ নতুন গড়ে ওঠা একটি রাষ্ট্রে, সেই ইতিহাসই রূপান্বিত করেছেন তিনি। এক সুদক্ষ শৈলীতে বর্তমানকে অতীতের ছদ্মবেশি বিপ্রতীপ প্রত্নপ্রতিমায় বিন্যস্ত করেই সেলিনা হোসেন লিখেছেন এ উপন্যাস। এই কাহিনির অন্তরঙ্গ ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়েছে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার সুমহান ঐতিহ্যের স্মৃতির সঙ্কেত, সংগ্রামী সমকালের সত্তার উপলব্ধি, আর স্বপ্নময় প্রত্যাশায় জড়ানো ভবিষ্যতের কল্পনা। [পল্লব সেনগুপ্ত, 'নীল ময়ূরের যৌবন : হাজার বছরের স্মৃতিময় সেতু', চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত) MíK_v, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫]

১৩৮. এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন বাংলা সাহিত্যের আরেক শক্তিমান কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন--

হুমায়ুনের জনপ্রিয়তা তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও ছাড়িয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় শরৎচন্দ্রের কয়েক গুণ বেশি চলেছে হুমায়ূনের উপন্যাস। ... হুমায়ূনদের মৃত্যু নেই। ওরা বেঁচে থাকে মানুষের হৃদয়ে। দুই বাংলার মানুষের মাঝে। (ইমদাদুল হক মিলন, ‖cq ûg\qb A\n‡g', অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১২)

১৩৯.

ক. সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি অবশ্য হুমায়ুন আহমেদ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'নন্দিত নরকে' লিখেই পেয়েছিলেন। বাইশ বছরের এক অচেনা তরুণ লেখকের এই লেখাটি পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন আহমদ শরীফ–

'মাসিক মুখপত্র'-এর প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় গল্পের নাম 'নন্দিত নরকে' দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেননা ঐ নামের মধ্যেই যেন একটি নতুন জীবনদৃষ্টি, একটি অভিনব রুচি, চেতনার একটি নতুন আকাশ উঁকি দিচ্ছিল। লেখক তো বটেই, তাঁর নামটিও ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু পড়তে শুরু করলাম ঐ নামের মোহেই।

পড়ে আমি অভিভূত হলাম। গল্পে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি একজন সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর, একজন কুশলী স্রষ্টার পাকা হাত। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর, এক দক্ষ রূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান দষ্টারর জন্মলগ্ন যেন অনুভব করলাম। হুমায়ুন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবন-রসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবেন-এই প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব। (সরদার আবদুস সাত্তার, ¯^ZRvMwbqv ûgvqb Avn‡g`, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২৬৫-২৬৬)

খ. আনিসুজ্জামানের অভিমত–

২৪ বছর বয়সী এক তরুণ–বিজ্ঞানের ছাত্র–প্রথম উপন্যাস লিখেই পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়ে ফেলল। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ বা প্রয়োজন হলো না। ... হুমায়ুন লিখেছে দু'হাতে। ... সে লিখেছে উপন্যাস ও ছোটগল্প, নাটক ও রম্যরচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও শিশুতোষ রচনা। প্রথম প্রথম সমালোচকেরা তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তারপর তাঁরা তার ক্রটিসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ... হুমায়ূনের অধিকাংশ রচনা হয়তো উপন্যাসিকা বলে গণ্য হবে–জীবনের খণ্ডচিত্রই তারা তুলে ধরে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও যে সে অনেক লিখেছে, তাও ভোলা যায় না। ... সে যা তুলে ধরেছে তার লেখায়, তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তার দেখার ভঙ্গি, উপস্থাপনের ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাতে এই চেনা জগৎ ও জানা কথার মধ্যে আমরা নতুনত্ব খুঁজে পাই। ... হুমায়ুন পাঠকসৃষ্টিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ['তুমি রবে নীরবে', ûgvqb Avn‡g` ¯§iKMÖš', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৩]

১৪০. ইমদাদুল হক মিলন জানিয়েছেন––

স্বাধীনতার পর পর 'নন্দিত নরকে' বাংলাদেশের সবচাইতে আলোচিত উপন্যাস। আহমদ শরীফ, শওকত আলী, আহমদ ছফা এইসব শ্রদ্ধেয় মানুষ উপন্যাসটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সনাতন পাঠক ছদ্মনামের আড়ালে বসে তখনই বিখ্যাত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় 'নন্দিত নরকে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। ['আমাদের হুমায়ুন আহমেদ', ûgvqb Avn‡g` ¯§iKMÖš', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২]

১৪১. তিনি এ উপন্যাসের 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা'-তে তিনি নিজের লেখালেখির অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে পাঠককে জানিয়েছেন––

সোমেন চন্দের লেখা অসাধারণ ছোট গল্প 'ইঁদুর' পড়ার পরই নিচ মধ্যবিত্তদের নিয়ে গল্প লেখার একটা সুতীব্র ইচ্ছা হয়। 'নন্দিত নরকে' (১৯৭২) 'শঙ্খনীল কারাগার' ও 'মনসুবিজন' নামে তিনটি আলাদা গল্প প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলি। নিজের উপরে বিশ্বাসের অভাবের জন্যেই লেখাগুলি দীর্ঘকাল আড়ালে পড়ে থাকে। (k•Lbxj KvivMvi, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. অনুল্লেখিত)

১৪২.আরেকজন সমালোচক জানিয়েছেন––

হুমায়ূনের সাহিত্যিক জীবনে তার বাবার ভূমিকা অপরিসীম। ফয়েজুর রহমান পেশায় ছিলেন পুলিশ অফিসার। কিন্তু নেশায় ছিলেন সাহিত্যিক। প্রতিমাসে বাড়িতে সাহিত্যেও আসর বসাতেন। সেই আসরের নাম ছিল সাহিত্য বাসর। হুমায়ূন ও তার ভাইবোনেরা ছিলেন এই আসরের মধ্যমণি। সেখানে কবিতা পাঠ হতো, গল্প পাঠ হতো। সেই থেকেই তো হুমায়ূনের ঝোঁক পড়ালেখা এবং লেখালেখিতে। (সিনহা আবুল মনসুর, ûgvqb : GKRb n¨wgj‡bi ewklqvjv, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪৭-৪৮)

১৪৩. তাঁর মা আয়েশা ফয়েজ বলেন--

ও তখন ঢাকায় চলে এসেছে। মহসীন হলের ছাত্র। একবার একটা উপন্যাস লিখে আনল। সম্ভবত 'শঙ্খনীল কারাগার'। বাসার সবাই আমরা পড়লাম-কিন্তু তার বাবাকে পড়ানোর সাহস তার ছিল না। একদিন আমাকে দিয়ে সে লেখাটি তার বাবার কাছে পাঠাল। তারপর-আমার পাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করে অর্থাৎ জানতে চায় তার বাপ এটা পড়ে কি বললেন। এ রকম দু-এক দিন যাবার পর এক রাতে সবাই যখন শুয়ে গেছে তখন তার বাবা তাকে ডাকলেন। খুব ভয়ে ভয়ে সে গেল। আমিও তখন ছিলাম। তার বাপ পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে দিয়ে বললেন-'এটা যত্ন করে রেখে দিস। তুই একদিন খুব নামকরা লেখক হবি।' (তালহা বিন জসিম, ûgvqb Avn‡g‡`i mvÿvrKvi, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৮)

১৪৪. কথাশিল্পী শওকত আলীর অভিমত--

সাহিত্যগুণের বিচার হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়। তার লেখালেখির উদ্দেশ্য এবং সুরটাই অন্য এক সূত্র ধরে হাঁটে। বাংলাদেশের সমমাজজীবনকে যেমনভাবে সে দেখেছে, তেমনিভাবে তাকে উপস্থিত করেছে। দেখা যাবে, সে যা তুলে ধরেছে তার লেখায়, তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তার দেখার ভঙ্গি, উপস্থাপনের ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাতে এই চেনা জগত ও পরিচিত মানুষগুলোর মধ্যে, তাদের কথার মধ্যে আমরা নতুনত্ব খুঁজে পাই, নতুন এক ধরনের আনন্দ-বিষাদের দোলায় দুলতে থাকি। এই দুলুনিই হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টি। ['হুমায়ূননামা', ûgvqb Avn‡g` ¯§iKMš', হাসান হাফিজ (সম্পাদিত), তাম্রলিপি, ঢাকা, পৃ. ২০৩]

১৪৫.হামীম কামরুল হক জানিয়েছেন--

হিসাব করে দেখা গেছে, তিনি ... ৩৬৮টি বই লিখেছেন। ... হুমায়ুন আহমেদের লেখা পড়ামাত্রই চেনা যায়। বর্ণনাভঙ্গি, চরিত্র নির্মাণ, পরিস্থিতি নির্মাণ, সংলাপে তিনি এমন এক শৈলীর উদ্ভাবনকারী যা বোধ করি বাংলাসাহিত্যে অদ্বিতীয়। ... এসব তিনি নিয়েছেন, তিনি যে অঞ্চলের মানুষ সেই নেত্রকোণা ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষের কথনভঙ্গি থেকে। ['হুমায়ূন আহমেদ : শূন্যতার শিক্ষা', ûgvqb Avn‡g` ¯§iKMš', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৮৮]

১৪৬.সুব্রত কুমার দাস এ উপন্যাস সম্পর্কে অভিমত জানিয়েছেন–

> ‘উড়ে যায় নিশিপক্ষী’ একটি মহৎ উপন্যাস হতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু অবাস্তব আর বাস্তব সেখানে স্থান পেয়েছে খুব ঘনিষ্ঠে। সারা উপন্যাস জুড়েই অলৌকিক ঘটনা ও উপস্থিতিসমূহ বারবার প্রবেশ করে মূল প্লটকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তিনবুড়ি–কুঁজোবুড়ি, মেঝোবুড়ি ও ছোটবুড়িকে নিয়ে গল্পের যে প্রথম অধ্যায় শুরু সেখানে রয়ে গেছে অলৌকিকতার এক তীব্র আবেশ। সে অলৌকিকতাকে ছেড়ে যখনই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওসমানের আবির্ভাব ঘটেছে আমরা প্রত্যক্ষ করি বাস্তব সে ঘটনাও যেন অবাস্তবতার প্রলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে ... শত্রুরা ত্রিশ বছর আগে বাপ-মাকে মেরে ফেলার পর যে ওসমানও গ্রাম ত্যাগ করে শহরে গিয়েছিল সে গ্রামে তার পুনঃপ্রবেশ সম্পূর্ণত বাস্তব-লৌকিক হওয়া আসলেই অসম্ভব। ... উড়ে যায় নিশিপক্ষী একটি অলৌকিক জগতকে পরিভ্রমণে সফল হলেও ... সত্যানুসন্ধান না থাকায় উপন্যাসটি মহৎ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে ব্যর্থ হয়। (‘যাদুবাস্তবতা ও বাংলাদেশের উপন্যাস’ evsjv K_vmwnZ¨ hv‘ev¯ÍeZv Ges Ab¨vb¨, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৪৫)

এ বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। এ উপন্যাসে বিবৃত ওসমানের আখ্যান জাদুবাস্তব নয়, বরং অতিনাটকীয়। বাস্তবতার শর্তকে তা প্রায়শই ছুঁয়ে যায়। পৈতৃক সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে মন্নাফ খাঁর বাবা ওসমানের মা-বাবাকে যেভাবে খুন করায় এবং একপর্যায়ে যেভাবে এ ঘটনার অন্তরালবর্তী রহস্য উন্মোচিত হয়, তা জাদুবাস্তব নয়, বরং নির্মম বাস্তব। তবে ওসমান ও তার মায়ের সঙ্গে কুঁজোবুড়ির যে সম্পর্ক বহুবছর আগে গড়ে উঠেছিল, তা বহুদিন পর নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। এ বৃত্তান্ত কিছুটা চমকপ্রদ, অতিনাটকীয় হলেও অবাস্তব বা অসম্ভব প্রসঙ্গ নয় মোটেই। এ উপন্যাসে লেখক নয়নপুরের মতো ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত গ্রামের যে চালচিত্র উপস্থাপন করেছেন, তা বিস্তৃত পরিসওে বিশ শতকের প্রথমার্ধের ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অনাহার-শিক্ষাবঞ্চিত নিচবর্গভুক্ত আটপৌরে মানুষের যাপিত জীবনকেই তুলে ধরে। এতে জাদুবাস্তবতার প্রসঙ্গটি সমালোচকের জোরপূর্বক আরোপ। কাজেই এ বিবেচনা থেকে সমালোচকের উক্ত অভিমতকে গ্রহণের যৌক্তিকতা আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। নিঃসন্দেহে এ উপন্যাসটি লেখকের অভীষ্ট জীবনবোধ ও প্রাগ্রসর শিল্পভাবনার সমন্বিত সৃষ্টিকর্ম। সমালোচক যে ঘটনাগুলোকে অলৌকিক বলে চিহ্নিত করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলোকে এরূপ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর অন্তরালের চেহারা যে ভিন্ন এবং কোনো অতিলৌকিকতা, অতিপ্রাকৃতিক প্রসঙ্গযুক্ত নয়, বরং নিতান্তই যুক্তিনিষ্ঠ এবং বোধগম্য। আমরা উপন্যাসটির গবেষণাভুক্ত প্রসঙ্গাদি অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছি। কেন ওসমানের ত্রিশ বছর পর নিজ গ্রামে ফিরে আসার ঘটনাকে বাস্তবতাবর্জিত বিবেচনা করতে হবে, এর কোনো উত্তর দূরের কথা ইঙ্গিতও সমালোচকের লেখায় নেই। তাছাড়া তিনি এ উপন্যাসে ‘সত্যানুসন্ধান’ বলতে কী বোঝাচ্ছেন, তা সচেতন পাঠকের বোধগম্য হয় না। কারণ, লেখক নয়নপুরের বাসিন্দাদের যে জীবনবাস্তবতা ও চালচিত্রকে এ উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন, তা নিতান্তই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এতে প্রতিপাদ্য ভাবনা ও গ্রামীণ মানুষের সামগ্রিক রূপায়ণ চোখে দেখা প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আলোকেই শিল্পিত ভঙ্গিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এসব কারণে সমালোচকের অভিমতকে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করা চলে না।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহুকাল ধরে বিভিন্ন ভাষা-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের এ অঞ্চলে আবির্ভাব, বসবাস, পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমঝোতা-সমন্বয়ের পরিণতিতে এদেশের জাতিগত পরিচয়ে বহুত্বের ছাপ প্রবল। নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাও কালের বিবর্তনে বাঙালির জাতীয় চেতনায় ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের কৌমচারী জীবনপ্রবাহের স্মৃতিময় সাক্ষর এতদঞ্চলের নিসর্গচারী-প্রকৃতিনির্ভর মানুষের পেশা, অভ্যাস-আচরণ, ভাবনা, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি-অনুশাসন, সামাজিক প্রথা-উৎসব, ধর্মীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান-সংগঠন অর্থাৎ তাদের সার্বিক জীবনধারাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। পাশাপাশি, বিশেষ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত বিধায় বংশানুক্রমিক পেশা অবলম্বনের বাধ্যবাধকতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও প্রজন্মান্তরে সম্প্রসারিত হবার শাশ্বত জৈবিক প্রণোদনা-- উভয়ের পরিণতিতে এদেশের লোকসমাজে পরিলক্ষিত হয় অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় সমন্বয়বাদ। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা তাঁদের রচনায় লোকমানসে প্রতিফলিত এসব ভাবনাকে নিগূঢ়ভাবে অনুধাবন করেছেন। কারণ, তাঁদের প্রায় সকলেরই শৈশব-কৈশোর-যৌবনপ্রারম্ভ কেটেছে গ্রামীণ স্মৃতিমাখা পরিবেশে, যেখানে খেটে খাওয়া বিভিন্ন পেশাজীবী লোকসমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। গ্রামের অবারিত প্রকৃতি, স্নিগ্ধ-উদার নিসর্গের হাতছানি আর বাসিন্দাদের কর্মময় জীবনের পরতে পরতে ছড়ানো লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাচার তাঁদের আলোড়িত করেছে। ব্যক্তিজীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর্লোকে লালিত শিল্পানুভব, মানবিক মূল্যবোধ ও শাশ্বত হৃদয়বৃত্তির আবেদন তাঁদের উপলব্ধিতে বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি যে বিমুগ্ধতা সৃষ্টি করেছে, তা বিভিন্ন উপন্যাসে বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। নিজের দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙালির আজন্মলালিত নাড়ীর টান, তার ঐতিহ্যবোধ ও প্রজন্মান্তরের পথচলার যে আকুতি, গ্রামীণ কৃষি লোকজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই তা বিকশিত হয়েছে। বাংলার লোকসংস্কৃতিভুক্ত বিভিন্ন উপাদান অন্বেষণের জন্য এ গবেষণাকর্মে আমরা যেসব উপন্যাস নির্বাচন করেছি, সেগুলোর প্রতিটিই এদেশের গ্রামীণ আবহ, স্থানিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক পরিসরে রচিত। কাজেই, আবহমান বাংলার যে চিত্রকল্প বাঙালির অন্তর্লোকে সন্নিহিত স্বাজাত্যবোধ, ঐতিহ্যপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও উদার মানবতাবোধের আহ্বানে লোকসংস্কৃতির বহুধাবিস্তৃত পরিমণ্ডলে প্রতিনিয়ত স্পন্দিত হয়, তারই প্রতিনিধি এসব উপন্যাস।

২.

এ গবেষণাকর্মভুক্ত মোট এগারটি উপন্যাসে লোকবিশ্বাস বিভিন্ন পরিসরে উপস্থিত। লোকবিশ্বাস বাঙালি লোকমানসে বরাবর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কেননা, এর সঙ্গে জড়িত থাকে ব্যক্তিমানুষের এমন কোনো মৌলিক ভাবনা, যার প্রতি তার আগ্রহ বিদ্যমান। আবার সেই ভাবনাটির মৌলিকতা স্বীকৃতি পায় উপযোগিতাগত বিবেচনায় অন্যদের সঙ্গে একাত্ম হবার পরিণতিতে। এসব বিশ্বাস কখনো ধর্মীয়, কখনো প্রাত্যহিক জীবন-সংশ্লিষ্ট, কখনো বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অনুষঙ্গবহ। জসীমউদ্‌দীনের †evev Kvwnbx উপন্যাসে স্বল্প পরিসরে কিছু লোকবিশ্বাসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কুটুম পাখি ডাকলে বাড়িতে অতিথি আসে, এ বিশ্বাস অত্যন্ত প্রাচীন ও গ্রামীণসমাজে বহুল প্রচলিত। লৌকিক ইসলামী বিশ্বাসের পরিচয় এ উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে চরিত্রসমূহের মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে। তাই বিধর্মীর (খ্রিস্টান) ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে মুসলমানদের বিপদ ঘটতে পারে, এমনকি কেউ মারা যেতে পারে, এ ধরনের বিশ্বাসের প্রতিফলনও লোকসমাজে লক্ষণীয়। পাশাপাশি শবেবরাতের রাতের পবিত্রতা এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রিয়জনের কাছে প্রত্যাবর্তনজনিত বিশ্বাসও এ উপন্যাসে রূপায়িত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের wZZvm GKwU b‘xi bvg উপন্যাসে তিতাস তীরবর্তী মালোসমাজের চেতনাপ্রবাহে নদীকেন্দ্রিক বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে। মাঝনদীতে ঝড় বা অন্য কোনো বিপদে পড়লে গঙ্গার নাম স্মরণমাত্র বিপন্ন ব্যক্তি রক্ষা পায়, এরূপ বিশ্বাসের প্রতিফলন এ উপন্যাসে ঘটেছে। রঙধনু আকাশে ওঠার পর বিশেষ কোনো ছড়া আবৃত্তি করলে সেটি আকাশে মিলিয়ে যায়, এরূপ ঘটনাও এ উপন্যাসে বিবৃত। মৃত ব্যক্তি পাখি, পশু, অশুভ আত্মা বা অশরীরীরূপে প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসে তার ক্ষতি করতে, লোকসমাজে এ ধরনের বিশ্বাসও প্রচলিত। বিশেষ পথে ফুল দিয়ে রাখলে, মুমূর্ষু রোগীকে সেখানে নিয়ে গেলে সেই পথে সুস্থ ব্যক্তির গমন বিপদ ঘটায়। স্বপ্নে নদীর শুকিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখাও অশুভ বিবেচিত, যা প্রতীক-রূপকের অনুষঙ্গে লোকমানসে অস্তিত্বসংকট সৃষ্টি করে। বলাবাহুল্য, এসব লোকবিশ্বাসের প্রয়োগ গবেষণাভুক্ত অন্যান্য উপন্যাসে প্রায়শই অনুপস্থিত। মালোর সন্তান হিসেবে অদ্বৈত এমন সব ভাবনা-অভিজ্ঞতাকেই ধারণ করতে চেয়েছিলেন, যার সঙ্গে তিতাসপারের বাসিন্দাদের রয়েছে আজন্ম পরিচিতি ও সম্পৃক্ততা। শওকত ওসমানের Rbbx উপন্যাসে ধর্মকেন্দ্রিক কিছু বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে। যেমন ওজুর পানির পবিত্রতা সম্পর্কিত বিশ্বাস, অবস্থাপন্ন মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় গরিবদের জন্য আহার পরিবেশন ও সেই খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে নিম্নবিত্তের গৃহবধূর উৎকণ্ঠা (নিজের ছেলেমেয়ের মঙ্গল বিঘ্নিত হতে পারে ভেবে) প্রভৃতি। আবু ইসহাকের mh-‘xNj evox উপন্যাসে সূর্য-দীঘল বাড়ি সম্পর্কিত অশুভ বিশ্বাস ও ধারণা বদ্ধমূল। জয়গুনের পারিবারিক বিপর্যয়ের নেপথ্যেও এতদ্বিষয়ক বিশ্বাস উপস্থিত। এ ধরনের ভাবনার প্রতিফলন আমাদের গবেষণাভুক্ত অন্য উপন্যাসে নেই। এর পাশাপাশি ভূত-প্রেত-অশরীরী সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এতে রয়েছে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের Kvke‡bi Kb¨v উপন্যাসে স্রষ্টার প্রতি নির্ভরতাহেতু লোকসমাজে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে চরিত্রের মনোভঙ্গিতে। তাঁর রচিত mg‘ evmi উপন্যাসে নদীতীরবর্তী লোকসমাজে প্রচলিত কিছু বিশ্বাসের উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন নদীতেস্নান করতে গিয়ে কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হলে অবশেষে (গোষ্ঠীর টোটেম হিসেবে) তাকে পূজা করা, নদীতে মাছ ধরা বা যাত্রাকালে আহার বিরতির একপর্যায়ে জলের মাছের জন্য খাবার বিতরণ, নদীকে মা গঙ্গা হিসেবে পূজা করা এবং আসন্ন বিপদকালে তার নাম স্মরণ করে প্রতিকূল পরিস্থিতি এড়ানোর চেষ্টা প্রভৃতি। এসব বিশ্বাসে কৌমজীবনসংক্রান্ত আদিম ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। জহির রায়হানের nvRvi eQi a‡i উপন্যাসে স্রষ্টা সংক্রান্ত বিশ্বাসের পাশাপাশি কৃষি জমিতে ফসল ফলানো প্রসঙ্গেও বিশ্বাসের উল্লেখ লক্ষণীয়। স্রষ্টার নাম করে জমিতে

ফসল বুনলে তা পরিমাণে বেশি হবে, এমন ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের †Lvqvebvgv উপন্যাসে লোকবিশ্বাসের প্রয়োগ এ গবেষণাভুক্ত অন্য উপন্যাসগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রমী। তিনি গতানুগতিক ভঙ্গিতে নিছক ঘটনার প্রয়োজনে বা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বোঝাতেই লোকবিশ্বাসের প্রয়োগ ঘটাননি। বরং চরিত্রের অন্তর্গত এ বিশ্বাস সমগ্র লোকসমাজেই কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এর অন্তরালে কীভাবে একটি জনগোষ্ঠীর অতীত বৃত্তান্ত, তাদের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাজাত্যবোধ ও ঐতিহ্যপ্রীতির সন্ধান পাওয়া যেতে পানে, তিনি এরই প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এ উপন্যাসে মুনসি বয়তুল্লা শাহ-কেন্দ্রিক কিংবদন্তি যে আখ্যানের জন্ম দিয়েছে, তার সঙ্গে অজস্র বিশ্বাস সমন্বিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, চেরাগ আলি ও তমিজের বাপের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত গ্রামবাসীর অলৌকিক-অতিলৌকিক বিশ্বাস, ভূত-প্রেত, অশরীরী ও দৈবী শক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষঙ্গ। এগুলো সমন্বিতভাবে এ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সমষ্টিচেতনাকে আদ্যোপান্ত প্রভাবিত করেছে। হরিপদ দত্তের Ckv‡b AwM‘vn উপন্যাসে গ্রামে প্রচলিত জ্বিন সম্পর্কিত বিশ্বাসের স্বতন্ত্র রূপায়ণ ঘটেছে। বাঁশঝাড়ে বসবাসরত বাদুড়কে জ্বিন ভাবা, মৃত কচ্ছপের খোলসকে গোয়ালঘরে রাখা (গরুর মড়ক, অসুখ থেকে উদ্ধার পেতে), কামিনী ফুলের গন্ধে বিমোহিত হয়ে সাপ আসে প্রভৃতি লোকবিশ্বাস গ্রামীণ সমাজে লক্ষণীয়। সেলিনা হোসেনের bxj gq‡ii †hŠeb উপন্যাসে ভিন্ন ধরনের কিছু বিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটেছে। যেমন কালো সুতা পরিধান করলে বেশি আয় হয়, কোনো শুভ কাজ বা শিকারে যাত্রার পূর্বে অমঙ্গলসূচক কথা পরিহার করা, বিশেষ সংখ্যক (চৌষট্টি) ঘড়া না সাজালে শুড়িখানায় খদ্দের আসবে না এবং ব্যবসায় মন্দা দেখা দেবে, বিনা অর্থে খেয়ায় যাত্রী পারাপারে বিরত থাকা প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। নাসরীন জাহানের D‡o hvq wbwkcÿx উপন্যাসে লক্ষণীয়, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্রষ্টার নাম স্মরণ, রাতে নিজের চেহারা আয়নায় দেখা অমঙ্গল এবং চুরি করতে গেলে বিড়ালের শরণাপন্ন হওয়াও লোকসমাজের বিশ্বাসের প্রতিফলন। বিভিন্ন উপন্যাসে বিবৃত গ্রামীণ লোকবিশ্বাসসমূহ যাচাই করলে এতদঞ্চলের অধিবাসীদের অন্তর্বাস্তবতার রূপরেখা অনুধাবন করা যায়। কিছু কিছু বিশ্বাস বাংলাদেশের অধিক এলাকায় প্রচলিত থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ফলে এসব উপন্যাসসমূহে উপস্থাপিত বিশ্বাসরাজির সমন্বয়ে বাংলাদেশের লোকসমাজের মানসপ্রবণতা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

৩.

আমাদের গবেষণাভুক্ত প্রতিটি উপন্যাসেই লোকসংস্কারের বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে এর ভূমিকা ও প্রভাব লক্ষণীয়। অন্যদিকে, লোকাচার ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে লোকসংস্কারের উপস্থিতি অনায়াসেই পরিলক্ষিত হয়। লোকসংস্কারের সঙ্গে যেহেতু সমষ্টিমানুষের শুভ-অশুভ, ইহলৌকিক-পারলৌকিক ভাবনা জড়িত, তাই এর প্রভাবও তাদের আচরণ-মানসিকতা-কাজে প্রতিফলিত হয় সর্বাধিক। †evev Kwnbx উপন্যাসে দিব্যি দেয়া, মন্ত্রের শক্তিতে আস্থা পোষণ, যাত্রাপথে শুভ-অশুভ বিবেচনা ও বেছে খাবার খাওয়ার প্রসঙ্গসমূহ উপস্থিত। তবে নবজাতকের প্রতি ডাইনি, মায়াবিনী, অশুভ শক্তির নজর দেয়া সংক্রান্ত অমঙ্গল ভাবনা এবং এর প্রতিকারের বন্দোবস্ত হিসেবে দরজার পাশে মড়া গরুর মাথার হাড় রাখা, কুনজর এড়াতে উঠানের বাঁশের ওপর কালিমাখা ভাঙা হাঁড়ি রাখা, সর্দি এড়াতে রসুনের মালা নবজাতকের গলায় পরানো প্রভৃতি সংস্কারের বৃত্তান্ত অনুধাবন করলে লোকমানসের প্রবণতা বোঝা যায়। b‘x I bvix উপন্যাসে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে পীর-ফকির সংক্রান্ত সংস্কার, মানত করা, অভিশাপ দেয়া, জাদু-টোনা প্রভৃতি। বদর

পীরের নাম স্মরণ বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত রীতি। বিশেষত নৌযাত্রী, জেলেরা জীবিকার তাড়নায় নৌকায় চড়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতকালে তার নাম স্মরণ করে। তাছাড়া সাপ, কুমির, হাঙর ও অন্যান্য প্রাণীর কবল থেকে রক্ষা পেতেও তার নাম স্মরণের রীতি প্রচলিত। পাঁচ পীরের নামে নৌকার গলুইয়ে সিঁদুরের ফোঁটা দিলে, মিলাদ পড়ালে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে লোকসমাজে ধারণা প্রচলিত রয়েছে। পীরের অলৌকিক শক্তিতে আস্থা পোষণ, তাকে দিয়ে জাদুটোনা করানো, বাণ মেরে শত্রুকে বশীভূত করা, এমনকি শত্রুকে অভিশাপ দেয়াও লোকসংস্কারের অন্তর্গত। wZZvm GKwU b‘xi bvg উপন্যাসে তিতাসপারের মালো ও মুসলমান কৃষকসমাজে প্রচলিত লোকসংস্কারের মধ্যে রয়েছে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় রাম, গঙ্গা ও আলীর নাম স্মরণের রীতি। পরিবারের অভিভাবক ও বয়স্ক সদস্যদের নাম মুখে না বলা, বশীকরণ, মারণ-উচাটন, মন্ত্র পড়া ধূলো ছুঁড়ে প্রতিপক্ষকে বশীভূত করার চেষ্টা, জড়িবুটি-শিকড় দিয়ে গোপনে কারো অনিষ্ট সাধন প্রভৃতিও লোকসংস্কারভুক্ত। আদিম সমাজে প্রচলিত জাদুবিদ্যা, মন্ত্র-তন্ত্র, বশীকরণ প্রভৃতি অবশিষ্ট এসব কাজে প্রতিফলিত হয়েছে। Rbbx উপন্যাসে পানি পড়া, তাবিজ পড়া, পীরের কবরে সিন্নি মানত করা, হরির লুট দেয়া, তিন সত্যি করা, জ্বিন-ভূতে বিশ্বাস, জ্যোতিষীকে দিয়ে ভবিষ্যত গণনা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। jvjmvj উপন্যাসে পীরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও মাজারপূজা , তার দেয়া পানি পান ও তাবিজ গ্রহণ করে সন্তান ধারণ, জিকির করা ও মাজারের পাশে রাত যাপন প্রভৃতি সংস্কার থেকে গ্রামীণ মুসলমান লোকসমাজের সংস্কারগ্রস্ততার পরিচয় ফুটে ওঠে। এমনকি নারীর আচরণ তার ওঠা-বসা, চালচলন, কথাবলা ও হাঁটার ভঙ্গি সবকিছুই পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসন দ্বারা নির্ধারিত হয় লোকসংস্কারের অধীনে। mh-‘xNj evox উপন্যাসে ভূতের অত্যাচার ও বিতাড়ন সম্পর্কিত লোকসংস্কারের পাশাপাশি দিব্যি দেয়া, মানত করা, অভিশাপ বর্ষণ, বশীকরণ প্রভৃতিও লোকসমাজে প্রচলিত। কোচে মাছ ধরার পূর্বেই কচ্ছপ ধরা, মাছ ধরতে ব্যর্থ হয়ে বর্শি আগুনে পুড়িয়ে অশুভ দৃষ্টি কাটানো ও লুঙি উল্টো করে পরিধান করা প্রভৃতি লোকসংস্কারের মাধ্যমে লোকসমাজের রক্ষণশীল মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আবু ইসহাকের অন্য উপন্যাস cÙvi cwjØxc-এ লক্ষণীয়, কৃষকরা মাছ ধরতে গিয়ে সামাজিকভাবে বিব্রত হয়। কেননা, সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করলে, মাছ ধরা অসম্মানজনক কাজ। তাই জীবিকার তাড়নায় ফজল রাতের অন্ধকারে গোপনে মাছ ধরে। পীরের দেয়া পানিপড়া, সুগন্ধির মাধ্যমে প্রেমিকাকে বশীভূত করার চেষ্টাও লক্ষণীয় এ উপন্যাসে, যা লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত। KvÂbgvjv উপন্যাসে বশীকরণের মাধ্যম হিসেবে বাটিচালানের বিবরণ লক্ষণীয়। কালা-ধলা লুঙিচোরকে ধরতে এ পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়েছিল। মন্ত্র পড়ে চোরকে খুঁজে বের করতে তারা যে অভিনয় করেছিল, তা উপন্যাসে বিবৃত। লোকসমাজে এ ধরনের ঘটনার স্বতন্ত্র আবেদন পরিলক্ষিত হয় বলেই কালা-ধলার এ সংক্রান্ত অনভিজ্ঞ আচরণ নিয়ে তারা সংশয় পোষণ করে না। বশীকরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে কালনাগিনীকে বন্দি করে হাঁড়িতে পোষা, মন্ত্রপূত করে ছেড়ে দেয়া এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিকারকে খুঁজে বের করে আক্রমণের ঘটনায় আদিম সমাজের স্মৃতিই জাগ্রত হয়। শামসুদ্দীন আবুল কালামের RvqR½j উপন্যাসে সুন্দরবনের অরণ্যচারী লোকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভের আগ্রহে, মামলায় জিততে ও শত্রুকে হারাতে বেদে, ওঝা, ফকিরের ওপর অলৌকিক শক্তি আরোপ, তুকতাক, ঝাঁড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ ধারণ, জড়িবুটি, মন্ত্রপড়া পানি পান প্রভৃতি আচরণে লোকসংস্কারের প্রভাব প্রত্যক্ষ। দিন ও রাতের বিশেষ সময়ে ঘর ছেড়ে বাইরে না আসা, দক্ষিণরায়ের পূজা করে বাঘের কবল থেকে আত্মরক্ষা, মনসার পূজা করে সাপের আক্রমণ থেকে নিস্তার লাভ, কুমিরব্রত পালন, ওলাবিবি ও শীতলাবিবির পূজা করে অসুস্থতার কবল থেকে সুরক্ষার প্রচেষ্টা, ব্রহ্মদৈত্য-অশরীরীকে নানা কৌশলে পরাস্ত করার চেষ্টা প্রভৃতি লোকসংস্কারের

প্রবণতা। mg' evmi উপন্যাসে রয়েছে নদী-সাগরের মিলনস্থল সাগরমেলা থেকে আনা মাদুলির অলৌকিক গুণের প্রতি বিশ্বাস, যা সঙ্গে থাকলে জল-স্থল-বনের কোনো বিপদই ব্যক্তিকে কাবু করতে পারে না। আবার সাগরমেলার জল পবিত্র ও দৈবী গুণসম্পন্ন বিধায় বন্ধ্যা নারী-পুরুষও সন্তান ধারণের সামর্থ্য ফিরে পায় বলে লোকসমাজে কথিত। ফকির-সন্ন্যাসী, পীর-দরবেশের দেয়া লাঠি পথের সব বাধা দূর করে, এ ধরনের সংস্কারের পরিচয়ও লোকসমাজে রয়েছে। mv‡is †eŠ উপন্যাসে নারী সংক্রান্ত সংস্কারের স্বকীয় রূপ উপস্থাপিত। গৃহকাজে নিপুণ, পয়মন্ত, নম্র-ভদ্র-বিনয়ী, মিষ্টভাষী নারীকে বলা হয় লক্ষ্মী, যে পরিবার ও সংসারকে পরিপাটিভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। তার গুণে সংসারে আয়-উন্নতি হয় বলেও লোকসমাজে প্রচলিত। নবিতুনও এ ধরনের নারী। অন্যদিকে পুরুষকে প্ররোচিত, ছলনা করতে পারদর্শী, অস্থির, ছটফটে, সংসারে অমনোযোগী, কাজ-কর্মে উদাসীন, নিজের সাজসজ্জার প্রতি অসচেতন নারীকে বলা হয় অলক্ষ্মী, যাকে ঘিরে সংসারে বালা-মুসিবত ঢোকে। সংসারের আয়-উন্নতি ছারখার হয়ে যায়। নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের কাঙ্ক্ষিত অভিপ্রায় এ সংস্কারে প্রকাশিত হয়েছে। †Lvqvebvgv উপন্যাসে জ্বিন-ভূত প্রসঙ্গ, অভিশাপ দেয়া, বরদোয়া, কুদৃষ্টি বা নজর লাগা প্রভৃতির পাশাপাশি স্বপ্ন দেখা, এর ব্যাখ্যা করা ও শোনা, খোয়াবনামা বা স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী বই প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। লেখক এতে প্রচলিত ঘটনাকেই নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছেন স্থানীয় ইতিহাস, কিংবদন্তি ও লোকসঙ্গীতের সঙ্গে এসব উপাদান মিলিয়ে গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামদ্বয়ের অন্তর্গত বাসিন্দাদের সমষ্টিমানসের পরিচয় তুলে ধরতে। কুলসুম, চেরাগ আলি, তমিজের বাপ ও বৈকুণ্ঠ-- এ চার চরিত্রের আচার-আচরণ, সংলাপ, মনস্তত্ত্ব ও ভাবমূর্তি গ্রামবাসীকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে, যার মূলে রয়েছে উপর্যুক্ত লোকসংস্কাররাশি। ছেলে হুমায়ুনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হামিদার মনোবৈকল্য, স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নের জগতে ফিরে পাবার জন্য কুলসুমের ভারসাম্যহীনতাও মূলত এসব লোকসংস্কারের প্রভাবজাত। ফলে এ উপন্যাসে লোকসংস্কার আর আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সম্মিলন ঘটেছে ব্যতিক্রমী ভঙ্গিতে, যা আমাদের গবেষণাভুক্ত অন্য কোনো উপন্যাসে অনুপস্থিত। লেখক স্বীয় গ্রামীণ অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক-লোকসাংস্কৃতিক অনুষঙ্গসমূহকে ভিত্তি করে এ উপন্যাস লিখেছেন, যা বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও গ্রন্থে উল্লেখিত। mh Zwg mv_x উপন্যাসে লক্ষণীয়, অনাবৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পেতে গ্রামের বাসিন্দারা পীরের মাজারে সিন্নি মানত ও কোরান খতম করে, এমনকি দুধের জন্য ক্ষুধায় অস্থির শিশুকে অনাহারে রাখা হয়। আবার রাতের অন্ধকারে ভূতুম পেঁচার ডাককে অমঙ্গল বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন রোগের আবির্ভাবকে আসমানি বালা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। Ckv‡b AwM'vn উপন্যাসে উল্লেখিত, কেউ অবেলায় ভাত খেয়ে অসুস্থ হলে ধারণা করা হয়, তার প্রতি জ্বিনের নজর পড়েছে। কারণ অবেলায় নাকি জ্বিন-ভূত খায়। তাছাড়া রাতের বেলা নারীর খোলা চুলে জ্বিন ভর করে বলেও প্রচলিত রয়েছে লোকসমাজে। শবেবরাতের রাতে জমির আলে আগরবাতি ও মোম জ্বেলে দিলে নাকি জমির উর্বরাশক্তি বাড়ে। এ ধরনের লোকসংস্কার লৌকিক ইসলামের প্রভাবজাত। জমির ফসলের প্রতি শঠ, অসৎ, দুশ্চরিত্র ব্যক্তির নজর কাটাতে গরুর মাথার খোল লাঠিতে গেঁথে ক্ষেতের মাঝে পুঁতে রাখার সংস্কারও এ উপন্যাসে বিবৃত। AÜK‡c R‡b¥rme উপন্যাসে তুকতাকের ভিন্নধর্মী প্রসঙ্গ বিবৃত। মনোকামনা পূর্ণ করতে জনৈক বেদে নাকি এমন এক পাখির হাড় সংগ্রহ করেছিল, যেটি সাত আকাশের ওপর বাস করে। অমাবস্যার রাতে গোরস্তানের জ্বিনের সঙ্গে লড়াই করে সেই পাখিকে ধরে তার হাড় আয়ত্ত করেছিল সেই বেদে। এভাবেই সে অসীম শক্তির অধিকারী হয়েছিল। মৃত ব্যক্তি প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসে, এ লোকসংস্কারের রূপায়ণ ঘটেছে মরণীর মৃত্যুর ঘটনায়। অসুস্থ মরণী মৃত্যুবরণ করলে শাশুড়ির অবচেতনলোকে সে ফিরে আসে জ্বিন রূপে। রাতের অন্ধকারে তেতুলগাছে মরণীরূপী জ্বিনকে দেখতে পাওয়ার

অলীক প্রত্যক্ষণ পরানবিবিকেও অসুস্থ করে তোলে। bxj gq‡ii †hŠeb উপন্যাসে রয়েছে কাকের ডাক শুনে গৃহবধূ সুলেখার দিনদুপুরেই আতঙ্কগ্রস্ত হবার বৃত্তান্ত। শুধু তাই নয়, কাকটির হিংস্র ও একরোখা চেহারাও তার বিবেচনায় অমঙ্গলের বার্তাবহ। অন্যদিকে, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুকে লোকসমাজে অকল্যাণ ও অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে বিবেচনার দৃষ্টান্তও এ উপন্যাসে রয়েছে। সেকারণে ভানুমতীকে গ্রামবাসী গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে চায়। †div উপন্যাসে রয়েছে আগুনের গোলা ধারণকারী জ্বিনের প্রসঙ্গ, যা দেখে জঙলা এলাকায় যেতে গ্রামবাসী ভয় পায়। পাশাপাশি দণ্ডায়মান দুটি তালগাছে আগুনের গোলা ছুটে যাওয়ার ঘটনাও মূলত লোকসংস্কারজাত কাহিনী। সেকারণেই এ দুটি গাছে দোষ রয়েছে বলে গ্রামে রটনা ছড়িয়ে পড়ে। কৃষি সম্পর্কিত ভিন্ন কিছু লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে রয়েছে। যেমন ফসলের মাঠে ফিরাইল বা ক্ষেতের পাহারাদার সংক্রান্ত প্রসঙ্গ। সে মন্ত্রের গুণে নিজেকে ও ক্ষেতকে রক্ষায় সমর্থ। শিলাবৃষ্টি হবার দিন-ক্ষণ পূর্বেই নির্ধারণ করা এবং ক্ষেতকে সুরক্ষা করা তার কাজ। সে গ্রামের জ্বিন-ভূত-প্রেতদের বৃত্তান্ত জানে বিধায় করণীয় সম্পর্কে গ্রামবাসীকে অবহিত করে। Acivn উপন্যাসে সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত লোকসংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, রোগীকে সাপে কাটলেও চিৎকার করে তা কাউকে বলা যাবে না। কারণ যত বেশি লোক জানবে, রোগীর অবস্থা বিষের প্রতিক্রিয়ায় তত খারাপ হবে। রোগীকে কোনোভাবেই ঘুমাতে দেয়া যাবে না, পানি পান করানো যাবে না। ওঝা রোগীর চিকিৎসা করিয়ে ব্যর্থ হলে তাকে কলার ভেলায় চড়িয়ে খাবারসহ পানিতে ভাসিয়ে দেবার নিয়ম ছিল। D‡o hvq wbwkcÿx উপন্যাসে কুঁজোবুড়ির অলৌকিক শক্তিবিষয়ক আখ্যানের মূলে রয়েছে বিভিন্ন লোকসংস্কার, যা গ্রামবাসীর সমষ্টিমানসে বহুকাল ধরে সক্রিয়। জ্বিন পোষা, গ্রামবাসীর ভাগ্য গণনা ও কর্মফল লিখে সিন্দুকে আটকে রাখা, রাতের অন্ধকারে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দেয়া ও হাওরে ঘুরে বেড়ানো, পাখির রুহ দিয়ে মানুষকে সুস্থ করা সবই লোকসংস্কারজাত। চন্দ্রানীর মনোবিকারের মূলেও লোকসংস্কারের প্রভাব প্রবল। চারবার সন্তান প্রসবের পর নবজাতকদের মৃত্যু তাকে পীড়িত করেছিল, যা অবশেষে মনোবৈকল্যে পরিণত হয়েছিল। পীরের চিকিৎসায় সুস্থ হবার ভাবনাও লোকসংস্কারের প্রভাবজাত। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত লোকসংস্কারের বৈশিষ্ট্য, ধরন ও প্রবণতা যেমন অনুধাবন করা চলে, তেমনিভাবে লোকমানসে এর প্রভাবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়, বিশেষ কিছু লোকসংস্কারের উপস্থিতি বিভিন্ন উপন্যাসেই রয়েছে। সেই তুলনায় কিছু কিছু উপাদান নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। তবে, এসবের সমবায়েই এদেশের লোকসংস্কৃতিতে লোকসংস্কারের প্রবল উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

৪.

লোকাচার বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে লোকসমাজের বাসিন্দারা বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এগুলো বহুলাংশেই ধর্মীয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবনাসংশ্লিষ্ট। বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাব যে লোকসমাজের বাসিন্দাদের প্রভাবিত করে, তা বিভিন্ন আচারের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার তাগিদ থাকে। এগুলো ঐতিহ্যগতভাবেই বহুকাল ধরে অনুসৃত। সমগ্র লোকসমাজেই এসব আচারের মূল্য ও ভূমিকা স্বীকৃত বিধায় তা পালনে গুরুত্বারোপ করা হয়। †evev Kvwnbx উপন্যাসে অতিথি আপ্যায়নজনিত লোকাচারের বিবরণ রয়েছে। আজাহের যখন তার পরিবার নিয়ে রহিমপুরের মাতবর গরীবুল্লার বাড়িতে আসে, তখন তাদের যথাসাধ্য সমাদর করা হয়। মৃত ব্যক্তির লোকাচার হিসেবে সমাধিস্থ করার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে বড়ুর মৃত্যুর ঘটনায়। এসব ঘটনা

তাদের প্রবহমান জীবনেরই অংশ। b'x I bvix উপন্যাসে লক্ষণীয়, দাবদাহে গ্রামের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি নামাতে বদনা বিয়ের আয়োজন করা হয়। গত দুই বছর অনাবৃষ্টিতে পীড়িত রহিমপুরের কৃষকসমাজ নুরু ও তার সঙ্গীদের দিয়ে এ আয়োজন করায়। তবে এক পর্যায়ে তার বাবা আসগর মিয়া বদনা বিয়ের অনুষ্ঠান পালন সত্ত্বেও বহু প্রত্যাশিত বৃষ্টি না নামায় এ লোকাচারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। আদিম লোকাচারের সাক্ষ্য হিসেবে এ ঘটনা লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করে। তেমনিভাবে লৌকিক ইসলামের প্রতিফলন রয়েছে এ উপন্যাসে মিলাদের আয়োজনে। ধূলদির হাটের ফকির গ্রামের প্রধান নজু মিয়ার বাড়িতে ওয়াজ নসিয়ত ও মিলাদে নেতৃত্ব দেয়। এ উপলক্ষে আপ্যায়নের আয়োজন ও অন্যান্য বন্দোবস্তও লোকাচারের প্রভাবগত। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসে সামাজিক লোকাচারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন অনন্তের মা গোকর্ণঘাট গ্রামে বসবাসের জন্য এলে পাড়ার মহিলারা তার জন্য পান-তামাক আনে, কুশল বিনিময় করতে নিজেরাই যেচে এগিয়ে আসে। কালোবরণের পরিবারে নবজাতকের জন্ম উপলক্ষে অন্নপ্রাশন, আটকলাই, দোয়াতকলম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মাঘমণ্ডলের ব্রতের আচার, অনন্তের মার মৃত্যুর পর তার সৎকার ও পারলৌকিক কল্যাণজনিত বিভিন্ন আচার পালন, এমনকি শুকদেবপুর গ্রামে কিশোরের সঙ্গে তার নবপরিণীতা স্ত্রীর বিয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আচারের উল্লেখ থেকেও বোঝা যায়, লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে মালোজীবনের চালচিত্র রচনায় আগ্রহী। Rbbx উপন্যাসে সাংসারিক সামগ্রী, অর্থ দিয়ে একের প্রতি অন্যের সহায়তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গেও নিত্যদিনের প্রয়োজনে বিভিন্ন সামগ্রী আদানপ্রদান, দাওয়াত গ্রহণ ও অন্যদের খাওয়ানো, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততার মাঝে বিভিন্ন আয়োজনে, উৎসবে অংশগ্রহণ প্রভৃতি লোকাচারের দৃষ্টান্ত। অসাম্প্রদায়িকতা যে লোকসমাজের মূল সুর, এসব ঘটনায় সেই প্রসঙ্গটি আভাসিত। jvjmvj উপন্যাসে গ্রামীণ কৃষিজীবন সম্পৃক্ত লোকাচারের পরিচয় রয়েছে। বিয়ের আসরে ও ধান ভানার সময় মেয়েদের সমবেত কণ্ঠে গীত পরিবেশন, বাসররাতে নবদম্পতির ঘরে লুকিয়ে থেকে ঠাট্টা-তামাসা করা, ফসল বপন করতে গিয়ে কৃষকদের মাঠে নাচ-গান করা, শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালির শরণাপন্ন হওয়া, শিরালির মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নগ্ন নৃত্য পরিবেশন প্রভৃতি ঘটনা থেকে মহব্বতনগরের গ্রামবাসীর লোকাচারের প্রবণতাসমূহ বোঝা যায়। mg' evmi উপন্যাসে লোকাচারের দৃষ্টান্ত হিসেবে কুমির ব্রত পালন ও পূজার বিবরণ রয়েছে। গঙ্গাকে মায়ের মতো ভক্তি করা, নিজেকে এর সন্তান হিসেবে বিবেচনা, গঙ্গার জলে বসবাসরত মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর মঙ্গলকামনায় নিজের ভাগের খাবার বিতরণ জলজীবী সম্প্রদায়ের লোকাচারের দৃষ্টান্ত। এমনকি দাম্পত্যজীবনের প্রত্যাশিত অভিপ্রায় হিসেবে সন্তানধারণের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও কোনো কারণে ব্যর্থতাবশত সাগরমেলায় নরনারীর অবাধ মিলনের রীতি আদিম যৌনচিন্তা ও যৌনাচারের স্মৃতিবহ। mv‡is te¯ উপন্যাসে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে আক্রান্ত লোকসমাজের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে কামিজবুড়োর দিকনির্দেশনা ও বিবিধ কর্মকাণ্ড পালনজনিত নির্দেশ লোকাচারভুক্ত। যদিও এগুলো লৌকিক ইসলামের অনুসরণ, তবু স্মর্তব্য, লোকসমাজ এভাবেই নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার লড়াই অব্যাহত রাখে। এক্ষেত্রে অবলম্বন হিসেবে লোকাচারের অনুসরণ গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। mskßK উপন্যাসে মৃতের সৎকার বিষয়ক লৌকিক ইসলামী লোকাচারের বর্ণনা রয়েছে। nvRvi eQi a‡i উপন্যাসে কুটুমের সেবা-যত্ন, পরিচর্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন লোকাচারের উল্লেখ লক্ষণীয়। আত্মীয়-স্বজনকে সম্মান জানানো, কুশল বিনিময়, হাত-মুখ ধোয়া ও পরিচর্যা, উপহার নিয়ে কুটুমবাড়ি যাওয়া ও বিদায় নেয়া, প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ এ উপন্যাসে উপস্থিত।

৫.

লোকপ্রথার আংশিক পরিচয় কিছু উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। সংহত সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের রীতি-নীতি, চালচলন, ওঠা-বসা, ঐক্য টিকে থাকে লোকপ্রথার কাঠামোতে। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসে লক্ষণীয়, অনন্তের মা ছেলেকে নিয়ে গোকর্ণঘাট গ্রামে বসবাসের জন্য এলে তাকে 'দশের বিচার'-এ উপস্থিত থাকতে হয়। মাতবরদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে মঙ্গলার পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করতে হয়। তেমনিভাবে জমিদারের খাজনা পরিশোধ করার প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুন, হাট বসানো, কারো মেয়ের বিয়ের জন্য উপযুক্ত দিনক্ষণ নির্ধারণ ও প্রস্তাব যাচাই করা প্রভৃতিও লোকপ্রথার দৃষ্টান্ত। নাইয়র প্রথা, সখী সম্পর্ক পাতানো, বন্ধুস্তালি প্রভৃতির মাধ্যমে ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের একাত্ম হবার দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে রয়েছে। nvRvi eQi a‡i উপন্যাসে একান্নবর্তী পরিবারপ্রথার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। শিকদারবাড়ির গৃহকর্তা বৃদ্ধ কাশেম শিকদার ও তার স্ত্রী ছমিরণ বিবির সন্তান মকবুল এ পরিবারের কর্তা হিসেবে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন স্ত্রী আমেনা, ফাতেমা, টুনি ও অন্য শরীকদের নিয়ে তার সংসার। সে পরিবারের কর্তা বিধায় বিভিন্নভাবে স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন করে। তার প্রথম পক্ষের মেয়ে হীরণের বিয়ের প্রস্তাব এলে তা কার্যকর করা প্রসঙ্গে উপন্যাসে বিবৃত ঘটনাবলিতে প্রতীয়মান হয় একান্নবর্তী পরিবারপ্রথার স্বরূপ। সকলের মতামত জেনে, বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রচেষ্টা এ ঘটনায় পরিস্ফুট। †Lvqvebvgv উপন্যাসে পোড়াদহের মেলার অনুষঙ্গে নাইয়রের প্রসঙ্গ উল্লেখিত। মেলা উপলক্ষে জামাই ও মেয়েকে সন্তানাদিসহ পিতৃগৃহে আনা, নতুন জামা ও খরচ দিয়ে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করানো ও সম্ভাষণ জানানোর রীতি গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা গ্রামে প্রচলিত। †div উপন্যাসে নাইয়র প্রথার বিবরণ লক্ষণীয়। সাধারণত বর্ষাকালে হাওর এলাকা জলমগ্ন হলে এসময়ে বিবহিত নারীরা পিতৃগৃহে আসে। D‡o hvq wbwkc ÿx উপন্যাসে বেদে দলের সর্দারের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রকাশিত হয় দলের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত ও শাসনের ঘটনায়। সেখানে তার কথাই সিদ্ধান্ত, আইন হিসেবে মান্য। কোনো নারী দলের শৃঙ্খলা ভাঙলে বহর থেকে নির্বাসিত হবার দৃষ্টান্তও রয়েছে। ফলে চন্দ্রানীসহ অন্য বেদেনিরাও নির্দিষ্ট নিয়ম-অনুশাসন মেনে দিনযাপনে বাধ্য হয়। এ উপন্যাসে বিবৃত গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার রূপায়ণে লোকসংস্কৃতির জোরালো ভূমিকা রয়েছে। এসব ঘটনা থেকে অনুধাবন করা চলে, লোকসমাজে বিদ্যমান প্রথা কীভাবে পরিবারে, দলে ও গোষ্ঠীতে সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

৬.

লোকবৃত্তির পরিচয় এ গবেষণাকর্মভুক্ত কিছু উপন্যাসে লক্ষণীয়। অধিকাংশ উপন্যাসেই গ্রামীণ কৃষকসমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা বংশপরম্পরায় এ পেশা নির্বাহ করে। কিন্তু পেশা পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত অথবা একইসঙ্গে একাধিক পেশা নির্বাহের প্রসঙ্গও লোকসমাজে রয়েছে। †Lvqvebvgv উপন্যাসে তমিজের বাপ ও তমিজ মাঝি পরিবারের সন্তান। তারা জাল দিয়ে মাছ ধরে, নৌকা চালায়, আবার জোতদার শরাফত মণ্ডলের জমিতে কামলা খেটে ফসলের ভাগ পায়। তমিজ ধান কেটে মজুরি আনতে খিয়ার অঞ্চলে যায়। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসে তিতাসপারের মালো সম্প্রদায়ের পাশাপাশি মুসলমান কৃষকদের বৃত্তান্তও সংক্ষেপে উল্লেখিত, যারা চরাঞ্চলের জমিতে গরু-বলদ নিয়ে চাষাবাদ করে। কারিগর সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে †eve Kwnbx উপন্যাসে। তারা রং উৎপাদন ও তাঁতে কাপড় বুনে জীবিকা নির্বাহ করে। Rbbx উপন্যাসে আজাহের রাজমিস্ত্রিগিরির পাশাপাশি ঘরামির কাজ ও মুদি দোকানদারি করে। নদীতীরবর্তী মানুষের তথা জেলে ও মাঝিদের প্রসঙ্গ এসেছে mg' evmi, cÙvi cwjØxc প্রভৃতি উপন্যাসে। তবে তারাও পেশাগত প্রয়োজনে কৃষিবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল।

Kvke‡bi Kb¨v উপন্যাস বিশেষভাবেই মাঝি ও জেলেদের নিয়ে রচিত। b'x I bvix, jvjmvj, nvRvi eQi a‡i, mh Zvg mv_x, Ckv‡b AvM'vn, AÜK‡c R‡bvrme প্রভৃতি উপন্যাসে কৃষকজীবনের রূঢ় বাস্তবতা রূপায়িত। KvÂbgvjv, D‡o hvq wbwkcÿx উপন্যাসদ্বয়ে ভ্রাম্যমান বেদে সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছে, যারা আদিম অরণ্যময় জীবনের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিবিড়ভাবে জড়িত। RvqR½j উপন্যাসে সুন্দরবনের শ্বাপদসংকূল অরণ্যে বিচরণরত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সংগ্রামশীল জীবনভাষ্য বিবৃত।

৭.

লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ থেকে তাদের খাদ্যাভ্যাস, রুচিবোধ, নিত্যদিনের আহার্য সংগ্রহের সামর্থ্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ অবহিত হওয়া যায়। ভোজনরসিক বাঙালির খাদ্যতালিকা প্রাচীনকাল থেকেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কিন্তু লোকসমাজের বাসিন্দাদের অর্থ উপার্জন করে ভালোমন্দ খাওয়ার সঙ্গতি তেমন নেই বললেই চলে। আমাদের গবেষণাভুক্ত প্রতিটি উপন্যাসেই বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষুধা মেটানোর জন্য ব্যবহৃত খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান-আয়োজন-উৎসব উপলক্ষে বানানো বিভিন্ন খাবার রয়েছে। †eve Kwnbx উপন্যাসে নিত্যদিনের আহার হিসেবে বেতে-শাক, আউসের চাল ও শুকনো ডাটার ঝোল, বেতের আগা, ঢ্যাপের মোয়া, খুদ ভাজা, শাকআলু, ছোলা, প্রভৃতির পাশাপাশি নাস্তা ও ভালো খাদ্য হিসেবে চিড়া ও খেজুরের গুড়, পিঠা, মিষ্টি, পানতুয়া, সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিত্তিতে লোকখাদ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সমাহার লক্ষণীয়। নদীপ্রধান এলাকায় স্বাভাবিকভাবেই মাছ লোকখাদ্যের তালিকায় উপস্থিত থাকে। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসের প্রবাস খণ্ডে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। †Lvqvebvgv উপন্যাসে পোড়াদহের মেলাকে ঘিরে বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে। সেলিনা হোসেনের bxj gq‡ii †hŠeb উপন্যাসে হাজার বছর পূর্বের বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কাগনি ধানের ভাত, মুরলা মাছের ঝোল, হরিণের মাংস, বেতি শাক, হেলেঞ্চা, গিমা, সজনে, সরপুঁটি, কাঁকড়া, শামুক, কচি বেতের ডগা, মসুর ডালের বড়া, কলার পাতায় মসলা, ধনে পাতা, কাঁচা মরিচ দিয়ে মাখানো গুঁড়া মাছ, সাদা ডাঁটার চচ্চড়ি, ভাদালি পাতার ভর্তা, লাউ-বেগুনের তরকারি, মসলা-দই-রাই-সরিষা দিয়ে মাখানো কচ্ছপের মাংস, নালিতা শাকের ঝোল, ঢেঁকিশাক দিয়ে নোনা ইলিশ, কাঁচা কলার ভর্তা ও নটে শাক ভাজা, হেলেঞ্চা শাক, সজারুর মাংস, ভাত-গম-গুড়-মধু-ইক্ষু-তালরস দিয়ে গাঁজানো মদ প্রভৃতি। লোকসমাজে খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে ধূমপানের প্রসঙ্গও বাঙালি লোকসমাজের বিশিষ্ট পরিচয় তুলে ধরে। পান-সুপারি, তামাকপাতা ও তামাকযোগে ধূমপানের প্রতি আসক্তি বাঙালি লোকসমাজে বহুকাল ধরেই পরিলক্ষিত হয়।

৮.

নদীমাতৃক বাংলার সহজলভ্য এবং কর্মোপযোগী যানবাহন হিসেবে নৌকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে এর ব্যবহার অধিক হলেও অন্যান্য সময়েও একে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়। যাতায়াতের কাজে, মালামাল ও যাত্রী পরিবহন, মাছ ধরা প্রভৃতি কাজে গ্রামীণ লোকসমাজে নৌকার ব্যবহার লক্ষণীয়। নৌকা বাংলার লোকসংস্কৃতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। ফলে একে ঘিরে লোকক্রীড়া, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। গ্রামের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের নিজের নৌকা ও জাল থাকে, আর সঙ্গতিহীন ব্যক্তি অন্যের নৌকায় মজুরির বিনিময়ে কাজ করে। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদের নাম 'রাঙা নাও'। কারণ, তিতাসপারের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে

লোকসমাজে নৌকার গুরুত্ব ও উপযোগিতা স্বীকৃত। গ্রীষ্মের কাঠফাটা উত্তাপে জলাশয় শুকিয়ে গেলে এবং তিতাসের স্রোত মন্থর হয়ে পড়লে নৌকা তুলে রাখা হয়। আবার বর্ষাকালে তা ব্যবহার করা হয়। নৌপথে দীর্ঘযাত্রায় নৌকাতেই মাঝি-জেলেরা খায়, ঘুমায়। এভাবে নৌকা তাদের চলমান জীবনের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। মালোপাড়ার লোকসমাজের বাসিন্দাদের স্বাবলম্বী হবার অন্যতম শর্তই হলো নিজ অর্থে নৌকা ও জাল কিনে পরিবার চালানোর সামর্থ্য বজায় রাখা। Kvke‡bi Kb¨v, mh-‘xNj evox, mg‘ evmi, cÙvi cwjØxc প্রভৃতি উপন্যাসে নৌকাকে লোকসমাজের জীবনপ্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শ্রমজীবী প্রান্তিক লোকসমাজের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৯.

গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক কাজের তাগিদে অনুসৃত লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্ন উপন্যাসে বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত না হলেও তারা সহজাত বুদ্ধি, বিবেচনা ও উদ্ভাবনী শক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে নতুন সামগ্রী সৃষ্টিতে সমর্থ। †evev Kwwnbx উপন্যাসে পিঠা বানানোর ঘরোয়া পদ্ধতিতে অনুসৃত হয়েছে লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তির প্রয়োগ। b‘x I bvix উপন্যাসে কুমির শিকার করার ফাঁদেও লোকপ্রযুক্তি ব্যবহৃত। wZZvm GKwU b‘xi bvg উপন্যাসে বর্ষাকালে জলমগ্ন পুকুরে মাছ চাষ ও মাছ শিকারের প্রক্রিয়াও লোকপ্রযুক্তিনির্ভর। তেমনিভাবে মাছ ধরার জন্য মোটা ও সরু সুতা বানিয়ে তা দিয়ে জাল বুনে বিক্রি করা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে লোকপ্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটে। Rbbx উপন্যাসে প্রচণ্ড গরমে শারীরিক অবস্থা দুঃসহ হয়ে পড়ে বলে বালুময় নদীতীরের হাঁটু-জলে তরমুজ চুবিয়ে ঠাণ্ডা করে খাওয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। mh-‘xNj evox উপন্যাসে লোকজ্ঞানের পরিচয় বিধৃত। গ্রামীণ লোকসমাজকে প্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মড়ক, দাবদাহ, চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান, বাতাসের গতি প্রভৃতি তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। cÙvi cwjØxc উপন্যাসে ফজল ও তার দুই সঙ্গী মাছ ধরার উপযোগী জাল যেভাবে প্রস্তুত করে, এর প্রতিটি ধাপে লোকপ্রযুক্তির পরিচয় রয়েছে। Kvke‡bi Kb¨v উপন্যাসে শিকদার তার বাড়ির চারপাশে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাবশত গাছপালা লাগায়, পশুপাখি লালন করে। এতে লোকজ্ঞানের পরিচয় বিবৃত। KvÂbgvjv উপন্যাসে বুনো বিষাক্ত সাপকে বশীভূত করে শত্রুকে জব্দ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। RvqR½j উপন্যাসে গহীন বনের বাসিন্দা মৌয়ালরা কীভাবে বিভিন্ন ধাপে নিপুণভাবে মধু সংগ্রহ করে, তা উল্লেখিত। mskßK উপন্যাসে ফসল উৎপাদনের জন্য গ্রামের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের আবহাওয়া, বাতাসের গতি, ঝড়ের পূর্বাভাস, ঋতুর পরিক্রমা, তাপমাত্রা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির প্রতি সতর্ক অভিনিবেশ দানের প্রবণতা লক্ষণীয়। Acivn উপন্যাসেও ঢল নামার ব্যাপারে গ্রামবাসীর উৎকণ্ঠিত; ক্ষিপ্র মনোভঙ্গিও লক্ষণীয়। কারণ কৃষিকাজের প্রয়োজনে প্রকতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাতে তারা বহুকাল ধরে অভ্যস্ত।

১০.

লোকসমাজের বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য ওঝা, পীর-দরবেশ, ফকির, সন্ন্যাসী, কবিরাজ, তান্ত্রিক, বেদে, সাপুড়ে প্রমুখের প্রতি নির্ভরতা স্মরণ করিয়ে দেয় আদিম সমাজব্যবস্থার অনুষঙ্গবাহী স্মৃতিকে। রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি মারণ-উচাটন, গুণ-জাদুটোনা ও বাণমারা, বশীকরণ, তুকতাক, জাদুমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি লোকসমাজে বিদ্যমান। শুধু শারীরিক অসুস্থতার প্রতিকারের প্রয়োজনেই নয়, বরং বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারের জন্য অর্থের বিনিময়ে

প্রতিপক্ষকে কাবু করতে, নিজে লাভবান হতে, কখনো বা প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিবর্তনের তাগিদে গোষ্ঠীসমাজে এসব ব্যবস্থা প্রচলিত। সকল সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে তাদের প্রতি অলৌকিক ও অতিলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতা আরোপের প্রবণতা লোকসমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত। b'x I bvix উপন্যাসে জনৈক হেকিমের পরিচয় পাওয়া যায়, যে পানিপড়া, হজমিগুলি আর দোয়া পড়া ফু দিয়ে গ্রামবাসীর চিকিৎসা করে। কিন্তু একপর্যায়ে ধূলদির হাটে আগত ফকিরের কেরামতির কাছে সে পরাভব স্বীকারে বাধ্য হয়। ভূতে ধরা জনৈক তরুণীর চিকিৎসার জন্য সে যে চিকিৎসা চালায়, তাতে শারীরিক নির্যাতনই প্রাধান্য পায়। তবু নিরক্ষর লোকসমাজের বাসিন্দারা এতেই সন্তুষ্ট থাকে। ভূত- প্রেত সংক্রান্ত সংস্কারও এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে বিধায় অসহায় গ্রামবাসী ওঝা-ফকির-কবিরাজের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক অবধি বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে অনুরূপ সামাজিক বাস্তবতার সন্ধান পাওয়া যায়। Rbbx উপন্যাসে রোগীর রোগের চিকিৎসায় দরবেশ ও পীরের পানিপড়া, তাবিজ, মৌলবির দোয়া-দরুদ প্রভৃতির প্রতি নির্ভরতা লক্ষণীয়। mh-'xNj evox উপন্যাসেও ভূতের প্রতিকারার্থে পীর-ফকির, কবিরাজ ও হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হবার বাধ্যবাধকতা উপস্থাপিত। গ্রামবাসীর অসহায়ত্ব, ভীরুতা ও রক্ষণশীল সন্ত্রস্ত মানসিকতাকে পুঁজি করে প্রতারক শ্রেণি কীভাবে আখের গোছায় সেই ইঙ্গিত এসব প্রসঙ্গের উপস্থাপনায় রয়েছে। Kvke‡bi Kb¨v উপন্যাসে ঘরোয়া বা টোটকা চিকিৎসার উল্লেখ সংক্ষেপে বিবৃত। সাপুড়ে ও বেদে সর্দারের দ্বারা সাপের দংশনে জর্জরিত রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত KvÂbgvjv, Acivn, D‡o hvq wbwkcÿx প্রভৃতি উপন্যাসে রয়েছে। গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার রূপায়ণে এসব প্রসঙ্গকে লেখকরা উপজীব্য করেছেন। RvqR½j উপন্যাসে ভেষজ চিকিৎসার বিবরণ রয়েছে। অরণ্যচারী বাসিন্দারা আকস্মিকভাবে আহত হলে, রোগ-ব্যাধিতে ভুগলে তাৎক্ষণিকভাবে এ চিকিৎসার দ্বারস্থ হয়। এছাড়া জোঁকের কবল থেকে বাঁচতে, বিষাক্ত কাঁটার ক্ষত সারাতে, জ্বর-ব্যথার উপশমের জন্যও লোকসমাজে বিভিন্ন উদ্ভিদ, লতা-গুল্ম, ডাল ও ছাল, শেকড় বিভিন্ন অনুপাতে ব্যবহারের রীতি বেশ প্রাচীন। mg' evmi ও mh Zwg mv_x উপন্যাসেও লোকসমাজে প্রচলিত ঘরোয়া চিকিৎসাপদ্ধতির বিভিন্ন উল্লেখ রয়েছে। এসব প্রসঙ্গ থেকে লোকসমাজের উদ্ভাবনী শক্তি ও আবিষ্কারক মনের উদ্ভাসন লক্ষ্য করা যায়।

১১.

লোকশিল্পের মাধ্যমে লোকসমাজের বাসিন্দাদের নন্দনভাবনার পরিচয় প্রকাশিত হলেও তাদের কাছে ব্যাপারটি একান্তভাবেই ব্যবহারিক উপযোগিতা-সংশ্লিষ্ট। নিত্যদিনে প্রয়োজনে তারা যেসব সামগ্রী উৎপাদন করে, সেগুলোতে বিদ্যমান কারুকাজ, নকশা, রঙ, বুনন ও নান্দনিক আবেদন মিলেমিশে বস্তুসামগ্রীকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করে। †evev Kwnbx উপন্যাসে বস্ত্রশিল্পের বৃত্তান্ত উপস্থাপিত। ফরিদপুর অঞ্চল বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এ উপন্যাসে তাঁতে তৈরি শাড়ির প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে রহিমদ্দি কারিগরের বয়নকর্ম প্রসঙ্গে। নকশিকাঁথা, সুঁই-সুতা দিয়ে রুমালে তোলা নকশা, পাট দিয়ে বানানো দড়ি, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো ঝুড়ি, হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত শাড়ি প্রভৃতি লোকশিল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। তাছাড়া গৃহবধূদের তৈরি শিকা এবং আল্পনার উল্লেখও এ উপন্যাসে রয়েছে। রহিমদ্দীর বয়নকৃত জামদানি শাড়ির খ্যাতি নিজের গ্রাম পেরিয়ে অন্যান্য গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। সে জামদানি শাড়ির পাশাপাশি মনখুশী, দিলখুশী, কলমীলতা, কাজললতা, গোলাপ ফুল, রাসমণ্ডল, বালুচর প্রভৃতি শাড়ি বুনেও প্রসিদ্ধি অর্জন করে। b'x I bvix উপন্যাসে নুরু মালেকের প্রতি বিমুগ্ধতাবশত যেসব রঙিন দৃশ্য কল্পনা করে, সেগুলোই তার হাতের নকশি কাঁথায় ফুটে ওঠে সুঁই-সুতার একেকটি রঙিন ফোড়ে। মালেক বাঁশ,

কাঠ ও রঙিন ঘাস দিয়ে বিভিন্ন খেলনা, নতুন ধানের ছড়া দিয়ে সাতনরী হার বানিয়ে নুরুকে উপহার দিত ছেলেবেলায়। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসেও সেলাইশিল্পের উল্লেখ রয়েছে। জোবেদ আলীর গৃহকর্মে নিযুক্ত কামলা করমালীর স্ত্রী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অন্যের বাড়িতে কাঁথা সেলাই করে। মাঘমণ্ডলের ব্রত উপলক্ষে বাসন্তীর বাড়িতে কিশোর ও সুবল আল্পনা এঁকে দিয়েছিল, যা ব্রতের অঙ্গ এবং লোকশিল্পের নিদর্শন।

১২.

লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন লোকসমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিচয় তুলে ধরে। পেশাগত কারণে বেদেনিরা নাচ-গান-যাত্রাদলে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত নারী-পুরুষেরা এ ব্যাপারে সচেতন থাকে। তেমনিভাবে পতিতা নারীকেও জীবিকা নির্বাহের তাগিদে প্রসাধন ও সাজসজ্জার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয়। লোকসমাজে পুরুষের জন্য ব্যবহৃত পরিচ্ছদ হিসেবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই লুঙ্গি, গামছা, ধুতি, টুপি, গেঞ্জি, পিরান, ফতুয়া, চাদর ও পায়ে চপ্পল, রবার ও ক্যাম্বিসের জুতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নারীরা তাঁতের শাড়ি, ডুরে শাড়ি, জামা প্রভৃতিতে অভ্যস্ত। নারীদের বিভিন্ন ধাতব অলংকারের ব্যবহার নির্ভর করে তাদের আর্থিক সঙ্গতির ওপর। প্রসাধনের প্রতি আগ্রহও তাদের আচরণে প্রকাশিত। †evev Kwnbx উপন্যাসে রাঙা মেহেদি, সুগন্ধি তেল, চুড়ি, কাঠের চিরুণি, গলার হার, সোনার তাবিজ, সিঁদুর, নাকের নথ, রূপার নূপুরসহ বিভিন্ন সৌখিন শাড়ির উল্লেখ রয়েছে। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসে বেদেনিরা পসরা নিয়ে গ্রামে গ্রাামে বেড়ায়। তারা আয়না, চিরুনি, সাবান, মাথার কাঁটা, কাঁচের চুড়ি, পুতির মালা নিয়ে সওদা করে। KvÂbgvjv উপন্যাসে নাচের আসরে আগত মালাকে বিচিত্র সাজে সজ্জিত হতে দেখা যায়। অন্যের মনোযোগ অর্জনের পাশাপাশি নিজের স্বভাবজাত সৌন্দর্যকে উপস্থাপনের তাগিদ, পেশাগত প্রয়োজন প্রভৃতি কারণে মালা যথাসম্ভব পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সাজায়। চুলে রঙিন ফুল, পরনের আঁটোসাঁটো বাহারি সবুজ শাড়ি ও লাল জামা, বাঁকাভাবে কাঁটা মালার চুলের সিঁথি, গলায় পরিহিত রূপার হাসুলী ও পায়ের খাড়ু প্রভতির সমাহারে মালা অপূর্ব সাজে হাজির হয়ে নিমেষেই পুরো আসরের মনোযোগ কেড়ে নেয়। mv‡is †eŠ উপন্যাসে নারীর প্রসাধনের বিবরণ রয়েছে। bxj gq‡ei †hŠeb উপন্যাসে শবরীর প্রসাধনকলার বিবরণে বাঙালি নারীর হাজার বছর পূর্বের ঐতিহ্যবিমুগ্ধতা আভাসিত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে সাজসজ্জায় সে নারী মনোযোগী। এসব বিবরণে আভাসিত হয়েছে লোকসমাজের বাসিন্দাদের প্রসাধনকলা, অলংকরণ ও সাজসজ্জার মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজেকে শোভিতরূপে প্রকাশের তাগিদ।

১৩.

লোকক্রীড়া লোকসমাজের চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন লোকক্রীড়ার উপস্থিতি বাঙালি লোকসমাজে লক্ষণীয়। শুধু বালক-বালিকারাই নয়, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরাও বিভিন্ন খেলায় অংশ নেয়, উপভোগ করে। কখনো কখনো খেলাকে ঘিরে একেকটি লোকগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত ও জনপ্রিয় খেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে কাবাডি, দাড়িয়াবাধা, গোল্লাছুট প্রভৃতি। †evev Kwnbx উপন্যাসে বালক-বালিকাদের মধ্যে বর-কনের বিয়ে করে সংসার পাতানোর খেলার বিবরণ রয়েছে। b'x I bvix উপন্যাসে

নৌকায় চড়ে বেড়ানোর খেলা, কাঁদা ছোড়াছুড়ি ও লাফঝাঁপ; wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে নৌকাবাইচের বিবরণ রয়েছে। Rbbx উপন্যাসে আমজাদ ও মোনাদির লাঠি খেলা, লাটিম ও মার্বেল খেলায় আগ্রহী ছিল। তাছাড়া মহেশডাঙার নির্জন অরণ্যে তারা লুকোচুরিও খেলত। cÙvi cwjØxc উপন্যাসে লোকক্রীড়া হিসেবে বিস্তৃত পরিসরে কাবাডি খেলার বিবরণ রয়েছে। এ খেলাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের নায়ক ফজল তার সঙ্গীদের সাহায্যে নিজেদের চরের (মাঝের চর) সম্মান ও গৌরব পুনরুদ্ধার করে, চর আসলির প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের মাধ্যমে। KvÂbgvjv উপন্যাসে ভেলকিবাজি বা জাদুর খেলা, সাপের খেলা দেখানোর বৃত্তান্ত উপস্থিত। নগদ অর্থের বিনিময়ে দর্শকেরা বেদেদের পরিবেশিত খেলা ও নাচ-গান উপভোগ করে। nvRvi eQi a‡i উপন্যাসে শান্তির হাটে আগত বাজিকর দলের সার্কাস পরিবেশনের বৃত্তান্ত রয়েছে। বাঘের খেলা, দড়ির ওপর হেঁটে চলা মানুষের খেলা প্রভৃতি সেই আসরে পরিবেশিত হয়।

১৪.

গ্রামীণ লোকসমাজের স্বরূপ বহুলাংশে বিধৃত হয় তাদের উদযাপিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-আয়োজন ও উৎসবে। বাঙালির উৎসবপ্রবণ মানসিকতা প্রসঙ্গে 'বারো মাসে তের পার্বণ' এ বাগধারা প্রচলিত। বিভিন্ন ধর্মীয় আয়োজন ছাড়াও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত অজস্র সমাবেশ ও আয়োজন লোকসমাজে অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক উৎসব, মেলা, পালা-পার্বণ প্রভৃতিতে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে লোকসমাজের বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করে। এসব আয়োজনকে ঘিরে অসাম্প্রদায়িকতা, সহমর্মিতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সমাজে সম্প্রসারিত হয়। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসে তিতাসপারের মালো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে ঋতুভিত্তিক উৎসব বা বাসন্তী উৎসব। এছাড়া উত্তরায়ন সংক্রান্তিও এ ধরনের উৎসব, যেখানে ধর্মের প্রভাব অনুপস্থিত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ই এসব আয়োজনে অংশ নেয়। মালোপাড়ায় উদ্‌যাপিত বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে রয়েছে মাঘমণ্ডলের ব্রত, দোল পূর্ণিমার উৎসব, হোলি, কালীপূজা, মনসা পূজা, যাত্রা, মনসার ভাসান ও পুথিপাঠ প্রভৃতি। মুসলমান সমাজে প্রচলিত উৎসবের মধ্যে রয়েছে ইদ ও মোহররম, জারি গানের আসর প্রভৃতি। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে নতুন ধান দিয়ে পিঠা ও অন্যান্য মুখরোচক খাবার বানানোর আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি কীর্তন নিয়ে গ্রামের পথে উৎসাহীদের কোলাহল, হরির লুট, নাচ-গান, কদমা ও বাতাসা বিতরণ, প্রভৃতিও লোক-উৎসব হিসেবে মালোদের বিনোদনে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন, সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা, প্রভৃতিতে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়। তেমনিভাবে বিয়েকে কেন্দ্র করে লোক-উৎসব নতুন মাত্রা পায়। নবজাতকের অন্নপ্রাশন, আটকলাই, দোয়াতকলম অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজনেও লোক-উৎসবের ভিন্ন রূপ উপস্থিত। mh-'xNj evox উপন্যাসে ইদের আয়োজন স্বল্প পরিসরে বিবৃত। Kvke‡bi Kb¨v উপন্যাসের প্রারম্ভেই জেলেদের জীবিকাসংশ্লিষ্ট ইলিশ শিকার উৎসবের বৃত্তান্ত রয়েছে। এ উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলা, চৈত্রসংক্রান্তির মেলার আয়োজনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের অবাধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাটিসংলগ্ন কৃষিজ সংস্কৃতির প্রতি একাত্মতাবোধের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। পাশাপাশি হেমন্তে নতুন ফসলকেন্দ্রিক নবান্নের আয়োজন আর শীতের পিঠাপুলির আমেজ বাঙালি লোকসমাজে লালিত উৎসবময়তারই ইঙ্গিত বহন করে। KvÂbgvjv উপন্যাসে বেদেদলের লোকবাদ্য-সঙ্গীত-নৃত্যযোগে অভিনয় কোনো নির্দিষ্ট উৎসবকে ঘিরে পল্লবিত হয়নি। বরং লোকমানুষের নির্মল আনন্দলাভের তাগিদ এর নেপথ্যে

সক্রিয়। তবে কালীপূজা উপলক্ষে এবং পুথিপাঠের আসরে গ্রামীণ লোকসমাজে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। nvRvi eQi a‡i উপন্যাসেও পুথিপাঠের আসরের বিবরণ লক্ষণীয়। সন্ধ্যায় সকলে মিলে বাড়ির উঠানে বসে যখন গাজী কালু, কমলা ও ভেলুয়ার পুথি পাঠ শোনে তখন এ আসরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। mskßK উপন্যাসে তালতলির হাটে অনুষ্ঠিত মেলার বিবরণ রয়েছে। মেলায় বিভিন্ন সামগ্রী বেচাকেনার পাশাপাশি কবিগানের আসর ও যাত্রা, রাধাকৃষ্ণপালা অনুষ্ঠিত হয়। †Lvqvebvgv উপন্যাসে লোকউৎসব হিসেবে পোড়াদহের মেলার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এটিই উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উৎসব যেখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা অনুপস্থিত। লোকসমাজের যে কোনো পর্যায়ের বাসিন্দারাই এ মেলায় নির্দ্বিধায় অংশগ্রহণ করে। এর পাশাপাশি নিশানের মেলা, এলাঙ্গির মেলা, রয়াদহের ফকিরের মেলাসহ পুরো চৈত্র মাস জুড়েই এতদঞ্চলে অন্যান্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাকে ঘিরে বিভিন্ন পারিবারিক-সামাজিক রীতি-প্রথা ও অনুষ্ঠানের বৃত্তান্তও এ উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। bxj gq‡ii †hŠeb উপন্যাসে গ্রামীণ কৃষিসমাজের ঐতিহ্যবাহী দুটি উৎসবের বিবরণ রয়েছে। এর একটি হলো সুখরাত্রিব্রতের উৎসব, অন্যটি কাম মহোৎসব। নরনারীর অবাধ যৌনমিলনের সামাজিক অনুমতির মাধ্যমে লোকসমাজের কৃষিনির্ভর পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত এসব উৎসবে রয়েছে। আনন্দ-আয়োজন, নৃত্য-গীত-বাদ্যযোগে লোকসমাজের উল্লাসপ্রবণ মানসিকতা ও নর-নারীর সম্মতিসূচক দৈহিক সম্পর্কের রূপায়ণ এ দুটি উৎসবকে ঘিরে চরিতার্থ হয়। †difv উপন্যাসে নেত্রকোণায় প্রচলিত বাঘাই উৎসবের বিবরণ রয়েছে, যেটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং একান্তই কৃষিজ উৎসব। ক্ষেতের ফসল ভালো হলে গ্রামবাসী এর আয়োজন করে। সারা বছরের প্রয়োজনীয় ধান সংগ্রহে রাখার পর উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে এ উৎসব করা হয়। গ্রামের তরুণেরাই মূলত এ আয়োজনের উদ্যোক্তা। তারা ধান কাটা শেষ হবার পরবর্তী পূর্ণিমায় উৎসবের বন্দোবস্ত করে। এ উপলক্ষে বিশেষ গান পরিবেশিত হয়। সিন্নি রান্নার উপকরণ গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ সম্মিলিত আয়োজনে লোকসমাজের অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা প্রতিফলিত হয়। D‡o hvq wbwkc ÿx উপন্যাসে লোক-উৎসব হিসেবে মেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। নতুন ধান কাটা হলে নয়নপুরে ও এর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে মেলা বসে। গ্রামবাসীর কাছে নগদ অর্থ না থাকলে তারা নতুন ধানের বিনিময়ে মেলা থেকে শখের ও প্রয়োজনের সামগ্রী কেনে। মেলা উপলক্ষে গ্রামে মনিহারী দোকান বসে, পসারীরা বিভিন্ন সামগ্রী সাজিয়ে দর্শকদের তুষ্ট করতে চায়। এর পাশাপাশি বেদেনিরা আসে সাপের খেলা দেখাতে। বাজিকরদের বানরের খেলা দেখানোর আয়োজন, পুতুলনাচের আসর, পুথিপাঠের আসর, জাদুকরের জাদুর খেলার আসর প্রভৃতি আয়োজনে সমগ্র গ্রাম মুখরিত হয়ে যায়। এমনকি মন্ত্রসিদ্ধ শিরালি, যে ক্ষেতের ধান পাহারা দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে ফসল তোলার ঋতুতে, সেও জাদু দেখিয়ে দর্শককে বিমোহিত করে। তার জাদুর কৌশলে উড়ন্ত ধান খই হয়ে যায়। শিলাবৃষ্টির কবল থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষার দায়িত্ব পালনের শর্ত সত্ত্বেও সে এভাবে মেলায় আগত দর্শকদের মনোরঞ্জন করে।

১৫.

লোকসাহিত্য মৌখিকভাবে রচিত এবং শ্রুতিকথিত-স্মৃতিবাহিত পরম্পরায় লোকসমাজের সৃষ্টিশীলতার অনবদ্য নিদর্শনরূপে টিকে থাকে। লোকসংস্কৃতির সৃষ্টিশীলতার অন্যতম ধারা এটি, যা পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল

মিলিয়ে চলতে সমর্থ। এর উল্লেখযোগ্য শাখাগুলো হলো ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, মন্ত্র, রূপকথা, উপকথা, লোকপুরাণ, কিংবদন্তি, বাগধারা, পুথিপাঠ প্রভৃতি। আমাদের গবেষণাভুক্ত প্রায় সব উপন্যাসেই লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পবোধ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। †evev Kwnbx উপন্যাসে ধাঁধার ব্যবহার ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ, বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার অংশ হিসেবে এতে ধাঁধার প্রয়োগ হয়েছে। আবার রূপকথার প্রসঙ্গও এসেছে, আমির সাধু ও বেলোয়া সুন্দরীর আখ্যান যোগে। মূলত লোকসমাজে গল্প-বৃত্তান্তে বিমুগ্ধতা শ্রুতিগত বিনোদন লাভের এবং শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম হিসেবেও স্বীকৃত। বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীতের মধ্যে বিয়ের মেয়েলি গীত, গ্রাম্য লোকগীত, বালক-বালিকাদের পুতুল খেলার গান, মারফতি গান, ভাটিয়ালি গান, বাউল গান শ্রোতা ও পাত্র-পাত্রী অনুযায়ী স্থান ও আসরে আবৃত্ত হয়। লোকসাহিত্যের এসব ধারায় প্রকাশিত হয় লোকসমাজের বাসিন্দাদের সৃষ্টিশীলতা, মেধা ও মননের সাক্ষর। b'x I bvix উপন্যাসে প্রবাদের বিভিন্ন উল্লেখ লক্ষণীয়। নারীর মুখে প্রবাদের জন্ম, উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে বিধায় এ উপন্যাসেও নারীর সংলাপেই প্রবাদের অধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। wZZvm GKwU b'xi bvg উপন্যাসে লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব উপকরণই প্রযুক্ত। ধাঁধা, ছড়ার পাশাপাশি লোকপুরাণের বিচিত্র সমাবেশ এ উপন্যাসের গৌরবময় দিক। ivgvqY-gnvfviZ, gbmvg½j-এর চাঁদ সওদাগর, বেহুলা লখীন্দর প্রসঙ্গ, জালা বিয়া, যুধিষ্ঠির ও পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, শিব, দুর্গা ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবী, স্বর্গ-নরক প্রসঙ্গ, যশোদার লোকায়ত পুরাণ মিলেমিশে এ উপন্যাসের পৌরাণিক পরিসরকে মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ করে তুলেছে। ব্রতের গান, ভাটিয়ালি, বারোমাসী, নৌকাবাইচের গান. বাউল গান, পুথির পাঠ, কেচ্ছার গান, যাত্রাগান প্রভৃতির সমবায়ে এ উপন্যাসে লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। Rbbx উপন্যাসে চন্দ্রকোটাল পরিবেশিত লোকসঙ্গীতগুলো শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই ভূমিকা পালন করেনি। পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িকতার আহ্বান ও মানবতাবোধ এসব গানে উৎসারিত। mh-'xNj evox উপন্যাসে শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে। প্রবাদ ও লোককাহিনির পাশাপাশি গ্রাম্য লোকগীত, ভিক্ষুকের গান, মাঠে ধান কাটার গান, চানাচুর বিক্রেতার ছড়া, বালক-বালিকার ছড়া, বড়শিতে মুখ লাগলে নজর কাটানোর ছড়া, ভূতে ভর করা মানুষের ছড়া, বালক-বালিকার ঝিঝিপোকা ধরার ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা প্রভৃতির আবেদন সব ধরনের পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য, মনোহারী। আবু ইসহাক পদ্মার চরাঞ্চলের জীবনবাস্তবতা রূপায়ণের তাগিদে cÙvi cwjØxc উপন্যাসে উপযুক্ত ভাবাবহ সমন্বিত লোকসঙ্গীতকে যুক্ত করেছেন। পাশাপাশি বিয়ের গান, পিঠা বানানোর গান, পালকি বাহকদের গান, রূপকথার অনুষঙ্গ এ উপন্যাসের লৌকিক আবহকে সম্প্রসারিত করেছে। ভাব অনুযায়ী বাগধারার প্রাসঙ্গিক ব্যবহারও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। Kvke‡bi Kb¨v উপন্যাসে লোকসঙ্গীতের প্রয়োগ বিশিষ্টতার দাবিদার। ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে একটি করে লোকগীতের সংযোজনা এবং বক্তব্য ও ভাবের সারমর্মকে সঙ্গীতে প্রকাশের আগ্রহ লেখকের কৌশলী অথচ শিল্পময় প্রচেষ্টার সাক্ষ্যবহ। nvRvi eQi a‡i উপন্যাসে পুথিসাহিত্যের সংযোজন ব্যতিক্রমী মাত্রা পেয়েছে। বিগত দিনের স্মৃতিময়তার অনুষঙ্গ হিসেবে এর প্রয়োগ উপন্যাসের ঘটনাস্রোত ও চরিত্রসমূহের মনোলোকে প্রভাব ফেলে। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর বাড়ির উঠানে আসর জমিয়ে পুথি পড়া ও শোনা এমন এক কালের স্মৃতিকে পাত্রপাত্রীর অন্তর্ভাবনায় জাগ্রত করে, যে জীবন আবহমানকালের, হাসি-আনন্দের-নির্মলতার প্রতীক। বাস্তব জীবনের কোলাহল থেকে বিগত দিনের মাধুর্যময় সংবেদনার অনুভব কল্পনা ও অতিলৌকিকতার সন্নিবেশে পুথির পাঠক ও শ্রোতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এক অধরা জগতে।কমলা, ভেলুয়া, গাজী কালুর পুথির আবেদন লোকসমাজে ঐতিহ্যানুসারেই প্রজন্মান্তরে অব্যাহত থাকে, শাশ্বত মানবধর্মের আহ্বানে।

†Lvqvebvgv উপন্যাসে কিংবদন্তি ও লোকসঙ্গীতের ব্যবহার স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। ঐতিহাসিক ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিংবদন্তির সঙ্গে কাল্পনিক চরিত্র মুনসি বয়তুল্লা শাহের কিংবদন্তি, গালগল্প, লোককথা, যমুনা, বাঙাল, মানাস, করতোয়া, মোষের দিঘি, কাৎলাহার বিল প্রভৃতি বিষয়, চরিত্র, স্থানকে ঘিরে লেখক এক স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এসব কিংবদন্তির সঙ্গে রয়েছে ইতিহাসের কোনো প্রসঙ্গের যোগাযোগ, আবার কোনো ঘটনা নিতান্তই লেখকের রচনা। লেখক বিভিন্ন কিংবদন্তির সঙ্গে সমকালের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও উনিশ শতকের ইতিহাসের খণ্ডাংশ মিলিয়ে এমন এক আখ্যান গড়ে তুলেছেন, যেখানে লোকমানসের স্বরূপ নিছক গ্রামীণ আবহেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পাঠকের মনোলোকেও তা স্বকীয় মাত্রা পায় নিজস্ব কল্পনা ও সৃজনসামর্থ্যের গুণে। অর্থাৎ বিনির্মাণের দায়িত্বকে লেখক এভাবেই পাঠকের ওপর আরোপ করেন এ উপন্যাসের লোকসাংস্কৃতিক জগৎ গ্রন্থনায়। Ckv‡b AwM‘vn উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত ছড়া, বাগধারা ও প্রবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ লক্ষণীয়। গ্রামীণ লোকসমাজের হাসি-ঠাট্টা, তামাসা-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এসব মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে অকপটে। AÜK‡c R‡b¥rme উপন্যাসে লোককথার প্রয়োগ ব্যতিক্রমী শিল্পগুণে উৎকর্ষমণ্ডিত। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত পাঁচটি কাহিনী কুটুম পাখি, হাড়িয়া পুতপুত পাখি, ঘুঘু পাখি, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, ও চৈতার বৌ বিষয়ক। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক রীতিনীতি ও অনুশাসন, নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উপস্থিত। এসব লোককাহিনীতে এতদঞ্চলের গ্রামীণ লোকসমাজের চালচিত্র রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া শালদো বিলের আঞ্চলিক কিংবদন্তি, গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত কূয়ার কিংবদন্তি এবং জনৈক সাধুর কিংবদন্তি, যার প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান ও লোকরুচির প্রতিনিধিত্বশীল। এসবের সমবায়ে নরসিংদির গ্রামীণ লোকসমাজের পরিচয় এ উপন্যাসে স্বতন্ত্র পরিচয়ে উদ্ভাসিত।

১৬.

এ গবেষণাকর্মভুক্ত নির্বাচিত উপন্যাসসমূহে বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকভাষা প্রযুক্ত হয়েছে, যা উপন্যাসের ভাবপরিমণ্ডল ও প্রাকরণিক-শিল্পবোধসম্পৃক্ত বাস্তবতাকে জীবনঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে। ভাষা সামাজিক মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। লোকসমাজে প্রচলিত ভাষা বৃহত্তর সমাজমানসের তলদেশ থেকে উৎসারিত হয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে অবিরাম প্রবাহিত হয়ে চলে। তাই লোকমানসের স্বরূপ অন্বেষণে এ ভাষার প্রভাব ও ব্যবহারিক উপযোগিতা স্বীকার্য। লেখকগণ যে বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে উপন্যাস লিখেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাষাকেই পাত্রপাত্রীর সংলাপে, আচরণে, তাদের অন্তর্বাস্তবতার রূপায়ণে উপজীব্য করেছেন। ব্যক্তিজীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা, সচেতনভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে উপন্যাসে রূপায়ণের আগ্রহ, সর্বোপরি ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের নিরন্তর তাগিদ লেখকদের অনুপ্রাণনা যোগায় বাস্তব আবহ ও ভাষিক পটভূমির সমবায়ে উপন্যাসকে শিল্পমণ্ডিত করে তুলতে। এর ফলে চরিত্রসমূহের আবেদন বহুলাংশেই বাস্তবের মানুষের প্রতিতুল্য হয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি, লোকভাষায় আঞ্চলিকতার প্রভাব প্রবল বলেই এতে বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয় লেখকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি, পর্যবেক্ষণশক্তি ও পাত্রপাত্রীর মনস্তত্ত্বকে নির্দিষ্ট আঞ্চলিক প্রতিবেশের পটভূমিতে ফুটিয়ে তুলতে পারার সম্ভাবনা। †eve Kwnbx উপন্যাসে জসীমউদ্‌দীন নিজস্ব গ্রামীণ পরিমণ্ডলে (ফরিদপুরের) প্রচলিত লোকভাষাকে ব্যবহার করেছেন। একই প্রবণতা সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের wZZvm GKwU b‘xi bvg উপন্যাসে (কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকভাষা ব্যবহারে)। আবু ইসহাকের cÜvi cwj Øxc উপন্যাসে (মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুরের লোকভাষা প্রয়োগে), শহীদুল্লা কায়সারের mv‡is †eŠ

উপন্যাসে (নোয়াখালির লোকভাষা প্রয়োগে), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের †Lvqvebvgv উপন্যাসে (বগুড়ার লোকভাষা ব্যবহারে), আহমদ ছফার mh Zwg mv_x উপন্যাসে (চট্টগ্রামের লোকভাষা ব্যবহারে), হরিপদ দত্তের Ckv‡b AwM'vn ও AÜK‡c R‡b¥rme উপন্যাসদ্বয়ে (নরসিংদির লোকভাষা ব্যবগারে), হুমায়ূন আহমেদের †div উপন্যাসে (নেত্রকোণার লোকভাষা ব্যবহারে) এ ধারার প্রয়োগ লক্ষণীয়। বাগধারা, দেশজ শব্দরাশি, চরিত্রের অঙ্গভঙ্গি, ইশারা-ইঙ্গিত, আলাপের নিজস্ব ধরন, সংলাপ প্রক্ষেপণের স্বকীয়তা প্রভৃতি গুণে লোকভাষার উপস্থিতি এসব উপন্যাসে স্বকীয় মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। আমাদের গবেষণাভুক্ত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং হুমায়ুন কবির ব্যতীত অন্যদের উপন্যাসসমূহে গ্রামীণ জীবনসংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং লোকমানুষের অন্তর্ভাবনা সম্পর্কিত অবহিতির সম্যক উপলব্ধি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। তবে এ দুজন ঔপন্যাসিকও যে বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজ এবং এখানকার বাসিন্দাদের চালচিত্রকেই নিজস্ব জীবনোপলব্ধি ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাঙ্ময় রূপ দিয়েছেন স্বীয় লেখনীতে, এর দৃষ্টান্তও রয়েছে jvjmvj, এবং b'x I bvix উপন্যাসে। আমাদের গবেষণাভুক্ত কোনো কোনো উপন্যাসে লোকভাষা ব্যবহারে কিছুটা আড়ষ্ট ভাব, জড়তা, সাধুরীতির প্রয়োগ, সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ, বিশেষণের যথেচ্ছ প্রয়োগ, উপন্যাসের বর্ণনা ও আখ্যানভাগের সম্প্রসারণে গতিশীলতা ও প্রাণবন্ত ভাবকে মন্থর করে তোলার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। তবু, গবেষণাকর্মভুক্ত উপন্যাসগুলোর আলোকে বাংলাদেশের লোকভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

সমাজের কায়িক শ্রমজীবী মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রবাহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি অবলম্বনে লেখকদের লেখনীতে উপজীব্য হয়েছে। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও সমকালসচেতনতা, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক বীক্ষা, সংবেদনশীল শিল্পদৃষ্টির নির্যাস এসব উপন্যাসে রূপায়িত লোকসংস্কৃতির পরিচর্যায় লক্ষণীয়। বাংলার সংস্কৃতিতে রয়েছে অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সহনশীলতা, সম্প্রীতি আর মানবতার উদাত্ত আহবান। মানবসভ্যতার হাজার বছরের পথচলার ইতিহাসে বাঙালি জাতির বিশিষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে সংস্কৃতিসংলগ্ন জীবনবীক্ষাকে পাথেয় করে ভবিষ্যতের পানে অগ্রযাত্রার উদ্যমী মানসিকতায়। প্রকৃতির অবারিত সান্নিধ্যে শতধারায় উৎসারিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রাত্যহিক কর্মপ্রবাহে ধারণের অন্তর্তাগিদ লোকসমাজকে উজ্জীবিত করে। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের সীমানা পেরিয়ে তাদের জীবনধারায় ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা আর ঔদার্য অনুরণিত হয় লোকসংস্কৃতির অজস্র অনুষঙ্গে। যে অর্থে সংস্কৃতি বলতে পরিশীলন আর মানস-উৎকর্ষগত রূপান্তরকে বোঝায়, বাংলাদেশের লোকসমাজভুক্ত বাসিন্দাদের চিন্তা-চেতনা, জীবনভাবনা আর কর্মধারায় তারই সহজাত উদ্ভাসন পরিলক্ষিত হয় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতায়, বোধে ও মননে স্বদেশকে লালনের আগ্রহে। উপর্যুক্ত উপন্যাসসমূহ সেই সংবেদনশীল অভিব্যক্তিরই নান্দনিক ভাষ্যচিত্র।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)

Acivn (১৯৮৮), হুমায়ূন আহমেদ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২

AÜK‡c R‡b¥rme (১৯৮৭), হরিপদ দত্ত, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭

Ckv‡b AwM‘vn (১৯৮৬), হরিপদ দত্ত, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬

D‡o hvq wbwkc ÿx (১৯৯৯), নাসরীন জাহান, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

KvÂbgvjv (১৯৬০), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৮৪

Kvke‡bi Kb¨ (১৯৫৪), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩

†Lvqvebvgv (১৯৯৬), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ২, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২

Rbbx (১৯৪৭), শওকত ওসমান, শওকত ওসমান উপন্যাসসমগ্র ১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

RvqR½j (১৯৭৩), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪

wZZvm GKwU b‘xi bvg (১৯৫৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১

b‘x I bvix (১৯৫২), হুমায়ুন কবির, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৯

bxj gq‡ii †hŠeb (১৯৮২), সেলিনা হোসেন, শব্দশৈলী, ঢাকা, ১৯৮২

cÙvi cwjØxc (১৯৮৬), আবু ইসহাক, আবু ইসহাক উপন্যাসসমগ্র, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০১৩

†div (১৯৮৩), হুমায়ূন আহমেদ, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৪

†evev Kwnbx (১৯৬৪), জসীমউদ্‌দীন, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮

jvjmvj (১৯৪৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী ১, সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

mg' evmi (১৯৮৬), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬

mskßK, শহীদুল্লা কায়সার, চারুলিপি, ঢাকা, ২০০৯

mv‡is †eŠ (১৯৬২), শহীদুল্লা কায়সার, চারুলিপি, ঢাকা, ২০০৯

mh 'xNj evox (১৯৫৫), আবু ইসহাক, আবু ইসহাক উপন্যাসসমগ্র, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০১৩

mh Zwg mv_x (১৯৬৭), আহমদ ছফা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯৩

nvRvi eQi a‡i (১৯৬৪), জহির রায়হান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

খ. সহায়ক গ্রন্থতালিকা (লেখকের নামের বর্ণানুক্রমিক)

অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), A‰ØZ gjøegY iPbvmgM, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১

অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), †jvKms¯«wZ I evsjv mvwnZ¨, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮

অচিন্ত্য বিশ্বাস, cm½: A‰ØZ gjøegY I wZZvm GKwU b'xi bvg, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৫

অচিন্ত্য বিশ্বাস, †jvKms¯«wZwe'¨v, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫

অজয় রায়, evsjv I evOvjx, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭

অঞ্জন সেন ও উদয় নারায়ণ সিংহ (সম্পাদিত), wg_ mvwnZ¨ ms¯«wZ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯১

অঞ্জন সেন ও শেখ মকবুল ইসলাম, mc-ms¯«wZ I gbmv, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২

অতুল সুর, evsjv I evOvjxi weeZb, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১২

অনীক মাহমুদ, evsjv K_vmvwn‡Z¨ kIKZ Imgvb, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫

অনু হোসেন, evsjv‡'‡ki KweZv : †jvKms¯«wZi b›'bZË, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

অনুপম হীরা মণ্ডল, †jvKµxovi AšÍcvV, অবসর, ঢাকা, ২০১১

অনিমেষকান্তি পাল, লোক সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৪

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, evsjvi eZ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ü'‡qi GKj-IKj, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৯

অশোক মিস্ত্রি, knx'jøv Kvqmvi : Rxeb I mvwnZ¨, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

আতোয়ার রহমান, †jvKmvwn‡Z¨i K_v, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

আতোয়ার রহমান, Drme, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬

আতোয়ার রহমান, †jvKKwZ K_v¸"Q, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

আতোয়ার রহমান, †jvKKwZ wewPÎv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

আদিত্য মুখোপাধ্যায়, evsjvi †jvKms¯'wZ, অমর ভারতী, কলকাতা, ২০০৫

আদিত্য মুখোপাধ্যায়, †jvKms¯'wZi ¯'i/c I mÜvb, বোনা, কলকাতা, ২০১৪

আনন্দ ভট্টাচার্য, mb¨vmx I dwKi we‡'vn : BwZnv‡mi cbwe‡ePbv, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০

আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ûgvqb Avn‡g' ¯§viKMš', অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

আনু মুহাম্মদ, Bwjqvm I c‡ki kw³, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

আনোয়ারুল করীম (সম্পাদিত), †dvK‡jvi : †jvKms¯'wZi K_KZv, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১০

আবু রুশদ, kIKZ Imgvb I ˆmq' IqvjxDjøvni Dcb¨vm, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২

আবুবকর সিদ্দিক, mwn‡Z¨i msMcmsM, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১

আবুল আজাদ, kIKZ Imgv‡bi Dcb¨vm, গ্লোব লাইব্রেরি প্রাঃ লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৮

আবুল আহসান চৌধুরী ও মাসুদ রহমান (সম্পাদিত), ûgvqb Kwei : Rb¥kZel ¯§iY, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

আবুল আহসান চৌধুরী, †jvKms¯'wZ we‡ePbv I Ab¨vb¨ cm½, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

আবদুল কাদির, evOjvi †jvKvqZ mwnZ¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

আবদুল মতিন, kvgm''xb Avej Kvjvg I Zvi cÎvejx, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২০০৬

আবদুল মান্নান সৈয়দ, ˆmq' IqvjxDjøvn, অবসর, ঢাকা, ২০০১

আবদুল হাফিজ, evsjv‡'‡ki †jŠwKK HwZn¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫

আবদুল হাফিজ, †jŠwKK ms¯'vi I gvbe mgvR, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

আবদুল হামিদ, Mvg evsjvi †Ljvajv, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০

আবুল আহসান চৌধুরী, †jvKms¯‹wZ we‡ePbv I Ab¨vb¨ cÖm½, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

আবুল হাসান চৌধুরী, iex›`ªKv‡e¨ †jvK Dcv`vb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১

আরজুমন্দ আরা বানু, knx`jøv Kvqmvi I Rwni ivqnv‡bi K_vmvwnZ¨ : welq I cKiY, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

আলমগীর জলিল, evsjv‡`‡ki MvgxY ms¯‹wZ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১১

আলাউদ্দিন মণ্ডল (সম্পাদিত), AvLZvi‾¾vgvb Bwjqvm : PY fvebv I PY K_v msMn, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১১

আলাউদ্দিন মণ্ডল, AvLZvi‾¾vgvb Bwjqvm : wbgv‡Y wewbgv‡Y, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯

আলি নওয়াজ, Lbvi ePb : Kwl I Kwó, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১

আশরাফ সিদ্দিকী, †jvKvqZ evsjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮

আশরাফ সিদ্দিকী, wKse`wšÍi evsjv, চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা, ১৯৯১

আশরাফ সিদ্দিকী, †jvKmvwnZ¨ I †jvK HwZn¨, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৫

আশরাফ সিদ্দিকী, †jvK-mvwnZ¨ (দুই খণ্ড), গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮

আশুতোষ ভট্টাচার্য, iex›`bv_ I †jvK-mvwnZ¨, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৩

আশুতোষ ভট্টাচার্য, evsjv g½jKv‡e¨i BwZnvm, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য, evsjvi †jvK-kæwZ, পুরোগামী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

আশুতোষ ভট্টাচার্য, evsjvi †jvKmvwnZ¨, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৭

আশুতোষ ভট্টাচার্য, evsjvi †jvK-ms¯‹wZ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০০৫

আহমদ ছফা, evOwj gmjgv‡bi gb, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৯

আহমদ শরীফ, evOvjxi wPšÍv-†PZbvi weeZbavi v, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৭

আহমদ শরীফ, ga¨h‡Mi mwn‡Z¨ mgvR I ms¯‹wZi i/c, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

আহমদ শরীফ, evOvjx I evsjv mwnZ¨, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১ম খণ্ড : ২০০৪, ২য় খণ্ড : ২০০৫)

আহমেদ মাওলা, evsjv‡`‡ki K_vmvwnZ¨ : ceYZvmgn, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

আহসান হাবীব, M‡íi hv`Ki, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

আয়েশা ফয়েজ, Rxeb †h iKg, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১

ইমদাদুল হক মিলন, wcq ûgvqb Avn‡g`, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

ইয়াহ্ইয়া মান্নান, kvgm``xb Avej Kvjv‡gi Dcb¨v‡m mgvR ev¯ÍeZv, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

ওসমান গনি, Bmjvgx evsjv mwnZ¨ I evsjvi cw_, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০০

ওয়াকিল আহমদ, evsjvi †jvK-ms¯‹wZ, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪

ওয়াকিল আহমদ, evsjv †jvKmwnZ¨ : Qov, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪

ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), †jvKms¯‹wZ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

ওয়াকিল আহমদ, †jvKÁvb I †jvKchw³, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০

ওয়াকিল আহমদ, evsjv †jvKmwn‡Z¨ gš¿, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০

ওয়াকিল আহমদ, evsjv †jvKmwnZ¨ : avav, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, Dcb¨v‡mi wewbgvY Dcb¨v‡mi Rv`y, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

কুদরত-ই-হুদা, kIKZ Imgvb I m‡Z¨b †m‡bi Dcb¨vm : Aw½K wePvi, আদর্শ, ঢাকা, ২০১৩

ক্ষেত্র গুপ্ত, wekvqb I †jvKms¯‹wZ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১১

খগেশকিরণ তালুকদার, evsjv‡`‡ki †jvKvqZ wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭

খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্দীন (সম্পাদিত) RmxgD``x‡bi ceÜmgn (wØZxq LÐ), পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

গিয়াস শামীম, evsjv‡`‡ki AvÂwjK Dcb¨vm, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

গিয়াস শামীম, evsjv mwn‡Z¨ AvÂwjK Dcb¨vm, প্রকাশনা সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১৫

জব্বার হোসেন (সম্পাদিত) gn¤§‘ Rvdi BKev‡ji mvÿvrKvi, জাগৃতি, ঢাকা, ২০১২

জামরুল হাসান বেগ, bRij Bmjvg I A‡b¨iv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

জাহাঙ্গীর আলম সরকার, Kv‡jvËxY ûgvqb Avn‡g‘, পূর্বা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ˆmq‘ IqvjxDjøvni Rxeb‘kb I mvwnZ¨Kǵ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

জীবেশ নায়ক, †jvKms¯‹…wZwe‘¨v I †jvKmvwnZ¨, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

তপোধীর ভট্টাচার্য, Dcb¨v‡mi mgq, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯

তপোধীর ভট্টাচার্য, Dcb¨v‡mi wewbgvY, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

তানভীর মোকাম্মেল, ˆmq‘ IqvjxDjøvn, wmwmdvm I Dcb¨v‡m HwZn¨ wRÁvmv, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

তারকনাথ সরকার (সম্পাদিত), †jvKms¯‹…wZi wewPÎ cwimi : A‡š¦lY I we‡kølY, বলাকা, কলকাতা, ২০১৪

তালহা বিন জসিম, ûgvqb Avn‡g‡‘i mvÿvrKvi, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩

তিতাস চৌধুরী. ˆekvL I Avgv‡‘i HwZn¨‡PZbv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০

তিতাস চৌধুরী. A‰ØZ gjøegY I Ab¨vb¨ ceÜ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১

তিতাস চৌধুরী, †jvKmvwn‡Z¨i bvbw‘K, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

তুষার চট্টোপাধ্যায়, †jvKms¯‹…wZi ZËi¦c I ¯^i¦c wRÁvmv, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৫

তুষার চট্টোপাধ্যায়, †jvKms¯‹…wZ cv‡Vi f‚wgKv, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১

তোফায়েল আহমদ, †jvKHwZ‡n¨i ‘k w‘MšÍ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

দীপঙ্কর ঘোষ, evsjvi g‡Lvk, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২

দিব্যজ্যোতি মজুমদার, †jvKms¯‹…wZi fwel¨r I †jvKvqZ gb, গাঙচিল, ঢাকা, ২০১০

দেবশ্রী পালিত, Qov : †jvKvqZ Rxe‡bi Kviæfvl, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২

দেবাশিষ ভট্টাচার্য, wek kZ‡Ki evsjv K_vmvwn‡Z¨ wb”eMxq †PZbv, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ২০১০

দেবীপ্রসাদ ঘোষ, A‰ØZ gjøegY : GK wfb cwZ‡mvZ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, K_vmvwnZ¨ I K_vmvwnwZ¨K cm‡½, আশাবরী পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০০

নজরুল ইসলাম, evsjv‡‘‡ki †jvKR †Ljvajv, শুভ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

নাজমুল হক, cÂMo †Rjvi BwZnvm I †jvKms¯‹wZ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

নির্মল দাশ, †jvKfvlv †_‡K fvlv‡jvK, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

নিসার উদ্দিন, evsjv‡‘‡ki †jvKms¯‹wZ, একুশে বাংলা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩

নীহাররঞ্জন রায়, ev½vjxi BwZnvm (Aw‘ce), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

নূরুল আলম আতিক (সম্পাদিত), ḇ মিথ সংখ্যা, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৯

নূরুল আনোয়ার, QdvgZ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১০

নূরুল আনোয়ার (সম্পাদিত), Avng‘ Qdvi Wv‡qwi, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১০

নূরুল আনোয়ার (সম্পাদিত), Avng‘ Qdvi mvÿvrKvi mgM, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩

পবিত্র সরকার, †jvKms¯‹wZi b›‘bZË, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৫

পবিত্র সরকার, †jvKfvlv †jvKms¯‹wZ, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩

পবিত্র সরকার, †jvKfvlv ms¯‹wZ b›‘bZË, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ২০১৪

পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), †jvKcivY I ms¯‹wZ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫

পল্লব সেনগুপ্ত, cRv cve‡Yi DrmK_v, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১

পল্লব সেনগুপ্ত, †jvKK_vi AšÍ‡jvK, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২০০০

পল্লব সেনগুপ্ত, †jvKms¯‹wZi mxgvbv I ¯iƒc, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০

প্রণব চৌধুরী (সম্পাদিত), evsjv‡‘‡ki mvwn‡Z¨i Av‡jvPbv chv‡jvPbv I Ab¨vb¨ ceÜ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১

প্রণব সরকার (সম্পাদিত) †jvK : evsjvi b‘b‘x, Rjvkq 1, কলকাতা, ২০১৩

প্রদ্যোত ঘোষ, evsjvi †jvKwkí, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪

প্রবীর ঘোষ, cev‘ ms¯‹vi-Kms¯‹vi, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮

প্রিসিলা রাজ (অনূদিত), wg_ GÛ wgwbs, ক্লদ লেভি-স্ত্রস, বাঙলায়ন, ঢাকা, ২০০৭

ফকরুল চৌধুরী, ms¯‹…wZi i¨cKí, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৩

ফজলুল হক তুহিন, evsjv‡`‡ki KwweZvq †jvKms¯‹…wZ, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

ফজলুল হক সৈকত (সম্পাদিত), K_wkíx Ave BmnvK, শোভা প্রকাশ, ঢাকা , ২০০৭

ফজলুল হক সৈকত ও জান্নাতুল পারভীন (সম্পাদিত), K_wbgvZv †mwjbv †nv‡mb, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

ফরিদা সুলতানা, evsjv‡`‡ki Dcb¨v‡m Rxeb‡PZbv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvK-wekvm I †jvK ms¯‹vi, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৪

বরুণকুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পাদিত), evOjvi †jvKms¯‹…wZ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৬

বরুণকুমার চক্রবর্তী, evsjvi †jvKµxov, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১

বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvKR ms¯‹…wZ : †ciYv I †cÖ¶vcU, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০৩

বরুণকুমার চক্রবর্তী, avav : ¯^i¦c mÜvb, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮

বরুণকুমার চক্রবর্তী, evsjv cev‡`i ¯^vb-Kvj-cvÎ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৮

বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvKms¯‹…wZi mvZKvnb, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০৯

বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), cev‘ cm½, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০

বরুণকুমার চক্রবর্তী, †jvKms¯‹…wZi mjK mÜv‡b, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০

বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), e½xq †jvKms¯‹…wZ‡Kvl, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১২

বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), evsjv Qov cwiµgv, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪

বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), †jŠwKK gš¿, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৫

বলরাম মণ্ডল, civY wewPÎv, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৯৩

বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), evsjvi eZ I Ab¨vb¨ eZK_v, দীপায়ন, কলকাতা, ২০১২

বিমল গুহ, AvawbK evsjv KweZvq †jvKR Dcv'vb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡'‡ki mwnZ¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

বিশ্বজিৎ ঘোষ, cjvKcivY, RbmgvR I K_wkí, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২

বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), VvKigvÒi Swj, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, অবসর, ঢাকা, ২০১৩

বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী, wekvqb I †jvKms¯wZ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১৩

ভূঁইয়া ইকবাল, evsjv‡'‡ki Dcb¨v‡m mgvRwPÎ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

মনজুরুর রহমান, ˆekvLx †gjv I Ab¨vb¨, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

মনসুর মুসা, ce evOjvi Dcb¨vm, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, evsjv cev' I KwlweÁvb, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০১১

মনোহর বিশ্বাস, wfb‡Pv‡L ceÜgvjv, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৩

মফিজ ইমাম মিলন (সম্পাদিত), ûgvqb Avn‡g' ¯§iKMš', তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১৩

মমতাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), jvjmvj Ges IqvjxDjøvn, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৯

মমতাজ শহীদ, Avgvi 'v'vfvB ûgvqb Avn‡g', অবসর, ঢাকা, ২০০৯

মযহারুল ইসলাম, †dvK‡jvi cwiwPwZ I cVb-cvVb, অবসর, ঢাকা, ২০১২

মলয় বসু, evsjv mwn‡Z¨ i/cK_v-PPv, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮০

মহসিন শাস্ত্রপাণি, RbkwZ, উন্মেষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

মহীবুল আজিজ, evsjv‡`‡ki Dcb¨v‡m MvgxY wb"eM, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

মনোয়ারা খাতুন, evsjv‡`‡ki †jvKmvwn‡Z¨ mgvR, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

মাসুদ রহমান, ûgvqb Kwei : Rxeb I mvwnZ¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫

মাসুদুজ্জামান, Kv‡ji KnK I evsjv‡`‡ki K_vmvwnZ¨, লেখাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

মাসুদুজ্জামান ও বরেন্দু মণ্ডল (সম্পাদিত), †mwjbv †nv‡m‡bi K_vmvwnZ¨ : †`k-Kvj-RwZ, লেখাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

মাহমুদুল বাসার, Rxebwkíx Rwni ivqnvb, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১১

মাহমুদুল বাসার, evsjv‡`‡ki K_vmvwnZ¨, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

মাহবুব হাসান, bRiæ‡ji KweZvq wg_ I †jvKR Dcv`vb, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০১

মাহবুব হাসান, evsjv‡`‡ki KweZvq †jvKR Dcv`vb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫

মিলনকান্তি বিশ্বাস, cm½ : †jvKms¯‹…wZ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪

মিলনকান্তি বিশ্বাস, A‰ØZ gjøegY I evsjvi †jvKms¯‹…wZ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪

মিলনেন্দু জানা, `wÿY-cwðg e‡½i avav : GKwU mgxÿv, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৪০৯

মিহির কামিল্যা চৌধুরী, evsjvi †jvKms¯‹…wZ : ¯^v‡` A¯^v‡`, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

মিহির চৌধুরী কামিল্যা, AvÂwjK †`eZv : †jvKms¯‹…wZ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০০

মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পাদিত), e½xq wkí cwiPq, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪

মিঞা লুৎফার রহমান ও ফজলুল হক সৈকত (সম্পাদিত), RmxgD``xb : HwZ‡n¨i AnsKvi, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পাদিত), wd‡i †`Lv mviv Rxeb, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, প্রথম খণ্ড : ২০০০, দ্বিতীয় খণ্ড : ২০০১

মুনীর আহমেদ, ûgvqb Avn‡g` I hZ K_v, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

মুস্তাফা পান্না, evsjv‡`‡ki kgRxex gvbl, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

মুহম্মদ আবদুল খালেক, ga¨h‡Mi evsjv Kv‡e¨ †jvK-Dcv`vb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

মুহম্মদ আবদুল জলিল, †jvKmwn‡Z¨i bvbv w`K, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

মুহম্মদ আবদুল জলিল, †jvKms¯‹…Zi bvbv cm½, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

মুহম্মদ আবদুল জলিল, †jvKwPwKrmvq Zš-gš¿. বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০১

মুহম্মদ আবদুল জলিল, evsjvi †jvKvqZ ms¯‹…Z, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১২

মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদ, evsjv‡`‡ki †jvKfvlv : mgxÿv I Awfavb, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদ, cdvK‡jvi I †jvKfvlv, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

মৃণাল নাথ, fvlv I mgvR, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯

মেজবাহ উদ্দিন তুহিন, evsjvi †jvKwkí I †jvKHwZn¨, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১২

মোবারক হোসেন ও কুতুব আজাদ সম্পাদিত, evsjv‡`‡ki Drme : beeI, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

মোমেন চৌধুরী, evsjv‡`‡ki †jŠwKK AvPvi-Abôvb : Rb¥ I weevn, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

মোমেন চৌধুরী, †jvKms¯‹…wi I wewea cm½, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান (সম্পাদিত), Avng` Qdv ¯§viKMš', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩

মোশতাক আহমেদ, GKSjK wKse`wšÍ ûgvqb Avn‡g`, নালন্দা, ঢাকা, ২০১৩

মোস্তফা মোহাম্মদ, AvLZvi"¾vgvb Bwjqv‡mi K_vmwn‡Z¨ wfbgvÎv Ab¨mi, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩

মোস্তফা মোহাম্মদ, mwn‡Z¨ gbb-mRb I AvLZvi"¾vgvb Bwjqvm, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, †dvK‡jvi Drme I †jvK ms¯‹…wi, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০৭

মোঃ আকতারুজ্জামান শেখ, gvB‡Kj g`m~`b `‡Ëi Kve¨ I cnm‡b †jvK-Dcv`vb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

মোঃ আবদুর রশীদ, kIKZ Imgv‡bi †QvUMí : mgKvj, Rxeb‰ewPÎ¨ I wkíiƒc, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, ২০১৫

যতীন সরকার, cvKZR‡bi Rxeb‘kb, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

রঙ্গলাল সেন, cvwi¤K mgvRweÁvb, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩

রতন সিদ্দিকী, Dwbk kZ‡Ki evsjv bvU‡K †jvK Dcv‘vb, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০৬

রফিকুজ্জামান হুমায়ুন (সম্পাদিত) ûgvqb Avn‡g‘ ¯§viKMš, জনতা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

রফিকউল্লাহ খান, evsjv‡‘‡ki Dcb¨vm : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

রফিকুল ইসলাম, Dcgnv‡‘‡ki wkíKjv, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩

রবিন পাল, Dcb¨vm : cvP¨ I cvðvË¨, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১১

রশীদ করিম, Avi GK ‘wó‡KvY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১

রবিন পাল (সম্পাদিত), jvjmvj : bvbv cm½, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০

রহমান হাবিব, evsjv‡‘‡ki KweZv I Dcb¨v‡mi ‘kb Ges Avng‘ Qdvi mwówek¦, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

রাজশেখর বসু (সারানূদিত), gnvfviZ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

রাজশেখর বসু (সারানূদিত), ivgvqY, বাল্মীকি রচিত, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

রাজিয়া সুলতানা, mwnZ¨ exÿY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

শঙ্কর বিশাই, evsjvi ‘wÿY-cwðg DcKjeZx †jvKRxeb I ms¯wZ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪

শওকত আলী, kIKZ Avjxi ceÜ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

শহীদ ইকবাল, AvLZvi¾vgvb Bwjqvm : gvbl I K_wkí, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯

শামসুদ্দিন চৌধুরী, ˆmq‘ IqvjxDjøvni mwn‡Z¨ cZxP¨ cfve, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

শামসুদ্দিন চৌধুরী (অনূদিত), wbevwPZ iPbv : †Kv‘ †jwf ¯'vDm, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১১

শামসুদ্দিন চৌধুরী (অনূদিত), wg_jwR, রলা বার্ত, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১২

শামসুল আরেফীন, Avng‘ Qdvi A›‘ignj, বলাকা, চট্টগ্রাম, ২০০৪

শামীমা হামিদ, ˆmq‘ IqvjxDjøvni mvwnZ¨Kg : kãe¨envi I †PZbvcevnixwZ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

শান্তনু কায়সার, A‰ØZ gjøegY, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬

শান্তনু কায়সার, kIKZ Imgvb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩

শাহরিয়ার ইকবাল, ûgvqb Kwei, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

শাহরিয়ার কবির, AšÍi½ ûgvqb Avn‡g‘, সুবর্ণ, ঢাকা, ১৯৯২

শাহাদুজ্জামান (সম্পাদিত), AvLZviæ¾vgvb Bwjqv‡mi Wv‡qwi, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

শাহীদা খাতুন (সম্পাদিত), GK‡ki ceÜ : †dvK‡jvi, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

শাহীদা আখতার, ce I cwðg evsjvi Dcb¨vm, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

শিমুল মাহমুদ, bRiæj mvwn‡Z¨ civY cm½, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

শিরীণ আখতার, evsjv‡‘‡ki wZbRb Jcb¨wmK, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪

শীলা বসাক, evsjvi wKse‘wš, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৩

শুভ রহমান (প্রকাশক), A‰ØZ gjøegY I wZZvm GKwU b‘xi bvg, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৯

শুভঙ্কর ঘোষ, K_wk‡íi eûgwÎKZv, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০২

শেখ মাসুম কামাল, cm½ : Avng‘ Qdvi gvbm cKwZ I wkívbfwZ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০০৯

শেখ মকবুল ইসলাম, †jvKms¯'wZweÁvb : ZË, c×wZ I c‡qvM, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১

শোয়েব শাহরিয়ার, Bwjqvm I LwÐZ †PZbvi bv›‘xcvV, নিসর্গ, বগুড়া, ২০০৪

শ্যামসুন্দর প্রধান, wKse‘šÍx : Drm I we‡kølY, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১

সনৎকুমার মিত্র, evOjv †jvKfvlv weÁvb, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২০০১

সমীরণ মজুমদার (সম্পাদিত), AvLZvi¾vgvb Bwjqvm ¯§viKMš, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৭

সরকার আবদুল মান্নান, evsjv K_vmvwnZ¨ : AvawbKZvi Kkxje, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

সরদার আবদুস সাত্তার, ¯§wZRvMwbqv ûgvqb Avn‡g‘, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩

স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদিত), ˆekvLx †jvK-Drme ceÜ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

সিনহা আবুল মনসুর, ûgvqb : GKRb n¨wgj‡bi ewklqvjv, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), †cŠiwYK Awfavb, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৪১৫

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, RmxgD‘‘xb : Kwegvbm I Kve¨mvabv, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০১২

সুব্রত কুমার দাস, evsjv K_vmvwnZ¨, hv‘ev¯ÍeZv Ges Ab¨vb¨, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০২

সুব্রত কুমার দাস, evsjv‡‘‡ki K‡qKRb Jcb¨vwmK, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৫

সুব্রত মুখোপাধ্যায়, mxgvšÍ evsjvi †jvKµxov, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০১

সুধীর চক্রবর্তী, Drm‡e BwZnv‡m †gjvq, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪

সুবলচন্দ্র মিত্র, evsjv cev‘ I cePb, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

সুমিতা দাস, iƒcK_vi Aw½K : ie›‘bv‡_i KweZv I Mvb, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

সুশান্ত দাস (সম্পাদিত), wZZvm GKwU b‘xi bvg : cm½ I Abl½, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ১৯৯৯

সুশান্ত মজুমদার, gb‡bi ga, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১০

স্মৃতি ভৌমিক, bvU¨Kvi kIKZ Imgvb, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩

সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদিত), kvgm‘‘xb Avej Kvjvg ¯§viKMš, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), GK‡ki ¯§iKMš 2000, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০

সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), ˆmq‘ IqvjxDjøvn iPbvejx (c_g LÐ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

সৈয়দ আকরম হোসেন, cm½ : evsjv K_vmvwnZ¨, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭

সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পাদিত), ˆggbwmsn MxwZKv, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩

সৈয়দ আবদুল মকসুদ, ˆmq‘ IqvjxDjøvni Rxeb I mvwnZ¨ (‘B LÐ), মিনার্ভা বুকস, ঢাকা, ১৯৮১-১৯৮৩

সৈয়দ মাহবুব আলম, †jvKwkí, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৯

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, Qovq evOvjx mgvR I ms¯‹…wZ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

সৌগত চট্টোপাধ্যায়, †jvKms¯‹…wZ : A›‘ignj-evignj, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০

সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), †jvKK_vi eYgvjv, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪

সৌদা আখতার, ˆmq‘ IqvjxDjøvni jvjmvj I Ab¨vb¨ ceÜ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

সৌভিক রেজা, K_wk‡íi K_v, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১২

সৌমেন সেন, †jvKms¯‹…wZi AvZ¥-Aci I Ab¨vb¨, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৪

সৌমিত্র শেখর, K_wkí A‡šlY, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬

সৌমিত্র শেখর (সম্পাদিত), †jvK-Drme : bevb, অবসর, ঢাকা, ২০১৪

সৌমেন দাশ, ZjbvgjK †jvKmvwnZ¨ : c×wZ I c‡qvM, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৬

হরিপদ দত্ত, K_v I mvwnZ¨, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০০২

হাসান আজিজুল হক, K_vmvwn‡Z¨i K_KZv, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮১

হাসান আজিজুল হক, K_v †jLv K_v, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩

হাসান আজিজুল হক, iPbv msMn 4, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩

হাসান আজিজুল হক, gM Ae‡jvKb I mvgvb¨ wePvi, চারুলিপি, ঢাকা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

হাসান হাফিজ (সম্পাদিত), ûgvqb Avn‡g' : mgKv‡ji †Pv‡L, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

হাসান হাফিজ (সম্পাদিত), ûgvqb Avn‡g' ¯§iKMš, মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০১৩

হরিপদ দত্ত, K_v I mwnZ¨, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০০২

হরিশংকর জলদাস, b'xwfwËK evsjv Dcb¨vm I ˆKeZ RbRxeb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

হুমায়ুন আজাদ, ûgvqb AvRv‡'i mvÿvrKvi, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

হুমায়ূন আহমেদ, Avgvi Avcb Avavi, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১০

হুমায়ূন আহমেদ, k•Lbxj KvivMvi, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫

হুমায়ূন আহমেদ, KvV‡cwÝj, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

হুমায়ূন আহমেদ, dvD‡›Ub‡cb, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

হুমায়ূন আহমেদ, iO‡cwÝj, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

হুমায়ূন আহমেদ, GB Awg, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

হুমায়ূন আহমেদ, wnwRwewR, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

হুমায়ূন আহমেদ, emšÍ wejvc, প্রথমা, ঢাকা, ২০১২

হুমায়ুন কবির, evOjvi Kve¨, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

হীরেন্দ্রনাথ মিত্র, evsjvi †jvKDrme I †jvKwkí, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১৫

হেলাল আহমেদ, Uj÷q, weò †' I Ab¨vb¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

হোসনে আরা জলী, kIKZ Imgvb I Ab¨vb¨ cm½, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

ইংরেজি গ্রন্থ

Maria leach (edited) : *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend,* Funk and Wagnalls Company, America, 1949.

সহায়ক পত্রিকা ও প্রবন্ধ (বর্ণানুক্রমিক)

আখতারুন্নেছা বেগম (সম্পাদিত), wkíKjv evsjv cwÎKv, ত্রয়োবিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩

আখতারুন্নেছা বেগম (সম্পাদিত), wkíKjv evsjv cwÎKv, চতুর্বিংশ বর্ষ ২য় ও পঞ্চবিংশ বর্ষ ১ম যুক্ত সংখ্যা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫

আনু মুহাম্মদ (সম্পাদিত), ZYgj ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৮

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পাদিত), evsjv GKv‡Wwg cwÎKv, ৪৮ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪

এজাজ ইউসুফী (সম্পাদিত), wjwiK আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত), MíK_v, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৬, রাজশাহী, ২০১৫

প্রণব সরকার (সম্পাদিত), †jvK, সংখ্যা ১, কলকাতা, ২০১৩

প্রণব সরকার (সম্পাদিত), †jvK, বাংলার মেলা ও উৎসব সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৮

ভীষ্মদেব চৌধুরী (সম্পাদিত), AšÍ‡'k, হারুনুর রশীদ, 'কাব্যিক ভাষ্যে চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস', প্রথম বর্ষ বসন্ত সংখ্যা, ২০১৫

মনসুর মুসা (সম্পাদিত), DËiwaKvi, ২৮ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, ২৯ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, ৩০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

মোস্তফা তারিকুল আহসান সম্পাদিত, evZ©¨, পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, রাজশাহী, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত Elv‡jv‡K, নব পর্যায় তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৪

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত Elv‡jv‡ক নব পর্যায় পঞ্চম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৯

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত ঊষালোকে নব পর্যায় অষ্টম সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৪

মোঃ শহিদুর রহমান সম্পাদিত, †dvK‡jvi Rvbvj, চতুর্থ সংখ্যা, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ২০১০

শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), evsjv GKv‡Wwg cwÎKv, ৫৩ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

সদরুল আমিন (সম্পাদিত), Kjv Abl‘ cwÎKv, হোসনে আরা, ‘পদ্মার পলিদ্বীপ : চর অঞ্চলের জীবনের মানচিত্র’, খণ্ড ৬, সংখ্যা ৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১৩

সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত) DjLvMov, মহীবুল আজিজ, ‘ভাটি অঞ্চলের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও সমুদ্রবাসর’, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৫

সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), DjLvMov, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৬

সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), DjLvMov, সংখ্যা ১৯, ঢাকা, ২০১৬

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), DËiwaKvi, আজহার ইসলাম, ‘বাংলাদেশের অপাংক্তেয় জীবনের নীরব রূপকার কথাশিল্পী শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম’, ২৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), evsjv GKv‡Wwg cwÎKv, ৫২ বর্ষ ২য় সংখ্যা. বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পাদিত), evsjv GKv‡Wwg cwÎKv, মাহফুজা হিলালী, ‘শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের তিনটি উপন্যাস : জায়জঙ্গল, সমুদ্র বাসর ও কাঞ্চনগ্রাম’, ৫২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

হুমায়ুন কবির (সম্পাদিত), NsNi, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৫

শওকত হোসেন (সম্পাদিত), nvjLvZv, গোপা দত্ত ভৌমিক, ‘উড়ুক্কু : বিপন্নতার বর্ণমালা, প্রতিবাদের আখর’, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository